জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষান্মাসিক সূচীপত্র

১৯৫৯

দ্বাদশ বর্ষ ; জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন : ১৯৫৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
অনন্তের পরিভাষা	শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জী	৬৫	ফেব্রুয়ারী
অতিকায় সৌরচুল্লী		২২৬	এপ্রিল
আরথ্রাইটিসের চিকিৎসা	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	২৫৭	মে
আলোকের চাপ	শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী	১৫৫	মার্চ
আখের ছিব্ড়া হইতে কাগজ ও প্লাষ্টিক		২৯৫	মে
ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান	শ্রীসুবোধনাথ বাগচী	১২৯	মার্চ
উল্কা	শ্রীসুবিমল সিংহরায়	১১০	ফেব্রুয়ারী
এন্জাইম	শ্রীজয়া রায়	২৭৫	মে
এরেনিয়াস	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২১৬	এপ্রিল
এক্স-রে, অ্যাটম ও ম্যাক্স ফন লাউয়ে	শ্রীবিমলেন্দু মিত্র	৩২১	জুন
কালের বন্ধন	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৬৮	ফেব্রুয়ারী
কাঁকড়ার কথা	শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯	মার্চ
কুষ্ঠরোগের নূতন ঔষধ		২৯৩	মে
কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি	—গ—	৩৪৪	জুন
কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার		২৯৪	মে
ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম		১০১	ফেব্রুয়ারী
ক্লোরোফিল-মানুষ	শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী	১৬৫	মার্চ
খাদ্য-বিজ্ঞান ও রুচিবোধ	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	১৬	জানুয়ারী
গণিতে রহস্য-বাদ	শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	২২৯	জুন
গণিতশাস্ত্রের প্রগতি	শ্রীশুকদেব দত্ত	১৪	জানুয়ারী
গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান	ক্ষমা মুখোপাধ্যায়	১৯৩	এপ্রিল
গোধূলি ও উষা	শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	১০	জানুয়ারী
গ্রহাণুপুঞ্জের সন্ধানে		২১৪	এপ্রিল
চাঁদের দেশের নূতন খবর	শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	২৩৬	এপ্রিল
চিকিৎসায় রসায়ন	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	২৬১	মে
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিস্ময়		২৯	জানুয়ারী
চিঠি-পত্র (মাতৃদুগ্ধ)	শ্রীধ্রুবপ্রসাদ সেন	১০৪	ফেব্রুয়ারী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহার্য ?		২১০	এপ্রিল
জলহস্তী		৩০৩	মে
জানবার কথা		৫০	জানুয়ারী
”		১১৩	ফেব্রুয়ারী
”		১৮১	মার্চ
”		২৪১	এপ্রিল
জিভের কথা	শ্রীজয়া রায়	৯৪	ফেব্রুয়ারী
জীবের আঙ্গিক গঠন	শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা	১৯৯	এপ্রিল
জীবদেহের রঞ্জক পদার্থ	”	২৭০	মে
জ্ঞান বিজ্ঞানের নানাকথা	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	২৩৮	এপ্রিল
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	৯১	ফেব্রুয়ারী
ডাঃ জোনাস ই. সল্ক্		৩০৬	মে
তটরেখার স্থায়ী পরিবর্তন	শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র	১৬৮	মার্চ
তোৎলামি	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৮১	ফেব্রুয়ারী
দিনটি কত বড় ?	শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	২৬৬	মে
নভোচারী রকেটের চন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটন	বি. কুকারকিন	২৩৩	এপ্রিল
নিদ্রা	শ্রীসন্তোষকুমার দে	১৭৩	মার্চ
পরশমণি	শ্রীবিজয়কুমার শীল	১৯	জানুয়ারী
পরমাণু পরিচয়	শ্রীঅশোককুমার দত্ত	৯৭	ফেব্রুয়ারী
পরমাণু-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ		২৯৭	মে
পারমাণবিক শক্তি	শ্রীকমলেশ মজুমদার	২৮৯	মে
পার্বত্য পথ নির্মাণ	শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২২১	এপ্রিল
পুরাতন ধমনীর স্থলে নূতন ধমনী		১০২	ফেব্রুয়ারী
পুস্তক পরিচয়		৩৬	জানুয়ারী
পেন্সিলের কথা	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৩৬১	জুন
প্যাভ্লব	শ্রীসন্তোষকুমার দে	৭৭	ফেব্রুয়ারী
প্রকৃতির রোষ	শ্রীসুবিমল সিংহরায়	১৪১	মার্চ
প্রাণী-দেহের জল	শ্রীজয়া রায়	২০৩	এপ্রিল
প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাচ	শ্রীপার্থসারথি সেন	২৭৫	মে
বরফাচ্ছাদিত সুমেরু মহাসাগর		৩৫৭	জুন
বংশগতির রহস্য			জানুয়ারী
বাংলার জীবজন্তু	শ্রীবিনায়ক সেন	১০৫	ফেব্রুয়ারী
বায়ুস্তরে আয়নমণ্ডলী	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	১৫৮	মার্চ
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষা সমস্যা	শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী	৮৬	ফেব্রুয়ারী
বিজ্ঞান সংবাদ •	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	৩২০	এপ্রিল
		২৮১	মে

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে সৌরশক্তি		২০৯	এপ্রিল
বিশ্বজগতে সূর্যের স্থান	শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত	২২	জানুয়ারী
বেতার-দূরবীক্ষণ		৩০	জানুয়ারী
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জাতীয় সরকার	শ্রীদুর্গাদাস	২০৬	এপ্রিল
ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন		৩৭	জানুয়ারী
ভিটামিন ও দেহপুষ্টি		৩৫৯	জুন
ভূ-ত্বক ও ভূ-অভ্যন্তর	শ্রীমিহির বসু	৭৩	ফেব্রুয়ারী
মঙ্গলগ্রহের কথা	শ্রীজয়া রায়	৩১৩	জুন
মরুভূমি	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৩৪	জুন
মহাশূন্যের বাণী	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	১৬২	মার্চ
মানব-কল্যাণে জীবাণু		১৭৬	মার্চ
মেসন	শ্রীসরোজকুমার দে	১৪৪	মার্চ
রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার—১৯৫৮	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩	জানুয়ারী
শিল্পে ধাতুর ব্যবহার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	৩৪১	জুন
সামুদ্রিক আগাছা রাসায়নিক মূল্য		৩৫৮	জুন
সুরুর সুরুতে	শ্রীঅলক চক্রবর্তী	৪৭	জানুয়ারী
সূর্য-কিরণ ও জীবন	শ্রীঅমলেন্দু মিত্র	৩২	জানুয়ারী
সেমিনভের নূতন-তত্ত্ব		২৯৯	মে
সেলাই-কল আবিষ্কারের কথা		৩৫৪	জুন
সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে	শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য	৩০	মে
হ্যামিলটন	শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী	৬	জানুয়ারী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক-সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৫৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
শ্রীঅমলেন্দু মিত্র	সূর্য-কিরণ ও জীবন	৩২	জানুয়ারী
শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	কাঁকড়ার কথা	১৭৯	মার্চ
শ্রীঅলক চক্রবর্তী	সুরুর সুরুতে	৪৭	জানুয়ারী
শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	পার্বত্য পথ নির্মাণ	২২১	এপ্রিল
শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী	আলোকের চাপ	১৫৫	মার্চ
	হ্যামিলটন	৬	জানুয়ারী
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	আরথ্রাইটিসের চিকিৎসা	২৫৭	মে
	তোৎলামি	৮১	ফেব্রুয়ারী
	বায়ুস্তরে আয়ন-মণ্ডলী	১৫৮	মার্চ
	পেন্সিলের কথা	৩৬১	জুন

লেখক	প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা	মাস
শ্রীঅশোককুমার দত্ত	পরমাণু পরিচয়	৯৭	ফেব্রুয়ারী
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা	জীবের আঙ্গিক গঠন	১৯৯	এপ্রিল
	জীবদেহের রঞ্জক-পদার্থ	২৭০	মে
শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	এরেনিয়াস	২১৬	এপ্রিল
	কালের বন্ধন	৬৮	ফেব্রুয়ারী
	রসায়নে নোবেল পুরস্কার—১৯৫৮	৩	জানুয়ারী
	মরুভূমি	৩৩৪	জুন
শ্রীকমলেশ মজুমদার	পারমাণবিক শক্তি	২৮৫	মে
ক্ষমা মুখোপাধ্যায়	গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান	১২৩	এপ্রিল
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	খাদ্য-বিজ্ঞান ও রুচিবোধ	১৬	জানুয়ারী
	জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা	২৩৮	এপ্রিল
	চিকিৎসায় রসায়ন	২৬১	মে
	মহাশূন্যের বাণী	১৬২	মার্চ
	শিল্পে ধাতুর ব্যবহার	৩৪১	জুন
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি	৩৪৪	জুন
শ্রীজয়া রায়	এন্‌জাইম	২৭৫	মে
	জিভের কথা	৯৪	ফেব্রুয়ারী
	প্রাণী-দেহের জল	২০১	এপ্রিল
	মঙ্গলগ্রহের কথা	৩৫৩	জুন
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	৯১	ফেব্রুয়ারী
শ্রীদুর্গাদাস	বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জাতীয় সরকার	২০৬	এপ্রিল
শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জী	অনন্তের পরিভাষা	৬৫	ফেব্রুয়ারী
শ্রীধ্রুবপ্রসাদ সেন	চিঠি-পত্র (মাতৃদুগ্ধ)	১০৪	ফেব্রুয়ারী
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী	ক্লোরোফিল-মানুষ	১৬৫	মার্চ
শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র	তটরেখার স্থায়ী পরিবর্তন	১৬৮	মার্চ
শ্রীপার্থসারথি সেন	প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাচ	২৮৫	মে
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	বিজ্ঞান সংবাদ	২৩০	এপ্রিল
	„	২৮১	মে
শ্রীবিনায়ক সেন	বাংলার জীবজন্তু	১০৫	ফেব্রুয়ারী
শ্রীবিজয়কুমার শীল	পরশমণি	১৯	জানুয়ারী
শ্রীবিমলেন্দু মিত্র	এক্স-রে, অ্যাটম ও ম্যাক্স ফন লাউয়ে	৩২১	জুন
বি, কুকারকিন	নভোচারী রকেটের চন্দ্রের রহস্যোদ্ঘাটন	২৩৩	এপ্রিল
শ্রীমিহির বসু	ভূ-ত্বক ও ভূ-অভ্যন্তর	৭৩	ফেব্রুয়ারী
শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	গোধূলী ও উষা	১০	জানুয়ারী
	চাঁদের দেশের নূতন খবর	২৩১	এপ্রিল
	দিনটা কত বড় ?	২৬৬	মে
	গণিতে রহস্যবাদ	২২৯	জুন

শ্রীসরোজকুমার দে	মেসন	১৪৪	মার্চ
শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত	বিশ্বজগতে সূর্যের স্থান	২২	জানুয়ারী
শ্রীসন্তোষকুমার দে	নিদ্রা	১৭৩	মার্চ
	প্যাভ্‌লব	৭৭	ফেব্রুয়ারী
শ্রীসুবিমল সিংহরায়	উল্কা	১১০	ফেব্রুয়ারী
	প্রকৃতির রোষ	১৭১	মার্চ
শ্রীসুবোধনাথ বাগচী	ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান	১২৯	মার্চ
শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য	সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে	৩০০	মে
শ্রীশুকদেব দত্ত	গণিত-শাস্ত্রের প্রগতি	১৭	জানুয়ারী

চিত্র-সূচী

অক্সিজেন পরমাণুর ছবি	...	২০	জানুয়ারী
অ্যাটলাস নামক ক্ষেপণাস্ত্রকে শূন্যে নিক্ষেপের প্রস্তুতি	...	২৮৮	মে
ইউ-এস-এর একটি সৌরচুল্লীর একাংশের দৃশ্য		আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা	মার্চ
এক্স-রে, অ্যাটম ও ম্যাক্স ফন লাউয়ে	...	৩২৩, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৬	জুন
কয়ার ফড়িং এর লম্ফন	...	৩৫০	জুন
কলাম্বাস-২ নামক যন্ত্র	...	২৬০	মে
কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড	...	৩১৬	জুন
খোলস-শূন্য শামুক	...	৩৫১	জুন
গণিতে রহস্যবাদ	...	৩৩৩	জুন
গুবরে পোকার লড়াই	...	৩৪৬	জুন
গোধুলি ও ঊষা	...	১২, ১৩	জানুয়ারী
চিড়িয়াখানায় শ্বেতভল্লুক		আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা	ফেব্রুয়ারী
জানবার কথা	...	৫০	জানুয়ারী
"	...	১৮২	মার্চ
"	...	২৪১	এপ্রিল
জুনো-২ নামক রকেট	...	২১৫	এপ্রিল
টাইটান নামক ক্ষেপণাস্ত্র	...	২২০	এপ্রিল
ডাঃ এ. এল মুদালিয়র	...	৩৭	জানুয়ারী
" এম. রায়	...	৩৮	জানুয়ারী
" এস. আর. পালিত	...	৪০	জানুয়ারী
" এ. কে. দত্ত	...	৩৯	জানুয়ারী
" এন. সি. চ্যাটার্জী	...	৪১	জানুয়ারী
" আর. মিশ্র	...	৪১	জানুয়ারী

„ বি. এন. ভীমাচার .. ৪২ জানুয়ারী

„ পি. জি. পাণ্ডে ... ৪৩ জানুয়ারী

„ বি. কে. কর ... ৪৪ জানুয়ারী

„ এন. পি. বেনওয়ারি .. ৪৪ জানুয়ারী

„ ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী .. ৪৫ জানুয়ারী

„ এম. দত্ত ... ৪৫ জানুয়ারী

„ এস. জালোটা .. ৪৬ জানুয়ারী

„ হিদেকী ইউকাওয়া .. ১৪৭ মার্চ

„ সি এফ. পাওয়েল .. ১৫০ মার্চ

„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ... ৯২ ফেব্রুয়ারী

„ জোনাস ই. সল্ক .. ৩০৬ মে

ডায়নামোমিটার যন্ত্রে কীট-পতঙ্গের শক্তি পরীক্ষা ... ৩৪৯ জুন

ড্রেসডেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে ড্রেডনটট নামক সাবমেরিন ১৪৩ মার্চ

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে চিকিৎসা .. ২৮৪ মে

দিনটা কত বড়? .. ২৬৭, ২৬৮ মে

ধাতুর ক্ষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা ... ২৬ জানুয়ারী

নাইট্রোজেন পরমাণুর ছবি ... ২০ জানুয়ারী

পরমাণু রূপান্তরের যন্ত্র ... ২১ জানুয়ারী

পাতা-কাটা পিঁপড়ে ... ৩৪৪ জুন

পাইওনিয়ার নামক কৃত্রিম উপগ্রহ আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা জানুয়ারী

পাইপমোবাইল নামক যন্ত্র ... ৬৭ ফেব্রুয়ারী

পাইওনিয়ার-৩ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ ... ২২৫ এপ্রিল

পাই-মেসনের মিউ-মেসনে রূপান্তর ... ১৫১ মার্চ

পাঁচশ' ডিগ্রি তাপ উৎপাদক সৌরচুল্লী ... ২২৭ এপ্রিল

পার্বত্য পথ নির্মাণ ... ২২২ এপ্রিল

পুনার জাতীয় গবেষণাগার ... ৮৫ ফেব্রুয়ারী

পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সৌরচুল্লী ... ৩ ৮ জুন

পেন্সিলের সরু মুখের উপর দিয়ে খোলা-শূন্য শামুক হাঁটছে ... ৩৫২ জুন

বড় ফড়িংটি ছোট ফড়িংটিকে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে তাড়া করছে ৩৫১ জুন

বেট্‌সি বাগ ... ৩৪৫ জুন

ব্রিডার-রি-অ্যাক্টরের দৃশ্য ... ২ জানুয়ারী

ভারটোল-৭৬ নামক বিমান ... ১৪৪ মার্চ

ভ্যানগার্ড-২-এর আভ্যন্তরীণ নক্সা ... ২৯২ মে

মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা ... ৩৪৩ জুন

মস্কোর শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত রকেটের অগ্রভাগ আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা এপ্রিল

মেসন-কণিকার পথচিহ্ন	...	১৪৬	মার্চ
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত অভিনব আকাশ-যানের নমুনা		আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা	মে
শস্য সংগ্রাহক পিঁপড়ে	...	৩৪৫	জুন
সজ্জী-শামুক	...	৩৪৭	জুন
সজ্জী বাগানের শামুক অনায়াসে উপরে উঠে যাচ্ছে	...	৩৪৮	জুন
সূর্য-প্রদক্ষিণকারী পায়োনিয়ার-৪		আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা	জুন
সৌর চুল্লীর প্রতিফলকের দৃশ্য	...	২২৬	এপ্রিল
সৌরচুল্লীর তাপের তীব্রতা পরীক্ষার জন্য লোহার বীম	...	২২৮	এপ্রিল
সৌরচুল্লীর তাপে লোহার বীম গলে গেছে	...	২২৮	এপ্রিল
সৌরচুল্লীর তাপে লোহার বীমে ডিম্বাকৃতির গর্ত সৃষ্টি হয়েছে	...	২২৯	এপ্রিল
স্কেট নামক সাবমেরিন	...	১৫৭	মার্চ

বিবিধ

		পৃষ্ঠা	মাস
আকাশে মঞ্চ স্থাপন	...	৩৭৪	জুন
অভিনব ইলেকট্রনিক যন্ত্র	...	১৯১	মার্চ
অভিনব খেল্না মোটর গাড়ী	...	৬০	জানুয়ারী
অতি দ্রুত ছবি তুলবার ক্যামেরা	...	২৫২	এপ্রিল
অক্সিজেন প্রয়োগে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি	...	২৫৩	এপ্রিল
অর্ধশতাব্দীকালের খাদ্য অবিকৃত	...	৬২	জানুয়ারী
আকাশে অবস্থানের নূতন রেকর্ড	...	১২৭	ফেব্রুয়ারী
আকাশে মঞ্চ স্থাপন	...	৩৭৪	জুন
ইলেকট্রনিক রক্ত বিশ্লেষক	...	২৫১	এপ্রিল
ইস্পাতের চেয়ে শক্ত প্লাষ্টিক	...	৩১৭	মে
ইনফ্লুয়েঞ্জার নূতন টীকা	...	১২৩	ফেব্রুয়ারী
উইলোগাছের শাখার দ্বারা অস্থি ভঙ্গের চিকিৎসা	...	৬১	জানুয়ারী
১৯৬৪ সালে ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন	...	১২৪	ফেব্রুয়ারী
উদ্ভিদের ব্যাধি নিরাময়ে শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার	...	১৯১	মার্চ
উজ্জ্বলতর সূর্য	...	৩২০	মে
উল্কাপিণ্ডের জীবন-কথা	...	৩১৭	মে
কমেট-৪ বিমানের নূতন রেকর্ড	...	১২৩	ফেব্রুয়ারী
কারগলিতে এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা ধোতাগার	...	৩১৪	মে
কুষ্ঠরোগের নূতন ঔষধ	...	৫৯	জানুয়ারী
ক্যামেরুণ পর্বতে অগ্ন্যুৎপত্তি	...	২৫৫	এপ্রিল
ক্যানসার রোগোৎপত্তির রাসায়নিক কারণ	...	২৪৮	এপ্রিল
ক্লোরেলা মহাকাশ যাত্রীর রক্ষাকবচ	...	৫৮	জানুয়ারী

কৃত্রিম কিড্‌নি	...	৩১৭	মে
কৃত্রিম উপায়ে মানব-দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি	...	৩৭২	জুন
খালের ময়লা পরিষ্কারে মাছ	...	১২২	ফেব্রুয়ারী
খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন	...	১২৫	ফেব্রুয়ারী
গ্র্যাফাইট ক্রুসিকা তৈরীর নূতন	...	১২৭	ফেব্রুয়ারী
চন্দ্রলোক ও মানুষ	...	২৪৯	এপ্রিল
চাঁদের রং	...	৩১৯	মে
চিকিৎসায় পারমাণবিক শক্তি	...	৩১৪	মে
চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় ভেষজ	...	২৫৩	এপ্রিল
ছায়াপথের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস	...	৫৬	জানুয়ারী
জল ও মৃত্তিকাস্পর্শী অভিনব যান	...	৩৭৪	জুন
টেপিওকা ম্যাকারনি	...	১২৫	ফেব্রুয়ারী
তিনশত কোটি বছর আগে	...	৩১৮	মে
তেজস্ক্রিয় পুস্তক	...	১২৪	ফেব্রুয়ারী
দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে গবেষণা	...	২৫০	এপ্রিল
দীর্ঘজীবী মানুষ	...	৬১	জানুয়ারী
দেশান্তর ভ্রমণকারী মাছ	...	৫৯	জানুয়ারী
ধাতব লবণের সাহায্যে উদ্ভিদের রোগ নিরাময়	...	২৪৭	এপ্রিল
নন্দকোট্‌ শৃঙ্গ অভিযান	...	৩৭২	জুন
নূতন টেলিভিসন লেন্স	...	১২২	ফেব্রুয়ারী
নূতন ধরণের যন্ত্র-মানব	...	১৯১	মার্চ
নূতন ঔষধ আবিষ্কার	...	২৫১	এপ্রিল
পরমাণু শক্তি হইতে বিদ্যুৎশক্তি	...	৩১৫	মে
পরলোকগত ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	...	৬৩	জানুয়ারী
পরলোকগত ডাঃ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	...	১১৯	ফেব্রুয়ারী
পরলোকগত ক্যাপ্টেন স্কট কর্তৃক ব্যবহৃত ঘড়ি	...	১২৩	ফেব্রুয়ারী
পারমাণবিক লণ্ঠন	...	১২৭	ফেব্রুয়ারী
পুষ্টির অভাব দৃষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ	...	১৪৭	এপ্রিল
পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার	...	২৪৮	এপ্রিল
পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি	...	১৯১	মার্চ
পৃথিবীর আকার	...	১৯১	মার্চ
পৃথিবীর আকার ও আন্তঃগ্রহ দূরত্ব	...	২৪৮	এপ্রিল
প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কার	...	২৫৩	এপ্রিল
প্লাষ্টিকের ধমনী	...	২৫১	এপ্রিল
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ	...	১৮৮	মার্চ
বজ্রপাত ঘটিয়ে ফসল বৃদ্ধি	...	২৫২	এপ্রিল
বাঁকুড়া ও অণ্ডালে কয়লাখনির সন্ধান	...	১৮৯	মার্চ
বিভিন্ন দেশে জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি	...	৫৭	জানুয়ারী
বিগবেন শতবার্ষিকী	...	১৯০	মার্চ
বিষ ও অমৃত	...	৩১৭	মে
বিজ্ঞানীর স্বপ্ন	...	২৫৫	এপ্রিল
বেলুনযোগে আটলাণ্টিক অতিক্রমের প্রয়াস	...	৬১	জানুয়ারী

বেতার-সঙ্কেত প্রতিফলনের কাজে চন্দ্র উপগ্রহ	...	২৪৯	এপ্রিল
বোর্ণিওর আদিম নরমুণ্ড শিকারী জাতি	...	২৫৪	এপ্রিল
বৃটেনের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ	...	১৯০	মার্চ
ভারতে ইউরেনিয়াম ধাতুর কারখানা	...	১২৪	ফেব্রুয়ারী
ভারতে চীনা পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন পরীক্ষা	...	১২৫	ফেব্রুয়ারী
ভারতে মরু-পঙ্গপালের উপদ্রবের আশঙ্কা	...	১৮৯	মার্চ
ভারতে প্রথম পলিথিন কারখানা	...	৩১৪	মে
ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁক প্রবেশের সম্ভাবনা	...	৩১৪	মে
ভাইরাস ব্যাধি নিরাময়ে অক্সিজেন প্রয়োগ	...	৩১৬	মে
ভূগর্ভের তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	...	৩১৫	মে
ভূগর্ভস্থ সমাধিতে অমূল্য সম্পদ	...	৬০	জানুয়ারী
মহাকাশ বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক অধ্যায়	...	৩১৯	মে
মহাকাশে মৃত্তিকার অভিশাপ	...	২৫৪	এপ্রিল
মহাকাশে রুশ রকেট	...	৫৬	জানুয়ারী
মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ	...	১২৬	ফেব্রুয়ারী
মধ্য প্রদেশে নূতন কয়লা খনির সন্ধান	...	৩৭১	জুন
মরুভূমিতে জল-বিদ্যুৎ ষ্টেশন	...	৩১৬	মে
মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান	...	৩৭৪	জুন
মাটির নীচে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন	...	১২১	ফেব্রুয়ারী
মানুষের দেহযন্ত্র ও বয়স	..	১২৪	ফেব্রুয়ারী
মৌমাছির লালা থেকে নূতন অ্যান্টিবায়োটিক	...	২৫০	এপ্রিল
যান্ত্রিক মস্তিষ্ক	...	৬১	জানুয়ারী
রক্ত চাপাধিক্যের নূতন ঔষধ	...	৩৭৩	জুন
রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী	...	২৪৭	এপ্রিল
রক্তাল্পতা রোগের ঔষধ	...	৩৭৩	জুন
রক্তে ক্যান্সার রোগ	...	৩৭৩	জুন
রেশম চাষে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার	...	৩১৫	মে
শব্দের গতির দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন বিমান	...	১২৩	ফেব্রুয়ারী
শুক্রগ্রহে রকেট উৎক্ষেপণ	...	৩১৮	মে
শুক্রগ্রহে বেতার সঙ্কেত প্রেরণ	...	২৪৯	এপ্রিল
সমুদ্রের বহু নূতন রহস্য আবিষ্কার	...	১২০	ফেব্রুয়ারী
সমুদ্রের নোনাজল সুস্বাদু করিবার ব্যবস্থা	...	২৫২	এপ্রিল
সাধারণ সর্দিকাশি সম্পর্কিত গবেষণা	...	৬২	জানুয়ারী
সাধারণ সর্দির ভাইরাস	...	১৯০	মার্চ
৮৭ ঘণ্টায় বিশ্ব পরিক্রমা	...	২৫৪	এপ্রিল
স্বয়ংক্রিয় লৌহখনি	...	২৫৫	এপ্রিল
স্বপ্নবিলাস	...	২৫৪	এপ্রিল
হাতে কাগজ তৈরীর নূতন পদ্ধতি	...	১২৭	ফেব্রুয়ারী
হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার	...	২৫০	এপ্রিল

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৯

দ্বাদশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক যাণ্মাসিক বিষয় সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
অবকাশ পরিমাপক যন্ত্রাদির ব্যবহার	শ্রীদেবপ্রসাদ মৈত্র	৩৭৬	জুলাই
অক্টোপাস	শ্রীসুবিমল সিংহরায়	৪১৩	”
অন্তঃসত্বা অবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়		৪৬২	অগাষ্ট
অর্শ	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৫৩০	সেপ্টেম্বর
অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গ		৫৯৪	অক্টোবর
আধুনিক চিকিৎসায় প্লাষ্টিক		৬৫৯	নভেম্বর
আরশোলা	শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪৭	সেপ্টেম্বর
আঠারো মাস দুধ টাট্‌কা রাখা		৫৪৬	”
অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের চিকিৎসা		৫৯৬	অক্টোবর
অ্যাপেণ্ডিসাইটিস	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৬৫৫	নভেম্বর
অ্যান্টিবায়োটিক্স	শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি	৫৭৪	অক্টোবর
ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের প্রয়োজনীয়তা		৬৬২	নভেম্বর
উত্তাপে প্রাণ-ক্রিয়া	শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৯	সেপ্টেম্বর
উচ্চ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়া	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	৫২৮	”
উদ্ভিদ ও শিশির	শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী	৫৮৫	অক্টোবর
করোনারী থ্রম্বোসিস	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৪৭০	অগাষ্ট
কাগজের গুণ ও ব্যবহার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	৫৬৪	নভেম্বর
কার্বন	”	৬৭৭	”
কোকো ও চকলেট	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৪৪৩	অগাষ্ট
ক্যান্সার রোগের সমস্যা	”	৪৬৪	”
ক্যান্সার সম্বন্ধে দু’চার কথা	শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়	৫৮১	অক্টোবর
ক্যালকুলাসের গল্প	শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জী	৫১৪	সেপ্টেম্বর
খাদ্য ও কৃষিকার্যে পারমাণবিক শক্তি	শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী	৭০১	ডিসেম্বর
গণিতে ধাঁধা	শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	৬১৩	অক্টোবর
গণিতে শূন্যের আবিষ্কার	”	৪৪৪	অগাষ্ট
চন্দ্রলোকে উৎক্ষিপ্ত রকেট		৫৭৮	অক্টোবর
চাঁদের গল্প	শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী	৪৮৩	অগাষ্ট

চাঁদের দেশে রকেট অভিযান	শ্রীবিশ্বম্ভর ঘোষ	৫৫০	সেপ্টেম্বর
জানবার কথা		৪২১	জুলাই
"		৪৮৬	অগাষ্ট
"		৫৫২	সেপ্টেম্বর
"		৬১৯	অক্টোবর
জীবনের জন্ম-কথা	শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র	৬৬৯	নভেম্বর
জোনাকীর আলো		৫২৩	সেপ্টেম্বর
ডপ্‌লার এফেক্ট	শ্রীঅশোক কুমার দত্ত	৪৭৯	অগাষ্ট
তিমি	শ্রীমৃণালকান্তি পট্টনায়ক	৬১৫	অক্টোবর
তেজস্ক্রিয় বলয় সম্পর্কে নতুন তথ্য		৪১১	জুলাই
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুহুরী	৪২০	"
দাঁত	শ্রীজয়া রায়	৭০৫	ডিসেম্বর
নতুন ধরণের শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র		৬৬০	নভেম্বর
নিমেষে কি ফুটবে না ফুল ?	শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়	৬৩১	"
পপ্‌ভের জন্ম-শতবার্ষিকী		৫৫০	অগাষ্ট
পরমাণু-জগতের অন্তরালে	শ্রীসরোজকুমার দে	৬৩৬	নভেম্বর
পারমাণবিক শক্তি	শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক	৫০৩	সেপ্টেম্বর
পুস্তক পরিচয়		৪৭৮	অগাষ্ট
পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুহুরী	৭৩৩	ডিসেম্বর
প্রাণ ও তার প্রতিষ্ঠা	শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য	৫৮৭	অক্টোবর
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল		৪০৯	জুলাই
পৃথিবীর বয়স	শ্রীসুদামচন্দ্র রায়	৭৩৭	ডিসেম্বর
প্লাষ্টিক সার্জারীর উন্নতি		৪৬৫	অগাষ্ট
ফনোগ্রাফের কথা		৬৮০	নভেম্বর
বর্ধিত রক্তচাপ	শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা	৪০৩	জুলাই
বজ্রপাত	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৬০২	অক্টোবর
বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিকপ্রবন্ধ	শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৪৪৭	অগাষ্ট
বংশবিদ্যার ক্রমবিকাশ	শ্রীননীগোপাল কর্মকার	৬৯৫	ডিসেম্বর
বর্তমানের চাঁদ ও অতীতের পৃথিবী		৭২০	ডিসেম্বর
বিজ্ঞান-সংবাদ	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	৩৯৯	জুলাই
বেল	শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী	৬৬৯	নভেম্বর
বেতার ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড	শ্রীশান্তিময় বসু	৪৩৯	অগাষ্ট
বিবিধ		৪২৯	জুলাই
"		৪৯৫	অগাষ্ট
"		৫৬০	সেপ্টেম্বর

বিবিধ		৬২৬	অক্টোবর
”		৬৮৮	নভেম্বর
”		৭৪০	ডিসেম্বর
ভারতের অতীত আগ্নেয়োচ্ছ্বাস	শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ	৬৩৫	”
ভিলাই ইস্পাত কারখানা	শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	৭২১	ডিসেম্বর
ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের সন্ধানে		৫৯৮	অক্টোবর
মরুভূমির গাছপালা	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৯৪	জুলাই
মহাজাগতিক-রশ্মি সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান		৪৬৭	অগাষ্ট
মহাশূন্যের অভিযাত্রী	শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বসু	৬০৭	অক্টোবর
মহাশূন্যযাত্রী রকেট নিয়ন্ত্রণের উপায়		৭২৮	ডিসেম্বর
মাছের বিষ	শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮১	অগাষ্ট
মানবজীবনে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সাহা	৬৭৩	নভেম্বর
মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা		৫৯৩	অক্টোবর
মুক্তা	শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র	৫২৫	সেপ্টেম্বর
মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের যন্ত্র		৫৯৫	অক্টোবর
যদি সূর্য আর না থাকে	শ্রীশুকদেব দত্ত	৫৩৮	সেপ্টেম্বর
যে শব্দ শোনা যায় না	শ্রীমুকুল বিশ্বাস	৭১৫	ডিসেম্বর
রকেট	শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ	৭০৫	ডিসেম্বর
রক্ত-তঞ্চন	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	৩৮৭	জুলাই
রি-ইনফোর্সড্ সিমেন্ট কংক্রীট	শ্রীনির্মলেন্দুবিকাশ কর	৭০৯	ডিসেম্বর
রেডার	শ্রীদীপক বসু	৭২৫	ডিসেম্বর
শ্বাস-প্রশ্বাস-সহায়ক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার		৪০৭	”
শিশু-পক্ষাঘাত	শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৬৩৮	নভেম্বর
সবুজ পাতা থেকে প্রোটিন সংগ্রহ		৪০৮	জুলাই
সর্প-দংশনের চিকিৎসা		৫৪০	সেপ্টেম্বর
সস্তায় ইট তৈরীর যন্ত্র		৫৪৩	”
সমুদ্রতলে সুড়ঙ্গ খনন		৫৯৯	অক্টোবর
সাবানের কথা	আনসার রহমান	৭৩০	ডিসেম্বর
সুদূর পিয়াসীর এক অজানা অধ্যায়	শ্রীআশীষকুমার মাইতি	৫৬৭	”
হর্মোন	শ্রীসুব্রতকুমার পাল	৭১২	ডিসেম্বর
হাইড্রোজেন	শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন	৪১৭	জুলাই
হাইড্রোজেনেই মৌলিক পদার্থ	শ্রীসুবিমল কুণ্ডু	৬১১	অক্টোবর
হিম-শৈত্যের সন্ধানে	শ্রীসলিল বসু	৫২১	সেপ্টেম্বর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৫৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	অর্শ	৫২০	সেপ্টেম্বর
	অ্যাপেণ্ডিসাইটিস	৬৫৪	নভেম্বর
	করোনারী থ্রম্বোসিস	৪৭০	অগাষ্ট
	রক্ত-তঞ্চন	৩৮৭	জুলাই
শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরশোলা	৫৪৭	সেপ্টেম্বর
	মাছের বিষ	৪৮১	অগাষ্ট
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ	ভারতের অতীত আগ্নেয়োচ্ছ্বাস	৬৩৫	নভেম্বর
শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বসু	মহাশূন্যের অভিযাত্রী	৬০৭	অক্টোবর
শ্রীঅশোককুমার দত্ত	ডপলার এফেক্ট	৪৭৯	অগাষ্ট
শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়	নিমেষে কি ফুটবে না ফুল চকিতে ফল ফলবে না?	৬৩১	নভেম্বর
শ্রীআশীষকুমার মাইতি	সুদূর পিয়াসীর এক অজানা অধ্যায়	৫৭৭	অক্টোবর
আনসার রহমান	সাবানের কথা	৭৩০	ডিসেম্বর
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা	বর্ধিত রক্তচাপ	৪০৩	জুলাই
শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	কোকো ও চকলেট	৪৪৩	অগাষ্ট
	বজ্রপাত	৬০২	অক্টোবর
	মরুভূমির গাছপালা	৩৯৪	জুলাই
	শিশু-পক্ষাঘাত	৬৩৮	নভেম্বর
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	উচ্চ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়া	৫২৮	সেপ্টেম্বর
	কাগজের গুণ ও ব্যবহার	৬৬৪	নভেম্বর
	কার্বন	৬৭৭	”
	হাইড্রোজেন	৪১৭	জুলাই
শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ	রকেট	৭৩৫	ডিসেম্বর
শ্রীজয়া রায়	দাঁত	৭০৫	ডিসেম্বর
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	ভিলাই ইস্পাত কারখানা	৭২১	ডিসেম্বর
শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তাপে প্রাণ-ক্রিয়া	৫০৯	সেপ্টেম্বর
শ্রীদীপক বসু	রেডার	৭২৫	ডিসেম্বর
শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়	ক্যান্সার সম্বন্ধে দু'চার কথা	৫৮১	অক্টোবর
শ্রীদেবপ্রসাদ মৈত্র	অবকাশ পরিমাপক যন্ত্রাদির ব্যবহার	৩৭৬	জুলাই
শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জী	ক্যালকুলাসের গল্প	৫১৪	সেপ্টেম্বর
শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী	চাঁদের গল্প	৪৮৩	অগাষ্ট

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী	বেল	৬১৮	নভেম্বর
শ্রীননীগোপাল ধর্মকার	বলবিদ্যার ক্রমবিকাশ	৬৯৫	ডিসেম্বর
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী	উদ্ভিদ ও শিশির	৫৮৫	অক্টোবর
	খাদ্য ও কৃষিকার্যে পারমাণবিক শক্তি	৭০১	ডিসেম্বর
শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক	পারমাণবিক শক্তি	৫০৩	সেপ্টেম্বর
শ্রীনির্মলেন্দুবিকাশ কর	রি-ইনফোর্স্ড্ সিমেণ্ট কংক্রীট	৭০৯	ডিসেম্বর
শ্রীপত্তাকীরাম চন্দ্র	জীবনের জন্মকথা	৬৬৯	নভেম্বর
	মুক্তা	৫২৫	সেপ্টেম্বর
শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি	অ্যাণ্টিবায়োটিক্স	৫৭৪	অক্টোবর
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	বিজ্ঞান সংবাদ	৩৯৯	জুলাই
শ্রীবিশ্বম্ভর ঘোষ	চাঁদের দেশে রকেট অভিযান	৫৫০	সেপ্টেম্বর
শ্রীমুকুল বিশ্বাস	যে শব্দ শোনা যায় না	৭১৫	ডিসেম্বর
শ্রীমৃণালকান্তি পট্টনায়ক	তিমি	৬১৫	অক্টোবর
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুহুরী	দাক্ষিণাত্যের মালভূমি	৪২০	জুলাই
	পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে	৭৩৪	ডিসেম্বর
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সাহা	মানবজীবনে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব	৬৭৩	নভেম্বর
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ	৪৪৭	অগাষ্ট
শ্রীশুকদেব দত্ত	যদি সূর্য আর না থাকে	৫৩৮	সেপ্টেম্বর
শ্রীশান্তিময় বসু	বেতার ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড	৪৩৯	অগাষ্ট
শ্রীসলিল বসু	হিম-শৈত্যের সন্ধানে	৫২১	”
শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ	গণিতে ধাঁধা	৬১৩	অক্টোবর
	গণিতে শূন্যের আবিষ্কার	৪৫৪	অগাষ্ট
শ্রীসরোজকুমার দে	পরমাণু-জগতের অন্তরালে	৬৬৬	নভেম্বর
শ্রীসুবিমল সিংহরায়	অক্টোপাস	৪১৩	জুলাই
শ্রীসুবিমল কুণ্ডু	হাইড্রোজেনই মৌলিক পদার্থ	৬১১	অক্টোবর
শ্রীসুদামচন্দ্র রায়	পৃথিবীর বয়স	৭৩৭	ডিসেম্বর
শ্রীসুব্রতকুমার পাল	হর্মোন	৭১২	ডিসেম্বর
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য	প্রাণ ও তার প্রতিষ্ঠা	৫৮৭	অক্টোবর

চিত্র-সূচী

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় বসে আছে	...	৪১৩	জুলাই
অক্টোপাস কাঁকড়াকে আক্রমণ করেছে	...	৪১৪	,,
অক্টোপাশের পিঠের নীচের দৃশ্য	...	৪১৫	,,
অক্টোপাশের বুকের দিকের দৃশ্য	...	৪১৬	,,

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়	...	৪৬২	অগাষ্ট
অর্শ	...	৫৩০	সেপ্টেম্বর
আলেকজাণ্ডার পপভ্	...	৪৫০	অগাষ্ট
অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের সামনের দৃশ্য	...	৬৫৫	নভেম্বর
অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের পিছনের দৃশ্য	...	৬৫৭	”
ইলেকট্রনের বিপরীতমুখী-ঘূর্ণন	...	৪৭২	অগাষ্ট
ঊর্ধ্বাকাশে বেলুন প্রেরণ	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		অগাষ্ট
ওপেন হার্থ ফার্ণেস	...	৭২২	ডিসেম্বর
করোনারী থ্রম্বোসিস	...	৪৭১	অগাষ্ট
কাস্বেতে তৈলকূপ খননের দৃশ্য	...	৪৪৬	অগাষ্ট
কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন	...	৪৬৮	অগাষ্ট
কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-৬	...	৫১৩	সেপ্টেম্বর
কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ	...	৬৩৫	নভেম্বর
চাঁদের ছবি	...	৫০৯	অক্টোবর
চাঁদের বিপরীত দিকের দৃশ্য	...	৬০৪	নভেম্বর
চাঁদে প্রেরিত রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতীক	...	৬৩৭	”
জানবার কথা	...	৪২২	জুলাই
”	...	৪৮৬	অগাষ্ট
”	...	৫৫২	সেপ্টেম্বর
”	...	৬১৯	অক্টোবর
জেনিথ রিয়্যাক্টর	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		সেপ্টেম্বর
তড়িৎ-চুম্বক বর্ণালী	...	৪৪০	অগাষ্ট
নটিলাস নামক সাবমেরিন	...	৪৬০	”
পপভের তৈরী ঝড়-নির্দেশক যন্ত্র	...	৪৫১	”
পপভ্ কর্তৃক স্থাপিত গগল্যাণ্ড দ্বীপের বেতার কেন্দ্রের দৃশ্য	...	৪৫২	”
পট্কাজাতীয় বিষাক্ত মাছ	...	৪৮২	”
প্যাডেল হুইল চালিত কৃত্রিম উপগ্রহ	...	৪০২	জুলাই
প্রাচীন সংখ্যা লিপির কয়েকটি নমুনা	...	৪৫৫	অগাষ্ট
ফনোগ্রাফ	...	৬৮০	নভেম্বর
বিড়লা শিল্প ও কারিগরী যাদুঘর	...	৪৫৩	অগাষ্ট
ব্লাষ্ট ফার্ণেস	...	৭২৩	ডিসেম্বর
বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র	...	৪৪১	অগাষ্ট
ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের অবস্থান	...	৭৩৪	ডিসেম্বর
মহাশূন্য-যানের নমুনা	...	৩৮৬	জুলাই
মেলরোজ হৃৎপিণ্ড-ফুস্ফুস যন্ত্র	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		ডিসেম্বর

রেডিও টেলিস্কোপ	...	৬৯৩	জুলাই
রেডার যন্ত্র	...	৬৬৭	নভেম্বর
রেডারের ক্রিয়াকৌশল	...	৭২৭	ডিসেম্বর
সিনভা-র‍্যাম ব্লক যন্ত্রের সাহায্যে গৃহ নির্মাণ	...	৫৪৪	সেপ্টেম্বর
সিনভা-র‍্যাম ইটের নির্মিত একটি গৃহ	...	৫৪৫	সেপ্টেম্বর
সূর্য-রশ্মি দ্বারা পরিচালিত মহাশূন্য যানের কল্পিত দৃশ্য	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		সেপ্টেম্বর
সোভিয়েট ট্রাক্টর	...	৭৩২	ডিসেম্বর
সোভিয়েট বিজ্ঞানী কর্তৃক মহাকাশে প্রেরিত ভল্টলো নামক কুকুর ও একটি খরগোসের ছবি	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		নভেম্বর
হাঁস-মুরগীর রোগ প্রতিবোধক ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পদ্ধতি	আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা		জুলাই

বিবিধ

		পৃষ্ঠা	মাস
অন্ধ্র প্রদেশে নরম মাটির সন্ধান	...	৬৯০	নভেম্বর
অম্লত্ব প্রতিরোধ সম্পর্কে নূতন তথ্য	...	৬৯০	”
অদ্ভুত গাণিতিক যন্ত্র	...	৬৯২	”
আকাশ বাতাসে মরণভস্ম	...	৪৩০	জুলাই
ইথিলিন ডাইক্লোরাইড	...	৭৪১	ডিসেম্বর
উদ্ভিজ্জ মোম	...	৭৪১	”
১৯৫৯ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার	...	৬২৭	অক্টোবর
উত্তর মেরু অঞ্চলকে শস্য সমৃদ্ধ করিবার পরিকল্পনা	...	৭৪৪	ডিসেম্বর
উর্দ্ধ আবহমণ্ডলের বায়ুপ্রবাহ	.	৬২৮	”
কলিকাতা বন্দরে নূতন ড্রেজার	...	৪২৯	জুলাই
কম খরচে পরমাণু-শক্তি	...	৪৩২	”
কোয়াণ্টাম রশ্মি-পরিচালিত মহাব্যোমযান	...	৫০২	অগাষ্ট
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	...	৬৯১	নভেম্বর
ক্যান্সার গবেষণায় অগ্রগতি	...	৪৩২	জুলাই
কণ্ঠশ্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার	...	৬৯১	নভেম্বর
ক্যান্সার ইঁদুর	...	৪৩৮	জুলাই
কৃত্রিম উপগ্রহে টেলিভিশন	...	৫০১	অগাষ্ট
কৃত্রিম উপায়ে মাংস পেশী উৎপাদন	...	৭৪৬	ডিসেম্বর
কৃষিকার্যে পরমাণু	...	৪৩০	জুলাই
কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা বেতার প্রেরণ	...	৪৩৫	”
খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুর্নবৃদ্ধি	...	৪৩৩	”
জমি তৈরীর যন্ত্র	...	৭৪৮	ডিসেম্বর
চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের দৃশ্য	...	৬২৭	অক্টোবর
চন্দ্রের আকার	...	৬২৮	”
চন্দ্রের বিপরীত দিকের অবস্থা	...	৬৮৮	নভেম্বর
চন্দ্রের কলঙ্ক কাহিনী	...	৭৪৩	ডিসেম্বর
চায়ের ভেষজগুণ	...	৪৯৬	অগাষ্ট
চার মিনিটের মৃত্যু	...	৫৬২	সেপ্টেম্বর

চোখে দেখা ও কানে শোনার চশমা	...	৫৬২	সেপ্টেম্বর
৭৮,৪০০ ফুট উঁচু হইতে লম্ফ প্রদান	...	৭৪৫	ডিসেম্বর
ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ সম্পর্কে গবেষণা	...	৪৯৭	অগাষ্ট
ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ গবেষণায় সুফল	...	৪৩৪	জুলাই
ট্র্যাকোমা রোগের টিকা	...	৭১২	ডিসেম্বর
ডানাওয়ালা মানুষ	...	৭৪৫	ডিসেম্বর
তরল সিরিঞ্জ	...	৬২৯	অক্টোবর
তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় আলোচনা	...	৫৬০	সেপ্টেম্বর
তুষার-মানব সম্পর্কে আলোচনা	...	৫৬২	„
তেজস্ক্রিয়ার পরিণতি	...	৫৬১	„
তেজস্ক্রিয়ার বীজ দ্বারা টিউমার নষ্ট	...	৪৯৭	অগাষ্ট
তৈল বীজ হইতে পুষ্টিকর প্রোটিন	...	৬২৭	অক্টোবর
থোরিয়াম হইতে তাপ-শক্তি	...	৫৬০	সেপ্টেম্বর
দশ হাজার বৎসরের পুরাতন মমি	...	৪৩৮	জুলাই
দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি	...	৪৯৮	অগাষ্ট
দীর্ঘকালব্যাপী রক্ত-সংরক্ষণ	...	৪৩৩	জুলাই
নূতন নেত্র	...	৪৩৫	„
নূতন ধূমকেতু	...	৬৯৩	নভেম্বর
নূতন পেনিসিলিন	...	৬৯০	„
নূতন শক্তির সন্ধান	...	৭৪৬	ডিসেম্বর
পরলোকে সি. টি. আর. উইলসন	...	৬৯৪	নভেম্বর
পরলোকে গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার	...	৬৯৪	„
পারমাণবিক ঘড়ি	...	৪৩০	জুলাই
পারমাণবিক ইন্ধন	...	৪৩১	„
পাকস্থলীর ক্ষতের নূতন ভেষজ	...	৬২৯	অক্টোবর
পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট	...	৭৪৩	ডিসেম্বর
প্রাচীন সুবীয়-সভ্যতার সম্পদ	...	৬৯২	নভেম্বর
প্রাণী-দেহের দ্রুত পুষ্টিসাধন ঔষধ	...	৪৩৩	জুলাই
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম	...	৪৯৯	অগাষ্ট
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্থি	...	৭৪৬	ডিসেম্বর
পৃথিবীর জন-সংখ্যা	...	৪৩৭	জুলাই
পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্য	...	৪৩৭	„
পৃথিবীর বিকিরণ-বলয়-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	...	৬২৮	অক্টোবর
পৃথিবীধ্বংসী হলাহল	...	৫৬১	সেপ্টেম্বর
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস	...	৬৮৮	„
বিহারে সোপষ্টোনের সন্ধান	...	৪২৯	জুলাই
বিশ্বে রেকর্ড পরিমাণ চাউল-উৎপাদন	...	৪৯৫	অগাষ্ট
বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ	...	৭৪৮	ডিসেম্বর
ভারতের জন্য শক্তিশালী চুম্বক	...	৬৯১	নভেম্বর
ভারতে পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন	...	৪৯৫	অগাষ্ট
ভারতে জিপ্সাম শিল্প	...	৪৯৬	„
ভারতে পঙ্গপালের উপদ্রব	...	৪২৬	„

ভারতে নাইলনের সুতা তৈয়ার	...	৪৯৬	অগাষ্ট
ভারতমহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান	...	৬২৬	অক্টোবর
ভারতে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কারখানা	...	৫৬০	সেপ্টেম্বর
ভারতে ২১টি কয়লা স্তর আবিষ্কৃত	...	৬৬১	”
ভারতে উদ্ভিদের হর্মোন উপাদান তৈরী	...	৫৬১	”
ভারতের উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তি	..	৭৪০	ডিসেম্বর
ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ	...	৪৩১	জুলাই
ভূমধ্য সাগরের গভীরতা	...	৭৭৫	ডিসেম্বর
মহাকাশে জীবনের সন্ধান	...	৬৮৯	নভেম্বর
মঙ্গলগ্রহে মানুষের অভিযান	...	৪৩৮	জুলাই
মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জীবন	...	৭৫৫	ডিসেম্বর
মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে	...	৪৩৬	”
মহাশূন্যে যাত্রা	...	৫৬৭	সেপ্টেম্বর
মহাকাশে বৈজ্ঞানিক মহাগার স্থাপন	...	৬৩১	অক্টোবর
মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে সম্মেলন	...	৪৯৯	অগাষ্ট
মহাব্যোমযানের প্রত্যাবর্তনের সমস্যা	...	৫০০	”
মার্কিন উপগ্রহ—ডিসকভারার-১	...	৭৪৩	ডিসেম্বর
মানবদেহে ইরিডিয়াম	...	৭৪৫	”
মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির গবেষণা	...	৭৪১	”
মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা মাটির চুম্বক	...	৪৩৬	জুলাই
মিলন, না মৃত্যু?	...	৭৪২	ডিসেম্বর
মূকের বাক্‌শক্তি লাভ	...	৪৯৯	জুলাই
যক্ষ্মারোগের নূতন চিকিৎসা	...	৩০৫	”
যুক্তরাষ্ট্রের এক্স-১৫ বিমান	...	৬৩০	অক্টোবর
রক্তপাতশূন্য ও যন্ত্রণাহীন অস্ত্রোপচার	...	৪৩৩	জুলাই
রক্তের উচ্চ চাপে নূতন ভেষজ	...	৭৫২	ডিসেম্বর
রাজা হর্ষের আমলের মুদ্রা	...	৬৯১	নভেম্বর
রাগির লন্ট	...	৭৪৮	ডিসেম্বর
রোগ চিকিৎসায় পারমাণবিক রিয়্যাক্টর	...	৪৩৪	জুলাই
লোকরঞ্জক সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার	...	৬৯১	নভেম্বর
শিশুদের পুষ্টিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ	...	৭৩০	ডিসেম্বর
সমুদ্রের রহস্য সন্ধানে	...	৬৯৩	”
সোভিয়েট রকেটের চন্দ্রপৃষ্ঠে উপস্থিতি	...	৫৬০	সেপ্টেম্বর
সৌর চিকিৎসা	...	৪৯৮	অগাষ্ট
সৌরলোকের নিকটতম গ্রহের আলোকচিত্র	...	৭৪৩	ডিসেম্বর
হাসপাতালে ৬৫ বৎসর	...	৬৯৩	নভেম্বর
হৃদ্‌রোগীদের বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা	...	৪৯৭	অগাষ্ট
হৃদ্‌রোগ নিরাময়ে জৈব-বিদ্যুৎ	...	৫০১	”

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন

১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন বিষয়বস্তুই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৩। **কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে** লিখিত না হলে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত না হওয়ারই সম্ভাবনা।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে উহা পৃথক সাদা কাগজে চাইনিজ কালিতে সুন্দরভাবে এঁকে পাঠান দরকার; অন্যথায় চিত্র প্রকাশিত হবে না।

৫। মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিতর্কমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হবে না।

৬। বানানে ষত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

৭। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শব্দগুলিকে বাংলা অক্ষরে **ব্লক টাইপে** লিখতে হবে এবং তার পাশে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে।

৮। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন; বিশেষ কারণ বা ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে না। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে প্রয়োজনীয় টিকেট দেওয়া দরকার।

৯। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে (ফেডারেশন হল) পাঠাতে হবে।

১০। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূরা ঠিকানা থাকা দরকার।

১১। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের অধিকার থাকবে।

১২। প্রবন্ধ অমনোনীত হওয়ার কারণ জানাতে সম্পাদক অক্ষম।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ জানুয়ারী, ১৯৫৯ প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীকে শুভ নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাই। নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া-আসা দিনগুলিকে আজ আবার নূতন করিয়া মনে পড়িতেছে। আজ হইতে দীর্ঘ এগার বৎসর পূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রথম আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের যে সুমহান আদর্শ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহারই ধারক ও বাহকরূপে এই পত্রিকার সার্থকতা আজ সর্বজন-বিদিত। আদর্শ যত উচ্চ, পথও তত বন্ধুর। বন্ধুর পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই অভিযাত্রীর পাথেয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞাম তাহার চলার পথে বহুজনের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞান এখন আর জনসাধারণের নিকট দুরূহ, জটিল বা বিভীষিকা নহে। মানুষের কৌতূহলী মন আজ বিজ্ঞান-সরস্বতীর খাসমহলের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মন ছুটিয়া চলিয়াছে পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর-দূরান্তরে। বিজ্ঞান-জগতের নানা সংবাদ জানিতে সাধারণ পাঠকও আজ আগ্রহশীল। বিদেশী ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জটিলতা উন্মোচন করিয়া কত জনই বা কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে? অথচ বিষয়বস্তুটি বুঝিবার মত সহজ জ্ঞান মানুষের মধ্যে মোটেই দুর্লভ নহে।

বিজ্ঞানের নানা বিষয় সাধারণের উপযোগী করিয়া বাংলা ভাষায় প্রচারের জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র মধ্যস্থতায় শিক্ষক ও ছাত্রগণ ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। আশা হইতেছে, পথের বন্ধুরতা ক্রমশঃই অধিকতর মসৃণ হইয়া উঠিবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচারের একটি গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাধরগণ এই পথের মহান পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার যাদুদণ্ড স্পর্শে বৈজ্ঞানিক সত্যের শুষ্ক কাঠিন্যকে অপূর্ব সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন। এই

প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামও স্মরণীয়। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রও স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কি অতীতের, কি বর্তমানের বহু লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার মধ্যে অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য শৈলীর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বিষয় বিজ্ঞান হইলেও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এই কথা মনে রাখা দরকার যে, সকলের বোধগম্য করিয়া বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে হইবে। ভাষার শুচিতা রক্ষা করিয়াও যে তাহা করা যায়, পূর্বাচার্যগণের রচনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য এই শুচিতাবোধ যেন বাতিকে পরিণত না হয়।

সম্প্রতি জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই সম্পর্কে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাষার জটিলতা ও দুরূহতা অতিক্রম করিয়া বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তৎপ্রতি মানুষের মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয় না। ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে ব্যাহত হইলে বিদেশী ভাষার ভাণ্ডারে সন্ধান দোষাবহ নহে। কিন্তু অনাবশ্যক জটিলতা ও দুরূহ বাগধারা রচনাকে ভারাক্রান্তই করিয়াই তোলে। যাহারা বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহশীল তাঁহারা এই কথাটি স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞান-সাহিত্যের কল্যাণ হইবে। আমাদের আশা—বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের এই শুভ প্রয়াস জনসাধারণের সানুগ্রহ আনুকূল্যে জয়যুক্ত হইবে।
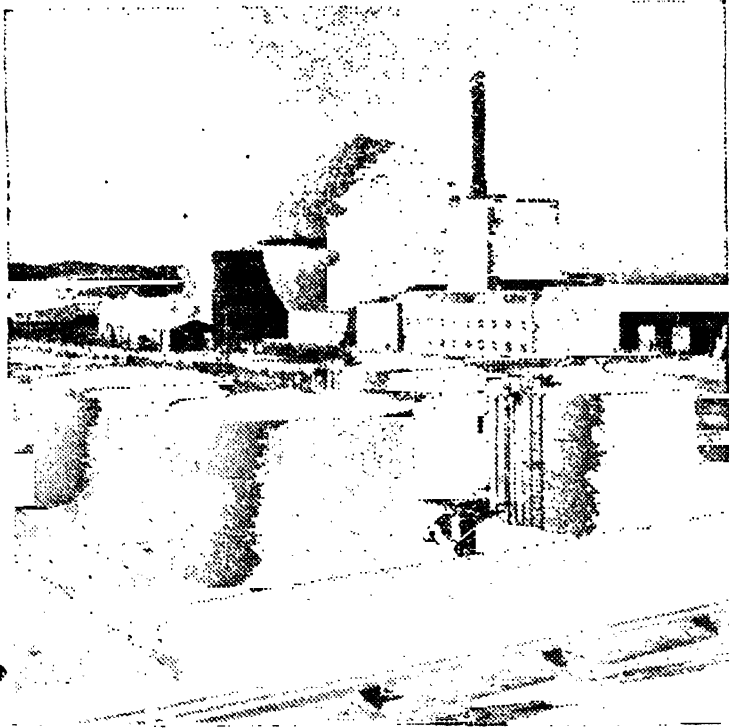
বৃটেনের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের উদ্যোগে স্থাপিত দ্রুত বিভাজনক্ষম ব্রিডার রিয়্যাক্টরের দৃশ্য।

রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার—১৯৫৮

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী ডাঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গারকে রসায়ন-বিজ্ঞানে ১৯৫৮ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়াছেন। ইনসুলিন অণুর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

মানবদেহে পাকস্থলীর পিছনে প্যানক্রিয়াস নামে একটা বড় গ্ল্যাণ্ড আছে। খাদ্যের সঙ্গে প্রোটিন পাকস্থলীতে যায়। সেখানে প্রোটিনকে হজম করবার জন্যে যে সব দ্রব্যের প্রয়োজন, সেগুলি এই প্যানক্রিয়াসে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া প্যানক্রিয়াসে ইনসুলিনও উৎপন্ন হয়। ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে চিনিজাতীয় দ্রব্যকে শরীরের কাজে লাগানো। আখের রস, গ্লুকোজ, ফুলের মধু, মিষ্টি ফল ও নানাপ্রকার শাকসব্জীতে চিনি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ০'০৮ থেকে ০'১৮ ভাগ, আর মূত্রে শতকরা ০'১ ভাগের চেয়েও কম। প্যানক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডে উৎপন্ন ইনসুলিন এই চিনিকে ভেঙ্গেচুরে শরীরের কাজে লাগায়। প্যানক্রিয়াসে গোলযোগ হলে শরীরে প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের অভাব ঘটে। তখন বহিরাগত চিনি শরীরের কাজে লাগানো সম্ভব হয় না এবং দেহে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায়। বহুমূত্র রোগীর রক্তে চিনির পরিমাণ শতকরা ০'৩ ভাগ ও মূত্রে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন শরীরে ছুঁচ দিয়ে ঢুকিয়ে ঐ অতিরিক্ত চিনিকে ভেঙ্গেচুরে দেওয়া হয়। তাছাড়া খাদ্যে চিনিজাতীয় দ্রব্যের পরিমাণও হ্রাস করে দেওয়া হয়। তখন চিনির পরিমাণ কমে যায়—বহুমূত্র রোগ থেকে সাময়িক সুস্থতা লাভ করা চলে।

প্যানক্রিয়াস থেকে নিঃসৃত এই অতি প্রয়োজনীয় হরমোন ইনসুলিন প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে। এর আবিষ্কারকদের নাম ব্যান্টিং ও বেষ্ট।

প্রায় বিশ বছর আগে ১৯৩৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে গবেষণা সুরু করেন স্যাঙ্গার। ১৯৪৪ সালে তিনি কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে ইনসুলিন অণুর পরমাণু সংযোজন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করেন। নিম্নোক্ত কারণের জন্যে তিনি ইনসুলিনকে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেন—

১। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রোটিন পাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। ইনসুলিন মোটামুটি বিশুদ্ধ অবস্থায় সহজেই পাওয়া যায়।

২। ইনসুলিনের মধ্যে কোন্ কোন্ পরমাণু রয়েছে তা বিশ্লেষণের সাহায্যে রাসায়নিকেরা পূর্বেই তা বের করেছিলেন। একটি ইনসুলিন অণুর মধ্যে রয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফারের মোট ৭৭৭ পরমাণু। অবশ্য কি ভাবে এই ৭৭৭টি পরমাণু সংযোজিত হয়ে ইনসুলিন অণুর সৃষ্টি করেছে তা জানা ছিল না।

৩। খাদ্য হিসাবে আমরা যে চিনি গ্রহণ করি, ইনসুলিন তাকে পুড়িয়ে শরীরের কাজে লাগায় এবং আমাদিগকে বহুমূত্র রোগের কবল থেকে রক্ষা করে। কিন্তু কি প্রকারে ইনসুলিন চিনিকে পোড়ায় তা আমাদের জানা নেই। ইনসুলিন অণুর ভিতরকার পরমাণুর সঠিক সংগঠন জানা গেলে হয়তো ইনসুলিনের কাজের রহস্যও উদ্ঘাটিত হতে

পারে। আমরা হয়তো বুঝতে পারবো, কি ভাবে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়।

ডাঃ স্যাঙ্গার কি কঠিন সমস্যার সমাধান করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করলেন তা একটা উদাহরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা ফুটবল দলের এগারো জন খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হয়েছে। কে কোথায় খেলে তা বলা হয় নি। এখন সাজিয়ে দিতে হবে দলটিকে, কে কোথায় খেলবে। অথচ এগারো জনের প্রত্যেকে শুধু এক বিশেষ জায়গায়, যথা—গোলে, ব্যাকে বা ফরোওয়ার্ড লাইনে খেলতে পারে। অঙ্ক কষে দেখা যাবে, দলটিকে সাজানো চলে ১১× ১০×৯×৮×৭×৬×৫×৪×৩×২×১; অর্থাৎ ৩, ৯৯, ১৬, ৮০০—এত প্রকারে। অথচ এদের একটি হচ্ছে মাত্র সঠিক উত্তর। সুতরাং কারো পক্ষে সঠিক উত্তর দেবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প।

সংখ্যাটি এগারো হলেই সমস্যা যখন এত কঠিন তখন সহজেই অনুমেয় ৭৭৭ সংখ্যার হিসাব নিয়ে কি কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন ডাঃ স্যাঙ্গার ও তাঁর সহকর্মীরা।

স্যাঙ্গার সহজেই বুঝলেন যে, সহজে ফল লাভ করা সম্ভব নয়—সুদীর্ঘ সাধনা তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। সিদ্ধিলাভ তাঁর জীবনে হবে কিনা, কে জানে!

স্যাঙ্গার জানতেন যে, যাবতীয় প্রোটিনের গঠনের মূলে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড। এ-পর্যন্ত প্রায় ২৫টির মত অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কৃত হয়েছে। সব চেয়ে ছোট অ্যামিনো অ্যাসিডের আণবিক ওজন ৯০ এবং সব চেয়ে বড়টির ২৫০-এর মত। প্রায় সব অ্যামিনো অ্যাসিডই দানা বেঁধে থাকে এবং ক্ষুদ্র অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি জলে গলে যায়। মানবদেহে প্রোটিন উৎপাদনে অ্যামিনো অ্যাসিডের দান অত্যন্ত বেশী—অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাবে দেহের স্বাভাবিক কাজ বাঁধা পায়। দেখা গেছে, মানবদেহে সব অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হয় না। প্রোটিন-প্রধান খাদ্য শরীরের প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে।

স্যাঙ্গারের আরও জানা ছিল যে, কোন নতুন উপায়ে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড সাজানো হলেই এক একটি নতুন প্রোটিন পাওয়া যাবে। ইনসুলিনের একটি অণুতে রয়েছে ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড অণু। ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিডকে সাজানো চলবে কোটি কোটি সম্ভাব্য উপায়ে—আর তার একটি হবে ইনসুলিন অণু। ৭৭৭টি পরমাণু থেকে স্যাঙ্গার ৫১টি অণুতে মনোনিবেশ করলেন, তবুও কাজের পরিমাণ রইলো অসম্ভব রকমের। কিন্তু স্যাঙ্গারের ধৈর্যও অপরিসীম।

একটি ইনসুলিন অণুর ভিতরকার ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড অণুর সম্ভাব্য শৃঙ্খলা নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইনসুলিন অণুকে বিদারণ করে নানা অংশে বিভক্ত করলেন। তারপর বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে চিহ্নিত করা হলো। কালি চোষবার জন্যে আমরা ব্লটিং কাগজ ব্যবহার করি—এই ব্লটিং কাগজের ভিতর দিয়ে যাবার সময় এক এক রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড এক এক রকমের ছাপ রেখে যায়। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ছাপ দেখে স্যাঙ্গার ও তাঁর সহকর্মীরা বাছাই করলেন বিভিন্ন দলের অ্যামিনো অ্যাসিড।

এভাবে ইনসুলিন অণুর বিভিন্ন অংশ বের করে ডাঃ স্যাঙ্গার ভাবতে লাগলেন—কি উপায়ে বিভিন্ন অংশগুলি সজ্জিত হয়ে রূপ নেয় ইনসুলিন অণুর? তিনি বড় অংশগুলি আলাদা করে নিলেন, আর ছোট অংশগুলি বড় অংশগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। একদিন যা করেন পরদিন পরীক্ষায় তা বাতিল হয়ে যায়। আবার নতুন করে জুড়তে বসেন। এভাবে কেটে গেল একটানা আট বছর।

১৯৫২ সালের শেষভাগে তাঁদের সুদীর্ঘ সাধনা

সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৫৪ সালে স্যাঙ্গার প্রমাণ করেন যে, ২১টি ও ৩৫টি অ্যামিনো অ্যাসিডের দুটি শৃঙ্খলে গ্রথিত হয়েছে ইনসুলিন অণু—ঐ দুটি শৃঙ্খলে রাসায়নিক গ্রন্থনীর কাজ করছে দুটি করে চারটি সালফার পরমাণু। এ রকম আর একটি গ্রন্থনী তিনি পরে আবিষ্কার করেন।

১৯৫৪ সালে ইনসুলিন অণুতে ৭৭৭টি পরমাণুর বিন্যাস সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

স্যাঙ্গারের কাজের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, গরু, শূকর, ছাগল, ভেড়া ও মানুষের দেহে যে বিভিন্ন ইনসুলিন উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু দুটি স্থানের বিন্যাসে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যতীত স্যাঙ্গারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হতো না। ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডি. ভিগনভের আবিষ্কৃত ক্রোমেটোগ্রাফীর সহায়তায় স্যাঙ্গারের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে কোন পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশের অস্তিত্বও সহজেই ধরা পড়ে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি শাখার ভেষজ গবেষণা বিভাগে ডাঃ স্যাঙ্গার যুক্ত আছেন ১৯৩৯ সাল থেকে। তাঁর একনিষ্ঠা ও ধৈর্য যে কোন সাধকের গৌরবের বস্তু। দুর্গম পথে দুর্দম অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হবার মত শক্তিধর পুরুষ তিনি। ১৯৫৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (F. R. S.) নির্বাচিত হন।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর সাংবাদিকেরা তাঁকে অভিনন্দিত করলে তিনি বলেন যে, তিনি সত্যই খুব খুশী হয়েছেন এই পুরস্কার লাভে—তবে তাঁর কাজের একটা পর্যায় মাত্র শেষ হয়েছে, এখনও অনেক সম্ভাবনা অজানা রয়ে গেছে। কি করে রোগ হয়, একথা আমরা এখনও পুরাপুরি জানতে পারি নি। ইনসুলিন অণুর পরমাণু বিন্যাস জানবার ফলে রোগ হবার প্রক্রিয়া জানতে অনেক সুবিধা হবে। আরও বৃহত্তর কর্মসাধনায় মানব-জাতির কল্যাণে তাঁর সাধনা উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করুক, বিশ্ববাসী আজ এই কামনাই করছে। জীবনের চাবি রয়েছে প্রোটিনের মধ্যে—সেই প্রোটিনের গঠন আবিষ্কারে আজ পর্যন্ত সব চেয়ে সাহসের কাজ করেছেন ডাঃ স্যাঙ্গার।

হ্যামিলটন

শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী

বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের অগ্রগতির পথে গণিত-বিদ্যার প্রয়োজন প্রতি পদে পদে। কিন্তু নানা-কালের দিক্‌পাল বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় যতটা, সে তুলনায় বিশুদ্ধ গণিতের একনিষ্ঠ সাধকেরা প্রায় অব-হেলিত, অপরিচিত। হয়তো এঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য সাধারণের আওতার অনেক ঊর্ধ্বে বলেই এমন হয়েছে।

এই প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর একজন অমর গণিত সাধক, আয়ারল্যাণ্ডের সুযোগ্য সন্তান উইলিয়াম রোয়েন হ্যামিলটনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী আলোচনা করবো। নিউটনের পরে ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে হ্যামিলটনের মত প্রতিভা আর বেশী দেখা যায় নি।

১৮০৫ সালের ৩রা অগাষ্ট হ্যামিলটনের জন্ম হয়। পিতা ডাবলিনের একজন সলিসিটর; বক্তা হিসাবেও তাঁর পিতার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু সংসার বুদ্ধি তাঁর মোটেই প্রখর ছিল না। পিতার এ সব গুণ অথবা দোষের অনেকগুলিই হ্যামিলটনের ধমনীতে সঞ্চারিত হয়েছিল। মাতা সারা হাটন ছিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী মহিলা। হ্যামিলটন তাঁর উপযুক্ত সন্তান। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে হ্যামিলটনই ছিলেন সব চেয়ে ছোট।

বোধ হয় পিতার সাংসারিক বুদ্ধির অভাবের জন্যেই হ্যামিলটন মাত্র এক বছর বয়স থেকেই মানুষ হন তাঁর কাকা রেভারেণ্ড জেমস্ হ্যামিলটনের কাছে। হ্যামিলটনের বয়স যখন বারো তখন মাতার এবং এর দু'বছর পরে পিতার মৃত্যু হয়। মাতা-পিতার সঙ্গে একটা প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠবার সুযোগই হলো না তাঁর জীবনে।

কাকা জেমস্ ছিলেন ডাবলিন থেকে কয়েক মাইল দূরে ট্রিম নামক গ্রামের ধর্মযাজক। তাঁর মত বহু ভাষাবিদ খুবই বিরল। প্রতিভাবান ভ্রাতুষ্পুত্রকে পেয়ে তাঁর এই ভাষাচর্চার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব রকম ভাষার এক অবিশ্বাস্য সংগ্রহশালা খুললেন হ্যামিলটনের মধ্যে। তিন বছর বয়সে হ্যামিলটন ইংরেজী পড়তে শিখলো। বয়স যখন পাঁচ, তখন ল্যাটিন, গ্রীক আর হিব্রু পড়তে এবং অনুবাদ করতে তাঁর আর কোন অসুবিধাই রইলো না। আট বছরে ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ আয়ত্ত করলেন। দশ বছরে পড়বার আগেই প্রাচ্যের ভাষাগুলি একে একে শিখতে লাগলেন। সংস্কৃত এবং আরবীয় থেকে আরম্ভ করে হিন্দী, মারাঠী এবং বাংলা ভাষার উপরও তাঁর অধিকার বিস্তৃত হলো। শেষ পর্যন্ত চীনা ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত বইয়ের অভাবে খুব বেশী দূর এগোতে পারলেন না। তেরো বছর বয়সে হিসাব করে দেখা গেল, জীবনের প্রতিটি বছরে হ্যামিলটন এক একটি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। গল্পের মত মনে হয়, কিন্তু এসবই ঐতিহাসিক সত্য।

শুধু ভাষাচর্চাই নয়, কবিতা লেখাও ছিল হ্যামিলটনের একটা বড় নেশা। এ নেশা তাঁর প্রায় সারাজীবনই ছিল। একটি সত্যিকারের স্বপ্নালু প্রকৃতি-প্রেমিক হৃদয় ছিল তাঁর। নতুন নতুন ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই কবিতা লিখতে সুরু করে দিতেন। একবার আয়ারল্যাণ্ডের কোন একটা সুন্দর দৃশ্য বর্ণনার জন্যে তিনি ল্যাটিন

হেক্সামিটারের আশ্রয় নিলেন। কারণ তাঁর মনে হলো, সোজা ইংরেজী এই উদাত্ত ভাবের উপযুক্ত বাহক মোটেই নয়। হ্যামিলটনের চৌদ্দ বছর বয়সে পারস্যের রাষ্ট্রদূত এলেন ডাবলিনে। পারসিক ভাষার শ্রেষ্ঠ শব্দসম্ভার দিয়ে একটি অভিনন্দন পত্র রচনা করে হ্যামিলটন পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে।

পনেরো বছর বয়সে হ্যামিলটন ডাবলিন নগরে জেরা কোলবার্ন (১৮০৪-১৮৭৯) নামে তাঁর সমবয়স্ক এক আমেরিকান বালকের সংস্পর্শে আসেন। কোলবার্ন ছিলেন এক জীবন্ত গণনা-যন্ত্র—মুখে মুখে বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল, ঘনমূল তিনি মুহূর্তে করে দিতে পারতেন। এঁর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে হ্যামিলটনের প্রতিভা সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে সুরু করলো। তিনি বুঝলেন, তাঁর আসল পথ হচ্ছে গণিতশাস্ত্রের পথ। কোলবার্ণের এই বিচিত্র ক্ষমতার উৎস ছিল তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির মধ্যে। এর সঙ্গে দেখা না হলে হ্যামিলটন হয়তো ভাষাচর্চা আর কবিতা নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতেন—বিরাট এক প্রতিভার অপব্যবহার হতো। কাব্য রচনার পথ যে তাঁর ঠিক পথ নয়, এটা হ্যামিলটন পরে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেও বুঝে-ছিলেন। এ পরিচয়ের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করবো।

যাহোক, এই সময় থেকে হ্যামিলটন গভীর-ভাবে গণিতের অধ্যয়ন সুরু করে দিলেন। ভাষা অথবা ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চাও বজায় রইলো, কিন্তু গৌণভাবে। সতেরো বছর বয়সেই তিনি উচ্চ গণিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

১৮২৩ সালের ৭ই জুলাই হ্যামিলটন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন, একশত পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনায়াসে প্রথম হয়ে। এর আগে পর্যন্ত তাঁর সব রকম পড়াশুনাই বাড়িতে হয়েছে, কোন বিদ্যালয়েই যান নি। তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার কথা ট্রিনিটিতে আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জনশ্রুতি ব্যর্থ হয় নি—কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ সম্মানের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষার ফলের চেয়েও বড় কথা, এই সময়টাতেই হ্যামিলটন নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মেতে ছিলেন। অবশ্য ট্রিনিটিতে আসবার আগেই তিনি তাঁর বোন এলিজা ও পরে তাঁর কাকাকে চিঠিতে জানান—আমি বোধ হয় একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করতে চলেছি। এই আবিষ্কার মোটামুটি পূর্ণ রূপ পায় তাঁর একুশ বছর বয়সে (১৮২৭)—আলোকের গতিপথ সম্পর্কে জ্যামিতি ও বীজগণিতের অভিনব প্রয়োগে। রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমীতে তিনি এই "থিওরী অফ এ সিস্টেম অফ রেইজ" পেশ করলেন। অনেকেই বললেন, দ্বিতীয় নিউটনের আবির্ভাব হয়েছে।

এর অল্প কিছু দিন পরেই ট্রিনিটিতে 'প্রোফেসর অফ অ্যাস্ট্রোনমি'র পদ খালি হলো। কয়েকজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ প্রার্থী হলেন। কিন্তু ট্রিনিটির পরিচালকবর্গ সম্পূর্ণ একমত হয়ে হ্যামিলটনকে এই পদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। হ্যামিলটনের বয়স তখন বাইশ। তাছাড়াও তিনি সবে মাত্র আণ্ডার গ্রাজুয়েট হয়েছেন। তাই এই পদের জন্যে তিনি দরখাস্তও করেন নি। হ্যামিলটনের প্রতিভা ট্রিনিটিকে কতটা মুগ্ধ করেছিল, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রোফেসরের পদ নেওয়ার পর হ্যামিলটন চলে গেলেন ডাবলিন থেকে কিছু দূরে ডুনসিক অবজারভেটরীতে।

এই অধ্যাপক পদের জন্যে রুটিনবাঁধা কাজ কমই ছিল। হ্যামিলটন পুরাপুরি গণিতের সাধনায় মগ্ন হলেন। মাঝে মাঝে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা তৎসম্পর্কিত বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর এ সব ভাষণ হতো অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ অথচ আশ্চর্য রকম কবিত্বপূর্ণ। ছাত্র আর অধ্যাপকের সমাবেশে ঘর ভর্তি হয়ে যেত।

১৮৩২ সালে হ্যামিলটন তাঁর পূর্বোক্ত আলোক-

রশ্মি সম্পর্কিত প্রতিপাদ্য থেকে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বিশেষ কতকগুলি একপ্রকার কেলাসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথে আলোকের নতুন একভাবে প্রতিসরিত হওয়া উচিত—শঙ্কু-আকৃতি প্রতিসরণ। এর আগে এ নিয়ে কেউ পরীক্ষা করেন নি।

এবার হ্যামিলটনের জনৈক বন্ধু লেবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখলেন। হ্যামিলটনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারবত্তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হলো।

এরপর ১৮৩৫ সালে বস্তুপিণ্ডের গতি সম্পর্কে তিনি বিশেষ মূল্যবান গাণিতিক গবেষণা করেন। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি—অনিশ্চয়তাবাদের বেশ কিছুটা আভাস এই গবেষণার ফলাফলে রয়েছে। ঐ বছরেই হ্যামিলটন 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। দু বছর পরে তিনি রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমীর সভাপতির পদে নির্বাচিত হন।

হ্যামিলটনের ব্যক্তিগত জীবন মোটেই সুখের ছিল না। উনিশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদ্য লিখে নিজেকে শান্ত করেন। এর পর দ্বিতীয় ব্যর্থ প্রেম। তারপর ১৮৩৩ সালে হেলেন মারিয়া বেইলে এলেন তাঁর জীবনে। হ্যামিলটনের বয়স তখন আঠাশ। বেইলের স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ। তাঁকে বিয়ে করে হ্যামিলটন মোটেই সুখী হন নি। বিয়ের কয়েক বছর পরেই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে মিসেস হ্যামিলটন ইংল্যাণ্ডে তাঁর বোনের বাড়ীতে বেড়াতে চলে যান। দু-বছর পরে সেখান থেকে ফিরলেন, ১৮৪২ সালে। কিন্তু অবস্থার কিছুই উন্নতি হলো না। হ্যামিলটনের দেখাশোনার সব ভারই চাকরদের উপর পড়লো। ফল যা হওয়ার তাই হলো। আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকের খাওয়াপরা কোন কিছুই ঠিকমত হতো না। ঘর-দুয়ার বিশ্রী রকমের অপরিষ্কার হয়ে থাকতো। অথচ এত অসুবিধার মধ্যেও দিনে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। স্বভাবতঃই পানের মাত্রা দিন দিনই বাড়তে লাগলো। শেষে প্রায় বিপজ্জনক সীমায় এসে পৌঁছলেন। একদিন এক পার্টিতে অতিরিক্ত পান করে একদম মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর মদ স্পর্শ করবেন না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা খুব বেশী দিন টেঁকে নি। এত বড় বিজ্ঞানীর এই অসহায় অবস্থার কথা ভাবলে সত্যই মর্মাহত হতে হয়। হ্যামিলটনের জীবনে প্রয়োজন ছিল একজন সহানুভূতিশীলা বুদ্ধিমতী নারীর—ঘরকন্না গুছিয়ে রেখে যিনি বিজ্ঞানীর গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পারতেন। প্রতিভা আর তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশের যোগাযোগ হয়তো অনেক সময়েই হয় না। সাধারণ অনেক প্রতিভাই তাই মরে যায়। কিন্তু হ্যামিলটনের মত বিরাট প্রতিভার মৃত্যু নেই বলেই তিনি এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের অনেক কিছু দিয়ে গেছেন।

১৮৪৩ সালে ত্রিমাত্রিক দেশে ভেক্টর সম্পর্কে তিনি এক মূল্যবান আবিষ্কার করেন—ক্যালকুলাস অফ কোয়াটারনিয়ন। এটা নিয়ে হ্যামিলটন প্রায় পনেরো বছর ভেবেছেন, অজস্র অঙ্ক কষেছেন। কিন্তু একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর মনে সমাধান এসে গেল, ১৬ই অক্টোবর, ১৮৪৩ সালে। হ্যামিলটনের এই আবিষ্কারের ফলাফল প্রচলিত কতকগুলি গাণিতিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে। সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারে নি, কিন্তু তারা এটা বুঝলো যে, হ্যামিলটন যুগান্তকারী একটা কিছু করে-ছেন। শোনা যায়, আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করবার পর ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ তাঁকে লাঞ্চে আহ্বান জানান। হ্যামিলটনের অবস্থাটাও হলো অনেকটা এই রকম—রাস্তায় বেরুলে অ্যাংলো-আইরিশ অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে ঘিরে ফেলতো। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতো

কোয়াটারনিয়নের ব্যবহারটা কি, একটু বুঝিয়ে বল তো! এই আবিষ্কারের যুক্তিপদ্ধতি আধুনিক কালে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রভৃতিতে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে।

এর প্রায় বাইশ বছর পরে, ১৮৬৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ৬১ বছর বয়সে হ্যামিলটনের মৃত্যু হয়—বাতব্যাধির আক্রমণে। এটা তাঁর জীবনের নির্জনতম সময়। মিসেস হ্যামিলটন অসুস্থতার জন্যে প্রায়ই কাছে থাকতেন না। নোংরা খাবার ঘরই তাঁর গবেষণাগারে পরিণত হলো। পাচক কিংবা খানসামা কেউ মাঝে মাঝে এসে একটি করে মাটন চপ এগিয়ে দিয়ে যেত। খেলেন কি না খেলেন, সে খোঁজ কে করে? তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, অগোছালোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে গণিতের অজস্র কাগজপত্র আর বইয়ের পাণ্ডু-লিপির স্তূপ। এরই মধ্য থেকে বেরুল অনেক হাড়ের টুকরা, শুকিয়ে-যাওয়া চপ, আর খাবারের ডিস। কি অবস্থার মধ্যে হ্যামিলটনের শেষ দিনগুলি কেটেছে, এথেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স তাঁকে প্রথম বিদেশী সভ্য মনোনীত করেন।

স্বদেশের প্রতি হ্যামিলটনের গভীর আকর্ষণ ছিল। পশুপক্ষীদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। তাঁর স্বভাব ছিল খুবই সরল। কোন এক ব্যক্তি একবার তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তখনই হ্যামিলটন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা আপোষে মীমাংসা হয়ে যায়।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, সাউদে প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সঙ্গে হ্যামিলটনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে হ্যামিলটনের প্রথম দেখা হয় ১৮২৭ সালে। কবির সংস্পর্শে এসে হ্যামিলটন এই কথাটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজ্ঞান সাধনাই তাঁর আসল পথ। এর আগে হ্যামিলটন বিরাট কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এর পরেও সারাজীবন ধরেই হ্যামিলটন অল্প-বিস্তর কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তিনি যে জাত কবি নন—একথা বুঝতেন। হ্যামিলটনের প্রতিভা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে মুগ্ধ করে-ছিল। তিনি বলেছেন, কেবল দু'জন মানুষের সামনে তাঁর নিজেকে ছোট মনে হতো, এক হ্যামিলটন এবং দ্বিতীয় জন কোলরিজ।

হ্যামিলটনের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কেটে গেছে। যতদিন জীবিত ছিলেন, দেশ-বিদেশে অজস্র সম্মান তিনি পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ কিছু না বুঝলেও তাঁর জয়গান করেছে। মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে অনেকেই ভুলে যেতে লাগলো হ্যামিলটনকে। বিংশ শতাব্দীতে হ্যামিলটন সাধারণ মানুষের কাছে না হোক, বিজ্ঞানীদের কাছে পূর্ণমূর্তিতে ফিরে এসেছেন। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক পদার্থ-বিদ্যার ছোট-বড় বেশ কয়েকটি জয়তোরণ।

গোধূলি ও উষা

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

প্রাচীন কাল থেকে গোধূলি ও উষা মানুষের কল্পনাকে বিচিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৈদিক আর্যগণ উষাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। তাঁদের ভাষায় এর নাম ছিল উষস্ বা উষসী। প্রাচীন রোমান ও গ্রীকরাও উষাকে দেবতা কল্পনা করেছিলেন। রোমীয় পুরাণে ইনি অরোরা, প্রভাতের দেবী। এর স্বামী হলেন টিথোনাস। প্রত্যেক দিন প্রভাতে দেবী অরোরা তার স্বামীর জাফরাণী রঙের বিছানা থেকে উঠে রথে চেপে তার গোলাপী আঙুল দিয়ে শিশির ছিটাতে ছিটাতে চলে যান। গ্রীক পুরাণে এর নাম ইয়োস দেবী। গ্রীক ভাস্করেরা ইয়োস দেবীকে অঙ্কিত করেছেন—একজন যুবতী সমুদ্র থেকে উঠে রথে চেপে চলেছেন, রথ টানছে পাখাযুক্ত ঘোড়া। যুবতীর দু'হাতে দুটি কলসী; তাথেকে তিনি প্রভাতের শিশির ছিটিয়ে চলেছেন। গ্রীক ও রোমীয় উপকথায় এই দেবীর সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে উষা ও গোধূলি অতি পবিত্র সময় এবং ভগবানের আরাধনার সবচেয়ে প্রশস্ত কাল। এই প্রসঙ্গে গোধূলি ও উষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদদের কাছে গোধূলি ও উষার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল না মনে হয়। তিথিতত্ত্বে বরাহ বচনে আছে—"অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা যাবৎ। তেজঃ পরিহানিরূষা ভানোরর্দ্ধোদয়ং যাবৎ॥" সূর্যের অর্ধাস্ত কাল থেকে যে পর্যন্ত না তারকা প্রকাশিত হয়ে সন্ধ্যা প্রকটিত হয় এবং রাত্রি প্রভাতের পর তারকার তেজ লোপ করে সূর্যের অর্ধোদয় কাল পর্যন্ত সময়কে উষা বলা হয়। হিন্দু-জ্যোতিষে আরও আছে যে, রজনীর দুই মুখ; এক মুখ প্রভাতের, অন্য মুখ সন্ধ্যার। এই উভয় সন্ধিকালকে হিন্দুরা সন্ধ্যা নাম দিয়েছেন। এথেকে বোঝা যায়, প্রভাতের উষা এবং সন্ধ্যার গোধূলি উভয়েই একরূপ কারণ-সম্ভূত এবং উভয়ের স্থিতি ও প্রকৃতি যে একই, তা হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের অজ্ঞাত ছিল না। এখন আমরা দেখবো, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ এ-সম্বন্ধে কি বলেছেন।

সূর্যাস্তের পর রাত্রির অন্ধকার আসতে একটা বিশেষ সময় কেটে যায়। এই সময়কে গোধূলি বলা হয়। সূর্যোদয়ের আগেও এইরূপ একটা সময় আছে, তার নাম উষা। সূর্য অস্ত যাবার পর পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতার জন্যে সূর্যের আলো আমাদের কাছে সোজাসুজি আসতে পারে না। কিন্তু সূর্যের আলো পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি বিক্ষিপ্ত ভাবে পৃথিবীতে এসে পৌছায়। এজন্যে সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ ধরে পৃথিবী সূর্যের আলো পরোক্ষভাবে কিছু পরিমাণে পেয়ে থাকে। সূর্যোদয়ের আগেও এরূপ ব্যাপার ঘটে। সূর্যের আলো সোজাসুজি পৃথিবীতে এসে পৌছাবার আগেই উপরের আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় প্রতিফলিত রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছায়।

গোধূলি ও উষার স্থিতিকাল কত? এ-সম্বন্ধে স্থির করা হয়েছে যে, সূর্যাস্তের পরে ষষ্ঠ পর্যায়ের তারাগুলি যখন দিকচক্রবালে ফুটে ওঠে তখনই গোধূলির সমাপ্তি। অনুরূপ ভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে ষষ্ঠ পর্যায়ের তারাগুলি যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখনই উষার আগমন। কিন্তু এ ব্যাপারটা বায়ুমণ্ডলের

অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। তবে একটা কথা এই যে, সাধারণতঃ সূর্য যখন দিগন্তের নীচে ১৮° ডিগ্রি নেমে যায় তখনই ষষ্ঠ পর্যায়ের তারাগুলি দেখা দেয়। তাই স্থির করা হয়েছে যে, দিগন্তের নীচে সূর্যের লম্ব-দূরত্ব ১৮° ডিগ্রির বেশী হলেই গোধূলির সমাপ্তি হলো ধরে নিতে হবে। গোধূলির সমান সময় উষারও স্থিতিকাল।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, গোধূলি পৃথিবীর সব জায়গায় সমান সময় ধরে থাকতে পারে না। গোধূলির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে দুটা জিনিষের উপর—(১) স্থানের অক্ষাংশ; (২) সূর্যের বিষুব-লম্ব (Declination)। এ দুটা জিনিষের যে কোনটার পার্থক্য হলেই গোধূলির স্থিতিকালও বদলে যাবে। পৃথিবীর বিষুবরেখাই হলো 0° অক্ষাংশ; বিষুবরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বই হলো তার অক্ষাংশের পরিমাণ। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু দুটার অক্ষাংশ হলো ৯০° ডিগ্রি। আমরা জানি, সূর্য সারা বছর ঠিক পৃথিবীর বিষুবরেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয় না, বছরে দুটা দিন মাত্র (২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) এরূপভাবে কিরণ দেয়। ২১শে মার্চের পরে সূর্য একটু একটু করে উত্তরে সরে যেতে থাকে; তারপর ২১শে জুন কর্কট ক্রান্তির (২৩° ২৮' উঃ) উপর পৌঁছায়। এরপর আবার উল্টা দিকে একটু একটু করে সরে গিয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিষুব-রেখার উপর আসে। এ-পর্যন্ত সূর্যের উত্তরায়ণ। তারপর সূর্য দক্ষিণে একটু একটু করে সরে গিয়ে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে মকর ক্রান্তিতে (২৩° ২৮' দঃ) এসে পৌঁছায়। আবার উল্টা দিকে হেলতে হেলতে ২১শে মার্চ বিষুবরেখায় চলে আসে। এ-পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণায়ন। বিষুবরেখা থেকে সূর্যের কোন দিনের যে লম্ব-দূরত্ব তাকেই বলা হয় সূর্যের বিষুব-লম্ব। এর ক্ষুদ্রতম মান 0° এবং বৃহত্তম মান ২৩° ২৮'।

এই বিষুব-লম্ব এবং অক্ষাংশের পার্থক্যের জন্যে কোন স্থানের উপর সূর্যের আপাত দৈনিক গতি-পথটা কম-বেশী বাঁকাভাবে দিগন্ত রেখাকে ছেদ করতে থাকে। তার ফলে এই পথের উপর সূর্যের ১৮° ডিগ্রি নেমে যাওয়ার সময়টাও কম-বেশী হতে থাকে। বিষুবরেখার উপর সূর্যের দৈনিক গতি-পথটা কিন্তু লম্বভাবে দিগন্ত রেখাকে ছেদ করে। তাই সেখানে গোধূলির স্থিতিকালও সবচেয়ে ছোট হয়; কারণ লম্বভাবে ১৮° ডিগ্রি নেমে যেতে সূর্যের সবচেয়ে কম সময় লাগে। বিষুবরেখা ছেড়ে উত্তরে বা দক্ষিণে যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই সূর্যের ১৮° ডিগ্রি নীচে নামতে বেশী সময় লাগতে থাকে। চিত্র (১ ও ২নং) দুটা থেকে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে।

এখন দেখা যাক, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে গোধূলির স্থিতিকাল কেমন হবে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্য প্রায় ৬ মাস ধরে দিগন্তের নীচে থাকে। এই সময়ে দিগন্ত থেকে সূর্যের লম্ব-দূরত্ব কিন্তু খুব বেশী হয় না। সবচেয়ে বেশী দূরত্ব হয় ২৩° ২৮'। এই তথাকথিত রাত্রির বেশ বড় একটা অংশ গোধূলি ও উষা দু-ধার জুড়ে থাকে। দুই মেরুতে সূর্যের ১৮° ডিগ্রি নীচে নামতে বেশ কিছু দিন লেগে যায়, আর ১৮° ডিগ্রির মধ্যে থাকলে পুরা অন্ধকারও হতে পারে না। সূর্যের বিষুব-লম্ব ঠিক সমহারে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু হ্রাস-বৃদ্ধির হারটা সমান স্বীকার করে নিলে মেরুদেশে গোধূলি ও উষার স্থিতিকালের একটা মোটামুটি হিসাব করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ১৮° ও ২৩° ২৮'-এর অনুপাত যা হবে, গোধূলি ও উষার স্থিতিকাল এবং ৬ মাসের অনুপাতও তাই হবে। এই অনুপাতের অঙ্কটা সমাধান করলে গোধূলি ও উষার স্থায়িত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৪ মাস। উত্তর মেরুতে ২৩শে সেপ্টেম্বরের পরে প্রায় ২ মাস গোধূলি চলে, আর ২১শে মার্চের আগে ২ মাস হয় উষা। দক্ষিণ মেরুতে এর ঠিক বিপরীত। ২১শে মার্চের পরে ২ মাস গোধূলি, আর ২৩শে সেপ্টেম্বরের আগে ২ মাস

ঊষা। আমরা যারা বিষুবরেখা থেকে খুব বেশী দূরে থাকি না, তাদের কাছে মেরুদেশের একটানা ৬ মাস রাত্রির কল্পনা একটু কষ্টকর। আবার সেই ৬ মাস রাত্রির স্বরূপটাও আমরা বুঝতে পারি না। এটা আমাদের দেশের অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার মোটেই নয়, এর ৪ মাসই গোধূলি ও ঊষার আবছা আলোকে কেটে যায়; বাকী ২ মাস আসল রাত্রির আকাশে মেরুজ্যোতির ছটায় পুরা অন্ধকার হতেই পারে না। ব্যাপারটা সত্যিই খুব মজার।

পথটা দিগন্তরেখাকে প্রায় লম্বভাবে ছেদ করে। তাই ঐ দিনে গোধূলিকাল ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যা অনুপাত ১৮° ও ৩৬০°-ডিগ্রির মধ্যে তাই অনুপাত হয়ে থাকে। কারণ খ-বৃত্তের কৌণিক মান ৩৬০° এবং এটা ২৪ ঘণ্টার তুল্য। এই অনুপাতের অঙ্কটা সমাধান করলে গোধূলির সময় পাওয়া যায় ১ ঘ: ১২ মি:। এটাই হলো বিষুব অঞ্চলে গোধূলির সবচেয়ে কম স্থিতিকাল।

পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন দিনে
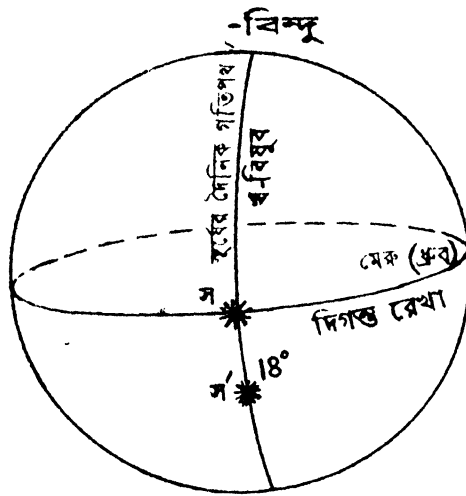
১নং চিত্র

বিষুব দেশে গোধূলি (বিষুব-সংক্রান্তি দিনে)
স—অস্তকালে সূর্য, স´—গোধূলির শেষ সূর্য
(সূর্যের গতিপথ খ-বিষুবের সঙ্গে মিলে গেছে
এবং দিগন্তকে লম্বভাবে ছেদ করেছে)।

বিষুবরেখার দেশে গোধূলি যে সবচেয়ে ছোট হয় তা আমরা দেখেছি। এর মধ্যে আবার সূর্যের বিষুব-লম্বের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে গোধূলিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এখন দেখা যাক দুটা বিষুব-সংক্রান্তির দিন (২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) গোধূলির পরিমাণ কত হবে। এই দু-দিন সূর্যের আপাত দৈনিক গতি-পথটা খ-বিষুবের (Celestial Equator) সঙ্গে প্রায় মিলে যায় এবং এটা খ-বিন্দু (Zenith) ও অধঃ-বিন্দুর (Nadir) মধ্য দিয়ে যায়। ঐ গোধূলির পরিমাণ কি হবে, তা জানতে হলে প্রথমতঃ ঐ স্থানের অক্ষাংশ সূক্ষ্মভাবে জানতে হবে। এর জন্যে কোন ভাল অক্ষাংশের বই দরকার; আর জানতে হবে ঐ দিনে সূর্যের বিষুব-লম্ব। এটা পাওয়া যাবে গ্রীনউইচ মানমন্দির থেকে প্রকাশিত নৌ-পঞ্জিকা (Nautical Almanac) থেকে। এদুটা জিনিষ অবলম্বন করে দুটা গোলীয় ত্রিভুজ সমাধান করতে হবে। একটা ত্রিভুজ সমাধান করে গোধূলির শেষে সূর্যের

'আওয়ার অ্যাঙ্গল' পাওয়া যাবে। এর অর্থ, এমন একটা কোণ পাওয়া যাবে, যা থেকে সূর্যোদয় থেকে গোধূলির শেষ পর্যন্ত সূর্যের ভ্রমণ করতে কত সময় লাগলো তা জানা যাবে। আর একটা ত্রিভুজ সমাধান করলে এমনিভাবে সূর্যাস্ত কালে সূর্যের 'আওয়ার অ্যাঙ্গল' পাওয়া যাবে। এই দুটা 'আওয়ার অ্যাঙ্গলের' পার্থক্য নিয়ে সেটা সময়ে পরিণত করলে গোধূলির সময় পাওয়া যাবে। এরূপ গোলীয় ত্রিভুজ সমাধান করতে অবশ্য উচ্চতর ত্রিকোণমিতির সাহায্য নিতে হবে।

বা দক্ষিণ হলে খাটবে। এ দুটা যদি পরস্পরের বিপরীত হয়, আর এদের পার্থক্য যদি ৭২°-র ডিগ্রি কম না হয়, তাহলেই সারারাত গোধূলি থাকবে। হিসাবটা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। যারা কলকাতার কাছাকাছি বাস করে, তাদের পক্ষে সারারাত গোধূলি উপভোগ করবার মজাটা আর ঘটে উঠবে না। কারণ কলকাতা অঞ্চলের অক্ষাংশ ২২°৩০', আর সূর্যের বৃহত্তম বিষুব লম্ব ২৩°২৮'-এর যোগ-বিয়োগে কোন রকমে ৭২° ডিগ্রি করা যাবে না। সবচেয়ে নিম্ন অক্ষাংশ যেখান থেকে
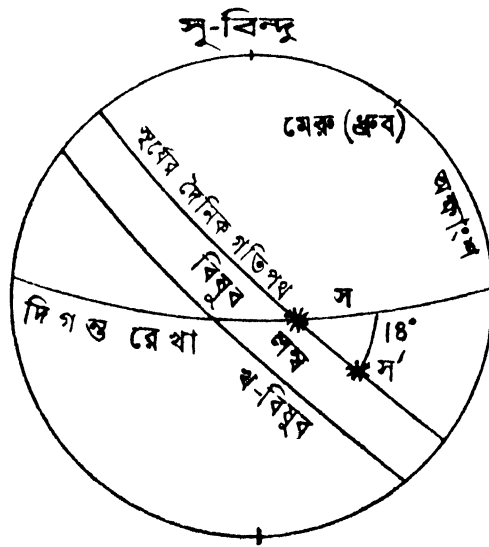
২নং চিত্র

যে কোন স্থানে যে কোন দিনে গোধূলি (সূর্যের দৈনিক গতিপথ খ-বিষুব থেকে সরে গেছে এবং দিগন্তকে বক্রভাবে ছেদ করছে)।

এখন দেখা যাক, গোধূলি সারা রাত ধরে থাকতে পারে কিনা এবং কোথায় এরূপ হওয়া সম্ভব। হিসাব করে দেখা যায়, কোন স্থানে, কোন দিনে অক্ষাংশ ও সূর্যের বিষুব-লম্বের যোগফল যদি ৭২° বা ৭২° ডিগ্রির বেশী হয় তবে সারা রাতটাই গোধূলিতে কেটে যাবে, খাঁটি রাতের অন্ধকার আর আসতেই পারবে না। এ নিয়মটা অবশ্য অক্ষাংশ ও সূর্যের বিষুব-লম্ব উভয়ের উত্তর

সারারাত গোধূলি দেখা যেতে পারে তা হচ্ছে, ৪৮°৩২' উত্তর বা দক্ষিণ; কারণ ৪৮°৩২'+২৩°২৮' =৭২°। সবচেয়ে উচ্চ অক্ষাংশ যেখান থেকে দুটা বিষুব-সংক্রান্তি দিনে সারারাত গোধূলি দেখা যেতে পারে তা হচ্ছে, ৭২° ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সারারাত গোধূলি দেখবার আনন্দ পেতে হলে আমাদের ৪৮°৩২' থেকে ৭২° অক্ষাংশের মধ্যে কোথাও না কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে।

গণিতশাস্ত্রের প্রগতি

শ্রীশুকদেব দত্ত

হ্যাঙ্গেরিয়ান অ্যারিস্টোক্র্যাট্‌রা নাকি তিনের বেশী গুণতে পারতো না; অবশ্য এর সত্যতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তারা খুব বেশী বুদ্ধিমান ছিল না এবং সেজন্যেই বোধ হয় তাদের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রচলিত। কিন্তু এখনও এমন অনেক জাতি আছে, যারা তিনের বেশী গুণতে পারে না। যেমন, আফ্রিকার হটেণ্টট্‌রা —ওদের কাছে এক, দুই, তিনের পরে আর চার নয়, তিনের পরেই অনেক—ঐ তিন পর্যন্তই ওদের দৌড়।

গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে যখন প্রথম জ্ঞান হলো তখন সকলেরই অবস্থা ছিল ঐ হটেণ্টট্‌দের মত। এখন অবশ্য আমরা ইচ্ছামত বড় বড় সংখ্যা ভাবতে বা লিখতে পারি। এই পৃথিবীর বয়স কত সেকেণ্ড বা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত ইঞ্চি—এসব প্রশ্নের উত্তরে একটা সংখ্যার পিছনে অনেকগুলি শূন্য বসাতে হবে—আর কিছুই নয়। যেমন, এই বিশ্বজগতের মোট পরমাণুর সংখ্যা লিখতে হলে তিনের পিছনে চুয়াত্তরটা শূন্য বসাতে হবে। অতগুলি শূন্য লেখার পরিশ্রম অবশ্য সহজেই বাঁচাতে পারা যায় যদি ঐ সংখ্যাটিকে ৩×১০^{৭৪} লেখা যায়। দশের ডান দিকে একটু উপরে ঐ চুয়াত্তর সংখ্যাটি বোঝাচ্ছে যে, তিনকে চুয়াত্তরটি দশ দিয়ে গুণ করা হচ্ছে। গুণ করে দেখলে সেই একই ফল পাওয়া যাবে—নয় কি?

এই ভাবে লেখার পদ্ধতি অবশ্য খুব বেশীদিন উদ্ভাবিত হয় নি। হাজার বছর কিংবা তার চেয়ে কিছুদিন আগে সম্ভবতঃ কোন হিন্দু গণিতবিদ্‌ এই উপায় বের করেছিলেন। তার আগে রোমান অক্ষরে সংখ্যা লেখার প্রচলনই ছিল খুব বেশী। এখনও এই রোমান অক্ষরের ব্যবহার অনেক স্থানেই লক্ষ্য করা যায়; যেমন—ঘড়ির ডায়ালে, বইয়ের পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা লেখবার খুবই অসুবিধা ছিল। একটা উদাহরণ দিই—৯৮৩১ এই সংখ্যাটি রোমান হরফে লিখলে দাঁড়াবে এই রকম—

MMMMMMMMDCCCXXXI

এথেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে নিশ্চয়ই যে, সময় আর স্থানের অপব্যয় হতো প্রচুর। এই রোমান হরফে দশলক্ষ লিখতে হলে এক হাজার M লিখতে হবে পাশাপাশি—কষ্টসাধ্য কাজ নয় কি? এই কারণেই খুব বড় সংখ্যা হলেই তখনকার পণ্ডিতেরা ধরে নিতেন অগণিত; যেমন—আকাশের তারার সংখ্যা বা সমুদ্রসৈকতে বালিকণার সংখ্যা। অনেকটা হটেণ্টট্‌দের মতই—তিনের কিছু বেশী হলেই অনেক।

অবশ্য খৃষ্টের জন্মের তিনশ' বছর আগেই আর্কিমিডিস খুব বড় বড় সংখ্যা গোনবার এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রীক গণিতশাস্ত্রে সে সময় মিরিয়াড বা দশ হাজারই ছিল সবচেয়ে বড় সংখ্যা। তিনি মিরিয়াড মিরিয়াড বা দশ কোটির নাম দিলেন অক্টেড। এটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর একক। তারপর অক্টেড অক্টেড বা তৃতীয় শ্রেণীর একক, অক্টেড অক্টেড অক্টেড বা চতুর্থ শ্রেণীর একক—এই রকম চললো। এই উপায় বের করে আর্কিমিডিস বললেন যে, সমুদ্রসৈকতে বালির সংখ্যা তিনি সহজেই বের করতে পারবেন।

তখন বিশ্বজগৎকে কল্পনা করা হয়েছিল একটা ফাঁপা বলের মত; আর সব তারা, গ্রহ, উপগ্রহ-

গুলি এর মধ্যেই রয়েছে বলে ধরা হতো। সে সময়ের এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্ অ্যারিস্টার্কাস অফ স্যামন বলেছিলেন যে, এই বলের ব্যাসার্ধ প্রায় ১০^১০ স্ট্যাডিয়া—এক স্ট্যাডিয়া প্রায় ১৮৮ মিটারের কাছাকাছি; অর্থাৎ ওটাকে আমরা ১০^৯ মাইল ধরতে পারি। আর্কিমিডিস এই তথ্য সংগ্রহের পর গণনা করে বের করলেন যে, এই গোলকে বালি ভর্তি করতে হলে প্রয়োজনীয় বালিকণার সংখ্যা হবে অষ্টম এককের এক হাজার মিরিয়াডের কাছাকাছি, অর্থাৎ আমাদের কথায় ১০^৬৩-এর কাছাকাছি। অবশ্য আর্কিমিডিসের গণনা নির্ভুল ছিল না; কারণ বিশ্বজগতের যে ব্যাস ধরে তিনি গণনা করেছিলেন, তা ঠিক নয়। পৃথিবী থেকে শনিগ্রহের দূরত্বই ঐ দূরত্বের প্রায় সমান। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা এখনও ৫×১০^২১ মাইলের বেশী দেখতে পাই না। বিশ্বজগতের ব্যাস যদি এই পর্যন্তও ধরা হয় তাহলেও প্রয়োজনীয় বালিকণার সংখ্যা হবে প্রায় ১০^১০০ অর্থাৎ একের পিছনে একশটা শূন্য।

অবশ্য বিশ্বজগৎকে বালিকণা দিয়ে পূর্ণ করতে গেলে যে প্রচুর বালিকণার প্রয়োজন হবে, এটা যে কেউই বলতে পারে। এমন অনেক প্রশ্ন আছে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে যাদের উত্তর কম বলেই মনে হবে, কিন্তু সমাধান করলে দেখা যায় যে, প্রকৃত উত্তর খুবই বড় হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিই—

দাবা খেলার ছকে ৮টা করে ৮ সারিতে মোট ৬৪টা ঘর আছে। যদি বলা হয় এই ছকের প্রথম ঘরে একটা গমের দানা, দ্বিতীয় ঘরে দুটা, তৃতীয় ঘরে চারটে, চতুর্থ ঘরে আটটা, পঞ্চম ঘরে ষোলটা—এইভাবে চৌষট্টি ঘর পর্যন্ত ভর্তি করে দিতে পারা যাবে কি? অবশ্য পারা যাবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় গমের সংখ্যা হবে ১৮,৪৪৬, ৭৪৪,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫টি—অর্থাৎ পৃথিবীর দু-হাজার বছরের উৎপাদিত গমের সমান।

আর একটা গল্প বলি। গণিত শাস্ত্রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক W. R. Ball-এর Mathematical Recreation থেকে এটা বলছি। বারাণসীতে ব্রহ্মার মন্দিরে দেবমূর্তির সামনে একটা পিতলের প্লেট। ঐ প্লেটের উপর তিনটি হীরকদণ্ড দাঁড় করানো আছে। একটি দণ্ডের মধ্যে আছে চৌষট্টিটি সোনার চাকৃতি। উপরের চাকৃতির ব্যাস সব চেয়ে কম। দ্বিতীয় চাকৃতির ব্যাস প্রথটির চেয়ে বেশী, কিন্তু তৃতীয়টির চেয়ে কম। এভাবে ৬৪তম চাকৃতির ব্যাস সবচেয়ে বেশী। এই চাকৃতিগুলিকে অন্য একটি হীরকদণ্ডে আনতে হবে। এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে দেবমন্দিরের পুরোহিতের উপর। আনবার সময় কিন্তু দুটা নিয়ম মানতে হবে—প্রথমতঃ, কখনও একটার বেশী চাকৃতি একসঙ্গে তোলা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ছোট চাকৃতির উপর কোন বড় চাকৃতি কখনই রাখা চলবে না। দেবমন্দিরে পুরোহিত যেদিন এই কাজ শেষ করবেন, সেদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি—ধরা যাক, ক, খ, গ হলো তিনটি দণ্ড, আর ক দণ্ডে রয়েছে চৌষট্টিটি চাকৃতি। প্রথমেই প্রথম চাকৃতি ক দণ্ড থেকে খ দণ্ডে রাখা হলো। এবার দ্বিতীয় চাকৃতি রাখা হলো ক দণ্ড থেকে গ দণ্ডে এবং প্রথম চাকৃতি খ দণ্ড থেকে গ দণ্ডে। মাত্র তিনবারেই দুটি চাকৃতি বাইরে আনা হলো। এবার তৃতীয় চাকৃতিকে ক দণ্ড থেকে নিয়ে আসা হলো খ দণ্ডে, প্রথম চাকৃতিকে ক দণ্ডে, দ্বিতীয়কে খ দণ্ডে, আর সর্বশেষে প্রথমটিকে ফের খ দণ্ডে। সাত বারে তৃতীয় চাকৃতি অবধি বাইরে আনা হলো। চারটে চাকৃতি আনতে গেলে একই রকমভাবে পনেরো বার বদল করতে হবে। এই রকমে চৌষট্টিটি চাকৃতিকে অন্য দণ্ডে বদল করতে হলে ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৫ বার নাড়াচাড়া করতে হবে। একবার বদল করতে যদি এক সেকেণ্ড

সময়ও লাগে তবে মোট সময় লাগবে প্রায় ৫৮ হাজার কোটি বছর। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীর আয়ু হলো আর ২ হাজার কোটি বছর; অর্থাৎ চৌষট্টিটি চাকৃতি অন্য দণ্ডে আনবার আগেই পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তিনটে পেরেক বসিয়ে তাতে ৬৪টা চাকৃতি লাগিয়ে ব্যবস্থা করলেই দেখা যাবে যে কত সময় লাগবে।

অবশ্য আমরা যতদূর জানি, বারাণসীতে এ রকম কোন মন্দির নেই বা ছিল না। সম্ভবতঃ এটা পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত কোন গল্প। তবে এটা ঠিক যে, মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমশঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। যে মানুষ আগে তিনের বেশী গুণতে পারতো না, সে আজ বলতে পারে—আকাশে তারার সংখ্যা কত, বলতে পারে বিশ্বজগতে কত পরমাণু আছে, বলতে পারে পৃথিবী থেকে কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ কত দূরে। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন বড় বড় অঙ্ক কষতে আর ইলেকট্রনিক কম্পিউটেটর লাগবে না, মানুষ মুখে মুখেই কষে দেবে—খুব বেশী দূরে নয় সেদিন।

খাদ্য-বিজ্ঞান ও রুচিবোধ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

খাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিস্তৃতভাবেই প্রয়োগ করা হয়। গবেষণা করে নির্ণয় করতে হয়, কোন্ কোন্ দ্রব্য শরীরের পক্ষে আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খাদ্য পুষ্টিকর করবার জন্যে অবস্থাবিশেষে অনেক প্রকার দ্রব্যই যোগ করা প্রয়োজন; যেমন—ক্যালসিয়াম, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, মলিবডিনাম, কোবাল্ট, আয়োডিন, ফ্লোরিন এবং এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি ভিটামিন। বর্তমানে অ্যামিনো অ্যাসিডও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভিন্ন প্রকারের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উদ্ভাবন, খাদ্য স্থানান্তরে পরিচালন, গুদামজাত করা প্রভৃতি বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। গবেষণার প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের জন্যে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য অবিকৃত রাখা হয়। নানাপ্রকার রং মেশানো হয় খাদ্যদ্রব্য মনোরম করবার জন্যে। অনেক রকম গন্ধদ্রব্য দিয়ে খাদ্যের স্বাদের তারতম্য করা হয়। তাহলেও খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা অনেকটা নির্ভর করে বর্তমান সভ্যজগতের রুচির উপর। কাজেই সভ্যসমাজের অভিরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

পুষ্টির জন্যেই খাদ্য গ্রহণ করা হয়—এরূপ বললে যথেষ্ট হলো না। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা আটার রুটি, দুধ ও শাকসব্জী মিলিয়ে একটি সুষম খাদ্য জনসাধারণের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সর্বসাধারণের আপত্তির ফলে তৎকালীন সরকারকে এই বৈজ্ঞানিক সুপারিশ নাকচ করতে হয়েছিল, খাদ্যটি যথেষ্ট পুষ্টিকর হওয়া সত্ত্বেও। ভক্ষ্যদ্রব্য পুষ্টিকর অথচ রমণীয় হতে হবে।

যদিও আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় বাস করি, তাহলেও আমাদের

আচার-ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই পুরাকালের অবৈজ্ঞানিক যুগের অনুরূপ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য-সামগ্রীর গুণ বৃদ্ধি করতে গেলে অনেক সময় যেন সংস্কারে বাধে। ময়দায় লবণ মিশিয়ে পাউরুটি করা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কিন্তু খড়িমাটির গুঁড়া, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যোগ করে পুষ্টিকর করতে হলে অস্বাভাবিক মনে হবে। তেমনি ক্লোরিন প্রয়োগ করে পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করবার জন্যে জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া স্বাভাবিক মনে হয় না। কাজেই পুষ্টির জন্যেই হোক, কিংবা রং ও স্বাদের জন্যেই হোক, খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করতে হলে সভ্যসমাজের রুচিসম্মত হবে কি না, নির্ণয় করতে হবে। এমন কি, সভ্য সমাজের অনেক অভিরুচিই অপকারী হলেও সহ্য না করে উপায় নেই।

খাদ্যদ্রব্যে যে সব রং মেশানো চলে, সেগুলি অনেক দেশেই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত; অননুমোদিত কোন রং খাদ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। খাদ্যের রং একটি গুরুতর বিষয়। কারণ আমরা সব খাদ্যকেই তাদের রং দিয়ে বিচার করি। সুতরাং কৃত্রিম রং সংযোজন মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যথেষ্ট কূটতর্কের সূচনা করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—যদি কোন রুটিওয়ালা একটি কেকে এরূপ ভাবে হলুদে রং দেয় যেন ডিম সংযোগ না করেও ডিম-মিশ্রিত কেকের অনুরূপ মনে হয়, তাহলে কি এরূপ কার্যে খাদ্যটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অধিকতর পুষ্টিকর হবে? কিংবা ডিম না থাকা সত্ত্বেও ডিমের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণা করা হবে? কিংবা নির্দোষভাবে সৌন্দর্যবর্ধক রং যোগ করে দ্রব্যটির চিত্তাকর্ষতা-বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের আনন্দের উদ্রেক ঠিক সেরূপ নির্দোষভাবে করা হবে, যে ভাবে একটি মহিলা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিজের সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করে এবং দর্শনের আনন্দের কারণ হয়? রংটি অপকারী না হলেই সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হয়।

সম্প্রতি খাদ্যে যে সব রং যোগ করা হয়, সেগুলির নির্দোষিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গেই পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাহলেও ভবিষ্যতে শরীরে কোনরূপ ক্রনিক বা যাপ্য ব্যাধির উদ্ভব হবে কি না, এখনও নিশ্চয় করে বলবার কোন উপায় নেই। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাটার ইয়েলো নামক রং ব্যবহার করবার অনুমোদন ছিল। কিন্তু পরে জাপানে প্রমাণ করা হলো যে, এই রং ব্যবহারে ইঁদুরের যকৃতে ফোড়া হয়। তারপর আমেরিকায় এই রং খাদ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞের মতে, খাবারে এই সব কৃত্রিম রং ব্যবহার একেবারে বন্ধ করে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

রূপ, রস, গন্ধে নানাভাবেই রসায়নবিদ্ খাদ্য অধিকতর মনোরঞ্জক ও তৃপ্তিকর করবার সহায়তা করতে পারেন। একটি পুষ্টিকর খাদ্য খাবার উপযোগী কি না, তার স্বাদের উপর নির্ভর করে। এরূপ হতে পারে যে, খাদ্যটি পুষ্টিকর হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাদ এত বিশ্রী যে, কেউ খেতে চায় না। কিন্তু সুগন্ধি পদার্থ মিশিয়ে একে স্বাদু করলে সবাই আগ্রহ করে খাবে। এ-ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে সহায়তা করা হলো। অবশ্য রাসায়নিক দ্রব্যটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী না হলেই হয়।

খাদ্য বিকৃত হয়ে যাতে অপচয় না হয়, সেজন্যে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়; যেমন—রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো, ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা, জল নিষ্কাশন করে শুষ্ক করা, বায়ুশূন্য কোঠায় রাখা ইত্যাদি। এসব পদ্ধতিতে অপচয় নিবারণ করে' অধিক খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব। অনেক দিন থেকেই মাছ, মাংস, ফল প্রভৃতি

সংরক্ষণের জন্যে লবণ কিংবা চিনি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক পদার্থই, যেমন—বোরেট, ফ্লোরাইড, ফরম্যালডিহাইড, ফেনল প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে পরে অপকারী প্রমাণিত হওয়ায় একে একে পরিত্যক্ত হয়েছে। কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে। ১৮০০ সালে লণ্ডনে মদের সঙ্গে সালফারডাইঅক্সাইড মেশানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে বেন্‌জয়িক অ্যাসিড এবং সালফার ডাইঅক্সাইডই খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। ঔষুধে ব্যবহৃত হয়, এরূপ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে খাদ্য অবিকৃত রাখবার প্রস্তাব হয়েছে। পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন যোগ করলে মাংস দেরীতে বিকৃত হয়।

বর্তমান সভ্যজগতের দাবী অনুযায়ী পাউরুটির রং হবে সাদা, স্পর্শ হবে কোমল এবং গঠন হবে সবদিকে সমান ও মৌচাকের মত। এইরূপ রুটি তৈরীর জন্যে ক্লোরিন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে পটাসিয়াম আয়োডেট ব্যবহার করা হয়। অনেক দিন থেকেই পটাসিয়াম আয়োডেটের ন্যায় আয়োডিন সংশ্লিষ্ট পদার্থ খাদ্যে যোগ করা হয়—ভক্ষ্য দ্রব্যের কোন বাহ্যিক গুণের উন্নতির জন্যে নয়, পরন্তু পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে। গলগণ্ড রোগের প্রতিষেধক হিসাবে সাধারণ লবণে আয়োডিন মেশানোর যথেষ্ট প্রচলন আছে।

খাদ্যে পুষ্টিকর দ্রব্য সংযোজনের উদ্দেশ্যই হলো, মিশ্র খাবারটি পূর্ণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর করা। যদিও মহৎ উদ্দেশ্যেই খাবারের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ যোগ করা হয়, তথাপি এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিতর্কের কারণ হতে পারে। এরূপ প্রস্তাব করা যায় যে, পুষ্টিকর পদার্থ না মিশিয়েও সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিদিন শাকসব্জী, ফলমূল খেলে আর ভিটামিন সি-এর অভাব হবে না। স্বাস্থ্যের জন্যে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার দরকার নেই। গুঁড়াদুধ এবং একজাতীয় অন্যান্য খাদ্যে অতিরিক্ত ভিটামিন-ডি যোগ করে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে যতটা দরকার তার চেয়ে বেশী ভিটামিন-ডি খাওয়ানো হয়।

খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি বিকৃত ব্যবস্থার দাবী করি, তা খাদ্যের বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তনের জন্যেই হোক কিম্বা রং ও স্বাদ বদ্‌লানোর জন্যেই হোক। নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে খাদ্যের এসব পরিবর্তনের কতটা দায়িত্ব নেওয়া সমীচীন হবে, সহজ জ্ঞান দিয়ে এই সমস্যাটি অনুধাবন এবং মীমাংসা করতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যকৃতে ক্যান্সার হতে পারে, এই ঝুঁকি নিয়েও অনেক লোক সিগারেট খেতে দ্বিধা করেন না।

নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ ও ভিটামিন যোগ করে খাদ্য পুষ্টিকর করতে হবে, সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই। এসব খাদ্য কোন্ শ্রেণীর লোকের পক্ষে কতটা দরকার, সে সব যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে। অসঙ্গত রুচির জন্যে যেন এরূপ খাদ্য না খেতে হয় যা শরীরের পক্ষে অপকারী। মোটের উপর নিজের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করাই হবে যুক্তিযুক্ত।

পরশমণি

শ্রীবিজয়কুমার শীল

পরশমণির স্পর্শে লোহা হয়ে যায় সোনা—এক সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই প্রবাদের ভিতর নিহিত রয়েছে জড়বস্তুর রূপান্তরের ইঙ্গিত। এক মৌল রূপান্তরিত হচ্ছে অপর এক মৌলে—লোহা হয়ে যাচ্ছে সোনা। আর সেই রূপান্তরের কারণ অজানা এক মণি—কবির ভাষায় পরশমণি।

সেই অজানা পরশমণির সন্ধান বিজ্ঞানী আজ পেয়েছেন। বিজ্ঞানাগারে বসে পরশমণির স্পর্শে বিজ্ঞানী ঘটিয়েছেন বস্তুর রূপান্তর। এক গুণবিশিষ্ট মৌলকে আরেক গুণবিশিষ্ট মৌলে রূপান্তরিত করেছেন। জড় পদার্থের রূপান্তরের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একে একে সব কিছু জানতে পারবো। জড়বস্তুর রূপান্তর সাধন করবার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টরা। সস্তা ধাতু থেকে মূল্যবান স্বর্ণ তৈরী করবার ব্যর্থ চেষ্টায় অ্যালকেমিষ্টরা সারাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। অ্যালকেমিষ্টদের এই ব্যর্থ চেষ্টার পর বেশ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। মানুষের মন প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে বিচার করবার, বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছে।

১৮০৩ সালে ডালটন পরমাণু-তথ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ডালটনের মতে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণিকা দিয়ে তৈরী। এই অতি ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণিকার নাম পরমাণু। সুতরাং ডালটনের মতানুযায়ী বস্তুর রূপান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে হেনরী বেকারেল আবিষ্কার করেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসে কতকগুলি কণিকা এবং রশ্মি, যেমন—আল্‌ফা কণা, বিটা কণা এবং গামারশ্মি। পদার্থের এই স্বতঃবিকিরণের মধ্যে বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন জড়বস্তুর রূপান্তর—পরমাণুর ভাঙ্গনে। এক পরমাণু রূপান্তরিত হচ্ছে আরেক পরমাণুতে। মৌলের এই রূপান্তর অহরহ ঘটছে অবিরাম গতিতে। কিন্তু অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন তখনও সফল হয় নি। তাঁদের স্বপ্নের সত্যতার একটা প্রমাণ মাত্র পাওয়া গেছে। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। বিজ্ঞানী মনে মনে প্রশ্ন করেছেন—কৃত্রিম উপায়ে মৌলের রূপান্তর সম্ভব কিনা? বিজ্ঞানী সন্ধান করেছেন পরশ পাথরের, যার পরশে বিজ্ঞানাগারে বসে ঘটানো যায় বস্তুর রূপান্তর। একদিন সন্ধান পাওয়া গেল সেই পরশমণির, আর তখনি বস্তুর রূপান্তর কৃত্রিম উপায়ে ঘটানো সম্ভব হলো।

পদার্থের এই রূপান্তর বুঝতে গেলে পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌, লর্ড রাদারফোর্ড, মোস্‌লে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যে ছবি পাওয়া গেল তা মোটামুটি এই রকমের—

প্রত্যেক পরমাণু দুটি অংশে তৈরী। একটি তার কেন্দ্রভাগ বা কেন্দ্রবস্তু, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রবস্তুর বাইরের অংশ হচ্ছে ইলেকট্রনের রাজ্য। অতি ক্ষুদ্র, প্রায় ভর-বিহীন ঋণ তড়িৎবিশিষ্ট কণিকাই ইলেকট্রন নামে পরিচিত। সুতরাং কেন্দ্রবস্তুতে থাকে সমান সংখ্যক বিপরীত-ধর্মী ধন তড়িৎবিশিষ্ট এবং ১

ভরযুক্ত কণিকা যাকে বলা হয় প্রোটন। নিউ-ক্লিয়াসের ভিতর প্রোটনের সংখ্যাই পারমাণবিক সংখ্যা নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি মৌলেরই এক একটি বিশিষ্ট পারমাণবিক সংখ্যা আছে। মৌলিক পদার্থের ধর্ম তার পারমাণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আর থাকে তড়িৎবিহীন কতকগুলি কণিকা যাদের বলা হয় নিউট্রন। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান। নিউট্রন এবং প্রোটনের সম্মিলিত ভরই হচ্ছে পরমাণুর ভর। পরমাণুর ভরকে একটি সংখ্যার দ্বারা সূচিত করা হয়। এই সংখ্যাই ভর-সংখ্যা নামে পরিচিত।

বেরিয়ে আসে প্রোটন কণিকা। সমীকরণের সাহায্যে রূপান্তরটি নিম্নে দেখানো হলো—

$$_7N^{14} + {}_2He^4 - {}_8O^{17} + {}_1H^1.$$

$_7N^{14}$ — নাইট্রোজেন পরমাণু।

$_2He^4$ = আল্‌ফা কণিকা।

$_8O^{17}$ — অক্সিজেন।

$_1H^1$ = প্রোটন কণিকা।

এই আল্‌ফা কণিকা পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে। আল্‌ফা কণিকা হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণু, যার দুটি ইলেকট্রন খসিয়ে নেওয়া হয়েছে।
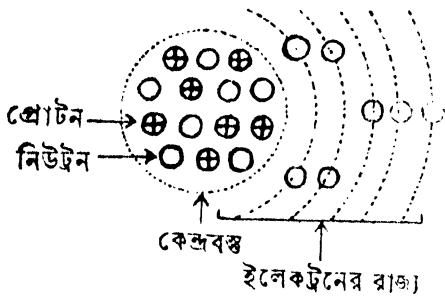
১নং চিত্র

নাইট্রোজেন পরমাণুর ছবি। নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা—৭ এবং ভর-সংখ্যা হচ্ছে—১৪।
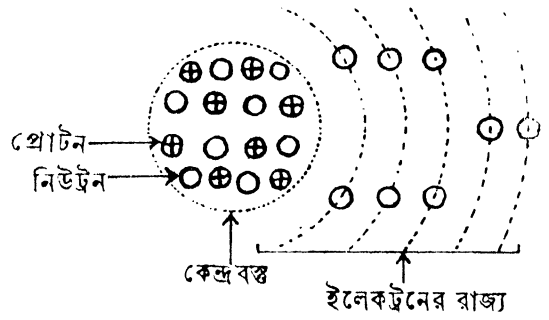
২নং চিত্র

অক্সিজেন পরমাণুর ছবি। অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে—৮ এবং ভর-সংখ্যা হচ্ছে—১৬।

নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা অপেক্ষা এক কম। এখন কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা বাড়িয়ে যদি আট করা যায় তাহলেই অক্সিজেন মৌল পাওয়া যাবে। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ১৯১৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড। মধ্যযুগে অ্যালকেমিষ্টরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন সফল হলো বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন মৌলকে তীব্র গতিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকার আঘাতে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করেন। রূপান্তরের সময়

এই আল্‌ফা কণিকাই হচ্ছে আমাদের বহু আকাঙ্খিত পরশমণি।

তীব্রগতি আল্‌ফা কণিকার আঘাতে যে সব মৌলের রূপান্তর সাধিত হয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ—

বোরন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ইত্যাদি।

রাদারফোর্ডের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকমহলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন পরশমণির সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় আবিষ্কৃত

হলো অনেকগুলি নতুন পরশমণি, যথা—প্রোটন কণিকা, ডয়টেরন কণিকা, নিউট্রন কণিকা, গামারশ্মি ইত্যাদি। এই সব পরশমণির ভিতর নিউট্রন কণিকাই সর্বোৎকৃষ্ট। নিউট্রন কণিকার আঘাতে আমাদের জানা প্রায় সব মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সাধিত হয়েছে। নিউট্রনের স্পর্শে ইউ-রেনিয়াম ধাতু-২৩৮ থেকে বিজ্ঞানী তৈরী করেছেন নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মৌলিক পদার্থ—প্রকৃতির রাজ্যে যাদের কোন অস্তিত্ব নেই। পরশমণির স্পর্শে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ তৈরী করা গেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শিল্প ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় ব্যবহারের জন্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বর্তমান পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

নিউট্রন কণিকার আঘাতে সোনাকে পারায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমীকরণের সাহায্যে সোণার এই রূপান্তর দেখানো হলো—

$${}_{৭৯}Au^{১৯৭} + {}_{০}n^{১} \rightarrow {}_{৭৯}Au^{১৯৮} + \text{গামারশ্মি}$$

$${}_{৭৯}Au^{১৯৮} \rightarrow {}_{৮০}Hg^{১৯৮} + {}_{০}e^{১-}$$
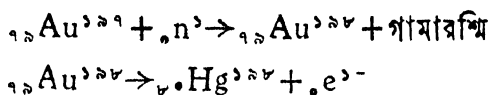
যদিও লোহাকে সোনায় পরিণত করা যায় নি, কিন্তু পারা থেকে সোনা তৈরী করা হয়েছে। মানুষের কাছে সোনা অতি মূল্যবান জিনিষ। অতীতকালে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পরশমণির স্পর্শে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে বহুল পরিমাণে সোনা তৈরী করা সম্ভব নয়। পরশমণির স্পর্শে পারা থেকে সোনা তৈরী করতে যে খরচ পড়বে, প্রকৃতিজ সোনার মূল্য তার চেয়ে অনেক কম। অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভিতর পরমাণুর যে রূপান্তর অহরহ ঘটছে, মানুষ কৃত্রিম উপায়ে মৌলের সেই রূপান্তর সাধন করেছে। এক মৌল রূপান্তরিত হয়েছে আর এক মৌলে—নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন, লিথিয়াম থেকে হিলিয়াম, অ্যালু-মিনিয়াম থেকে সোডিয়াম, সোনা থেকে পারা, পারা থেকে সোনা। পরশমণির স্পর্শে আমরা লাভ করেছি সোনার চেয়ে বহু মূল্যবান জিনিষ—পরমাণুর ভিতর লুকায়িত প্রচণ্ড শক্তি—যে শক্তি আনবে আগামী যুগে এক নতুন বিপ্লব।

৩নং চিত্র

রাদারফোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত পরমাণু রূপান্তরের প্রথম যন্ত্র। প্রোটন কণিকা c-এর উপর পড়ে' আলোক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। a-তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের আধার। তীব্র গতিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকার উৎস, b-যে মৌলকে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করা হবে, c-ফ্লোরেসেণ্ট পর্দা, d-মাইক্রস্কোপ, e-স্ক্রু।

বিশ্বজগতে সূর্যের স্থান

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল সূর্য। গ্রহ-সমূহের গতি সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশাল আকৃতি ও গুরুত্বের জন্য সূর্য একটি বিশিষ্ট ধারায় যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

আমাদের গ্রহের স্থিতিকাল ধরা যাইতে পারে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন বৎসর। এই ভাবে সূর্যের রশ্মি বিকিরিত হইতে থাকিলে ইহার আয়ুষ্কাল বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অদ্যাবধি উহা প্রায় একই অবস্থায় আছে।

প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক বিক্রিয়ার জন্য ইহা সম্ভব হইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য ৪×১০^{৩৩} আর্গ শক্তি বিকিরণ করে। এক গ্র্যাম সৌর-ভর প্রতি সেকেণ্ডে ২ আর্গ শক্তি হারায়। সূর্যের ভর ২×১০^{৩৩} গ্র্যাম হইলে সূর্যের স্থিতিকাল, অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন বৎসর পর্যন্ত প্রতি গ্র্যামে ২.৫×১০^{১৬} আর্গ রশ্মি বিকিরণ করিয়াছে। এই প্রচণ্ড শক্তির বিকিরণ সত্ত্বেও সূর্যের অন্তঃস্থলের তাপমাত্রা প্রায় ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী।

এই সৌর-শক্তির প্রধান উৎস হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন প্রতিনিয়ত হিলিয়ামে রূপান্তরিত হইতেছে এবং পারমাণবিক শক্তির উৎসের কাজ করিতেছে। এই ধরণের বিকিরণ প্রত্যেক নক্ষত্রেই চলিতেছে। নক্ষত্রগুলি সাধারণতঃ বিশাল ভরযুক্ত। পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র কোন জাগতিক পিণ্ডে এই বিক্রিয়া সম্ভব নয়। ভিতরের চাপ ও তাপ এই পারমাণবিক বিক্রিয়া সংঘটনে অসমর্থ।

নক্ষত্রগুলি রাত্রিতে উজ্জ্বল পিণ্ডের মত প্রতীয়-মান হয়। ইহার প্রধান কারণ পারমাণবিক রশ্মির বিকিরণ। সাধারণ গ্রহের নিয়ম অনুযায়ী নক্ষত্র-গুলিও অসীম শূন্যে বিশেষ নিয়মে বিশাল মণ্ডলীতে সুসংবদ্ধ। এই নক্ষত্রমণ্ডলীর শ্বেতাভ জ্যোতিপুঞ্জ আমাদের নিকট Milky way বা ছায়াপথ নামে পরিচিত।

নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল বহু নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত। ভরের দিক হইতে কেন্দ্রস্থলের ভর নক্ষত্র-পুঞ্জের মোট ভর হইতে অনেক কম। নক্ষত্র-পুঞ্জের কেন্দ্রস্থল হইতে অনেক সর্পাকৃতি বাহু উৎসারিত হইয়াছে। এই বাহুগুলির ভিতর বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্যমান এবং গ্যাসীয় পদার্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই ছায়াপথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পরে আবার এক হইয়া গিয়াছে। নক্ষত্রপুঞ্জের বিষুবীয় রেখায় যে গাঢ় ধূলিকণা আছে, তাহাই আলো শোষণ করিয়া এই অংশের সৃষ্টি করিয়াছে।

নক্ষত্রপুঞ্জের বিশাল আকৃতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যাইতে পারে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০০ কিলোমিটার হইলে উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে তাহার সময় লাগিবে প্রায় ১০০,০০০ বৎসর। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে ৮½ মিনিটের মত সময় লাগে। ইহা হইতে নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপকতা সহজেই অনুমান করা যায়।

নক্ষত্রপুঞ্জে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০ মিলিয়ন; কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল বেষ্টন করিয়া তারকাগুলি ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। সূর্য উপরিউক্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে একটি এবং নক্ষত্র-পুঞ্জের কেন্দ্রস্থল হইতে ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। অন্যান্য নক্ষত্রগুলির মত সূর্য ঠিক নিয়মিত ধারায় ঘুরিতেছে। অবশ্য এই নক্ষত্রপুঞ্জ

ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বৎসর সময় লাগে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে নক্ষত্র বর্ষ বা জাগতিক-বর্ষ। তুলনামূলক বিচারে আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ৩৬৫ দিনে ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ৩৫০০-৪০০০ মিলিয়ন বৎসর। সেই হিসাবে ইহার জাগতিক-বর্ষ ১৫ হইতে ১৬, অর্থাৎ আমাদের সূর্য তাহার পরিবার লইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের চারিদিকে ৩৬ বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি আকর্ষণীয় যুগল নক্ষত্র দেখা যায়। জীবনের সমস্যার দিক হইতে এই নক্ষত্রগুলি বিশেষভাবে জড়িত বলে মনে করা হয়। এই বিচিত্র রকমের যুগল নক্ষত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অনেকগুলি দৃশ্যমান, আবার অনেকগুলি দৃষ্টিলোকের বাহিরে অবস্থিত।

এই যুগল নক্ষত্রগুলি বর্ণালী রশ্মি দ্বারা নিরূপণ করা হইয়াছে। ইহাদের বলা হয় Spectroscospic binaries। ইহাদের গতি এক নহে। এই গতি-বৈষম্য Spectrum-এ ধরা পড়ে। কয়েকটি যুগল নক্ষত্রের নাম দেওয়া গেল।

a. Centauri (সেণ্টউরি)
Sirius (সিরিয়াস)
Procyon (প্রোকিয়ন)
Opheuchi (অফিউচি)
Cygni (সিগ্‌নি)
Kruger (ক্রুগার)

অধিকাংশই লাল বর্ণের তারকা। উপরিভাগে তাপের মাত্রা ২০০০°-১০০০°; বেশীর ভাগই আমাদের সূর্যের চেয়ে ম্লান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, নক্ষত্রসমষ্টির ৮০ ভাগই যুগল নক্ষত্র বা তাহাদের গুণিতক নক্ষত্র দ্বারা বেষ্টিত। একটি নক্ষত্র ২টি নক্ষত্রে বিভাজিত হওয়া সম্ভব কিনা, এই সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে। তবে এই বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের সূর্যের মত এক নক্ষত্রের তারকা খুব কমই আছে। বেশীর ভাগই যুগল তারকা।

আমাদের গ্রহগুলির একটি কেন্দ্র থাকিবার ফলে উহারা বৃত্তাকার পথে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু যুগল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দ্বৈতকেন্দ্র থাকিবার ফলে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ সম্ভব নহে। এই বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণের ফলে সূর্য নিয়মিতভাবে প্রায় একই পরিমাণ সৌর-কিরণ বিকিরণ করে। কিন্তু যুগল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে বাধ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রত্যেক নক্ষত্র পারমাণবিক শক্তি বিকিরণ করিতে পারে। এই বিকিরণ ক্ষমতা নক্ষত্রের ভর এবং তাপের উপর নির্ভর করে।

এই বিশেষ ভরযুক্ত নক্ষত্রগুলির স্থিতিকাল মিলিয়ন বৎসরের উপর। ইহাদের মধ্যে কতিপয় নক্ষত্রে হয়তো কয়েক শত হাজার বৎসর পূর্বে জীবনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। জাগতিক ঘটনাবলীর দিক হইতে এইগুলি আধুনিক ঘটনা। সেদিক হইতে আমাদের সূর্যের মত ক্ষুদ্র নক্ষত্র, পরিমিত বিকিরণের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করিয়া বহুদিন থাকিতে পারে। এই অবস্থাই প্রকৃত পক্ষে গ্রহগুলিতে জীবন বিকাশের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এই প্রসঙ্গে পরিবর্তনশীল তারকার কথা বলা দরকার। যে সকল তারকার ঔজ্জ্বল্য এক রকম থাকে না, সেগুলিকেই পরিবর্তনশীল তারকা বলা হয়। যে সকল নক্ষত্রের উপগ্রহ আছে, তাহাদের প্রভাব অবশ্যই কিছু আছে। উপগ্রহগুলি কক্ষপথে ভ্রমণ করিবার সময় মূল নক্ষত্রকে ঢাকিয়া ফেলে; কাজেই তাহাদের আর তত উজ্জ্বল দেখায় না। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নক্ষত্রগুলি পরিবর্তনশীল। সাধারণতঃ নোভা শ্রেণীর তারকাই পরিবর্তনশীল। এই শ্রেণীর তারকা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে স্ফীত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়; তাহার ফলে কখনও উহাদের ঔজ্জ্বল্য ১০০,০০০ গুণ বর্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জে এই ধরণের পরিবর্তন অনেকবার হইয়া থাকে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, তাপ

ও আলোক বিকিরণের সহিত সূক্ষ্ম অণুকণিকার স্রোত প্রতিনিয়তই নির্গত হইতেছে। সাধারণতঃ এইগুলিকে কণিকার বিকিরণ (Corpuscular radiation) বলা হয়। ইহার ফলে নক্ষত্রগুলি ক্রমশঃ ভরমুক্ত হইতে থাকে। অবশ্য সামান্য ভরযুক্ত তারকায় এইগুলি বেশী দৃশ্যমান। আমাদের সূর্যের মত ভরমুক্ত নক্ষত্রে কণিকার বিকিরণ অত্যন্ত অল্প। তার কারণ সূর্য অনেক পূর্ব হইতেই ভরমুক্ত হইয়া প্রায় স্থায়ী অবস্থায় আসিয়াছে। কণিকার বিকিরণ আলোর বিকিরণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ভর, ঔজ্জ্বল্য এবং তাপ অনুযায়ী প্রত্যেকটি নক্ষত্রের অবস্থিতির বিন্যাস কল্পনা করা যায়।

প্রত্যেকটি নক্ষত্র বিকাশের পথে ভরমুক্ত হইয়া শ্লথগতি প্রাপ্ত হয়। কণিকার বিকিরণের ফলে ভর কমিয়া যাওয়ায় কৌণিক গতিভর ক্রমশঃ কমিয়া যায়। প্রত্যেক নক্ষত্রই যে অতিভরযুক্ত হইবে এমন নহে। নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করিবার সময় দেখা গিয়াছে, বহু উজ্জ্বল ও প্রচণ্ড উষ্ণতাবাহী নক্ষত্রের সহিত অল্প ভরযুক্ত বহু ম্লান নক্ষত্র বিদ্যমান। কিন্তু বিকাশের পথে ভরমুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম।

আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যাক। সূর্য ও তাহার পরিবারের জন্ম হইয়াছে কয়েক সহস্র মিলিয়ন বৎসর আগে। ইহার ভর বর্তমান ভর হইতে অনেক গুণ বেশী ছিল। পরিশেষে বিবর্তনের ফলে ভর ও গতিমুক্ত হইয়া একটি স্থায়ী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূর্যের ভর এবং গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের গুণফল সব সময় এক থাকে। জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সূর্যের ভর ১ সহস্র মিলিয়ন বৎসর স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রায় এক ভাবেই আছে।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০ মিলিয়ন। নক্ষত্রগুলির মধ্যে দূরত্ব বিশাল। সেই দূরত্বের তুলনায় নক্ষত্রগুলির আয়তন খুবই ছোট; কাজেই নক্ষত্রপুঞ্জের আয়তনের কাছে এই নক্ষত্রগুলির অস্তিত্ব একরকম নগণ্যই বলা চলে। নক্ষত্র-জগতের মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই। কাজেই নক্ষত্রমণ্ডলের বিশৃঙ্খলার ভিতরে অপর একটি নক্ষত্রের সহিত সংঘাতের সম্ভাবনা কম।

জেম্‌স্ জীন্‌সের গণনা অনুযায়ী আমাদের বর্তমান নক্ষত্রপুঞ্জের গঠন অনুসারে সূর্যের নিকট কোন নক্ষত্রের আগমন $১০^{১৭}$ বছরে একবার হইতে পারে মাত্র। কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, একবার যদি গ্রহের মূল কাঠামো ঠিক হইয়া যায়, তাহা হইলে বহির্জগতের নক্ষত্রের সহিত বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

পৃথিবীর ধূমকেতুর সম্মুখীন হওয়া, সূর্যের শীতলতা, সূর্যের অন্য নক্ষত্রের সহিত সংঘাত প্রভৃতি পৃথিবীর জীবন অবলুপ্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হয়। তবে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের শীতল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সূর্যে হাইড্রোজেনের প্রাচুর্য থাকিবার ফলে এই পারমাণবিক বিক্রিয়া আরও কয়েক সহস্র মিলিয়ন বৎসর নির্বিবাদে চলিবে।

সাধারণতঃ ব্রহ্মাণ্ডের ঘনত্ব হাইড্রোজেনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাহার কারণ সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। যদিও একথা সত্য যে, যে দিন নক্ষত্রপুঞ্জের উৎপত্তি হইয়াছে, সে দিন হইতে প্রতিনিয়তই হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হইয়া হিলিয়ামে পরিণত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুরু ভরযুক্ত বহু উপাদানে গঠিত নাক্ষত্রিক পিণ্ডগুলি সাধারণতঃ গ্যাসীয় পদার্থ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

অ্যাকাডেমিসিয়ান জি. সেইন এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ দেখাইয়াছেন যে, নক্ষত্র-জগতের মধ্যে নীহারিকার ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। অনেক নক্ষত্র এই সব নীহারিকার ভিতর বিদ্যমান। এই নক্ষত্রগুলি হয়তো এই নীহারিকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা নীহারিকার সহিত এক সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে। নক্ষত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পুঞ্জীভূত অস্পষ্ট স্তর এবং কঠিন ধূলিকণার সংমিশ্রণেই তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ধূলিকণা-গুলির উষ্ণতা তাহাদের বাহিরের গ্যাসীয় পদার্থের উষ্ণতা হইতে অনেক কম। ফলে, গ্যাসীয় নীহারিকা শীতল হইয়া সাধারণ নক্ষত্রে পরিণত হয়।

ডি. স্যাফ্রোনোভ দেখাইয়াছেন যে, নক্ষত্রগুলি ৮০০০° সে. বা ততোধিক তাপযুক্ত সাধারণ মাধ্যা-কর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী আকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণেরই বেশী সাহায্য করে। পক্ষান্তরে এই নীহারিকার স্তর অতিক্রম করিবার সময় নীহারিকার ধূলিকণা সূর্য বা নক্ষত্রের আলো শোষণ করিয়া গ্রহ-গুলিতে তাপের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে গ্ল্যাসিয়াল যুগের পৃথিবীর অবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪০০ মিলিয়ন বৎসরের ইতিহাসে এই পৃথিবীর আবহাওয়া ক্যাম্‌ব্রিয়ান, পারমিয়ান, ক্রিটেসিয়াস প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমে পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়মিত ধারা ছিল না। কিন্তু গ্ল্যাসীয় যুগে প্রচুর পরিমাণ জলকণার ঘনীভবন এবং বহু গিরি ও পর্বতমালার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, আগ্নেয়-গিরির ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পর্বতরাজির উদ্ভব হইয়াছে; পক্ষান্তরে পৃথিবীর আবহাওয়া আগ্নেয় ভস্ম ও ধূলিকণার দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় সূর্য কিরণের গতি রুদ্ধ করিয়াছে এবং অপরদিকে জলকণার ঘনীভবনে সাহায্য করিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রপুঞ্জ (Galaxy) কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিদ্যমান। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ ১৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত—তিনটি স্পাইরাল নীহারিকা, ৬টি ডিম্বাকৃতি এবং চারটি অসমান। ইহারা প্রত্যেকেই নক্ষত্র এবং গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা পুঞ্জীভূত। অবশ্য বর্তমান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা ইহার বাহিরে অনেক বৃহৎ আকারের নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহাদের সাধারণতঃ Meta-galactic System-এর ভিতর ধরা হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নক্ষত্রগুলির আয়তনের তুলনায় তাহাদের দূরত্ব অপরিসীম। কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সেই তুলনায় দূরত্ব অনেক কম। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের কথাই ধরা যাক। ইহার ব্যাস ১০০০০০ আলোক-বর্ষ। ইহার নিকটবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব মাত্র ৫ গুণ বেশী। সেইদিক হইতে এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সংঘাত ঘটা অসম্ভব নহে।

যদি এইরূপ সংঘর্ষ ঘটে, তাহা হইলে এমন কি বিপদ হইতে পারে? নক্ষত্রগুলির আয়তন জাগতিক সীমার তুলনায় নগণ্য হওয়ায় একটি নক্ষত্রপুঞ্জ অপর নক্ষত্রগুলির মধ্যে পরিবর্তন না আনিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া অবাধে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

অবশ্য এই ধরণের সংঘাতের ফলে নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতরকার গ্যাস এবং ধূলিকণা সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। একটি নক্ষত্রপুঞ্জের আর একটির উপর কম-বেশী প্রভাব থাকে। সময় সময় দেখা যায়, একটি নক্ষত্রপুঞ্জ আর একটির সম্মুখীন হইবার ফলে উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে উজ্জ্বল ব্রিজের সৃষ্টি হয়। এই ব্রিজগুলি সম্ভবতঃ কতকগুলি তারকার সমষ্টি। কাজেই নক্ষত্রপুঞ্জের সীমার বাহিরের স্থান শূন্য নহে। পাত্‌লা গ্যাসীয় মাধ্যমে আরও কয়েকটি পৃথক তারকার সমাবেশ দেখা যায়। খুব সম্ভব সেগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের বেষ্টনী হইতে মুক্ত। যে কোন তারকা বিশেষ গতিযুক্ত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের

ভিতরকার স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। সৌর-বিজ্ঞানী জুই-কি এই ধরণের অনেক নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। সাধারণতঃ ইহারা আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে ১৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত।

যদি সূর্য তাহার পরিবার লইয়া এই নক্ষত্র-পুঞ্জের বেষ্টনী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল স্থানে চলিয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের স্থিতির দিক হইতে কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নক্ষত্রখচিত আকাশের স্থলে কখনও কখনও নীহারিকা বা অন্য কোন নক্ষত্রপুঞ্জের দেখা পাইব মাত্র।

মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণে কিছুটা ব্যতিক্রম হইতে পারে; কিন্তু মূলতঃ আমরা সূর্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় জীবনের দিক হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।
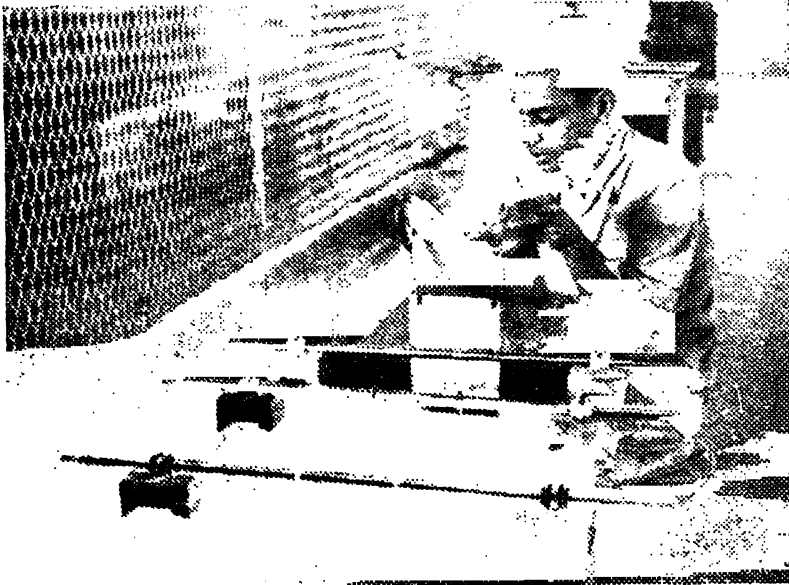
মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত ইলেকট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গবেষকেরা ধাতুর ক্ষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

সঞ্চয়ন

বংশগতির রহস্য

বংশগতির রহস্য সম্পর্কে নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ইভান কমুনিয়ান্‌ত্‌স্‌ লিখেছেন—ঈগল পাখীর ডিম ফুটে ঈগল-ছানাই বেরোয়, অষ্ট্রিচ-ছানা বেরোতে পারে না। কিন্তু কেন এ-রকম হয়? প্রকৃতির নিয়ম বলেই এটাকে আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক নিয়মের পিছনে একটা কার্য-কারণ সূত্র থাকে। এ-ক্ষেত্রে সেই কার্য-কারণ সূত্রটা কি?

মানুষের ক্ষেত্রে, শুধু মানুষের কেন—সব রকম প্রাণীর ক্ষেত্রেই, পূর্বপুরুষের চেহারা, শরীর বা অঙ্গ-সংগঠনের নানারকম বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় উত্তর পুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু কি ভাবে হয়, সেটা এক আশ্চর্য রহস্য।

জীব-বিজ্ঞানীরা জানেন, প্রাণীর প্রজনন-কোষের (রিপ্রোডাকটিভ সেল) মাধ্যমেই সন্তানের মধ্যে পিতামাতা অথবা পূর্বপুরুষের লক্ষণগুলি বংশগত-ভাবে বর্তায়। এই প্রজনন-কোষ অতি ক্ষুদ্র, অণু-বীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। অথচ এই ক্ষুদ্র কোষের মধ্যেই কেমন করে বংশানুক্রমের এতগুলি গুণ লুকিয়ে থাকে? সন্তানের মধ্যে এই বংশানুক্রমিক গুণগুলি পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে বিশ-ত্রিশ বছর, এমন কি তারও বেশী লেগে যেতে পারে। কেমন করেই বা এই কণা-পরিমাণ কোষ এত দীর্ঘকাল ধরে লক্ষণ-গুলিকে বংশানুক্রমিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে?

ইদানীং জীব-বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে কোষ সম্পর্কে পুরনো ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছুকাল আগে জীব-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন—কোষের নিউক্লিয়াসে কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফোকাস রয়েছে এবং এগুলিই বংশগত গুণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই ফোকাসগুলি কি কি পদার্থ দিয়ে তৈরী তা জানা সম্ভব হয় নি। এদের জৈব-রাসায়নিক সংযুতিও বের করা যায় নি। একটা বিষয়ে শুধু তাঁরা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছুতে পেরেছিলেন যে, বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে নির্ধারিত করে নিউক্লিয়াসের কতকগুলি মূল জটিল বস্তু—যেগুলিকে ক্রোমোসোম বলা হয়।

জীব-বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ্য করেন যে, বংশগত গুণাবলীর বাহক যে জীন্‌স্‌, সেই জীন্‌স্‌ বিশেষ ধরণের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশানু-ক্রমিক গুণগুলির সংক্রমণ ঘটায়। এই বিশেষ ধরণের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রোটিন ফার্মেণ্টেশন রিয়্যাকশন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগলো—তবে কি এই জীন্‌ প্রোটিন ফার্মেণ্টেরই অণু? লেবরেটরিতে বহু পরীক্ষা চালিয়েও এ-সম্পর্কে কোন রকম সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হলো না।

কিন্তু প্রোটিন যদি বংশগত গুণাগুণের বাহক না হয়, তাহলে এই গুণগুলির সংক্রমণ ঘটতে পারে একমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিডের দ্বারাই, আর কোন কিছুর দ্বারা নয়। কারণ, সব ক্রোমোসোমেরই মূল পদার্থ হলো মাত্র দুটি জিনিষ—নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিন। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল—নিউক্লিক অ্যাসিডও বংশগতির বাহক নয়। সেই সঙ্গে এও দেখা গেল—নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলির গঠন খুব সরল এবং নির্দিষ্ট একটা ছক মেনে চলে।

যাঁরা বংশানুক্রমিক গুণের আধার ও বাহক হিসাবে বিশেষ কোন একটা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস

করেন না, সেই ভাববাদী দার্শনিক আর তাঁদের সহযোগী বিজ্ঞানীরা তখন ফের সেই সব বস্তুর অতীত প্রাণ-শক্তির কথা তোললেন।

কিন্তু বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরাই দলে ভারী। তাঁরা এ-সম্পর্কে অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জানা গেল—গোড়াতে এই অ্যাসিডের আণবিক গঠন যতটা সরল আর নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা বলে মনে হয়েছিল, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। বিজ্ঞানীদের এই ধারণাই হলো যে, জীন্ হলো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি হলো এই—

নিউক্লিক অ্যাসিডগুলির মধ্যে একটিকে বলা হয় ডেস্‌অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড—সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। এই ডি. এন. এ-র অণুগুলিতে পরমাণুর সজ্জা বা অ্যাটামিক গ্রুপিং প্রত্যেক-বার একই রকমের হয় না। তাছাড়া, এর অণুর মধ্যে পরমাণুগুলির পরিবেশ বা ডিষ্ট্রিবিউশনও হয়ে থাকে অনিয়মিতভাবে; যেমন—উদ্ভিদ, মাছ, পাখী আর মানুষ—এই চার রকম প্রাণীর কোষ থেকে আলাদা করে নেওয়া চারটি আলাদা আলাদা ডি. এন. এ.-অণুর পরমাণুগুলি এক হলেও, পরমাণু-শৃঙ্খল বা অ্যাটামিক চেন্-এর বিন্যাস চারটির বেলায় চার রকমের এবং তাদের গঠন-সমাবেশও বিভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাণীর ডি. এন. এ-র আলাদা এবং নিজস্ব আণবিক সূত্র বা মলিকিউলার ফর্মুলা আছে। উপমা দিয়ে বলা যায়, এই ডি. এন. এ. যেন ইটের তৈরী বাড়ির মত, আর এর মৌল পরমাণুগুলি যেন ইট—এক একরকমভাবে ইট সাজিয়ে যেন এক-এক রকমের বাড়ি তৈরী করা হয়, প্রত্যেকটি বাড়ির স্থাপত্য আর ঘর-বারাণ্ডার বিন্যাস যেমন আলাদা রকমের হয়, অথচ ইট সেই একই রকমের, তেমনি মৌল পরমাণুগুলি এক হলেও প্রত্যেকটি প্রাণীর কোষের ডি. এন. এ-র আণবিক সূত্র বিভিন্ন।

সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ জীব-বিজ্ঞানীই আজ এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, এই ডি. এন. এ-ই বংশানুক্রমিক গুণাগুণীর ধারক ও বাহক; এটাই বংশগতির বস্তুভিত্তি।

এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পর জীব-বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন, কোন একটি প্রাণীর বংশানু-ক্রমিক গুণাগুণের সঙ্গে তার কোষের ডি. এন. এ-র রাসায়নিক গঠন-বিন্যাস আর আণবিক সূত্রের সম্পর্ক বের করবার কাজে। এই সম্পর্ক যে খুবই জটিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সম্পর্কের নিয়মাবলী সঠিক আর নিখুঁতভাবে বের করে সেই সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা অর্জনের পরে জীব-বিজ্ঞানে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে যাবে! সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ডি. এন. এ. তৈরী করে বিজ্ঞানীরা তখন ইচ্ছামত বিভিন্ন জীবের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং নতুন জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

বিশেষ একটি প্রাণীর কোষে ডি. এন. এ. আর পারমাণবিক গঠন-বিন্যাস যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে নানারকমের বিপাকীয় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তার ফলে প্রাণীটি সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন—ইদানীং ক্যান্সার রোগকে এরই ফল বলে মনে করবার মত কারণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলেও ডি. এন. এ. অণুর গঠন-বিন্যাসের রূপান্তর ঘটে এবং তারই ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত নানা রোগ দেখা দেয়; অর্থাৎ ডি. এন. এ. নিয়ে গবেষণার ফলে এসব সাংঘাতিক রোগের নির্ভরযোগ্য নিরাময়ের ব্যবস্থাও করা যাবে।

ভবিষ্যতে যে এই ডি. এন. এ-কে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরী করা যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাষীরা তখন কুমড়ার আকারের আপেল

ফলাবেন, অথচ সেই আপেলের স্বাদ-গন্ধ ও গুণের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। একই গোলাপ-গাছের দশটি গোলাপ ফুলে দশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, বর্ণ ও গন্ধ সৃষ্টি করা যাবে। অষ্ট্রিচ পাখীর মত বিরাট মুরগী আমাদের বাগানে চরে বেড়াবে। তাদের মাংসের স্বাদ আর কোমলতা মোটেই কমবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিস্ময়

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চক্ষুরোগ-চিকিৎসা বিভাগের অস্ত্রোপচার কক্ষে একটি অস্ত্রোপচারের কাজ চলেছে। এখানে চোখের উপর অস্ত্রোপচার যে কতবার হয়েছে তার হিসাব নেই। অসংখ্য লোক এখানে এসে তাদের দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেছে—আমি দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে অস্ত্রোপচারটি হচ্ছে, তার একটা বিশেষত্ব আছে। এই চক্ষুরোগ-চিকিৎসা বিভাগের পরিচালক ডাক্তার জারোমির বুরুজ্ আটান্ন বছর বয়সের একজন অন্ধের চোখে ফিলাতফ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করে অন্ধ লোকটির কর্ণিয়া বা অক্ষি-পটল (অক্ষিগোলকের সূক্ষ্ম আর স্বচ্ছ আবরণ) তুলে দিয়ে কর্ণিয়া জুড়ে দিয়েছেন। এই লোকটি চল্লিশ বছর আগে তার দৃষ্টিশক্তি হারায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে। সেই থেকে আজ চল্লিশ বছর ধরে সে এক অন্ধকার জগতে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই নৈরাশ্যভরা জীবনেও সে সুখ আর আশা খুঁজে পেয়েছে একজন মহিলার নিঃস্বার্থ প্রেম আর যত্নের মধ্যে। অন্ধ হয়ে যাবার দু বছর বাদে এই মহিলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়, আর সাঁইত্রিশ বছর ধরে সে তার জীবনের আশার আলোটি অনির্বাণ রাখে।

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অস্ত্রোপচার চলেছে। কোন কিছু নির্দেশ দেবার দরকার নেই—সুশিক্ষিত নার্সের দল খুব ভাল ভাবেই জানে, ঠিক কখন কোন্ জিনিষটা সার্জেনের হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত—যেন অনন্তকাল পরে অস্ত্রোপচার শেষ হলো, আসলে যেটা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র।

এর এক সপ্তাহ বাদে রোগীটির ঘরে এসে ঢুকলো একটি মেয়ে—উদ্বেগ আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছে তার চোখে-মুখে। রোগীটি শুয়ে আছে—এক ফালি কাপড়ে চোখ দুটি বাঁধা। মেয়েটি তার কাছে আসতেই রোগীর পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার বুরুজ্ কাপড়ের ফালিটা একটু তুলে শুধু বললেন—আপনার মেয়ে। রোগীকে তখন ফিস্‌ফিস্ করে বলতে শোনা গেল—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি! ডাক্তার বুরুজ্ আবার তার চোখ ঢেকে দিলেন কাপড়টা দিয়ে।

জীবনে এই প্রথম বাপ তার মেয়েকে চোখে দেখলো—তার জন্মের তেত্রিশ বছর বাদে। ইতি-মধ্যে তার এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সন্তানের জননী হয়েছে সে—আর অন্ধ জীবনের শেষ বছরটিতে এই নাতি-নাতনিই ভরিয়ে তুলেছে তার নিঃসঙ্গ জীবন—কারণ তার যে জীবনসঙ্গিনী স্নেহ-প্রীতিতে সাঁইত্রিশ বছর ধরে তাঁর অন্ধকার জীবনকে আলোয় উজ্জ্বল করে রেখেছিল, সে মারা গেছে এক বছর আগে।

প্রাগের প্লাষ্টিক সার্জারি ক্লিনিকে এনে একটা অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ি থেকে নামানো হলো দশ বছর বয়সের হেলেন-কে। মেয়েটির সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে সাংঘাতিকভাবে—দেখে মনে হচ্ছে, পোড়া মাংসের

একটি পিণ্ড। পরীক্ষা করে ডাক্তারেরা বোঝলেন, এরূপ ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ব্যবস্থা হয়ে গেল তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে। ডাক্তার ফ্রান্তিসেক বুরিয়ান নিজে তার ভার নিলেন; সর্বক্ষণ পালা করে জেনের চিকিৎসা চালালেন ডাক্তার আর নার্সের দল। তারপর পঁয়তাল্লিশ বার তার দেহে রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, কয়েক শত গ্রাম অতি মূল্যবান সব পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তার শরীরের মধ্যে। দু'দিন পর্যন্ত যখন জেন বেঁচে রইল তখন খুব একটা ভরসা পেলেন ডাক্তার বুরিয়ান। এর পরে ১০৮ দিন ধরে রোজ দু'বার করে অতি সাবধানে তার দেহে একটুও নাড়াচাড়া না করে সম্পূর্ণ পরিশোধিত (স্টেরাইল) অবস্থায় তাকে ওষুধে স্নান করানো হতে লাগলো। তারপর ক্রমান্বয়ে তার মুখে আর দেহে কতকগুলি প্লাষ্টিক অস্ত্রোপচার (ক্ষত স্থানের চামড়া তুলে সেই জায়গায় নতুন চামড়া জুড়ে দেওয়া) করা হলো। তারপর বাড়িতে আর স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে জেনকে পুরা দেড় বছর ধরে চিকিৎসাধীনে রাখা হলো।

এই দেড় বছরে জেন প্রায় আগেকার মতই চেহারা ফিরে পেয়েছে—শুধু তার পিঠের উপরে একটা ছোট্ট পোড়া দাগ তাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয়, দেড় বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা—যে দিন বাড়ির উনুনে এক গাদা কাঠ জ্বালাবার জন্যে সে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে তাতে দেশলাইয়ের কাঠি ধরাতে গিয়ে নিজেই পোড়া কাঠে পরিণত হয়েছিল।

* * *

উপরে যে দুটি চিকিৎসার কথা বলা হলো, সেই দুটি ক্ষেত্রে মোট খরচ পড়েছে পাঁচ লক্ষ চেকো-শ্লোভাক ক্রাউনেরও বেশী। কিন্তু বলা বাহুল্য, সব খরচ বহন করেছে রাষ্ট্র—কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার সব হাসপাতালেই জনসাধারণের রোগ-চিকিৎসা করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রত্যেকটি রোগীর রোগ ও চিকিৎসাব্যবস্থার বিবরণ যেমন রাখা হয়, তেমনি তার চিকিৎসার খরচপত্রেরও হিসাব রাখা হয়। কিন্তু সেটা চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। রোগীকে কখনও তার চিকিৎসার খরচ সম্বন্ধে ভাবনায় পড়তে হয় না।

বেতার-দূরবীক্ষণ, অনুবাদক যন্ত্র ও চালকহীন ট্রেন

বেতার-দূরবীক্ষণ, অনুবাদক যন্ত্র ও চালকহীন ট্রেন সম্পর্কে এ. ডব্লিউ. হ্যামলেট লিখিয়াছেন—বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে বৃটেন যে অপরিসীম উন্নতি করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি জিনিষের নাম করা যাইতে পারে—বিশ্বের বৃহত্তম বেতার-দূরবীক্ষণ, ইলেকট্রনিক অনুবাদক যন্ত্র এবং চালকহীন ভূগর্ভ রেলওয়ে।

বৃটেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম দুইটি বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন—একটি ম্যাঞ্চেস্টারের নিকটবর্তী জোড্রেল ব্যাঙ্কে; আর একটি অন্য ধরণের, কেম্ব্রিজে। তারকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে, মহাকাশে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও গ্যাসের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং বেতার-তরঙ্গের অদৃশ্য উৎস অনুসন্ধানের জন্য এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দুইটি নির্মাণ করা হইয়াছে। এই গুলির সাহায্যে মহাকাশের এত দূরবর্তী স্থান দেখা

যাইবে যাহা এযাবৎ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছিল।

জোড্রেল ব্যাঙ্কের দূরবীক্ষণটির সাহায্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। কেম্ব্রিজের দূরবীক্ষণটি লইয়া এখনও পরীক্ষাদি চালানো হইতেছে। ফলাফলের কথা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না; তবে এইটুকু বলা যায় যে, এই দুইটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ সম্পর্কে বহু নূতন অজ্ঞাত তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

ম্যাঞ্চেস্টারের বেতার-দূরবীক্ষণটির অতিকায় আকৃতি দর্শককে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া তোলে। ইহার বিরাট ইস্পাত-নির্মিত অবতল (concave) আয়নাটি ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুরানো যায়। গামলার মত আকৃতিবিশিষ্ট এই আয়নাটি এত বড় যে, ইহার ভিতরকার গাত্রে আসন করিয়া দিলে ১০,০০০ লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। কেম্ব্রিজের দূরবীক্ষণটি আরও বড়, কিন্তু দেখিতে অতটা চমকপ্রদ নয়। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ রেল লাইনের উপর বসানো থাকে এবং প্রয়োজনমত লাইনের উপর দিয়া চালানো হয়। ইহার আয়নাগুলি হইল অসংখ্য এরিয়েলের তার; ম্যাঞ্চেস্টারের আয়নাটির মত কোন অতিকায় নীরেট বস্তু নয়। সমস্ত যন্ত্রটি দেখিতে হইলে প্রায় এক মাইল হাঁটিতে হয়; সুতরাং এক নজরে ইহার সবখানি দেখা যায় না।

বৃটেনের তরুণ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় অনুবাদের কাজ করা যায়। যন্ত্রটি অবশ্য এখনও পরীক্ষা ও গবেষণার পর্যায়েই রহিয়াছে। যন্ত্রটির নির্মাতারা বলেন যে, এখন যেরূপ অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল লোকেরা সহজেই তাহার অর্থোদ্ধার করিতে পারেন; কিন্তু কাহাকেও দিতে গেলে শব্দগুলি একটু পরিমার্জিত করিয়া ও সাজাইয়া দিতে হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যন্ত্রটির আরও উন্নতি সাধন করিয়া উহার দ্বারা নিখুঁত অনুবাদ করাইয়া লওয়া হয়তো অসম্ভব হইবে না; কিন্তু তাহা করিবার বাস্তবিকই কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা আছে কিনা, বর্তমানে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।

ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিতে চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বৃটেনের জন্য একই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, যাহার ফলে বৃটেনের যে কোন স্থানের লোক নিজ টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাইয়া যে কোন স্থানের লোকের সহিত কথা বলিতে পারিবে। ব্রিস্টলে শীঘ্রই এইরূপ একটি এক্সচেঞ্জ খোলা হইবে যাহার ফলে ব্রিস্টলের ঐ এক্সচেঞ্জের লোকেরা বৃটেনের প্রধান প্রধান সহর-গুলির লোকের সহিত সোজাসুজি টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কারিগরী দক্ষতার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল—বৃটিশ ডাক বিভাগের চালকহীন ভূগর্ভ রেলওয়ে। ভূপৃষ্ঠের বহু নিম্নে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ডাকবাহী স্বয়ংক্রিয় ট্রেনসমূহ লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাচল করে। এই রেলওয়ের স্টেশনগুলি হইল সর্টিং অফিস। এই সকল অফিসেও এখন স্বয়ংক্রিয় সর্টিং-এর জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসানো হই-তেছে, যাহার ফলে নির্দিষ্ট আকারের খাম ব্যবহার করিলে পত্র লেখকদের ডাকমাশুল কম লাগিবে।

সূর্যকিরণ ও জীবন

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিদিন সূর্যের উদয় এবং প্রতি সন্ধ্যায় তার অস্তগমন দেখে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সূর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে তেমন একটা সচেতনতা লক্ষিত হয় না। কেবল বর্ষাকালে মেঘের আড়ালে দিনকতক সূর্যদেব যখন লুকিয়ে পড়েন তখনই আমরা সূর্যকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। শুধু ঐটুকুই মাত্র। অথচ সূর্য যে কতবড় বিস্ময়, কি আশ্চর্য তার শক্তি, তা বুঝিয়ে বলা যায় না। আদি অন্তহীন তার জীবনকাল, অক্ষয় অব্যয় তার শক্তি। বিজ্ঞান সঠিকভাবে আজও বলতে পারে নি, প্রচণ্ড তাপও আলোকের উৎস এই মহাপিণ্ডটি কিভাবে এবং কতদিন আগে জন্মগ্রহণ করেছে।

সৌরজগতের বাইরে যা আছে থাক, কিন্তু এক হিসাবে মনে হয়, সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই ভাগ্যবান; কারণ, এখানে এক বিচিত্র জীব-জগতের আবির্ভাব ঘটেছে। হয়তো মঙ্গলের মত কোন গ্রহে কোন বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। তবে খুব সম্ভব মানুষের মত বুদ্ধিজীবী প্রাণীর বিকাশ সেখানে সম্ভব নয়; কারণ, অন্যান্য গ্রহে হয় তাপ কম, নয় বেশী।

সূর্য যেমন আশ্চর্য্য বস্তু, আমাদের পৃথিবীও তেমনি। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, অন্যান্য গ্রহগুলির সঙ্গে সূর্য থেকে একদা আকস্মিকভাবে পৃথিবী ছিটকে বেরিয়ে এসে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তফাতে থেকে সূর্যের চতুর্দিকে প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে সুরু করেছে। যদিও পৃথিবীর সেই প্রথম জন্মদিনের সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তথাপি ভূস্তর গঠনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমুদ্র-জলে লবণ সঞ্চয়ের হিসাব, ইউরেনিয়ামের বিকিরণ নিঃশেষিত হবার ফলে সীসকের সৃষ্টি ও তার পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে জানতে পারা গেছে—আনুমানিক দুই বা তিন শত কোটি বৎসর পূর্বে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকে। বাষ্প তরল হয়ে এসে সরের মত আস্তরণ গড়ে ওঠে। নীচের গলিত বস্তুর আলোড়ন এবং ভূ-পৃষ্ঠের নানারকম জটিল ধরণের পরিবর্তনের ফলে পাহাড়-পর্বত, খাল-খন্দের সৃষ্টি হয়ে পৃথিবী ক্রমশঃ বর্তমান আকৃতি পরিগ্রহ করে। পৃথিবী সূর্য থেকে এমন একটা দূরত্বে এসে পড়েছিল যে, প্রাণের বিকাশ ও পুষ্টি-লাভ সে পরিবেশে সম্ভব ছিল। প্রাণের বিকাশ হতে গেলে জল, অক্সিজেন, কার্বন, আলো, তাপ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু অপরিহার্য। বাষ্পপিণ্ডরূপে পৃথিবী যখন সূর্য থেকে জন্ম নিয়েছিল তখন ঐ পিণ্ডের উপাদানের মধ্যেই ঐ সব মৌলিক পদার্থ-গুলি পৃথকভাবে বজায় ছিল। আলো ও তাপ জুগিয়ে আসছে সূর্য। ক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে এসে সূর্যকিরণের সাহায্যে কিভাবে এতগুলি মৌলিক ও যৌগিক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। তবে এটুকু বলা শক্ত নয় যে, অক্সিজেন যেমন আলাদাভাবে ছিল তেমনি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে জলীয় বাষ্পও প্রচুর পরিমাণে সেই মহাপিণ্ডের উপর সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বাষ্পরাশি ঠাণ্ডা হয়ে জলরূপে নিম্নভূমিগুলি ভরিয়ে সমুদ্ররূপে বিরাজ করতে লাগল। সূর্যকিরণের ক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করবার সময় হলো এবার। প্রখর কিরণ

বর্ষণে সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হতে লাগলো; বৃষ্টিপাতে সরস হতে লাগলো মৃত্তিকা, নদী-নালার জন্ম হলো, বাতাস বইতে লাগলো, অক্সিজেন প্রভৃতি সঞ্জীবনী গ্যাস পৃথিবীর আবহাওয়ায় ভর করে প্রাণের আগমন প্রতীক্ষায় রইলো। কিন্তু প্রথম প্রাণের বীজটি কিভাবে পৃথিবীতে এসে পড়েছিল অথবা সৃষ্ট হয়েছিল তা আজও বিজ্ঞানী-দের কাছে গবেষণার বস্তু। তাঁরা এটুকু মাত্র জেনেছেন যে, জীবদেহ কার্বনের একটি জটিল ধরণের যৌগিক পদার্থ মাত্র। কিন্তু প্রাণ বা চেতনা বস্তুটি কি, তা আজও জানা যায় নি। এইখানে বিজ্ঞান নীরব। তেরো লক্ষ পৃথিবীর সমষ্টির তুল্য প্রকাণ্ড সূর্যই যখন এতবড় পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের কাণ্ডটি ঘটাতে পারলো, অথচ কেবল প্রাণের বিকাশ ঘটলো অপর কোন শক্তির দ্বারা—একথা বিশ্বাস করবে তারাই, যারা সূর্যের অসীম শক্তির কথা বিস্মৃত হয়ে থাকে। মহাজগতের বুকে মনুষ্য বুদ্ধির অতীত কত কাণ্ড যে অহরহ ঘটে চলেছে, তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। পৃথিবীতে জীবোৎ-পত্তির সূত্রপাত সম্ভবতঃ সেই রকমেরই একটা ব্যাপার। হয়তো অনুকূল পরিবেশে পদার্থসমূহের রাসায়নিক মিশ্রণে নিতান্তই আকস্মিকভাবে প্রথম জীবসৃষ্টির সূচনা দেখা দিয়েছিল। জাগতিক ঘূর্ণনবেগ এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণই যে জীবদেহে চেতনার সঞ্চার করেছে, তা বিজ্ঞানীদের অজানা নয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ বস্তু আছে যার অণু-পরমাণুর-গঠন প্রণালীর মধ্যে মহজাগতিক ঘূর্ণন-চাঞ্চল্য বিদ্যমান নেই! তাই একথা ধারণা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, সূর্যই প্রথম জীব সৃষ্টি করেছিল এবং তার অস্তিত্ব বজায় রাখবার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অদ্ভুত উপায়ে জীবনধারা বইয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ কেউ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে প্রথম সৃষ্টির বীজ পৃথিবীতে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু এ অনুমান অসার প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে সাব-ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসকে চেতন ও অচেতন পদার্থের অন্তর্বর্তী অবস্থা বলে প্রমাণের চেষ্টা চলছে।

যাহোক, প্রাণ প্রকাশেরই অপেক্ষায় ছিল মাত্র। জেলীর মত এককোষী জীব নিজের অজ্ঞাতসারে বিবর্তনের পাকচক্রে এগুতে সুরু করলো। একথা খুবই বিস্ময়কর যে, নিজের দেহে আকৃতি প্রকৃতির কি পরিবর্তন ঘটছে, তা নিজের কাছেই অজ্ঞাত। কোন এক অজ্ঞাত বিধানে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে খাইয়ে কোটি কোটি বছর ধরে অনুন্নত জীব শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির ধাপে আরোহণ সুরু করলো। এই অপরিজ্ঞাত বিধানটি কার বা কোথা থেকে উদ্ভূত? এতটুকু চিন্তা না করেও আমরা সব কিছু কৃতিত্বের গৌরব তুলে দিতে পারি সূর্যের স্কন্ধে। প্রকৃতিকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে-ই খাপ খাইয়ে নিয়েছে জীব-জগৎকে। তাই বলা যায়, জীবনের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

সমুদ্র থেকে ডাঙ্গার উদ্ভব। সেই ডাঙ্গায় বৃষ্টিপাত ঘটানো, বাতাস বহানো, ফুল-ফল ধরানো, জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমকে বাঁচানো—এ সব কিছু সাধিত হচ্ছে সূর্যের কিরণজাল দ্বারা। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যও সূর্যকিরণের মধ্যে লুক্কায়িত। বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে জন্মের পর জীব ক্রমে পুষ্ট হয়ে ওঠে; সেই আবেষ্টনীই আবার তার দেহকে ক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়ে দেয়। সূর্যকিরণ একাধারে প্রাণসঞ্জীবনী, আবার প্রাণ-সংহারিনীও বটে—সৃষ্টি ও ধ্বংসের একাত্মীভূত প্রবল শক্তির ধারক ও বাহক। কেবলমাত্র সঞ্জীবনী-শক্তিই যদি পৃথিবীর উপর প্রযুক্ত হতো, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো, কল্পনা করা যায় না। বৈচিত্র্যের অভাবে পৃথিবীতে কোন জীবনই থাকতো না। কোটি কোটি বছর ধরে বসুমতী ফল-ফুল, শস্য ও জীব-জগৎ নিয়ে

প্রাণের অপূর্ব সমারোহ সাজিয়ে বসে আছে চির নতুনভাবে। স্থবিরা অথচ অনন্ত যৌবনা পৃথিবীর এ খেলা পুরনো হবে না কোন দিন।

সূর্য যে পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে তার সামান্যই আমরা পাই। মোট সূর্য-তাপের দু'শো কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে পৌছায়। বড় একটা পাঁচ হাজার ওয়াটের বাল্‌ব্‌ জ্বেলে একশোর গজ দূরে একটি সরিষা দানা স্থাপন করলে সেটি যে পরিমাণ আলোকিত হয়, হয়তো তার চেয়েও কম পরিমাণ আলো আর তাপ পৃথিবী সূর্য থেকে পেয়ে থাকে। পরিমাণ অতি সামান্য হলেও সারা পৃথিবী যেটুকু তাপ সূর্য থেকে আহরণ করে তা যদি একত্র করা সম্ভব হতো, তাহলে এক মিনিটে দশ লক্ষ মণ জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠতো। আলোর সঙ্গে তাপও সূর্য থেকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে (প্রতি সেকেণ্ডে) ছুটে এসে পৃথিবীতে পড়ে। প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীন অভিজ্ঞতায় এর মাহাত্ম্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না সব সময়। অথচ কিছুকাল যদি এই সূর্যকিরণের অভাব ঘটে, সারা পৃথিবী তাহলে মৃত বলে গণ্য হবে।

পৃথিবীতে ভূভাগের পরিমাণ আপেক্ষিক তুলনায় নিতান্ত নগণ্য হলেও জীব-জগতের পক্ষে তা যথেষ্ট। জীবনধারণের জন্যে জল ও বাতাসের প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড সূর্যকিরণ সম্পাতে প্রভূত জলরাশি বাষ্পাকারে উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। সেখানেও সূর্যের মহিমা। স্থলভাগ সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত, তাই বায়ুও উত্তপ্ত। আলো বা তাপ প্রতিহত না হলে ফলপ্রসূ হয় না। তাই কোটি কোটি মাইল বিচরণ পথের মাধ্যমকে বিন্দুমাত্রও আলো বা তাপ না বিলিয়ে চলে আসছে তার তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে। তাই পৃথিবী-পৃষ্ঠ ছেড়ে উপর দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যাবে, ততই বাতাস হবে পাতলা এবং ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা পেয়ে জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে পরিণত হয়। আবার পৃথিবী-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী স্থলবিশেষে সূর্যকিরণ সম্পাতজনিত তাপের বৈষম্য ঘটে। উত্তাপে বায়ুর গাঢ়তা লঘু হয় এবং সে কারণে চাপও হ্রাস পায়। যেখানে সূর্যের উত্তাপ বেশী লাগে, সেখানকার বায়ুর চাপ কমে যাওয়ার ফলে তা উর্ধ্বদিকে উঠতে থাকে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ শীতল বায়ু ঐ স্থান অধিকারের চেষ্টা করে। এভাবে বায়ু সতত প্রবাহিত হতে থাকে এবং সেই বায়ু-প্রবাহ মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেই বৃষ্টি নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ভরিয়ে তোলে। ফল-ফুল ও শস্য গজায়, অরণ্যসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র জীব-জগৎ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

বায়ুপ্রবাহের ফলেও জীব-জগতের যথেষ্ট উপকার হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যের জন্যে মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন। বাতাস যদি নড়াচড়া না করতো তাহলে জীব বেঁচে থাকতো না। অবিরাম বায়ু-প্রবাহ দূষিত বায়ু উড়িয়ে নিয়ে প্রাণদায়ী অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা করে।

বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের ফলে প্রকৃতির আর এক লীলা উদ্ভিদ রাজ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ শুধু বৃষ্টিপাত আর বায়ুপ্রবাহের ফলেই বাঁচে না। তাদের প্রয়োজন অঙ্গারের। জীব-দেহেরও মূল উপাদান অঙ্গার। তবে সেই অঙ্গার আহরিত হয় উদ্ভিদ থেকে। মাংসাশী জীব উদ্ভিজ্জ পদার্থ গ্রহণ করে না; তবে তাদের খাদ্যবস্তু উদ্ভিদভোজী প্রাণী। উদ্ভিদ সরাসরি অঙ্গার গ্রহণ করতে পারে না—তাদের তৈরী করতে হয়। গাছের পাতার সবুজ কণা সূর্যকিরণের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করবার শক্তি রাখে। সবুজ পাতা অঙ্গারাম্ল গ্যাস থেকে অঙ্গার গ্রহণ করে' অক্সিজেন ত্যাগ করে। সেই অক্সিজেন জীব-জগতের কাজে লাগে। উদ্ভিদ এই কাজটি না করলে জীব-জগতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত। আবার অঙ্গাররূপে

পরিণত বৃক্ষের কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রাণীরা গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। প্রাণীদের দেহের কার্বন মূলতঃ আসে উদ্ভিদ থেকে। জীবদেহের মলমূত্রাদি বা দেহাবশেষ উদ্ভিদের পুষ্টি সাধন করে। এভাবে উদ্ভিদ ও জীব-জগৎ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে বেঁচে আছে। এরা একে অপরের পরিপূরক।

এর পরের কথা হলো—তাপ। সূর্যই সব রকম তাপশক্তির উৎস। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে যে সব কৃত্রিম তাপ ও আলোক-শক্তি সৃষ্টি করেছেন, তাদের আদি ও মূল উৎসের সন্ধান করলে আমরা সেই সব শক্তির কেন্দ্রস্থল সূর্যকেই পাই। উদ্ভিদ সৃষ্টির মূলে সূর্যকিরণ কতখানি কার্যকরী তা আগেই বলেছি। অতীতের বনসম্পদ মাটি চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে। সেই কয়লা এবং কয়লার বাই-প্রোডাক্ট দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার কতখানি সহায়তা হয়ে থাকে, তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। খনিজ তৈল সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে জল-শক্তিকে কাজে লাগানো হয় তাও বৃষ্টিপাত এবং নদী-প্রবাহের উপর নির্ভর করে। অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম সহায়ক। এগুলি হলো সূর্যকিরণের পরোক্ষ ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া যা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করি তা হলো ঋতুপরিবর্তন। সম্বৎসর ধরে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর সুশৃঙ্খল চক্রাবর্তন। কোথাও যতিপাত নেই, ছন্দ পতন নেই। ক্রান্তি বলয়ে গমনাগমনজনিত সূর্যের অয়ন ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে কোন গোলার্ধে গ্রীষ্ম, কোন গোলার্ধে শীত। এই গ্রীষ্ম ও শীত উভয়েরই প্রয়োজন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ যে শুধু বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের সহায়তা করে তাই নয়, ভূপৃষ্ঠের ক্লেদরাশিকে ধ্বংস করে নতুন প্রাণ-বিকাশেরও সহায়তা করে। সমগ্র পৃথিবীতে জল-বায়ুর সমতা রক্ষিত না হওয়াও একটা মঙ্গলজনক নিয়ম। গ্রীষ্ম ও শীতের মত অপরাপর ঋতুও তাদের মাঙ্গলিক উপচার নিয়ে গোটা জীব-জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সূর্য থেকে আলো ও তাপ আসা বন্ধ হয়ে গেলে গোটা পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যেত।

সূর্যরশ্মির মধ্যে রয়েছে অতি শক্তিশালী আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি। এই আলট্রাভায়োলেট রশ্মি জীব-জগতের, বিশেষ করে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকে। পৃথিবীর উপরে বহুদূরব্যাপী বায়ুর চাদর বিছানো থাকবার ফলে এই রশ্মির তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যায়। পৃথিবীতে এই রশ্মি এমন পরিমিতভাবে এসে পৌছায় যে, জীব-জগতের মৃত্যুর কারণ না হয়ে তা উপকারই করে থাকে। রোগজীবাণু, যারা অদৃশ্য অবস্থায় থেকে সর্বদাই মানুষের ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় রত, সেগুলি সূর্যকিরণের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যায়। এমন রোগজীবাণু খুব কমই আছে যারা সূর্যকিরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। দূষিত জলও সূর্যকিরণের সংস্পর্শে জীবাণুমুক্ত হয়। জীবাণু-বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের পক্ষে কোনদিনই সারা বিশ্বকে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হতো না। কেবল জীবাণু ধ্বংসই নয়, সূর্যকিরণের এমন একটা শক্তি আছে যা সর্বপ্রকার দুর্গন্ধকে অল্প সময়ের মধ্যে নাশ করতে পারে।

তাছাড়া সূর্যকিরণে রয়েছে ভিটামিন-ডি। উন্মুক্ত গাত্রে সূর্যকিরণ সেবন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। অবশ্য বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান ফুস্-ফুসের যক্ষ্মারোগীদের সরাসরি সূর্যকিরণ সেবন নিষেধ করে থাকেন।

পুস্তক পরিচয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী—অধ্যাপক অমিতাভ সেন। প্রকাশক—শ্রীঅমিতাভ সেন। ১৮।৩ ফার্ণ রোড, কলিকতা-১৯। প্রাপ্তিস্থান—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিমিটেড; ১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃঃ ১০৭। মূল্য দুই টাকা।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানব-সভ্যতার যখন শৈশবাবস্থা তখন থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ জ্যোতিষ্কদের বিষয় জানবার চেষ্টা করে এসেছে। তখন থেকেই সুরু হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার গোড়াপত্তন। প্রথমে যাঁরা মানুষের চিরাচরিত ধারণার ব্যতিক্রম কোন কিছু বলেন, তখনই তাঁদের পক্ষে ও বিপক্ষে সৃষ্টি হয় নানা রকম মতবাদ। এই কারণেই প্রাচীন জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকের জীবনে এসেছে নানারকম সংঘাত। অবশেষে জয়ী হয়েছে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতবাদ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক পাশ্চাত্যের মনীষীদের জীবনকাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতি-বিজ্ঞানের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে, আর সেটা যুদ্ধ বা সমাজবিপ্লবের ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশে তুচ্ছ নয়। প্রাচীন বিজ্ঞানকে জানতে হলে প্রয়োজন বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করা। আজ বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে যেমন সভ্যতা অচল, তেমনি একথাও সত্য যে, জ্যোতিবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ। লেখক খৃষ্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে চীন, মিশর প্রভৃতি দেশের জ্যোতিবিদ্যা অনুশীলনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে বর্তমান শতাব্দীর মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনে এসে সমাপ্তি টেনেছেন। সহজ সরল কথায় লেখক বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ বর্ণনা করেছেন—কোথাও বা সরল চিত্রাঙ্কনের সাহায্য নিয়েছেন, বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রাঞ্জল করবার জন্যে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লেখক আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত এবং সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য আপেক্ষিকতাবাদের বক্তব্য সহজভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। তবে আলোচনা আরও বিস্তৃত হলে ভাল হতো।

বইখানি পড়ে আনন্দের সঙ্গে দুঃখ হলো এই ভেবে যে, লেখক বাংলা দেশের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রাচীন ভারতের কোন জ্যোতিবিদের জীবনকাহিনী এবং তাঁদের গবেষণার কথা শোনালেন না। যাহোক, বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও সর্বশ্রেণীর পাঠকেরাই বইখানি পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করবেন বলে আশা করা যায়। এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, প্রচ্ছদপট সুরুচিপূর্ণ। অ. ম.

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই অধিবেশনের মূল ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ডাঃ এ. এল. মুদালিয়ার
মূল সভাপতি

ডাঃ মুদালিয়ার ১৮৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি কলা ও ভেষজ-বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট হন এবং ১৯২২ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বৃটেনের রয়েল কলেজ অব অবষ্টেট্রিক্‌স্‌ অ্যাণ্ড গাইনকোলজী এবং ১৯৪০ সালে আমেরিকান কলেজ অব সার্জন্‌স্‌-এর ফেলো নির্বাচিত হন। স্বীয় বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে অবষ্টেট্রিক্‌স্‌ ও গাইনকোলজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৩৪-'৩৮)। পরে ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৪২ সালের অগাষ্ট মাস হইতে অদ্যাবধি তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯২৯, ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৮ ও ১৯৫৩ এই পাঁচ বৎসরের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং ভারতের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন (১৯৪৮-'৪৯)। তিনি অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কাউন্সিলের (পরে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া) প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৩১) হইতেই সদস্য আছেন। তিনি ভোর কমিটির একজন সদস্য। তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং কাউন্সিল অব্‌ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল

ডাঃ এ. এল. মুদালিয়ার
মূল সভাপতি

এডুকেশন-এর সদস্য। তিনি দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক কমিটি এবং মাদ্রাজ ইনষ্টিটিউট অব্‌ টেক্‌নোলজীর পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান

এবং ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স-এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৪৬ সালে সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এবং ১৯৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের তিনি যথাক্রমে সদস্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং ইউনেস্কোর (U.N E.S.C.O.) জন্য স্থাপিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের সদস্য।

তিনি একাধিক বার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ও নেতা হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫১-'৫৬ সালে ইউনেস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধিদলেরও একজন সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৪-'৫৬ সালে ইউনেস্কোর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতিরও সদস্য ছিলেন (১৯৪৮-'৫৮)।

ডাঃ মুদালিয়ার নিম্নোক্ত ডিগ্রিগুলি লাভ করিয়াছেন—এল-এল. ডি. (সিংহল) ১৯৪২, ডি.এস-সি. (অন্ধ্র, পাটনা, লক্ষ্ণৌ ও উড়িস্যা), ডি.সি.এল (অক্সফোর্ড) ১৯৪৮, এল-এল. ডি. (গ্লাসগো) ১৯৫১, ডি লিট (আন্নামালাই) ১৯৫৫, ডি.এস-সি (কলিকাতা) ১৯৫৭ ও এল-এল. ডি. (মন্ট্রিল) ১৯৫৮।

তিনি ১৯১৬ সাল হইতে মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য আছেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই অগাষ্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

ডাঃ এম. রায়

সভাপতি—গণিত শাখা

ডাঃ রায় ১৯০৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান জেলায় নরসিংগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২৮ সালে বি. এস-সি পরীক্ষায় গণিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এস-সি পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বৎসর সমস্ত এম. এ ও এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ

ডাঃ এম. রায়
সভাপতি—গণিত শাখা

করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গোসেইন স্কলারের সম্মান দান করে।

১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ডাঃ রায় ফলিত গণিত বিভাগে রিসার্চ স্কলার ছিলেন এবং অধ্যাপক এন. আর. সেনের অধীনে হাইড্রো-ডাইনামিক্স সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯৩৬ সালে গণিতের সহকারী অধ্যাপকরূপে লাহোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজে যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ফ্লুইড ডাইনামিক্স সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি

ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি আগ্রা কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তিনি বর্তমানে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্ সায়েন্স-এর ডীন পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ফ্লুইড ডাইনামিক্সের সমস্যা সম্বন্ধে অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ এ. কে. দত্ত
সভাপতি—পদার্থ-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ দত্তের পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের তেওতিয়া গ্রামে। ডাঃ দত্তের পিতামহ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চন্দ্রকুমার দত্ত সেকালের একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ডাঃ দত্তের পিতা স্বর্গীয় ভূপালকুমার দত্ত ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর লেকচারার ছিলেন এবং পরে অন্য কাজে যোগ দেন।

ডাঃ দত্ত ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ তিনি বি. এস-সি এবং ১৯২৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর কলেজে লেকচারার হিসাবে কাজ করিবার পর তিনি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্গীয় এম. এন. সাহা, এফ. আর. এস-এর অধীনে ডাঃ দত্ত গবেষণায় নিযুক্ত হন। মলিকিউলার স্পেক্ট্রোস্কোপি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার পর তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বার্লিনের কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনষ্টিটিউটে পোষ্ট-ডক্টরেট ফেলো হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রোফেসর ডিবাইয়ের অধীনে আলট্রাসনিক্স্ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৩৮ সালে প্রত্যাবর্তন করিয়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪২ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। পরে ১৯৪৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসাবে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য বলা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ না করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার হিসাবে যোগদান করেন।

ডাঃ এ. কে. দত্ত
সভাপতি—পদার্থ-বিজ্ঞান শাখা

১৯৫১ সালে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার ময়ূরভঞ্জ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি একখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ দত্ত ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ১৯৪৫ সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো নির্বাচিত হইয়া-

ছেন। আমেরিকার গুগেনহাইম মেমোরিয়াল ফেলোসিপ কমিটি ডাঃ দত্তকে উক্ত ফেলোসিপের একজন রেফারী মনোনীত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ১৯৫১ সালে রোমে অনুষ্ঠিত আলট্রাসনিক্‌স্ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডাঃ দত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক এস. আর. পালিত

সভাপতি—রসায়ন শাখা

অধ্যাপক এস. আর. পালিত কলিকাতায় ১৯১২ সালের ২৪শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে রসায়নে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশুদ্ধ

অধ্যাপক এস. আর, পালিত
সভাপতি—রসায়ন শাখা

রসায়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৬-৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে রসায়নের লেক্‌চারার ছিলেন এবং ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিহারের নামকুম ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এইখানে গবেষণা করিয়া তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। ১৯৪৫-'৪৬ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গীয় অধ্যাপক জে. ডব্লু. ম্যাকবেইন এফ. আর. এস-এর সহযোগীরূপে গবেষণা করিয়া মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬-'৪৭ সালে তিনি নিউইয়র্কের পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউট অব্ ব্রুকলিনে অধ্যাপক এইচ. মার্কের সঙ্গে গবেষণা করেন।

অধ্যাপক পালিত লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব্ কেমিষ্ট্রি ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স অব্ ইণ্ডিয়া-র ফেলো। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত জুরিক কংগ্রেস ও সম্মেলনে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তিনি ১৯৫৮ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে যুক্তরাজ্য ও ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

ডাঃ পালিত ১৯৪৭ সাল হইতে কলিকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির ভৌত-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় গবেষণামূলক অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ এস. সি. চ্যাটার্জী

সভাপতি—ভূবিদ্যা ও ভূগোল শাখা

ডাঃ এস. সি. চ্যাটার্জী ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৬ সালে ভূবিদ্যায় অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূবিদ্যা গবেষণাগারে স্বর্গীয় অধ্যাপক এইচ. সি. দাশগুপ্তের অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি পাটনা কলেজে ভূগোলের লেক্‌চারার হিসাবে যোগ দেন। কুড়ি বৎসর তিনি ভূগোলের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডাঃ চ্যাটার্জীর পরিচালনায় ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি-

ডাঃ এস. সি. চ্যাটার্জী
সভাপতি—ভূবিদ্যা ও ভূগোল শাখা

ক্যাল লেবরেটরীতে স্বর্গীয় অধ্যাপক বিশ্বাসের অধীনে তিনি ভূবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় প্রভূত সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথম ভূবিদ্যায় ডি. এস-সি ডিগ্রি পান। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স অব্ ইণ্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি পাটনা বিজ্ঞান কলেজের নবসৃষ্ট ভূবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার জে. এন. টাটা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ববিদ্ সমিতির সদস্য এবং জিওলজিক্যাল মাইনিং অ্যাণ্ড মেটালার্জিক্যাল সোসাইটির ফেলো। ডাঃ চ্যাটার্জী জিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

অধ্যাপক আর. মিশ্র

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার ডোবি নামক গ্রামে ১৯০৮ সালের ২৪শে অগাষ্ট অধ্যাপক মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারানসী সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল (১৯১৮-'২৫), কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৫-'৩১) এবং যুক্তরাজ্যের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-'৩৭) শিক্ষালাভ করেন। তিনি কাশী হিন্দু বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে

অধ্যাপক আর. মিশ্র
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

ডেমনষ্ট্রেটর (১৯৩১-'৩৯) এবং সহকারী অধ্যাপক (১৯৩৯-'৪৬) হিসাবে কাজ করেন। তিনি ভাগলপুরের টি, এন, জে কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধানরূপেও কাজ করিয়াছিলেন (১৯৩৯-'৪১)।

ইহার পর তিনি যথাক্রমে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান রীডার হিসাবে (১৯৪৬-'৫৫) কাজ করেন এবং ১৯৫৫ সাল হইতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক মিশ্র ছাত্র জীবনে সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানসূচক মালবীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যে অধ্যাপক ডব্লিউ. এইচ. পিয়ারসল, এফ.আর.এস-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিয়া বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব্ সায়েন্স হইতে গবেষণার জন্য বৃত্তি লাভ করেন।

তিনি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রাবস্থায় ১৯৩১ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁহার প্রথম মৌলিক নিবন্ধ পাঠ করেন। তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ল্যাণ্ট ইকোলজির একটি সংস্থা স্থাপন করেন। সেখানে গবেষণা করিয়া কয়েকজন ছাত্র পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধীনে কিছু সংখ্যক কর্মী পরীক্ষামূলক ইকোলজি ও ইকোলজি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন।

অধ্যাপক মিশ্র ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সেস (ইণ্ডিয়া), ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস (ইণ্ডিয়া) ও ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি ১৯৫৮ সালে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের জীববিদ্যা বিভাগের এবং ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সহিত তিনি যুক্ত আছেন। তিনি একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ডাঃ বি. এস. ভিমাচার

সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডাঃ ভিমাচার ১৯০৬ সালে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের প্রথম ভাগ ব্যাঙ্গালোরে অতিবাহিত হয়। ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী-বিদ্যার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। মৎস্য-চাষ সম্পর্কে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া তিনি উন্নত পন্থায় মৎস্য-

ডাঃ বি. এস. ভিমাচার
সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

চাষ এবং সেই সম্পর্কে গবেষণার জন্য মহীশূরে নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি.এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া ১৯৪৭ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেন। এখানে তিনি মৎস্য-চাষ সম্পর্কিত জীব-তাত্ত্বিক গবেষণা চালান। ১৯৫৩-'৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের লোয়েষ্টফ্‌ট্ মৎস্য গবেষণা-কেন্দ্রে কাজ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের মৎস্য এবং সামুদ্রিক জীব বিষয়ক গবেষণা-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি ১৯৫৪ সাল হইতে কলিকাতার

সেন্ট্রাল ইন্‌ল্যাণ্ড ফিসারীজ রিসার্চ ষ্টেসনের চীফ রিসার্চ অফিসার পদে নিযুক্ত আছেন।

তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সেস, ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস ও জুয়োলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার ফেলো এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। কলম্বোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এফ.এ.ও-র ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীর মৎস্য গবেষণা পরিষদের সভায় তিনি সরকারীভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রী পি. জি. পাণ্ডে

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

শ্রী পাণ্ডে ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলাহাবাদ, ইউয়িং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে প্রাণিবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এস-সি এবং উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে উত্তর প্রদেশ
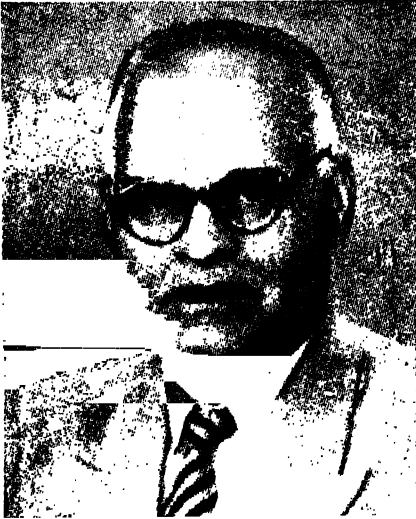
শ্রী পি. জি. পাণ্ডে
সভাপতি—চিকিৎসা পশু-চিকিৎসা শাখা

সরকারের বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি লণ্ডনের রয়েল ভেটারিনারী কলেজে যোগদান করেন। এম. আর. সি ভি. এস. ডিপ্লোমা লাভ করিয়া তিনি ১৯৩৩ সালে আসাম সরকারের পশু-চিকিৎসা সম্পর্কিত কার্যে নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের কার্যে যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের পশু ও মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। গুরু দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি গৃহপালিত পশুর রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি পশু-রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বহু জটিল পশু-রোগের কারণ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পরজীবী তত্ত্ব, ও প্যাথোলোজি সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। উত্তর প্রদেশের পশু-প্রজনন ও চিকিৎসা কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি ইজ্জতনগরের (মুক্তেশ্বর) ভারতীয় পশুগবেষণা-কেন্দ্রের ডিরেক্টর।

ডাঃ বি. কে. কর

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ বৈকুণ্ঠকুমার কর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ পারিজার সহকারী হিসাবে গবেষণায় যোগদান করেন।

জার্মেনীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ডাঃ কর জার্মেনীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুসে অ্যাকাডেমিক স্কলার মনোনীত হন এবং সেখানে অধ্যাপক রুল্যাণ্ড ও ডাঃ এফ. ব্যাকম্যানের অধীনে গবেষণা করিয়া পি-এইচ. ডি ডিগ্রি পান। জার্মেনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডাঃ কর ১৯৩৮ সালে কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ফেলো হিসাবে গবেষণায় যোগদান করেন। তিনি এখানে আট বৎসরেরও বেশী গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও অধিনায়কের পদে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির পাট গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেন। তিনি ২৫ বৎসরাধিক কাল শস্যাদির শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং এই

ডাঃ বি. কে. কর
সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ৯ বৎসরাধিক কাল পাট সম্পর্কে গবেষণা করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ এ. পি. বেনওয়ারি
সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

ডাঃ বেনওয়ারি ১৯১৭ সালের ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে কে. জি. মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররূপে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিত্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট (এম. বি. বি-এস) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিত্যালয়ে শারীরবৃত্তের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি লাহোরের বি. আর মেডিক্যাল কলেজে শারীরবৃত্তের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে ডাঃ বেনওয়ারি অনার্সসহ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। জয়পুরের এস. এম. এস. মেডিক্যাল কলেজে দুইমাস সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিবার পর তিনি বিহারের দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবৃত্তের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি গোয়ালিয়রের জি. আর. মেডিক্যাল কলেজে শারীরবৃত্ত ও

ডাঃ এ. পি. বেনওয়ারি
সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

জৈবরসায়ন বিভাগের অধিনায়ক এবং অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানেও তিনি উক্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪৮-'৪৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শারীরবৃত্ত বিভাগের রেকর্ডার নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পুষ্টি, পরিপাক ও সঞ্চালন সম্পর্কিত শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি বিশেষ উৎসাহী। এই সম্বন্ধে তিনি অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রী ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

শ্রীকৃষ্ণস্বামী ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূবিদ্যায় এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মাইনিং অ্যাণ্ড মেটালার্জি ইনষ্টিটিউট, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিদ্যা বিভাগে লেক্‌চারাররূপে কাজ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসাবে মাদ্রাজ সরকারী যাদুঘরে গবেষণায় যোগদান করেন। মাদ্রাজের চতুর্দিকে যে সকল আদি প্রস্তর যুগের স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেই সকল স্থানের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে

শ্রী ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

তিনি গবেষণা করেন। ১৯৩৬ সালে কাশ্মীরের ডি টেরা প্লেইষ্টোসিন ভূবিদ্যা সম্পাকত গবেষণায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এম. সি. বারকিট এবং ১৯৩৬-'৩৭ সালে ফ্রান্সের সরবোনে Abbe' Breuil-এর অধীনে গবেষণা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করেন।

১৯৪৬ সালে তিনি প্রথম কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রাকইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি নয়া দিল্লীর আর্কিয়োলজি ইন ইণ্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ডাঃ এম. দত্ত

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

ডাঃ দত্ত ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি গণিতে অনার্সসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৭ সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংল্যাণ্ডে উচ্চতর শিক্ষার্থে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিলাভ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টেক্‌নোলজিতে এম. এস-সি ডিগ্রি পান।
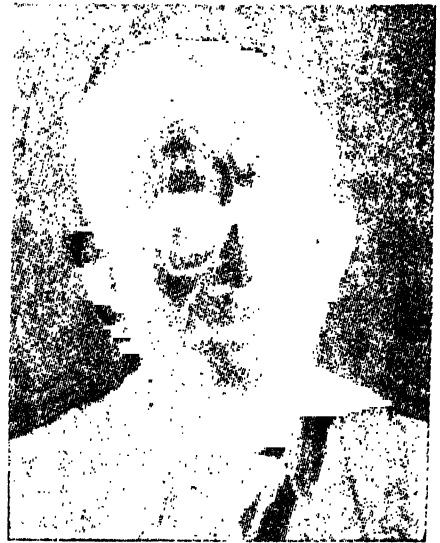
ডাঃ এম. দত্ত
সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

বিদ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ভারত সরকার ডাঃ দত্তকে যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি সেখানে এডিনবরা কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক বিভাগে এবং সাউথ ওয়েল্‌স্ পাওয়ার কোম্পানী অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করেন। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বৃত্তি পাইয়া ইংল্যাণ্ডে

গমন করেন এবং ১৯৫০ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ডাঃ দত্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৈদ্যুতিক পর্ষতের চিফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ এস. জালোটা

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ জালোটা ১৯০৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী কর্পূরতলার (পূর্বের দেশীয় রাজ্য) ফাগওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে

ডাঃ এস. জালোটা
সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কলেজ ত্যাগ করেন এবং তাঁত ও বয়ন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি লাহোর ডি. এ. ভি কলেজে ভর্তি হন। মনস্তত্ত্বে অনার্স সহ লাহোরের এফ. সি. কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় স্বর্ণ-পদক লাভ করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে তিনি দর্শনে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মী নির্বাচনী সংস্থার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি টাটা কোম্পানীতে মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে কাজ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৯ সালে এবং ১৯৫০ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত সদস্য হিসাবে যুক্ত আছেন।

শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশুদ্ধ গণিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষাজীবনে তিনি কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-সৃষ্ট পরিসংখ্যান বিভাগে তিনি লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি বিহার সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি পুনরায় ইণ্ডিয়ান-ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে সিনিয়র প্রোফেসর নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে সেই পদেই কাজ করিতেছেন।

গাণিতিক পরিসংখ্যান সম্বন্ধীয় গবেষণায় তিনি বিশেষ উৎসাহী। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি অনেক গবেষণামূলক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবন্ধের ব্লকগুলি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। স.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৫৯

১২শ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা
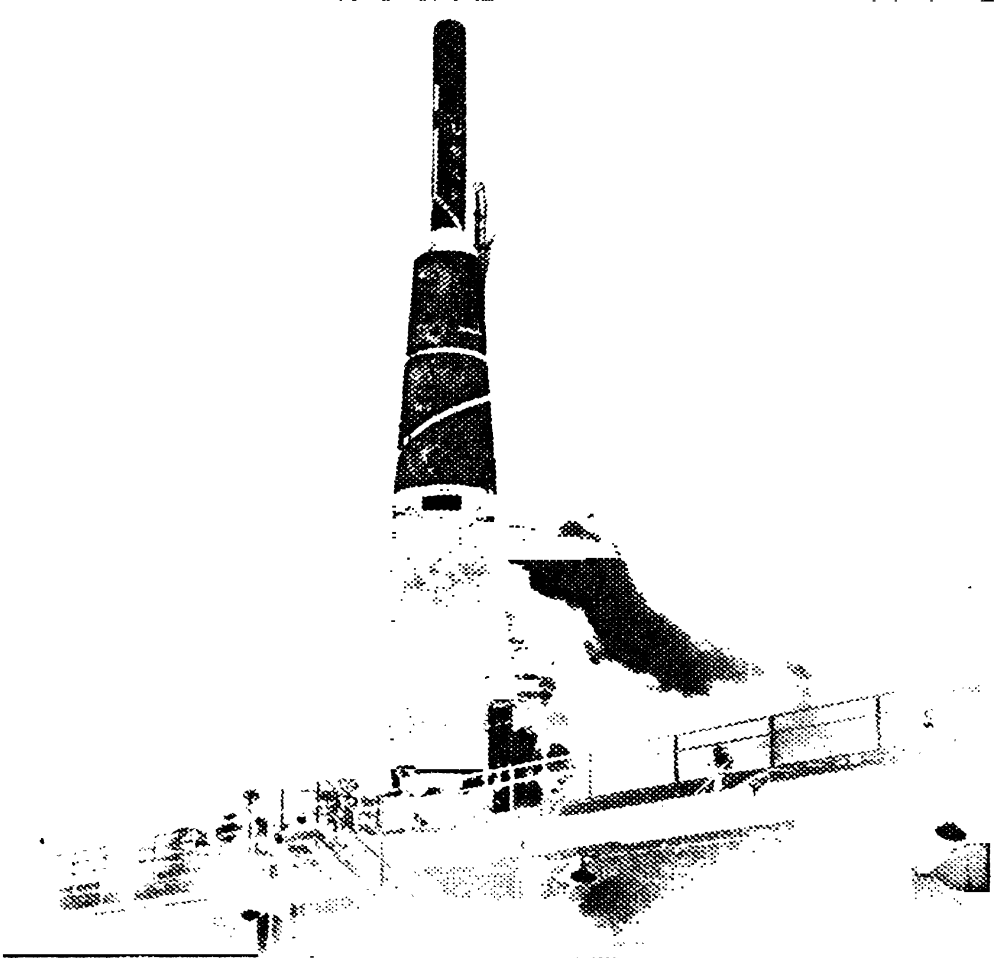
থর-এবল্ রকেট 'পাইওনিয়ার' নামক যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহটিকে ৭৯,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে।

সুরুর সুরুতে

পৃথিবীর জন্ম হলো কেমন করে ?

মোটামুটিভাবে হয়তো অনেকেই জান এর উত্তর; কিন্তু এটা জান কি যে, এর সম্পূর্ণ ও সঠিক উত্তর আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, কারুর কাছেই। তবু যতটুকু জানা গেছে, সে সম্বন্ধে আজ তোমাদের কাছে আলোচনা করবো।

প্রায় দেড়শ' বছর আগে ফরাসী দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লাপ্লাস পৃথিবীর জন্মের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—শুধু পৃথিবীই নয়, সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছিল বিপুল পরিমাণ বাষ্প থেকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে মহাকাশে এই রকম বহু কুয়াশাচ্ছন্ন জায়গা দেখা যায়। মহাকাশের এই বিশাল বাষ্পরাশিকে নেবুলা বলে। লাপ্লাসের মতানুযায়ী এই নেবুলাই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার সময় মাঝে মাঝে বিরাট ঘন অংশ থেকে গিয়েছিল, যেগুলি ধীরে ধীরে আমাদের গ্রহসমূহের সৃষ্টি করেছিল। সূর্যকে নেবুলার মধ্যমণি বলে ভাবা হতো এবং সূর্য একটু একটু করে সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে বলে লাপ্লাস ভেবেছিলেন।

লাপ্লাসের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণা করে দেখলেন যে, নেবুলা থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে—এই মতবাদের বহু অসুবিধা আছে। বহু পরীক্ষিত সত্য মিথ্যা হয়ে যায় তাঁর নেবুলা মতবাদ মেনে নিলে। তবুও তাঁর সিদ্ধান্ত একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। কারণ তাতেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ছিল। সেগুলি হচ্ছে—

(১) প্রত্যেকটি গ্রহ তাদের নিজেদের মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘুরছে। সূর্য যেভাবে নিজের মেরুদণ্ডে ঘুরছে তারাও সেইভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(২) নিজের মেরুদণ্ডে ঘোরা ছাড়াও তারা সূর্যের চারদিকে একই দিকে ঘুরছে।

(৩) যে যে গ্রহের যতটা চাঁদ আছে (যেমন পৃথিবীর একটি, বৃহস্পতির বারোটি ইত্যাদি) তারাও ঐ একই দিকে ঘুরছে। অবশ্য দু-একটি চাঁদের ঘোরবার ব্যতিক্রম আছে, তাদের গুরুত্ব খুব কম। আর তাছাড়া তাদের ঐ রকম ব্যতিক্রমের কারণও বিশ্লেষিত হয়েছে।

লাপ্লাসের মতবাদ অনুযায়ী যে তিনটি সর্তের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে—লাট্টু, লেত্তি থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ঘুরতে থাকে, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহেরা যখন নেবুলা থেকে ছিট্‌কে বেরুলো, তারাও তেমনি ঘুরতে সুরু করলো। থামাবার মত কোন শক্তি না থাকায় ঘোরাটা কোনদিনই বন্ধ

হলো না। তাই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরপাক খেয়ে চলেছে—তো চলেছেই। এইভাবে আবার চাঁদ প্রভৃতি উপগ্রহগুলিও ঘুরছে—অবশ্য ভিন্ন গতিতে।

লাপ্লাসের মতবাদের সত্যতা বিচার করা যায় যখন আমরা ভাবি সূর্যে এত তাপ রয়েছে কেমন করে? তাপ বিকিরণ করছে সূর্য কোন্ অতীতকাল থেকে; কিন্তু কই তবু তো শেষ হচ্ছে না! হেল্‌ম্‌হোলৎস্ বলেছেন, সূর্য ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং তারই ফলস্বরূপ সে তাপ বিকিরণ করছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বহু আগে সূর্য এখনকার চেয়ে অনেক বড় ছিল। এ তো গেল মিলের কথা। এবার গরমিলের কথায় আসা যাক। বহু পরীক্ষিত সত্য, অথচ হাজার চেষ্টাতেও লাপ্লাসের মতবাদের সঙ্গে মেলে না। বড় বড় গণিতজ্ঞেরা তাঁদের গাণিতিক তথ্যের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত লাপ্লাসের মতবাদকে অচল বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রধান এবং মূল কারণ হলো—

সঙ্কোচনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার ক্ষমতা এত বেশী যে, সে তার সাহায্যে বহু বড় বড় তারা তৈরী হতে পারতো—এত ছোট ছোট গ্রহ তাতে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব এখন নতুন মতবাদে কি বলছে, আলোচনা করা যাক। লাপ্লাসের পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক নতুন মতবাদ যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে মহাকাশে এক বিরাট দুর্ঘটনার ফলে। এই রকম দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে। অসীম মহাকাশে আরও কোটি কোটি সৌরজগৎ থাকা বিচিত্র নয়! আবার আমাদের সৌরজগৎ ছাড়া আর একটাও না থাকাও সম্ভব। এটা অনুমানের ব্যাপার; তাই ঠিক করে বলা যায় না, আরও সৌরজগৎ আছে কিনা।

যাহোক, এই নতুন মতবাদে অনুমান করা হয়েছে যে, বহু বছর আগে (সংখ্যা দিয়ে যা কল্পনা করা যায় না) যখন আমাদের সূর্য এখনকার চেয়ে আরও বহুগুণ বৃহৎ আকারে আকাশে বিচরণ করতো তখন আর একটা বিরাট তারকা সূর্যের খুব কাছাকাছি এসেছিল। যে কোন দুটা জিনিষের মধ্যে সব সময় একটা আকর্ষণ শক্তি বিরাজ করে। এই শক্তি জিনিষ দুটির ভরের গুণফল এবং তাদের মধ্যের দূরত্বের বর্গের ভাগফলের আনুপাতিক হয়। অঙ্কে লিখলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—ধর, আকর্ষণী শক্তি হচ্ছে শ, জিনিষ দুটির ভর হচ্ছে ক ও খ, আর দূরত্ব হচ্ছে—দ, তাহলে উপরের সূত্রানুযায়ী—

$$\text{শ} \propto \frac{\text{ক} \times \text{খ}}{(\text{দ})^2}$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তারাটা সূর্যের কাছাকাছি আসবামাত্রই তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণী শক্তির আবির্ভাব হলো। যেহেতু সূর্যও খুব বড় এবং যে তারাটা এসেছিল

তাকেও খুব বড় বলে মনে করা হয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যেকার এই শক্তির পরিমাণ খুব বেশী হবে। তার উপরে মধ্যেকার দূরত্ব কম হলে তো আর কথাই নেই। দূরত্ব যত কম হবে, তার বর্গ কিছু দ্বারা বিভাজ্য হলে ভাগফলটা আরও বড় হবে। ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ৫-এর বর্গ কত? ২৫। দূরত্ব পাঁচ না হয়ে যদি চার হতো, বর্গ হতো কত? ষোলো। এখন যে কোন সংখ্যা—ধর ১০০, তাকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে হয় চার, আর ষোল দিয়ে ভাগ করলে ছয়ের কিছু বেশী হয়। সুতরাং দেখতেই পাওয়া গেল, দূরত্ব যত কমে দুটি জিনিষের মধ্যে, তাদের মধ্যেকার আকর্ষণী শক্তি তত বাড়ে।

এখন তারাটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তির সৃষ্টি করলো, যার ফলে সূর্যের গায়ের বড় বড় বাষ্পীয় অংশ ক্রমশঃ বড় হতে সুরু করলো। বড় হতে হতে তারা ধীরে ধীরে এক-একটা লম্বা চুরুটের আকার ধারণ করলো এবং টানাটানির ফলে এই লম্বা অংশটি সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই চুরুটাকৃতি অংশটি —যার ধারের দিক দুটা সরু আর পেটের দিকটা মোটা—সূর্যের চারধারে ঘুরতে সুরু করলো। তারপর অগণিত বছর পরে এইগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে কয়েকটা গোলাকৃতি পিণ্ডের আকার ধারণ করলো। এইভাবে গ্রহাদির জন্ম হলো।

প্রথম প্রথম এই গ্রহগুলি ডিম্বাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতো। এখন যদিও গ্রহগুলি গোলাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না, তবুও এই পথকে মোটামুটি গোলাকার বলা যায়। ডিম্বাকার পথে এই গ্রহগুলি যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতো এবং নিজেরাও একেবারে জড়পিণ্ডের আকার ধারণ করে নি, তখন তারা যে সময় সূর্যের কাছাকাছি আসতো তখন গ্রহ আর সূর্যের মধ্যে প্রচুর আকর্ষণী শক্তি দেখা দিত। এই গ্রহগুলি থেকে আবার কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে তার চারদিকে অন্য এক গতিতে ঘুরতে সুরু করলো। এইভাবে হলো উপগ্রহের জন্ম।

গ্রহগুলির জন্মরহস্য মোটামুটিভাবে এইরকম ধরে নেওয়া হয়েছে। যদিও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কিছু কিছু খুঁৎ বের করা যায়, তবুও গণিতজ্ঞেরা লাপ্লাসের ব্যাখ্যার চেয়ে এই ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ব্যাপার বলি। আগেই বলা হয়েছে যে, চুরুটের মত দেখতে বাষ্পীয় অংশের পেটের দিকটা মোটা ছিল। তাহলে পেটের দিকে অবস্থিত গ্রহগুলি অর্থাৎ মধ্যেকার গ্রহগুলির আকৃতিতে বড় আর মোটা হওয়া উচিত ছিল। বাস্তবিক তাই-ই হয়েছে। মধ্যেকার গ্রহগুলি, যেমন—বৃহস্পতি ও শনি অন্যান্য গ্রহদের অপেক্ষা অনেক বড়।

তাহলে মোটামুটি জানা গেল যে, পৃথিবী তার সুরুতে এক প্রচণ্ড গরম বায়বীয় পদার্থ ছিল। ধীরে ধীরে এই বায়বীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে তরল হলো তারপর ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে অনেকটা এখনকার মতই শক্ত হয়ে উঠলো। পৃথিবী যে এককালে এই

সব স্তর অতিক্রম করে এসেছে তা আজও বোঝা যায় নানা আগ্নেয়গিরির ব্যবহার লক্ষ্য করে। গরম দুধ রেখে দিলে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় উপরে একটা সর পড়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সরটা একবারে মসৃণ নয়, বেশ উঁচু-নীচু। পৃথিবীরও এই অবস্থা হলো। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর কোন অংশ খুব উঁচু হলো এবং এইভাবে জন্ম হলো পাহাড়-পর্বতের। হিমালয়, রকি পর্বতমালা ইত্যাদি সবারই জন্মবৃত্তান্ত মোটামুটি এই রকমের। আগে অবশ্য এসব পাহাড়-পর্বত আরো বেশী উঁচু ছিল, কিন্তু পরে ঝড়বৃষ্টি এবং আরো নানারকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এরা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগলো। নীচু অংশগুলিতে বৃষ্টি ইত্যাদির জল জমে সেখানে সৃষ্টি হলো বড় বড় সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি।

শ্রীঅলক চক্রবর্তী

জানবার কথা

১। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে অনেক সেতু ও খিলানের সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ এইগুলি মানুষের দ্বারা নির্মিত হয় নি। পৃথিবীতে এই জাতীয় সেতুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সেতু হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্রের উটা রাজ্যস্থিত রামধনু সেতু (সেতুটির আকৃতি অনেকটা
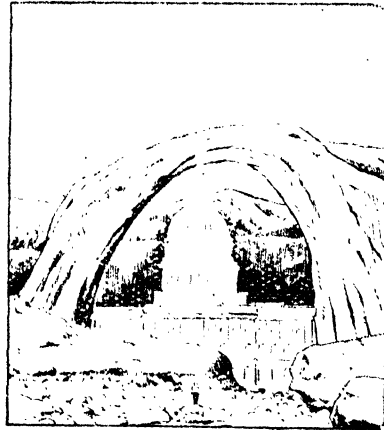
১নং চিত্র

রামধনুর মত)। সেতুটির উচ্চতা ৩০৯ ফুট এবং বিস্তৃতি ২৭৮ ফুট। সেতুটি এতটা চওড়া যে, নীচে এর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর স্থান হতে পারে।

২। আমরা প্রতি মিনিটে কত শব্দ বলতে বা চিন্তা করতে পারি? প্রশ্নটা অদ্ভুত হলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন—একজন

মানুষের চিন্তাধারার গতি হচ্ছে, প্রতি মিনিটে গড়ে অন্ততঃ ৫০০ শব্দ এবং বলবার গতি

২নং চিত্র

হচ্ছে, গড়ে প্রতি মিনিটে প্রায় ১০০ শব্দ।

৩। সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনের উত্তর মেরু অভিযানে সাফল্য লাভের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্র-পথে প্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে অতি

৩নং চিত্র

কম দূরত্ব অতিক্রম করেই যাতায়াত করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পূর্বের পথের তুলনায় দূরত্ব যা কমেছে তা প্রায় ৪৯০০ মাইল, অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় প্রায় অর্ধেক।

৪। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে সবাই দেখে থাকবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিন নটিলাস উত্তর মহাসাগরের ভাসমান তুষারের নীচ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে সামুদ্রিক অভিযানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। নটিলাসই প্রথম জাহাজ—প্রকৃতপক্ষে যে প্রথম

উত্তর মেরুতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এক সঙ্গে এত লোক (১১৬ জন, এরা

৪নং চিত্র

সবাই নটিলাস-এ ছিল) এর পূর্বে আর উত্তর মেরুতে পৌঁছুতে পারে নি।

৫। পৃথিবী থেকে মানুষ যদি চাঁদে গিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায়—তাহলে তার কাছে আকাশ কিরকম দেখাবে? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন—চাঁদ থেকে আকাশকে সর্বদাই কালো দেখাবে; কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকায় সূর্যালোক কোন কিছুতে

৫নং চিত্র

প্রতিফলিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে সূর্যালোক ব্যাপ্তি লাভ করে বলে পৃথিবী থেকে আকাশকে নীলাভ মনে হয়।

৬। বিখ্যাত বিমান-চালক চার্লস এ. লিণ্ডবার্গের নাম অনেকেই শুনে থাকবে। ইনি ১৯২৭ সালে বিমান চালিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রমের প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। এঁর পোষা বিড়াল ছানা প্যাট্সিকে বিমান চালাবার সময় তিনি সঙ্গে রাখতেন। প্যাট্সিকে তিনি খুব পয়মন্ত বলে মনে করতেন।

সব সময়ে প্যাট্সিকে সঙ্গে রাখলেও আটলান্টিক অভিযানের সময় কিন্তু সঙ্গে রাখেন

৬নং চিত্র

নি। কারণ, তিনি মনে করতেন—এই বিপদসঙ্কুল বিমান চালনায় একটি বিড়ালের জীবনের ঝুঁকি নেওয়াও খুবই দায়িত্বপূর্ণ।

৭। বৈদ্যুতিক ইনক্যান্‌ডেসেণ্ট বাতির আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস এডিসনের নাম অনেকেই হয়তো জান। সর্বপ্রথম এই বাতির দ্বারা মিসেস সারা জর্ডানের বোর্ডিং হাউসটিকে (মেন্‌লো পার্ক, এন. জে.) আলোকিত করা হয়েছিল।

৭নং চিত্র

এই উদ্দেশ্যে এবং নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহারিক কার্যকারিতা পরীক্ষা করবার জন্যে এডিসন ১৮৭৯ সালে তাঁর পরীক্ষাগার থেকে মিসেস জর্ডানের খাবার ঘর পর্যন্ত তার টাঙ্গিয়ে ছিলেন।

৮। চা'ল আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। চা'ল উৎপাদনের পরিমাণ কম হলে একটা সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই চা'লের সঙ্কট দূর করবার জন্যে

অনেকে বিকল্প খাদ্যশস্যের কথা বলেছেন। রবার্ট আই. কৌফম্যান নামে একজন আমেরিকান এই সঙ্কট দূর করবার জন্যে একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন।

৮নং চিত্র

এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে চা'লের মত খাদ্যশস্য তৈরী করা যায় এবং সেগুলি দেখতে ঠিক চা'লের দানার মত। সে সব শস্যকণায় কলে-ছাটা চা'লের তুলনায় ৮ থেকে ১০ গুণ বেশী ভিটামিন থাকে। ১৯৫৭ সাল থেকে ফিলিপাইনে এই যন্ত্র ২৪ ঘণ্টা চালিয়ে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে—তাতে দৈনিক ৬০,০০০ লোককে সাধারণ চা'লের চেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ কম খরচায় খাওয়ানো যেতে পারে।

৯। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের নির্ধারিত কার্যসূচী শেষ হয়ে যাবার পরেও যুক্তরাষ্ট্র এবং অষ্ট্রেলিয়া একত্রে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের

৯নং চিত্র

উইলকিস কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবে। এই সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে—তাতে সব দেশের বিজ্ঞানীদের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে সাদর আহ্বান জানানো হয়েছে।

১০। 'এক্সপ্লোরার—৪' নামক পৃথিবীর যে বৃহত্তম ও চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটি পৃথিবী পরিক্রমার একটি নতুন কক্ষপথ সৃষ্টি করেছে। এর কক্ষপথ পরিক্রমার সময় হচ্ছে ১১০.২ মিনিট
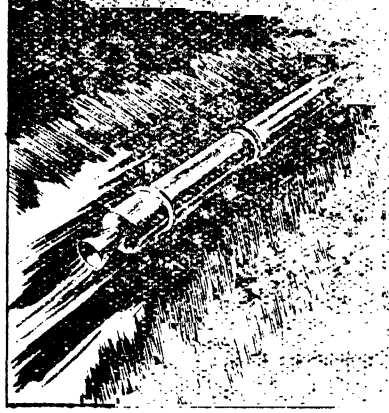
১০নং চিত্র

এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল হচ্ছে চার থেকে পাঁচ বছর। নিকটবর্তী মহাশূন্যের অন্যান্য উপগ্রহগুলির উপর যে তীব্র রশ্মি বিকিরিত হয়—সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই 'এক্সপ্লোর-৪'-কে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকা যেভাবে দেওয়া হয়—তাতে একজনের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী লোককে টিকা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্যে এখন যন্ত্রের সাহায্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে মারাত্মক কলেরা রোগ সংক্রামক
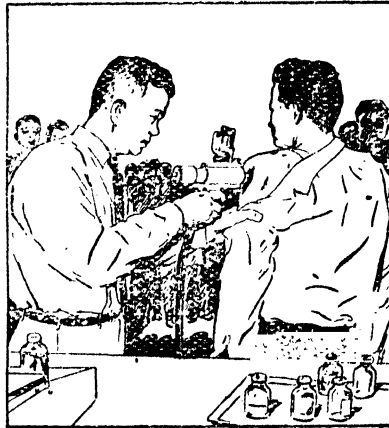
১১নং চিত্র

আকারে দেখা দেওয়ায় এই যন্ত্রের সাহায্যে লোককে টিকা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কলেরা রোগ দমন করা সম্ভব হয়েছে। পাঁচটি টিকা দেওয়ার যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৮০০ থেকে ১০০০ লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি যন্ত্র এবং চার মিলিয়ন সেন্টিমিটার ভ্যাকসিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিল।

বিবিধ

মহাকাশে রুশ রকেট

সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা টাস কর্তৃক ৩রা জানুয়ারী ঘোষিত হইয়াছে যে, রাশিয়া ২রা জানুয়ারী চন্দ্র অভিমুখে যে রকেট ছাড়িয়াছে, উহা চন্দ্রের পাশ কাটাইয়া সূর্য প্রদক্ষিণকারী একটি নূতন গ্রহে (মনুষ্য-সৃষ্ট প্রথম গ্রহ) পরিণত হইবে।

লণ্ডনের পরবর্তী এক খবরে প্রকাশ—রাশিয়া চন্দ্র অভিমুখে যে রকেট ছাড়িয়াছে, উহা ৩রা জানুয়ারী ১ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহা তাহার গন্তব্য পথের প্রায় অর্ধেক। ইতিপূর্বে আর কোন রকেট এত উচ্চে উঠে নাই। মস্কো রেডিও বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মহাশূন্যে আরও অধিক দূরে রকেট প্রেরণের উদ্দেশ্যে চন্দ্রে একটি ঘাটি স্থাপনের জন্য এক সোভিয়েট অভিযান প্রেরিত হইবে।

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ভাইস প্রেসিডেণ্ট আলেকজাণ্ডার টপচিয়েভ বলিয়াছেন যে, চন্দ্র অভিমুখে প্রেরিত রকেট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে এবং উহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম নিখুঁতভাবে কাজ করিতেছে।

মস্কো রেডিও এবং সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা টাস ঘোষণা করিয়াছে এবং অপরাপর সোভিয়েট বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, দেড় টন ওজনের উক্ত রকেট চন্দ্রের এলাকা অতিক্রম করিয়া অবিরাম বেতারে বহু তথ্য প্রেরণ করিতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইহাকে প্রথম মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম হিসাবে ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছেন। ৭ই জানুয়ারী সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশক সংস্থা টাস জানাইয়াছে যে, সোভিয়েট রকেট কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সূর্য প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়াছে।

ছায়াপথের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস

খ্যাতনামা বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক লোভেল সম্প্রতি এক বেতার ঘোষণায় বলেন, বিজ্ঞানীরা অসীম শূন্যতা ও অনন্তকালের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চলিয়াছে।

জোড্রেল ব্যাঙ্কের অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপের অধ্যক্ষ লোভেল বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। অন্তরীক্ষে যেখানে এক হাজার কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই ছায়াপথের যে প্রান্ত হইতে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত রেডিও-তরঙ্গ আসিয়া পৌছিতেছে, সেখানে আমরা দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু রেডিও-তরঙ্গের উৎস সাধারণ নক্ষত্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক লোভেল বলেন, এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বারে আসিয়া আমরা পৌছিয়াছি। বলিতে গেলে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সম্ভাবনা আজ দেখা যাইতেছে।

ওয়াশিংটনের বিজ্ঞানীরা জুপিটার হইতে রেডিও-তরঙ্গ ধরিয়াছেন। কিন্তু আরও হাজার হাজার বেতার-তরঙ্গ আছে, যেগুলির উৎস এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

১২৬১১০০ কোটি মাইল দূরে সর্বাপেক্ষা নিকটতম যে নক্ষত্র, তাহাও যদি সূর্যের ন্যায় রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে তবে জোড্রেল ব্যাঙ্কের টেলিস্কোপে তাহা ধরা পড়িবে। বাস্তবিক তাহা ধরিবার চেষ্টাই চলিতেছে। এই চেষ্টার ফলে যাহাই হউক না কেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণ নক্ষত্র হইতে আগত রেডিও-তরঙ্গ ছায়াপথ হইতে আগত রেডিও-তরঙ্গের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটাইতেছে না।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের দৃঢ় বিশ্বাস, ছায়াপথ হইতে যে রেডিও-তরঙ্গ আসিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেখানকার বিস্তীর্ণ চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ধাবমান কণিকা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। যদি ইহাই মহাজাগতিক বিকিরণের উৎস বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যাইতে পারে।

ছায়াপথের নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া হাইড্রোজেন বাষ্প বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল হাইড্রোজেন পরমাণু ২১৮ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা রেডিও-টেলিস্কোপ যন্ত্রে ধরা পড়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। মহাযুদ্ধকালে জনৈক ডাচ্ বিজ্ঞানী এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পোলিশ বিজ্ঞানীরা তাহা অবলম্বন করিয়াই ছায়াপথের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ছায়াপথের যে অংশ মানুষ কোনদিন দেখিতে পাইবে না, ডাচ্ বিজ্ঞানীরা তাহার এমন বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা হয়তো দীর্ঘকাল অবিশ্বাস্য থাকিয়া যাইবে।

প্রোফেসর লোভেল বলেন, ছায়াপথের বাহির হইতে যে রেডিও-তরঙ্গ আসিতেছে, সে সম্পর্কে আমার ধারণা, নক্ষত্রপুঞ্জের পারস্পরিক সংঘর্ষ হইতেই উহাদের সৃষ্টি হইতেছে। ছায়াপথের চতুর্দিকে মহাশূন্য বিরাজ করিতেছে। তথাপি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কেন না, এক একটি বৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্জ প্রতি সেকেণ্ডে ২ হাজার মাইল বেগে শূন্যলোকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

লোভেল বলেন—আমার এই মতবাদ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে বটে; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিপুল রহস্যের দিক হইতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দেশে জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির নিয়োগ

মানব-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জেনেভায় পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা চালান। ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ক্যানাডার পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের যে আয়োজন চলিতেছে, সে সম্পর্কেও সমবেত পাঁচ হাজার বিজ্ঞানীকে জানানো হয়।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন কক্রফ্ট্। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি হোমি ভাবা বলেন, ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়নের কালে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কথাটি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিয়া দেখা হইয়াছে। কেন না, দেখা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে ব্যয় পড়িবে, তাহা কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়ের প্রায় সমানই বলা চলে।

সমবেত বিজ্ঞানীরা সকলেই মোটামুটি এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য লাভ করিতে এখনও দীর্ঘদিন বিলম্ব রহিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টায় কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করা চলিবে না।

কিন্তু সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক এমেলিয়ানোভ হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরক শক্তিকে কাজে লাগানো সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী আশাবাদী রহিয়াছেন। তিনি বলেন, থার্মো-নিউক্লিয়ার বা হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলন সাধনের জন্য এমন চুল্লী নির্মাণ করা সম্ভব, যাহা জাহাজেও স্থাপন করা চলিবে। অবশ্য ইহা এখনও

পরিকল্পনার পর্যায়েই রহিয়াছে। এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সমস্যাটি সমাধানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অধ্যাপক এমেলিয়ানোভ পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ডয়টেরিয়াম সাধারণ হাইড্রোজেনের তুলনায় দ্বিগুণ ভারী এবং ট্রাইটিয়াম তিন গুণ ভারী।

প্রথম যে থার্মোনিউক্লিয়ার চুল্লী নির্মিত হইবে—তাহাতে ডয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়াম মিক্‌চার ব্যবহার করা হইবে। এই দুইটি পদার্থের পরমাণুর মিলন ঘটাইবার জন্য উহাদিগকে ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হইবে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে যে, এমন চুল্লী নির্মাণ সম্ভব যাহার প্রতি ঘনমিটার মূল পদার্থ হইতে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি বাহির হইয়া আসিতে পারে। পারমাণবিক চুল্লী, জেট ইঞ্জিন বা অন্য কোন শক্তি উৎপাদন যন্ত্রের সে সামর্থ্য নাই। অতএব পারকল্পনার দিক হইতে ডয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়াম চুল্লী নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু ফরাসী পারমানবিক শক্তি সংস্থার অধ্যক্ষ অধ্যাপক পেরিন বলেন, অন্ততঃ বিশ বৎসরের মধ্যে থার্মোনিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপন সম্ভব হইবে না।

মার্কিন প্রতিনিধি ষ্টেব্‌লার ও ডেভিস বলেন, আরও কিছুকাল হাইড্রোজেন শক্তি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে; কিন্তু এক পুরুষের মধ্যেই আমাদিগকে পারমাণবিক শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কেন না, আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যেই আমেরিকার মজুদ জ্বালানী নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

ভারতের বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া ডাঃ হোমি ভাবা বলেন, ভারতে প্রচুর পরিমাণ থোরিয়াম রহিয়াছে। এই অবস্থায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রথম দশ বৎসরে যে মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন হইতে পারে, পরবর্তী দশ বৎসরে তাহা পরিশোধ করা যাইবে এবং যতদূর সম্ভব দ্রুততার সহিত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াইয়া তুলিবার পথ সুগম হইবে। কয়লার উৎপাদন বাড়াইয়া তোলা ক্রমশঃই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে।

ক্লোরেলা মহাকাশ-যাত্রীর রক্ষাকবচ

ভবিষ্যতে যেসব মানুষ মহাশূন্যগামী ব্যোমযানে চাপিয়া গ্রহান্তরে যাত্রা করিবে, তাহাদের প্রাণধারণের জন্য অক্সিজেন সরবরাহের সমস্যার সমাধান হইবে ক্লোরেলা নামক একপ্রকার উদ্ভিদের সাহায্যে।

ক্লোরেলা একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ—এত ক্ষুদ্র যে, সিকি আউন্স জলের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ক্লোরেলা থাকিতে পারে। এই উদ্ভিদের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হইল এই যে, ইহা অন্যান্য উদ্ভিদের চেয়ে ঢের বেশী দ্রুতবেগে বাতাস হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন ত্যাগ করে। সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধক একটি কক্ষে একটি মানুষকে বা অন্য কোন প্রাণীকে যদি বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে অক্সিজেনের অভাবে। কারণ, মানুষ প্রাণী বাতাস হইতে এবং অন্যান্য অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু সেই বায়ুরোধক কক্ষে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরেলা রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মানুষের পরিত্যক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ক্লোরেলা শোষণ করিয়া লইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ত্যাগ করিবে। আবদ্ধ প্রাণী এই অক্সিজেন তাহার নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিবে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ায় প্রাণী এবং ক্লোরেলা বাহির হইতে কোনরূপ বাতাস বা অক্সিজেনের সরবরাহ না পাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে।

এই ভাবেই আকাশ-যানে চাপিয়া যে মানুষ গ্রহান্তরে যাইবে তাহাকে বায়ুরোধক, তাপরোধক, চাপনিয়ন্ত্রিত ও মহাজাগতিক-রশ্মি-নিরোধক কক্ষে দিনের পর দিন এই ক্লোরেলা বাঁচাইয়া রাখিবে।

ক্লোরেলার খাদ্য হইল কতকগুলি খনিজ লবণ। এই খনিজ লবণের পরিমাণ কমাইয়া-বাড়াইয়া উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ক্লোরেলার প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ হইতে ৫৮ পর্যন্ত—অর্থাৎ সাত গুণেরও বেশী বাড়াইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর একটি প্রক্রিয়ায় ইহার চর্বির পরিমাণ শতকরা ৪ হইতে ১৫ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। গম অথবা ঐ জাতীয় খাদ্য-শস্য অপেক্ষা ক্লোরেলা ১২ গুণ বেশী সৌরশক্তি শোষণ করিয়া থাকে বলিয়া উহা অতি দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে এবং সেই জন্যেই ইহার কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা এত বেশী।

দেশান্তর ভ্রমণকারী মাছ

পাখীর মত মাছও বিশেষ বিশেষ ঋতুতে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে গিয়া পড়ে। মাছের এই মাইগ্রেশন বা দেশান্তর ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী মৎস্য-বিজ্ঞানী, সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিশেষ মূল্যবান। মাছের এই দেশান্তর যাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার স্টিল সহরের ওয়াশিংটনের ফিশারী ইন্সটিট্যুট-এর কয়েকজন গবেষক কতকগুলি শ্যামন মাছের (অনেকটা ইলিশ মাছের মত দেখিতে—ইলিশের চেয়ে পেট সরু ও অপেক্ষাকৃত লম্বা) পাখ্‌নায় নম্বর ও ঠিকানা লেখা প্লাষ্টিকের টিকিট আট্‌কাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ছাড়িয়া দেন। টিকিটে একথাও লেখা ছিল—যে ব্যক্তি এই মাছটি পাইবে, সে যদি তাহা ওয়াশিংটন মৎস্য-বিজ্ঞান ভবনের কর্তৃপক্ষকে জানায় তবে তাহাকে নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে। সম্প্রতি খাবারোভস্ক-এর ক্রাস্‌নাইয়া জারিয়া মৎস্যজীবী সমবায়ের গ্রেগরি নামক একজন জেলে ওখোটস্ক সমুদ্রে উদা নদীর মোহানা হইতে কয়েক মাইল ভিতরের দিকে এই মাছটি তাঁহার জালের মধ্যে পান। এই মাছটি কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপান সমুদ্রের উত্তরে ও বেরিং সমুদ্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে এখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল।

কুষ্ঠরোগের নূতন ঔষধ

সম্প্রতি টোকিওতে অনুষ্ঠিত ৭ম আন্তর্জাতিক কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়, যাহার সাহায্যে চিকিৎসার সময় বিশেষভাবে হ্রাস করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পূর্ব নাইজেরিয়ার অন্তর্গত উজুয়াকোলি কুষ্ঠ চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ এফ. টি. ডেভী আলোচ্য সম্মেলনে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করেন। বৃটেনের একটি ফার্ম উক্ত ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ডাঃ ডেভী গত এপ্রিল মাস হইতে ঔষধটি লইয়া পরীক্ষাকার্য চালাইতেছেন।

ঔষধটির নাম হইল—এটিসুল। ইহার একটি অদ্ভুত গুণ হইল এই যে, চামড়ার উপর ঘষিয়া দিলে ইহা কার্যকরী হয়। ঔষধটির প্রস্তুতকারীরা (ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ) বলেন যে, বর্তমানে এটিসুলই হইল একমাত্র জীবাণুনাশক ঔষধ, যাহা চামড়ার উপর ঘষিয়া দিলে দেহের ভিতরে গিয়া কাজ করে।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল বলেন যে, বেশ কিছু কাল পরীক্ষাকার্য চালাইয়া কিছুটা সাফল্য লাভ করিবার পর ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইল। আশা করা যাইতেছে যে, এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া রোগীর চিকিৎসাকাল বেশ কিছুটা কমানো সম্ভব হইবে। বর্তমানে যেখানে

রোগীদের প্রায় দুই বৎসরকাল পৃথক করিয়া রাখিতে হয়, সেখানে এটিসুল ব্যবহার করিলে মাত্র তিনমাস পৃথক করিয়া রাখিলেই চলিবে।

আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার ফলে বহু কুষ্ঠরোগীর রোগ নিরাময় করা সম্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও সারা বিশ্বে কুষ্ঠরোগীদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০ হইতে ৫০ লক্ষ।

অভিনব খেল্‌না-মোটর গাড়ি

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা একটি মজার খেল্‌না-মোটরগাড়ি তৈয়ারী করিয়াছেন। এই খেল্‌নাটিতে স্প্রিং ঘুরাইয়া দম দিতে হয় না। ইহার সহিত কোন ব্যাটারি যুক্ত নাই, কিন্তু তবু ইহা আপনা হইতেই স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করে। শুধু ঘরের ভিতরে খানিকটা আলো থাকিলেই হইল—সাধারণ দিনের আলো অথবা যে কোন কৃত্রিম আলো। এই আলোই মোটর গাড়িটিকে চালাইয়া থাকে।

এই খেল্‌না-গাড়িটির ভিতরে একটি খুব ছোট্ট বৈদ্যুতিক মোটর বসানো আছে এবং গাড়ির ছাদটি হইল খানিকটা বোরন-পরমাণু মিশ্রিত একটি সিলিকন-ক্রিস্ট্যাল প্লেট। এই প্লেটটির উপরে আলো পড়িয়া যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, সেই বিদ্যুৎই ঐ ক্ষুদ্র মোটরটিকে চালাইয়া থাকে। তৃতীয় স্পুটনিকের ভিতরে রক্ষিত সৌর-ব্যাটারিগুলি যে বৈজ্ঞানিক নিয়মে পরিচালিত, এই খেলনা-মোটর গাড়ির নিয়মও তাহাই। এই নিয়মে শুধু খেল্‌না-গাড়িই নহে, ছোট বৈদ্যুতিক পাখা কিম্বা ছোট একটি বেতার-সেটও চালানো যায়। যে পরিমাণ আলো এই সিলিকন প্লেটের উপরে পড়িবে তাহার শতকরা ১১ ভাগ আলোকশক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইবে। এক বর্গগজ প্লেট প্রায় ১২০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভূগর্ভস্থ সমাধিতে অমূল্য সম্পদ

চীনের সম্রাট ওয়ান লি'র (১৫৭৩-১৬২০ খৃঃ অব্দ) ভূগর্ভস্থ কবর খনন করিয়া মিং আমলের অমূল্য ধনসম্পদ পাওয়া গিয়াছে। ১৬ মাস খনন-কার্য চালাইয়া সমাধি-প্রাসাদের রুদ্ধ দ্বারটি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেকার আমলে যদি কেহ এই ধরণের চেষ্টা করিত তবে তাহার ও তাহার পরিবারবর্গকে সমাধি-ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

চীনের সহকারী সংস্কৃতি মন্ত্রী চেং চেন্‌তো স্বয়ং এই খননকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের তিনটি বৃহৎ দ্বার রহিয়াছে। প্রত্যেকটি দ্বার অখণ্ড মার্বেল পাথরের তৈয়ারী। প্রত্যেকটি দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে কাংস্যধ্বনি হইতে থাকে।

প্রাসাদের প্রধান কক্ষে মার্বেল পাথরের তিনখানা আরামকেদারায় ড্রাগনের চেহারা আঁকা রহিয়াছে। উক্ত কক্ষেরই দূরতম প্রান্তে রহিয়াছে সম্রাট ও তাঁহার দুই সম্রাজ্ঞীর শবাধার। মূল কক্ষে স্বর্ণনির্মিত মদ্যপাত্র, ভোজনপাত্র রহিয়াছে। মণি-মুক্তাখচিত একখানি তরবারীও রহিয়াছে। সম্রাটের যুদ্ধসাজের মূল্য যে কত, তাহা অনুমান করাও সম্ভব নহে। নিকটেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল রহিয়াছে।

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর শবাধার স্বর্ণখচিত মূল্যবান রেশমী বস্ত্রের দ্বারা শোভিত। ইহা ছাড়া রহিয়াছে—মণিমাণিক্যখচিত পানপাত্র, দক্ষিণ সাগর, ভারতবর্ষ, সিংহল ও তুরস্ক হইতে আনীত স্বর্ণালঙ্কার।

মিং রাজগোষ্ঠীর ওয়ান লি ১০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র ২১ বৎসর বয়সেই তিনি তাঁহার সমাধিস্থল নির্বাচনের কাজে লাগিয়া যান।

চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্সেরও অধিক রৌপ্য ব্যবহার করিয়া এই সমাধি-প্রাসাদ নির্মাণ করা হইয়াছে।

সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহার বংশধরগণ

এই ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ভূগর্ভস্থ সমাধি-ভূমিটি নির্মাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যাহার কোন তুলনা নাই। আয়তনে উহা হয়তো মিশরের পিরামিডের তুলনায় ছোট, কিন্তু ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের দিক হইতে উহা অনেক শ্রেষ্ঠ।

বেলুনযোগে আটলান্টিক অতিক্রমের প্রয়াস

ডিউক অব এডিনবরার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনজন পুরুষ এবং একজন নারী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবাধগতি বেলুনে আরোহণ করিয়া আটলাণ্টিক অতিক্রমের চেষ্টা করিবেন। নিছক বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিবেন।

কেবল বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া ইতিপূর্বে কোন বেলুনই আটলাণ্টিক অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে নাই। হাওয়ায় ভাসিয়া চলিবার দিক হইতে ইহা প্রথম উদ্যম।

দীর্ঘজীবী মানুষ

অবশেষে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। তিনি ইরানের ফেরুদানের নিকটবর্তী কলু সাও গ্রামের অধিবাসী। নাম—সৈয়দ আলী সালেহী। বয়স ১৯৫ বৎসর। এই কথা শুধু তিনিই বলেন না, সরকারী কাগজপত্রেও ইহার সমর্থন মিলিয়াছে।

মাত্র ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা এই মানুষটি জীবনে কোন দিন জুতা পরেন নাই। কোন দিন ধূমপান করেন নাই। মদ তিনি কোন দিন স্পর্শও করেন নাই। মাঝে মাঝে দু-এক কাপ চা তিনি পছন্দ করেন। কানে একটু কম শোনেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর আজও অটুট আছে। অসুখ-বিসুখ কাকে বলে, তিনি জানেন না। একচোটে ১২ মাইল তিনি স্বচ্ছন্দে হাঁটিতে পারেন। বলেন, হাতে কাজ না থাকিলে মন আমার ভাল থাকে না।

জীবনে একবার শুধু তিনি গ্রাম হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন—সে ১৫৯ বৎসর আগেকার কথা। চাষীদের উপর জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে শাহের দরবারে নালিশ করিবার জন্য ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি তেহারানে গিয়াছিলেন। আর কোথাও তিনি কোন দিন যান নাই—যাইবার ইচ্ছাও নাই। চারদিকে দুরারোহ পর্বত, গভীর অরণ্য—সেখানে তার নিভৃত পল্লীগৃহ—সেটিই তার ভাল লাগে।

যান্ত্রিক মস্তিষ্ক

ব্যাঙ্কের হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাহা টাইপ করা, ঠিকানা লেখা এবং আমানতকারীকে সে হিসাব জানাইয়া দেওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক রোমে চালু হইয়াছে।

যান্ত্রিক হিসাবরক্ষক ইটালীর সর্বত্র শাখা অফিসসমূহ হইতে টেলিপ্রিণ্টারযোগে প্রাপ্ত হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণী বিন্যাস করে। প্রতি মিনিটে নয় লক্ষ সংখ্যা বা অক্ষর চৌম্বক ফিতার উপর লিপিবদ্ধ করে এবং ইটালী, ফ্রান্স, ইংরেজী বা আমানতকারীর পছন্দমত যে কোন ভাষায় তাঁহার হিসাব তৈয়ার করিয়া দেয়।

যন্ত্রটির জন্য মাসে ৩২ হাজার ডলার ভাড়া দিতে হয়, কিন্তু পাঁচ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে উহা নয় লক্ষ আমানতকারীর হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে।

উইলো গাছের শাখা দ্বারা অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা

চীনের পরম্পরাগত ভেষজশাস্ত্রের প্রবীণ চিকিৎসক লিউ-তা-ফু উহানের পরম্পরাগত চীনা হাসপাতালে উইলো গাছের শাখার সাহায্যে একটি পায়ের গুরুতর অস্থিভঙ্গ কৃতকার্যতার সহিত জোড়া লাগাইয়াছেন। পাঁচ মাসব্যাপী চিকিৎসা ও বিশ্রামের পর রোগীকে শীঘ্রই হাসপাতাল হইতে ছুটি দেওয়া হইবে।

লিউ-তা-ফুর উইলো শাখার সাহায্যে অস্থিভঙ্গ

চিকিৎসার পদ্ধতি উহাদের অন্যান্য হাসপাতালেও পরীক্ষিত হইয়াছে এবং যে সকল রোগীর ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অস্থি-ভঙ্গের নূতন ও পুরাতন বহু পূর্ণবয়স্ক ও শিশু রোগী ছিল। শুধুমাত্র হাত ও পায়ের অস্থিভঙ্গই নয়—হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, দেহের সন্ধিস্থল, এমন কি—মেরুদণ্ডের অস্থি-ভঙ্গও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে নিরাময় হইয়াছে।

পশ্চিমী প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসক এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রোগীর নিজের দেহ হইতে অস্থি লইয়া অথবা প্লাষ্টিক ও ধাতুর সাহায্যে ভগ্ন অস্থির সংযোগ সাধন করিতে চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিতে গেলে দুইবার অস্ত্রোপচার করিবার প্রয়োজন হয়। ক্ষত-নিরাময়েও উইলো শাখার সাহায্যে চিকিৎসার অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগে।

লিউ তা-ক্যু'র পদ্ধতি আসলে চীনের পরম্পরাগত ভেষজশাস্ত্র হইতেই সংগৃহীত, যদিও ২০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ইহার ব্যবহার হয় নাই। গত বৎসর এই পদ্ধতির পুনরুদ্ধারের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি কতকগুলি কুকুরের উপর কৃতকার্যতার সহিত পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিতে উইলো শাখাটিকে যথোপযুক্ত ভাবে চাঁচিয়া ভগ্ন অস্থি-র সঙ্গে ঠিকমত-ভাবে স্থাপন করিতে হয়। কিছুদিন পরে শাখাটি অস্থিতে পরিণত হইয়া যায়।

এই পদ্ধতিটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষার জন্য উহাদের জনস্বাস্থ্য বুরো একটি গবেষক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমী শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা চিকিৎসকগণও এই পদ্ধতি হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিতে সাহায্য করিতেছেন।

অর্ধশতাব্দীকালের টিনে আবদ্ধ খাদ্য অবিকৃত

বৃটিশ ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের লেবরেটরি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা একটি টিন হইতে ৫৮ বৎসরের পুরাতন ক্রিষ্টমাস পুডিং লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা এই দীর্ঘকাল পরেও সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে।

রিসার্চ কেমিষ্ট জে. ডবলিউ. সেল্‌বি ১৮২৩ সালের এক টিন মাংস সম্পর্কেও এই ধরণের মত প্রকাশ করেন। একশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে সুমেরু অঞ্চল হইতে এই টিনটিকে লইয়া আসা হয় এবং তাহা এতকাল এডিনবরার একটি গৃহের দরজায় ঠেকনার কাজে ব্যবহার হইতেছিল। সম্প্রতি পরীক্ষার পর জানা যায় যে, এই টিনজাত মাংস সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত এবং খাদ্য হিসাবে তাহার অবস্থা মোটামুটি ভালই।

সাধারণ সর্দিকাশি সম্পর্কিত গবেষণা

সাধারণ সর্দিকাশির প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানীগণ এই পর্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন তাহা আশানুযায়ী ফলপ্রসূ না হইলেও তাহারা এখনও এই চেষ্টা সমানে চালাইয়া যাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিকিৎসকদের নিকট যাহারা চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে তাহাদের প্রায় এক-দশমাংশ হইল সর্দিকাশির রোগী। সল্‌স্‌বারীর কমন কোল্‌ড রিসার্চ ইউনিট নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৬ সাল হইতে এই রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া আসিতেছে তাহার কর্তৃপক্ষ সর্দিকাশি সংক্রান্ত গবেষণার সাহায্যের জন্য ভলাণ্টিয়ার চাহিয়া এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। ভলাণ্টিয়াররা এই কেন্দ্রে ১০ দিনের জন্য "গিনিপিগ" হিসাবে কাজ করিবে। আজ পর্যন্ত এই আবেদনে ৬,০০০ ভলাণ্টিয়ার সাড়া দিয়াছে।

এই গবেষণার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বৃটিশ বিজ্ঞানশিক্ষা পরিষদ (যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন ও ডেনমার্কের বিজ্ঞানীদের সহিত এক সঙ্গে) জীবন্ত তন্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি ভাইরাস উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন যাহা অসাধারণ সর্দিকাশির কারণ বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার এই ফল হয়তো ভবিষ্যতে সাধারণ সর্দি-কাশির ভাইরাস আবিষ্কারেরও সহায়ক হইবে।

পরলোকে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেশ-বরেণ্য বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ২১শে জানুয়ারী বেলা ১১-৪৫ মিনিটে নিউ আলীপুরস্থিত তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাটি ছিল হুগলী জেলার আলমবাটী গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গতঃ রামচন্দ্র ঘোষ কণ্ট্রাক্টর ও অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন।

ডাঃ ঘোষ গিরিডি হাই স্কুল ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

ছাত্র-জীবন প্রথমাবধিই উজ্জ্বল ছিল এবং তিনি বহু পুরস্কার, পদক ও বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০৯ সালে জ্ঞানচন্দ্র ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি শীঘ্রই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনি আচার্য রায়ের সহিত ভ্রমণ করিতেন। ১৯১১ সালে তিনি আই. এস-সি পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৩ সালে তিনি বি. এস-সি পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং ১৯১৫ সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সকল পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাইতে হয়।

এম. এস-সি পরীক্ষায় ফল বাহির হইবার পূর্বেই ১৯১৫ সালে স্যার আশুতোষ তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-সৃষ্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে রসায়ন শাস্ত্রের লেক্‌চারার নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে স্বর্গতঃ স্যার টি. এন. পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিতে থাকেন এবং ভারতে জড় রসায়ন-শাস্ত্রে গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে পরিচিত হন। এখান হইতেই তিনি শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রোলাইট তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন এবং তাঁহার এই তত্ত্ব বিশ্বের সমগ্র বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নার্ষ্ট, হেবার প্রভৃতি বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তাঁহার এই তত্ত্ব সমর্থন করেন ও তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানান।

১৯১৮ সালে ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং পালিত বৃত্তি এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির সাহায্যে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। তিনি কিছুকাল লণ্ডনে অধ্যাপক ডোনানের লেবরেটরিতে কাজ করেন। ১৯২১ সালে তিনি জার্মেনীতে যান। সেখানে নার্ষ্ট ও হেবার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাঁহার কার্যাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন। অধ্যাপক নার্ষ্ট জ্ঞানচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে জার্মান ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন এবং অধ্যাপক হেবার তাঁহার প্রবন্ধগুলি জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন।

১৯২১ সালেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডাঃ ঘোষ নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকেন। ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ব্যাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন।

এই সময়ে তিনি ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায়ই গড়িয়া ওঠে।

ডাঃ ঘোষ ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বৃত হন এবং ১৯৫৫ সালে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

বিগত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডাঃ ঘোষ গবেষণার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধীনে ভারতে একদল বিশিষ্ট গবেষক-কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোর প্রভাব, গ্যাসে রাসায়নিক ক্রিয়ার কারিগরী ও তাত্ত্বিক বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন। এই পথে গবেষণা চালাইয়া হাইড্রোকার্বন সিন্থেসিসে ফিসার-ট্রোপক প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেন। দেশজ কাঁচামাল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যাবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত কার্যে তিনি তাঁহার ছাত্র ও গবেষকদিগকে পরিচালিত করেন। ইহার ফলে আজ ভারতে ভারতীয় উপকরণে বহু রসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিবার সময় নূতন নূতন দিকে তাঁহার কর্ম-প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। তিনি সেখানে বিমান ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতুবিদ্যা ও কম্বাসন ইঞ্জিনীয়ারিং—এই তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ খোলেন।

অধ্যাপক জে. এন. মুখার্জি ও অধ্যাপক এস. এস. ভাটনগরের সহিত ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় রসায়ন সমিতি গঠন করেন এবং এই সমিতির সভাপতি হন। ১৯২৫ সালে তিনি বারাণসীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেন। লাহোরে ১৯৩৯ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনিই ছিলেন মূল সভাপতি। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে অধরচন্দ্র মুখার্জী মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেন।

১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের যে বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দল বৃটেন, আমেরিকা ও ক্যানাডা পরিদর্শন করেন, ডাঃ ঘোষ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার সায়েন্স কনফারেন্সে এবং ১৯৪৯ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের সভায় ও লেক সাক্‌সেসে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত রাষ্ট্র-পুঞ্জের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯৪৩ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ ঘোষ বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার চেষ্টায় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। দিবাভাগে ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠ-ভবন তাঁহারই পরিকল্পনা। কলিকাতায় এরূপ তিনটি পাঠ-ভবন আছে। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অনন্তের পরিভাষা

শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জি

অনন্ত বা Infinity কাকে বলে তা নিয়ে শুধু সাধারণ লোকই নয়, অনেক গণিতজ্ঞও মাঝে মাঝে ভুল করে বসেন। সাধারণতঃ বলা হয়

$\frac{1}{0} = \infty$ (অনন্ত)

কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মনে করুন, আপনার কাছে একটা চকোলেট আছে। আপনি যদি অর্ধেকটা করে দেন তাহলে দুজন ছেলেকে চকোলেট দিতে পারবেন। তেমনিই যদি $\frac{1}{4}$ করে দেন তাহলে আপনি চার জনকে দিতে পারবেন। যদি $\frac{1}{১০০}$ করে দেন তাহলে ১০০ জনকে দিতে পারবেন।

মনে করুন, ওটাকে আপনি $১০^{১০}$ টুক্‌রা করে ফেলেছেন। তখন $১০^{১০}$ ছেলেকে আপনি চকোলেট দিতে পারেন। অর্থাৎ আপনি চকোলেটটাকে যত ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে পারবেন তত বেশী সংখ্যক ছেলেকে দিতে পারবেন। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই চকোলেটটা শেষ হয়ে যাবে।

এবার ধরুন, আপনি প্রত্যেক ছেলেকে শূন্য (Zero) অংশ করে চকোলেট দিচ্ছেন। কতজন ছেলেকে আপনি চকোলেট দিতে পারবেন? ছেলের সংখ্যা যতই হোক না কেন, আপনার হাতের চকোলেটের কণামাত্রও খরচ হবে না। সুতরাং $\frac{1}{0}$-এর অর্থ কি? সহজ ভাষায় বলতে গেলে এর কোন অর্থ নেই।

কিন্তু Infinity বা অনন্তের অর্থ আছে। যখন আপনার চকোলেটটি এত ছোট করে ফেলবেন যার চেয়ে ছোট টুক্‌রার কল্পনাও করা যাবে না, তখন কতজন ছেলেকে চকোলেট দিতে পারবেন? তখনই ছেলের সংখ্যা অনন্ত হয়ে দাঁড়াবে। কেন না, আপনি তখন এত অধিক সংখ্যক ছেলেকে চকোলেট দিতে পারবেন যার কল্পনাও করা যাবে না।

ক্যাণ্টর অনন্ত বা Infinity-র অন্য একটি পরিভাষা দিয়েছেন। সেটা বলতে গেলে আগে সেট্ (set) আর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।

কতকগুলি একজাতীয় বা একগুণবিশিষ্ট বস্তু সমষ্টিকে সেট্ বলে। যেমন—হাতের পাঁচটা

আঙ্গুল একটা সেট্। একটা ক্লাশও একটা সেট্। সেট্-এর বস্তুগুলিকে তার Element বা মূল বলে।

কোন সেটের অংশকে সাব-সেট্ বলে। যেমন ধরুন, একটা ক্লাশে বারো জন ছাত্রী আর আঠাশ জন ছাত্র আছে। এখন ক্লাশ একটা সেট্। কিন্তু ঐ বারো জন ছাত্রী মিলে একটা সাব-সেট্ তৈরী করেছে এবং আঠাশ জন ছাত্র মিলে আর একটা সাব-সেট্ তৈরী করেছে।

দুটা সেট্কে সমরূপ (Similar) বলে যখন একটির প্রত্যেকটি মূলের জন্যে অন্য সেটে একটি জুড়ী মূল পাওয়া যাবে। ইংরেজীতে একে বলে One to one correspondence—সরল বাংলায় বলা যেতে পারে জুড়ী।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরুন, একটি নগরে কোন পুরুষেরই এক জনের বেশী স্ত্রী নেই এবং কোন মেয়েরই একজনের বেশী স্বামী নেই। যখন ঐ নগরের সমস্ত বিবাহিত পুরুষেরা একটা সেট্ তৈরী করবে এবং সমস্ত বিবাহিতা মেয়েরা আর একটা সেট্ তৈরী করবে, সেই দুই সেট্ হবে সমরূপ। কেন না পুরুষ সেটের প্রত্যেক মূলের, অর্থাৎ প্রত্যেক বিবাহিত লোকেরই একটি জুড়ী বিবাহিতা মেয়েদের সেটে পাওয়া যাবে। সেইরূপ প্রত্যেকটি বিবাহিতা মেয়ের একজন স্বামী পুরুষ-সেটে পাওয়া যাবেই।

ক্যাণ্টর সমরূপ সেট্ দিয়েই সংখ্যার পরিভাষা দিয়েছেন। যেমন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। তাঁকে দিয়ে কটা সমরূপ সেট তৈরী করতে পারা সম্ভব? মাত্র একটাই। সেইরূপ কোন কলেজের প্রিন্সিপাল বা কোন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী—এঁরা সবাই মাত্র একটি করেই সমরূপ সেট্ তৈরী করতে পারেন। এইরূপে ১-এর পরিভাষা দেওয়া হলো।

ধরা যাক, যমজ ছেলে। এরা কটা সমরূপ সেট্ তৈরী করতে পারবে? নিশ্চয়ই দুটা। এইরূপে ২-এর পরিভাষা দেওয়া হলো।

সেইরূপ স্বামী, স্ত্রী ও প্রথম সন্তানে তিনটি সমরূপ সেট্ তৈরী করতে পারবে। এই হলো ৩-এর পরিভাষা।

একটু চিন্তা করলেই অন্যান্য সংখ্যার পরিভাষা বের করা যাবে। এখন আসা যাক অনন্তের পরিভাষায়।

ধরা যাক, A আর B দুটা সমরূপ সেট্; অর্থাৎ A-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী B-তে এবং B-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী A-তে পাওয়া যাবে। এখন মনে করা যাক—C, B-এর একটি সাব-সেট্। যদি B Pinite বা সীমিত সেট্ হয় তাহলে C নিশ্চয়ই B-এর চেয়ে ছোট হবে। তখন B এবং C কখনই সমরূপ হতে পারবে না। সুতরাং C এবং A সমরূপ হবে না।

কিন্তু যদি A আর C সমরূপ হয়, অর্থাৎ A-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী C-তে এবং C-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী A-তে পাওয়া যায় তখন A-কে বলা হবে একটি অনন্ত বা Infinite সেট্। তখন B এবং C-কেও অনন্ত বা Infinite বলা হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা আরও একটা ফল বের করতে পারি। I-কে অনন্ত সেট্ তখনই বলা হবে যখন I-এর সাব-সেট্ I' এবং I সমরূপ হবে।

এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এক ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের মেম্বারদের মিটিং ছিল ১লা এপ্রিল। ভুলক্রমে ঐ ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার ঐ দিন একই সময়ে ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের মিটিং করবার অনুমতি দিলেন। উভয় ফ্যাকাল্টিতেই মেম্বারের সংখ্যা ছিল অনন্ত। কিন্তু মেম্বারদের বসবার জন্যে একটি মাত্র হল ছিল। ঐ হলে অনন্ত চেয়ার ছিল। ভুল যখন রেজিষ্ট্রার বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাঁর মাথায় তো বজ্রাঘাত! অনন্ত মেম্বারদের তিনি বসতে দেবেন কোথায়? অনন্ত লোককে 'এপ্রিল ফুল' করা বিপজ্জনক বৈকি!

অনেক ভেবে শেষে তিনি গেলেন গণিতের প্রধান অধ্যাপকের কাছে। তিনি সব কিছু শুনে মৃদু হেসে বললেন—কুছ্ পরোয়া নেই। এক্ষুনি চেয়ারগুলিতে নম্বর লাগিয়ে দিন। তারপরে ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের মেম্বারদের জোড় নম্বরের চেয়ারগুলিতে এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের মেম্বারদের বেজোড় নম্বরের চেয়ারগুলিতে বসতে বলবেন। জোড় নম্বরের চেয়ারগুলি একটা অনন্ত সেট্ তৈরী করবে এবং বেজোড় নম্বরের চেয়ারগুলি আর একটা অনন্ত সেট্ তৈরী করবে। কাজেই উভয় ফ্যাকাল্টির মিটিংই ভালভাবে হয়ে যাবে।

পাইপমোবাইল নামক এই অদ্ভুত যন্ত্রটির সাহায্যে ভূগর্ভে পাইপ বসাইবার কাজ অতি সহজে সম্পন্ন হয়। সাতটি গুডইয়ার টায়ারের উপর স্থাপিত ৮০ টন ওজনের এই যন্ত্রটি ডিজেল ইঞ্জিনে চলে।

কালের বন্ধন

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বসুন্ধরায় প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষ দেখে এসেছে—রাত্রির অন্ধকার দূর করে সারা আকাশ আলোকিত করে পূবে দেখা দেয় ভোর বেলাকার রাঙা সূর্য। ক্রমে সূর্য মাথার উপরে চলে যায়। তারপর পশ্চিম আকাশে নেমে আসে এবং পশ্চিমের মেঘমণ্ডিত আকাশকে বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় রঞ্জিত করে বিদায় নেয়। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসে। কোন রাত্রিতে চাঁদ দেখা দেয়, কোন রাত্রিতে একেবারেই নয়। এভাবে সূর্যের ওঠা ও অস্ত যাওয়া মানুষের মনে দিবারাত্রির ধারণা জন্মিয়ে দিল। পর পর দুটি পূর্ণিমার চাঁদ মাসের ধারণা সৃষ্টি করলো। চাষের কাজ যখন মানুষ সুরু করেছে তখন থেকেই ঋতু-বৈচিত্র্যের দিকে তার নজর পড়তে আরম্ভ হলো। সন্ধানী দৃষ্টির কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে শুধু পার্থক্যই নয়, মিলও রয়েছে যথেষ্ট—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত একের পর এক আসছে—বসন্ত শেষ হয়ে আবার গ্রীষ্মের সুরু।

পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডে ঘূর্ণনের ফলে দিবা-রাত্রির সৃষ্টি হচ্ছে—এটি পৃথিবীর আহ্নিক গতি। পৃথিবীর একটি বার্ষিক গতিও আছে। বৃত্তাভাস পথে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বছরে একবার ঘুরে আসছে। কক্ষপথের তলের সঙ্গে পৃথিবীর মেরুদণ্ড একটা নির্দিষ্ট কোণ করে আছে। এই কোণের পরিমাপ হচ্ছে ৬৬.৫° ডিগ্রী। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এবং ঐ কোণের দরুণ বিভিন্ন ঋতু-বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন আকাশের তারাগুলি বছরে একবার করে ঘুরে ফিরে আসছে পূর্বের জায়গায়। উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতি মাসে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যায়, এক বছর পরে আবার ফিরে আসে একই জায়গায়, একই সময়ে। উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা কিন্তু একই জায়গায় দেখা যায় রাত্রির যে কোন সময়, যে কোন মাসে। এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর মেরুদণ্ড যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তা ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে; অর্থাৎ মেরুদণ্ডটি ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে আছে। যারা দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও আর্জেন্টিনিয়ায়, অর্থাৎ বিষুব রেখার দক্ষিণে বাস করে, তাদের পক্ষে উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য দক্ষিণ আকাশেও আর একটি ধ্রুবতারা দেখতে পাওয়া যায়।

সময় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বহু প্রাচীন। দিনের আকাশে সূর্যের আর রাত্রির আকাশে তারার অবস্থিতি থেকে সময়কে ভাগ করে বলে দেওয়া সম্ভব ছিল প্রাচীন কালেও। সূর্য ও তারাকে ঢেকে ফেলে মেঘ ও কুয়াসা মাঝে মাঝে গোল বাঁধাতো। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে ঘড়ির আবিষ্কার হলো। প্রাচীন ব্যাবিলনে সর্বপ্রথম সূর্য-ঘড়ি ও বালি-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ঘড়ি আবিষ্কারের পর কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের মনে স্পষ্টতর ধারণা জন্মে গেল। মনে হলো, প্রতিটি মুহূর্ত বয়ে চলছে—সময়ের গতিতে একটুকুও বিচ্যুতি নেই, নেই কোন বাহ্যিক প্রভাব। কালের গতি অপ্রতিহত। নদীর স্রোত শীতে ক্ষীণ হয়ে আসে, বর্ষায় হয়ে ওঠে দুর্দম। কাল-স্রোতে শীত নেই, বর্ষা নেই—একই গতিতে তা চিরপ্রবহমান।

কালের গতিকে প্রভাবান্বিত করবার জন্যে চেষ্টা

হয়েছিল অবশ্য। এ চেষ্টা করেছে যাদুকরেরা আর কল্পনাবিলাসী লেখকের দল। যাদুকরেরা ভেল্কি দেখিয়েছেন—লেখকেরা তাঁদের লেখায় মানুষের স্বপ্নকে সফল করবার উদ্দেশ্যে কাল্পনিক কলের বর্ণনা দিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিজ্ঞানীদের মনে কাল সম্বন্ধে কিছু সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। তারপর ১৯০৫ সালে ছাব্বিশ বছরের যুবক আইনষ্টাইন—স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা একেবারে বদ্‌লে দিলেন। আইনষ্টাইনের মতবাদ এরূপ ক্রান্তিমূলক যে, কথিত আছে, প্রকাশিত হওয়ার প্রথম বছরে সারা পৃথিবীর মাত্র ১২ জন ঐ মতবাদ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিলেন—অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন নি। কেউ কেউ আইনষ্টাইনকে পাগলও বলেছিলেন।

একেবারে স্থির হয়ে কিছুই নেই, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি। প্রতি সেকেণ্ডে চাঁদ এক কিলোমিটার (৮ কিলোমিটারে ৫ মাইল) গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। যে পৃথিবীতে আমরা চলাফেরা করছি সেটাও নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘণ্টায় হাজার মাইলের বেশী বেগে (বিষুবরেখার কাছে) ঘুরছে, আর সূর্যের চারদিকে বৃত্তাভাস কক্ষপথে সেকেণ্ডে ২০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। সূর্য আবার তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সেকেণ্ডে ১৩ মাইল বেগে ছুটছে। যে নক্ষত্র-মণ্ডলীতে সৌরজগৎ অবস্থিত তার গতিবেগ হচ্ছে ছায়াপথের তুলনায় সেকেণ্ডে ২০০ মাইল। সুদূর নক্ষত্ররাজ্যের তুলনায় এই ছায়াপথ আবার ছুটছে ১০০ মাইল বেগে।

এই চলমান জগতে একেবারে স্থির যখন কিছু নেই, তখন একেবারে চরম স্থির বলেও কিছু থাকতে পারে না। আইনষ্টাইন বললেন, একেবারে চরম সময় বলেও কিছু নেই—একমাত্র আলোকের গতি অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয় বলে এক অক্ষয়রূপে বিরাজিত। স্থানের রূপ বদ্‌লাচ্ছে, তেমনি বদ্‌লাচ্ছে কালেরও চেহারা। এক ও অদ্বিতীয় নয় কাল, বিচিত্র প্রকৃতিতে সে বহুরূপী।

মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীতে দিবারাত্রি হচ্ছে, আর সূর্যের চারদিকে ঘোরবার ফলে হচ্ছে বছর। পৃথিবীর দিন ঘণ্টার অনুপাতে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিন ও বছরের হিসাব দেওয়া হলো—

গ্রহের নাম	দিনের পরিমাণ	বছরের পরিমাপ
১। বুধ	৮৮ দিন	৮৮ দিন
২। শুক্র	২০ দিন	২২৪.৭ দিন
৩। পৃথিবী	২৩ঘ. ৫৬ মি. ৪ সে.	৩৬৫.২৫৬ দিন
৪। মঙ্গল	২৪ ঘ. ৩৭ মি. ২৩ সে.	৬৮৬.৯৮ দিন
৫। বৃহস্পতি	৯ ঘ. ৪৩ মি.	৪,৩৩২.৫৯ দিন
৬। শনি	১০ ঘ ২৬ মি.	১০,৭৫৯,২৯ দিন
৭। ইউরেনাস	১০ ঘ. ৪২ মি.	৩০,৬৮৫.৯৩ দিন
৮। নেপচুন	১৫ ঘ. ৪৮ মি.	৬০,১৮৭.৬৪ দিন
৯। প্লুটো	?	৯০,৪৭০.২৩ দিন

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রহে দিন বা বছরের পরিমাপ আমাদের পৃথিবীর মত নয়। বুধ গ্রহে দিন এবং বছরের পরিমাপ এক, ৮৮টি পার্থিব দিনের সমান। বুধে থাকলে আমাদের সময় সম্বন্ধে যে ধারণা হবে, পৃথিবীতে থাকলে তা হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর ঋতু-বৈচিত্র্য এবং নক্ষত্র-সমূহের বার্ষিক গতি ও অন্যান্য গ্রহে একরূপ হবার কথা নয়। বুধে একদিনেই বিভিন্ন ঋতুর লক্ষণ দেখা যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতার এ কিন্তু ঘোরতর পরিপন্থী। আবার ইউরেনাস, নেপচুন বা প্লুটোতে এক বছর বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

কাল তাই বিভিন্ন স্থানে অভিন্নরূপে প্রকাশিত নয়। কালের রূপবৈচিত্র্য আরও প্রকট হবে যদি নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। সৌর-জগতের নিকটতম তারকা থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে লাগে চার বছর। আজ আমরা যে

আলোতে ঐ তারাটিকে দেখছি—সেই আলো চার বছর আগে ঐ তারা থেকে যাত্রা স্বরু করে আজ পৃথিবীতে এসে পৌছালো। আমাদের কাছে যা বর্তমান মনে হলো, তারাটির কাছে তা হচ্ছে অতীত কাল।

তাই স্থানের বন্ধন এড়াতে পারে নি 'কাল', কালের বন্ধনও কাটাতে পারে নি 'স্থান'। স্থান বাদ দিয়ে নয় কাল, কাল বাদ দিয়েও নয় স্থান।

আইনষ্টাইন গাণিতিক উপায়ে আরও দেখালেন যে, ক নামক বস্তুর আপেক্ষিক গতি যদি খ নামক বস্তুর তুলনায় বেশী হয়, তবে ক বস্তুতে স্থান ও কালের সঙ্কোচন ঘটবে। ধরা যাক, ক-এর আপেক্ষিক গতি হচ্ছে v, আর আলোকের গতি হচ্ছে c (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার) আর খ-এর অতিবাহিত সময় যখন $t_{\text{খ}}$, ক-এর অতিবাহিত সময় হচ্ছে $t_{\text{ক}}$ 1 আইনষ্টাইনের মতে $t_{\text{ক}} = \sqrt{1 - v^2/c^2}\ t_{\text{খ}}$ 1

এই সমীকরণের নাম হচ্ছে Lorentz Transformation বা লরেঞ্জ বিবর্তন। $t_{\text{ক}}$-এর পরিমাণ ক-এর গতির দিকের উপর নির্ভরশীল নয়। সরল বা সর্পিল যে কোন পথ ধরে চলুক ক, যদি খ-এর তুলনায় তার আপেক্ষিক গতি v হয় তবেই উপরের স্বত্রটি খাটবে। এবার আমরা এ স্বত্রটি নিয়ে আলোচনা করবো।

১। ধরা যাক, রাম বসে আছে, আর শ্যাম ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে হেঁটে চলেছে। শ্যামের ঘড়িতে এই হাঁটবার দরুণ ১ সেকেণ্ড কম (রামেরঘড়ির তুলনায়) যেতে লাগবে ৩×১০৯ বছর, অর্থাৎ ৩০০ কোটি বছর। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, আমাদের পৃথিবীর স্থষ্টি হয়েছিল ২০০ থেকে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে। পৃথিবীর সেই স্বষ্টির গোড়া থেকে যদি কখনও না থেমে শ্যাম চলতে আরম্ভ করতো ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে তবে চলবার দরুণ আজ তার ঘড়ির সঙ্গে রামের ঘড়ির তফাৎ হতো ১ সেকেণ্ড।

২। রাম বসে আছে ঘরের দাওয়ায়, আর শ্যামের রেলগাড়ী ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে। শ্যামের রেলগাড়ী যদি এমনি ছুটে চলে অবিশ্রান্তভাবে ৭৫ লক্ষ বছর তবে রামের ঘড়ির সঙ্গে শ্যামের ঘড়ির সময়ের তফাৎ হবে মাত্র এক সেকেণ্ড।

৩। রাম মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর শ্যাম জেট বিমানে ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার গতিতে আকাশ পরিক্রমায় ব্যস্ত। রাম ও শ্যামের ঘড়িতে এক সেকেণ্ড তফাতের জন্যে ৭৫ হাজার বছর শ্যামকে একটানা জেট বিমান ছুটিয়ে চলতে হবে।

৪। রাম বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের নিকট বসে শুনছে বীপ্ বীপ্ শব্দ, আর শ্যাম স্পুটনিকে চড়ে পৃথিবীর চারদিক বেষ্টন করে আসছে সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার বেগে। ৯০ বছর যদি শ্যাম এমনি স্পুটনিকে ঘুড়ে বেড়ায় অবিশ্রান্তভাবে তবে রাম ও শ্যামের ব্যবধান হবে মাত্র এক সেকেণ্ড।

৫। শ্যামের রকেট সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাঁধা অতিক্রম করে চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহের অভিমুখে ছুটে চলেছে। এই বেগে যদি শ্যাম চলে ৪০ বছর, তবে তার ঘড়ির সঙ্গে রামের ঘড়ির সময়ের ব্যবধান হবে মাত্র এক সেকেণ্ড।

৬। বর্তমানে পরিকল্পিত ফটোন রকেট চড়ে চলেছে শ্যাম। তার গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১, ৬১,০০০ মাইল। যাত্রার স্বরু থেকে দু' ঘণ্টা যখন রামের ঘড়িতে, শ্যামের ঘড়িতে তখন মাত্র ১ ঘণ্টা। পৃথিবীতে রামের ৫০ বছর কেটে গেছে, অথচ শ্যাম রকেটে কাটিয়েছে মাত্র ২৫ বছর।

৭। বর্তমানে ফটোন রকেটের সর্বোচ্চ গতি ধরা হয় ১,৭৭,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। এ

রকম দ্রুতগতিতে যদি যাওয়া যায় তবে পৃথিবীতে যখন ১০০ বছর, রকেটে তখন মাত্র ৪৩ বছর।

৮। যদি ফটোন রকেটের গতি আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়, অর্থাৎ আলোর গতির শতকরা ৯৯ ভাগ করা যায় (সেকেণ্ডে ২, ৯৭, ০০০ কিলোমিটার) তবে পৃথিবীতে যখন ১০০ বছর, রকেটে তখন মাত্র ১'৪ বছর।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে সহজেই বুঝা যায়—

১। শ্যামের গতিবেগ যখন আলোকের গতির তুলনায় অতি নগণ্য তখন শ্যাম ও রামের সময়ের ব্যবধান অতি তুচ্ছ। ২। কিন্তু যখন রামের তুলনায় শ্যামের আপেক্ষিক গতি আলোর গতির নিকটে পৌছায়, তখন সময়ের ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হয়ে পড়ে। আজ যখন চাঁদে যাওয়ার কথা হচ্ছে, তখন পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া আর নিছক কল্পনার বিষয় নয়। হয়তো বিশ-পঁচিশ বছর দেরী হতে পারে, কিন্তু মতবাদের দিক দিয়ে ত্রুটি বড় কিছু নেই। এই মহাশূন্য পরিক্রমায় আলোর গতিসম্পন্ন ফটোন রকেট হচ্ছে এক বিরাট সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা। যদি ফটোন রকেটের গতি আলোর গতির সমান হতে পারে তবে কালের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবার কথা। ঐ রকেট তখন অতি দূরের নক্ষত্রও ঘুরে আসতে পারবে। ঐ রকেটের আকাশচারীরা মর্ত্যের লোকের তুলনায় অনেক দীর্ঘায়ু হবে।

উপরিউক্ত সময়ের সঙ্কোচন সত্যই কতটা হবে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মনে সংশয় রয়েছে। কারণ এখনও এই সঙ্কোচন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নি। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভাবনা আজ কিন্তু দেখা দিয়েছে।

যে যন্ত্রটির উপর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ নির্ভর করছে তার নাম হচ্ছে, পারমাণবিক ঘড়ি (Atomic clock)। আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গ আর আলোক-তরঙ্গ একই শ্রেণীর, উভয়েই এরা তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ; তবে তাদের পার্থক্য হচ্ছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র, আর বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সে তুলনায় অনেক বৃহৎ। বেতার-তরঙ্গের মধ্যেও দৈর্ঘ্যের হেরফের আছে—অতি দীর্ঘ থেকে অতি হ্রস্ব তরঙ্গও আছে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গকে বলা হয় মাইক্রো-ওয়েভ। এই জাতীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। এদের কিন্তু অদ্ভুত গুণ রয়েছে। কোন পরমাণুর ভিতর দিয়ে আলো অতিক্রম করবার সময় ঐ পরমাণু বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে নেয়। আবার উত্তেজিত অবস্থায় ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে—এ তথ্য হচ্ছে বর্ণালী বিশ্লেষণের ভিত্তি। বর্ণালী বিশ্লেষণের সহায়তায় পরমাণু সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা গেছে। কোন অণুর ভিতর মাইক্রো-ওয়েভ প্রবেশ করিয়ে তার ভিতরের অনেক খবর জানা গেছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থের অণুর (কেবল চাপ বা তাপ নয়) আবর্তন এবং অবস্থানও মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—অণুর ভিতরকার পরমাণুর মধ্যে যোগসূত্র পর্যন্ত মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে পরীক্ষা করা চলে।

অ্যামোনিয়ার (NH_3—তিনটি হাইড্রোজেন ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণুতে এর একটি অণু গঠিত) অণু এই মাইক্রো-ওয়েভ বেতার তরঙ্গের সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিটন এবং উইলিয়াম্‌স্ ম্যাগ্‌নেট্রন যন্ত্রের সাহায্যে মাইক্রো-ওয়েভ সৃষ্টি করে অ্যামোনিয়া-ভর্তি রবার বেলুনের ভিতর দিয়ে ঐ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করে দেখেছেন—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ১'২৫ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি (তরঙ্গ-সংখ্যার হিসেবে ২৩,৮৭০ মেগাসাইক্‌ল্ প্রতি সেকেণ্ডে) তখন বেলুনটি অতিমাত্রায় বেতার-তরঙ্গ শোষণ করে নেয়। সম্প্রতি আরও উন্নততর যন্ত্রের সাহায্যে

অ্যামোনিয়ার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। নানা কারণে মনে করা হয় যে, অ্যামোনিয়া অণুর ভিতরের তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণু একটা পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত রয়েছে। এই পিরামিডের মাথায় রয়েছে নাইট্রোজেন পরমাণু। তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একই তলে রেখে ঐ তলের উপরে অথবা নীচে অবস্থান করতে পারে নাইট্রোজেন পরমাণুটি। মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে পরীক্ষায় জানা গেছে যে, নাইট্রোজেন পরমাণুর পক্ষে দুটি অবস্থানই সম্ভব। ১২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ যখন অ্যামোনিয়ার অণুতে প্রবেশ করে, তখন নাইট্রোজেন পরমাণু ঐ দুটি অবস্থানের ভিতর দুলতে আরম্ভ করে—অনেকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। এ ঘটনাটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সুড়ঙ্গম (Tunnelling), আর ১·২৫ সেন্টিমিটার তরঙ্গের এই দোলনকে বলা হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের Inversion spectrum বা সুড়ঙ্গ বর্ণালী।

অ্যামোনিয়া গ্যাসের এই সুড়ঙ্গ-তরঙ্গের সংখ্যা —প্রতি সেকেণ্ডে ২৩,৮৭০ মেগাসাইক্‌ল্—খুব স্থায়ী বলে তরঙ্গ-সংখ্যার ষ্ট্যাণ্ডার্ড হওয়ার বিশেষ উপযোগী। এই তরঙ্গ-সংখ্যা নিরূপণ করা আজ আর কঠিন কিছু নয়। তারপর এই তরঙ্গ-সংখ্যার ভিত্তিতে এমন মাইক্রো-ওয়েভ সৃষ্টি করা সম্ভব যা অন্য যে কোন তরঙ্গ-সংখ্যা থেকে স্থায়ী—বাইরের কোন প্রভাবে এর স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। তারপর এই মাইক্রো-ওয়েভকে ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে কমিয়ে হাজার সাইক্‌লে পরিণত করা হয়। এই হাজার সাইক্‌লের সাহায্যে একটি সাধারণ ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই নিয়ন্ত্রিত ঘড়ির নামই হচ্ছে পারমাণবিক ঘড়ি। পারমাণবিক ঘড়ি অভ্রান্ত সময়-রক্ষক। সাধারণ পেণ্ডুলাম ঘড়ির সময় পৃথিবীর আবর্তনের উপর নির্ভরশীল—পৃথিবীর বৃত্তাভাস আবর্তন-কক্ষের দরুণ গ্রহ-উপগ্রহের পরিবর্তনশীল দূরত্বে প্রভাবান্বিত হয়। তবে পেণ্ডুলাম ঘড়ির অভ্রান্ততা একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশী নাহলেও, পারমাণবিক ঘড়িতে বাইরের কোন প্রভাব কার্যকরী নয় বলে তার সময় অতিমাত্রায় অভ্রান্ত। পারমাণবিক ঘড়ির আবিষ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাইকেলসন ও মর্লি পৃথিবীর আবর্তন গতিতে আলোর গতি প্রভাবান্বিত হয় কি না, পরীক্ষা করেছিলেন। তখন কোন প্রভাব লক্ষিত হয় নি। এখন সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে তা আবার যাচাই করে দেখা সম্ভব হবে। তা ছাড়া আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত কালের সঙ্কোচন মাপাও সম্ভব হবে।

একটি পারমাণবিক ঘড়ি কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপন করা হবে, আর একটি থাকবে পৃথিবীতে। বেশ কিছুদিন ধরে এই দুটা ঘড়ির সময় তুলনা করা হবে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা মতবাদ অনুসারে দুটা ঘড়ির সময়ের পার্থক্য দিন দিন বেড়ে যাবার কথা।

এই সময়ের পার্থক্য খুব বেশী হবে না; কারণ উপগ্রহের গতি হচ্ছে মাত্র সেকেণ্ডে ৫ মাইল বা ৮ কিলোমিটার। আশা করা যায়, এক মাসের ভিতর সময়ের পার্থক্যটা নির্ভরযোগ্যভাবে মাপা চলবে। উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে সময়জ্ঞাপক বেতার-তরঙ্গের কক্ষপথে উপগ্রহের অবস্থিতি ও পৃথিবীর আয়ন-মণ্ডলের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও এক মাস ধরে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঐ দুটা ঘড়ির মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য পাওয়া যাবে, তা অভ্রান্ত হবে বলেই আশা করা যায়। মার্কিন ও রুশ দেশে এই পরীক্ষার জন্যে বেশ তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে।

কেউ কেউ উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একটি এবং নীচু উপত্যকায় একটি পারমাণবিক ঘড়ি স্থাপন করবার প্রস্তাব করেছেন,। উঁচু পাহাড়ের আবর্তন গতি উপত্যকার তুলনায় বেশী হলেও এই পরীক্ষার ফল উপগ্রহের পরীক্ষার মত অত সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য হবে না।

অনেক কাল ধরে মানুষ আকাশকে জয় করবার স্বপ্ন দেখে এসেছে। আকাশ জয় করতে করতে আজ সে স্বপ্ন দেখছে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার। স্থান জয়ের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে কালকে জয় করবার সম্ভাবনা। যে কাল 'নিরবধি' বয়ে চলেছে, সে মহাকালের পায়ে মানুষ শিকল পরিয়ে দিতে চলেছে।

ভূত্বক ও ভূ-অভ্যন্তর

শ্রীমিহির বসু

জন্ম নিয়েই মানুষ যে পৃথিবীকে দেখেছে, সেই পৃথিবীকে চেনবার ইচ্ছা তার স্বাভাবিক। এই জিজ্ঞাসা থেকে ভরে উঠেছে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার, খুলে দিয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এক নতুন দিক। মানুষ জানতে পেরেছে ভূ-কম্পনের প্রকৃত রূপ, আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের গুপ্ত ইতিহাস, পর্বতের জন্ম কথা। পৃথিবীর ভিতর ও বাইরের অনেক কথাই আজ মানুষের অজানা নয়। পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের প্রাথমিক জ্ঞান স্বভাবতঃই তার নিরীক্ষার উপর গড়ে উঠেছে। তারপর বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানের সীমা হয়েছে ধীরে ধীরে প্রসারিত।

আজ আমরা জেনেছি আকাশের চাঁদ আর আমাদের মাটির পৃথিবীর মধ্যে তফাৎ কোথায়। রূপালী চাঁদের কাছে এলে দেখা যাবে, সেখানের ধূসর বন্ধুরতা, মৃত্যুর নিথর স্তব্ধতা। কারণ প্রাণের উপাদান সেখানে নেই—বাতাস নেই, জল নেই। আর তারই বিপরীত রূপ আমাদের পৃথিবীর, যেখানে আছে প্রাণের উচ্ছ্বাস আর প্রকৃতির বিচিত্র রূপের প্রকাশ। পৃথিবীর উপরের মত নীচেও আছে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য।

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে এক বায়ুমণ্ডল (অ্যাট-মোস্ফিয়ার)। এই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নামতে নামতে এক সময়ে আমরা পাই প্রাণের স্পর্শ। এখানেই জীবমণ্ডলের সুরু। পৃথিবীর এই জীব-জগৎ বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল ও ভূত্বকের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর জলরাশির আধার যে কঠিন ভূভাগ, তাকে বলা হয় ভূত্বক (ক্রাস্ট)। এই কঠিন ভূত্বকের মধ্য দিয়ে নামতে সুরু করলে বিভিন্ন প্রকৃতির স্তরের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরী এই স্তরগুলি পৃথিবীর মধ্যে মণ্ডলাকারে সাজানো রয়েছে।

পৃথিবীর মণ্ডলাকার রূপকে আমরা এই ভাবে প্রকাশ করতে পারি—

	প্রধান উপাদান	অবস্থা	গভীরতা (কিঃ মিঃ)
বায়ুমণ্ডল—	অম্লজান, অঙ্গারাম্ল, জল, নাইট্রোজেন, দুষ্প্রাপ্য গ্যাস	গ্যাসীয়	
জীবমণ্ডল—	জল, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ	জলীয় ও গ্যাসীয়	
জলমণ্ডল—	জল, লবণ	জলীয় (কঠিন)	৩·৮০
ভূত্বক—	সিলিকীয়	কঠিন	৩০·০
ম্যাণ্টল্	,,	,,	২৮৭০
অন্তঃস্থল	,, নিকেল ইঃ	? কঠিন আংশিক তরল	৩৪৭১

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূত্বক, ভূ-ম্যাণ্টল্ ও ভূ-অন্তঃস্থলের জন্ম বোধ হয় ভূতাত্ত্বিক যুগ সুরু হওয়ার (বাতাস ও জল উৎপত্তির) আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের বণ্টন তাদের ঘনত্ব অনুসারে হয় নি, হয়েছিল কয়েকটি ভূ-রাসায়নিক নিয়মের প্রভাবে। যেমন ধরা যাক, থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম—এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির ঘনত্ব খুবই বেশী, কিন্তু তবু তারা ভূ-অন্তঃস্থলে না গিয়ে পৃথিবীর উপরে, অর্থাৎ ভূত্বকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলো। কারণ এই, ভূত্বকের উপাদান-গুলির (প্রধানতঃ সিলিকন) প্রতি তাদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

ভূত্বকের প্রকৃতি ও রূপের অভিব্যক্তির মূলে যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, তার সম্পূর্ণ কারণ নির্ধারণ আজও শেষ হয় নি বা সম্ভব হয় নি। ভূপৃষ্ঠের বিশালতা ও বৈচিত্র্যই এর কারণ হতে পারে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিকদের পরস্পর বিরোধী মতবাদ অনেক ক্ষেত্রে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তবে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার করলে আমরা একটা মূল সূত্রের সন্ধান পেতে পারি।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে স্থল ও জলভাগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। যেমন—তাদের ত্রিকোণাকার গঠন ও আপেক্ষিক অবস্থান। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের এবং দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের প্রাধান্য, সুমেরু বৃত্তের ভূখণ্ড ও কুমেরু বৃত্তের চতুর্পার্শ্বস্থ জল-খণ্ডের পরিবেষ্টন, তাছাড়া জল ও স্থলের প্রতিপাদ অবস্থান। এই সব তথ্য থেকে এক সাধারণ মতবাদ প্রচার করেছিলেন লোথিয়ান গ্রিন তাঁর চতুস্তলক প্রকল্পে। এই প্রকল্পে বলা হয়েছে যে, চতুস্তলকের আকৃতি বিশিষ্ট পৃথিবীতে তলগুলি অধিকার করে আছে জলভাগ ও চারটি কোণে আছে স্থলখণ্ড। কিন্তু ভূ-গোলকের চতুস্তলক রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাছাড়া দক্ষিণ গোলার্ধ জুড়ে এক সময়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডের কথা স্বীকার করে নিলে চতুস্তলক প্রকল্পের অসারতা প্রতিপন্ন হয়।

ভূপৃষ্ঠ ও ভূত্বকের প্রধান চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা তার উপাদান সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করতে পারি। ভূত্বকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আজও সম্ভব হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর এই কঠিন ক্ষীণ বহিরাবরণ, ভূগর্ভস্থ অকেলাসিত স্তরের উপর একটি কেলাসিত স্তর মাত্র। এই ত্বকের প্রধান উপাদান আগ্নেয় শিলা হলেও স্থানে স্থানে পলল শিলার ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন আবরণ আছে। বিভিন্ন দেশের স্তরায়ণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানকার পলল শিলাগুলির সব নীচে রয়েছে এক অতি প্রাচীন কেলাসিত প্রস্তর ভূমি। এই কঠিন কেলাসিত ভূমিই হচ্ছে ভূত্বকের উপরিভাগ। ভূত্বকের প্রথম দশ মাইল পর্যন্ত শিলা উপাদান এই রকম—

আগ্নেয় ও পরিবর্তিত শিলা	... ...	৯৫%
কাদা পাথর	... ...	৪%
বেলে পাথর	... ...	০·৭৫%
চুনা পাথর	... ...	০·২৫%

স্যুয়েস পৃথিবীর একটা ত্রিতলীয় রূপ ধারণা করে নিয়েছেন। সর্বোপরি গ্রানিটজাতীয় পাথরের একটি স্তর, যার নাম সিয়াল; কারণ সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম এই স্তরের প্রধান উপাদান। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫ থেকে ২.৯০। স্যুয়েস বলেছিলেন যে, ভূমণ্ডলের বিভিন্ন মহাদেশগুলি সিয়াল স্তরে তৈরী এবং তারা আর একটি অপেক্ষাকৃত ভারী স্তরের উপর ভাসছে। শেষোক্ত স্তরের নাম সিমা; কারণ তাতে আছে সিলিকা ও ম্যাগ্নেসিয়ামের প্রাধান্য। সিমা স্তর সিয়াল স্তরের চেয়েও পুরু ও গুরু (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯০ থেকে ৪.৭৫)। সিমা স্তরের প্রধান পাথর হলো বেসাল্ট ও গ্যাব্রো গোত্রের পাথর। সিমা স্তরের অনেক নীচে হলো পৃথিবীর অন্তঃস্থল বা নিকেল (নিকেল ও লৌহ প্রধান মণ্ডল)-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১১। সিয়াল স্তরের গভীরতা পৃথিবীর সব জায়গায় সমান নয়। যেমন, মহাদেশীয় অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার, আটলাণ্টিক অঞ্চলে ৫-১৫ কিঃ মিঃ, হিমালয় অঞ্চলে ০-১০০ কিঃ মিঃ, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ০ কিঃ মিঃ। মহাদেশের গড় উচ্চতা ½ মাইল।

অবশ্য এই সব ধারণাটাই সমস্থিতির (Isostacy) স্বীকৃতির উপর নির্ভর করছে। তবে ইতিমধ্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, উপরের হাল্কা পাথরের স্তর নীচেকার অপেক্ষাকৃত ভারী পাথরের উপর

ভাসছে। বরফ জলে ভাসবার সময় যেমন খানিকটা মাথা তুলে থাকে, মহাদেশগুলিও তেমনি খানিকটা উপরে বেরিয়ে আছে। ভেসে-থাকা ও ডুবে-থাকা অংশের মধ্যে একটা অনুপাত আছে। পর্বত, মালভূমি ইত্যাদির অনুপাতিক অংশ সিমার মধ্যে ডুবে আছে; অর্থাৎ সিয়াল ও সিমা স্তরের সীমানা খুব মসৃণ নয়।

যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরের রূপকে জানতে পেরেছি, সে হলো ভূপৃষ্ঠের পাথর, মহাশূন্যের উল্কাপিণ্ড ও ভূগর্ভস্থ ভূকম্পনের প্রকৃতি ইত্যাদি। এর মধ্যে ভূকম্পনের প্রকৃতি থেকেই সবচেয়ে মূল্যবান ও সঠিক তথ্যাদি জানা গেছে। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে যখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, তখন কম্পন-তরঙ্গ সেখান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কম্পন-তরঙ্গ প্রধানতঃ দু-রকমের। প্রথমতঃ, দীর্ঘ তরঙ্গ যা কেবল ভূপৃষ্ঠের প্রস্তর স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, আর দ্বিতীয় তরঙ্গ যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই তরঙ্গ ভারী ও কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি যায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, ভূকম্পন তরঙ্গ যখন কোন মহাদেশের নীচ দিয়ে যায়, তখন তার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। যখন তরঙ্গ সাগরতলের প্রস্তর স্তরের মধ্য দিয়ে যায় তখন গতিবেগ হ্রাস পায়। এই থেকে ধারণা হয়েছে যে, গ্র্যানিট ও ঐ জাতীয় পাথর দিয়ে মহাদেশগুলি গঠিত, আর তার নীচে, অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে বেসাল্ট ও ঐ জাতীয় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ভারী পাথর। এই দুটি প্রস্তরের স্তর এক সঙ্গে প্রায় ৩০ মাইল পুরু। এও লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, দ্বিতীয় প্রকার তরঙ্গ যতই পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করে ততই তার গতিবেগ বেড়ে যায়। তবে ১৮০০ মাইলের নীচে এই গতির হার বদলে যায়। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যে ক্রমশঃ ভারী পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়েছে, তা প্রমাণিত হচ্ছে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠ থেকে এক মাইল নীচে প্রতিবর্গ ফুটে পাথরের চাপ ৭৫০ টন; কিন্তু কেন্দ্রের কাছে এই চাপ প্রায় ২০ লক্ষ টন। সুতরাং ভূস্তরের নীচেকার পদার্থ আর যাই হোক, সাধারণ পাথর নয়। পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের পাথরের গুরুত্ব হচ্ছে ৩.০। সুতরাং এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এমন কিছু দিয়ে তৈরী যার গুরুত্ব প্রায় ১২। আঠারশ' মাইল পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যে কঠিন, তা দেহ-তরঙ্গের সঞ্চরণ থেকে জানা যায়। কিন্তু ১৮০০ মাইলের নীচে পৃথিবীর অন্তঃস্থল খুব সম্ভব তরল; কারণ এর মধ্য দিয়ে আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ* দেহ-তরঙ্গটি প্রবাহিত হতে পারে না। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের আগে অবশ্য অনেকেই মনে করতেন যে, পৃথিবী বেশ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। কিন্তু এই আবিষ্কারের পর পুরনো ধারণাও পাল্টাতে সুরু করলো। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতিই প্রধানতঃ পৃথিবীর তাপ জোগাচ্ছে। তবে এসব উপাদানগুলি বিশেষ করে ভূস্তরের (প্রকৃত-পক্ষে সিয়াল স্তরের) মধ্যেই আবদ্ধ। তবে এটা ঠিক যে, এই তাপ বৃদ্ধি এমনভাবে হচ্ছে না যা পৃথিবীকে তরল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।

এই মাত্র আমরা যে ভূত্বকের পর্যালোচনা করলাম, সেই ভূত্বকে ছোট-বড় পরিবর্তন প্রতি-নিয়তই ঘটছে, যদিও মানুষের স্বল্পমেয়াদী জীবনে তা বড় হয়ে চোখে পড়ে না। কোন কোন যুগে এই পরিবর্তন দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে। যেমন ওয়েগ্নারের মতে—কার্বনিফেরাস যুগে, অর্থাৎ

---

* দেহ-তরঙ্গের দুটি রূপ আছে। একটিতে মাধ্যমের কণাগুলি তরঙ্গের গতিপথের সঙ্গে লম্বভাবে কম্পিত হয়; সুতরাং আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ। অপরটিতে তরঙ্গের মাধ্যম গতিপথের দিকে কম্পিত হয়; সুতরাং শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ। প্রথমোক্ত তরঙ্গটি তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না।

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে সিয়াল স্তর দিয়ে গঠিত এক বিশাল মহাদেশ পৃথিবীকে ঢেকেছিল। একে ঘিরে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর। সে সময়ে ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া একত্রিত ছিল। এই কার্বনিফেরাস যুগের পর থেকে বর্তমান জল ও স্থলভাগের ভৌগলিক সম্পর্ক সুরু হওয়ার সূচনা হয়। তখন এই বৃহৎ ভূখণ্ডটি ভাঙ্গতে সুরু করে। এই মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

কোন দেশের পাললিক শিলার স্তরক্রম আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে কখন কখন বহু যুগ ধরে পলল জমা হয়েছে এবং তারপর অল্প সময়ের মধ্যে সেই পললশিলা চাপের ফলে বিকৃত হয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠেলে উঠে পর্বতের জন্ম দিয়েছে। এই পর্বতোত্থানের যুগে স্বভাবতঃই পলল জমা বন্ধ থাকে। তাছাড়া ভূখণ্ডের কোন কোন স্থানে পললের গভীরতা এবং কোথাও পললের ক্ষীণ বিস্তার থেকে বোঝা যায়, পললের ইতিহাস যুগে যুগে ও স্থানে স্থানে বদ্‌লে গেছে। অর্থাৎ পললের জন্ম দিয়েছে যে জলরাশি তা কখনও ভূখণ্ডের উপর এসেছে, আবার কখনও বা ভূখণ্ড থেকে সরে গেছে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, এই ভূখণ্ড কখনও নীচে নেমেছে, আবার কখনও উপরে উঠেছে। তবে এই পরিবর্তন খুবই ধীরে ধীরে ঘটেছে। ভূস্তরের এই ধরণের পরিবর্তনকে বলা হয়েছে Epirogeny। কার্বনিফেরাস, জুরাসিক ও ক্রিটেসাস যুগে (৩০ কোটি থেকে ১০ কোটি বছর আগের ইতিহাসে) সমুদ্রের জল বার বার ভারতের উপকূল থেকে এই ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

আর ভূত্বকের যে পরিবর্তনের ফলে যুগে যুগে পললশিলা বিকৃত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করেছে তাকে বলা হয়েছে Orogeny। আজ থেকে ৬ কোটি বছর আগে ভারতের উত্তরে এমনি একটি ঘটনার সূচনা হয়েছিল। সেদিনের টেথিস সাগরের জল ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিল, আর তার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল আজকের গিরিরাজ হিমালয়।

প্যাভ্‌লব

শ্রীসন্তোষকুমার দে

পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অভিযানের যুগে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির বিষয় সাধারণ মানুষের অনুসন্ধিৎসা যেন অনেকটা কমে এসেছে। তাই সাধারণ মানুষ আজ স্পুট্‌নিকের খবর যতটা রাখে, জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বা শারীর-বিজ্ঞানের খবর ততটা রাখে না—একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। সেই জন্যেই মনে হয়, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইভান পেট্রোভিচ প্যাভ্‌লবের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি সাধারণ শিক্ষিত লোকের কাছে মোটামুটি অজানা রয়ে গেছে। প্যাভ্‌লব ছিলেন এক তত্ত্বদর্শী অনুসন্ধিৎসু গবেষক; সমস্ত জীবনটা গবেষণাগারেই কাটিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে নিয়েছেন চিরবিদায়। শারীর-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি, যেমন—রক্তসংবহনতন্ত্র, পাচনতন্ত্র, শ্বসন ও সংজ্ঞাতন্ত্র (সেন্সরি সিষ্টেম), আপেক্ষিক শারীর-বিজ্ঞান, ফলিত নিদান-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু গবেষণা করেছেন। এসব অসংখ্য গবেষণার মধ্যে তাঁর তিনটি গবেষণাকে যুগান্তকারী বলা যেতে পারে। এই তিনটি হলো—রক্তসংবহনতন্ত্র (অবশ্য মিচুরিনের গবেষণা প্যাভ্‌লবের গবেষণা অপেক্ষা আরও বিস্ময়কর), পাচকগ্রন্থিতত্ত্ব এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী (কন্‌ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স)। শেষোক্তটি প্যাভ্‌লবের একান্ত নিজস্ব। তিনি যদি আর কোন বিষয়ে গবেষণা নাও করতেন, তথাপি এই একটি মাত্র গবেষণার জন্যে হয়ে থাকতেন চির-স্মরণীয়।

এই নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী জিনিষটা হলো—যে কোন জীবের উপর কোন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করলে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। খাবার দেখলেই জিভে জল আসে, খেতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু এই ইচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রিত করা চলে। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস ধরলেই তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হতে থাকবে। এখন যদি কুকুরটিকে প্রত্যেকবার খাবার দেবার সময় একটা ঘণ্টা বাজানো যায় বা আলো জ্বালা হয়, তাহলে ঐ ঘণ্টার শব্দ বা আলোটি লালাগ্রন্থির উপর প্রতি-ক্রিয়া জাগিয়ে তুলে লালা নিঃসরণে সাহায্য করবে এবং কিছুদিন অভ্যাস করালে মাংসখণ্ড না দেখলেও কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হতে থাকবে এবং ঘণ্টার শব্দ না শুনলে বা আলোক-রশ্মি না দেখলে আর খেতে চাইবে না বা ক্ষুধাবোধ করবে না। শব্দ বা আলোর সঙ্গে লালা নিঃসরণের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বা সহজাত নয়—এ সম্বন্ধটি হলো শিক্ষালব্ধ। এই শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী বলা হয়। প্রতিবর্তী নিম্নলিখিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।

(উঃ = উত্তেজক, প্র = প্রতিক্রিয়া)

উঃ$_1$→প্র$_1$ (লালা নিঃসরণ, স্বাভাবিক প্রকাশ)

উঃ$_2$ (আলোকরশ্মি বা ঘণ্টার শব্দ)→প্র$_2$ (আলোক বা শব্দের প্রতিক্রিয়া, স্বাভাবিক প্রকাশ)

উঃ$_1$ + উঃ$_2$ (একই সময় উপস্থাপিত)→প্র$_1$ (লালা নিঃসরণ) বার কয়েক পরীক্ষা

উঃ$_2$ (আলোক বা ঘণ্টার শব্দ)→প্র$_1$ (লালা নিঃসরণ)

এইবার আলোকরশ্মি দেখলে বা ঘণ্টার শব্দ শুনলেই লালা নিঃসরণ হতে থাকবে এবং তখন লালা নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

১৮৪৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রিয়াজন শহরে এক দরিদ্র পুরোহিতের ঘরে প্যাভ্লবের জন্ম হয়। পিতা পুরোহিত হলেও অবস্থা তাঁর স্বচ্ছল ছিল না—ঘরের কাছে একখণ্ড জমিতে শাকসব্জি চাষ করে অর্থকৃচ্ছতা খানিকটা দূর করবার চেষ্টা করতেন। বালক প্যাভ্লব সানন্দে পিতাকে এই কাজে সহায়তা করতো। এইভাবে অল্প বয়স থেকেই প্যাভ্লবের শারীরিক পরিশ্রমের উপর অনুরাগ জন্মায়। ফলে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এ অভ্যাসটি ছাড়তে পারেন নি। বিদ্যারম্ভ হয় তাঁর সাত বছর বয়সে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে চারটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। তাই এগারো বছর বয়সে এক পাদরি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে জনকয়েক অতি যোগ্যতাসম্পন্ন চিন্তাশীল শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শে যা লাভ করলেন, চিরদিনের জন্যে তা অক্ষয় হয়ে রইলো। এই সময় বেলেনিস্কি, হারজেন, চেরোনিস্কি, ডেরোলিবভ প্রভৃতি প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা, সমাজ-জীবনে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা চলছিল, তার বিরুদ্ধে চালাচ্ছিলেন আপোষহীন সংগ্রাম। এর প্রতিক্রিয়া প্যাভ্লবের জীবনে এসে পড়ে। ফলে তিনি বুঝতে পারেন, সমাজ-জীবনের, তথা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে জীব-বিজ্ঞান ও শারীর-বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন। যাই হোক, পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সকলেই ভেবেছিল পৌরোহিত্যকে সে জীবনের বৃত্তি বলে বেছে নেবে; কিন্তু প্যাভ্লব তা না করে সেণ্ট পিটার্স-বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Ilya Fadeyevich Tsyon-এর অধীনে শারীর-বিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং শীঘ্রই অগ্ন্যাশয় নার্ভ (Pancreas nerve) সম্বন্ধে এক মৌলিক গবেষণা-মূলক নিবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৭৫ সালে স্নাতক উপাধি লাভ করবার পর বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু সে যুগে সহায়-সম্পদহীন অপরিচিত যুবকের পক্ষে ডিগ্রি মাত্র সম্বল করে অধ্যাপকের পদ পাওয়া এবং সেই সঙ্গে গবেষণা করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে জুটলো। এই সময় তাঁর অধ্যাপক টাইসন একটি সামরিক বিদ্যালয়ে শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পেয়ে তাঁকে সহকারী করে নিলেন; কিন্তু টিঁকে থাকতে পারলেন না। টাইসন সেখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকেও বিদায় নিতে হলো।

আবার আরম্ভ হলো জীবনসংগ্রাম। অনেক চেষ্টার পর এক পশু-চিকিৎসা কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক উস্তিমোভিচের সহকারী পদ পেয়ে গেলেন এবং সেই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজেও পড়াশুনা আরম্ভ করে দিলেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম সংজ্ঞানাশক কোন ওষুধ না দিয়েই কুকুরের রক্তচাপ পরিমাপে সাফল্য লাভ করেন। ১৮৭৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাস করে স্নাতকোত্তর পাঠের জন্যে দু-বছরের জন্যে একটা বৃত্তি পেলেন। ডাক্তারী পাস করলেন বটে, কিন্তু কোন দিনই ডাক্তারী করলেন না। এই সময়কার ঘটনা উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে লিখেছেন—ডাক্তারী করবার জন্যে ডাক্তারী পাস করি নি, ডাক্তার হয়েছিলাম শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পাবার আশায়। এই কলেজে চাকরদের থাকবার একটা ঘরকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তিনি নিজের গবেষণাগার করে নিলেন। যৌবনের প্রথম দশটি বছর কাটিয়ে দিলেন এখানে বিজ্ঞানের সাধনায়, পরিচয় রেখে গেলেন নিজের সৃজনধর্মী প্রতিভার। না ছিল যন্ত্রপাতি, না ছিল পশুপক্ষী কিনে পরীক্ষা চালাবার মত পয়সা—শুধু বুকে ছিল অসীম আশা আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

ঠিক এমনি অসুবিধার মধ্য দিয়ে গবেষণার কাজ চালাতে হয়েছিল আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্র

ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে। এই খানেই দুই দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত মিল। অনেক সময় পেট ভরে তার খাওয়া জুটতো না—যা রোজগার করতেন, জন্তুজানোয়ার কিনে তা খরচ করে ফেলতেন। এই সময়ের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ ছিল যে, স্বাধীনভাবে নিজের গবেষণাগারে বসে কাজ চালাবার সুযোগ পেয়েছি। এই সময় যে স্নায়ুগুলি অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তার সন্ধান পান; হৃৎপিণ্ডকে ফুস্‌ফুস থেকে বিচ্ছিন্ন করবার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানোর বিষয় কিছু কিছু গবেষণা চালান। মুস্কিল হলো—এই সময়ে বিয়ে করে বসেন—ফলে, সংসারের অর্থকৃচ্ছ্রতা আরও বেড়ে ওঠে। ১৮৯০ সালে মিলিটারি মেডিক্যাল অ্যাকাডেমিতে ভেষজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এর পাঁচ বছর পরেই জীবনের কাম্য শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এখানেই ৪১৫ বছর ধরে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যান জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। এতদিনে সাফল্য ও সুখ্যাতি অজস্র ধারায় তাঁর উপরে বর্ষিত হতে লাগলো—সায়েন্স অ্যাকাডেমির সভ্য হলেন এবং নোবেল পুরস্কার পেলেন। সুখের মুখ দেখলেন—অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হলো।

এতদিনে মনের মত করে একটা গবেষণাগার তৈরী করতে মনস্থ করলেন। সাধারণের কাছে অর্থ ভিক্ষা করলেন এবং পেলেনও। এই অর্থে নীরব প্রাসাদ (টাওয়ার অব্ সাইলেন্স) নামে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগার তৈরী হলো। এই গবেষণাগারেই পাচক-গ্রন্থি (ডাইজেস্‌টিভ গ্ল্যাণ্ড) এবং নিয়ন্ত্রিত প্রত্যাবর্ত বিষয়ে গবেষণা করে জগৎ-বরেণ্য হলেন।

জারের শাসনকালে প্যাভ্‌লব না পেয়েছিলেন গবেষণার সুবিধা, না পেয়েছিলেন সম্মান বা প্রতিপত্তি। সোভিয়েট সরকার তাঁকে দিলেন প্রচুর সম্মান। ৭৫তম জন্মদিবসে তাঁর নামে এক নতুন শারীর-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সরকার তাঁকে সম্মানিত করলেন। তাঁর অশীতিতম জন্মদিবস পালিত হলো লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে কলটুসি গ্রামে সিটি অব্ সায়েন্স নামে এক বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করে। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের হাতে সরকার দিলেন প্রচুর অর্থ—নিত্য নতুন গবেষণার কাজ চালাবার জন্যে। তাঁর ৮৫তম জন্মদিবস পালিত হলো গবেষণার জন্যে তাঁর হাতে অপরিমিত অর্থ দিয়ে। সেদিন সোভিয়েট জন-সংস্থা (Sovnarkom) তাঁকে অভিনন্দন জানালো —হে সুধি, সাধক, জ্ঞানতাপস, অভিনন্দন নাও জনসংস্থার। তোমার স্বাস্থ্য, শক্তি, কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি আমরা। জ্ঞানের আলোকে দেশকে করে তোল মহীয়ান। উত্তরে প্যাভ্‌লব বলেছিলেন—আমারও মন চায় অনেক দিন বেঁচে থাকতে; কারণ আমার গবেষণাগার দিন দিন উন্নতিলাভ করছে। সরকার আমার কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমি চাই এ অর্থব্যয় সার্থক হোক, দেশের মাটিতে বিজ্ঞান শাখা-প্রশাখা মেলে পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠুক। এর ঠিক দু-বছর পরে ৮৭ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্যাভ্‌লব ছিলেন খুব খাঁটি লোক। স্বজাত্যাভিমান ছিল তাঁর অভ্রভেদী। ১৯২৭ সালে একবার তাঁর কঠিন অস্ত্রোপচার করবার দরকার হয়। ডাক্তারেরা একবাক্যে বলেন, জার্মেনি থেকে একজন নামজাদা অস্ত্রোপচারককে আনা হোক; কিন্তু প্যাভ্‌লব বাধা দিয়ে বললেন—আমার দেশের অস্ত্রোপচারকদের চেয়ে জার্মান অস্ত্রোপচারকেরা যে ভাল, একথা স্বীকার করতে আমি রাজী নই। দেশে এত বড় বড় অস্ত্রোপচারক থাকতে তাঁদের বাদ দিয়ে জার্মান অস্ত্রোপচারক আনতে আমি কিছুতেই দেব না। সুতরাং

সোভিয়েট অস্ত্রোপচারক ডাঃ মার্টিনোভ এই কঠিন অস্ত্রোপচার করে তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করেন।

প্যাভ্‌লব বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের বিজ্ঞানীরা যেন তাঁরই মত বিজ্ঞানকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে। তাই যুবকদের প্রতি পত্রে তিনি (লেটার টু দি ইয়ুথ) বলেছিলেন—বিজ্ঞান চায় মানুষের কাছে তার সারা জীবনের অকুণ্ঠ সেবা। এক জীবনে তো নয়ই, দুটি জীবন এক সঙ্গে পেলেও বিজ্ঞানের সেবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তিনি চেয়েছিলেন, শারীর-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভেষজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিবিড় করে গড়ে তুলতে। শারীর-বিজ্ঞান পঠন-পাঠন বিষয়ে বলতেন, দেহ-যন্ত্রের প্রতিটি যন্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে। একটি বক্তৃতায় একবার বলেছিলেন, যে যন্ত্র-বিজ্ঞানী যন্ত্রের প্রতিটি অংশ খুলে দেখে পরীক্ষা করে তার দোষগুণ বিচার করতে পারেন, তিনিই হলেন যথার্থ যন্ত্র-বিজ্ঞানী। তেমনি যে শারীর-বিজ্ঞানী দেহ-যন্ত্রের যে কোন বিকারগ্রস্ত অংশকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাকেই বলবো জীবন-তত্ত্বে তাঁর জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্যাভ্‌লবের সময় পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করা ছিল এক অতি দুরূহ ব্যাপার। তিনি এ কাজ হাতে নিয়ে ত্রিশটি কুকুরের পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করেন; কিন্তু সব কটি কুকুরই মারা যায়। এ অবস্থায় অন্য কেউ হলে হতাশায় মুস্‌ড়ে পড়তেন; কিন্তু প্যাভ্‌লব কোন কাজ হাতে নিয়ে সহজে ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না—বৎসরাধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এ কাজে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক দুঃসাহসী বিপ্লবী; তবু কোন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করবার আগে বারবার তাকে পরীক্ষা করে দেখতেন এবং তাঁর প্রচারিত নতুন তথ্য বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতেন না।

জার-শাসিত রাশিয়ায় প্যাভ্‌লব্ ছিলেন অবহেলিত, অনাদৃত। সে দিন দেশের সরকার তাঁর প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখাতে পারেন নি; কিন্তু এ গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল সোভিয়েট সরকারের অকৃপণ অর্থানুকুল্য ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে। তাঁর স্মৃতিকে চিরদীপ্যমান রাখবার জন্যে সোভিয়েট সরকার তাঁর নামে দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। একটি হলো প্যাভ্‌লব ইনষ্টিটিউট অব্ ফিজিওলজি, অপরটি হলো নিউ ইনষ্টিটিউট অব্ হায়ার নারভাস অ্যাকটিভিটি।

মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৯৩৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে আন্তর্জাতিক শারীর-বিজ্ঞানীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা একবাক্যে প্যাভ্‌লবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শারীর-বিজ্ঞানী বলে ঘোষণা করেন।

তোৎলামি

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

স্পষ্ট উচ্চারণ করবার সময় বাকযন্ত্রের কোন প্রকার সাময়িক বৈকল্য ঘটলে শব্দ উচ্চারণে বাধা জন্মে এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলি বারংবার উচ্চারিত হতে থাকে। একই অক্ষরের বারংবার উচ্চারণকে তোৎলামি বলা হয়। যারা এইভাবে কথা বলেন তাঁদের তো অসুবিধা হয়-ই, উপরন্তু যিনি কথা শোনেন তারও খারাপ লাগে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, তোৎলামি একরকমের রোগ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ রোগ সারানো মোটেই কষ্টকর নয়।

কথা বলবার সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোৎলামি হয় না। সেজন্যে কথা কি করে সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। শ্বাসনালীর মুখে কোমলাস্থির একটি পেটিকা আছে। সেটিকে বলা হয় স্বরযন্ত্র বা Larynx। স্বরযন্ত্রের মধ্যে দড়ির মত দুটি টানা আছে। এর নাম ভোকাল কর্ড। প্রশ্বাস বায়ুর ধাক্কা লেগে ভোকাল কর্ডটি কাঁপতে থাকে; ফলে এখানে স্বরোৎপত্তি হয়। জিভ, দাঁত, ঠোঁট প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে ঐ স্বর কথা রূপে প্রকাশ পায়। স্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ কথা বলা নির্ভর করে তিনটি বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর—(১) বাতাস পাবার জন্যে শ্বাসযন্ত্র, (২) স্বর উৎপাদন করবার জন্যে স্বরযন্ত্র এবং (৩) সুসংবদ্ধ কথা বলবার জন্যে ঠোঁট, জিভ, চিবুক এবং প্যালেটের মাংসপেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যখনই এই তিনটি যন্ত্রের কাজের সামঞ্জস্য থাকে না তখনই তোৎলামি সুরু হয়।

অনেকে তোৎলামিকে বংশগত রোগ বলে মনে করেন। একথা সর্বাংশে সত্য না হলেও লক্ষ্য করা গেছে যে, তোৎলা পরিবারের ছেলেমেয়েরাও বেশীরভাগ তোৎলা হয়। বয়স অনুসারে তোৎলাদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(১) কিশোর তোৎলা, (২) বয়স্ক তোৎলা। শিশু যখন কৈশোরে উপনীত হয়, বয়সের সেই সন্ধিক্ষণে তাদের মনে একটা আত্মসচেতনতার ভাব আসে। এই আত্মসচেতনতা উত্তেজনা এনে দেয়। অতিরিক্ত উত্তেজনা বাকযন্ত্রের কর্মধারায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে তোৎলামি হয়। কিশোরীদের চেয়ে কিশোরদের মধ্যে তোৎলামির মাত্রা বেশী দেখা যায়। তার কারণ বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের লাজুকতা ও আত্মসচেতনতার ভাব আগে আসে। প্রাথমিক শৈশব অবস্থাতে বা বাল্যজীবনে গোড়ার দিকে কোন ছেলেমেয়ে তোৎলা থাকে না, কিন্তু যখন থেকে লাজুকতা ও আত্মসচেতনতা বাড়তে থাকে, তখন থেকে ছেলেদের তোৎলামি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এই সঙ্গে একথা বলে নেওয়া ভাল যে, সব কিশোর তোৎলা হবে—একথা ভাবা অত্যন্ত ভুল।

হাম, ডিপ্‌থিরিয়া, হুপিংকাশি প্রভৃতি কয়েকটি কষ্টদায়ক রোগের পর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল থাকবার সময় লোকের সাময়িকভাবে তোৎলামি আসে। হঠাৎ ভয় পেলে অথবা গুরুতর উত্তেজনায় তোৎলামি দেখা দেয়। গৃহ এবং তার পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার উপর শিশু বা কিশোরদের তোৎলামির উৎপত্তির কারণ নির্ভর করে। কোন কারণে মা-বাবা সম্বন্ধে বিরাগ, কোন রকম পক্ষপাতিত্বের ফলে ঈর্ষা, অতিরিক্ত আদর অথবা অতিরিক্ত কড়াকড়ি—এমন কি, বারে বারে শিক্ষক পরিবর্তনের ফলেও শিশুর তোৎলামি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। বয়স অনুসারে কিশোর তোৎলা-

দের প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) জন্মাবার পর প্রথম দু-বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন অনেকে তোৎলায়; (২) যারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখে তারা ছয় থেকে আট বছর পর্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, কিন্তু তার পরে অনেকে সাময়িকভাবে তোৎলা হয়।

দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই শিশু কথা বলবার অভ্যাস রপ্ত করে। কাজেই এ সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবাবস্থায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় আসে, যখন শিশু পড়তে বা লিখতে শেখে। এই সময় সে পড়া, লেখা ও কথা বলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করে।

ডাঃ অরটন শিশু বা কিশোর তোৎলাদের চারভাগে ভাগ করেছেন—(১) যারা প্রথম থেকে বাঁ হাতে সব কিছু কাজ করায় অভ্যস্ত হয়, তাদের যখন বাবা-মা ডান হাতে কাজ করতে শেখান তখন সেই সব শিশুরা তোৎলামি করে।

(২) যে সব শিশু দুই হাতের মধ্যে কোন হাতের প্রাধান্য বেশী হওয়া উচিত তা বুঝতে দেরী করে, তারা তোৎলা হয়।

(৩) তোৎলামি যাদের বংশগত।

(৪) যারা উল্লিখিত সব ত্রুটিমুক্ত, তাদেরও অনেকে তোৎলা হয়।

যারা ছেলেবেলায় তোৎলায় তাদের মনের মধ্যে সর্বদাই সঙ্কোচের ভাব থাকে। নিজেকে সব সময় ছোট মনে করে। এইভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে স্নায়বিক বিকার আসে এবং তারই ফলে বড় হলেও এদের অনেকে তোৎলা থেকে যায়। বড়দের মধ্যে যারা তোৎলায় তাদের তোৎলামি নানারকম স্নায়বিক বিকার থেকে আসে।

বয়স্ক তোৎলারা অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা সহজেই উত্তেজিত হয়, রাত্রে নিজের অজ্ঞাতেই বিছানায় মূত্রত্যাগ করে, রাত্রে অনর্থক ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে এবং প্রায়ই এদের মুখ, মাথা বা দেহের অন্য কোন অংশ থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। অনেকের ছোটবেলা থেকে তোৎলামির ফলে উত্তেজনা-কেন্দ্র অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বড় হলেও এই ত্রুটি অনেক ক্ষেত্রে থেকে যায়। কাজেই এরা সমাজে নিজেদের অন্তরঙ্গদের সঙ্গেও সহজে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না। তাছাড়া অপরিচিত লোকের সামনে যেতে হলে খুবই সঙ্কোচ বোধ করে, আর নিজেকে ছোট ভাবতে থাকে। শিশু তোৎলা এবং বয়স্ক তোৎলাদের মধ্যে তফাৎ এখানেই। শিশুদের মনোবিকার ঘটে না।

তোৎলামিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(১) Physiological stammering—কোন শব্দ উচ্চারণ করবার সময় কোন বিশেষ অক্ষরের উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে তাকে বার বার উচ্চারণ করাকে Physiological stammering বলে। সাধারণতঃ দুই থেকে চার বছরের শিশুরা যখন কথা বলতে শেখে, তখন এই ধরণের তোৎলামি সুরু হয়। অনেকে বলেন, যে শিশুর বুদ্ধি কম, সেই কথা বলবার সময় তোৎলায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক তোৎলা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণের চেয়ে বেশী থাকতে পারে, তার প্রমাণও অনেক পাওয়া গেছে।

(২) Pathological stammering অথবা Spasmophemia—স্বরযন্ত্র এবং শব্দ উচ্চারণের জন্যে প্রয়োজনীয় মুখের অন্যান্য অংশের কাজের সামঞ্জস্য না হলে এই শ্রেণীর তোৎলামি দেখা দেয়। শব্দের গোড়ার প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। এই শ্রেণীর তোৎলা লোকেরা ব্যঞ্জনবর্ণটিকে তাড়াতাড়ি বার বার উচ্চারণ করতে করতে শেষে সমস্ত শব্দটি বলে ফেলে। ইংরেজী ও বাংলাভাষার উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। এই শ্রেণীভুক্ত তোৎলা লোকেরা Perfectly simple কথাটিকে P-p-p-p-p-

Perfectly s-s-s-s-simple—এই ভাবে উচ্চারণ করে থাকে। মজা হচ্ছে এই যে, এরা শব্দের শেষাংশ বেশ স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে পারে। এবার বাংলাতে উদাহরণ দিচ্ছি; যেমন—ক-ক-ক-ক-কমল, ব-ব-ব-বসু ইত্যাদি।

তোৎলা লোকেরা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণটি আস্তোভাবে উচ্চারণ না করে সেখানেই তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেন।

ভাষাতত্ত্বের বইতে আমরা উষ্মবর্ণ, তালব্য বর্ণ, কণ্ঠ্যবর্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের কথা পড়ে থাকি। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখ এবং স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নানাভাবে কাজ করে। বর্ণ উচ্চারণের সময় যে অংশ বিশেষ কার্যকরী হয়—তার নামানুসারে বর্ণটির নামকরণ হয়ে থাকে। ইংরেজী এবং বাংলা দুই ভাষাতেই স্বরবর্ণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বেশী। সেই জন্যে উষ্মবর্ণ, তালব্য বর্ণ ইত্যাদি বর্ণ-তালিকার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাধিক্য থাকে। কাজেই ঐগুলি উচ্চারণ করতে হলে বাক্‌যন্ত্রের নানারকম কারসাজির প্রয়োজন। তোৎলাদের কাছে এই কাজ বেশ দুরূহ। সেজন্যে এরা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে অনাবশ্যক সময় দিয়ে থাকে। ইংরেজীতে, বিশেষভাবে B, D, P, T. K,G, S. ইত্যাদি এবং বাংলাতে ব, ড, প, ট, ত, থ, ক, জ, য ইত্যাদি উচ্চারণ করতে গিয়ে তোৎলারা বিপত্তি ঘটায়। অনেক সময় মানসিক আবেগের উপর তোৎলামির মাত্রা নির্ভর করে। যখন তোৎলা লোক কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে আসে তখন তার উত্তেজনা খুব বেড়ে যায়, ফলে তোৎলামির মাত্রা বাড়ে। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবার সময় এদের খুব কম অসুবিধা হয়। কচিৎ দু-একজন লোক দেখা যায়, যারা স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে তোৎলায়। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবার সময় তোৎলামির কারণ হচ্ছে, এই শ্রেণীর লোকের False vocal cord স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় অনাবশ্যকভাবে খিঁচুতে থাকে। এই খিঁচ-ধরা কমাবার জন্যে এরা বেশ বড় করে মুখ হাঁ করে। ঐ হাঁ-করা অবস্থায় উচ্চারিত শব্দগুলি শুদ্ধভাবে খুব তাড়াতাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা দম হারিয়ে না ফেলে, ততক্ষণ এভাবে একটানা কথা বলতে থাকে। পরে দম ফুরিয়ে গেলে আবার দম নিয়ে একইভাবে হুস্ করে বাকী কথা বলে ফেলে। সেক্সপীয়র তাঁর নাটকে স্বরবর্ণ উচ্চারণের উল্লিখিত বিপত্তি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। "I would thou couldst stammer, that thou mightst pour this concealed man out of thy mouth, as wine comes out of a narrow-necked bottle, either too much at once, or none at all. I prithee, take the cork out of thy mouth that I may drink thy tidings."

৩। Hysterical stammer—সাধারণতঃ বারো বছরের উপরের বালকদের এবং বয়স্ক যুবকদের মধ্যে এই ধরণের তোৎলামি দেখা যায়। সাময়িকভাবে এই শ্রেণীর তোৎলামি হয়ে থাকে। গুরুতর ভয় পেলে এই রোগ দেখা দিতে পারে। পরিবারে নানারকম অসচ্ছলতা, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি হ্রাস ইত্যাদি বহুবিধ কারণে অনেক যুবক মানসিক যাতনা ভোগ করেন। ক্রমাগত মানসিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক লোক সাময়িকভাবে তোৎলা হয়। অনেকে আবার কোন তোৎলাকে নকল করতে করতে নিজেই এই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৪। Spasmodic Dysphonia—যাদের পেশা হচ্ছে অনর্গল কথা বলা, অর্থাৎ ধর্মযাজক বা পুরোহিত, জননেতা, অধ্যাপক শ্রেণীর লোকেরা এই তোৎলামিতে ভোগেন। অনেক সময় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করবার পরেই হঠাৎ তাদের স্বরযন্ত্রের মাংসপেশীতে খিঁচুনী আরম্ভ হয়; ফলে বক্তৃতাপ্রবাহে বাধা জন্মে। সেই সময় ঝাঁকুনী

দিয়ে আস্তে আস্তে কথাগুলি বের করা ছাড়া এদের আর কোন উপায় থাকে না।

তোৎলামি কেন হয়—এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়ে গেছে। নানা মতবাদ সম্বলিত বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে সমস্যাটির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু মতবাদের মধ্যে মোটামুটি পাঁচটি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া চলে।

১। স্বাভাবিক স্বরস্ফুরণের জন্যে মুখ, স্বর-যন্ত্রের মাংসপেশী ও বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলীর কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যখন সামঞ্জস্য থাকে না, তখন তোৎলামি দেখা দেয়।

২। কথা বলবার জন্যে শ্বাসযন্ত্র, স্বরযন্ত্র ও মুখের বিভিন্ন মাংসপেশী প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সন্দেহ, উদ্বেগ, বিচলিত অবস্থা ইত্যাদি নানা-প্রকারের মানসিক বিপর্যয়ের জন্যে উপরিউক্ত তিনটি যন্ত্রের মাংসপেশীর কর্মের সামঞ্জস্য থাকে না।

৩। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনরূপ বৈকল্য ঘটলে তাড়াতাড়ি কোন শব্দ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলেও তোৎলামি হয়।

৪। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন যে, এক শ্রেণীর লোক তাঁদের জীবনের দুঃখময় স্মৃতি অথবা কোন গোপন কাহিনী যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হঠাৎ না বলে ফেলে, তার জন্যে সব সময় সজাগ থাকে। গোপন কাহিনী প্রকাশ না করবার জন্যে অতিরিক্ত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। এর ফলে অযথা কোন বিশেষ শ্রেণীর স্নায়ু সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সব সময় তারা মনে করে, কথার মধ্যে এই বুঝি তাদের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে বলে আশা করা যায়। মনে করা যাক, ক বাবু কোন এক বিমল বাবুর সম্বন্ধে অনেক গোপন কথা জানেন এবং সে কথা কারো কাছে বলবেন না বলে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কোন এক প্রসঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিমল বাবুর কথা উঠলো। উপস্থিত ব্যক্তির কেউ হয়তো ক বাবুকে অনুরোধ করলেন, বিমলবাবু প্রসঙ্গে সাধারণ দু-একটি কথা বলতে। তখন বাধ্য হয়ে ক বাবুকে কিছু বলতে হয়; কিন্তু তিনি সব সময় মনে করেন, যদি কোন মুহূর্তে বিমল বাবুর গোপন কথা বলে ফেলেন তাহলে বিশ্রী ব্যাপার হবে। এই অতি সচেতনতা ক বাবুকে তোৎলা করে তুলতে পারে। কোন কথা উচ্চারণ করতে গিয়েই তিনি তাঁর গোপন কথাগুলির বেরিয়ে আসা বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। তার ফলে একই অক্ষর বার বার উচ্চারণ করেন।

৫। মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অঞ্চলে সুসংবদ্ধ কথা বলবার (Articulated speech) কেন্দ্র অবস্থিত। কোন কারণে এই অংশ উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ না করলে তোৎলামি দেখা দিতে পারে।

তোৎলা লোকেদের অনেকে নানাভাবে তাদের তোৎলামি ঢাকতে চেষ্টা করে। কথা বলবার সময় তারা নানারকম বাড়তি শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। অনেকে কথার সঙ্গে নিঃশ্বাস নেবার সময়-কার শব্দ করে। অনেকে থুক্‌থুক্ শব্দ করে কথা শেষ করে। অনেকে আবার কথা বলবার সময় নানা-রকম শেষ মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করে অন্যের কাছে নিজেদের তোৎলামি ঢাকবার চেষ্টা করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কথা বলবার সময় তোৎলাদের মাথা, মুখ বা শরীরের কোন অংশ সাময়িকভাবে কাঁপতে থাকে।

তোৎলা লোকেরা যখন একা নিজের সঙ্গে কথা বলে অথবা লুকিয়ে একা গান করে তখন তারা মোটেই তোৎলামি করে না। এর কারণ এই যে, তাঁরা ঐ সময় মোটেই আত্মসচেতন থাকে না।

নিয়মিত চিকিৎসা করলে তোৎলামি বেশ ভালভাবেই সেরে যেতে পারে। এর চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। তোৎলাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। যাতে শিশু বা কিশোর মানসিক

স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, সেইভাবে বাড়ীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাবা-মা, ভাই-বোন ও শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সুমধুর করা উচিত। চাকুরী সম্পর্কে যুবকদের মানসিক ক্লেশের কারণ থাকলে তা দূর করবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তোৎলা লোককে একা একটি ঘরের মধ্যে নিজের সঙ্গে জোরে, আস্তে এবং পরিষ্কারভাবে কথা বলবার অভ্যাস করা, ঐ ভাবে পড়া এবং আবৃত্তি করবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। এগুলিকে মুখের ব্যায়াম বলে। এতে চারটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হয়—১। পরিপূর্ণভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, ২। আস্তে এবং সুস্পষ্টভাবে কথা বলতে চেষ্টা করা, ৩। যে বর্ণ উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়, সেখানে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবার চেষ্টা না করে গলার স্বর বাড়িয়ে দেওয়া, ৪। দৈহিক ব্যায়াম, নাচ এবং গান করা এই রোগ সারাবার মূল্যবান ব্যবস্থা।

যে সব তোৎলা রোগী কথা বলবার সময় মুখভঙ্গী করে থাকে, তাদের উচিত ঘরে একা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস করা। প্রথমে নিজের সঙ্গে কথা বলে নিজের উপর বিশ্বাস আনতে হবে, তারপরে বিশেষ প্রিয় এবং শুভার্থী দু-একজন লোকের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কথা বলা অভ্যাস করতে হবে।

রোগীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে তোৎলামি সারাবার প্রধান চিকিৎসা।
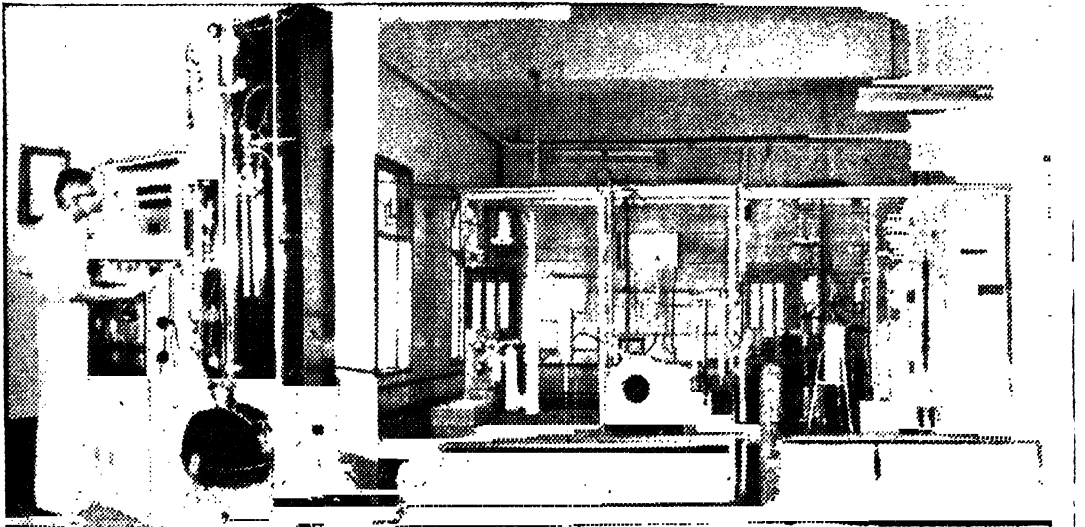
পুনার জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারের একাংশের দৃশ্য

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাষা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

ব্যক্তিবিশেষের কাছে মায়ের যে স্থান, কোন সমাজ বা দেশের পক্ষে তার মাতৃভাষারও সেই স্থান। কোন অনিবার্য কারণবশতঃ অনেক সময় ছোট শিশু ধাত্রী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়। ছোট শিশু সেই ধাত্রীকেই মা বলতে শেখে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে তার প্রকৃত মাকেই মায়ের আসনে বসায়। সেইরূপ অনেক সময় দেখা যায়, বিদেশীয় শাসনের ফলে সেই বিদেশীয় জাতির ভাষা পরাধীন দেশের রাজকার্য, শিক্ষা প্রভৃতির পরিবাহক হয়ে তার মাতৃভাষার স্থান দখল করে। কিন্তু বিদেশীয় শাসনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার পর (যদি সেই জাতি তার ভাষাগত স্বকীয়তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না দেয়) সেই জাতি আবার তার মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করে। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজীই প্রধান ভাষা ছিল এবং ইংরেজী ভাষাই উচ্চ শিক্ষা, রাজকার্য প্রভৃতির বাহক ছিল সত্য, কিন্তু কোন মতেই ভারতবাসী তার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হারায় নি। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাই ভারতবাসীর মাতৃভাষা—পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তাই। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনেও কোন ভারতবাসীই তাঁর সাহিত্যের সাধনায় মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। দু-একজন তা করতে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিলাস মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষাই যে আমাদের সব কাজের ধারক ও বাহক হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই এ হতে বাধ্য। কিন্তু যতই স্বাভাবিক হোক না কেন—একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কতকগুলি বিষয়ে এ নিয়ে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হবে। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রবর্তন, এই প্রকার অসুবিধা সবচেয়ে বেশী অনুভূত হবে বা হচ্ছে। এই সব বিষয়ের মধ্যে এখানে যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাষা সমস্যা। শুধু মাত্র বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতেই এ নিয়ে বিচার করা হলেও যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষার সম্বন্ধেও অনুরূপ আলোচনাই প্রযোজ্য।

নব্যবিজ্ঞানে এমন বহু শব্দ আছে, যাদের উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই। সেই সব শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নির্ধারণই এক কথায় পরিভাষা সমস্যা। অনেকেই হয়তো মনে করবেন, পরিভাষা সমস্যা মানেই বাংলা ভাষায় অবর্তমান কিছু নতুন শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু তা মোটেই নয়। একটু আলোচনা করলেই দেখা যাবে নতুন শব্দের সৃষ্টি ছাড়াও এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। খুব স্থূলভাবে দেখলেও দেখা যায়, তিন ভাবে এই প্রতিশব্দ নির্ধারণ চলতে পারে—

(১) বাংলা ভাষায় নতুন প্রতিশব্দ তৈরী; (২) বিদেশীয় শব্দগুলিকে উচ্চারণে একটু পরিবর্তিত করে বাংলা হরফে লেখা এবং (৩) বিদেশীয় শব্দগুলিকেই বাংলায় লেখা।

প্রথমে বাংলা ভাষায় নতুন প্রতিশব্দ তৈরীর কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কোন ভাষায় সেই ভাষার অপরাপর শব্দরাজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন শব্দ-সৃষ্টি বিশেষ দুরূহ কাজ। তাই অনেকের মত হচ্ছে, প্রতিশব্দ যে ঠিক নতুন

তৈরী শব্দ হতেই হবে তা নয়, ভাষায় পূর্ব থেকেই প্রচলিত কোন শব্দকে পরিভাষা হিসাবে কোন নির্দিষ্ট অর্থ ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরই বোধ হয় বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম, যিনি এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ও মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি লিখেছেন—শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ। প্রাচীন শব্দের নতুন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নেই (জগৎ কথা)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রামেন্দ্রসুন্দর ইংরেজী Gas শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাংলা 'অনিল' শব্দটি। অনিল শব্দটি বাংলা ভাষায় নতুন সৃষ্ট নয়। বাংলা ভাষায় পূর্ব থেকেই বর্তমান এই শব্দকেই Gas-এর পরিভাষা হিসাবে সমার্থক ধরে নিয়েছেন। এই ভাবে পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা তৈরী সম্ভব কি না তা যথেষ্ট বিচার্য; কারণ এইরূপ যথোপযুক্ত শব্দ সর্বদাই নাও পাওয়া যেতে পারে। সে যাই হোক, এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলবার আগে আমাদের দেখা উচিত—এই ভাবে নতুন শব্দ তৈরী করেই আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে চাই কি না বা চাইলেও সেটা ভাল হবে কি না? এইভাবে বাংলাভাষায় এক প্রস্থ পরিভাষা রচনায় প্রধান অসুবিধা এই যে, তাহলে প্রত্যেককেই এই তালিকা মুখস্থ করে আয়ত্ত করতে হবে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, এই অসুবিধা বিন্দুমাত্রও থাকবে না যদি বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণ অংইশ বাংলা ভাষার মাধ্যমে চালানো হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে আমাদের বিচার করে দেখা দরকার, বিজ্ঞান-শিক্ষা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া সম্ভব কি না? বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, তা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব এবং এই অভাব মেটানো নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। ধরা যাক, উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষায় (যেমন B.sc., M.sc. ক্লাশে) বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার কথা। এখন এই সমস্ত মানের সমুদয় পুস্তকই ইংরেজীতে। কাজেই প্রয়োজন হবে সেই সব পুস্তক বাংলায় অনুবাদের অথবা বাংলা ভাষায় সেই সব পুস্তকের নতুন রচনা। কোন বিষয়ে মাত্র একজন কি দুইজন লেখকের বই অনুবাদ বা একজন কি দুইজন লেখকের রচিত পুস্তকেই চলবে না; কারণ Reference Book হিসাবে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পুস্তক প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্তমান পরিবেশে (অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত) বলা যায়, এ ব্যবস্থায় এখনও বহু বিলম্ব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীচু মানের বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্লাশে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভব হলেও উঁচু মানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্যতীত গত্যন্তর নেই। বাংলা ভাষায় একপ্রস্থ নতুন শব্দ তৈরী দ্বারা পরিভাষা সমস্যার সমাধান করলে দেখা যাবে, নীচু দিকের ক্লাশে যতদিন পর্যন্ত শুধু বাংলা ভাষাতেই পড়ানো হবে ততদিন পর্যন্ত কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু উপরের দিকে গিয়ে যখন ইংরেজী ছাড়া চলবে না, তখন বাধ্য হয়েই বাংলা শব্দগুলির ইংরেজী জানতে হবে, অর্থাৎ সেই পরিভাষা মুখস্থের পালা। যতদিন পর্যন্ত উঁচু মানের বইগুলিও বাংলাতে প্রকাশিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এর হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের চট্ করে ইংরেজী তুলে দেবারও উপায় নেই, আর নতুন প্রতিশব্দ তৈরীর দ্বারা পরিভাষা সমস্যার সমাধান খুব আশাপ্রদ হবে বলে মনে হয় না। আর একটা কথা, এই পরিভাষা সমস্যা একটি সর্বভারতীয় সমস্যা। বাংলা ভাষাতে অথবা আর যে কোনও প্রাদেশিক ভাষাতে নতুন শব্দের দ্বারা এর সমাধান করলে সেই শব্দ অপরাপর ভারতীয় ভাষাতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এবং হলেও তা গ্রহণ করা হবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফলে দাঁড়াবে এই যে,

প্রত্যেক ভারতীয় ভাষাই আপন আপন ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন শব্দ তৈরী করবে, যার ফলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ে বা বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে কোন ঐক্য বা সামঞ্জস্য রক্ষা বিশেষ ব্যাহত হবে। সুতরাং মনে হয়, নতুন শব্দ তৈরী করবার পরিবর্তে অন্য উপায়ে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।

এখন বিদেশীয় শব্দগুলিকে পরিবর্তিত করে বাংলায় ব্যবহার করা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রত্যেক ভাষার শব্দরাজিরই উচ্চারণগত একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জন্যে কোন এক ভাষায় অপর ভাষার শব্দকে কেমন বেখাপ্পা ও বেমানান মনে হয়। পরিভাষা সমস্যা এড়াবার জন্যে ইংরেজী শব্দগুলিকে বাংলা হরফে লিখে চালানই সহজতম পদ্ধতি। কিন্তু বাংলা ভাষার অপেক্ষাকৃত কোমল শব্দরাজির মধ্যে ইংরেজী শব্দগুলিকে খটমট শোনায় বলে অনেকের মত হচ্ছে, ইংরেজী কোন শব্দ ঠিক সেইভাবে না লিখে স্থানে স্থানে একটু পরিবর্তিত করে বাংলার ছাচে ঢেলে নেওয়া। মূল পদার্থগুলির (Elements) বাংলা নাম দেওয়া প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরও এই মতই সমর্থন করেছেন—"মূল পদার্থগুলির অধিকাংশ অল্পদিন মাত্র পণ্ডিতগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই ইহাদের বাংলা নাম নাই। বিদেশী নামগুলি বাংলা হরফে লিখিয়া চালানো যাইবে, কি প্রত্যেকের জন্য নূতন নামের সৃষ্টি করা হইবে, ইহা বাংলা ভাষায় এক বিষম সমস্যা হইয়াছে। যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই ইংরেজীতে কৃতবিদ্য, আবার স্বদেশী বিদেশী দুই প্রস্থ নাম ব্যবহার করায় নানা অসুবিধা। কাজেই বিদেশী নামগুলি বাংলা হরফে চালানই মোটের উপর সুবিধা। বাঙ্গালীর বাগেন্দ্রিয়ের খাতিরে একটু আধটু উচ্চারণ বদলাইলে শ্রুতিকটুতা দোষও দূর হইতে পারে অথচ বুঝিবার গোল হইবে না। এইরূপে সীলীনম, তেলুরম স্বচ্ছন্দে বাংলায় চলিতে পারে।"

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেও সেই আগের মতই এক প্রশ্ন—পরিভাষা মুখস্থের ব্যাপারই চলে আসছে। অধিকন্তু এখানে অবিকৃতভাবে ঠিক সেই শব্দটি থাকলে যে সুবিধা থাকতে পারতো তাও থাকলো না, আবার আমাদের বাংলা ভাষার যা বৈশিষ্ট্য তাও রক্ষা হলো না; কারণ বিদেশীয় শব্দকে একটু-আধটুকু পরিবর্তিত করলেই ঠিক-ভাবে বাংলা ভাষার ধাতের সঙ্গে খাপ খাবে—একথা বলা চলে না। তারপর এই ভাবে অদল-বদল করেই যদি আমরা পরিভাষা সমস্যার সমাধান করতে চাই, তাহলে তা করতে হবে এক বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। খেয়াল-খুসী মত যা খুসী করলে একই শব্দকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে প্রকাশমান দেখা যাবে (বর্তমানে যা হচ্ছে), যা মোটেই অভিপ্রেত নয়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ব্যবহৃত ফস্ফরস্, মগ্নীশম্, আলমীনম্ কিন্তু এখন কেউই ব্যবহার করেন না। রবীন্দ্রনাথও নিউটনকে 'ন্যুটন' লিখেছেন। এই ভাবে লেখকের ইচ্ছামত পরিবর্তন, যে কেউ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠকালে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করে থাকবেন।

সর্বশেষে বিদেশীয় শব্দগুলিকে বাংলা হরফে চালাবার কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এর বিরুদ্ধে যা বলা যেতে পারে তার প্রথমটি সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষার ধাতের সঙ্গে ঠিক মেশে না। আর অনেকে আবার নেহাৎ স্বাদেশিকতার খাতিরেও এটা অপছন্দ করেন যে, আমাদের ভূতপূর্ব শাসকদের ভাষা আমাদের ভাষার উপরেও তার স্থায়ী ছাপ রেখে যাক। কিন্তু দ্বিতীয়টির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নেই; কারণ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ ছাড়াও ইতিমধ্যেই অনেক ইংরেজী শব্দই বেমালুম বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। আর তাছাড়াও

এই ভাবে যদি কিছু বিদেশী শব্দ আমাদের গ্রহণ করতে হয় তবে তা মোটেই অপমানজনক কিছু হবে না; কারণ এই গ্রহণ আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি এবং প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক হবে। পৃথিবীর সব ভাষাই কমবেশী বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের সেই পথ অনুসরণে তেমন কিছু বাধা আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বিদেশীয় শব্দগুলিকে বাংলা হরফে লিখে ব্যবহার করলে অনেক দিক দিয়ে বেশ সুবিধা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাহলে এ সম্বন্ধে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার পরিভাষা সমস্যার সমাধানই একযোগে হয়ে যাবে। এর ফলে প্রাদেশিক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে এমন একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে, যা মোটেই সম্ভব হবে না যদি প্রত্যেক ভাষাই স্বকীয় ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে আপন ভাষার উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পরিভাষা সমস্যার সমাধান করে নেয়। এর ফলে পরিভাষা মুখস্থ করবার কোন বালাই থাকবে না। এতে সবচেয়ে সুবিধা হবে এই যে, উচ্চতর মানের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে অল্প কিছু ইংরেজী শিখেই বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকাবলী পড়তে পারা যাবে। এটা যে একটা মস্তবড় সুবিধা, সে কথা আশা করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান বিষয়ক বাইরের বই, সাময়িক পত্র প্রভৃতি আমাদের দেশে খুবই কম। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার হার ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, এই জাতীয় পুস্তক বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে অনুবাদ বা রচনার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইংরেজী পুস্তকাবলীর উপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে। কাজেই ঐ জাতীয় পুস্তকাবলী পাঠ যাতে সহজসাধ্য হয়, সেই দিকে নজর দিয়ে পরিভাষা সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এক জায়গায় লিখেছেন—"কেহ কেহ Gas শব্দটি বাংলা হরফে লিখিয়া গ্যাস নামটি বাংলা ভাষায় চালাইতে চাহেন। আমি তাহাতে কিছুতেই সায় দিব না। ঐ শব্দ ঐরূপে লিখিলে আমাদের ভাষায় ধাতের সঙ্গে মিশিবে না; বড় কদর্য দেখাইবে। একটা ভদ্রতর শব্দ চাই।" কিন্তু তিনিই আবার আর এক জায়গায় বলছেন (বোধ হয় পরবর্তীকালের রচনায়) "বাংলা ভাষার একটা ধাত আছে। সেই ধাতের সঙ্গে না মিলিলে ভাষাটাই কদর্য হইয়া পড়িবে ও লোকে বরং ইংরেজী পড়িবে, কিন্তু সেই কদর্য বাংলা পড়িবে না। অম্লজান, যবক্ষারজান, উদ্‌জান—এই যে নামগুলি বাঙ্গলা কেতাবে দেওয়া হইয়াছে তাহারও নানা দোষ। প্রধান দোষ উহাদের দীর্ঘতা; লেখা কেতাবে থাকিতে পারে, কিন্তু মুখের কথায় চালানো দুষ্কর। সেই জন্য কথিত ভাষায় উহা এতকালেও চলে নাই। এই নাম কয়টি এত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে না ঠেকে সেইরূপ নাম হওয়া উচিত। যতদিন আপত্তির মীমাংসা না হয় ততদিন ইংরেজী নামই ব্যবহার করা ভাল, ইহা এই বয়সে বুঝিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের ইংরেজী নামই ব্যবহার করিব। অনেকে অনেক আপত্তি তুলিবেন, কিন্তু এই আপত্তির অন্ত নাই। হাইড্রোজেন বড় কর্কশ, কিন্তু উদ্‌জানও কেহ বলিতে চাহিবে বোধ হয় না। ডাক্তারদের কল্যাণে আজকাল অক্সিজেন পাড়াগাঁয়েও চলিয়াছে, অতএব ইংরেজীই চলুক।" বর্তমানের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পঁচিশ-তিরিশ বছরের ব্যবধানেও সমস্যা সেই এক এবং সমানই রয়েছে; অতএব আমরাও বলি ইংরেজীই চলুক।

একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে এই গুরুতর ব্যাপারে

একবারে কোন সমাধানে পৌঁছাতে চাওয়া নেহাৎ বাতুলতা। আসল কথা হচ্ছে—এই বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত এবং এই কথা স্মরণ করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। নচেৎ এই নিয়ে বাংলা ভাষায় একটা বিশ্রী ব্যাপার আরম্ভ হবে বা ইতিমধ্যেই হতে আরম্ভ করেছে। যে উপায়েই পরিভাষা সমস্যার সমাধান করা হোক না কেন, তা কোন মতেই ব্যক্তিবিশেষের মতামতের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কোন দেশ বা জাতির ভাষা সেই দেশ বা জাতির জাতীয় সম্পত্তি। কাজেই ভাষাগত কোন সমস্যার সমাধান সেই জাতির সামগ্রিক দায়িত্ব। ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুসী মত প্রতিশব্দ ব্যবহার করবার ফলে বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনায় একই ইংরেজী শব্দকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে। "Centrifugal force"-কে বাংলায় লেখা হচ্ছে—কেন্দ্রাতিগ শক্তি, কেন্দ্রবিমুখী শক্তি, বাহিরমুখো বেগ, কেন্দ্রাপসারী শক্তি প্রভৃতি রূপে। Carbon dioxide-কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অঙ্গারাম্লিজেনী গ্যাস (বিশ্বপরিচয়); রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন কয়লা পোড়া-অনিল (জগৎকথা) ও ডাঃ কুদরৎই খুদা লিখেছেন অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ রূপে। ইংরেজী Violet বাংলায় বেগুনী রং। বেগুনের রঙের মত রং বলা হয়ে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—"বেগুনী শব্দটা অভব্য শুনায়, বার্তাকু করিলেও উন্নতি হয় না। কাজেই বেগুনী রঙের শিম্বীর বা শীমের বর্ণকে শিম্বী বর্ণ বলিলাম।"

Gravitation-এর বাংলা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যাই হোক ইংরেজীতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না বলে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।" (বিশ্বপরিচয়)

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটিই নিঃশংসয়ে প্রমাণ করবে যে, প্রতিশব্দ নির্ধারণ সমস্যা কোন মতেই ব্যক্তিগত মতামত অনুসারে হওয়া উচিত নয়। এই সব পরিবর্তন হয়তো সামান্য ভেবে অনেকেই উপেক্ষণীয় মনে করেন; কিন্তু মনে হয়—কোন মতেই তা হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ভাষার Exactness বা Acuteness। একই জিনিষ বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন শব্দে তা প্রকাশ করলে সেই ভাষা তত Exact এবং Acute কোন মতেই হতে পারে না বলেই মনে হয়।

বিভিন্ন বিদেশীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ কোন বিপদের সময় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে কোন মীমাংসা করে নেন। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকম কোন ব্যবস্থা না থাকায় বা এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত না হওয়ায় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পুস্তকের বা প্রবন্ধের লেখকেরা কখনও বা বাংলা হরফে বিদেশী শব্দকে, আবার কখনও বা নিজের খেয়ালখুসীমত পরিভাষা তৈরী করে নেন। কিন্তু এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে যে ওরূপ চলা মোটেই উচিত নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। কাজেই আমাদের এখানে উচিত যে, বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটু সজাগ হয়ে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির সমন্বয়ে এক বৈঠক আহ্বান করে এই ব্যাপারে কোনও একটা সমাধানে পৌঁছানো। আর শুধু কোন সমাধানে পৌঁছালেই চলবে না, তাঁদের নির্ধারিত পরিভাষা প্রত্যেক লেখক ও প্রকাশক যাতে ব্যবহার করেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমান সরকারও জনসাধারণকে বিজ্ঞানের বিষয়ে সজাগ করবার নানা উপায় অবলম্বন করছেন। সকলেই স্বীকার করবেন, বিজ্ঞান বিষয়ক সহজ সরল প্রবন্ধাদি রচনা ও প্রচারই এ কাজে প্রধানতম অঙ্গ। পরিভাষা ব্যাপারের উপযুক্ত সমাধান এ কাজে বিশেষ সহায়ক হবে। কাজেই আমাদের সরকারের সংশ্রবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হওয়া উচিত এবং এতে আমাদের শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বিশেষ সচেষ্ট। তাঁর অধীনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একযোগে পরিভাষা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে।

বিশ্বের দরবারে ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা যথেষ্ট। পরিভাষা সমস্যার উপযুক্ত সমাধান, বিশ্বের বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিচয় ৪৫ বৎসরের। স্বাধীনতা লাভের পর যখন তিনি ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর ডিরেক্টর জেনারেল হইয়া দিল্লীতে আসেন, তখন তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে জানিবার সুযোগ হয়। আমি তখন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলাম। পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে এই কাজে তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস দলের যে প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়, তিনি তাহার সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানচন্দ্র শিল্প-উদ্যোগের সহিত জড়িত ছিলেন না, তথাপি উক্ত কমিটি প্রসঙ্গে দেশীয় শিল্প-সংস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও দিল্লীর রাজকর্মচারীদের নিকট তাঁহাকে কিছু বাধা পাইতে হয়। কিন্তু অতুলনীয় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুণে এই সকল বাধা তিনি দূর করিতে সমর্থ হন।

তখনও দেশে প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয় নাই। শিল্পোন্নয়ন বেসরকারী তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে দেশে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছিল। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি বিবৃত হইলেও সরকার কর্তৃক শিল্প স্থাপনায় সরকারী মহলে যথেষ্ট বিরোধিতা ছিল। এই সময়ে আমরা একটি পেনিসিলিন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করি। কিন্তু নানা কারণে জ্ঞানচন্দ্রের আমলে ইহার স্থাপনা সম্ভব হয় নাই। বিগত যুদ্ধের সময় দেশে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সাল-ফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন ৩০,০০০ টন হইতে ১,৫০,০০০ টনে বৃদ্ধি পায়। ইহার জন্য প্রায় ৫০,০০০ টন গন্ধকের প্রয়োজন ছিল। গন্ধক ভারতে উৎপন্ন না হওয়ায় এই ব্যাপারে আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ এদেশে যথেষ্ট জিপ্‌সাম আছে। এই জিপ্‌সাম হইতে আমরা গন্ধক ও সিমেণ্ট তৈয়ারীর পরিকল্পনা করি। ইহাতে প্রায় ১ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহা না পাওয়ায় উহা অবশ্য কার্যকরী হয় নাই। ১৯৪৭ সালে ভারতে দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া দেশের চাহিদা মিটাইবার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাহা বিদেশে রপ্তানী হয়। যদিও পটাসিয়াম ক্লোরেট এদেশে প্রস্তুত হয়, কিন্তু ফস্‌ফরাস তৈয়ারী করিবার কোন ব্যবস্থা এদেশে ছিল না। অর্ডন্যান্স

ফ্যাক্টরীতে এই ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করিবার কথা হয়। সর্বসাকুল্যে দেশে মাত্র ৫০০ টন ফস্‌ফরাসের প্রয়োজন। কোন বেসরকারী কারখানা এত অল্প পরিমাণ মাল তৈয়ারী করিয়া লাভবান হইতে পারে না। অবসর সময়ে উদ্বৃত্ত রাসায়নিক ও মজুর দ্বারা সরকারী সংস্থায় উহা প্রস্তুত করাইলে বিশেষ লোকসান হইত না—এই প্রস্তাবও সরকারের নিকট প্রেরিত হয়

মাদ্রাজে কয়লা নাই, কিন্তু সেখানে লিগ্‌নাইটের সন্ধান মিলে। তাঁহার প্রচেষ্টায় উহা মাদ্রাজে উৎপাদিত হইয়া দক্ষিণস্থ শিল্প সংস্থাগুলির বিশেষ মিটিবে। যদিও তাঁহার শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ ত্যাগ করিয়া আসিবার পর এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় বটে, কিন্তু মূলতঃ তাঁহার আমলেই এই সকল প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল।

এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে অথচ হাই-টেন্‌সন ইনস্থলেটর এখানে তৈয়ার হয় না। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ডাঃ ঘোষ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন এবং অবশেষে এই শিল্প সংস্থাটি স্থাপিত হয়।

১৯৩৯ সালে ডাঃ ঘোষ ও আমি রাসায়নিক শিল্পের ফাঁকগুলি বন্ধ করিবার জন্য এক পরিকল্পনা
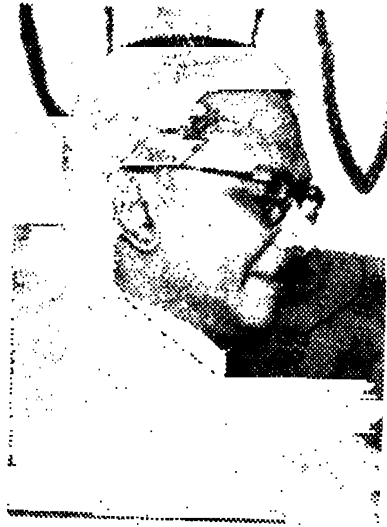
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

উপকার সাধন করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। সিন্ধ্রির অ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানা ইংরেজ আমলেই পরিকল্পিত হয়। ডাঃ ঘোষ তথায় অতি অল্প ব্যয়ে মেথানল উৎপাদনের পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিন্ধ্রির জন্য কোক-চুল্লী এবং তাহার সঙ্গে গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা তাঁহার সময়েই হয়। এই প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে তাঁহার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। দুর্গাপুরেও কোক-চুল্লী বসিতেছে, ফলে কলিকাতার নাগরিক ও শিল্প সংস্থাগুলির গ্যাসের প্রয়োজন করি। ইহাতে দেখান হয় যে, মাত্র ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায়। সে সময় প্ল্যানিং কমিশন গঠিত না হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় নাই। কিন্তু প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই সকল প্রস্তাব মূলতঃ গৃহীত হইবার পর কাজ সুরু হয়।

ভারতবর্ষে খনিজ তৈলের পরিমাণ বেশী নয়। কয়লা হইতে ইহা রাসায়নিক উপায়ে তৈয়ারী করিবার জন্য আমেরিকা হইতে কপারস্‌ কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞদের আনয়ন করা হয়। এই সম্পর্কে

ডাঃ ঘোষের সভাপতিত্বে এবং আমার সম্পাদনায় একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রায় দেড়বৎসর কাল নানাপ্রকার আলোচন-পর্যালোচনার পর এই কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। মাত্র ১২ কপি রিপোর্ট ছাপা হয়। ভারতের বাহিরে নানাদেশে এই রিপোর্ট বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হইবে, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এই সময়ে সায়েন্টিফিক ম্যানপাওয়ার কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সংসদে ডাঃ ঘোষের উপদেশ ও নির্দেশসমূহ বিশেষ মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতে ৪টি টেক্‌নোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমটি খড়্গপুরে স্থাপিত হয় এবং তিনি স্বয়ং ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের উপর অপর তিনটিরও অস্তিত্ব নির্ভরশীল—এই বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তির পক্ষে এই কাজ গ্রহণ করা উপযুক্ত হইয়াছে কিনা—এই প্রশ্ন অনেকেই করিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, খড়্গপুর তাঁহার জীবনের অতি দায়িত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া তিনি মনে করেন। এই নূতন অভিযানের তিনিই পথিকৃৎ।

এই কথাই আজ মনে হয় যে, যখনই কোন কিছু দায়িত্ব আসিয়াছে, তখনই তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছিল গুরুদেব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা। যাঁহারা আচার্যদেবের ছায়াতলে বর্ধিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই গুরুদেবের চরিত্রের কোন না কোন গুণ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু ডাঃ ঘোষ গুরুদেবের বহু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুতে আজ আমরা অনেকেই গুরুদেবের বিচ্ছেদ নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি।

অনন্ত কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—ক্ষুদ্র মানব-জীবন জল-বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া পুনরায় বিলীন হইয়া যাইতেছে - ইহাই চিরন্তন লীলা। কিন্তু মাঝে মাঝে কতিপয় মহাপ্রাণের অভ্যুদয় হয়—যাঁহাদের অবর্তমানেও তাঁহাদের আরব্ধ কার্য চিরকাল চলিতে থাকে। ডাঃ ঘোষ ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ। তিনি দেশকে গভীরভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের দারিদ্র্য-মোচন ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন তাঁহার শেষ জীবনের ব্রত ছিল। আমরা তাঁহার সেই ব্রতের কথাই আজ স্মরণ করি। এই ব্রত পালন করিবার বহু সুযোগ তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল এবং প্রাণপণে তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ইতিহাস তাঁহাকেই মনে রাখে, সফলতা-বিফলতার জমা-খরচে যাঁহার উদ্বৃত্ত থাকে সাফল্য। ৩৫ বৎসর পূর্বে লর্ড রোনাল্ডসে তাঁহার Heart of Aryavarta-তে যুবক জ্ঞানচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, জ্ঞানচন্দ্রের জীবনে তাহা ফলিত হইয়াছিল।

রাসায়নিক হিসাবেও তাঁহার দান অসামান্য। ভৌত-রসায়নের অনেক অধ্যায়ে তাঁহার কার্যের ছায়াপাত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে যাঁহারা স্থান দান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনে আচার্যদেবের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছিল। গুরুদেবের প্রাণে তিনি আনন্দদান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি ধন্য। আমরা তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী—তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। দেশ তাঁহার সেবা পাইয়া গর্বিত হইয়াছে। জীবনে সাফল্যের অধিক আর কি নিরীক্ষা আছে ?

জিভের কথা

শ্রীজয়া রায়

সাধারণ লোকের নিকট জিহ্বা শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ ও বিশেষ বিশেষ বর্ণ উচ্চারণের স্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের গলার দুই পার্শ্বে এবং জিহ্বার উপরে অবস্থিত স্বাদগ্রন্থির সাহায্যে আমরা খাদ্যের আস্বাদ পাইয়া থাকি। জিহ্বাহীন লোকেরও গলার দুই পার্শ্বে স্বাদগ্রন্থি থাকে। জিহ্বার উপরের ত্বক অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের স্বাদ-গ্রন্থির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলির সম্মুখভাগে যে স্পর্শগ্রন্থি থাকে সেইরূপ গ্রন্থিও আছে। জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ স্বাদগ্রন্থির সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি জন্মে।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল জিনিস খাই তন্মধ্যে নানাপ্রকারের মাছ, মাংস, ফল, সব্জী, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যাদিই প্রধান। জিহ্বা চার রকমের স্বাদগ্রহণ করে; যেমন—মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল ও লবণ। অথচ আমাদের খাদ্যবস্তু হইতে আরও বিভিন্ন রকমের স্বাদ পাইয়া থাকি। মিষ্ট বস্তুর স্বাদ জিহ্বার অগ্রভাগে, তিক্ত বস্তুর স্বাদ পশ্চাদ্-ভাগে এবং জিহ্বার দুই পার্শ্বে অম্ল ও লবণজাতীয় স্বাদ পাই। কিন্তু জিহ্বার অগ্রভাগে সকল রকম স্বাদ গ্রহণের জন্যই কিছু কিছু স্বাদগ্রন্থি আছে।

শিশুরা সাধারণতঃ কোনও মিষ্টদ্রব্য পাইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া খায়। তাহারা তাহাদের অজ্ঞাতেই যে স্থানে মিষ্টতাবোধ প্রবল, সেই স্থানটিই ব্যবহার করে। আবার দেখা যায় কোনও পানীয়ের মধ্যে লবণ ও মিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে তাহার দুই এক ফোঁটা জিহ্বায় দিলে প্রথম দুই রকম স্বাদের পার্থক্য বুঝা যায় না। পরে সেই পানীয়ের অংশ নির্দিষ্ট স্বাদগ্রহণের স্থানে পৌছাইলে উভয় রকমের স্বাদই পাওয়া যায়। কোনও ক্ষারজাতীয় বা ধাতব পদার্থের এক রকমের স্বাদ পাইলেও তাহার জন্য জিহ্বায় বিশেষ স্বাদগ্রহণের ব্যবস্থার কথা জানা যায় না।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম এই জিহ্বা সম্পর্কে সাধারণ লোকের জ্ঞান ইহা অপেক্ষা বেশী নয়। কিন্তু চিকিৎসকের নিকট এই ইন্দ্রিয়টি রোগ-নির্ধারণের সহায়ক হইয়া উঠে এবং তাঁহারা ইহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকেন। অনেক চিকিৎসক রোগীর মুখের কথা শুনিবার আগেই জিভ দেখাইতে বলেন। জিভ দেখিয়াই তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ-নির্ধারণ ও ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়টি শুধু স্বাদ-গ্রহণ ও কথা বলিবার জন্যই নয়, রোগ নির্ধারণের জন্যও তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট। জিহ্বা পর্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসক শুধু বর্তমানেরই নয়, অতীতের রোগ সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া দিতে পারেন।

জিভ সম্বন্ধে আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, জন্মের আগে, অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের দুইটি জিভ থাকে। জন্মের অল্পক্ষণ আগেই এই ইন্দ্রিয়ের দক্ষিণ ও বাম ভাগ একত্রে যুক্ত হইয়া যায়। এই দুইটি ভাগের সঙ্গম স্থলে একটি খাঁজ তাহাদের সংযোগের সাক্ষ্য দেয়। জিহ্বার দক্ষিণ ও বাম—এই দুইটি দিকই মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুর দ্বারা যুক্ত। এই দুই দিকের স্নায়ুর সমতাই ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

কোন লোক সম্মুখের দিকে সোজাভাবে জিহ্বা প্রসারণ করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে, তাহার ঐ দুই দিকের স্নায়ুর সমতা আছে। জিহ্বার দক্ষিণ

দিকের স্নায়ুসমূহ অবশ বা দুর্বল হইলে স্বভাবতঃই সেই দিকের মাংসপেশীগুলিও দুর্বল হয়। তাহার ফলে জিহ্বা বামদিকে এবং তাহার বিপরীত অবস্থায় দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া যায়। এই রকম বক্রতার কারণ, দুই পার্শ্বের স্নায়ুসমূহের সমতার অভাব। দ্বি-চক্রযানের একটি চক্র অকেজো হইয়া পড়িলে অন্য চক্রটির অবস্থা যেরূপ ঘটে, ইহাও সেইরূপ।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, জিহ্বার মধ্য রেখা হইতে যদি কোন দিক অপর দিক হইতে বেশী বাহির হইয়া আসে, তাহা হইলে ঐ স্থানের স্নায়ুর পক্ষাঘাতই নির্দেশ করে। সাধারণতঃ মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে বা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের ফলেই এইরূপ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। সেই জন্য চিকিৎসকদের নিকট এই লক্ষণের যথেষ্ট মূল্য আছে। সামান্য আঘাতের ফলে কখনও কখনও জিহ্বার কিছুটা বক্রতা দেখা দিতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে যে ষ্ট্রোক হয়, তাহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। এই রকমের রোগীর জিহ্বা পরীক্ষা করিয়াও রোগ ধরা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে রোগীকে জিহ্বা দেখাইতে বলিলে দেখা যাইবে যে, সে জিহ্বা প্রসারণ করিতে পারে না; উপরন্তু তাহার জিহ্বা মুখের এক পার্শ্বে হেলিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম বারের ষ্ট্রোক জিহ্বায় এইরূপ চিহ্ন রাখিয়া যায়।

জিভের চতুর্দিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। ইহার ভিতরের অংশ মাংসপেশীতে পূর্ণ। জিহ্বার উপরিভাগ যথেষ্ট কর্কশ হইলেও তাহার উপরের আবরণীটি সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছই হইয়া থাকে। সেই জন্য লক্ষ্য করিলে জিহ্বার তলদেশ দিয়া যে সকল রক্তবাহী শিরা ও ধমনী চলিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে দেখা যায়।

চিকিৎসকেরা সেই রক্তবাহী ধমনী ও শিরার রং দেখিয়া রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনুমান করিয়া বলিতে পারেন—রোগীর রক্তহীনতা আছে কি না। বিবর্ণ জিহ্বা দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন—রোগী রক্তে লৌহের অল্পতাজনিত রক্তহীনতায় ভুগিতেছেন।

জিহ্বায় অনেক সময় সাদা পর্দা পড়িতে দেখা যায়। এই কারণে অনেক সময় সুস্থ লোকও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সাধারণের ধারণা—কোষ্ঠবদ্ধতাই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও এই সাদা আস্তরণ থাকিয়া যায়। তখন চিকিৎসকগণ রোগীর ব্যক্তিগত খাদ্য-তালিকা এবং অভ্যাস জানিয়া বলিতে পারেন—কি কারণে ঐ পর্দা পড়িয়াছে। অতিরিক্ত দুগ্ধপান করিলেও জিভের সাদা দাগ পড়ে। তবে আমাদের দেশে শিশুরাই উপযুক্ত পরিমাণে দুধ পায় না, কাজেই এখানে বয়স্কদের অতিরিক্ত দুগ্ধপানের কথাই ওঠে না। অসুখ হইলে অবশ্য জিহ্বায় অনেক সময়ই এই কারণে সাদা আস্তরণ পড়ে।

বিগত চতুর্বিংশ শতাব্দী পূর্বেই ঔষধের জন্মদাতা হিপোক্রিটাস বলিয়াছিলেন যে, জিহ্বায় প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রতিফলিত হয়। আধুনিক চিকিৎসকেরা আস্তরণযুক্ত জিহ্বা লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

ইংল্যাণ্ডের লাউডন নামক জনৈক চিকিৎসক এই গবেষণায় অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি কয়েক শত রোগী লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন। প্রত্যেক রোগীর জিভের অবস্থা, তাহার সঠিক কারণ নির্ধারণ, জ্বর আছে কি নাই, কোষ্ঠ পরিষ্কার কিনা, ধূমপানের অভ্যাস এবং দাঁতের অবস্থা লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। তিনি জিহ্বার তিনটি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যথা—

১। পরিষ্কার জিহ্বা

২। কিছু পরিষ্কার জিহ্বা

৩। আস্তরণযুক্ত জিহ্বা

পরীক্ষার ফলে লাউডন বলিয়াছেন যে, যাহারা অধিক ধূমপান করে, তাহাদের জিহ্বায় সাদা পর্দা পড়ে। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যাহাদের জিহ্বায় আস্তরণ পড়িয়াছে, তাহারা

অনেকেই শ্বাসযন্ত্রের কোনও রোগে ভুগিতেছে। সেই তুলনায় পাকযন্ত্রের রোগীর সংখ্যা বেশী নয়। পূর্বোক্ত রোগীদের মধ্যে নাসিকাজাতীয় রোগ, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি, নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা গিয়াছে। টন্সিলের প্রদাহ ও জ্বরের দরুণ অনেক সময় জিহ্বায় সাদা পর্দা পড়ে। দাঁত খারাপ হইলেও এইরূপ ঘটে।

লাউডনের গবেষণার ফলে আরও জানা গিয়াছে যে, পাকস্থলী বা আন্ত্রিক গোলযোগ, অন্ত্র-ক্ষত বা আমাশয়ই জিহ্বায় আস্তরণ পড়িবার কারণ নয়। অনেক রোগী পেনিসিলিন লজেন্স ব্যবহারের পরে তাহাদের জিহ্বায় কালো দাগ দেখিতে পায়। প্রথমে মনে করা হইত, খাদ্যে কোনও আবশ্যকীয় উপাদান কম হইলে এইরূপ ঘটে। কিন্তু পরে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, পেনিসিলিন মুখের ভিতরে কতকগুলি নির্দোষ জীবাণুকে নষ্ট করিয়া দেয়; তাহার পর সেখানে কালো রঙের ছত্রাক জন্মে। ঐ ছত্রাকের নাম মনিলিয়া বা ক্যানডিডা নাইগ্রান্‌স্। জিহ্বায় কালো দাগ দেখিতে পাইলে চিকিৎসকেরা পেনিসিলিনের পরিবর্তে অন্য কোনও অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা সেই অ্যান্টি-বায়োটিকের সঙ্গে এমন কোনও রাসায়নিক পদার্থ যোগ করিয়া দেন, যাহার প্রভাবে ঐ ছত্রাক বিনষ্ট হইয়া যায়।

জিহ্বা লাল হইলে চিকিৎসকেরা সেই লালিমার ঘনত্ব হিসাবে রোগ নির্ণয় করেন। জিহ্বায় লাল ছিট্ ছিট্ দাগ দেখা গেলে তাহাকে স্কার্লেট ফিবারের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। জিহ্বার আরও একটি অবস্থা রোগী এবং চিকিৎসককে বিব্রত করিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়টি নানাভাবে চিত্রিত বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে সেই রেখাচিত্রের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। ইস্রায়েলের দুই জন চিকিৎসক অনেক শিশু রোগীর উদাহরণ দেখা-ইয়াছেন। জিহ্বার এইরূপ লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে চুলকানি, খোলস ওঠা ও ব্রঙ্কাইটিস হইতে দেখা যায়। তবে ইহার সঠিক কারণ নির্ণীত হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন, কিছুটা খাদ্যের দোষে, কিছুটা বা অ্যালার্জির ফলে অথবা বংশগত কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত অথবা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা সরু হইলেও কঠিন রক্তহীনতা বোঝায়। গোলাপী রঙের স্ফীতি ও বিবর্ণ জিহ্বা রক্তে লৌহের অল্পতাজনিত রক্তহীনতারই নির্দেশ দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জিহ্বায় প্রচুর রক্ত-চলাচল করে। ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন চিকিৎসক সেই সুবিধাকে কাজে লাগাইয়াছেন। যে সকল রোগীকে অসাড় করা হইয়া থাকে, চিকিৎসকেরা তাহাদের জিহ্বায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সূচিকাযোগে প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সুফল লাভ করিয়াছেন। বাহু বা উরুতে যে ইন্‌ট্রামাসকিউলার ইঞ্জেক্‌সন দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কার্যকরী হইতে প্রায় মিনিট দশেক সময় লাগে। কোনও ঔষধ সূচিকা-যোগে জিহ্বায় প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়। অবশ্য এই পদ্ধতি কেবলমাত্র রোগীর অসাড় বা অজ্ঞান অবস্থাতেই কাজে লাগানো সম্ভব।

পরমাণু পরিচয়

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

[পরমাণু সম্বন্ধে আজ সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে—কিন্তু এত আলোচনা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। পরমাণু সংক্রান্ত কয়েকটি প্রচলিত শব্দের পরিচয় সাধন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—লেখক।]

অণু বা মলিকিউল হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, যা নিজস্ব গুণ বজায় রেখে প্রকৃতিতে অবস্থান করতে পারে। অণুর সঙ্গে পরমাণুর প্রভেদ হলো—পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। হাইড্রোজেনের পরমাণু একাকী অবস্থান করতে পারে না। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে হাইড্রোজেনের অণু গঠিত।

পরমাণুকে ভাঙা যায় না—এ ধারণা ঠিক নয়; বস্তুতঃ পরমাণুর ভাঙনের ফলে পরমাণু বোমার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

পরমাণুর গঠন-প্রণালী সৌরমণ্ডলের অনুরূপ। যদিও তার আয়তন এত ছোট যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাইক্রস্কোপের সাহায্যেও তা চোখে পড়ে না। সূর্য-প্রদক্ষিণকারী নবগ্রহের ন্যায় পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু বা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন নামে অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা আবর্তিত হচ্ছে।

আইসোটোপ—একই পদার্থের প্রকারভেদ সম্ভব। তা হলো আইসোটোপ। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ষোল ধরে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক। কিন্তু এক ধরণের হাইড্রোজেন আছে যার পরমাণুর ওজন দুই। ফলে এই ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম সাধারণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। হাইড্রোজেন গ্যাসের অপর একটি আইসোটোপও রয়েছে। তা হলো ট্রাইটিয়াম। প্রকৃতিজাত আইসোটোপের সংখ্যা পরিমিত। কিন্তু সাইক্লোট্রন, সিনক্রোটন, পরমাণু রিয়্যাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে ইতিমধ্যে সাত শতাধিক কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পরমাণু বিস্ফোরণে বহুবিধ আইসোটোপের উদ্ভব হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ জীবদেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

সাধারণ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে আইসোটোপের পার্থক্য থাকে। ক্যালসিয়াম অস্থিগঠনে সহায়তা করে, কিন্তু তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়াম হাড়ে অধিক মাত্রায় জমা হলে ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ হয়। বহু আইসোটোপ আজ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন, তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে পরম আশার স্থল। শিল্পকার্যেও আইসোটোপ নিয়োজিত হচ্ছে। আইসোটোপের ব্যবহার প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব—আইনষ্টাইন উদ্ভাবিত যুগান্তকারী তত্ত্ব, দু-পর্যায়ে বিভক্ত—১৯০৫ সালের বিশেষ তত্ত্ব এবং ১৯১৫ সালের সাধারণ তত্ত্ব। পরমাণু শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি অংশ মাত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এতদিন আমরা পদার্থ অবিনাশী এবং শক্তির প্রকারভেদ আছে বলে জানতাম। যেমন, কাঠ পুড়লে অঙ্গার হয়, অথবা তাপ-শক্তি আলোকে রূপান্তরিত হতে পারে—ইত্যাদি। কিন্তু গাণিতিক উপায়ে আইনষ্টাইন প্রমাণ করেন যে, শক্তি ও পদার্থ আসলে একই জিনিষের বিভিন্নরূপ—পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। পদার্থকে শক্তিতে নিয়ে যাওয়া যায় বলেই মানুষ

আজ পরমাণুর অসীম শক্তির অধিকারী হতে পেরেছে। তবে শক্তিকে পদার্থে নিয়ে যাওয়ার কৌশল আজও মানুষের আয়ত্তে আসে নি।

ইউরেনিয়াম—একটি ধাতব পদার্থ—প্রকৃতিজাত মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী। ইউ-রেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের ফলে যে তেজ নির্গত হয় তা-ই পরমাণু বোমার উৎস।

ইলেকট্রন—পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুকে প্রদক্ষিণকারী নিগেটিভ তড়িৎবাহী বস্তুকণা। ওজন—সবচেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিদ্যুৎপ্রবাহ বলতে এই ইলেকট্রনের প্রবাহকেই বুঝায়।

এক্স-রে—গণিতশাস্ত্রে রোমান হরফ 'x' (এক্স) অজ্ঞাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্স-রে—অজ্ঞাত রশ্মি। ভুটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রন্‌জেন গবেষণাকালে সহসা এই বিচিত্র রশ্মির সন্ধান পান এবং এর প্রকৃতি তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকায় নাম দেন এক্স-রে। বর্তমানে রন্‌জেন রশ্মি নামেও পরিচিত। এক্স-রে'র বিকিরণ কাঠ, কাগজ মাংসপেশী, এমন কি—ধাতুর পাত্‌লা পাতও অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে; কিন্তু যে কোন ঘননিবদ্ধ বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ হাড়ের ছবি তোলা সম্ভব। তাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এর এত কদর।

জিন (Genes)—এক কথায় "জীবন-কণিকা" (Atom of life) জীব-কোষের অতি সূক্ষ্ম অংশ। পরমাণুর বিকিরণে জিন-এর ক্ষতি হয় সর্বাধিক। জিন বংশগতির নির্ধারক, সন্তানের দৈহিক গঠন কিরূপ হবে তা এই জিন-এর উপরই নির্ভর করে। বিকিরণের প্রভাবে জিন-এর যে পরিবর্তন হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক। এই পরিবর্তিত জিন বংশধরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে; তাই বিকিরণের ফলে ভবিষ্যৎ পুরুষের বিপদের পরিমাণও ভয়াবহ। পরমাণু বোমা পতনে নিকটবর্তী যে সব অঞ্চলের লোক আজও অনাহত আছে বলে বোধ হয়—বলা যায় না, কয়েক পুরুষ পরে তাদের বংশধরদের বিকিরণ-জনিত দুরারোগ্য রোগে ভুগতে হতে পারে। সম্প্রতি বিখ্যাত জেনেটিসিষ্ট ডাঃ মুলার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন যে, এ-পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরমাণু বিস্ফোরণের প্রভাবে আগামী ৩০ বছরে অন্ততঃ লক্ষাধিক লোকের জীবন হানি ঘটতে পারে। জিন-এর উপর বিকিরণের ক্রিয়া এতই মারাত্মক।

তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-অ্যাক্টিভিটি কোন কোন পদার্থের এক বিশেষ ধর্ম। ভারী পদার্থমাত্রেই তেজস্ক্রিয়; যেমন—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরি-য়াম ইত্যাদি। সাইক্লোট্রন, প্রোটন সাইক্লোট্রন ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে বহু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ (যে ষ্ট্রন্‌সিয়ামে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা ৯০) ক্যালসিয়াম-৪৪ ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় আইসো-টোপের উদ্ভব হয়। তেজস্ক্রিয়ার ফলে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তেজস্ক্রিয়তা একপ্রকার সক্রিয় বিকিরণ, যার ফলে মৌলিক পদার্থ আল্‌ফা, বিটা বা গামা রশ্মি বিকিরণ করে এবং মূল পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তেজস্ক্রিয়তার জন্যে দুর্লভ রেডিয়াম কালক্রমে সামান্য ধাতু সীসায় পরিবর্তিত হয়ে যায়।

থোরিয়াম—একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক ধাতব পদার্থ। পারমাণবিক শক্তি আহরণের ক্ষেত্রে ইউরে-নিয়ামের বিকল্পে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। পদার্থটি অপেক্ষাকৃত সুলভ। ভারতের দক্ষিণ উপকূলে মোনাজাইট বালিতে প্রচুর থোরিয়াম পাওয়া যায়।

নিউক্লিয়াস—পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু। প্রোটন, নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক বস্তুকণার সমবায়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান আহরণ আজও শেষ হয় নি। তবে এটুকু

ঠিক যে, নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে অপরিমেয় পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়।

পিকাডন—জাপানী কথা। পিকা মানে প্রখর আলো এবং ডন মানে ভীষণ শব্দ। ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাষ্ট ভোরবেলায় হিরোসিমায় প্রথম পরমাণু বোমা পতনের পর বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ আলো এবং প্রচণ্ড শব্দ—দুই-ই প্রায় এক সঙ্গে অনুভূত হয়েছিল। বোমা পতনের পর জীবিতদের মধ্যে এই পিকাডন বা সংক্ষেপে পিকা কথাটি জাপানীদের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়। পিকাডন বলতে তারা পরমাণু বোমাকেই বোঝাতো।

বল-তরঙ্গবাদ—ফরাসী গণিতবিদ্ ব্রগ্‌লি বস্তু-কণিকায় তরঙ্গধর্ম আরোপ করেছেন। তাঁর মতানুসারে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি একই সঙ্গে বস্তু ও তরঙ্গের ধর্ম পালন করে। একেই বলা হয় বল-তরঙ্গবাদ (Wave mechanics)। এই অভিনব তত্ত্ব বর্তমানে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। টমসন, নানার, স্টার্ণ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বল-তরঙ্গবাদ আজ কতকাংশে পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিকিরণ—তড়িৎ-চুম্বকের তরঙ্গাকারে প্রবাহিত শক্তি। যেমন—তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ, এক্স-রে ইত্যাদি। অপর অর্থে পরমাণুর গতিশীল বস্তুকণা—ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি।

বাতি বা আগুন জ্বাললে যে আলো বা তাপ বিকিরিত হয় তা হলো সাধারণ, কিন্তু পরমাণুর বিস্ফোরণে যে শক্তির বিকিরণ ঘটে তার প্রভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। অধিক বিকিরণে জীব-দেহ বিনষ্ট হয়। বিকিরণের ফলে উদ্ভূত 'রেডিয়েশন সিকনেস্' আজ অতি সাধারণ কথা। হিরোসিমা, নাগাসাকি এবং বিকিনীতে জাপানীরা এবং গবেষণা কেন্দ্রের বহু বিজ্ঞানী এই বিকিরণ রোগে ভুগে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, তড়িৎ বা তাপ বোধের ন্যায় জীবদেহ পরমাণুর বিকিরণ অনুভব করতে পারে না; ফলে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই মারাত্মকরূপে বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পরমাণুর বিকিরণ নতুন জিনিষ নয়, মহাজাগতিক রশ্মি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রকৃতিজাত বিকিরণের উৎস।

ভাঙন বা ফিসন (Fission)—পরমাণুর ভাঙন বললে আমরা নিউক্লিয়াসের ভাঙন বুঝি। নিউ-ক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে পরমাণুর শক্তি নির্গত হয়। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় জানা গেছে, ফিসনের ফলে উদ্ভূত নিউক্লিয়াসের ভগ্নাংশগুলির যোগফল কখনই অভগ্ন নিউক্লিয়াসের সমান হয় না, কিছু পরিমাণ বস্তু কম থাকে। এই পরিমাণ বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে মাত্র এক পাউণ্ড পদার্থ থেকে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, কয়েক লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লা জ্বেলেও তা পাওয়া যায় না।

ইউরেনিয়াম ইত্যাদির ফিসন পারমাণবিক শক্তির উৎস। জার্মেনীতে হ্যান এবং ষ্ট্রাসম্যান সর্ব-প্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙ্গতে সক্ষম হন। এই উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ সবচেয়ে সুবিধাজনক। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সময় দুই বা ততোধিক নিউট্রন নির্গত হয়ে থাকে। এই মুক্তিপ্রাপ্ত নিউট্রনগুলি পুনরায় উক্ত ইউরেনিয়ামে আঘাত করে। ফলে পরমাণু ভেঙে আরও শক্তি প্রকাশ পায়। এইরূপ পর্যায়-ক্রমিক ক্রিয়া (Chain Reaction) সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত হওয়াতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ মানে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ শক্তির প্রকাশ।

ফিউসন হলো ভাঙনের বিপরীত কথা। এখানে একাধিক পরমাণুর সম্মিলনে শক্তির উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেনের সঠিক ওজন ১·০০৮ এবং চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হতে পারে। কিন্তু হিলিয়ামের ওজন ৪·০০৩, অর্থাৎ ১·০০৮ × ৪ = ৪·০৩২ থেকে ০·০২৯ কম।

এই পরিমাণ পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। হাইড্রোজেন বোমাতে তাই হয়। কিন্তু হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করতে হলে প্রচণ্ড তাপ-শক্তির প্রয়োজন। সে পরিমাণ তাপ সূর্যপৃষ্ঠেই আছে। একমাত্র পরমাণু বোমা ফাটিয়ে পৃথিবীতে ঐ পরিমাণ তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। এজন্যে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণকালে পরমাণু বোমাকে পলতে হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টতঃ, প্রথমোক্ত বোমা শেষেরটির চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক।

মহাজাগতিক রশ্মি—বহির্বিশ্ব থেকে আগত বিশেষ এক বস্তুপ্রবাহ জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। এই রশ্মি মুখ্যতঃ বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছু পরিমাণ (এক-পঞ্চমাংশ) পরিবর্তিত রূপে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। মহাজাগতিক রশ্মি (কস্‌মিক-রে) সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃতভাবে জানা যায় নি, তবে বিজ্ঞানীরা একযোগে তৎপর হয়েছেন। ভারতবর্ষেও সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের গুলমার্গে (সাগরপৃষ্ঠ থেকে ৯,০০০ ফুট উঁচু) একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরেও এ সম্পর্কে গবেষণার কাজ চলছে। সর্বাধুনিক পরিকল্পনায় কৃত্রিম উপগ্রহে বিশেষ যন্ত্রপাতি যোগ করে কস্‌মিক-রে সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

রিয়্যাক্টর—পরমাণু ভাঙনের প্রচণ্ড শক্তিকে সংযত আকারে মানুষের কাজে লাগাবার উপায় বিশেষ, পূর্ব নাম অ্যাটমিক পাইল। প্রথম রিয়্যাক্টর প্রস্তুত হয় ১৯৪২ সালে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ মাত্র রিয়্যাক্টর প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। রিয়্যাক্টরের প্রকারভেদ আছে। বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে সম্প্রতি ভারত সরকার বোম্বের উপকণ্ঠে ট্রম্বেতে অপ্সরা নামে একটি স্থইমিং পুল রিয়্যাক্টর স্থাপন করেছে।

রেডিয়াম—ক্যুরী দম্পতি কর্তৃক আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় ধাতু। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এর ব্যবহার আছে। রেডিয়াম ধাতু থেকে নির্গত রশ্মি ক্যান্সার রোগাক্রান্ত তন্তু বা কোষসমষ্টিকে বিনষ্ট করতে পারে। তবে রেডিয়াম ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। নিরোগ অংশে বা অধিক ব্যবহারে রেডিয়ামের রশ্মি বিপরীত ক্রিয়া করে—রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে দুরারোগ্য ক্যান্সারের কারণ হয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ধাতু ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের অ্যাদিয়ার ক্যান্সার হাসপাতালে একটি কোবাল্ট বোমা বসানো হয়েছে।

রেম্—(Rem, Roentgen Equivalent Men), বিকিরণের একক। যে পরিমাণ এক্স-রে এক সি সি. (c c. ঘন সেন্টিমিটার) শুষ্কবায়ু O° ডিগ্রি তাপ এবং সাধারণ চাপে এক (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক) ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তাকে বলা হয় এক রন্‌জেন। রেম্ জৈবিক অর্থে রন্‌জেনের তুল্যার্থ। এক রন্‌জেন এক্স-রে নরদেহের যে ক্ষতি করে, সে পরিমাণ ক্ষতি যতটুকু পরমাণু বিকিরণে হয়, তার নাম হলো এক রেম। মানুষ সপ্তাহে ০·৩ রেম বিকিরণ সহ্য করতে পারে।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞেরা এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত স্বল্পতম বিকিরণও জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। টেলিভিশন দেখা, এক্স-রে দিয়ে দেহাভ্যন্তরের ফটো তোলা এবং খুব উঁচুতে বিমান আরোহণ প্রভৃতি জিন-এর সমান ক্ষতি করে। বর্তমানে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা এই বিপদকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ইদানীং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ক্যান্সার সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধিটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক কিছু জানা গেছে এবং এমন কিছু কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা গেছে যা ব্যাধির একেবারে প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করলে মোটামুটিভাবে রোগীকে সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু ক্যান্সারকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার মত কোন ওষুধ বা চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি—বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ক্যান্সারের বেলায়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি জৈব-রাসায়নিক ক্ষেত্রে ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। ক্যান্সারের আক্রমণের ফলে যখন জীব-দেহের সুস্থ স্বাভাবিক তন্তুগুলি অর্বুদাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সেগুলির মধ্যে কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে, সে সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে জানা গেলে চিকিৎসারও কার্যকরী ব্যবস্থা হতে পারে।

চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান পরিষদের রসায়ন-বিজ্ঞান ভবনের একদল বিজ্ঞানী অধ্যাপক সর্ম-এর পরিচালনায় এ সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এঁরা ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এঁদের গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, গত বছরে ভিয়েনায় যে আন্ত-র্জাতিক জৈব-রাসায়নিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, সেই কংগ্রেসে ক্যান্সার সম্পর্কে জৈব-রাসায়নিক গবেষণা সংক্রান্ত শাখা-অধিবেশন এবং অপর একটি সংশ্লিষ্ট শাখা-অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন দু-জন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানী। এঁদের গবেষণার ফলে এখনও ক্যান্সারের সর্বাঙ্গীন সমাধানের উপায় আবিষ্কৃত হয় নি বটে, তবে সেই লক্ষ্যে চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীরা যে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, সেকথা ওই কংগ্রেসে সমবেত সব বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন।

চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীরা যে ধারায় ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণা করছেন তা হলো মোটামুটি এই—জীব-কোষের মধ্যে যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি আছে, সেই অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়াকে (মেটা-বোলিজম্) যদি ব্যাহত করা যায় তাহলে অর্বুদের পৌনঃপুনিক বা ম্যালগিন্যাণ্ট বৃদ্ধিকেও বন্ধ করা যায়। নিউক্লিক অ্যাসিডগুলির একটি অংশকে বলা হয় ইউরাসিল। ইউরাসিলের অনেকগুলি অনুরূপ অ্যাসিড বা অ্যানালোগ কৃত্রিম উপায়ে লেবরেটরিতে তৈরী করে নিয়ে অর্বুদের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। অধ্যাপক সর্ম্ '৬-আজাইউরাসিল' নামে যে রাসায়নিকটি তৈরী করেন, দেখা গেল সেটা অর্বুদের বৃদ্ধিকে বেশ ভাল ভাবেই প্রতিরোধ করতে পারে। এই রাসায়নিকটি যে টিউমার-আক্রান্ত জায়গাটিকে সীমাবদ্ধ করে রাখে—তার প্রসারে বাধা দেয়, এই আবিষ্কার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক তথ্যের শক্তিশালী হাতিয়ার জোগাবে।

ইতিমধ্যে আরেক দল চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানী, যাঁরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাঁরা টিউমারের উপর তেজস্ক্রিয় কার্বন মিশ্রিত ৬-আজাইউরাসিল প্রয়োগ করে আরও ভাল ফল পেয়েছেন। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন মিশ্রিত ৬-আজাইউরাসিল অর্বুদের জীবাণু-

গুলির এক জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং ৬-আজাইউরাসিল-রিবোজাইড নামে একটি নতুন রাসায়নিক সৃষ্টি করে। এই শেষোক্ত রাসায়নিকটি শুধু যে টিউমারের বৃদ্ধি আর প্রসারকেই ব্যাহত করে তাই নয়, ক্রমেই টিউমারটিকে সারিয়েও তোলে। এই আবিষ্কারের পরে অধ্যাপক সর্ম ঘোষণা করেন—ক্যান্সার রোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার এক সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান এতদিনে পাওয়া গেছে।

পশুদেহে কৃত্রিম উপায়ে টিউমার সৃষ্টি করে এই নব-আবিষ্কৃত জৈব-রাসায়নিক প্রয়োগ করে অধ্যাপক সর্ম-এর সহকারী গবেষকেরা এ-পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই টিউমার সারিয়ে তুলেছেন। মানুষের বেলায়ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীরা এই ৬-আজাইউরাসিল রিবোজাইড-এর রোগ নিরাময়ের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং এ ক্ষেত্রেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে—যেমন, এই জৈব রাসায়নিকটি মস্তিষ্ক-তন্তুর মধ্যে মোটেই অনুপ্রবেশ করে না—এর ফলে এই জিনিষটি কোনরকম প্রতিকূল মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করবে না। ৬-আজাইউরাসিল কিন্তু রোগীর মনের উপর এইরকম প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

কিছুদিন আগে জেনেভায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল, সেই সম্মেলনে চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে তাঁদের উপরিউক্ত গবেষণার বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। এই গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা যে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, একথা অন্য সব দেশের বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

পুরাতন ধমনীর স্থলে নতুন ধমনী

ডাঃ উইলিয়াম এ. আর. টমাস পুরাতন ধমনীর স্থলে নতুন ধমনী সম্পর্কে লিখেছেন—ব্রুসেলস্-এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বৃটিশ প্যাভিলিয়নে অন্য অনেক জিনিষের সঙ্গে একটা নতুন জিনিষ প্রদর্শিত হয়। এই জিনিষটি হলো, এক বিশেষ ধরণের পলিথিলিনের সেলাইশূন্য টিউব। এটি আর কিছুই নয়, একটি কৃত্রিম ধমনী, শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যার মূল্য অপরিসীম। এই ধমনী আবিষ্কৃত হবার পর চিকিৎসকেরা পুরাতন ধমনীর স্থলে নতুন ধমনী ব্যবহারের একটা চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রায় ৫০ বছর পূর্বে এই নতুন ধমনীর সন্ধান সুরু হয় এবং এই অর্ধশতক ধরে কাচ, হাতীর দাঁত, অ্যালুমিনিয়াম ও সোনার টিউব নিয়ে বিকল্প ধমনী আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। কিন্তু এর কোনটিই কাজের যোগ্য হয় নি। শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতে তৈরী তন্তু, যথা নাইলন—এই দিকে কিছুটা কাজ করতে পারে।

এই তন্তু আবিষ্কৃত হবার পূর্বে চিকিৎসকেরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ধমনীর স্থান নিতে পারে একমাত্র নতুন ধমনী। কিন্তু তা কি পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে তা বোঝা যাচ্ছিল না; কারণ মানুষের শরীরে কোথাও কোন অতিরিক্ত ধমনী নেই যা সরিয়ে এনে অন্যের ক্ষতিগ্রস্ত ধমনী সংস্কারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হলো শিরার ব্যবহার। ধমনী আর শিরার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ধমনী হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সরিয়ে নিয়ে যায়, আর শিরা রক্ত বহন করে আনে হৃৎপিণ্ডে। এর অর্থ হলো

শিরার গাত্র ধমনীর তুলনায় অনেক পাতলা ; কারণ তাকে চাপ সহ্য করতে হয় অনেক কম। তার এই পাতলা গাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত ধমনী সংস্কারের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিকল্প ধমনী হিসাবে শিরার ব্যবহার হয়তো সম্ভব হতো (কারণ আমাদের অনেকেরই অতিরিক্ত শিরা আছে যা শরীর থেকে কেটে বের করে নিলে শরীরের কোন ক্ষতি করে না), কিন্তু তাতে শিরার গাত্র কেটে গিয়ে একটা অঘটন সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যেত।

মেডিক্যাল গবেষকেরা কিন্তু তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা আবিষ্কার করেন, শরীর থেকে ধমনী কেটে নিয়ে ধমনীর সংস্কার হতে পারে এবং এই ধমনী সংগ্রহ করা যেতে পারে মৃতের শরীর থেকে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। কিন্তু ক্রমশঃ সমস্যা দেখা দিল, যথাসময়ে ধমনী সরবরাহের।

এই সমস্যার সমাধান হয় ধমনী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে। ধমনী প্রথম রাখা হয় একটা সীল করা টিউবের মধ্যে, তারপর তাকে ফ্রিজ-ড্রাইং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই প্রোসেসিং সম্পূর্ণ হলে সীল করা টিউবে রক্ষিত ধমনীকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঘরের সাধারণ উত্তাপের মধ্যে রাখা সম্ভব হতে লাগলো। এর ফলে শল্য-চিকিৎসকেরাও যথাসময়ে ধমনীর সরবরাহ পাওয়ার বিষয়ে আশান্বিত হলেন। এখন বৃটেনের বহু হাসপাতালে, যেখানেই এই বিশেষ অস্ত্রোপচার হচ্ছে, সেখানেই তাদের নিজেদের ধমনী-ব্যাঙ্ক র'য়েছে।

এই সব ব্যাঙ্ক যথাযোগ্য কাজ করে যেতে পারলেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান হচ্ছে না। সেজন্যে উপযুক্ত কৃত্রিম ধমনী সম্পর্কে গবেষণার কাজ চলতে থাকে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, বিনা আয়াসে সুলভে বিশ্বের সর্বত্র চিকিৎসকদের কাছে ধমনী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা।

এখানে এসে দেখা দিল নতুন নতুন প্লাষ্টিক পদার্থ বা মানুষের তৈরী তন্তু। এই নতুন প্লাষ্টিক পদার্থ, যেমন—নাইলন, ওরলন, টেরিলিন প্রভৃতি নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা চলে পলিথিলিন নিয়ে (শেষোক্ত পরীক্ষার ফলই ক্রসেল্‌সের বিগত প্রদর্শনীতে আমরা দেখতে পাই)। টেরিলিন ও ওরলন ব্যবহার সন্তোষজনক হলেও সর্বশেষ পলিথিলিন ধরণের পদার্থের ব্যবহার আরও বেশী সন্তোষজনক হয়। এই পদার্থের এমন অনেক গুণ দেখা যায়, যা কৃত্রিম ধমনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। জিনিষটা যেমন শক্ত তেমনই নমনীয়। নমনীয়তা একটা মস্ত বড় গুণ, কারণ পায়ের ধমনীকে সহজে বাঁকাবার প্রয়োজন হয়। এর আর একটি গুণ হলো জিনিষটিকে ফুটন্ত জলে রাখলে তা সহজে কুঞ্চিত হতে পারে। শল্য-চিকিৎসকদের কাছে এর মূল্য অনেক ; কারণ অস্ত্রোপচারের সময় তাঁরা বুঝতে পারেন না, কতবড় টিউব তাঁদের প্রয়োজন হবে। এখন কুঞ্চিত করার সুবিধা থাকায় একটু বড় টিউব নিলেও তাকে প্রয়োজনমত ছোট করতে তাঁদের অসুবিধা হয় না।

এদিকে যেভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে মনে হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও উন্নত কোন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়তো সম্ভব হবে এবং শল্য-চিকিৎসকদের পক্ষে ধমনী পরিবর্তনের কাজও অনেক সহজ হয়ে আসবে।

চিঠি-পত্র

মাতৃদুগ্ধ

"স্তনদুগ্ধ ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন" (শ্রীসন্তোষ কুমার দে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৫৬১ পৃষ্ঠা, ১৯৫৮) প্রবন্ধটি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলতে চাই। শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী ও জ্ঞানগর্ভ হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের অনেকেই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শিশুকে গোদুগ্ধ বা অন্যান্য Baby food খাওয়াতে থাকেন। মাতার কোন ব্যাধি না থাকলেও অনেক ডাক্তার এতে সম্মতি প্রদান করেন। Baby food যাঁরা তৈরী করেন তাঁরাও অনেক সময় প্রচার করেন যে, এটি মাতৃ-দুগ্ধের সম্পূর্ণ পরিপূরক। আমরা শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে দেখতে পাই যে, মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর পক্ষে সর্বতোভাবে—বিশেষ করে, মানসিক বিকাশের দিক থেকে মঙ্গলজনক।

মানসিক বিকাশের জন্যে মাতৃদুগ্ধ বিশেষ উপযোগী হওয়ার কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর শ্বেত পদার্থের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে Cerebrosides। Cerebroside গ্রুপের সবই হচ্ছে Galactose-derivatives (Galactolipids)। দুগ্ধে যে শর্করা পাওয়া যায় (Lactose বা Milk-sugar), তা Glucose ও Galactose—এই দুই পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী গঠনের জন্যে প্রথম অবস্থায় Galactose-এর প্রয়োজন খুব বেশী হওয়া স্বাভাবিক। শিশুর শরীরে Glucose→galactose—এই রূপান্তরের ক্ষমতা খুব সম্ভব থাকে না—থাকলেও তুলনায় এর গতি কম থাকে। এই জন্যেই বোধ হয় প্রকৃতি দুগ্ধে Lactose সরবরাহের বন্দোবস্ত করেছে। মাতৃদুগ্ধে গো-দুগ্ধের তুলনায় ছানা জাতীয় পদার্থ (Casein-protein) ও লবণের অংশ অনেক কম; কিন্তু Lactose-এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ও তৈলজাতীয় পদার্থের পরিমাণ সমান বা প্রায় সমান।

	মাতৃদুগ্ধ (%)	গো-দুগ্ধ (%)
ছানা (Protein)	0·7-1·5	2·5-4·0
লবণ (Salts)	0·2-0·3	0·6-0·7
Lactose	6·0-7·3	3·5-5
তৈলজাতীয় পদার্থ (Fats)	2-4	2-4

(Text book of Biochemistry-Cameron; Published by J. A. Chenchall, London).

মাতৃদুগ্ধে যে গো-দুগ্ধের তুলনায় বেশী শর্করা থাকে (যে শর্করা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর জন্যে প্রয়োজনীয়), এটা কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়?

দ্বিতীয়তঃ বহুদিন পূর্বে ডাঃ বি. সি. গুহ গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন যে, দুগ্ধ থেকে তৈলজাতীয় (Fat) পদার্থ সরিয়ে নিলে এবং সেই দুধ ইঁদুরকে খাওয়ালে Lactose-এর Galactose অংশ শরীরে থাকে না, প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়; অর্থাৎ দুগ্ধের তৈলজাতীয় পদার্থ (Milk-fat) Galactose Assimilation-এর জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই গবেষণা বিলাতের Biochemical Journal-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে Elvehyem ও তাঁহার সহকর্মীগণ দেখিয়েছেন যে, Fat-এর প্রকৃতির উপর Assimilation-এর ডিগ্রি নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা খুব অযৌক্তিক হবে না—

মাতৃদুগ্ধের তৈলজাতীয় পদার্থের প্রকৃতি বা গুণই দুগ্ধ শর্করার (Lactose) Galactose Assimilation-এর জন্যে মানব শিশুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীধ্রুবপ্রসাদ সেন

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

কলিকাতার চিড়িয়াখানায় শ্বেত ভল্লুক।

ফটো—তারাদাস নাগ

বাংলার জীবজন্তু

বাংলাদেশকে বলা হয় শস্য-শ্যামলা। কারণ বাংলার মাটি অত্যন্ত উর্বর, এখানে যত সহজে শস্য জন্মায় পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নয়। কিন্তু মাটির উর্বরতাই বাংলার একমাত্র সম্পদ নয়—এখানকার বন্য পশু-পাখীও এক বিশাল সম্পদ।

বাংলাদেশ উত্তরে হিমালয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুবিশাল ভূখণ্ডে যে কত রকমের জন্তু-জানোয়ার, মাছ, সরীসৃপ আছে তা ধারণা করাও শক্ত। প্রথমেই ধরা যাক হাতীর কথা। বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর জীব—হাতীও এই বাংলায় রয়েছে। রাজা-জমিদারের বাড়ীর পোষা হাতী নয়, সত্যিকারের বুনো হাতী, তার স্বাভাবিক পরিবেশে। বাংলার উত্তর দিক অর্থাৎ দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা—প্রথমটি একেবারে হিমালয়ের উপর আর দ্বিতীয়টি হিমালয়ের পাদদেশে। জলপাইগুড়ির কিছু অংশে পাহাড় আছে যা হিমালয়েরই বিস্তৃত অংশ। এখানে আছে গভীর বন। সরকারের রাখা রিজার্ভ-ফরেষ্ট ও স্বাভাবিক বন-জঙ্গল দুই-ই আছে সেখানে; আর সেই সব বনে আছে বহু হাতী। অসংখ্য বলা চলে না, কারণ মানুষের অত্যাচারে এবং মানুষের জমির প্রয়োজনে জীব-জন্তুদের আবাসস্থল জঙ্গল কেড়ে নেওয়ায় বন্য জন্তু বহু জায়গায়ই অনেক কমে গেছে এবং বাংলা দেশের এসব অঞ্চলেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কাজেই ওদিক থেকে হাতী যথেষ্ট কমে গেলেও এখনও গুরুতরভাবে কমে নি। উপরন্তু বর্তমানে সরকার থেকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করায় তারা টিকেও গেছে এবং সংখ্যায়ও বাড়ছে। আগেকার দিনে রাজারাজরাদের ঐশ্বর্যের পরিমাপ হতো হাতীর সংখ্যা দিয়ে। তাই তাঁরা হাতী রাখতেন। সে হাতীকে অবশ্য তাঁরা পরিবহনের কাজে লাগাতেন। এখন মোটর-গাড়ীর প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা সেইদিকে ঝুঁকেছেন; তাতেও হাতী ধরা অনেক কমে গেছে। কাজেই কিছুদিন আগেও হাতী যেরূপ ধ্বংসের পথে এসে পৌচেছিল, তাথেকে অব্যাহতি পেয়ে পুত্র-কলত্র নিয়ে সংখ্যায় বেশ একটু বেড়েই উঠেছে।

হিমালয়ের এ অঞ্চলটার নাম তরাই। উত্তর-বিহার থেকে আরম্ভ করে উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর আসাম হয়ে এই তরাই অঞ্চল বিস্তৃত রয়েছে ব্রহ্মদেশের পাহাড় পর্যন্ত। এখানে হাতী ছাড়াও বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আছে গণ্ডার, আর বাংলার প্রসিদ্ধ বাঘ—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এসব বনে আর আছে বড় বড় অজগর বা ময়াল সাপ। এসব সাপ কুড়ি-পঁচিশ থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হয় পূর্ণ কলেবর হলে, আর তাদের বেষ্টনী হয় প্রায় তিন থেকে চার, সাড়ে চার হাত। এরা একটা সাধারণ

আয়তনের হরিণকে আস্ত গিলে ফেলতে পারে। সাপ তার খাবার সব সময়েই আস্ত গিলে খায়, অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মত মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় না। বাগে পেলে এরা একটা মানুষকে আস্ত গিলে ফেলবার শক্তি রাখে। কিন্তু কোথাও অজগর মানুষ খেয়ে ফেলেছে, এমন কথা শোনা যায় নি; অন্ততঃ আধুনিক কালে নয়।

এ ছাড়াও সে সব বনে আছে ছোট-বড় নানা ধরণের হরিণ। তাদের নানা জাত। সাধারণ শেয়ালের আকার থেকে আরম্ভ করে এক একটা টাট্টু ঘোড়ার মত। আর ভালুক, চিতা, নেকড়ে, শেয়াল, বনবিড়াল—এ সব তো আছেই!

বাংলার পশ্চিম দিকে বর্ধমান বিভাগ; অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ ঘেঁষে ছোট নাগপুরের বনের প্রান্তভাগ। এ সব হলো শাল, মহুয়ার বন। এ সব বনে আছে বিস্তর ভালুক, চিতাবাঘ, হায়েনা আর নেকড়ে। রয়্যাল বেঙ্গল বা ডোরাকাটা বাঘও এসব বনে আছে বটে, তবে তারা আসল রয়্যাল নয়—তার চাইতে আকারে বেশ কিছু ছোট। চিতাবাঘ বাংলাদেশে আছে দু-রকমের। এক দলের গায়ে চক্কর চক্কর দাগ, আর এক দলের গায়ে টিকের মত ছিটে-ছিটে দাগ। টিকেওয়ালা চিতারা খুবই কমে গেছে; তাদের খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় এখন। তবে এসব বনের বেশীর ভাগই হলো ভালুক।

টিকেওয়ালা চিতাকে বাংলার কোন কোন জায়গায় বলে গুলবাঘ। আর একটা এর চাইতেও ছোট ধরণের বাঘজাতীয় জন্তু আছে, তাও বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গায়ই পাওয়া যায়—যার নাম খাটাশ বা খট্টাশ। কোন কোন জায়গায় একে বাঘডাশাও বলে। বাঘডাশার গায়ে বাঘের মত ডোরা আছে, কিন্তু তার গায়ের রং কাল্‌চে হওয়ায় খুব নজর না করলে সে দাগ চোখে পড়ে না। এরা সাধারণ বনবিড়ালের চাইতে বড়, আবার সব চাইতেও ছোট যে চিতাবাঘ তার চাইতেও ছোট, অর্থাৎ বনবিড়াল আর বাঘের মাঝামাঝি একটি জন্তু।

বাংলাদেশে বনবিড়ালও আছে যথেষ্ট, আর তা পাওয়া যায় বাংলার সর্বত্র ছোট-বড় সব জঙ্গলেই; অর্থাৎ গ্রামময় বাংলার প্রতিগ্রামেই আছে তাদের বাস। বনবিড়াল গৃহপালিত বিড়ালের চাইতে আকারে বেশ বড়—সাধারণতঃ প্রায় দেড় গুণ; আর গায়ে থাকে ছাই রঙের লোমের উপরে পাঁশুটে ডোরা। বনে-জঙ্গলে লতাপাতা, গাছের গুঁড়ি আর আলোছায়ার সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে ওদের ঐ রকম রং। এরা বৃক্ষবাসী মাংসাশী জীব।

খেঁকশিয়াল, উদ্‌বিড়াল, বেজী, সজারু, খরগোস—এ সবও আছে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র। সাদা খরগোস বাংলায় আছে খুব কম, এখানকার খরগোস প্রায়ই ধূসর রঙের হয়ে থাকে। সজারু রাত্রিচর জীব। গভীর রাত্রিতে যখন সজারু চলা-ফিরা করে তখন ওদের গায়ের কাঁটার ঝাঁকুনীতে বেশ এক রকম ঝম্‌ঝম্ শব্দ হয়। সজারুর

কাঁটা দিয়ে নানারকম জিনিষ তৈরী হয়। তার ভিতরে সজারু-কাঁটায় ছোট ছোট সৌখীন বাক্স বা পেটিই প্রধান। সুন্দরবনের কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ আছে নদীয়া জেলা আর মুর্শিদাবাদ জেলার ওদিকে। সে সব বনে আছে একরকম বুনোকুকুর। স্থানীয় লোকেরা তাদের বলে ডোমকুকুর। এ জীবটিকে এখন আর বেশী দেখতে পাওয়া যায় না, এরা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

গোসাপ আছে প্রায় সারা বাংলাতেই। গোসাপেরা পড়ে সরীসৃপ শ্রেণীতে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে এক সময় গোসাপের চামড়ার চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। গোসাপের চামড়ার তৈরী জুতা, ছোট ছোট ব্যাগ ও মানিপার্স ইত্যাদি খুব ফ্যাসান হয়ে উঠেছিল। সেই সময় চামড়ার কারবারীরা লোক লাগিয়ে বাংলার গোসাপের বংশ প্রায় নির্মূল করে তুলেছিল। পরে গভর্ণমেণ্ট থেকে আইন করে গোসাপ মারা বন্ধ করে দেওয়া হয়; তাতেই গোসাপেরা তখনকার মত টিকে গেছে।

কচ্ছপও বাংলায় আছে বিস্তর এবং ছোট-বড় নানা জাতের। আর এদেশে আছে অসংখ্য কুমীর, আর তাদের ভিতরেও আছে ছোট-বড় নানা জাত। তবে দুটি বিশেষ জাতের কুমীর হচ্ছে—আসল কুমীর, যাকে ইংরেজীতে বলে Alligator, আর মেছো-কুমীর। মেছোকুমীরের সারা শরীর সাধারণ কুমীরের মতই, খালি মুখটি সুঁচালো ও লম্বা, অনেকটা কেকলে মাছের মত। এরা মাছ, ব্যাং, ইঁদুর ও খরগোসজাতীয় ছোট ছোট প্রাণী ধরে খায়। আসল কুমীর মাছ খায় বটে, কিন্তু বড় বড় জন্তুই ওদের সত্যিকার খাবার। বাগে পেলে মানুষও যথেষ্ট খায়। কুমীর সাঁতার দেয় তার লেজ নেড়ে, সাঁতারে সে হাঁসের মত পা ব্যবহার করে না। ঐ লেজ নেড়েই সে যথেষ্ট বেগে যেতে পারে এবং জলের ভিতর একবার কুমীরে পিছু নিলে খুব ভাল সাঁতারু না হলে রেহাই পাওয়া একরকম অসম্ভব। এদের শিকার ধরবার কায়দাটিও বড় মজার। কুমীরের নাকের ফুটো এবং চোখের গর্ত মাথার কঙ্কালের উপরে উঁচু করে বসানো, যাতে সে সারা শরীরটি জলের ভিতর ডুবিয়ে শুধু দেখবার জন্যে চোখ আর নিশ্বাস নেবার জন্যে নাকের ফুটোটি জলের বাইরে বের করে রাখতে পারে। অমনি করে ওরা একটুকুও না নড়ে নিশ্চল একখণ্ড ভেসে-আসা কাঠের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকে একই জায়গায়। তারপর দূরে পারের কাছে নিঃশঙ্ক কোন মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারকে আসতে দেখলেই সে স্থানটি লক্ষ্য করে নিয়ে টুপ্ করে ডুবে জলের নীচ দিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয় এবং লেজের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় লক্ষ্য বস্তুকে জলে নামিয়ে এনে কামড়ে ধরে। এদের লেজের শক্তি অসাধারণ। লেজের এক আঘাতে মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তুকে কয়েক গজ দূরে জলের মধ্যে নিয়ে

ফেলতে পারে। কুমীরও সরীসৃপ দলভুক্ত। কুমীরের চামড়াও নানারকম সৌখীন জিনিষ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়; তার ভিতরে জুতা ও সুটকেশই প্রধান।

এরা যদিও সারা বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় নদীতেই কম-বেশী আছে, তবুও এদের বিশেষ আবাস স্থল হলো সুন্দরবন—যেহেতু সেখানে আছে অজস্র নদী, আর তাদের বিব্রত করবার জন্যে সেখানে নেই তাদের প্রধান শত্রু মানুষ। কুমীর সাধারণতঃ নদী-নালাতেই বাস করে; সময় সময় ডাঙ্গায়ও উঠে আসে। সামুদ্রিক কুমীর থাকে ডাঙ্গার কাছে, মাঝ সমুদ্রে নয়। সমুদ্রের অতল গভীরে কুমীর নেই।

বাংলাদেশে আর একটি অদ্ভুত প্রাণী আছে, যার নাম বজ্রকীট বা বনরুই। এদের প্রধানতঃ পাওয়া যায় উত্তর বঙ্গে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরদিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলায়ও এদের দেখা যায় বলে শোনা গেছে। এদের জাত ভাই আছে চীনদেশে। এরা দক্ষিণ আমেরিকার আর্মাডিলোর শ্রেণীভুক্ত। দেখতে অনেকটা গোসাপের মত—চেহারায় কিন্তু গোসাপের চাইতে আকারে অনেক বড়। এর সারাটি গা মাছের আঁশের মত একরকম শক্ত আঁশে ঢাকা। সুন্দর সাজানো আঁশ, মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত। এরা পিঁপড়ে, উইপোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করে। পায়ে বঁড়শীর মত বাঁকা ধারালো নখ আছে, যার সাহায্যে এরা মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ের আড্ডা বের করে নেয়। ভয় পেলে এরা বুকের মধ্যে মাথা ও পা গুঁজে লেজটাকে গুটিয়ে একটি বলের মত পড়ে থাকে। তারপর শত্রু চলে গেছে মনে হলেই ধীরে ধীরে আবরণ মুক্ত করতে আরম্ভ করে। একবার ওভাবে জড়িয়ে পড়লে এরা এমনি শক্ত হয়ে থাকতে পারে যে, তাকে জোর করে আবরণমুক্ত করা বেশ কঠিন কাজ—একজন রীতিমত পালোয়ানকেও হিমসিম খেতে হয় এ কাজে।

বজ্রকীট এর সংস্কৃত নাম, বাংলা বনরুই। রুই মাছের মত আঁশে এদের সর্বশরীর ঢাকা বলেই এই নাম। অতীতে হয়তো এই জন্তুটি অনেকই ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেক কমে গেছে—প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। গভীর জঙ্গলে থাকে বলে কেউ এদের মারে না বা ধরেও আনে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কলকাতার চিড়িয়াখানায় এর একটিও নমুনা নেই; অথচ এরা বিদেশী জন্তু নয়, একেবারে বাংলারই জীব।

বাঁদর বাংলাদেশে বহু জায়গাতেই আছে—হনুমানও বাংলায় কম নেই। অন্যান্য স্থান ছাড়াও একমাত্র কলকাতার আশেপাশেই যথেষ্ট বাঁদর ও হনুমান দেখতে পাওয়া যায়। চিৎপুরের দিকে যথেষ্ট বাঁদরের দেখা মেলে। কলকাতায় হনুমান আছে, বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বরে। মজা এই যে, এক সময় কালীঘাটেও অনেক হনুমান ছিল; কিন্তু এখন আর তারা নেই। বোধহয় তীর্থযাত্রীদের দেওয়া খাবারের লোভেই এরা এই মন্দির এলাকায় বসবাস করতো। কিন্তু কালীঘাটের চারদিকে বাড়ীঘর তৈরী হওয়ায়

সেদিককার গাছপালা কেটে ফেলায় আস্তানার অভাবে তারা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

বাংলার দক্ষিণাংশ নদী-ঘেরা ব-দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এ স্থান প্রায় নদীর জালে ঘেরা। এই নদী-ঘেরা দ্বীপরাশি সমুদ্রের পার থেকে আরম্ভ করে ভূখণ্ডের বহু দূর পর্যন্ত গভীর বনে আচ্ছন্ন। এই বনে সুন্দরী গাছের প্রাধান্যের জন্যেই এর নাম সুন্দরবন হয়েছে, বনের সৌন্দর্যের জন্যে নয়—যদিও বনের সৌন্দর্যও এখানে কম নয়। এ বন ছোট-বড় নানা জন্তু-জানোয়ারে পূর্ণ। তার বিশেষ এবং প্রধান জন্তু হলো বাংলার সেরা বাঘ—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পৃথিবীর বৃহত্তম বাঘ, বাঘের রাজা। তাছাড়াও এখানে আছে কুমীর, সাপ, শুয়োর, হরিণ, বাঁদর প্রভৃতি নানারকম জীবজন্তু। এক সময় এ বনে বুনোমোষ ও গণ্ডারও মিলতো, কিন্তু এখন আর তারা নেই। সুন্দরবনের হরিণের গায়ের উপরের দিককার রং ঘোর বাদামী, যা ক্রমে ফিকে হয়ে নীচের দিকে এসে মিশেছে পেটের সাদা রঙের সঙ্গে। উপর দিকের বাদামী রঙের জমিতে চার-পাঁচ সারিতে থাকে সাদা বুটির দাগ। এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি ও সচকিত প্রাণী। এরূপ না হলে সুন্দরবনে ঐ রয়্যাল বেঙ্গলের রাজ্যে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

মানুষের চাষের জমির প্রয়োজনে দিন দিন সুন্দরবনের আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের কলকাতা মহানগরী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, এক সময় সে স্থানও ছিল সুন্দরবনেরই অংশ—অন্ততঃ বনের প্রান্তভাগ তো বটেই। দু'শ-সত্তর বছর পূর্বে এখানে সহর পত্তনের সময় এবং তার পরেও অনেক দিন কলকাতার গড়ের মাঠ এবং অন্যান্য অনেক অঞ্চলেই বাঘ ও হরিণ দেখা যেত। আদি কলকাতার বর্ণনা, দেশী ও বিদেশী লেখকের রচনাতে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য গড়ের মাঠ তখনও মাঠ হয় নি—সে ছিল গভীর জঙ্গল।

সুন্দরবনের অজগর যদিও সমধিক প্রসিদ্ধ, তবু সেখানে অন্যান্য সাপও আছে যথেষ্ট —বাংলা দেশের প্রায় সব সাপই এখানে আছে। এসব সাপ মাঠে এবং গাছের কোটরে দু'অবস্থাতেই থাকে। এদের সাধারণ আহার্যবস্তু হচ্ছে পাখীর ডিম ও বাচ্চা এবং ধরতে পারলে পাখীও; তাছাড়া টিক্‌টিকি, গিরগিটি, কাঠবিড়াল ও কাঠবিড়ালের মত ছোট ছোট জন্তু। এসব খাবারের লোভে সাপ গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। অজগরেরা জন্তু-জানোয়ার ধরবার জন্যে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে ঘাপ্‌টি মেরে ঝুলে থাকে।

শ্রীবিনায়ক সেন

উল্কা

তোমরা অনেকেই উল্কার নাম শুনেছ। আর যারা যাদুঘরে গেছ, তারা তো উল্কা দেখেছ নিশ্চয়ই! যাদুঘরের এক জায়গায় কাচের ভিতরে কতকগুলি ছোট বড় কালো কালো পাথর রাখা আছে, আর এক কোণে লেখা আছে নামটা—উল্কা। দেখেছ তোমরা সকলেই। কিন্তু ঐ কালো বিদ্‌ঘুটে সব পাথরগুলি দেখে নিশ্চয়ই ভাল লাগে নি, যেমন ভাল লেগেছে যাদুঘরের অন্যান্য জিনিষগুলি। না লাগবারই কথা, কেন না উল্কার তো কোন সৌন্দর্য নেই যার জন্যে তোমাদের চোখে পড়বে! বাইরে থেকে দেখে অদ্ভুত কিছু দেখা যায় না ওদের মধ্যে, যেটা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু ওদের জন্মবৃত্তান্ত যদি একটুও জানতে, কোথেকে এলো এরা যদি শুনতে, তাহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ওগুলিকে। দেখতে আর অবাক হতে!

তোমরা হয়তো জান যে, উল্কাপিণ্ড আকাশ দিয়ে উড়ে এসে পৃথিবীতে পড়ে। কতক পড়ে লোকালয়ে, কতক সমুদ্রে আর কতক পড়ে অজানা অচেনা মরুভূমি বা পাহাড়ে, যাদের কোন খোঁজই কেউ রাখে না। তাই যত উল্কাপাত হয়, তার বেশীর ভাগেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকালয়ে যেগুলি পড়ে তা থেকে ক্ষতিও হয় প্রচুর। তেমন বড় রকমের উল্কাপাত হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনুপাতে বেড়ে যায়।

পৃথিবীতে পড়বার সময় উল্কা তেতে লাল টক্‌টকে হয়ে যায়। এত গরম কি করে হয়, শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠে আসতে হলে পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল আছে তাকে ভেদ করে আসতে হয় উল্কাপিণ্ডকে। সেই সময় উল্কার গতি এমন প্রচণ্ড থাকে যে, বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে অত্যধিক তাপের সৃষ্টি হয়; আর সে তাপেই তেতে লাল হয়ে যায় উল্কাপিণ্ড। ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড সেই তাপে মাঝপথেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, পৃথিবীতে পৌঁছায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে উল্কাপিণ্ড জোগাড় করে পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, রাসায়নিক উপাদানের দিক দিয়ে উল্কাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। পাথর-উল্কা, লোহা-উল্কা, এবং পাথর-লোহা-উল্কা। প্রথমটিতে পাথরের ভাগই বেশী, দ্বিতীয়টিতে লোহাই প্রধান, আর শেষেরটিতে পাথর আর লোহার অনুপাত প্রায় সমান সমান। বড় বড় যত উল্কাপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই লৌহ-উল্কা। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার 'হোবা' নামক একজায়গায় সবচেয়ে বড় লৌহ-উল্কাপাত হয়। সে উল্কাটির ওজন ৬০ টন।

এবার উল্কার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে কিছু বলছি। এদের জন্ম সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ

প্রচলিত নেই। অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন। প্রথমে অনেক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, উল্কা পৃথিবী অথবা চাঁদ, নয়তো সূর্যেরই অংশ। প্রথমে পৃথিবীর কথাটাই ধরা যাক। পরে যখন দেখা গেল যে, উল্কার উপাদান আর পৃথিবীর উপাদান সম্পূর্ণ আলাদা তখন একথা সহজেই বুঝা গেল যে, পৃথিবী থেকে উল্কার জন্ম হতে পারে না। তোমরা হয়তো প্রশ্ন তুলতে পার—পৃথিবীর ভিতরে কি আছে সেটা তো আর জানা যাচ্ছে না, তবে তার সঙ্গ উল্কার কোন মিল নেই, একথা বা বুঝা যায় কেমন করে? মিল তো থাকতেও পারে! পণ্ডিতেরা উত্তর দিলেন—না, পারে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে শিলা রয়েছে তার সন্ধান আগ্নেয়গিরিগুলি দিতে পারে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় সে শিলাই তো লাভার আকারে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। মিলিয়ে দেখা গেছে—সে শিলার সঙ্গে উল্কার কোন মিল নেই। তবে বলতে পার, উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর অভ্যন্তরের শিলা দিয়েই তৈরী—একথা ধরে নিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আকাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় সে শিলায় এমন পরিবর্তন এসে গেছে যে, এখন তাকে পৃথিবীর শিলা বলে চেনবারই উপায় নেই। এ অনুমানটা অবশ্য কিছুটা সম্ভব। এখন তবে একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। উল্কাপিণ্ড যে গতিতে ছুটে যায়, সে গতি আরম্ভ করে দেবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, পৃথিবীর তা আছে কি? নেই। আর কি করেই বা থাকবে? পৃথিবী কত আস্তে নিজের চারদিকে ঘুরছে বলতো? ২৪টি ঘণ্টায় মাত্র একবার। তাই পৃথিবী উল্কার গতি আরম্ভ করে দিতে পারে না। সুতরাং উল্কার জন্মস্থান পৃথিবী নয়। এই একই কারণে চাঁদও বাতিল হয়ে যায়। বাকী থাকে শুধু সূর্য। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, সূর্যপৃষ্ঠ একরকম গরম বাষ্পীয় পদার্থে তৈরী। সেই বাষ্পীয় পদার্থ থেকে কঠিন পাথর ও লোহার উল্কার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তবে একথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, সেই বাষ্পের ভিতরে সূর্যের অভ্যন্তরে কঠিন শিলা আছে এবং তারই ভাঙ্গা অংশগুলি পৃথিবীতে উল্কারূপে এসে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা এথাও মনে রাখতে হবে। সেটা হলো সূর্যের উপরিভাগের বাষ্পের উত্তাপ। এই উত্তাপ এতই প্রচণ্ড যে, ভিতর থেকে ছোট ছোট শিলাখণ্ড বেরিয়ে আসতে গেলে সেই উত্তপ্ত স্তরটা পার হবার সময় গলে বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে। চিহ্নই থাকবে না সে পাথরগুলির। তাই সূর্য থেকেও উল্কার উৎপত্তি হতে পারে না।

প্রফেসর এইচ. এ. নিউটন অনেক গবেষণার পর দেখালেন যে, কতকগুলি সুটিং স্টারের কক্ষপথের সঙ্গে কতকগুলি পরিচিত এবং অধুনালুপ্ত ধূমকেতুর কক্ষপথের মিল আছে। এ থেকে তিনি অনুমান করেন যে, ধূমকেতু যখন কোন কারণে কতকগুলি অংশে ভেঙ্গে যায় তখন সেই ভগ্ন অংশগুলি ধূমকেতুর কক্ষপথেই ঘুরতে থাকে। এগুলিই সুটিং স্টার। তিনি বললেন যে, উল্কাও একরকমের সুটিং স্টার; তবে সাধারণ

স্যুটিং স্টারের চেয়ে এদের আয়তন অনেক বড়। সুতরাং নিউটনের মতে উল্কাপিণ্ড ধূমকেতু থেকেই তৈরী। কিন্তু তাঁর মতের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ধূমকেতু কোন কঠিন জিনিষে তৈরী নয়, সাধারণতঃ বাষ্পীয় অথবা অর্ধবাষ্পীয় কোন পদার্থে গঠিত। এই বাষ্প থেকে কঠিন উল্কার উৎপত্তি কেমন করে হবে? আর যদিও বা হয় তাহলেও এ মতবাদ টেঁকে না এই কারণে যে, সাধারণ উল্কার তুলনায় ধূমকেতুর আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট বলে অনেকে মনে করেন। তবেই দেখলে ধূমকেতু থেকে উল্কার উৎপত্তি হতে পারে না।

উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সৌরজগতের কোন গ্রহের ভগ্নাংশই এই উল্কা। মতবাদটি মেনে নেওয়া যায় সহজেই; কারণ উল্কার গতি আর আয়তন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে না তখন। কেন না, সেই গ্রহের নিজের যা গতি তাতেই উল্কা মহাশূন্যে অনায়াসে ছুটতে পারে। আর সৌর-জগতের গ্রহগুলির আয়তনও নেহাৎ কম নয় যে, তাদের ভগ্নাংশ থেকে উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হতে পারে না। সবার শেষে এখনও একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে—সেটা হলো, গ্রহগুলি ভাঙ্গে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চেম্বারলেন বলেছেন যে, একটা গ্রহের পাশ দিয়ে যদি অন্য আর একটা বড় গ্রহ ছুটে যায় তাহলে আগের গ্রহটার গায়ে এক এক জায়গায় ভীষণ টান পড়বে। এ টান পরের গ্রহটির আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হবে। আর এই টানেই ভেঙ্গে যাবে আগের গ্রহটি। গ্রহটির এভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার আর একটি বিকল্প পথও দেখানো যেতে পারে। সেটি হলো, দুটা গ্রহের মধ্যে যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে দুটা গ্রহই ভেঙ্গে গিয়ে উল্কার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এখানে একটা বাধা আছে। দুটা গ্রহ ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যাবার জন্যে ওদের যে গতি প্রয়োজন, তাতে ঐ ধাক্কার ফলে এত বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হবে যাতে ভাঙ্গা অংশগুলি জ্বলে উঠবে এবং ছাই হয়ে মিলিয়ে যাবে, উল্কা হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করবার সুযোগই পাবে না।

এই হলো উল্কার জন্ম সম্বন্ধে কয়েকটা মতবাদ। তাহলে দেখলে তো, যে বিদ্‌ঘুটে পাথরগুলিকে দেখতেই ইচ্ছা করে না, তাদের জন্ম-বৃত্তান্ত কত রহস্যময়! কাজেই এবার যখন যাদুঘরে যাবে, উল্কাপিণ্ডগুলিকে বেশ ভাল করে দেখতে ভুল করো না।

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

জানবার কথা

১। মাছ দিয়ে মাছ ধরা—কথাটা শুনলে তোমরা অনেকেই বিস্মিত হবে। অবশ্য বড় বড় মাছ বড়শীতে ধরবার জন্যে টোপ হিসাবে ছোট ছোট মাছ অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যে মাছের কথা বলা হচ্ছে, তারা কিন্তু টোপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। এই মাছের নাম রেমোরা (বাংলায় এদের চোষক মাছ বলা যেতে পারে)।

১নং চিত্র

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই মাছ দেখা যায়। এরা এমনভাবে অন্য মাছের গায়ে লেগে থাকে যে, অন্য মাছ তাদের শরীর থেকে এদের ছাড়াতে পারে না। সেজন্যে অনেকে এই মাছগুলিকে জ্যান্ত বড়শী বলে থাকে। জেলেরা অনেক সময় এদের লেজে দড়ি বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে অন্য মাছ ধরে থাকে। প্রায়ই এরা হাঙ্গরের গায়ে লেগে থাকে। হাঙ্গর শত চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না।

২। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টায়, বহু অভ্যাসের ফলে মানুষ লক্ষ্যভেদ করতে শেখে। এটা তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নয়, অর্জিত ক্ষমতা। কিন্তু মনুষ্যেতর এমন অনেক প্রাণী দেখা যায়, যারা স্বভাবতঃই লক্ষ্যভেদে অভ্যস্ত। এরূপ দু-একটা লক্ষ্যভেদী প্রাণী হয়তো তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। আমাদের দেশে বহুরূপী, মাছরাঙ্গা, তীরন্দাজ মাছ প্রভৃতি নানারকম লক্ষ্যভেদী প্রাণী দেখা যায়। আফ্রিকায় রিংহল্‌স্ কোব্রা নামে এক জাতীয় বিষধর সাপ দেখা যায়। এরা কয়েক ফুট দূর থেকে শিকারের ঠিক

চোখ লক্ষ্য করে বিষ ছুঁড়ে মারে। এই বিষ চোখে লাগলে মানুষ বা যে কোন জীবজন্তু

২নং চিত্র

সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যায়।

৩। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের কথা বোধ হয় তোমরা সবাই জান। এই ভূ-পদার্থ বর্ষের অভিযান ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়ে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়েছে। ঐ অভিযানে পৃথিবীর ৬৬টি দেশের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর পূর্বে মানুষের পরিপার্শ্বিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ গবেষণা

৩নং চিত্র

আর কখনও হয় নি। এই অভিযানের ক্ষেত্র ছিল—পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত কেন্দ্র থেকে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অভিযানের যে সব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে—সেগুলি শস্য উৎপাদন, আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, আকাশপথে মেরু অঞ্চলে যাতায়াত, বেতার-বার্তা প্রেরণ ও নৌ-চলাচল প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

৪। পাখী, কুকুর, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের দেহে সর্বদাই একটা স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় থাকে। চারদিকের আবহাওয়ার উষ্ণতার তারতম্যের ফলে

৪নং চিত্র

তাদের স্বাভাবিক দৈহিক উষ্ণতার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু শীতল-রক্তবিশিষ্ট মাছ, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীদের দৈহিক উষ্ণতা তাদের চতুর্দিকের আবহাওয়ার উষ্ণতার তারতম্যের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

৫। পৃথিবীতে দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। এই যুদ্ধের পিছনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।
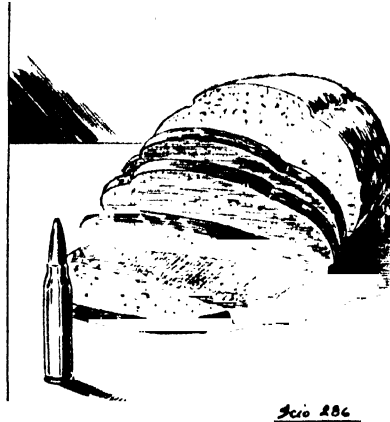
৫নং চিত্র

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা হতো—তাহলে পৃথিবী আরও উন্নত হতো। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন—যে কোন টাকার মানে হিসাব করা হোক না কেন, একটা রাইফেলের কার্তুজের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার দ্বারা মানুষের খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট রুটি কেনা যেত। আধুনিক একটা যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণ করতে যে

পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার দ্বারা একশ'টিরও বেশী সহরে আধুনিক বিদ্যালয় ভবনের মত পাকাবাড়ী তৈরী করা সম্ভব হতো।

৬। মানুষ প্রথমে ছিল অসভ্য। বহু বছরের সাধনার ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে সভ্যতার বর্তমান স্তরে পৌঁচেছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে—মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে—ইরানে। জীবিকানির্বাহের জন্যে মানুষ

৬নং চিত্র

প্রথমে পশু শিকার করতো—তারপর কৃষিকার্য অবলম্বন করলো। এই সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে—তার উপর ভিত্তি করেই ঐতিহাসিকেরা তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন।

৭। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে কাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেশী? এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন—স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীলোকের শ্বাস-প্রশ্বাস, পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের

৭নং চিত্র

তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ দ্রুততর গতিতে চলে।

৮। চোখ খুলে কেউ হাঁচি দিতে পার? বিজ্ঞানীরা বলেন—চোখ খোলা অবস্থায়

৮নং চিত্র

হাঁচি দেওয়া সম্ভব নয়। হাঁচবার সময় চোখ আপনাআপনি বুজে যায়।

৯। পৃথিবীর মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের হাসপাতালসমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে

৯নং চিত্র

সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে প্রতি ৬৭ জনের জন্যে হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যবস্থা আছে।

১০। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাঃ জোনাস ই. সল্‌ক্‌ পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেছেন। পোলিও রোগ সাধারণতঃ শিশুদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। ডাঃ সল্‌ক্‌ আবিষ্কৃত টিকা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে পোলিও রোগ দমন

করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর ৫৬টি বিভিন্ন দেশে এই টিকা প্রয়োগ করে এই

১০নং চিত্র

সাংঘাতিক রোগকে দমন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে এই টিকা বাজারে চালু হয়েছে।

১১। কথায় বলে—শম্বুক গতি; অর্থাৎ শামুক খুবই মন্থর গতিতে চলে। বিজ্ঞানীরা এদের গতিবেগ নির্ধারণ করেছেন। প্রতি ঘণ্টায় শামুক ·০০০৩৫৩০০৫

১১নংচিত্র

মাইল যেতে পারে। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, এদের গতিবেগ কিরূপ মন্থর।

বিবিধ

পরলোকগত ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, বিজ্ঞান কলেজ ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আহূত এক সভায় পরলোকগত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও সংগঠক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁহার সহপাঠী ও সহকর্মী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ এবং গুণমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সভার প্রারম্ভে অধ্যাপক বসু একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সমবেত সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর বিভিন্ন বক্তা ডঃ ঘোষের জীবনী ও কর্মপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন। দিল্লীতে জ্ঞানচন্দ্র শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা থাকাকালীন দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়িত করেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডাঃ জে. এন. রায়।

ডাঃ সুবোধনাথ বাগচি ভৌত-রসায়ন বিদ্যায় ডাঃ ঘোষের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভৌত-রসায়ন বিদ্যার উন্মেষ হয়। আরহেনিয়াস, অস্ওয়াল্ড, ভ্যাণ্ট হফ, র্নাষ্ট প্রভৃতি এই বিদ্যার এক একজন দিকপাল। এই বিষয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রোলাইটের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানচন্দ্র যে ঘোষেস্-ল পেশ করেন তাহা একটি দিক-নির্দেশক। তাহার উত্থাপিত এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে ডিবাই এবং হাকল আধুনিক ইলেকট্রোলাইট তত্ত্ব খাড়া করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ভৌত-রসায়ন বিদ্যার আধুনিক পাঠ্য পুস্তকে ঘোষেস্-ল-এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইলেকট্রোলাইট তত্ত্ব বর্তমানে সংশোধিত হইলেও ইতিহাসের খাতিরে ঘোষেস্-ল-এর উল্লেখ থাকা উচিত বলিয়া ডাঃ বাগচি দাবী করেন।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি মানুষ হিসাবে জ্ঞানচন্দ্রের পরিচয় দিয়া বলেন, ডাঃ ঘোষ কাজকর্মে ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, তাঁহার স্বভাব ছিল অতি মধুর। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে অপরের মতামত শুনিতেন এবং যে কেহ তাঁহার কাছে কোন কাজে সাহায্যের জন্য আসিলে তিনি যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেন।

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় কৃষি বিভাগের কর্মীরূপে ডাঃ ঘোষের সংস্পর্শে আসিয়া কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ও নানাবিধ প্রচেষ্টার যে পরিচয় পান, তাহা বিবৃত করেন।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন যাদবপুর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেসন অব সায়েন্স-এর উন্নতি সাধনে ডাঃ ঘোষের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই গবেষণা মন্দিরের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ডাঃ ঘোষের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তিনি ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি নিজে অল্পকালের মধ্যে জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের যুবকদের কাজের সুযোগ দেওয়ার প্রতি বিশেষ জোর দেন।

অধ্যাপক সমর গুহ ঢাকায় ডাঃ ঘোষের ছাত্ররূপে তাঁহার যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পান তাহা উল্লেখ করিয়া বলেন, ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় বিপ্লবী যুবকেরা বাহিরে দেখাইবার জন্য একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ডাঃ ঘোষ জানিতেন ইহা বিপ্লবী যুবকদের সংগঠন।

তথাপি তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও অন্যান্য-ভাবে সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে তিনি যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন, তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতে পারে নাই। ১৯৩৮ সালে জাতীয় মহাসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন, তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। আজ যে সমাজবাদের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সমাজবাদী পরিকল্পনার কথা ডাঃ ঘোষ বহুপূর্বেই ঘোষণা করেন।

পরিশেষে অধ্যাপক গুহ দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে ডাঃ ঘোষের মৃত্যুতে কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করায় বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শ্রীসত্যব্রত সেন ডাঃ ঘোষের গভীর ছাত্রপ্রীতির কথা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিবৃত করিয়া বলেন, এম. এস-সি পাশ করিবার পর যখন বক্তা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন ডাঃ ঘোষ তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিক্ষকের পক্ষ হইতে ছাত্রের প্রতি এইরূপ সম্বর্ধনা দেখিয়া বিস্মিত হন।

সভাপতি অধ্যাপক বসু বন্ধুবিয়োগে ব্যাথিত কণ্ঠে বলেন, দেশের মধ্যে চোখ ঘুরাইয়া দেখিলে ডাঃ ঘোষের মত লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা মিশিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা যদি কাহারো কোন উপকার হইত, তাহা করিতে তিনি সর্বদাই অগ্রসর হইতেন। তাই আজ তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রবৃন্দ মনে করেন যে, তাঁহারা একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হারাইয়াছেন।

যখন যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই কাজ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন, যে কর্মপথে গেলে দেশ অগ্রসর হইবে, তিলমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া সেই পথে তিনি অগ্রসর হইতেন। জীবনের আদর্শকে সুসংবদ্ধভাবে বিচার-বিবেচনার সঙ্গে কাজে রূপায়িত করাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীদের একটা দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বজায় রাখিতে পারেন না। কিন্তু ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানীদের যে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে ডাঃ ঘোষের অনেকখানি অবদান রহিয়াছে।

পরিশেষে অধ্যাপক বসু বলেন, মহাপুরুষদের জীবনে যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তার সবগুলিই জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মধ্যে ছিল।

এই স্মৃতি-সভায় ডাঃ ঘোষের অনুরাগী বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

সমুদ্রের বহু নূতন রহস্য আবিষ্কার

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বৎসরের কার্যসূচী অনুসারে সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ভিতিয়াজ, ওব্ ও মিহাইল লোমোনোসোফ নামে যে তিনটি জাহাজ বিভিন্ন সমুদ্রে ও মহাসাগরে যাত্রা করিয়াছিল, সেগুলি ২ লক্ষাধিক মাইল সমুদ্র-পরিক্রমার পর কয়েক হাজার নূতন নূতন তথ্য ও সামুদ্রিক নমুনা সংগ্রহ করিয়া গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য ১৪টি সোভিয়েট জাহাজ, ১০টি উপকূলস্থিত স্টেশন ও গোটা সোভিয়েট দেশ জুড়িয়া অসংখ্য গবেষণা ভবন ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইতেছে।

উপরিউক্ত তিনটি জাহাজ সমুদ্রসংক্রান্ত যে সব নূতন তথ্য ও সামুদ্রিক নমুনা সংগ্রহ করিয়াছে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল, সমুদ্রতলদেশে সাড়ে ছয় মাইল গভীরে সংগৃহীত কতকগুলি সামুদ্রিক জীব। এই অদ্ভুত জীবগুলিকে অ্যাক্টিমা ও ক্রাষ্টেসিয়া বলা হয়। সমুদ্রের অতখানি গভীরে প্রচণ্ড জলের চাপ সহ্য করিয়াও যে এই

জীবগুলি কি ভাবে বাঁচিয়া থাকে তাহা প্রাণী-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়।

নিরক্ষরেখার কাছাকাছি এক স্থানে ভিতিয়াজ জাহাজের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের আধ মাইলের কিছু বেশী গভীরে ষ্টাইলেফোরাস নামক অতি বিরল এক প্রকারের গভীর-জলচারী মৎস্য ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইতিপূর্বে এই বিরল সামুদ্রিক মৎস্যটির মাত্র একটি নমুনাই সংগ্রহ করা গিয়াছে—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগরে সংগৃহীত এই মৎস্যটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এতদিনে এই মৎস্যটির দ্বিতীয় নমুনা সংগ্রহ করিলেন। মৎস্য-বিজ্ঞানীদের মতে, ষ্টাইলেফোরাস হইল এক জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক প্রাণীর বর্তমান বংশধর। ইহাদের সংখ্যা এতই কমিয়া গিয়াছে যে, খুব শীঘ্রই এই সামুদ্রিক প্রাণীটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিবে।

এই জাহাজগুলির ভূ-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতলের বহু স্থানে ভূ-চৌম্বকের ব্যতিক্রম (জিওম্যাগ্নেটিক অ্যানোম্যালি) লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এইসব ব্যতিক্রমের মাপজোক লইয়াছেন। ইহার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মূল চৌম্বক নিরক্ষ-রেখাটি মানচিত্রে নির্দিষ্ট রেখা হইতে বেশ কিছুটা আলাদা। প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানীরা আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের নূতন চৌম্বক মানচিত্র রচনা করিবেন এবং সমস্ত দেশের ভূ-বিজ্ঞানীদের নিকটে এই নূতন মানচিত্র এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েট সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্যাদি ও গবেষণার ফলাফল পাঠানো হইবে।

সোভিয়েট সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল—সমুদ্রের গভীরতম তলদেশেও জলস্রোতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃত্তে তাঁহারা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বমুখী নিরক্ষরৈখিক স্রোত ও প্রতি-স্রোতকে (কাউণ্টার কারেণ্ট) গভীর মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিয়া এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে অন্যান্য কয়েকটি দেশের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদক কল-কারখানাগুলির পরিত্যক্ত অবশিষ্ট অংশগুলিকে সমুদ্রের গভীরে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, যাহাতে উহাদের তেজস্ক্রিয়তা মানুষ ও প্রাণীদের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম তল-দেশেও যে স্রোত রহিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইবার পর এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইতেছে। কারণ, স্রোতের মারফত ঐ সব পরিত্যক্ত অবশিষ্টাংশের তেজস্ক্রিয়তা সমুদ্রের সর্বত্র সংক্রামিত হইবে এবং সামুদ্রিক প্রাণীদের পক্ষে উহা ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি করিবে।

মাটির নীচে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন

জল-শক্তি থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিরাট বিরাট বাঁধ তৈরী হচ্ছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের কতকগুলি বাঁধ তাদের জল ধারণের ক্ষমতা ও বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতার জন্যে সারা বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। ভল্গা নদীর উপরে কুইবিশেব জলাধারের ধারণক্ষমতা হলো ৮০ শতকোটি ঘনমিটার। ওব্ নদীর উপরে নোভোসিবির্স্ক্ জলাধারের ধারণক্ষমতা ১১৯ শত-কোটি ঘনমিটার। আঙ্গারা নদীর উপরে ব্রাৎস্ক্ বাঁধে জল ধরে ১৭৯ ঘনমিটার। সুইজারল্যাণ্ডে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জলাধার তৈরী হচ্ছে—গ্র্যাণ্ড ডিকেন্স্ নামে এই বাঁধটির উচ্চতা হবে ২৮৪ মিটার। ভারতে বর্তমানে নির্মীয়মান ভাকরা-নাঙাল বাঁধ ও কোশী বাঁধ দুটিও উচ্চতার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির উচ্চতা ২০৭ মিটার, দ্বিতীয়টির উচ্চতা ২৪৮ মিটার।

কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার ভিসি ব্রোদ্ নামে জায়গাটিতে জল-শক্তি থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎ-

পাদনের যে স্টেশন তৈরী করা হচ্ছে, সেটার বাঁধ এসব বাঁধ থেকে ভিন্ন ধরণের। এখানে ভল্‌তাভা নদী থেকে একটি অন্তঃসলিলা শাখা-নদী তৈরী করে নেওয়া হচ্ছে; অর্থাৎ মাটির অনেকখানি নীচ দিয়ে বিরাট চওড়া মানুষের হাতে-কাটা একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে এই নদীর একটি শাখাকে প্রবাহিত করে নিয়ে একটি বাঁধে তার জল জমা করা হবে। লিপনো নামে জায়গাটিতে নির্মীয়মান এই জলাধারটি হবে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

ভল্‌তাভা নদীর জলকে যে সুড়ঙ্গপথে এই বাঁধে এনে ফেলা হবে, সেই সুড়ঙ্গটি কাটা হচ্ছে মাটির দেড়-শো মিটার নীচে। সুড়ঙ্গের মাটির দেয়ালগুলিকে সাড়েচার সেন্টিমিটার পুরু ইস্পাতের পাতে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সুড়ঙ্গটির অপর প্রান্ত গিয়ে শেষ হয়েছে একটি গ্র্যানিট পাহাড়ের বিরাট গহ্বরের মধ্যে। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র ব্যবহারের সময় গিয়ারগুলি জলের তোড়ে চালু করে দেবার পর জলধারা এসে জমা হবে এই গিরিগুহার মধ্যে। তার পরে টার্বাইন ব্লেডগুলিকে চালু করে দিয়ে জলধারা আবার ফিরে যাবে ভল্‌তাভা নদীর গর্ভে।

ভূগর্ভস্থিত এই বাঁধ চেকোস্লোভাক ইঞ্জিনিয়ার-দের এক বিরাট কৃতিত্বের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। বর্তমানে এটাই হবে বিশ্বের একমাত্র ভূগর্ভস্থিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনের স্টেশন।

খালের ময়লা পরিষ্কারে মাছ

তুর্কমেনিয়ার সেচ-প্রণালীগুলিতে ছাড়িবার জন্য সম্প্রতি চীন হইতে বিমানযোগে দশ হাজার বিয়েলি-আমুর নামক মাছের পোনা আমদানী করা হইয়াছে।

এই বিয়েলি-আমুর হইল ভেটকি জাতীয় এক প্রকারের মাছ—যদিও ভেটকি মাছের চেয়ে ইহারা আকারে বেশ বড় হয়। সাত বৎসরের একটি পূর্ণবয়স্ক বিয়েলি-আমুর মাছের ওজন আধ মণ হইতে ২৮ সের পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই মাছ খাইতে অতি সুস্বাদু।

কিন্তু তুর্কমেনিয়ায় এই মাছ খাইবার জন্য আমদানী করা হয় নাই। বিয়েলি-আমুর মাছ পুকুর ও খাল-বিলের শ্যাওলা ও ছত্রাকজাতীয় আবর্জনা অতি দ্রুত খাইয়া ফেলে এবং এইভাবে খাল-বিলের মুখ পরিষ্কার রাখিয়া জলপ্রবাহ অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। তুর্কমেনিয়ার জলসেচ-প্রণালী-গুলিতে শ্যাওলা ও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ খুব দ্রুত জন্মায় এবং এইসব খালের জলপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য এই শ্যাওলা ও ছত্রাক পরিষ্কার করিবার কাজে তুর্কমেন কৃষকদের অনেকখানি শ্রম ব্যয়িত হয়।

এখন হইতে এই বিয়েলি-আমুর মাছই কৃষকদের হইয়া এই খালের মুখ পরিষ্কার রাখিবার কাজ করিবে এবং বলা বাহুল্য, মাঝে মাঝে কৃষকদের খাদ্যও যোগাইবে।

নূতন টেলিভিশন লেন্স

সম্প্রতি বৃটেনে ইঞ্জিনিয়ারগণ এমন একটি উন্নত ধরণের ষ্টুডিও জুম লেন্স প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবহার পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছে।

এই নূতন লেন্সের কথা সম্প্রতি লণ্ডনে ঘোষিত হইয়াছে। এই ঘোষণা হইতে আরও জানা যায়, বড়দিন উপলক্ষে বি-বি-সি টেলিভিশন মারফৎ রাণীর বক্তৃতা প্রচার সম্পর্কে এই লেন্স ব্যবহৃত হয়।

বি-বি-সি এবং টেলর, টেলর অ্যাণ্ড হবসন লিমিটেড-এর সহযোগিতায় এই লেন্সটি উদ্ভাবিত হয়। নূতন লেন্স, ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরা না সরাইয়া, একই স্থানে দাঁড়াইয়া ক্লোজ-আপ গ্রহণে সাহায্য করিবে। টেলিভিশন ক্যামেরা সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে তাহা দূর করিবার

জন্যই এই ধরণের লেন্স প্রস্তুতের পরিকল্পনা হয়।

শব্দের গতির দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন নূতন বৃটিশ জঙ্গী বিমান

বৃটেনের সর্বঋতুতে উড্ডয়নক্ষম নূতন জঙ্গী বিমান ইংলিশ ইলেকট্রিক লাইটনিং সম্প্রতি শব্দের গতির দ্বিগুণ গতিতে উড়িয়া আসিয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

বিমানটি রেডার, কামান এবং ক্ষেপণীয় অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আকাশে উড়ে।

লাইটনিং বিমানটি এক্ষণে বিশ্বের দ্রুততম দুই-ইঞ্জিনবিশিষ্ট সর্বঋতুতে উড্ডয়নক্ষম জঙ্গী বিমান হিসাবে স্বীকৃত। ইহা এক্ষণে ব্যাপকভাবে নির্মিত হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনী এক এবং দুই আসনবিশিষ্ট এই ধরণের বিমান ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

বিমানটি আইরিশ সমুদ্রের উপর পরীক্ষামূলক ভাবে উড্ডয়নকালে ঘণ্টায় ১,২৮০ মাইল গতিবেগ লাভ করে।

কমেট-৪ বিমানের নূতন রেকর্ড

বৃটিশ ওভারসীজ কর্পোরেশন গত ৩০শে জানুয়ারী জানাইয়াছেন, একটি বি-ও-এ-সি কমেট-৪ জেট বিমান চার ইঞ্জিনযুক্ত যাত্রীবাহী বিমান হিসাবে হংকং হইতে টোকিও পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রমে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। বিমানটি ২,০০০ মাইল পথ ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে অতিক্রম করে।

কমেট বিমানটি পরীক্ষামূলকভাবে লণ্ডন হইতে টোকিও যাত্রা করে। এই পথ অতিক্রমের পূর্বের রেকর্ড হইল ৪ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট—ক্যানাডীয় প্যাসিফিক এয়ার লাইনসের বৃটানিয়া জেট বিমান এই রেকর্ড সৃষ্টি করে।

পরলোকগত ক্যাপ্টেন স্কট কর্তৃক ব্যবহৃত ঘড়ি

লণ্ডনের লর্ড মেয়র 'পেণ্ডুলাম টু অ্যাটম' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার সময় প্রদর্শনীর এক ঘড়ির দোকানেরও উদ্বোধন করেন। প্রদর্শিত ঘড়িগুলির আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড।

প্রদর্শিত ঘড়িগুলির মধ্যে পকেট সানডায়াল হইতে সিজিয়াম অ্যাটমিক ঘড়িও আছে। এই ঘড়ি এমন সুন্দর সময় রক্ষা করে যে, ৩০০ বছরে এক সেকেণ্ডের অধিক স্লো হয় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন এই শিল্পের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল কিন্তু বর্তমানে বৃটেন অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমতালে চলিয়াছে।

বৃটেনে প্রস্তুত ঘড়ির স্থায়িত্ব প্রমাণ করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান পরলোকগত ক্যাপ্টেন স্কটের কুমেরু অভিযানের সময় যে ঘড়িটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন প্রদর্শনীতে তাহা সকলকে দেখাইতেছেন। ক্যাপ্টেন স্কটের নিকট এই ঘড়িটি পাওয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র এই প্রতিষ্ঠানকে সেই ঘড়িটি দান করিয়াছেন। চল্লিশ বৎসর মিউজিয়ামে রাখার পর স্যার ভিভিয়ান ফুক্স্ কুমেরু অভিযানের সময় ঘড়িটি লইয়া যান এবং উহা এখনও নির্ভুল সময় দিতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার নূতন টীকা

ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃটেনে নূতন একপ্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা টীকা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই টীকার নাম দেওয়া হইয়াছে ইনভিরিন। বর্তমানে ইহা বৃটেনে প্রস্তুত হইতেছে এবং আগামী ইনফ্লুয়েঞ্জা মরশুমের পূর্বেই উহা বৃটেনে ব্যবহৃত হইবে। এই টীকার দ্বারা এশিয়া খণ্ডে যে ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হয়, তাহারও চিকিৎসা চলিবে। মাত্র একটি ইঞ্জেকশন সমগ্র শীতকালের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন।

১৯৬৪ সালের মধ্যে ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

১৬ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ. জে. ভাবা সংসদ সদস্যদের নিকট বলেন যে, ভারত ১৯৬৪ সালের শেষ নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে পারমাণবিক শক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে ডাঃ ভাবা সংসদ সদস্যদের নিকট বক্তৃতা করেন। আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে, এমন একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যন্ত্র স্থাপনের জন্য সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ভারতে পারমাণবিক শক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ডাঃ ভাবা বলেন যে, ১৯৬৪ সালের শেষ নাগাদ এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

তিনি বলেন যে, এই যন্ত্রের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে এবং ২০ মাস ধরিয়া উহার পরীক্ষা-কার্য চলিবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে কত ব্যয় হইবে তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ ভাবা বলেন যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার জন্য একটি যন্ত্র স্থাপনের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, তাহাতে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ডাঃ ভাবা বলেন যে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে প্রথমে আমাদের ইউরেনিয়াম ব্যবহার করিতে হইবে এবং পরে থোরিয়ামের উপর নির্ভর করিলেই হইবে। তিনি বলেন যে, ভারতে মজুদ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হইবে ত্রিশ হাজার টন। সম্প্রতি রাজস্থানে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে ইউরেনিয়াম ধাতুর কারখানা

ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি সংস্থা যে ইউরেনিয়াম ধাতুর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র এশিয়ায় প্রথম শ্রেণীর ইউরেনিয়াম উৎপাদনের উহাই প্রথম কারখানা। ৯ই ফেব্রুয়ারী সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি এই কারখানার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গত ৩০শে জানুয়ারী এই কারখানায় নিখাদ ইউরেনিয়ামের প্রথম পিণ্ড প্রস্তুত হয়।

তেজস্ক্রিয় পুস্তক

জনৈক আমেরিকান অক্সফোর্ডে এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নামক একখানা পুস্তক ক্রয় করিয়া দেখিতে পান যে, পুস্তকখানার নাম সার্থক হইয়াছে— উহা তেজস্ক্রিয়।

পুস্তকের ক্রেতা মিঃ বার্ণার্ড হার্ভে এক পত্রযোগে পুস্তক বিক্রেতাকে জানাইয়াছেন যে, পুস্তকখানার ভিতর দিকের মলাট হইতে আল্ফা রশ্মি বহির্গত হইতেছে এবং প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ রশ্মি-কণা বিকিরিত হইতেছে, তাহাও তিনি যন্ত্রের সহায়তায় গণনা করিয়াছেন।

পুস্তকখানার রচয়িতা হইতেছেন, বৃটেনের রেডিয়াম-বিজ্ঞানের অগ্রদূত লর্ড রাদারফোর্ড।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেডিয়াম-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সডির নিজস্ব গ্রন্থাগার হইতে উহা পুরাতন পুস্তকের দোকানে আসে।

পুস্তকখানা যিনি ক্রয় করেন, তিনি হইতেছেন, আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিয়াম গবেষণা বিভাগের মিঃ বার্ণার্ড হার্ভে।

মানুষের দেহযন্ত্র ও বয়স

চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা ফ্যামিলি ডক্টর-এর মতে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মানুষ প্রতি বিশ বৎসরে আধ ইঞ্চি করিয়া ছোট হইয়া পড়ে।

বয়স সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি বলিয়াছে—মানুষ একদিন দেড়শত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিবে বলিয়া বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে—মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্তুগুলি রোগাক্রান্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে শতাধিক বৎসরও অটুট থাকিতে পারে।

পত্রিকাটি বলিয়াছে—জরার কারণসমূহ এখনও জানা যায় নাই। জরার কয়েকটি লক্ষণের কথা পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

১০ বৎসর হইতে চক্ষুর সম্প্রসারণশীলতার অবসান সুরু হয়।

২০ বৎসর হইতে শ্রবণক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে।

৪০ বৎসর হইতে ম্লান আলোয় দেখিবার ক্ষমতা কমিতে সুরু করে।

৫০ বৎসর হইতে সূক্ষ্ম রুচিবোধের মাত্রা হ্রাস হইতে থাকে।

৬০ বৎসর হইতে ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা লোপ পাইতে আরম্ভ করে।

৭০ বৎসরে মানুষ তাহার ক্ষমতার দুই-তৃতীয়াংশ হারায়।

পত্রিকাটির মতে, দশ বৎসরের একটি বালকের কোন ক্ষত সারিতে যত সময় লাগে, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের লাগে তাহার পাঁচগুণ সময়। কারণ ৬০ বৎসর বয়সে মানুষের হাড় ভঙ্গুর হইয়া পড়ে এবং মাংসপেশীর ক্ষমতা শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস পায়।

খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতার নিদর্শন

কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ আমেদাবাদ হইতে ৬০ মাইল দূরে লোথালে একটি বৃহৎ ইষ্টক-নির্মিত কাঠামো আবিষ্কার করিয়াছেন। জল আটকাইবার ব্যবস্থাসমন্বিত একটি জল-প্রণালীর সহিত ঐ কাঠামোটি যুক্ত ছিল। উহা লোথাল বন্দরের জেটি রূপে ব্যবহৃত হইত।

কাঠামোটি ৬ শত ফুট লম্বা ও ১১০ ফুট চওড়া। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে ঐ স্থানে উন্নত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।

লোথালে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি যাদুঘর নির্মাণ করা হইতেছে।

টেপিওকা ম্যাকারনি

মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার টেপিওকার ম্যাকারনি প্রস্তুত-প্রণালী সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কেরালা রাজ্যে টেপিওকা হইতে প্রস্তুত ম্যাকারনি খাদ্য হিসাবে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায়, তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে কন্দ জাতীয় শস্য ব্যবহারের দিকে এই পুস্তিকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতে টেপিওকা চাষ ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে উহার ব্যবহার সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে।

ভারতে চানা পদ্ধতিতে ধান উৎপাদনের পরীক্ষা

কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ ১৬ই ফেব্রুয়ারী কটকে বলেন যে, দেশের প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে প্রায় ৩০টি কেন্দ্রে ধান-উৎপাদনে চীনাপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারত মনস্থ করিয়াছে।

ডাঃ দেশমুখ বলেন, সম্প্রতি চীনাপদ্ধতিতে ধানের চাষ সম্বন্ধে বহু কথা শুনা গিয়াছে এবং সেই দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ ফলনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে চীনারা এক মিটার গভীর করিয়া জমিতে লাঙ্গল দেয়, ঘন ঘন ধান্য রোপণ করে ও জমির গভীরে রাসায়নিক সার দেয়। তিনি বলেন যে, এই পদ্ধতিতে চাষ করিয়া প্রতি একরে ৩৬০ মণ ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা দাবী করে। এই

ফল খুবই সন্তোষজনক। সেইজন্য আমরা দেশের প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে প্রায় ৩০টি কেন্দ্রে চীনাপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মনস্থ করিয়াছি। আশা করা যায়, এই পরীক্ষার ফলে আমরা ধান-উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন নূতন পথের সন্ধান পাইব।

তিনি আরও বলেন, আমরা গত ৫ বৎসর ধরিয়া জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের পক্ষে প্রচার করিতেছি এবং তাহার ফলও বেশ উৎসাহজনক হইয়াছে। ১৯৫৩-'৫৪ সালে জাপানী পদ্ধতিতে ৪ লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হইয়াছিল; ১৯৫৭-'৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৪০ লক্ষ একর হইয়াছে। স্থানীয় পদ্ধতিতে চাষ করিয়া গত ৫ বৎসরে গড়ে প্রতি একরে ২৪.১৪ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে, পক্ষান্তরে জাপানী প্রথায় চাষে প্রতি একরে ধানের ফলন হইয়াছে ৩৩.৯১ মণ।

ডাঃ দেশমুখ বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে জাপানী পদ্ধতিতে চাষের জমির পরিমাণ ৮০ লক্ষ একর করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বড় ধান-উৎপাদক দেশ হইলেও দুঃখের বিষয়, ইহার প্রতি একরে ফলনের গড় পরিমাণ খুবই কম। এই অবস্থায় উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক।

ডাঃ দেশমুখ বলেন যে, ভারতে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ধানের চাষ হয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬ হাজার ফুট উচ্চ ভূখণ্ডেও ইহার চাষ হয়। জমির প্রকৃতিও বিভিন্ন। কোন কোন স্থানে ১৫ হইতে ২০ ফুট গভীর জলের মধ্যেও ধানের চাষ দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে বারিপাত যেখানে বৎসরে মাত্র ২০ হইতে ২৫ ইঞ্চি, সেখানেও চাষ হয়। কোন কোন ধান ৭০ দিনের মধ্যে পাকে, আবার এমন শ্রেণীর ধানও আছে যাহা পাকিতে ৬।৭ মাস সময় লাগে। বিভিন্ন সময়ে—গ্রীষ্ম, হেমন্ত বা শীত ঋতুতে ধান্য উৎপাদিত হয়।

ডাঃ দেশমুখ বলেন, এদেশে প্রায় ২৮০ শ্রেণীর ধান আছে। ইহার মধ্যে কয়েক শ্রেণী কেবল বিশেষ কোন অঞ্চলেই উৎপন্ন হয় এবং অন্য অঞ্চলে চাষ করা হইলে তাহা ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। ফলন বৃদ্ধির জন্য সঙ্কর জাতীয় বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহাতে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যায়, তজ্জন্য গবেষণা-কার্যের ক্ষেত্র প্রসারণ করা দরকার।

মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ

এক্স-১৫ রকেট বিমান—যাহা মানুষকে প্রথম শূন্যলোকে লইয়া যাইবে এবং সেখান হইতে জীবন্ত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবে—সেটি শীঘ্রই বি-৫২ বোমারু বিমানের ডানায় ভর করিয়া প্রথমবার আকাশে উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে উহাকে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। শেষের দিকে উহাকে বোমারু-বিমানের ডানার বাঁধন হইতে ছিন্ন করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে লইয়া আসা হইবে।

এ সমস্তই হইবে পরীক্ষামূলক। আশা করা যায়, আগামী গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি কৃষ্ণবর্ণ রকেট-বিমান এক্স-১৫ ঘণ্টায় ৪৫,০০ মাইল বেগে মহাকাশে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে সময় উহাতে একজন মানুষ আরোহী থাকিবেন এবং তিনি হইতেছেন বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন রবার্ট হোয়াইট।

ঊর্ধ্বারোহণের শেষ প্রান্তে শূন্যলোকের ভার-হীনতায় কেবলমাত্র সেফ্‌টি বেল্টই পাইলটকে তাহার আসনে ধরিয়া রাখিবে।

বিমানখানা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করিবার পর উহার ইস্পাত-আবরণী বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে রক্তিমাভা ধারণ করিবে।

বৈমানিকের নিরাপত্তার জন্য এমন সকল ব্যবস্থা রাখা হইবে যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেও তাঁহার অবতরণ বিঘ্নিত হইবে না।

আকাশে অবস্থানের নূতন রেকর্ড

লস ভেগাস (নেভাদা), দুইজন লোক একখানা উড়ন্ত হাল্কা বিমানে ১২০০ ঘণ্টা ১৯ মিনিট আকাশে অবস্থান করিয়া আন্তর্জাতিক রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

জ্বালানী লইবার জন্য বিমানখানি নীচে নামিয়া আসে এবং মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া দ্রুত ধাবমান লরী হইতে পেট্রল লইয়া আবার আকাশে উঠিয়া যায়।

হাতে কাগজ তৈরীর নূতন পদ্ধতি

ভারতের যে কয়টি কেন্দ্রে হাতে তৈরী কাগজ শিল্পকে লাভজনক করিয়া তুলিবার জন্য কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চালান হইতেছে, হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগার তাহার অন্যতম। হাতে তৈয়ারী কাগজ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। ইহাতে আদিম পদ্ধতিতে কাগজ তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং উহার উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

হায়দ্রাবাদের গবেষণাগারে এই উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় কাগজের-কলগুলিতে সাধারণতঃ যে ধরণের কাগজ তৈয়ারী হয় না, সেইসব কাগজ—যেমন বিশেষ ধরণের ড্রইংপেপার, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ, দলিলের কাগজ, ব্লটিং পেপার, সাদা কার্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চালান হইতেছে। এই গবেষণাগারে কাগজ পরীক্ষা ও কাগজের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সন্ধানের কাজও চলিতেছে। কাগজ শিল্পে নিযুক্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেরমালিকদের এই গবেষণাগার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকে।

গ্র্যাফাইট ক্রুসিকা তৈয়ারীর নূতন পদ্ধতি

জামসেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণাগারে মাটির আচ্ছাদনযুক্ত গ্র্যাফাইট ক্রুসিকা তৈয়ারীর নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত, ইহা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তাপে ব্যবহারের জন্য ক্রুসিকা নির্মিত হইয়াছে।

পিতল ও অন্যান্য লৌহেতর মিশ্র ধাতু গলাইবার জন্য গ্র্যাফাইট ক্রুসিকা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান ধাতু গলাইবার জন্যও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে বর্তমানে রাজামুন্দ্রি ও অন্যান্য স্থানে কম হারে মাটির আচ্ছাদনযুক্ত ক্রুসিকা নির্মিত হইয়া থাকে। উহা ধাতু ঢালাই শিল্পের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ১৯৫৭ সালে আমাদের দেশে ১৯,২৫,২৬৩ টাকার ক্রুসিকা আমদানী করা হইয়াছিল। দেশে তৈয়ারী ক্রুসিকা আমদানীকৃত ক্রুসিকার মত মজবুত হয় না।

এই নূতন পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক হারে ক্রুসিকা নির্মাণের চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে শুধু যে ক্রুসিকার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, উৎপাদনের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে আর ক্রুসিকা আমদানী করিতে হইবে না।

পারমাণবিক লণ্ঠন

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরণের ছোট আকারের পারমাণবিক লণ্ঠন নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা দশ বৎসর ধরিয়া একটানা আলো দিতে থাকিবে। এই লণ্ঠন তৈয়ারী করিতেই যা কিছু খরচ; দশ বৎসর ধরিয়া অনির্বাণ আলো পাইবার জন্য আর বাড়্তি কোন খরচ নাই।

এই লণ্ঠনের বালব্‌টি হইল এক বিশেষ ধরণের আলোকসঞ্চারী বা লুমিনেসেণ্ট্ পদার্থের প্রলেপ লাগানো প্লাসটিক কিংবা কাচের গোলক। এই গোলকটির ভিতরে ভরা আছে ক্রিপ্‌টন-৮৫ গ্যাস। এই গ্যাসের পরমাণুগুলি তড়িতাবিষ্ট হইয়া এই আলোকসঞ্চারী পদার্থটিকে ভাস্বর করিয়া তোলে এবং লণ্ঠন হইতে উজ্জ্বল আলো বিকিরিত হইতে থাকে। এই আলো দশ বৎসর ধরিয়া অনির্বাণ থাকিবে।

বিজ্ঞপ্তি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতা-বর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড়-বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব-বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখক-গণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত **কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না**; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী জুন '৫৯ মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩০শে এপ্রিল '৫৯ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌছান চাই। প্রবন্ধ **কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে** পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

কর্মসচিব,

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৫৯ | তৃতীয় সংখ্যা

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

এখন যাদের বয়স ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে, তরুণ বয়সে সেই সব বাঙালীর মনোবৃত্তি, ভাবাবেগ ও জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে কয়েক জন বাঙালী মহাপুরুষের প্রভাবে—চারিত্রিক দৃঢ়তায় ও নির্মলতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়; ধর্ম ও সমাজসেবায় রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ; রাজনীতিতে অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র, কাব্য ও ললিতকলায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানে প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র। ভারতকে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে প্রায় একই সময়ে শেষোক্ত দুই মহাপুরুষের জন্ম, মনে হয় যেন বিধিনির্দিষ্ট। এঁদের দুজনের কার্যকলাপ দেখেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার সাহস ও উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে রাজসুলভ দান করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

বিজ্ঞান সাধনার দুটি দিক আছে। এক-দিকে একনিষ্ঠ সাধনা ও তপস্যার দ্বারা প্রকৃতির গূঢ় তথ্য সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করা। আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন তারই প্রতীক। আর অন্যদিকে, বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও নিয়ম-কানুন শিল্পে প্রয়োগ করে জাতীয় জীবনের আর্থিক উন্নতি সাধন করা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েই নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন নি; তিনি অসীম কষ্ট স্বীকারে স্বহস্তে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে জাতীয় জীবনের মঙ্গল কামনায় নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে গেছেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই দুটি ধারার সমভাবে চর্চা প্রয়োজন। একটি অন্যটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, একের অভাবে অন্যটি শক্তি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং কাল-ক্রমে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সুস্থ ও সবল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির গঠন, বিজ্ঞানের এই দুটি দিকের উপরই সমভাবে নির্ভর করে।

একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের জাত নেই। আমরা যত বেশী সংখ্যক ভাষা শিখব, ততই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অনুকূল হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরও সহজসাধ্য হতো

যদি পৃথিবীর সকল পণ্ডিতেই একটি মাত্র ভাষায় তাঁদের নূতন গবেষণার ফলাফল সকলকে জানাতেন। তবুও একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গঠন, মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ভিন্ন অসম্ভব। এই সত্য ঐ দুই মহাপুরুষ সে যুগেও উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, আজ শিক্ষার বাহন প্রসঙ্গে নতুনভাবে অহেতুক তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই। প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর যে কি হতো, তা সবাই জানেন। ইংরেজী ভাষাকে আমাদের উপেক্ষা করা কোনমতেই সমীচীন নয়। এ ভাষা কার্যকরীভাবে আমাদের নিশ্চয়ই শিখতে হবে এবং আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে ইংরেজী ভাষার মান নিম্নগামী না হয়। তবুও একথা আমাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হবে যে, শিক্ষার বাহন সর্বস্তরেই মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব বায়ুহীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জীবনধারণ করা। আমরা গর্ব করে থাকি যে, ভারতে আপামর জনসাধারণ আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু যদি ক্ষণকাল বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, কথাটা যদি সাধারণ-ভাবে সত্য হয় তবে তার প্রধান কারণ, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মের কথা আমরা পূজাপার্বণ, যাত্রা, গান ও কথকতায় দেশীয় ভাষায় জন-সাধারণের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছি। বুদ্ধদেব তজ্জন্যেই তখনকার দিনের লোকভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করে-ছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ যে আমাদের জনচিত্তে এতটা স্থান অধিকার করে আছে, তার জন্যে জনসাধারণ বাল্মিকী-ব্যাসের নিকট ঋণী ততটা নয়, যতটা কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের নিকট। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্যে তাদের মান অধোগামী করতে হবে। এর অর্থ এই যে, আমাদের মাতৃভাষা যদি যথেষ্ট সম্পদশালী না হয় তবে তাকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আয়াস ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ হলেও এটা যে সম্ভব, তা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস যাঁরা সামান্য জানেন তাঁরাও স্বীকার করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চেষ্টা করলে যে কোন ভাষাই যে কোন বিষয়ের অনুশীলনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। অবশ্য এর জন্যে চাই নিষ্ঠা, তপস্যা ও মনীষা।

প্রায় এক যুগ পূর্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্থাপনা হয়েছে। নানা কারণবশতঃ এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ যথোচিত এবং আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে উঠতে পারে নি। তাই মনে হয়েছে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের সহায়তা করবে যদি আমরা ইতিহাসে বিজ্ঞানের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করতে পারি। এই বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিস্তৃত এবং গভীরতা এত অধিক যে, আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের মনীষা হয়তো এর যৎসামান্য মর্যাদা দিতে সক্ষম হতো। এমতাবস্থায় আমার মত ব্যক্তির এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। এ বিষয়ে আমি যে প্রামাণ্য জ্ঞান বিতরণে সক্ষম, এরূপ ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে সুধী ব্যক্তিগণকে ইঙ্গিত প্রদান করা, তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা। এ বিষয়ে যদি কারও উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পারি, যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

'তথাকথিত' ইতিহাস ; সমাজ ও বিজ্ঞান

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে রাজাউজীর, সেনাপতির

কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যের জয়-পরাজয় ও সীমানা সম্পর্কের কথা, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্বের কথা ও দু-চারটি 'অতি মানুষের' জীবনী পড়ে আসছি। এ সবই নাকি ইতিহাসের রূপ দিয়েছে, ইতিহাসকে চালিত করেছে! মার্ক্সের আবির্ভাবের পর শোনা যাচ্ছে, ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। শোনা যাচ্ছে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা, যার মূলে রয়েছে সম্পদের উৎপাদন পদ্ধতি। অথচ আশ্চর্য 'আধুনিক' ঐতিহাসিকগণও বিস্মৃত হয়েছেন যে, উৎপাদন পদ্ধতি সর্বকালেই তৎকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা যদি একটু বিস্তৃতভাবে দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে যে, যেমন আরম্ভের আগে আরম্ভ আছে, তেমনি ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব বা অর্থনৈতিক মূলের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার। বিজ্ঞান অর্থে আমি এখানে এই বোঝাতে চাই—প্রকৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি আহরণ, প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এই সব জ্ঞান সম্পদকে আয়ত্তাধীন ও কার্যকরী করে তোলা। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস যদি সম্পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে, বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্য সব কিছুই গড়ে উঠেছে। দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম ও নীতির আদর্শ, সমাজের আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তৎসঞ্জাত রাজনৈতিক মতামত, যুদ্ধ-বিগ্রহ—সব কিছুরই মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রভাব। শিল্পের উত্থান-পতন বিজ্ঞানের সঙ্গে সর্বকালেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এমন কি, চারুশিল্প ও ললিতকলার ইতিহাসও বিজ্ঞানের প্রভাবকে এড়াতে পারে নি। বর্তমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ঝোঁকই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চিত্রকলায়, স্থাপত্যবিদ্যায় ও সৌন্দর্যতত্ত্বে জ্যামিতির প্রভাব সর্বজনবিদিত। যদিও আমরা শব্দ-বিজ্ঞানকে সঙ্গীতশাস্ত্রের স্বার্থে যথোচিত কাজে লাগাই নি, তবুও সঙ্গীতে শব্দ-বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে আধুনিক সঙ্গীতবিদেরা যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। সঙ্গীতে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ যে শুধু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় চালিত হচ্ছে তা নয়—কালে হয়তো এ থেকে আমাদের ব্যক্তি নিরপেক্ষ রসসৃষ্টির সহায়তা হবে।

এই সার্বভৌম ইতিহাসের কাছে রাজারাজড়ার যুদ্ধ, ছোটবড় দেশের জয়-পরাজয়, সীমানা ও কীর্তিকলাপ কতই না গৌণ হয়ে পড়ে! অথচ ইতিহাসের পাতায় বিজ্ঞানের স্থান কতটুকু! এমন কি, এই বিরাট পটভূমিকায় ইতিহাস রচনার প্রয়াসও লক্ষিত হয় না। এটা শুধু আমার মনগড়া কথা নয়—একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"The history of Athens from 600 to 450 B. C. was presented (in text books) as a rise, the next century as a fall. The subsequent centuries omitted altogether from school text books, were presumably an age of darkness and death. It was disconcerting to notice that Aristotle flourished near 325 B.C. and that some of the greatest Greek scientists worked in the supposedly dead hinterland of 'Classical' Greek History.

*　　*　　*

The age of Elizabeth was 'golden' because the English were successful as pirates against the Spaniards, burned chiefly catholics at the stake and patronized Shakespeare's plays. The 17th and 18th centuries were comparatively inglorius, though Newton adorned the former and James Watt the latter.

* * *

Historical changes can be judged by the extend to which they have helped our species to survive and multiply. That is a numerical criterion expressible in figures of population.

(Gordon Child—Man makes himself)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লীবিগ যদি কৃত্রিম সার আবিষ্কার না করতেন, তবে ইউরোপের লোক না খেয়ে মরতো এবং তার প্রগতি সর্বপ্রকারে ব্যাহত হতো এবং সেটা হতো সেই যুগে যখন ইউরোপ শিল্প-বিপ্লবের সাফল্যে 'মিলেনিয়মের' স্বপ্ন দেখছে!

লোকে বলে—ঈশ্বর নিজ প্রতিকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। মানুষ নিজের আদর্শ স্থাপনকল্পে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুধর্মই জগতে একমাত্র ধর্ম, যেখানে এই অসাধারণ সাহসী উক্তি করা হয়েছে যে, মানুষ সবার উপরে এবং মানুষই অমৃতের অধিকারী, কারণ জীবজগতে একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের আসনে বসতে সক্ষম হয়। চরিত্র-মাহাত্ম্যে হয়তো সব বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের পর্যায়ে উঠতে না পারেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁরা ঈশ্বরের সমকক্ষ! কারণ বিজ্ঞানীরাই (ব্যক্তি-নিরপেক্ষ) নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা ভগবানের দানের ভিতর ছিল না এবং প্রকৃত-বিজ্ঞানী "একমেবদ্বিতীয়ম"কে শুধুমাত্র কল্পনায় নয়—পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরবার চেষ্টায় নিমগ্ন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে এই দু'-শ' বছরে বিজ্ঞান-জগতের চেহারা কতই না বদলে গেছে এবং তার সঙ্গে বদলে গেছে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নীতি ও আদর্শ। অবশ্য সব সময়েই যে বিবর্তন ও আবিষ্কার আমাদের উপকারে এসেছে বা সুখকর হয়েছে—একথা বলা যায় না। বিবিধ কারণে আমরা যে এই পরিবর্তন রোধ করতে পারি না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও ঠিক, এই অপকারিতার মূলে বিজ্ঞানের কোনই দোষ নেই এবং আবিষ্কারকদের দোষ ততটা নয়, যতটা বর্তমান সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার। এই সব ব্যবস্থাগুলি যদি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেত তা হলে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা উদ্ভূতই হতো না। যুদ্ধবিগ্রহের উপর বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ না করেও অনেক ছোট-খাটো জিনিষের উল্লেখ করা যায়, যেখানে দেখা যাবে—বিজ্ঞানের কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের স্বভাবের। স্বভাবের এই সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই আমরা পরিহার করিতে পারি। এই অস্বস্তিকর ঘনবসতিপূর্ণ কলকাতা মহানগরীতে রেডিও ও লাউড স্পীকারের উৎপাতের উল্লেখ করলেই চলবে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য আমাদের বিবিধ উৎপাত থেকে রক্ষা করবার পন্থা বের করে দিয়েছেন। যেমন ধরুন, শব্দ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করলে আমরা "সঙ্গীতপ্রিয়" প্রতিবাসী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাপ ও আর্দ্রতা-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করলে নেটিভ দেশেও "হোম কম্ফোর্ট" পেতে পারি। অবশ্য এগুলি ব্যয়সাপেক্ষ। সেই জন্যেই রেডিওর আবিষ্কারকেরা সবার কথা মনে রেখেই রেডিওর ভিতরই তার ব্যবস্থা রেখেছেন। সুতরাং আমরা যদি অপরকে নিজস্ব প্রিয় সঙ্গীত শোনাবার জন্যে বদ্ধপরিকর না হই, তবে তো কারও অসুবিধা হবার কথা নয়! যদি হয়, তবে দোষটা কার? বিজ্ঞানের, না মানুষের স্বভাবের? বিজ্ঞানীদের, না যাঁরা অহেতুক বিজ্ঞানের অপব্যবহার করেন, তাঁদের? ভবিষ্যতে, এমন কি, অদূর ভবিষ্যতে যে সব আবিষ্কারের আভাস আমরা পাচ্ছি তা শুধু আমাদের রাজনৈতিক জীবনে নয়—ধর্ম, চিন্তা, নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ—এমন কি, হৃদয়াবেগকে পর্যন্ত কি ভাবে যে প্রভাবান্বিত করবে তা বর্তমানে

অতি উদ্ভট কবির কল্পনায়ও আসে নি। শুধুমাত্র কল্পনা করুন—স্বনিয়ন্ত্রিত শিল্প-যন্ত্রাদির, মহাকাশ অভিযানের, নতুন শ্রেণীর ফল, ফুল ও জীবের উৎপত্তির কথা। মানুষের দাস, আলাদিনের দৈত্য, যন্ত্রমানব (Robot) আবিষ্কার আর বেশী দেরী নেই বলেই মনে হয়। কে জানে—হয়তো আমরা ইন-কিউবেটরের ভিতর ইচ্ছামত গুণাগুণসম্পন্ন মানুষই সৃষ্টি করতে পারবো! এই সব আবিষ্কারের ফলাফল আমাদের জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন যে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করবে, সে সম্পর্কে কিছু কল্পনা না করাই সমীচীন। হয়তো বা তার আগেই আমাদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি পারমাণবিক বোমার সাহায্যে দ্বিপদবিশিষ্ট ব্রেন সারিয়ানদের (যাদের আমরা মানুষ আখ্যা দিয়েছি) ধ্বংস করে দেবে! হয়তো বা এ-ভাবেই কলিযুগের শেষ হবে এবং মিউটে-শনে উদ্ভূত অভিনব জীব জগতে বাস করতে আসবে—যারা লুপ্ত আদমের বংশধরকে মূর্খ ও দাম্ভিক প্রাণীবিশেষ বলে সংজ্ঞা দেবে!

যদিও গত দু'শো বছরে বিজ্ঞানের প্রভাব অতি দ্রুত, চমকপ্রদ বলে আমাদের মনে হচ্ছে, তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের জন্মকাল থেকেই বিজ্ঞান তার জীবন-দর্শন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করছে।

খুব সম্ভব আদিম মানুষ প্রকৃতি থেকে অগ্নির স্বরূপ জানতে পেরেছিল এবং সেই জন্যেই অগ্নি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ধর্মীয় আচরণের অঙ্গীভূত হয়েছিল। তারপর সে অগ্নিকে ইচ্ছামত প্রজ্জ্বলিত করতে শিখলো, তার ফলে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় কি যে বিপ্লব হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখে না—তবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সভ্যতার প্রারম্ভে তীর-ধনুকের আবিষ্কার, চাকা ও রথের আবিষ্কার, পালতোলা নৌকা বা বায়ুকলের আবিষ্কার, জন্তু-জানোয়ারকে বশ করবার কায়দাকানুন আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-ব্যবস্থায় যে কি বিপ্লব ঘটিয়ে গেছে তার সামান্য কিছু সাক্ষ্য আছে। শোনা যায়, রথ ও চাকার সাহায্যে হিস্কোরা মিশরীয়দের হারিয়ে দিয়েছিল। অশ্ব ও লৌহ-নির্মিত তরবারীর সাহায্যেই হিটাইটরা সুমেরদের হটিয়ে দেয় এবং ভারতবর্ষে আর্যেরা প্রাগার্যদের পরাভূত করে। এই সেদিনও যখন চীনারা তাদের আবিষ্কৃত বারুদ দিয়ে শুধু উৎসবের ফুলঝুরী তৈরী করছিল, তখন ইউরোপীয়েরা বন্দুক, কামান তৈরী করে নিজেদের দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল। ভারতবাসীরা যখন ময়ূরপঙ্খী নৌকার কল্পনায় দিন কাটাচ্ছিল, তখন উন্নততর জাহাজ নিয়ে পর্তুগীজেরা এখানে হানা দেয়। তার ফল যে কি হয়েছিল, সে কথা লেখা নিষ্প্রয়োজন। শেষে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন দেশ জয়ের লোভে নয়, সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনায় নয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী যে গোল, এরাটোস্থেনিসের এই বৈজ্ঞানিক মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্খা। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছে—জগৎটা তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের ফলে কি ভাবে বদলে গেছে, তা উল্লেখ না করলেও চলবে।

এই তো গেল আমাদের স্থূল জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিতই মাত্র।

দর্শন ও বিজ্ঞান

আমাদের জীবনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতির উত্থান-পতন প্রধানতঃ নির্ভর করে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনদর্শনের উপর। এই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনদর্শনে দর্শনের স্থান সর্বজনস্বীকৃত। দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টিতেও বিজ্ঞানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হার্পাক ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

তিনি নাকি একবার বলেছিলেন—"আমরা এই আক্ষেপ প্রায়ই শুনতে পাই যে, আজকাল আর দার্শনিকের জন্ম হচ্ছে না। একথা কিন্তু ঠিক নয়। আজকালকার দার্শনিকেরা এই ফ্যাকাল্টিতে বসেন না, তাঁরা বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টিতে বিরাজ করছেন। আজকের দার্শনিক হলেন প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইন।" এ সত্য শুধু বিংশ শতাব্দীতেই প্রযোজ্য নয়—সর্বকালের পক্ষেই প্রযোজ্য। রাসেল তাঁর History of Western Philosophy-তে লিখেছেন—René Descartes (1596-1650) is usually considered the founder of modern philosophy, and I think, rightly. He is the first man of high philosophic capacity whose outlook is profoundly affected by the new physics and astronomy." কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তফাৎ এত স্পষ্ট ছিল না। যাঁরা ছিলেন দার্শনিক তাঁরাই ছিলেন মূলতঃ বিজ্ঞানী, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের সব তথ্যই তাঁদের জানা ছিল এবং তখন তা সম্ভবও ছিল। ইংরেজী ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতেও পদার্থ-বিদ্যাকে Natural Philosophy বলা হতো। প্লেটো এ সত্য জানতেন, তাই তাঁর বিদ্যামন্দিরে লিখে রেখেছিলেন—জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত এ মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অ্যারিষ্টোটল, গ্যালিলিওর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়েরও প্রামাণ্য পণ্ডিত। কাণ্ট থেকে বের্গস পর্যন্ত সব বড় দার্শনিকই তৎকালীন বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিলেন সুপরিচিত। আর লাইবনিৎস্ এবং রাসেল তো মূলতঃ বিজ্ঞানীই।

গ্যালিলিও এবং নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তাধারার ফল আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই, বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সতেজ পুনরুদ্ভবে। দিদেরো প্রমুখ এন্সাইক্লোপিডিষ্টরা, হলবাক্, হেলভেসিয়াস, মার্কস্—সবাই কার্যকারণ সাপেক্ষ বস্তুতন্ত্রবাদে গভীর বিশ্বাসী। কাণ্টের উপর নিউটনীয় কার্যকারণ সম্পর্কের প্রভাব এত বেশী যে, মানব-সমাজের মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করতে গিয়ে ও বস্তুর স্বরূপকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছিল, যথা—'a priori concepts'; 'categorical imperatives'; 'unknowability of things in themselves'। আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন, প্রথমটা সত্য নয়। নীট্‌শে যুক্তিদ্বারা দেখালেন যে, নীতিতে (morals) categorical imperatives-এর স্থান নেই; আর বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বলেন, শেষ প্রশ্নটির কোন অর্থ নেই, অবান্তর।

গ্যালিলিও এবং নিউটন ধর্মপুস্তকে লিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবিধ প্রকার সংস্কারের প্রতি আমাদের সন্দিহান করে তুলেছিলেন এবং সেই সন্দেহ দৃঢ় করে "তথাকথিত ধর্মের" মূলে আঘাত করলেন ডারউইন। ডারউইনের "Survival of the fittest" তত্ত্ব থেকে আমরা পাই—ম্যালথাস, মার্কস্ ও নীট্‌শেকে। ক্রমবিকাশের তত্ত্ব থেকে পাই বের্গস ও অরবিন্দকে। ভাববাদী ও বস্তুবাদী দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করবার চেষ্টায় জন্ম নেয় Positivism এবং Pragmatism-এর (কাঁতে, মাখ্, পোয়াঁকারে, উলিয়ম জেমস্)। গ্যালিলিও এবং নিউটনের বিস্ময়কর প্রভাবের অন্য একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখি উনবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজন-বাদী (utilitarian) দার্শনিকদের মধ্যে। এই দার্শনিকেরা আর সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রথম কারণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না—তাঁরা সমাজ ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি গড়বার চেষ্টায় ব্যস্ত।

দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে অমীমাংসিত চিরন্তন দ্বন্দ্ব—ভাববাদ ও বস্তুবাদ। বস্তু আগে না "ঐশী শক্তি" আগে? [মনে রাখা ভাল যে, ভাববাদীরা শক্তি বলতে বর্তমান বিজ্ঞানের সংজ্ঞার শক্তিকে (যা ভরের সঙ্গে সমার্থক) বুঝতেন না।]

উপনিষদের ঋষি ও প্লেটোর কথাই সত্য, না ডেমোক্রিটাস ও কণাদের কথাই সত্য? ডারউইনের আবির্ভাবের পর বোধ হয় ভাববাদীরাও অস্বীকার করতে পারেন নি যে, জীবনের পূর্বে জড়ের সৃষ্টি। এই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ জগৎ কোন অপ্রাকৃতিক মহাশক্তির খেয়ালে সৃষ্টি হয় নি। বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বস্তুগুণের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে। যদিও এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে জীবনের সৃষ্টি করতে পারেন নি, যদিও তাঁরা এখনও সঠিক জানেন না যে, কখন কোন্ অবস্থায়, কিরূপে প্রথম জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল, তবুও একথা প্রত্যেক বিজ্ঞানীই জানেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি ডেমোক্রিটাস-কণাদের পাল্লাটাই ভারী করছে এবং এই চিরন্তন প্রশ্নের ও দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারলে পারবেন বিজ্ঞানীরাই—তথাকথিত দার্শনিকেরা নয়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

ধর্ম ও দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত—এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ধর্মের উৎপত্তি হয় মানুষের ভয় ও অজ্ঞতা থেকে। কুসংস্কারের জন্মও ঐ থেকে। যা আমরা স্বল্প বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে বুঝতে পারি নি, যার কার্যকারণ সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই নি, তাই আমাদের অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিয়েছে এবং অবচেতন মনে হেতুবাদে বিশ্বাস থাকায় আমরা ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস করেছি। অনেক সময় ন্যায়শাস্ত্রের অজ্ঞতা বা অসম্পূর্ণতার জন্যে আমরা অনেক কিছুই বিশ্বাস করেছি যা যথার্থ নয়। একটা উদাহরণ আবার গর্ডন চাইল্ড থেকেই তুলে দিচ্ছি—

"Near the tropics the sun's movement is less striking (compared to northern latitudes). There the stars, always visible in those cloudless skies, provide a more obvious means of determining and dividing the solar year. *** By so using the stars as guides men may have come to the belief that they actually influenced terrestrial affairs. *You confuse connection in time with causal connection.* Because the star Sirius is seen in the horizon at dawn when the Nile flood arrives, it is inferred that Sirius causes the Nile flood. Astrology is based on this sort of confusion."

জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য চিরকালই মানুষের বিস্ময় ও ভয়ের উদ্রেক করেছে এবং তৎসম্পর্কে অজ্ঞতা আমাদের পরপারের বিশ্বাস এনেছে এবং তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে অনেক আচার-ব্যবহার। পিরামিড সৃষ্টির মূলেও এই বিশ্বাস ছিল যে, পরপারে জীবন আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সে কালে দুঃসাধ্য ছিল এবং মুষ্টিমেয় কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তার ফলে আমরা পাই মিশরে, সুমের দেশে, ব্যাবিলোনিয়ায় (এবং সম্ভবতঃ মহেন-জো-দাড়োতেও) পুরোহিত-প্রধান সভ্যতা। পুরোহিতেরা ছিলেন ভগবানের প্রেরিত পুরুষ—অতিপ্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। ছাপাখানার আবির্ভাবে এরূপ ধারণা আজ প্রায় দূরীভূত হতে পেরেছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী অত্যাশ্চর্য। এই সময় আমরা দেখি নৈতিক ধর্মের সৃষ্টি। মধ্য এশিয়ার য়িহুদী ধর্ম, ইরানে জোরাথুষ্ট্র, ভারতে উপনিষদের ঋষি, সাংখ্যের কপিল ও বুদ্ধ, চীনে লাওৎসে ও কনফুসিয়াস এবং গ্রীসে সক্রেটিস। এই সব ধর্মে মানবীয় (anthropomorphic) ঈশ্বরের স্থান নেই। ঈশ্বর যেখানে আছেন সেখানেও তিনি 'প্রথম কারণের' সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। ধর্মের ইতিহাসে ভারতবর্ষের দান অসীম। এক দিকে উপনিষদের ঋষিরা

প্রচার করেছেন, মানুষই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করতে বা ঈশ্বরে মিলিয়ে যেতে পারে এবং সমাজ-সভ্যতা নিরপেক্ষ ধর্ম আছে (যাকে কিছুকাল পূর্বে বিদেশে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার মূল কথা ও পার্থক্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আখ্যা দিয়েছিলাম Absolute Relegion)। কারণ তাঁরা প্রচার করেন যে, এই ধর্ম জড় ও জীবের প্রতি, পশু-পক্ষী, মানুষ, এমন কি, দেবতাদের প্রতিও প্রযোজ্য।

অন্যদিকে, কপিল ও বুদ্ধদেব প্রচার করলেন, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম সৃষ্টি করা যায়। এই সব মতবাদ সৃষ্টিতে তৎকালীন বিজ্ঞান কতটুকু সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছিল তা নিশ্চয় করে কিছু বলবার উপায় নেই; তবে এগুলি যে শুধু কল্পনা ও বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় নি, সেটা নিশ্চিত। কারণ পরবর্তী যুগে যখন বিজ্ঞানের প্রভাব ইউরোপে তীব্রভাবে এসেছে তখন দেখি আবার Absolute ধর্ম সৃষ্টি করবার প্রয়াস স্পিনোজার প্যান্থেইজমের মধ্যে—কান্টের Categorical imperatives-এর মধ্যে।

বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে বর্তমানে মানব-জীবনের যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তাতে এ প্রশ্ন আবার তীব্র হয়ে উঠেছে—বর্তমান মানব সভ্যতার ধর্ম কি হবে? এ একটি বাস্তব প্রশ্ন। আমরা যদি বাঁচতে চাই তবে এর যথোপযুক্ত উত্তর আমাদের একটা বের করতেই হবে। এ ধর্ম যে কিরূপ হবে তা বলা কঠিন। তবে এ কথা হয়তো নির্ভয়ে বলা যায় যে, যদি বর্তমান জগতে ধর্মকে কার্যকরী করে তুলতে হয় তবে তাকে বাস্তব-ধর্মী হতে হবে। এই নতুন ধর্ম অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাস করবে না, সর্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জন করবে। এক কথায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতি থাকলে চলবে না। নতুন ধর্ম হবে প্রধানতঃ নীতিমূলক এবং এই নীতি যাতে যুক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে, নচেৎ ধর্মের কার্যকরী ক্ষমতা থাকবে না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

সাংখ্যের পরমপুরুষের অবস্থা প্রাপ্তি বা নির্বাণত্ব লাভ হয়তো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আদর্শ হতে পারে এবং হয়তো কোনও কোনও অতিমানুষ সে লক্ষ্যে পৌঁছাতেও পারেন। তবুও এ আদর্শ যে সামাজিক মানুষের আদর্শ হতে পারে না (এমন কি, যদি প্রত্যেক মানুষই এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতো) তা বোধ হয় সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

প্রতিবাসীকে ভালবাসার আদর্শ মানব-সমাজে অতিশয় প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা কি সব সময় সম্ভব? প্রতিবেশীকে ভালবাসার সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সমস্যা বর্তমান সভ্যজগতে অনেক পরিমাণে সমাধান করেছে রাষ্ট্রের সাহায্যে সমাজসেবার সংস্থা সৃষ্টি করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা স্বীকার করে এবং প্রতিবেশীর অসুবিধা সৃষ্টি না করে তার প্রতি নিরপেক্ষ থেকে।

জীবে অহিংসার আদর্শ আরও উচ্চ। কিন্তু এই উচ্চ আদর্শকে কি কার্যকরী করা সম্ভব? খৃষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা তো এই আদর্শ গ্রহণই করেন নি। তাঁদের অহিংসার নীতি মানব-সমাজের ভিতরই নিবদ্ধ। কারণ, মানুষ ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ অসীম। মানুষের আত্মা আছে ইতর প্রাণীর নেই! যাই হোক, একথা ঠিকই যে, অহিংসা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ এবং যদিও ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ—প্রকৃতিকে জয় করা নয়, প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনাদর্শ গঠন করা ও জীবনযাত্রা চালনা করা, তথাপি এই ভারত-বর্ষেই আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মের নীতি প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত হতে পারে। এতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই এবং যদি সে ধর্ম কল্যাণকর হয়, তবে তা গ্রহণ করতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই নীতি আমরা কি পালন করতে পারি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ক্রমবর্ধ-

মান মনুষ্যজাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি শুধুমাত্র গাছপালার সাহায্যেই হতে পারে, প্রাণী-নিধনের প্রয়োজনীয়তা নেই (উদ্ভিদেরও প্রোটোপ্ল্যাজম আছে যাকে আমরা সজীব পদার্থ বলে থাকি। যাহোক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষ্ঠু সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব)। তবুও কি আমরা জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ দৈনিক শত শত প্রাণের ধ্বংস করছি না? তবে কি আমাদের ঔষধাদি গ্রহণ করে শরীরের অভ্যন্তরে জীবাণু ধ্বংস করা উচিত নয়? লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা কি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে পারবো না? মানুষকে অনাহারে মৃত্যুমুখে এগিয়ে দেব আর ইঁদুর, বানর যারা আমাদের শস্য বিনাশ করছে তাদের হত্যা করতে পারবো না? সীমারেখা কোথায় টানবো? আজকাল কেউ কেউ অহিংসা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, যে সব প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র নেই, সে সব প্রাণী যন্ত্রণা অনুভব করে না। তাদের প্রতি এই অহিংসানীতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

প্রথমতঃ, একটি প্রাণী ব্যথা অনুভব করছে কিনা, সেটা আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপে নির্ধারণ করবো? দ্বিতীয়তঃ, আমরা মানুষের স্নায়ুকে অবশ করতে সক্ষম যাতে সে কোন যন্ত্রণাই অনুভব করবে না। তা হলে যদি কোন ভাবী 'ধার্মিক ফ্যুরার' এই ভাবে বিবিধ সমস্যার সমাধান করেন, তাঁকে কি আমরা গ্রহণ করবো? উচ্চ ও ইতর প্রাণীর পার্থক্য কোথায় টানবো? অরওয়েল বর্ণিত দেশনেতা যদি সাদা ও কালো চামড়ার ভিত্তিতে বা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভিত্তিতে এই ভেদ সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান, তবে তাঁকে বাধা দেব কোন্ নৈতিক শক্তির সাহায্যে?

বর্তমানের কোন ধর্মের উপরই মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা থাকা সম্ভব নয় অথচ দেখা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাবী নৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বিজ্ঞানের বহির্ভূত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করে এবং বৈজ্ঞানিক ধর্মের পরিপূরকভাবে হয়তো কোন সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণকর ধর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং এর আশু প্রয়োজনও আছে সন্দেহ নেই। তবে কি কি উপায়ে তা হবে, সে প্রশ্নের সমাধান ভবিষ্যতে যে ধর্মাবতার আবির্ভূত হবেন তাঁর উপরই ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন ও লক্ষ্য

বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা এই যে, আমরা শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তত্ত্বীয় জ্ঞানের সহায়তায় অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য (বাস্তব সত্য যা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়) আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, উপনিষদের ঋষি থেকে বর্তমান দার্শনিক সবাই সেই সব যুক্তি-তর্কের প্রামাণ্যতা নির্ধারণের জন্যে বিজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আমরা যখন এই সত্যে উপনীত হই, তখন যুক্তি-তর্কের মূলে থাকে কতকগুলি মৌলিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত নিয়মকানুন। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি যদি ঠিকও থাকে, স্বতঃসিদ্ধগুলি (axioms, hypothesis, premises) যদি নির্ভুলও হয়, তবুও একথা জোর করে বলা যায় না যে, আমাদের যুক্তি-তর্কপ্রসূত ফল নির্ভুল হবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ব্যাপার আমরা দেখেছি। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারা যায়, আলোকের ধর্ম নিয়ে নিউটন ও হাইগেন্‌সের মতবাদ এবং বর্তমান শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানে কণা ও তরঙ্গের দ্বৈতবাদ। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, হয়তো দুটির মধ্যে একটি ঠিক, যদিও দুটি তত্ত্বই ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ত্রুটিবিহীন বা দুটি তত্ত্বই কোনও একটা আরও গভীর তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বিজ্ঞান আমাদের আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, একটা পরীক্ষিত তত্ত্বকে যখন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার

সীমার বাইরে টেনে নিই, তখনও সে তত্ত্ব যে নির্ভুল থাকবে তা বলা যায় না। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা গেছে, যে তত্ত্ব বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তা প্রায়ই মুছে যায় না—কোন একটা নতুন তত্ত্বের মধ্যে সীমিত থাকে মাত্র ; যথা—নিউটন ও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এবং গতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন। আজকাল সব বিজ্ঞানীই মেনে থাকেন যে, তত্ত্ব সত্য কিনা তার শেষ বিচারক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান।

অপর পক্ষে এ কথা ভুললে চলবে না যে, ন্যায়শাস্ত্রের ভিতরেই গলদ থাকতে পারে! সুতরাং একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রকে ভিত্তি করে সত্যে উপনীত হতে পারা যাবে, এমন কোন স্থিরতা নেই! প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ বর্তমান শতাব্দীতে উদ্ভূত গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্র। আমরা জেনেছি যে, অঙ্কশাস্ত্র সত্য কিনা—এ প্রশ্নই অসঙ্গত ও অবান্তর। প্রশ্ন ওঠে যে, অঙ্কশাস্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ কিনা? অবশ্য এমন প্রশ্নও উঠতে পারে, যেমন—ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁচেছি, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার মিল আছে কিনা? আইনষ্টাইনের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের দৃশ্যমান জগৎ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অনুসরণ করে। কিন্তু আইনষ্টাইন বলছেন, সেটা ঠিক নয়। তবে তিনিই বলেছেন—কোন্‌টা যে সত্য তা নির্ধারিত হবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা; কারণ দুটি তত্ত্বই যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে সঙ্গতিপূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন।

উপরে যা বলা হলো তা থেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম হবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলতে আমরা কি বুঝি? যে কোন তত্ত্বের—তা যতই ফলপ্রদ হোক না কেন —যাথার্থ্য নির্ধারিত হবে ন্যায়শাস্ত্র বা সৌন্দর্য তত্ত্বের (aesthetics) সাহায্যে নয়—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা। পুরাকালে কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এরূপ ছিল না। এই চিন্তাধারার বিস্ময়কর কার্যকারিতা আমরা গত তিন শ' বছরের অদ্ভুত দ্রুত গতিসম্পন্ন ইতিহাসে দেখেছি। এ কথা বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে না বললেও চলবে যে, এই চিন্তাধারার—যা আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলে উল্লেখ করি—জন্মদাতা গ্যালিলিও এবং প্রাচীনকালে এই চিন্তাধারা যে ছিল না তা প্রমাণ করছে গ্যালিলিওর নির্যাতন ও দুর্ভোগ। প্রাচীনকালে পৃথিবীর—ভারতেরও—প্রায় সব বিজ্ঞানীর অসীম আস্থা ছিল ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক সঞ্জাত ও সৌন্দর্য তত্ত্বের সমর্থক (aesthetic beauty, simplicity and harmony in Nature) তত্ত্বের উপর। পরীক্ষা করে সেই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করতেন না। এই মনোবৃত্তি সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। একদিন কয়েকজন শিষ্য তাঁকে নিবেদন করেন—মহাশয়, আপনি যে সব তত্ত্ব প্রচার করেছেন তা খুবই ভাল; তবে বিপদ এই যে, তা তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি নাকি উত্তর দেন—তাতে তোমাদের তথ্যের কপালই খারাপ প্রমাণিত হয়! এটা নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। কিন্তু গ্যালিলিওর পূর্বে এরূপ মনোবৃত্তি অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীরও ছিল। আজকের দিনে প্রত্যেক বিজ্ঞানী যেমন পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই শেষ বিচারক বলে মনে করেন, পুরাকালে ঋষি ও আচার্যদের মনোবৃত্তি সেরূপ ছিল না। এমন কি, পরমাণুবাদের স্রষ্টাকর্তাদের তত্ত্বও কল্পনাপ্রসূত (speculative)। ডেমোক্রিটাস বা কণাদ পরীক্ষা দ্বারা তাঁদের তত্ত্বকে যাচাই করতে প্রয়াস পান নি। পুরাকালের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়—এরাটোস্থেনিস, আরিস্টার্ক ও হিপার্কাসের মধ্যে। এরাটোস্থেনিস পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবী গোল কিনা। আরিস্টার্ক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবী

সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে এবং হিপার্কাস এই তত্ত্ব যে ভুল, তা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন। অবশ্য, আরিস্টার্কের তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল খুব ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের, যা তখনকার কালে ছিল না। ভারতবর্ষে ঐরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর উল্লেখ আছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry-তে। এই হিন্দু বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, বায়ুর ওজন আছে। সূক্ষ্ম যন্ত্রের অভাবে তাঁর পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল; তবে অনুমান যে সত্য, সেটা প্রমাণ করেন বহু শতাব্দী পরে ল্যাভোসিয়ের। চার্বাকীরাও বোধ হয় পরীক্ষালব্ধ সত্যে বিশ্বাস করতেন।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে কোন লজ্জা হওয়া উচিত নয় যে, বিজ্ঞানের বহু তথ্য ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হলেও এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ভারতেও ছিল না। গ্যালিলিওর পূর্বে জগতে কোথাও ছিল না—এমন কি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব দান রয়েছে যে হেলেনিক সভ্যতার, তাদের মধ্যেও না।

পৃথিবীর সভ্যতার মূল কাঠামো সর্বত্রই এক যুগে একইরূপ ছিল; যদিও প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণবশতঃ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। যে সভ্যতা মিশর ও সুমের দেশে উদ্ভূত হয়েছিল, কালক্রমে তারই স্রোত এসে সিন্ধু উপত্যকায় হাজির হয়। সামন্ততন্ত্রের যুগে চীন থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত সভ্যতার কাঠামো প্রায় একরূপ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্ভূত শিল্প-বিপ্লবের পর পৃথিবীর সর্বত্র একই কাঠামোতে গড়ে উঠেছে বা উঠতে চেষ্টা করছে। যদিও এই সভ্যতা পশ্চিম ইউরোপে জন্ম নিয়েছে এবং পশ্চিম ইউরোপ একে এতকাল লালন-পালন করেছে, তবুও এ সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা নয়—এ সভ্যতা বিশ্বসভ্যতা। আমরা চাই বা না চাই, এ সভ্যতা আমাদের গ্রাস করবে, এ সভ্যতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে এবং গ্রহণ করাই সমীচীন হবে; কারণ আমাদের ঐতিহ্যের প্রভাবে কেবল মাত্র এই সভ্যতার ভিতর দিয়েই পৃথিবীকে আমরা নতুন কিছু দিতে পারবো। ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাস—ভারতবর্ষের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, গান্ধী—সবাই আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।

বিজ্ঞানের আদর্শ—বহুর মধ্যের একের সন্ধান। সেই প্রথম কারণ খুঁজে বের করা, যার থেকে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সব কিছুরই উদ্ভব হয়েছে। নিউটন ও ডাল্টনের পর থেকেই সুরু হয়েছে সেই দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি—পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রনের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রসায়নশাস্ত্র এখন আর পদার্থ-বিদ্যা থেকে তফাৎ করে দেখা যায় না। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, পরমাণুই ক্ষুদ্রতম কণা নয়। এর ভিতরও রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউক্লিওন এবং আরও কত কি—যাদের স্বভাব ও ধর্ম এখনও ভালভাবে জানা যায় নি। আইনষ্টাইন দেখালেন শক্তি ও ভর একই কথা—একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা। তিনি আজীবন কাটালেন পদার্থ-বিদ্যার শেষ তত্ত্বটা কি, তা জানবার জন্যে। তাঁর প্রশ্ন অনেকটা যেন বেদান্তবাদীর মত; যদিও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক ও লক্ষ্যবস্তুর সংজ্ঞাও ভিন্ন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্বোলারের ইউরিয়া সংশ্লেষণ এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিই প্রথম দেখালেন, এতকাল আমরা অহেতুক জৈব ও অজৈব পদার্থের মূলগত পার্থক্যের কথা প্রচার করেছিলাম। তারপর থেকেই চলেছে জৈব-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি। জীব-বিজ্ঞানে জন্মালেন ডারউইন, ওয়ালেস, ভাইসম্যান, মর্গান; মনো-বিজ্ঞানে ফ্রয়েড। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যথা—বায়োকেমিষ্ট্রি, বায়োফিজিক্স, শারীর-বিদ্যা, মনো-বিজ্ঞান এবং সদ্য আগত সাইবারনেটিক্স্

ইঙ্গিত করছে যে, শুধু জড়-বিজ্ঞানই নয়—জীব-বিজ্ঞানও পদার্থ-বিদ্যার নিয়মানুগত। এমন কি, হয়তো মানুষের হাসি-কান্নার মূলেও রয়েছে জড়-পদার্থের মৌলিক কণা।

মেটাফিজিক্সের চেয়ে ফিজিক্স যে সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করতে বেশী সহায়তা করে, একথা সর্ব-সাধারণ সেই দিনই হৃদয়ঙ্গম করবে, যে দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারেই অজৈব পদার্থ থেকে 'জীবন' তৈরী করতে সক্ষম হবেন। প্রোটিন-বিদ্যা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয়, এ লক্ষ্যে পৌছাতে বিজ্ঞানের খুব বেশী দেরী হবে না। বিজ্ঞানের যাত্রা এতেই থেমে যাবে না। এর পর আছে জীবনের এবং বিশেষ করে মনুষ্য-জীবনের সত্যকার রহস্য উদ্ঘাটনের পালা। এর পথ এখনও বিজ্ঞানীরা দেখতে পান নি। কারণ জীব-বিদ্যার নিউটন এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। যেদিন "জীব-বিজ্ঞানী নিউটন" জন্মগ্রহণ করবেন, তখনই সুরু হবে বিজ্ঞানের ঐক্য সাধনার প্রকৃত জয়যাত্রা। নিউটনের আগে যেমন গ্যালিলিও, তেমনি ভবিষ্যৎ "জৈব নিউটনের" পূর্বে জগদীশচন্দ্র। সেই দিনই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যথার্থ সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবো।

বিজ্ঞানীর এ পথ অতি দুর্গম ও দুস্তর। এ পথ ক্ষুরের মত ধারালো; একটু ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই বিপদ। এ পথ তমসাচ্ছন্ন, হাতড়ে চলতে হবে। মাথা ঠুকে আলো জেলে পথের সন্ধান করতে হবে। বিজ্ঞানীর অনন্ত জিজ্ঞাসার কোন দিনই শেষ হবে না। মানবজাতি কোন দিনই এই মহাসাগর অতিক্রম করিতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বের অসংখ্য বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যদি এই মহা-সমুদ্রের ক্ষুদ্রতম অংশেরও সঠিক মানচিত্র আঁকতে পারা যায়, তা হলেই মানবজীবন ধন্য হয়েছে মনে করতে হবে—শত শত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করতে হবে। জগদীশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এই যে, আমাদের দেশে তিনিই সর্বপ্রথম এই পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন। বোধ হয় পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম 'জীবনকে' পদার্থ-বিদ্যার অঙ্গীভূত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নয়—পদার্থ-বিদ্যার উপযোগী সূক্ষ্ম পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে। তিনি যে দীপ জেলেছিলেন, আমরা—যারা তাঁর উত্তর-সাধক—যদি সেই দীপশিখা প্রজ্জলিত রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি, সেই দীপশিখা থেকে যদি দেশের প্রতি ঘরে, প্রতি বাতায়নে দীপ জ্বালাবার জন্যে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যাই, তা হলেই এবং শুধু তা হলেই আমাদের তাঁর নাম নেবার অধিকার থাকবে।*

* জগদীশচন্দ্রের জন্ম শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রকৃতির রোষ

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

সে আজ কতদিনের কথা—পৃথিবী ঘুরতে আরম্ভ করেছে সূর্যের চারদিকে। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলি যেমন করে ঘুরে চলেছে আজও, আমাদের পৃথিবীও ঠিক তেমনি করেই ঘুরছে—পরিক্রমণ করছে সূর্যকে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনে একবার। আর নিজের চারদিকে একবার পাক খেতে তার সময় লাগছে চব্বিশটি ঘণ্টা। কিন্তু এত সময় তো আগে লাগতো না! তাই হয়তো এখন সে ভুলে গেছে—আজ থেকে অন্ততঃ ৪৫০০ মিলিয়ন বছর আগে যখন প্রথম তার পরিক্রমণ সুরু হয় তখন মাত্র চার ঘণ্টা সময় লাগতো নিজের চারদিকে একবার পাক খেতে। তার পর থেকে যতই দিন গেছে, ক্রমে ক্রমে ততই সে তার গতি হারিয়েছে। তাই আজ আমাদের পৃথিবী এত ধীর আর স্থির।

ধীর স্থির হয়ে কিন্তু বসে থাকতে পারে নি পৃথিবীর অধিবাসীরা—মানুষেরা। ইতিহাসের পথ ধরে এগিয়ে গেছে—এগিয়ে চলেছে। জীবনের স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হয়েছে, জানবার নেশা পাগল করে তুলেছে মানুষকে। জেনেছে সে অনেক—আবিষ্কার করেছে আরও বেশী। আদিম মানুষ বিজ্ঞানকে চিনতো না—বিজ্ঞানও জানে নি আদিম পৃথিবীকে। যে গুহায় শতাব্দী ধরে জ্বলে নি আলো, ঢোকে নি বাইরের ডাক, যেখানে শুধু ছিল কতকগুলি প্রাণ—কতকগুলি দেহ, অনাড়ম্বর আর একান্তই আদিম, সেখানেও জ্বললো আলো। এল বৃহৎ বিশ্বের ডাক, মনে এল জিজ্ঞাসা, দেহে আড়ম্বর—ঘুচতে লাগলো আদিমত্ব ধীরে ধীরে। আরও ধীরে ধীরে বিজ্ঞান এসে চুপে চুপে দাঁড়ালো মানুষের সামনে। এ ইতিহাস সকলেরই জানা। বিংশ শতকের স্পুট্‌নিকের যুগে দাঁড়িয়ে একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, বিজ্ঞান আমাদের অনেক দিয়েছে, অনেক জানিয়েছে এবং আরও জানাবে। তবে পৃথিবীর ভাষা বোঝবার যদি কারও সাধ্য থাকতো সে হয়তো স্পষ্টই শুনতে পেতো, পৃথিবী মানুষকে সাবধান করে দিয়ে যেন বলছে, ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভাব। পৃথিবীবাসী কথাটা শুনতে পেলেও সাবধান হতো না, কারণ তারা ভবিষ্যৎ জানে না—তারা জানে শুধু বর্তমানকে; বর্তমানই তাদের কাছে চরম সত্য। কিন্তু তারা ভুল বুঝেছে প্রকৃতিকে। এর কারণ শুধু একটাই—প্রকৃতির রোষ তারা দেখে নি।

বেশী নয়, আজ থেকে এক লক্ষ বছর পিছিয়ে গেলেই প্রকৃতির রোষের প্রমাণ মিলবে। হিমযুগ সেটা। বিশেষ করে উত্তরের মহাদেশগুলিই এই হিমযুগের কবলে পড়েছিল। আদিম মানুষ ভেবেও পেল না সে, এত বরফ তাদের কেমন করে গ্রাস করলো—অতর্কিতে আর প্রতিকারহীন ভাবে। আট মিলিয়ন বর্গমাইল পৃথিবী-পৃষ্ঠ বরফের ছাউনিতে ঢেকে গেল। উত্তর আমেরিকাই এই বিরাট অঞ্চলের অর্ধেকটা দখল করেছিল। আর তিন মিলিয়ন বর্গমাইল পড়েছিল ইউরোপে। আর বাকীটা এশিয়ার বিভিন্ন পর্বতগুলির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের হিমালয় এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিও বাদ পড়ে নি।

এই হিমযুগের সব সময়টাতে যে হিমশীতল আবহাওয়া ছিল তা নয়, বরফাচ্ছন্ন দেশগুলিতে উত্তাপের আমেজও মাঝে মাঝে এসেছে, আর তখনই কিছুটা বরফ গলে গেছে। তবে এ অবস্থা বেশী দিন চললো না; আবার এল শীত, জমলো

বরফ। এমনি করে কেটে গেল সুদীর্ঘ পঁচাত্তর হাজার বছর। এর পর থেকে বরফ ক্রমে গলে যেতে থাকে, আর বর্তমানে শুধুমাত্র মেরুপ্রদেশ আর গ্রীনল্যাণ্ডই ঐ হিমযুগের নিদর্শন বহন করে চলেছে।

আদিম মানুষ বরফের অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, বুঝে উঠতে পারে নি কারণটা। আজকের মানুষ তার কারণ জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্যান্য প্রশ্নের মত এটারও সুষ্ঠু উত্তর খুঁজে পায় নি। এ সম্বন্ধে যেসব মত প্রচার করা হয়েছে তার মধ্যে সূর্যের বিকিরণ-ক্ষমতার তারতম্যটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী। সূর্য থেকে পৃথিবী যে পরিমাণ তাপ পায়, তার পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক; বিশেষ করে সৌরকলঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে। তাই এ-কথা মেনে নেওয়া যায় যে, এক লক্ষ বছর আগে সূর্যের এই তাপ খুব অল্প পরিমাণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতো এবং তার ফলেই এসেছিল ঐ সময়কার ভয়াবহ শীতলতা।

লক্ষ বছর আগের এই শীতল-মৃত্যুর দিনগুলিকে মানুষ ভুলে গেছে; তাই তারা মনেই আনতে পারে না প্রকৃতির রোষের কথা। এবার আরও একটু পিছিয়ে পড়া যাক। ভূতত্ত্বের ভাষায় তখন ক্রিটেসাস যুগ চলছে, অর্থাৎ সময়টা এখন থেকে ১২০ লক্ষ বছর আগে। মানুষ তখনও আসে নি পৃথিবীতে—সরীসৃপের দল রাজত্ব করে চলেছে নির্বিবাদে। ক্রিটেসাস যুগ শেষ হয় হয়, এমন সময় তাণ্ডবলীলা সুরু হয়ে গেল পৃথিবী জুড়ে। মহাদেশগুলি প্রকৃতির খেয়ালে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো—আর পূর্ব আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা আর ভারতের উপর ছড়িয়ে পড়লো উত্তপ্ত তরল লাভা। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ২০০,০০০ বর্গমাইল জায়গা। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে লাগলো। ভারতের ডেকান ট্র্যাপই ঐ জমাট-বাঁধা লাভা। এই হলো প্রকৃতির রোষ। আরও পিছিয়ে গেলে এমন আরও কত উদাহরণ যে দেওয়া যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

একথা ভাবতেও কি ভয় হয় না যে, যে কোন মুহূর্তে সূর্যের বিকিরণ ক্ষমতা কমে এলে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে আসবে সেই পুরনো দিনের তীব্র হিমযুগ। শীতল সেই মৃত্যু-আলিঙ্গন এড়িয়ে যাবার সাধ্য থাকবে না মানুষের। অথবা সূর্যের অভ্যন্তরে একটা শক্তিশালী পারমাণবিক 'ফিশন' হলো, আর উদ্ভূত উত্তাপ সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। সে উত্তাপ মানুষ সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে; কিন্তু মেরুর বরফরাশি যে পারবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরফ গলে জল হয়ে যাবে, আর সে জল পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়বে। সমুদ্রে দেখা দেবে জলস্ফীতি। এর ফলাফল সকলেরই জানা। বন্যায় ভেসে যাবে মানুষ—জলে ডুবে যাবে সমুদ্রোপকূলের সহরগুলি!

এমন দিনও আসতে পারে যা মানুষকে মনে করিয়ে দেবে ক্রিটেসাস যুগের শেষাঙ্ককে। কখন, কোথায় বিরাট ফাটল ধরলো আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল লাল লাভা। পুড়িয়ে ছাই করে দিল ছোটখাটো সভ্যতা, একটা দেশ—কেউ বলতে পারে না। কেউ একথাও জোর করে বলতে পারে না যে, তাদের দেশকে তারা প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে। সকলের অজ্ঞাতেই হয়তো একদিন এক অশুভ মুহূর্তে একটা মহাদেশ তলিয়ে যেতে থাকবে সাগরের তলায়, কিছুদিন পরে তার চিহ্নই কেউ খুঁজে পাবে না। অবিশ্বাস করবার উপায় নেই, কারণ অতীত বহন করে চলেছে এমন ঘটনার অজস্র উদাহরণ—ভূতত্ত্বের পৃষ্ঠায় লেখা আছে এমন অনেক ইতিহাস।

ভারতের দিকে তাকালেই দেখা যায়, হিমালয় সকলের উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সকলের উপরে সন্দেহ নেই; তবে এই মাথা তোলার পিছনে

অনেক ইতিহাস, অনেক দিনের ঘটনা লুকিয়ে আছে। জন্মের সময় হিমালয় ছিল আরও উত্তরে সীমাবদ্ধ—দক্ষিণে আসবার অনুমতি সে অনেক দিন পায় নি। তারপর যখন গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়, হিমালয়ও ধাপে ধাপে দক্ষিণে এগিয়ে আসে। আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়াতে হিমালয়কে অন্ততঃ পাঁচবার মাথা তুলতে হয়েছে। পঞ্চমবার মাথা তোলবার সময় সিন্ধু-গাঙ্গেয় মহীখাত তৈরী হলো, আর তাতে পলি জমে জমে তৈরী হলো আজকের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি। এ-কথা কেউ বলতে পারে না যে, এই সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির পললরাশি হিমালয় পর্বতমালার একটা অঙ্গ হয়ে যাবে না, অর্থাৎ উত্তর ভারতটাকেও হিমালয় গ্রাস করবে না। অপর পক্ষে এটাও অবিশ্বাস্য নয় যে, আজ থেকে ৩৫ লক্ষ বছর আগে মায়োসিন যুগে যেমন পশ্চিমঘাট বরাবর ভারতের কিছুটা অংশ আরব সাগরের নীচে বসে গেছে, আজ অথবা কিছুকাল পরে অন্য কোন অংশ তেমনি ভাবে বসে যেতে পারে। এগুলি না হওয়াই কাম্য, কিন্তু প্রকৃতির রোষ এড়ানো কঠিন।

এটা অনেকেই জানেন যে, রাজপুতানার থর মরুভূমি দিন দিন আয়তনে বাড়ছে। শুধু থর কেন, আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, চীনের গোবিই কি চুপ করে বসে আছে? তারাও বাড়ছে। তবে সেটা চোখে পড়বার মত নয় বলেই ভীতির সঞ্চার এখনো হয় নি। কিন্তু মরুভূমির ঝড় বালি নিয়ে এগিয়ে আসতে কতক্ষণ! আর কতক্ষণই বা সময় লাগবে জনপদের পর জনপদ গ্রাস করে নিতে? তবে সে ঝড় মরুভূমিতেই থেমে যাক, কি মরুর বালি মরুতেই থাক—প্রকৃতির রোষ তো ঠেকাবার নয়!

মরু, মেরু আর লাভার আক্রমণ, অতর্কিত ভূ-আলোড়ন ইত্যাদি অনেক কিছুই ধ্বংসকারী প্রাকৃতিক খেয়াল পৃথিবীর মানুষকে যে কোন দিন মৃত্যুর মুখে এনে ফেলতে পারে। সেদিন কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না; বুদ্ধি দিয়েও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে না, আদিম মানুষের মতই আজকের সুসভ্য মানুষও সেদিন প্রকৃতির হাতে নিজেদের ছেড়ে দেবে।
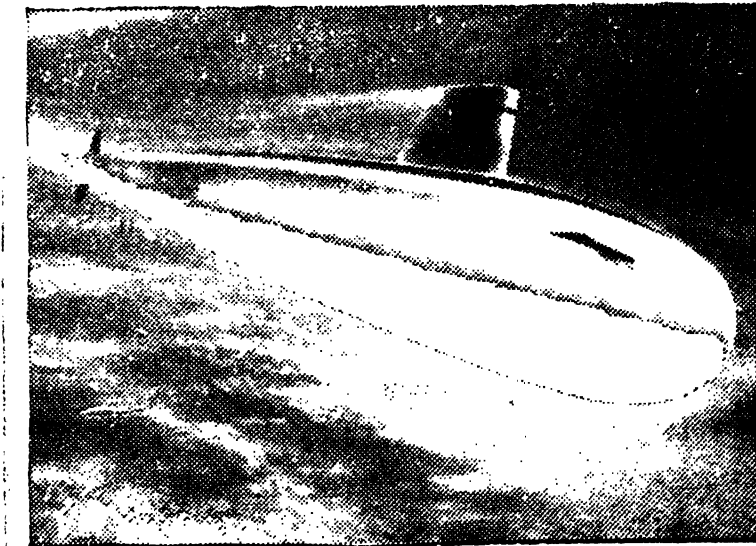
বৃটেনের প্রথম পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিন "ড্রেডনটের" দৃশ্য।

মেসন

শ্রীসরোজকুমার দে

বহির্জগৎ থেকে দিবারাত্র নিয়তই মহাজাগতিক রশ্মি নামক এক অতি শক্তিশালী রশ্মি পৃথিবীর উপরে এসে পড়ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এই রশ্মির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, যার ফলে এই রশ্মি সম্পর্কিত বহু অজ্ঞাত বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মি—আল্‌ফা-কণিকা, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিশালী মৌলিক কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই রশ্মির অন্তর্গত আর একটি অতি শক্তিশালী নতুন মৌলিক কণিকার সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৩৭ সালে—যার নাম রাখা হয় মেসোট্রন বা মেসন।

মেসন আবিষ্কারের পূর্বে বহু গাণিতিক ও ব্যবহারিক গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল। এ বিষয়ে গাইগার-মুলার কাউন্টার সমন্বিত মেঘকক্ষ এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত একপ্রকার ফটোগ্রাফিক ইমালসন অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। মহাজাগতিক রশ্মিকে প্রধানতঃ দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি সফ্‌ট কম্পোনেন্ট এবং অপরটি হার্ড কম্পোনেন্ট। ইলেকট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কণিকাকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়—যারা ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার বেধসম্পন্ন সীসার পাতের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়ে থাকে। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত আর এক শ্রেণীর কণিকা আছে যারা এক মিটারেরও অধিক পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে সক্ষম; এমন কি, সমুদ্রের কয়েক শত মিটার নিয়েও সেই কণিকার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর কণিকা যে অত্যন্ত অধিক শক্তিবিশিষ্ট তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই প্রকার কণিকাকে প্রথমে বিজ্ঞানীরা অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন বা পজিট্রন বলে ধারণা করেন। কিন্তু এই কণিকা যে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের এক মৌলিক কণিকা তা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

কোন বেগসম্পন্ন কণিকা কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার শক্তি ব্যয় করে, অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় কণিকাটির যে শক্তি ছিল, দেখা যায় পরিশেষে তার অনেকখানি শক্তি হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা ইলেকট্রন বাতাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ধীরে ধীরে তার শক্তি ব্যয় করে। ইলেকট্রনের শক্তি-ব্যয় সাধারণতঃ দু-প্রকারে হয়ে থাকে—আয়নীকরণ ও বিকিরণের দরুণ (Ionization and Radiative loss)। প্রথমক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ইলেকট্রন কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার গতিপথে অবস্থিত পরমাণুগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এবং তখন সেটি ঐ সকল পরমাণুকে একে একে আয়নিত করে; অর্থাৎ পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে আপতিত শক্তিশালী ইলেকট্রনটি শক্তিক্ষয় করে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার আয়নীকরণের ক্ষমতা হ্রাস না পায়। এই প্রক্রিয়ায় আয়নীকরণের দরুণ শক্তি ব্যয় হয়। মেঘকক্ষ ও ফটোগ্রাফিক ইমালসনে এরূপ ইলেকট্রন কর্তৃক অঙ্কিত আয়নিত রেখা পর্যবেক্ষণ করা যায়। আয়নীকরণের দরুণ শক্তি ব্যয়ের হার ইলেকট্রনের বেগের উপর নির্ভর করে। একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা একটি

ধীর গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন পরমাণুর পরস্পর সংঘর্ষ অধিক সময়ব্যাপী হয়ে থাকে এবং তার ফলে আপতিত ইলেকট্রনটি বেশী মোমেণ্টাম বা ভরবেগ জোগাতে সক্ষম হয়। সুতরাং অধিক গতিজনিত শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা ধীর গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন তাড়াতাড়ি শক্তি ব্যয় করে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়নীকরণের দরুণ শক্তি ব্যয়ও হ্রাস পায়। অবশ্য ইলেকট্রনের শক্তি খুব বেশী হলে আয়নীকরণের দরুণ শক্তিব্যয় আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং দেখা গেছে, আলোকের গতিবেগের শতকরা ৯৬ ভাগ বেগসম্পন্ন ইলেকট্রনের সর্বাপেক্ষা কম শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে। আবার যে মাধ্যমের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশ করে তার বিভিন্ন ধর্ম—যেমন ঘনত্ব, অর্থাৎ গতিশীল ইলেকট্রনের গমনপথে পরমাণুর সংখ্যার উপর ইলেকট্রনের শক্তিব্যয় নির্ভর করে। ইলেকট্রনের ন্যায় ঠিক একই প্রক্রিয়ায় পজিট্রনেরও আয়নীকরণের দরুণ শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে।

অপর যে প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের শক্তি ব্যয় হয় তা বিকিরণের দরুণ। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে আপতিত দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণু-কেন্দ্রকের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংঘর্ষে শক্তি ব্যয় হয়, দেখা গেছে। কিন্তু যদি একটি অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন (বা পজিট্রন) তার গমন পথে কোন একটি পরমাণু কেন্দ্রকের খুব নিকটে আসে তাহলে কেন্দ্রকের অধিক ভরের জন্যে ঐ ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকের মধ্যে একটি পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে ইলেকট্রনটির বেগ বেশ মন্দীভূত হয়। তখন ইলেকট্রনটির বেশ কিছুটা শক্তি ব্যয় হয়, যে শক্তি একটি ফটোন (তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ কণা) আকারে নির্গত হয়। ইলেকট্রনের শক্তি যত বেশী হয়, নির্গত ফটোনটির শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। এর পর এই ফটোনটি অপর একটি পরমাণু কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনে রূপান্তরিত হয় এবং ফটোনটির অন্তর্নিহিত শক্তি ইলেকট্রন ও পজিট্রনটির মধ্যে সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আবার এই ইলেকট্রন ও পজিট্রন অন্য দুটি কেন্দ্রকের খুব কাছাকাছি এসে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় দুটি ফটোনে পরিণত হয়—যেগুলির প্রত্যেকটি থেকে আবার একটি করে ইলেকট্রন ও পজিট্রন উৎপন্ন হয়। এইভাবে ফটোন তথা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের শক্তিও পূর্বাপেক্ষা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'কাস্‌কেড শাওয়ার' বা প্রপাত বর্ষণ। প্রক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে যতক্ষণ না ইলেকট্রন ও পজিট্রনের শক্তি এমন স্তরে পৌঁছায় যখন তারা আর ফটোনে পরিণত হয় না, অর্থাৎ সেই স্তরে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের শক্তি ব্যয় বিকিরণ অপেক্ষা আয়নীকরণের দরুণ বেশী হয়।

দেখা গেছে, পরমাণু-কেন্দ্রকের তড়িতাবেশ বা চার্জ বেশী হলে ইলেকট্রনের শক্তিব্যয় বিকিরণের ফলে বেশী হয়। বিজ্ঞানী বেথে ও হাইট্‌লার দেখিয়েছেন যে, বাতাস বা জল ও সীসার মাধ্যমে ইলেকট্রনের শক্তি যথাক্রমে ১০০ ও ১০ মি. ই. ভোল্টের অধিক হলে তার শক্তিব্যয় মোটামুটি বিকিরণের দরুণ হয়ে থাকে—আয়নীকরণের দরুণ নয়। ইলেকট্রনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণের দরুণ শক্তিব্যয় এত শীঘ্র ও এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে, ইলেকট্রনের শক্তি যত বেশী হোক না কেন, সেটি ৩০০ মিটারের বেশী বাতাসের স্তর ভেদ করে যেতে পারে না; কারণ তার মধ্যেই বিকিরণের ফলে শক্তির বেশ কিছুটা ব্যয় হয়ে যায়। ইলেকট্রনের শক্তি যত বৃদ্ধি পাবে তত তাড়াতাড়ি শক্তিশালী ফটোন উৎপন্ন করে তার শক্তি ব্যয়িত হবে। উপরন্তু বেথে-হাইট্‌লারের সূত্র থেকে জানা যায় যে, ইলেকট্রন বা পজিট্রনের শক্তি যত বেশী হোক না কেন, সেটি এক মিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে সক্ষম নয়। কারণ পরীক্ষান্তে

দেখা গেছে, এরা ভারী ধাতু সীসার মধ্য দিয়ে যাবার সময় খুব তাড়াতাড়ি ও প্রচুর পরিমাণে প্রপাত বর্ষণের সৃষ্টি করে এবং তার জন্যে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়।

পূর্বে মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত অতি শক্তিশালী এক কণিকার উল্লেখ করা হয়েছে যেটি কয়েক মিটারের অধিক পুরু সীসার পাত্ ভেদ করে যেতে পারে—এমন কি, কয়লা খনির কয়েক শত মিটার নিম্নে ও সমুদ্রের বহু নিম্নেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে অ্যাণ্ডারসন ও নেদারমেয়ার মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণাকালে মেঘকক্ষের সাহায্যে এমনি এক অতি শক্তিসম্পন্ন কণিকার সন্ধান পেলেন, যেটি মোটেই প্রপাত বর্ষণ করে না এবং কেবলমাত্র পথিমধ্যস্থ অণু ও পরমাণুগুলিকে আয়নিত করে শক্তি ক্ষয় করে এবং মেঘকক্ষে একটি মাত্র রেখা অঙ্কিত করে। অতএব প্রথমে যে ধারণা করা হয়েছিল, এই অজ্ঞাত কণিকা অতি শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বা পজিট্রন, তা ভুল। কারণ অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন বা পজিট্রন প্রপাত বর্ষণের সৃষ্টি করবেই। তখন বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন যে, এই কণিকার ভর যদি ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশ কয়েকগুণ বেশী হয় তাহলে কোন পরমাণু-কেন্দ্রকের খুব কাছ দিয়ে যাবার কালে কণিকার বেগ অল্পই মন্দীভূত হবে। এর ফলে কোন ফটোন নির্গত হবে না এবং প্রপাত বর্ষণের সৃষ্টিও হবে না। অতএব কণিকাটিকে ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী এক তড়িৎযুক্ত কণিকা বলে ধারণা করে নেওয়া হলো।

মেসন-কণিকার পথচিহ্ন (মেঘকক্ষে গৃহীত)।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে জাপানী পদার্থ-বিজ্ঞানী ইউকাওয়া নিউক্লিয়ার ফোর্স বা কেন্দ্রীকীয় শক্তি

সম্বন্ধে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী স্যাডউইক কর্তৃক নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তখন মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে যে, কোন পরমাণু একটি কেন্দ্রক ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। কেন্দ্রক আবার প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত এবং প্রোটনের সংখ্যা ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর-কেন্দ্রকে বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন থাকে। ইলেকট্রন ও প্রোটন যথাক্রমে সমপরিমাণ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক তড়িৎ-যুক্ত। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—একটা কেন্দ্রক-এ দুই বা ততোধিক একই তড়িৎযুক্ত প্রোটন কিরূপে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে? সাধারণ তড়িৎ-চুম্বকীয় সূত্রানুযায়ী প্রোটনগুলির একই তড়িতাবেশের দরুণ বিকর্ষিত হয়ে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। উপরন্তু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা নিউট্রনও অন্যান্য কণিকা ইলেকট্রন বা প্রোটনের দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত না হয়ে কোন এক শক্তির বলে কেন্দ্রক-এ অবস্থান করে থাকে।

ডাঃ হিদেকী ইউকাওয়া

বিজ্ঞানী ইউকাওয়া এই সকল জটিল প্রশ্নের এক উপযুক্ত ব্যাখ্যা নির্ধারণ করলেন, তাঁর নব আবিষ্কৃত কেন্দ্রীন-শক্তির সাহায্যে। তিনি দেখালেন যে, কোন পরমাণুর কেন্দ্রক-এ প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি ছাড়া কেন্দ্রীন-শক্তি নামক এক বিশেষ প্রকারের শক্তি কাজ করে কেন্দ্রক-এর মধ্যস্থিত এক অতি অল্প দূরত্বের সীমার

মধ্যে (প্রায় ১০$^{-১৩}$ সেণ্টিমিটার)। এই অল্প দূরত্বের সীমার মধ্যে একই তড়িতাবেশের দুই বা ততোধিক কণিকার মধ্যে বিকর্ষণ অপেক্ষা উপরি-উক্ত কেন্দ্রীন শক্তির বলে তারা পরস্পর অধিক আকর্ষিত হয়। কিন্তু ঐ সীমার পরেই কেন্দ্রীন শক্তি খুব তাড়াতাড়ি কমে যায় এবং ২ থেকে ৩×১০$^{-১৩}$ সেণ্টিমিটার দূরে সে শক্তি প্রায় একেবারেই থাকে না।

ইউকাওয়া গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে আরও দেখালেন যে, কেন্দ্রক-এর মধ্যস্থিত প্রোটন-প্রোটন, নিউট্রন-নিউট্রন ও প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকার ভারী কণিকার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং এই ভারী কণিকার ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২০০ গুণ। এই কণিকা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে এবং এই তড়িতাবেশ প্রোটনের সমপরিমাণ। তাছাড়া এই কণিকা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষও হতে পারে। ইউকাওয়া এই ভারী কণিকার নাম দিলেন হেভি-ফটোন বা মেসন। স্থায়ী কেন্দ্রকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইউকাওয়া দেখালেন যে, কেন্দ্রকের একটা ধনাত্মক প্রোটন একটা ধনাত্মক মেসন উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কনসারভেশন অব চার্জ বা তড়িতাবেশের নিত্যতা সূত্রানুযায়ী প্রোটনটি একটি নিউট্রনে পরিণত হয়। এই সময়ে কেন্দ্রকস্থ একটি নিউট্রন সদ্যোৎপন্ন ধনাত্মক মেসনটিকে শোষণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ধনাত্মক প্রোটনে পরিণত হয়। এর ফলে কেন্দ্রক-এ প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা পূর্বের অনুরূপই থেকে যায়। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ঋণাত্মক মেসন দ্বারাও শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। একটি নিউট্রন একটি ঋণাত্মক মেসন নির্গত করে একটি প্রোটনে পরিণত হয় এবং কেন্দ্রকস্থ একটি প্রোটন ঐ ঋণাত্মক মেসনটিকে শোষণ করে একটি নিউট্রনে পরিণত হয়। আবার প্রোটন-প্রোটন, নিউট্রন-নিউট্রনের মধ্যে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ মেসনের সাহায্যে শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এইভাবে কেন্দ্রকস্থ প্রোটন ও নিউট্রনগুলির মধ্যে অনবরত ভারী কণিকা মেসনের মাধ্যমে শক্তির আদান-প্রদানের দরুণ প্রোটন ও নিউট্রন সহযোগে পরমাণু-কেন্দ্রক স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়।

পূর্বে যে মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত অতিভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন কণিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি যে ইলেকট্রন, পজিট্রন বা ফটোন নয় তা এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র ও পরীক্ষার মাধ্যমে। এখন কণিকাটি ইউকাওয়া বর্ণিত কণিকার সমভরসম্পন্ন, অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রায় ২০০ গুণ ভরসম্পন্ন কণিকা বলে ধারণা করা হতে লাগলো। দেখা গেছে, কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকার বিকিরণের দরুণ শক্তির ক্ষয় প্রাপ্তি কণিকাটির ভরের ৪ বর্গফলের ব্যস্ত-অনুপাতে কমে যায় $\left[R_{loss} \propto \frac{1}{m^4}\right]$।

সুতরাং এই থেকে বোঝা যায় যে, একটি সাধারণ ইলেকট্রনের শক্তির ব্যয় বিকিরণের দরুণ যতখানি হবে, তার তুলনায় উপরিউক্ত ভারী কণিকার শক্তি-ব্যয় কয়েক লক্ষ গুণ কম হবে—যার জন্যে প্রপাত-বর্ষণেরও সৃষ্টি হবে না, অর্থাৎ আয়নীকরণের দরুণ শক্তি-ব্যয়ের তুলনায় এতই কম হবে যে, তাকে অতি নগণ্যরূপে বাদ দেওয়া যেতে পারে। সে জন্যে ভারী কণিকা কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার শক্তিব্যয় প্রধানতঃ আয়নীকরণের দরুণ হয়। আবার কণিকার বেগ অত্যন্ত বেশী হলে তার আয়নীকরণের দরুণ শক্তিব্যয়ও কম হয়। অতএব যে কণিকা কয়েক মিটার পুরু সীসার পাত্ ভেদ করতে সক্ষম, সেটি যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশ কয়েক গুণ ভারী হবে—সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এখন এই কণিকার সঠিক ভর কত, তা নির্ণয় করবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব টেক্নোলজিতে অ্যাণ্ডারসন ও

নেদারমেয়ার এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্ট্রীট্ ও ষ্টীভেনসন নামক বিজ্ঞানীরা স্ব স্ব প্রচেষ্টায় প্রায় একই সময়ে এই ভারী কণিকার ভর নির্ণয় করেন। কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকার মোমেণ্টাম বা ভরবেগ এবং বেগ নির্ণয় করা গেলে তার ভর নির্ধারণ করা যায়। অ্যাণ্ডারসন, নেদারমেয়ার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা একটি মেঘকক্ষকে শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করে আপতিত ভারী কণিকার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। তাঁরা আলোকচিত্রে অঙ্কিত কণিকা-রেখার কারভেচার বা বক্রতার পরিমাণ এবং আয়নীকরণের হার নির্ণয় করেন। এই থেকে কণিকার ভর নির্ণয় করে দেখা গেল, তা ইলেকট্রনের ভরের ১০০ থেকে ২০০ গুণ, অর্থাৎ ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী, কিন্তু প্রোটন অপেক্ষা হাল্কা। তখন এই কণিকার নাম দেওয়া হলো মেসোট্রন বা মেসন, অর্থাৎ মাঝামাঝি ভরবিশিষ্ট এক কণিকা।

মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত মেসন নামক এই মৌলিক কণিকার আবিষ্কারের পর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কণিকাটি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। পারমাণবিক বিজ্ঞানে কেন্দ্রকের অন্তর্নিহিত শক্তির অজ্ঞাত রহস্যের অন্তরালে মেসনের ভূমিকা যে অন্যতম, এই আশা বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করে তোলে। এর ফলে মেসনের বিভিন্ন ধর্ম, আয়ুষ্কাল, প্রকার ভেদ ইত্যাদি অনেক কিছু পর পর আবিষ্কৃত হতে থাকে।

মেসন এক অস্থায়ী কণিকা। এক সেকেণ্ডের কয়েক লক্ষ ভাগ পরে এটি একটি ইলেকট্রন বা পজিট্রনে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে মেঘকক্ষে মেসনের অনেকগুলি আলোকচিত্র গ্রহণ করে অঙ্কিত কণিকা-রেখা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, মেঘকক্ষের যেখানে মেসন কণিকার রেখাটি শেষ হয়েছে সেখানে রেখাটি বেশ প্রশস্ত হয়েছে। এই শেষ অংশ থেকে অপর একটি অপেক্ষাকৃত সরু ও একেবারে ঋজুরেখা বেরিয়ে এসেছে—যেটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ মেসনটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা তড়িতাবিষ্ট কণিকা ইলেকট্রন বা পজিট্রনে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় মেসনের স্থিতি-ভর বা 'রেষ্ট মাস' কমে যাওয়ার দরুণ প্রচণ্ড শক্তি সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং সেই শক্তি প্রায় আলোকের গতিসম্পন্ন হয়ে নয়ট্রিনো নামক আর একটি অতি হাল্কা কণিকায় পরিণত হয়।

শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত মেঘকক্ষে মেসনের আলোকচিত্র নিয়ে দেখা গেছে, মেসন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হতে পারে। তড়িতাবেশের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী সেই কারণে একটি ঋনাত্মক মেসন তার অল্প আয়ুষ্কাল পরে একটি ইলেকট্রনে এবং একটি ধনাত্মক মেসন একটি পজিট্রনে পরিণত হয়।

মেসনের গড় আয়ুষ্কাল নির্ণয় করবার বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কোন মৌলিক কণিকার গড় আয়ুষ্কাল কথাটির অর্থ, ঐ প্রকার কণিকা হাল্কা কণিকাতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে গড়ে তার সময় কত লাগে, তা বোঝায়। সাধারণতঃ অস্থায়ী মৌলিক কণিকার গড় আয়ুষ্কাল অতি অল্প এবং সে জন্যে এটি নির্ণয় করাও বেশ কঠিন। কতকগুলি গাইগার-মুলার কাউণ্টারকে কয়েন্সিডেন্স ও অ্যান্টিকয়েন্সিডেন্স সারকিট অনুযায়ী স্থাপন করে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মেসনের গড় আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। বর্তমানে এক বিশেষ ধরণের লিকুইড সিণ্টিলেটর ও ফটোমাল্টিপ্লায়ারের সাহায্য গ্রহণ করে একই সঙ্গে পাই-মেসন ও মিউ-মেসনের গড় আয়ুষ্কালের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানকালে কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয়ে ফটোগ্রাফিক ইমালসন বা অবদ্রবের দান অন্যতম। কোন তড়িতাবিষ্ট কণিকা যদি ফটোগ্রাফিক ইমালসনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রেন বা কণার মধ্য দিয়ে যায় তাহলে সেটি

ডেভেলপ করবার পর দেখা যায়, পথিমধ্যস্থ গ্রেন-গুলি কালো-বর্ণ ধারণ করেছে, অর্থাৎ কণিকার পথি-মধ্যস্থ ইমালসনের অণু-পরমাণুগুলি আয়নিত হয়েছে। এইভাবে আলোক চিত্রে কণিকা-সৃষ্ট একটি সুস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার কণিকা বিভিন্ন প্রকার রেখা সৃষ্টি করে। তবে ইমালসনে এই সব রেখার দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অল্প এবং সেজন্যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কণিকা-রেখা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ রেখা থেকে তার শক্তি এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কালো হয়ে যাওয়া গ্রেনের সংখ্যা থেকে গতিবেগ নির্ণয় করা যায়। একটি গতিশীল কণিকা ক্রমশঃ শক্তি ক্ষয় করে, অর্থাৎ তার বেগও কমে যায়। যত বেগ কমে যায় তত কণিকার আয়নী-করণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বেশী সংখ্যক গ্রেন কালো বর্ণের হয়ে যায়। এইভাবে কণিকার ভর নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই ফটো-গ্রাফিক ইমালসনের প্রচুর উন্নতিসাধন করা হয়েছে,
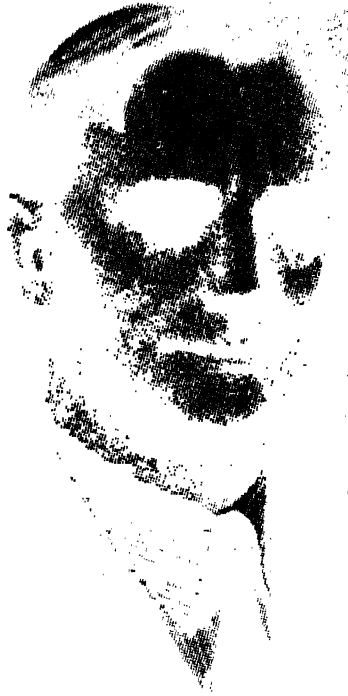
অধ্যাপক সি. এফ. পাওয়েল

কয়েকটি বিশেষ সুবিধা হলো এই যে, একই প্লেটে অসংখ্য সম্পূর্ণ রেখা অঙ্কিত হতে পারে। অতি শক্তি-শালী কণিকার দৈর্ঘ্য মেঘকক্ষ অপেক্ষা ফটোগ্রাফিক ইমালসন ভালরূপে নির্দেশ করতে পারে। তাছাড়া একটি প্লেটকে অধিক সময়ব্যাপী পরীক্ষা-কার্যে নিয়োগ করে কোন কণিকার উৎপত্তি থেকে তার বিভিন্ন রূপান্তরও প্লেটে ধরা পড়ে। একটি কণিকার যার ফলে বিভিন্ন নতুন কণিকার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী সি. এফ. পাওয়েল এক বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফিক ইমালসন প্রস্তুত করে তাতে মেসন-রেখা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি এক সময় লক্ষ্য করেন যে, ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে যাওয়া একটি অনুভূমিক রেখা

যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আর একটি নতুন ভিন্ন সরু রেখা বেরিয়ে এসেছে এবং রেখাটি ফটোগ্রাফিক প্লেটেই শেষ হয়েছে। উপরন্তু দ্বিতীয় রেখার শেষ থেকে আর একটি রেখাও বের হয়েছে যেটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন দ্বারা অঙ্কিত। বিজ্ঞানী পাওয়েল বহু পরীক্ষা করে দেখলেন যে, দ্বিতীয় রেখাটির দৈর্ঘ্য সব সময়েই সমান থাকে, অর্থাৎ এমন এক কণিকা দ্বারা সেটি সৃষ্ট, যার শক্তি সর্বদাই সমান

পাই-মেসনের মিউ-মেসন ও ইলেট্রনে রূপান্তর (ফটোপ্লেটে গৃহীত)।

(প্রায় ৪ মি. ই. ভো.)। আবার, যেহেতু কণিকা-রেখার 'থিকনেস' বা ঘনত্ব প্রাথমিকভাবে

কণিকার ভরের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং দ্বিতীয় রেখাটি যে কণিকা দ্বারা সৃষ্ট তার ভর প্রথম রেখার কণিকার ভর অপেক্ষা কম। প্রথম দুটি রেখা থেকে কণিকা দুটির শক্তি ও বেগ নির্ণয় করে তাদের ভর নির্ণয় করা হলো। দেখা গেল, প্রথম কণিকার ভর ইলেকট্রনের ভরের ২৭৬ গুণ এবং দ্বিতীয় কণিকাটির ভর পূর্বোক্ত মিউ-মেসনের সমান, অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরের ২১২ গুণ। প্রথমোক্ত কণিকার নাম দেওয়া হলো পাই-মেসন। পাই-মেসন তার অল্প আয়ুষ্কাল ($২\cdot৬ \times ১০^{-৮}$ সেকেণ্ড) পরে মিউ-মেসনে পরিণত হয়। কিন্তু ভরবেগের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী মিউ-মেসনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হাল্কা কণিকা বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এই কণিকা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, সুতরাং সেটি ফটোগ্রাফিক ইমালসনে কোন রেখা অঙ্কিত করে না। এই কণিকার নাম নয়ট্রিনো। আবার ইমালসনে যেখানে দ্বিতীয়, অর্থাৎ মিউ-মেসন রেখা শেষ হয়েছে সেখান থেকে আর একটি রেখা বের হয়েছে সেটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন কর্তৃক অঙ্কিত। প্রমাণিত হয়েছে যে, মিউ-মেসন একটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন ও দুটি নয়ট্রিনোতে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী গার্ডনার ও ল্যাটেস সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে পাই-মেসন উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। আল্‌ফা-কণিকাকে সিনক্রোসাইক্লোট্রন যন্ত্রের দ্বারা ৩০০ মি. ই. ভো.-এরও অধিক শক্তি-সম্পন্ন করে বেরিলিয়াম, কার্বন, কপার, ইউরেনিয়াম প্রভৃতিকে আঘাত করলে পাই-মেসন উৎপন্ন হয়। আল্‌ফা-কণিকার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেসনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেখা যায়। চুম্বক-ক্ষেত্রে এই মেসনের বক্রতার দিক ও গতিপথের পরিমাপ নির্ণয় করে মেসনের তড়িতাবেশ ও ভর নির্ণয় করা সম্ভব। দেখা গেছে, পাই-মেসন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে এবং তারা প্রত্যেকেই ইলেকট্রনের ২৭৬ গুণ ভরসম্পন্ন। উপরন্তু অধুনা নিউট্র্যাল পাই-মেসনের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এরা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, সুতরাং তাদের আয়নীকরণের ক্ষমতা না থাকায় ফটোগ্রাফিক ইমালসনে কোন রেখা অঙ্কিত করে না—সে জন্যে অন্য একপ্রকারে এদের অস্তিত্ব নির্ণয় করা হয়ে থাকে। নিউট্র্যাল পাই-মেসনের ভর ইলেকট্রনের ২৬৪ গুণ (অর্থাৎ সাধারণ পাই-মেসনের কিছু কম) এবং এটি অল্প আয়ুষ্কাল (৩×১০^{-১৪} সেকেণ্ড) পরে প্রায় ১০০ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন গামা কোয়াণ্টাতে পরিণত হয়।

পাই-মেসন আবিষ্কারের পর এই সম্বন্ধে আরও উন্নত ধরণের গবেষণা চলতে থাকে। বিজ্ঞানী পাওয়েল ও অচিয়ালিনি ফটোগ্রাফিক ইমালসনে পাই-মেসনের রেখা পরীক্ষাকালীন একটি বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করেন। তাঁরা দেখেন যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে পাই-মেসন রেখা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই বিন্দু থেকে কয়েকটি প্রোটন ও আল্‌ফা-কণিকার রেখা বের হয়েছে। এই থেকে তাঁরা স্থির করেন যে, পাই-মেসন প্রচণ্ড শক্তি সহযোগে ইমালসনের কেন্দ্রক ভেদ করে কেন্দ্রকটি ভেঙে দেয় এবং তখন কেন্দ্রকস্থ প্রোটন, নিউট্রন (নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হওয়ার ফলে তার রেখা অঙ্কিত হয় না) ও আল্‌ফা-কণিকা নিক্ষিপ্ত হয় চতুর্দিকে—যেন মনে হয়, একটি তারকার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসন' বা কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ। এই প্রক্রিয়ার ফলে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি পরমাণুর কেন্দ্রক পাই-মেসন কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণার পর তাঁরা দেখালেন যে, পাই-মেসন সক্রিয়-কেন্দ্রীন কণিকা বা নিউক্লিয়ার অ্যাক্টিভ পারটিকল্‌। ধীর ও দ্রুত বেগসম্পন্ন পাই-মেসন ভিন্নরূপে কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটায়। দেখা গেছে, এরূপ কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাতে বেশী সক্ষম ঋণাত্মক পাই-মেসন, কারণ ঋণাত্মক পাই-মেসন ধনাত্মক কেন্দ্রক কর্তৃক আকর্ষিত হয়। সে জন্যে ধীর গতিসম্পন্ন ঋণাত্মক পাই-মেসনও

কেন্দ্রক ভেদ করে তাকে ভাঙতে সক্ষম। কিন্তু ধনাত্মক পাই-মেসন কেন্দ্রক কর্তৃক বিকর্ষিত হয়; সুতরাং কেন্দ্রক ভেদ করতে তার প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়। সে জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে, ধনাত্মক অপেক্ষা ঋণাত্মক পাই-মেসন কর্তৃক পরমাণু কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ ঘটে থাকে।

পাই-মেসন যেমন কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত অতি শক্তিশালী প্রোটন, আল্‌ফা-কণিকা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন পরমাণুর ভারী ও হাল্‌কা কেন্দ্রকও ভেঙে যায় এবং কেন্দ্রক থেকে অন্যান্য কণিকার সঙ্গে পাই-মেসনও নির্গত হতে দেখা যায়। কিন্তু মিউ-মেসন কেন্দ্রকের রূপান্তর সাধনে একবারেই সমর্থ নয় বললেই হয়। অতি শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকার দ্বারা কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাই-মেসন উৎপন্ন হতে দেখা গেছে; কিন্তু মিউ-মেসন উৎপন্ন হতে দেখা যায় না। সে জন্যে মিউ-মেসনকে নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রীন কণিকা বা 'নিউক্লিয়ার ইনঅ্যাক্টিভ পারটিক্‌ল্‌' বলা হয়।

পাওয়েল, অচিয়ালিনি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে পাই-মেসন, মিউ-মেসন অপেক্ষা আরও কয়েকটি ভারী মেসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব ভারী-মেসন খুবই অস্থায়ী এবং অল্প আয়ুষ্কাল পরেই পাই-মেসন, মিউ-মেসন, ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনে পরিণত হয়। আধুনিক কালে আবিষ্কৃত কয়েকটি এমনি ভারী মেসন সম্বন্ধে সামান্য বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

(১) থিটা-মেসন—এটি ইলেকট্রনের প্রায় ৮০০ গুণ ভরবিশিষ্ট। এটি নিউট্র্যাল বা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে এবং অল্প আয়ুষ্কাল (~১০$^{-১০}$ সেকেণ্ড) পরেই পাই-মেসনে পরিণত হয়।

(২) কে-মেসন—এটি ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ১২৫০ গুণ এবং উভয় প্রকার তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে। অল্প আয়ুষ্কাল (~১০$^{-৯}$ সেকেণ্ড) পরে এটি পাই-মেসন ও নিউট্র্যাল থিটা-মেসনে পরিণত হয়।

(৩) ট-মেসন—ইলেকট্রনের ৯৭০ গুণ ভর-বিশিষ্ট। উভয় প্রকার তড়িৎ-যুক্ত হয়ে থাকে এবং অল্প আয়ুষ্কাল (~১০$^{-৮}$ সেকেণ্ড) পরে পাই-মেসনে পরিণত হয়।

(৪) কাপ্পা-মেসন—ইলেকট্রনের প্রায় ১২৫০ গুণ ভরসম্পন্ন এবং ঋণাত্মক বা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিভিন্ন প্রকার মেসনের ন্যায় (যাদের ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যবর্তী) ইলেকট্রনের ১৮৩৬ ও ৩৬৭২ ভরসম্পন্ন যথাক্রমে প্রোটন ও ডয়টেরনের মধ্যবর্তী ভরবিশিষ্ট হাইপারন নামক আর এক শ্রেণীর ভারী কণিকার সন্ধানও পাওয়া গেছে। এদের প্রকার অনুযায়ী অনেক সময় ল্যাম্‌ডা ও ওমেগা কণিকা বলা হয়ে থাকে। হাইপারনও খুব অস্থায়ী কণিকা এবং অল্প আয়ুষ্কাল (~১০$^{-১০}$ সেকেণ্ড) পরে এটি একটি প্রোটন বা নিউট্রন ও একটি পাই-মেসনে পরিণত হয়।

পূর্বোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করে এখন বলা যেতে পারে যে, মেসন প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত নয়। প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি প্রধানতঃ প্রোটন, আল্‌ফা-কণিকা দ্বারা গঠিত। এছাড়া আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ভারী কেন্দ্রকও প্রাথমিক রশ্মিতে দেখা দেখা যায়। এই সব প্রোটন, ভারী কেন্দ্রক প্রভৃতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুমণ্ডলস্থ বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষিত হয় এবং তার ফলে কেন্দ্রকগুলির বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। কেন্দ্রকের এই বিস্ফোরণের দরুণ পুনরায় প্রোটন, আল্‌ফা-কণিকা, ভারী মেসন, হাইপারন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার এই সকল নবোৎপন্ন কণিকা নতুন নতুন পরমাণু-কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়।

এভাবে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কেন্দ্রকের বিস্ফোরণের দরুণ যে সব ভারী মেসন উৎপন্ন হয় তারা আবার পাই-মেসন, মিউ-মেসন ও পরে ইলেকট্রন, পজিট্রন প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে, সমুদ্রতলে মহাজাগতিক রশ্মির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ হলো মেসন। আবার মেসন তার অতি অল্প আয়ুষ্কালের জন্যে বাতাসের মধ্য দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। অতএব এই থেকেও ধারণা করা যায় যে, মেসন প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত নয়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পারমাণবিক কেন্দ্রক থেকে মেসন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মেসন ও হাইপারন সম্বন্ধে অনেক বিষয় আছে, যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানাগারে প্রোটনকে ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তিসম্পন্ন করে এদের কৃত্রিমভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করা যাবে এবং তখন এদের বিভিন্ন ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বিষয় উদ্ঘাটিত হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীন শক্তির সঙ্গে মেসনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। যে কেন্দ্রীন শক্তি সম্বন্ধে জটিল ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের নিকট মায়াজাল সৃষ্টি করে আছে, মেসন সম্পর্কিত অনাবিষ্কৃত উন্নত তথ্যসমূহ অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো তাকে দূরীভূত করতে সক্ষম হবে।
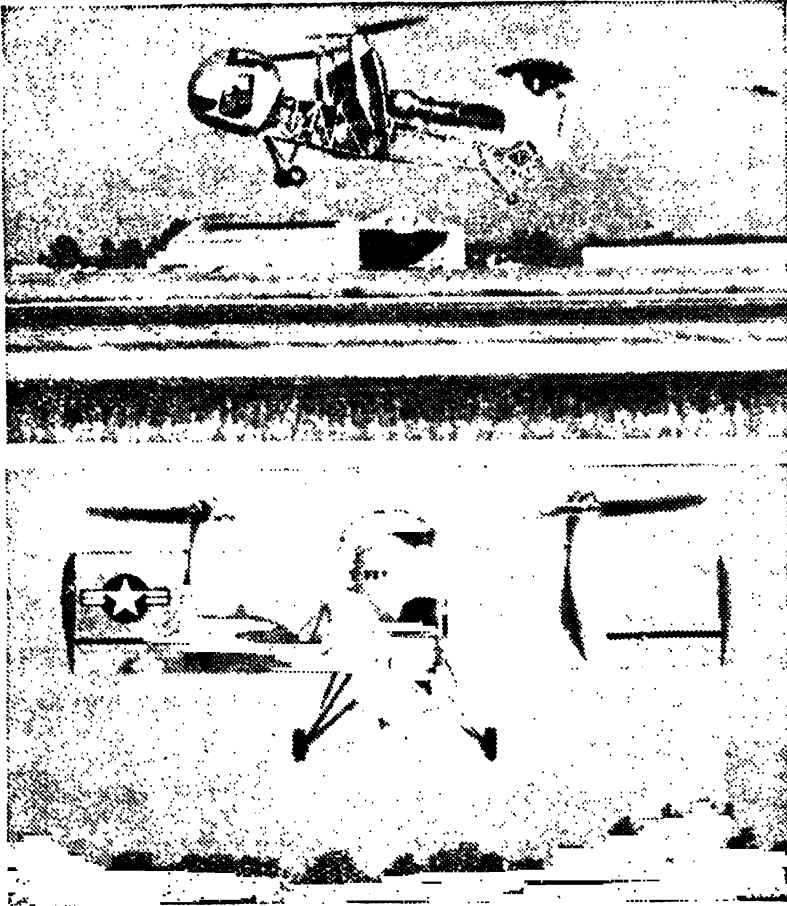
যুক্তরাষ্ট্রের নূতন ধরণের বিমান, ভারটোল-৭৬। এই বিমানের ডানা দুটি হেলানো। ভারটোল-৭৬ হেলিকপ্‌টারের ন্যায় ওঠা-নামা করতে পারে এবং এর গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০ মাইল।

আলোকের চাপ

শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী

আলো কোন বস্তুর উপর পড়লে সেখানে একটা চাপ দেয়। সাধারণতঃ এটা আমরা বুঝতে পারি না, কারণ এই চাপের পরিমাণ খুবই কম। দশ লক্ষ ফ্লাশলাইটের আলো এক সঙ্গে যে ধাক্কাটা দেবে, তা বড় জোর একটা ডাক টিকিটের ওজন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

গত শতাব্দীর শেষপাদে বিভিন্ন পরীক্ষায় আলোকের তরঙ্গবাদ নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। পুকুরে স্থির জলের উপর এক টুক্‌রা ঢিল ছুড়লে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এই ঢেউ উঁচু-নীচু হয়ে চারদিকে চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়লেও এর সঙ্গে এক বিন্দু জলও কিন্তু এগিয়ে যায় না। এটা প্রমাণ করবার জন্যে এক টুক্‌রা কর্ক এই ঢেউয়ের উপর ছেড়ে দিলে দেখা যাবে—তরঙ্গের তালে তালে কর্কটি ওঠা-নামা করছে বটে, কিন্তু ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, ঢেউয়ের সঙ্গে একটুকুও না এগিয়ে। জেনে রাখা দরকার, একটি তরঙ্গের শীর্ষ থেকে নিকটতম আরেকটি শীর্ষের দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

আলোর তরঙ্গবাদের বক্তব্য হলো এই যে, আলো শক্তির অনুরূপ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তরঙ্গের অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন একটি মাধ্যম বা মিডিয়ামের—পুকুরে যেমন জল। আলোকরশ্মি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য জায়গা দিয়েও অনায়াসে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা তাই কল্পনা করে নিলেন—নিখিল বিশ্ব জুড়ে রয়েছে এক অদৃশ্য মাধ্যম; এর নাম দেওয়া হলো ঈথার। কাজেই তরঙ্গ-তত্ত্ব অনুসারে আলোক এই সর্বব্যাপী ঈথার-সমুদ্রে শক্তির ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোকের উৎস থেকে এই ঢেউগুলি চক্রাকারে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শক্তির এই তরঙ্গগুলি নানা আকারের হতে পারে। খুব বড়, যেমন—বেতার তরঙ্গ (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দশ থেকে কয়েক শত মিটার পর্যন্ত) কিংবা খুব ছোট, যেমন—এক্স-রে (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ), তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত গামারশ্মি (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $১০^{-৮} – ১০^{-১০}$ সেঃ মিঃ), মহাজাগতিক রশ্মি (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $১০^{-১০} – ১০^{-১৩}$ সেঃ মিঃ)। এই বিরাট সীমানার মধ্যে একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ (যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪০০০ থেকে ৮০০০ Å, (১Å = $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ) আমাদের চোখের রেটিনাতে সাড়া জাগাতে পারে। এই অংশটাকেই সাধারণতঃ আমরা আলোক বলে থাকি। ৪০০০ থেকে ৮০০০ Å-এর মধ্যেই আবার লুকিয়ে আছে ইন্দ্রধনুর অতি পরিচিত সাতটি রং। এক প্রান্তে বেগুনী অন্য প্রান্তে লাল। বেগুনীর সীমানা ডিঙ্গিয়ে, অর্থাৎ ৪০০০ Å-এর নীচে অতি বেগুনী এবং নামতে নামতে শেষে আসবে রঞ্জেন রশ্মি, গামারশ্মি ও মহাজাগতিক রশ্মি। লালের সীমারেখা (৮০০০ Å) থেকে উজান বেয়ে অবলোহিতের (Infra red) দেশ ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে চললে তাপ-তরঙ্গ, রেডার-তরঙ্গ, টেলিভিসন-তরঙ্গ—অবশেষে বেতার-তরঙ্গের দেখা মিলবে। কাজেই গামারশ্মি, বেতার-তরঙ্গ, অবলোহিত কিংবা অতিবেগুনী রশ্মি যাই হোক না কেন, এগুলির সঙ্গে আমাদের তথাকথিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছাড়া মূলতঃ আর কোনই প্রভেদ নেই। ঈথারের মধ্য দিয়ে এরা প্রত্যেকে একই গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল

অথবা ৩×১০^{১০} সেঃ মিঃ) এগিয়ে চলে। কাজেই আলোকের চাপ, এই কথার মধ্যে আলোক কথাটা অনেক বিস্তৃত অর্থে ধরতে হবে। ইংরেজীতে Radiation-এর যা মানে, সেই অর্থে।

১৮৭৩ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখালেন যে, তরঙ্গ-তত্ত্ব থেকে আলোকের চাপের কারণ বেশ বোঝানো যায়। এ নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করবো না, বরং আলোকের আধুনিক কণাবাদ (Photon Theory of Light) থেকে আলোকের চাপ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাই আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো।

আগে কণাবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরকার। এই শতকের প্রথম দিকে প্রকৃতির রাজ্যে এমন কতকগুলি ঘটনার বিষয় জানা গেল, যা তরঙ্গ-তত্ত্ব থেকে মোটেই বোঝানো যায় নি। প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দেখালেন যে, যদি আমরা আলোককে চলমান শক্তি-কণিকার সমষ্টি বলে ধরে নিই, তবে এই সব ঘটনার কারণ সহজেই বেরিয়ে আসে। একতাল মৌলিক পদার্থ যেমন একই রকমের অসংখ্য পরমাণু দিয়ে তৈরী, তেমনি নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি রশ্মিও একই প্রকার অগণিত শক্তি-কণিকার সমবায়ে গঠিত। অবিভাজ্য এই শক্তি-কণিকার নাম দেওয়া হলো ফটোন। আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট, ফটোনের শক্তির মানও তত বেশী। ফটোন-তত্ত্বের আরও একটা সুবিধা হলো এই যে, এর জন্যে ঈথার-সমুদ্রের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। পদার্থের টুক্‌রা ছুড়ে দিলে যেমন বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও অনায়াসে ছুটে চলে, শক্তি-কণিকা বা ফটোনও তেমনি আলোকের গতিতে অনায়াসে এগিয়ে যাবে। এটা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯০৫ সালে মাইকেলসন ও মর্লি এক যুগান্তকারী পরীক্ষায় ঈথারের অনস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করেন।

এদিকে আবার আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব মিলিয়ে এটা দেখানো যায় যে, ফটোন যদিও মূলতঃ শক্তি-কণিকা, তথাপি চলমান ফটোনের একটা ভর থাকতে বাধ্য।

$$\text{এই ভরের মান} = \frac{\text{প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক}}{\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য} \times \text{আলোর গতি}} \quad (১)$$

প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান খুবই ছোট (৬×১০^{-২৭} আর্গ-সেকেণ্ড)। আলোর গতি আবার তেমনি বড়। কাজেই উপরের সমীকরণ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ফটোনের ভরও খুব কম।

যতই কম হোক, ভর যখন আছে তখন আলোক-রশ্মি, অর্থাৎ ফটোনপুঞ্জ পথের বাধার উপর আঘাত হানবেই, চাপ দেবেই। এটাও লক্ষণীয় যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বড়, ভরের মান—অতএব চাপের পরিমাণ ততই কম (১নং সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। বেতার তরঙ্গের চাপ হবে সব চেয়ে কম, মহাজাগতিক রশ্মির হবে সবচেয়ে বেশী।

একটা মজার ব্যাপার হলো—উপরে (১) নম্বর সমীকরণে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গবাদ মেনে নেওয়া হচ্ছে। অথচ এদিকে আবার আলোককে চলমান ফটোন-পুঞ্জ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তবে কি দুটাই সত্য? আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বাধ্য হয়েই তাই মেনে নিয়েছেন। হেঁয়ালীর মত শোনালেও আলোর এই দ্বৈত স্বভাব, প্রকৃতির রাজ্যের অন্যতম প্রধান সত্য। আধুনিক পদার্থ-বিদ্যায় এর ফলাফলও সুদূরপ্রসারী।

যাহোক, আলোর চাপের ব্যাখ্যা মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এই চাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এসব তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। কিন্তু গবেষণাগারে এর প্রমাণ ১৯০১ সালের আগে পাওয়া যায় নি। ১৯০১ সালে মস্কোয় লেবেডভ এবং আমেরিকায় নিকোলাস ও হল প্রায় একই সময়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে এই চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

প্রকৃতির রাজ্যে এই চাপের দৃষ্টান্ত অনাদিকাল

থেকে রয়েছে ধূমকেতুতে। ধূমকেতুর পুচ্ছটি মূলদেহ থেকে সব সময় সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত থাকে। এই পুচ্ছ উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থের অত্যন্ত পাত্‌লা স্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ কেপ্‌লার ১৬১৯ সালেই অনুমান করেছিলেন যে, সূর্যরশ্মির চাপই ধূমকেতুর পুচ্ছকে সব সময় সূর্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়—মৃদু হাওয়ার আঘাতে অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্থিত ধোঁয়া যেমন হয়ে থাকে। আধুনিক গাবষণায় কেপলারের এই মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়েছে। সূর্যদেহ থেকে আলোক রশ্মি, অর্থাৎ ফটোনের দল বেরিয়ে ক্রমেই দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। পথের বাধা ধূমকেতুর পুচ্ছটিকে আঘাত করে নিজেদের চলার পথ, অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পুচ্ছটিতে পদার্থের পরিমাণ খুব কম হওয়ার জন্যেই সূর্যালোকের সামান্য চাপেই এটা আলোর পথে বেঁকে যায়।

জলন্ত নক্ষত্রদেহে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারেও আলোকের চাপ এক উল্লেখযোগ্য শক্তি। সেখানে প্রতিটি পদার্থবিন্দুই অত্যুজ্জল আলো বিকিরণ করছে; কাজেই তার পাশের বিন্দুটিকে চাপ দিচ্ছে। এই চাপের পরিমাণ যথেষ্ট এবং অনেক সময় নক্ষত্রদেহের বায়বীয় চাপের কয়েক শতাংশ।

পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি যে চাপ দিচ্ছে, তার পরিমাণ প্রায় ১০০,০০০ টন। কিন্তু সূর্যের মহাকর্ষ এর কোটি কোটি গুণ শক্তিতে পৃথিবীকে অহরহ টানছে। অতএব সূর্য-রশ্মির চাপে পৃথিবীর মহাশূন্যে ছিট্‌কে পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমাদের পৃথিবী আরও কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য প্রদক্ষিণের পথে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাবে।
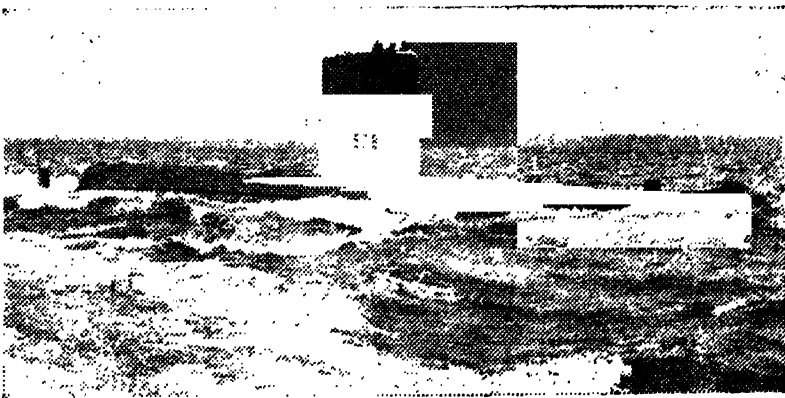
যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি-চালিত তৃতীয় ডুবোজাহাজ ‘স্কেটের’ দৃশ্য।

বায়ুস্তরে আয়নমণ্ডলী

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী কুলম্ব্ সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন বা বিদ্যুৎ পরিবাহিতার বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বায়ুকণা অথবা ধূলিকণাসমূহ কোন তড়িতান্বিত বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে বিদ্যুতান্বিত হয় এবং পরক্ষণেই তড়িতাবিষ্ট নতুন কণা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। কুলম্ব্-এর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা এস্‌লার, জিটেল, উইলসনও বায়ুমণ্ডলে আয়নের অবস্থার বিষয় আবিষ্কার করেন।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুকণা বা ধূলিকণার অণুগুলি ভেঙে গিয়ে আয়ন উৎপন্ন হয়। এই আয়নগুলির কিছু পজিটিভ, কিছু নেগেটিভ। যে সব অণু আমরা দেখে থাকি, সেগুলি তড়িদ্বিহীন বা নিউট্র্যাল; কারণ পজিটিভ নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সমপরিমাণ নেগেটিভ-ধর্মী ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই কোন পরমাণুকে বিদ্যুতান্বিত করবার অর্থ হচ্ছে, ইলেকট্রনগুলিকে জোর করে বাইরে নিয়ে আসা অথবা ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। প্রথমোক্ত কারণে পজিটিভ এবং দ্বিতীয় কারণে নেগেটিভ পরমাণু সৃষ্টি হয়।

আয়ন পরিবহনের প্রকৃতি নিরূপণ করবার জন্যে এক্স-রে থেকে প্রস্তুত আয়ন নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই আয়নগুলি প্রকৃতিতে অবস্থিত আয়ন থেকে খুব বেশী পৃথক চরিত্রের নয়, যদিও এই প্রাকৃতিক আয়নমণ্ডলী তড়িৎ-পরিবাহিতার জন্যে মূলতঃ দায়ী।

বায়ুস্তরে নানাপ্রকার আয়নের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(১) ক্ষুদ্রাকার আয়ন। এর গতিশীলতা ১.০ থেকে ২.০ সেন্টিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গতিশীলতার প্রকৃত মান আর্দ্রতা, চাপ, অন্যান্য বস্তুর উপস্থিতি ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে যে, একই অবস্থায় নেগেটিভ আয়নের গতিশীলতা পজিটিভ আয়নের চেয়ে বেশী। মুক্ত (Free) ইলেকট্রনগুলির গতিশীলতা (Mobility) সাধারণ আয়নের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আল্‌গা হয়ে থাকা ইলেকট্রনের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে আসা স্বাভাবিক যে, ক্ষুদ্রাকার আয়নগুলি দেখতে কি রকম? যদি একটি আয়ন কেবলমাত্র একটি বেশী বা কম সংখ্যক ইলেকট্রন সমন্বিত অণু হতো এবং যদি আর্দ্রতা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হতো তবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়নের গতিশীলতা একই রকমের হবে। প্রকৃতপক্ষে পজিটিভ আয়ন নেগেটিভ আয়নের চেয়ে নিম্ন গতিশীলতাসম্পন্ন। সেহেতু ধারণা করা সম্ভব যে, পজিটিভ আয়ন সাধারণ একক অণু (Single molecule) থেকে অনেক জটিল ধরণের। ক্ষুদ্রাকার আয়ন একটি আয়নিত অণু এবং তার চারপাশে কয়েকটি অণুর গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। ক্ষুদ্রাকার আয়নের ভর ১০।১২টি জলের অণুর সমান। এই আয়নের ভর একটি অক্সিজেন অণুর সমান। জলের অণুকে অতি সহজেই সমবর্তিত (polarize) করা যায়। ফলে যেখানে এরা অধিক সংখ্যায় থাকে, সেখানে সহজেই আয়নিত অণুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রাকার আয়ন ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

লাঁজভাঁ বৃহদাকার আয়ন আবিষ্কার করেন। এই বৃহদাকার আয়নগুলির গতিশীলতা '০০০৩ এবং '০০৮ এর মধ্যে। এদের একক (Unit) একই প্রকারের, কিন্তু গতিশীলতা কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ। এই বিভাগ আয়নের আকৃতি অনুসারে করা হয়েছে। গড়পড়তায় বৃহদাকার আয়নের গতিশীলতা ক্ষুদ্রাকার আয়নের চেয়ে $\frac{১}{৩০০}$ গুণ। ক্ষুদ্রাকার আয়ন অণুর আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু বৃহদাকার আয়নের আকৃতি এইটকেন কেন্দ্রকের মত। এইটকেন কেন্দ্রকের ব্যাসার্ধ ৩×১০^{-৬} সে. মি.।

আর একপ্রকার আয়নের সন্ধান পাওয়া গেছে — যার গতিশীলতা বৃহদাকার ও ক্ষুদ্রাকার আয়নের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ০'০১ থেকে ০'১ এর মধ্যে। সে জন্যে পোলক এর নাম দেন মাধ্যমিক আয়ন। মাধ্যমিক আয়ন অতি সামান্য আর্দ্রতায় থাকতে পারে। তবে আর্দ্রতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এরা অদৃশ্য হয়। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে —এদের গতিশীলতা ০'২ থেকে নীচে $১০^{-৩}$-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ এই মাধ্যমিক আয়ন কণিকাগুলিকে সালফিউরিক অ্যাসিডের কণিকা বলে মনে করা হয়। এই শ্রেণীর আয়নের আকৃতি $৩'৬ \times ১০^{-৭}$ সে. মি. ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট আয়নের কয়েক গুণ, প্রায় ২০০০ অণুর মত। নিম্ন আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রায় এরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর আয়ন কেবলমাত্র শিল্পাঞ্চলে (যেখানে ধোঁয়ার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের কণিকা থাকে) পাওয়া যায়।

নানা ধরণের আয়ন ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ-বিহীন এক ধরণের কণিকা আছে। এদের আকৃতি সাধারণতঃ বৃহদাকার আয়নের মত। এইটকেনের আবিষ্কারের ফলে এই কণিকাগুলির নাম হয়েছে এইটকেন নিউক্লিয়াস। বায়ুস্তরে যে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণা হয়, তা স্থূলাকার ধূলিকণা বা ধূমকণার উপরে হয় না। কেবলমাত্র এইটকেন কেন্দ্রক এবং অন্যান্য বিদ্যুতান্বিত কেন্দ্রক বা বৃহদাকার আয়ন-মণ্ডলীর উপর এই ঘনীভবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। জলে দ্রবীভূত হয়, এরূপ পদার্থের দ্বারা এইটকেন নিউক্লিয়াস গঠিত। অনেক ক্ষেত্রে এরা জলাকর্ষী বস্তুর দ্বারা গঠিত। দেখা গেছে—আর্দ্রতা যখন ১০০ ভাগের নীচে তখন ঘনীভবন প্রক্রিয়া সম্ভব।

বায়ু অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত হলে ক্ষুদ্রাকার আয়নও ঘনীভবন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হতে পারে। কিন্তু বৃহদাকার আয়ন এবং নিউক্লিয়াস বাতাসকে অতিরিক্ত সম্পৃক্ত হতে বাধা সৃষ্টি করে। প্রতি সি.সি-তে (c.c.) ক্ষুদ্রাকার অণুর সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য থাকে। সিড্‌নী সহরে সর্বনিম্ন মান পাওয়া গেছে ৪০। ডাবলিন সহরে ১০০-এর নীচে। সমুদ্র-সমতলে সর্বোচ্চ পরিগণিত মান ১৫০০। বৃহদাকার আয়নের পরিমাণ প্রতি সি.সি-তে ২০০ থেকে সমুদ্রতটের বড় সহরে ৮০,০০০ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বায়ুর যে কোন পরিমাণে ক্ষুদ্রাকার পজিটিভ আয়ন নেগেটিভের চেয়ে বেশী পরিমাণে থাকে। ক্ষুদ্রাকার পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়নের অনুপাত ১'২২। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৃহদাকার পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়নের অনুপাতও পূর্বেকার মতই। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাতে, যেমন—পাহাড়ের চূড়ায় প্রতি সি.সি-তে ক্ষুদ্রাকার আয়নের সংখ্যা বাড়ে এবং মান ২০০০ পর্যন্ত দাঁড়ায়। নেগেটিভ আয়ন থেকে পজিটিভ আয়নের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করবার মত। ক্ষুদ্রাকার আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতায় সাহায্য করে। এই ঘটনা থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে অবিশ্য পজিটিভ স্থানীয় বিদ্যুৎ আছে এবং এটাই নেগেটিভ থেকে অধিক সংখ্যায় পজিটিভ আয়ন তৈরী করে।

উচ্চতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃহদাকার আয়নের সংখ্যা কমতে থাকে। এবার দেখা যাক বায়ু-মণ্ডলে আয়নের সৃষ্টি হয় কেমন করে? ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টের সাহায্যে আয়ন সৃষ্টি করা

যায়। সূর্যের যে সব রশ্মি ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে আয়ন সৃষ্টি করতে পারে, সে সব রশ্মিকণা বায়ুস্তরের উচ্চ প্রদেশেই শোষিত হয়ে যায়। কাজেই বায়ুস্তরের যে স্থলে আয়ন সৃষ্টি হয়, সে স্থলে ঐ রশ্মিকণা পৌঁছুতে পারে না। বায়ুস্তরের নিম্ন অঞ্চলে ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট কার্যকরী হয়। ভূপৃষ্ঠে উক্ত এফেক্ট দিয়ে আয়ন সৃষ্টি করবার কথা শোনা যায় নি।

এলবার্ট দেখেছিলেন—মাটির নীচে ডিফিউসন পদ্ধতিতে যে বাতাস বেরোয় তার মধ্যে আয়ন থাকে। মনে হয়, ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্যে এ রকম হওয়া সম্ভব। ঝড়ো আবহাওয়াতে সংঘর্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে আয়নের সৃষ্টি হয়। এর ফলেই বিদ্যুৎঝলক এবং বিন্দুবিক্ষেপণ (point discharge) হয়। ঝড়ের সময় ধূলিকণাসমূহের পরস্পর সংঘর্ষের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ভূপৃষ্ঠে এবং বায়ুস্তরে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি বায়ুস্তরে আয়ন সৃষ্টি করে। আমরা যদি পাত্রের সাহায্যে প্রকৃতিতে আয়ন সৃষ্টির হার নির্ণয় করতে চাই তাহলে পাত্রের উপাদানে যাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন আল্‌ফা, বিটা প্রভৃতি রশ্মি আয়ন সৃষ্টি করে। আলফা-রশ্মির শক্তি সবচেয়ে বেশী; কিন্তু এর বিদারণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম। বায়ুমণ্ডলে আল্‌ফা-এফেক্ট দিয়েই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আয়ন সৃষ্টি করা হয়। পাত্রের দেয়াল খুব পাত্‌লা না হলে পরীক্ষার জন্যে ব্যবহৃত পাত্রের অভ্যন্তরে আল্‌ফা-রশ্মি যেতে পারে না। কিন্তু গামা-রশ্মি আল্‌ফা-রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী অভ্যন্তর (পৃথিবীর) থেকে আসতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে আগত আল্‌ফা-রশ্মি বায়ুস্তরে কয়েক সেন্টিমিটার পথ মাত্র যেতে পারে। সে জন্যে ভূপৃষ্ঠের খুব কাছের বায়ুস্তরে আল্‌ফা-রশ্মি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আয়ন প্রস্তুত হয়।

পজিটিভ আয়নের চেয়ে নেগেটিভ আয়নের গতিশীলতা এবং মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা দুই-ই বেশী। মাটির ভিতর থেকে ডিফিউসন পদ্ধতিতে যে বাতাস বেরোয় তা তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা আয়নিত। এর মধ্যে থাকে পজিটিভ আয়নের সংখ্যাধিক্য।

ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুস্তরের আয়ন মাপবার জন্যে পাত্‌লা দেয়ালবিশিষ্ট পাত্র নেওয়া হয়। আয়ন তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিমাপ করবার জন্যে বিরাটাকার তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। তা না হলে আয়নগুলির পরস্পর মিলিত হয়ে যায় এবং আয়ন সৃষ্টির হার মাপা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

জলভাগ থেকে স্থলভাগে আয়ন তৈরীর কাজ বেশী হয়। প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি সি.সি-তে ১১ জোড়া আয়ন প্রস্তুত হয়। ভূপৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় পদার্থ ৪ জোড়া, তেজস্ক্রিয় রশ্মি ৫ জোড়া এবং মহাজাগতিক রশ্মি বাকী ২ জোড়া আয়ন সৃষ্টি করে।

সবচেয়ে বেশী আয়ন সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে। মহাজাগতিক রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে, এমন কি, ভূগর্ভস্থ স্তরেও যেতে পারে। ফলে সর্বস্তরেই আয়ন সৃষ্টি হওয়ার পথ খোলা থাকে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে 'আয়নিজেসন' ভালভাবে হয়ে থাকে। মহাজাগতিক রশ্মির চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন আর একপ্রকার রশ্মি সূর্য থেকে বায়ুস্তরে পরিভ্রমণ করে। এই রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে আয়ন প্রস্তুত হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই রশ্মি শোষিত হয়ে যায়। কাজেই নীচু স্তরে আয়ন প্রস্তুতির কাজে এই শ্রেণীর রশ্মি কোন সাহায্যই করে না।

সেকেণ্ডারী বা গৌণ বিকিরণের দ্বারা বায়ুস্তরে কিয়দংশ প্রকৃত আয়নের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে পজিট্রন এবং মেসোট্রন নামে দুটি নতুন কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং মহা-

জাগতিক রশ্মি ক্ষুদ্রাকার আয়ন তৈরী করে। 'আয়নিজেসন' পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে বৃহদাকার আয়ন প্রস্তুত করা যায় না। পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্রাকার আয়ন একটি এইট্‌কেন কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহদাকার আয়ন সৃষ্টি করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নীচেকার বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে আয়ন তৈরী হয়। প্রথমে তৈরী হয় ক্ষুদ্রাকার আয়ন। এর গতিশীলতা ১ থেকে ২ সেঃ মিটারের মধ্যে (একক পূর্বেকার মত)। এই ক্ষুদ্রাকার আয়ন এইট্‌কেন কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলে বৃহদাকার আয়নে পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে মাধ্যমিক আয়নও তৈরী হয়। এদের গতিশীলতা প্রতি সেকেণ্ডে $১০^{-২}$ এবং $১০^{-৪}$ সেঃ মিঃ-এর মধ্যে।

এই আয়নিত বায়ুস্তরকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার। আয়নোস্ফিয়ারের দুটি অংশ। একটিকে বলা হয় E-স্তর। এর উচ্চতা ১০০ কিলোমিটার (রাত্রি বেলায়)। দিনের বেলায় এই স্তর E_1 এবং E_2 নামক দুটি স্তরে ভাগ হয়ে যায় এবং উচ্চতা ১০০ কিলোমিটারের চেয়ে কম থাকে। আর একটি অংশের নাম F-স্তর। রাত্রিবেলায় এর উচ্চতা ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার। দিনের বেলায় E-স্তরের মত F-স্তরও F_1 এবং F_2 অংশে ভাগ হয়ে যায়। E এবং F-স্তরকে যথাক্রমে হেভিসাইড এবং অ্যাপলটন লেয়ার বলা হয়ে থাকে।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে ওজোন স্তরে যে অক্সিজেন থাকে, সেই অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি (যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩০০০ আংষ্ট্রম ইউনিটের নীচে) শোষণ করে নেয় এবং আয়ন সৃষ্টি করে।

রাত্রিবেলা E এবং F-স্তরের উচ্চতা বাড়ে, কিন্তু আয়নের পরিমাণ কমে যায়। তার কারণ, রাত্রিবেলায় সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের আয়ন-স্তরে পৌঁছাতে পারে না; ফলে, আয়নগুলি পরস্পর মিশে যায়।

বায়ুমণ্ডলে যেমন আয়ন সৃষ্টি হয়, তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্রাকার আয়নগুলি নিম্নোক্ত উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—

(১) বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী ক্ষুদ্রাকার আয়নের সঙ্গে মিশে তড়িৎ-বিহীন অণু সৃষ্টি করে।

(২) বিপরীত-ধর্মী বৃহদাকার আয়নের সঙ্গে এইট্‌কেন নিউক্লিয়াস এবং একটি নিউট্র্যাল বা তড়িৎ-বিহীন অণু সৃষ্টি করে।

(৩) এইট্‌কেন নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহদাকার আয়ন সৃষ্টি করে।

বৃহদাকার আয়ন আবার বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী ক্ষুদ্রাকার অথবা বৃহদাকার আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মহাশূন্যের বাণী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে অভিনব বিজ্ঞান হলো রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা। জ্যোতির্বিদেরা রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্য পরীক্ষা করছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আলোক-তরঙ্গ অবলোকন না করে, তাঁরা মহাশূন্যের গভীর থেকে যে সব রেডিও-তরঙ্গ ভেসে আসে, সেগুলিকেই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। রেডার ও টেলিভিশনে যে সব আধুনিকতম ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, সে সবই এই অভিনব বিজ্ঞানে নিয়োগ করা হয়েছে। এক নতুন রহস্যময় অচিন্তনীয় বিশ্ব আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। মহাকাশের পরিচিত বস্তুসমূহ সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। আলোক-দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাশূন্যে যে সব বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় নি, রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। মহাশূন্য পরিবর্তিত ও আরও বিস্তৃত হচ্ছে।

সূর্য, গ্রহ, তারা, নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি থেকে নানাপ্রকার তরঙ্গ সব দিক থেকে অনবরত এসে পৃথিবীকে প্লাবিত করছে। কতকগুলি তরঙ্গ খুবই দুর্বল, আবার কতকগুলি তরঙ্গ যথেষ্ট জোরালো। এরা বিশ্বের বার্তা বহন করে আনে। ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে এবং এদের ইঙ্গিত যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বস্তুর স্বরূপ ও কর্মপ্রণালীর রীতি অনুধাবন করা যাবে।

এসব বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের উদ্ভব হয় পরমাণুর চাঞ্চল্যের জন্যে। চাঞ্চল্যের বৈশিষ্ট্যের উপর তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। দোলন যত আস্তে হবে, তরঙ্গ তত দীর্ঘ হবে। আবার দোলন যত দ্রুত হবে, তরঙ্গও তত ক্ষুদ্র হবে। কুড়ি মাইলেরও বেশী দীর্ঘ একটি তরঙ্গ হতে পারে। একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের পরিমাপ হতে পারে এক ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবার পূর্বেই অধিকাংশ তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দ্বারা অপসারিত হয়।

অনুসন্ধানকারীরা নানাপ্রকার রেডিও-দূরবীক্ষণ নির্মাণ করছেন। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বিশেষ গ্রাহক যন্ত্রের পরিকল্পনা হচ্ছে। রেডিও-দূরবীক্ষণের সাহায্যে দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই অনুসন্ধান করা যেতে পারে, পরিষ্কার রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার হয় না। আলোক-দূরবীক্ষণের সাহায্যে দিনের বেলায় সূর্যের আলোর জন্যে অন্য তারা দেখা যায় না; মেঘ আর কুয়াসাতেও অনুসন্ধান সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, সব সময়েই এবং সব আব-হাওয়াতেই রেডিও-তরঙ্গ গ্রহণ করবার কোন অসুবিধা নেই। রেডিও-দূরবীক্ষণ পাহাড়ের উপরে স্থাপন করবারও কোন আবশ্যকতা নেই। ইংল্যাণ্ডের অনুসন্ধানকারীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন; কারণ ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া সাধারণতঃই খারাপ এবং আলোক-দূরবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁদের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

দৃশ্যমান আলোর সাহায্যে আমরা যে বিশ্ব দেখি, রেডিও-দূরবীক্ষণের সাহায্যে তার চেয়ে অনেক বৃহদাকার বিশ্বকে জানা সম্ভব হবে। ক্যালি-ফোর্ণিয়ার মাউণ্ট প্যালোমারে পৃথিবীর বৃহত্তম দু-শ' ইঞ্চির দূরবীক্ষণ রয়েছে মহাকাশ অনুসন্ধান করবার জন্যে। দূরের তারা থেকে প্রেরিত রেডিও-তরঙ্গ গ্রহণ করবার যন্ত্র এত শক্তিশালী করা হয়েছে এবং মহাকাশের বহুদূরে অবস্থিত কোন কোন

উৎস থেকে এত জোরালো তরঙ্গ প্রেরিত হয় যে, মহাশূন্যের আরও গভীরে অনুসন্ধান করা সম্ভব হচ্ছে। প্যালোমারের বৃহত্তম আলোক-দূরবীক্ষণের গণ্ডীর বাইরে আরও কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত উৎস থেকে প্রেরিত রেডিও-তরঙ্গ এসব গ্রাহক-যন্ত্রে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় বারোটি আধুনিক রেডিও-মানমন্দিরে গবেষণার কাজ চলছে। ইংল্যাণ্ডে দুটি বৃহৎ মানমন্দির আছে—একটি আছে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জড্রেল ব্যাঙ্ক এক্স-পেরিমেণ্টাল ষ্টেশনে এবং অপরটি রয়েছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরিতে। জড্রেল ব্যাঙ্কের রেডিও-দূরবীক্ষণটিই পৃথিবীতে বৃহত্তম। এটি একটি দর্শনীয় বস্তু। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট সিড্নীতে রেডিও-ফিজিক্স লেবরেটরি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ রেডিও-জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই এখানে কাজ করেন। হল্যাণ্ডে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মানমন্দির আছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ গবেষণাগারগুলি আছে—ওহিও রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওয়াশিংটনে নেভাল রিসার্চ লেবরেটরিতে, হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরিতে এবং ওয়াশিংটনের কর্ণেগি ইনষ্টিটিউশনে।

ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কের রেডিও-দূরবীক্ষণের তরঙ্গ গ্রহণ করবার যন্ত্রটি একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ির মত আকৃতিবিশিষ্ট—লোহার পাত্ দিয়ে তৈরী। এটির ব্যাস হচ্ছে ২৫০ ফুট এবং ওজন ৫০০ টন। একে ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে দুদিকে দুটি স্তম্ভ আছে; এক একটি স্তম্ভ আঠারো তলার সমান উঁচু। স্তম্ভ দুটিকে চাকার উপরে বসানো হয়েছে, গোলাকার লাইনের উপর ঘোরাবার জন্যে। কাজেই যন্ত্রটিকে দিঙ্‌মণ্ডলের চারদিকেও ঘোরানো যায়। স্তম্ভ দুটির উপরে এরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে যে, ঝুড়ির আকারের যন্ত্রটি দিঙ্‌মণ্ডল ও আকাশের দিকে যে কোন ভাবে কাৎ করা যায়। বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে যন্ত্রটি আকাশের যে কোন স্থান লক্ষ্য করতে পারে, আবার উপরে-নীচে কিংবা যে কোন দিকে ঘোরানো যায়। তাছাড়া রয়েছে অনেক প্রকার ইলেক্‌ট্রিক কৌশল। প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাত বছরে যন্ত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। অবশ্য সব রেডিও-দূরবীক্ষণেরই গ্রাহক-যন্ত্র এক রকমের নয়।

মহাশূন্য থেকে রেডিও-তরঙ্গ গ্রহণ করবার জন্যে এসব যন্ত্র বিশেষভাবে নির্মিত। তাহলেও অযাচিত অনেক তরঙ্গই এ যন্ত্রের ফাঁদে এসে ধরা দেয় এবং লিপিবদ্ধ হয়। যেমন, পৃথিবীর অন্যান্য রেডিও-তরঙ্গ, এরোপ্লেন, রেডার, নানাপ্রকার যানবাহন, ঝড়, অনেক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র কিংবা মহাশূন্যের বিশেষ লক্ষ্যস্থল ব্যতীতও অন্যান্য স্থান থেকেও তরঙ্গ আসতে পারে—এমন কি, রেডিও দূরবীক্ষণের ভ্যাকুয়াম টিউবের বিরক্তিকর আওয়াজও। এই সব থেকে আবশ্যকীয় তরঙ্গ খুঁজে বের করে জোরালো করতে হয়। রেডিও-দূরবীক্ষণের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। বহুদূরের উৎস থেকে প্রেরিত খুব দুর্বল তরঙ্গও গ্রহণ করবার পরিকল্পনা হচ্ছে।

মহাকাশের কোনও স্থান একেবারে স্তব্ধ নয়। মহাশূন্য নানাপ্রকার বিকিরণে আন্দোলিত হচ্ছে। সবদিক থেকে সঙ্কেত অনবরত ভেসে আসছে। রেডিও-দূরবীক্ষণ যে দিকে ঘোরানো যাবে, সে দিক থেকেই শব্দ পাওয়া যাবে। অবশ্য সব শব্দই সমান জোরালো নয়; কোনটি তীক্ষ্ণ, কোনটি মৃদু। জ্যোতির্বিদেরা এর কারণ অনুসন্ধান করছেন।

মহাশূন্যের কোন কোন স্থানে কোন্ প্রক্রিয়ায় এত জোরালো তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, যা কোন প্রচলিত মতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায় না? অধিকন্তু, মনে হয়, এরূপ প্রক্রিয়ায় কোন আলো উৎপন্ন হয় না। রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে এরূপ অনেক তারার অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়, যাদের কোন আলো-দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় না। কাজেই এরূপ তারা যথেষ্ট আলো বিকিরণ করে না, যাতে তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা যেতে পারে।

এরূপ কোন কোন তারার খানিকটা দীপ্তি দেখা গেলেও তার যে প্রদেশ থেকে রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে স্থান দৃশ্যমান না-ও হতে পারে। এরূপ কোন প্রক্রিয়ার সংঘটন হচ্ছে, যাতে প্রচুর রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যা দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ প্রকাশ করবার পক্ষে কার্যকরী নয়।

পরমাণুর নিয়মিত ছন্দোময় দোলনের জন্যেই রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ রেডিও-তরঙ্গ উদ্ভূত হলে আন্দোলিত বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় অনুমান করা যায়। রেডিও-তরঙ্গ উৎপাদনের জন্যে মানুষের ইলেকট্রনিক টিউব প্রভৃতি কত প্রকার যন্ত্রপাতির আবশ্যক! কিন্তু প্রকৃতি কাজ করে মুক্ত মহাশূন্যে বিনা আড়ম্বরে। বিভিন্ন তারার মধ্যস্থিত উত্তপ্ত বিরল গ্যাসই তার প্রধান উপাদান।

মহাশূন্যে দীর্ঘ তরঙ্গ-বিশিষ্ট অত্যন্ত জোরালো রেডিও সঙ্কেত উদ্ভবের কারণ, রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা। হয়তো রেডিও-সঙ্কেত প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন গ্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এসব গ্যাসের গতি এত প্রচণ্ড যে, এরা প্রতি সেকেণ্ডে দু' হাজার মাইল বেগেও চলতে পারে। অবশ্য কেবল প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যেই রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে না। কোন শক্তি কিংবা কয়েকটি অবস্থার এরূপ সমাবেশ হওয়া দরকার, যাতে গ্যাসের মধ্যবর্তী বস্তু-কণিকার ছন্দোময় দোলন সম্ভব হয়। মহাশূন্যে বহুদূর বিস্তৃত ইলেকট্রন-মেঘের মধ্যে দোলন খুবই সম্ভব। যদি এরূপ মেঘের অন্য মেঘের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে মেঘের আয়তন সঙ্কুচিত হবে এবং মেঘের অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন কণিকাগুলি পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী হবে। যথেষ্ট কাছে এলে সমধর্মী ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণিকাগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং পুনরায় বাইরে পালিয়ে যাবে। এবার মেঘের বাইরের অন্য ইলেকট্রনসমূহের নিকটবর্তী হলে পুনরায় বিকর্ষিত হয়ে মেঘের অভ্যন্তরে চলে যাবে। এরূপ আন্দোলনে রেডিও-তরঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে। এ ভাবেই সূর্যের আলোকমণ্ডলেও রেডিও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রে দ্রুতগতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক কণিকার জন্যেও রেডিও-তরঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে। বিভিন্ন তারার মধ্যে চৌম্বকত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ চুম্বক হলো গ্যাসের, লোহার নয়। এরূপ গ্যাসের চৌম্বক শক্তি খুবই কম, কিন্তু আয়তন বহুদূর বিস্তৃত।

মহাশূন্য থেকে আগত নানাপ্রকার বিকিরণ পরীক্ষা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যেতে পারে। আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলেও অনেক তথ্য জানা যায়। এরূপ বিশ্লেষণে জানা যায়—কোন বস্তু পৃথিবীর দিকে আসছে কিংবা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বস্তুটি ঘুরছে কিনা এবং কোন দিকে ঘুরছে, এর জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্র আছে কিনা—ইত্যাদি অনেক খবর। এই ভাবে অনেক প্রকার রেডিও-তরঙ্গের বর্ণালীর সূক্ষ্ম বিচার করেও রেডিও তারা সম্বন্ধে (যাদের আলোক-দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় না) অনেক তথ্য জানা যেতে পারে এবং তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে পারে।

বিভিন্ন তারার মধ্যস্থিত গ্যাসে বহুল পরিমাণে হাইড্রোজেন থাকে। হাইড্রোজেন রেডিও-সঙ্কেত প্রেরণ করতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন ও কেন্দ্রের প্রোটন উভয়েই লাটিমের মত একদিকে ঘুরতে থাকে। আবার অবস্থান্তরে বিপরীত দিকেও ঘোরে। এই সময়েই রেডিও-সঙ্কেত প্রেরিত হয়। ফলে, প্রতি সেকেণ্ডে একশ' বিয়াল্লিশ কোটি বার দোলন হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় একুশ সেণ্টিমিটার। গ্রাহক-যন্ত্রে এরূপ কৌশল থাকা দরকার, যা মহাশূন্য থেকে আগত নানাপ্রকার রেডিও-তরঙ্গ থেকে কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের সঙ্কেতটি বেছে নিতে পারে। মহাশূন্যে

বিরল গ্যাসের মধ্যে অন্যান্য পদার্থের চেয়ে হাইড্রোজেনের পরিমাণই বেশী (শতাংশের নিরানব্বই ভাগেরও বেশী)। মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে হাইড্রোজেনের পরিমাণ জানতে পারলে, ঐ সব স্থানে বস্তুর পরিমাণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা হবে। এই সব বস্তু থেকেই তারকাসমূহের উৎপত্তি। এই ভাবে আমরা জানতে পারবো, কোন্ প্রক্রিয়ায় তারা, ছায়াপথ প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন অণু-পরমাণু থেকে সঙ্কেত প্রেরিত হয় বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। কাজেই মহাশূন্যে কোন বস্তুর অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে হলে, ঐ বস্তু থেকে প্রেরিত বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ গ্রহণ করে পরীক্ষা করা দরকার। এ সম্বন্ধে রেডিও-জ্যোতির্বিদেরা গবেষণা করছেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম থেকে তরঙ্গ প্রেরিত হয় বিরানব্বই সেন্টিমিটারে। ডয়টেরিয়াম খুবই বিরল এবং বহু দূরে দূরে অবস্থিত। সম্প্রতি এর সঙ্কেত গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ ডয়টেরিয়াম আছে তার চেয়েও পনেরো গুণ বেশী আছে ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে।

হয়তো এই অভিনব বিজ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতে বিশ্বের মূল উপাদান, মহাজাগতিক গ্যাস এবং তাথেকে ছায়াপথ ও তাদের মধ্যবর্তী রহস্যময় জগৎসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ হবে।

ক্লোরোফিল-মানুষ

শ্রীনলিনাকান্ত চক্রবর্তী

উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রশ্ন উঠলো, মানুষ উদ্ভিদের মত জল, বাতাস ও অন্যান্য অজৈব পদার্থ থেকে দেহপুষ্টির উপাদান তৈরী করতে পারে কিনা? উদ্ভিদের বেলায় আমরা দেখি, তারা মাটি থেকে নেওয়া জল এবং বাতাস থেকে নেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে। মানুষ যদি উদ্ভিদের মত জল ও বাতাস থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে নিজেদের দেহধারণের উপযোগী খাদ্য তৈরী করতে পারতো তাহলে পৃথিবীর অনেক জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যেত।

দেখা যাক, জল ও বায়ু থেকে খাদ্য তৈরীতে আমাদের অন্তরায় কি? উদ্ভিদ-জগতে দেখি, যাদের শরীরে ক্লোরোফিল অথবা পত্রহরিৎ আছে, তারাই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করতে পারে। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ সমূহ ক্লোরোফিল বর্জিত; সুতরাং পরজীবী। মানুষের শরীরে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণা না থাকায় তার পক্ষে নিজের দেহে খাদ্য তৈরী করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অবশ্য অন্যান্য অন্তরায়ও আছে। সে কথা বলবার আগে ক্লোরোফিল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ক্লোরোফিল শব্দটি আজকাল বেশ পরিচিত। উদ্ভিদের সবুজ অংশের প্রায় প্রত্যেকটি কোষেই ক্লোরোপ্লাষ্ট বা সবুজ কণিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই সবুজ কণিকায় থাকে ষ্ট্রোমা নামক একপ্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ ও নানাপ্রকার রঞ্জক দ্রব্য। এদের মধ্যে সবুজ রঞ্জক ক্লোরোফিল-এ ও বি এবং হলুদ রঞ্জক কেরোটিন এবং জেস্থোফিলই প্রধান। উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষণে ষ্ট্রোমা এবং ক্লোরোফিলের মিলিত কার্যকারিতা অপরিহার্য। আলোক-

সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিয়োজনে সাহায্য করে। খুব সম্ভব কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের ফলে আলোর কাজের পথ সুগম হয়ে যায়। প্রায় শতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে বর্তমানে এই জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের গঠন ও কাঠামো সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে উইলষ্ট্যাটার ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে দেখা গেছে, ক্লোরোফিল-এ ও বি প্রায় একই রকম। একমাত্র পার্থক্য হলো এই যে, ক্লোরোফিল বি-তে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু কম এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু বেশী থাকে। এদের রঙের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। ক্লোরোফিল-এ নীলাভ সবুজ, আর ক্লোরোফিল-বি হরিদ্রাভ সবুজ। সাধারণতঃ দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এ ও বি-এর অনুপাত ৩ : ১।

আগেই বলা হয়েছে, দেহের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন করতে হলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, চামড়ায় ক্লোরোফিল জাতীয় পদার্থ থাকা। ধরা যাক, মানুষের চামড়ায় ক্লোরোফিল রয়েছে, কিন্তু তাহলেই কি খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব? অর্থাৎ সে নিজের দেহের ক্লোরোফিলের সাহায্যে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দেহ-ধারণোপযোগী খাদ্য তৈরী করতে পারবে কিনা?

ক্লোরোফিল-মানুষের খাদ্যের কথা আমরা ভাবছি, কিন্তু সত্যিকারের দেহপুষ্টির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কি? প্রাণীমাত্রেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে দেহপুষ্টির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ কয়েক প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশই এককোষী অথবা প্রোটোজোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের দেহে থাকে ক্লোরোফিল। ফলে এরা আলোক-সংশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরী করতে পারে। আবার এক-প্রকার সবুজ হাইড্রা আছে, যাদের দেহকোষে থাকে এককোষী সবুজ শ্যাওলা। এরাও খাদ্যের ব্যাপারে অনেকটা আত্মনির্ভরশীল। এছাড়া কয়েক শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়াও রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীই খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরা।

এখন হয়তো বিপরিণতির (মিউটেশন) ফলে অথবা বংশগতির হঠাৎ কোন পরিবর্তনের ফলে মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীতে ক্লোরোফিল দেখা দিল! রাসায়নিক দিক থেকে আমাদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে ক্লোরোফিলের অনেক মিল আছে। সুতরাং দেহে ক্লোরোফিল তৈরী হতে হলে আকৃতির বিশেষ পরিবর্তনের দরকার হবে না। আর এই ক্লোরোফিল থাকবে মানুষের চামড়ায়; কারণ ক্লোরোফিল তৈরী অথবা আলোক-সংশ্লেষণ — উভয়ের জন্যেই আলোর একান্ত প্রয়োজন।

আবার আমরা ক্লোরোফিল মানুষের খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়ে ফিরে আসি। গাছের আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি—ক্লোরোফিল-মানুষ অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিঘণ্টায় প্রতিহাজার বর্গ-ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ০·০৫ আউন্স চিনি তৈরী করতে পারবে। মানুষের চামড়ায় সূর্যালোকের পক্ষে উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ মোটামুটি ২৬০০ বর্গইঞ্চি; অর্থাৎ একটা আলোক-সংশ্লেষী মানুষ প্রতিঘণ্টায় খাদ্য তৈরী করতে পারবে ০·১৩ আউন্স। দিনের আলোর পরিমাণ ১২ ঘণ্টা ধরলে দৈনিক খাদ্য তৈরীর পরিমাণ দাঁড়াবে দেড় আউন্স। এই দেড় আউন্স চিনি থেকে মাত্র ১৬০ ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু একজন সুস্থ মানুষের শরীর-গঠন ও শক্তির জন্যে দৈনিক চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যা একান্ত নগণ্য।

সাধারণ পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ক্যালরীর চাহিদা ১৫০০ থেকে ১৮০০, অবশ্য যদি সে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়। আর সাধারণ কাজকর্ম করলে তার দরকার আরও অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালরীর। কঠোর শারীরিক শ্রমকারীদের দরকার অতিরিক্ত ২০০০ ক্যালরী; অর্থাৎ সুস্থ, বলিষ্ঠ ব্যক্তির দৈনিক চাহিদা দাঁড়াচ্ছে দৈনিক ২০০০ থেকে ৪০০০ ক্যালরী।

আমরা ধরে নিচ্ছি, আলোক-সংশ্লেষী মানুষকে খাদ্য ক্রয়ের জন্যে অর্থোপার্জন করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে না। সে তার প্রয়োজনীয় সব খাদ্যোপাদান নিজেই তৈরী করতে পারবে। তাহলে তার দৈনিক চাহিদা হবে ২০০০ ক্যালরী।

ক্লোরোফিল-মানুষ খাদ্যের জন্যে আলোক-সংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনধারণের জন্যে অন্যান্য অনেক সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। সবুজ চামড়া সব সময় আলোতে খোলা রাখবার জন্যে তার পোসাক-পরিচ্ছদের বালাই আর থাকবে না। বছরের সব সময় যাতে সূর্যের আলো পেতে পারে, সে জন্যে তাকে হতে হবে উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসী। এভাবে তখন তার ঘরবাড়ী বা আশ্রয়েরও দরকার হবে না। তার জীবনধারণের জন্যে একমাত্র দরকার হবে, বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন এবং জল। এই পানীয় জলে অবশ্য পরিমাণমত খনিজ লবণ থাকতে হবে।

এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছি, ক্লোরোফিল-মানুষ তার দৈনিক চাহিদার অনুরূপ খাদ্য তৈরী করতে পারবে। কিন্তু উপরের আলোচনায় দেখা যায়—তার বর্তমান শরীর নিয়ে নিজ চাহিদার শতকরা ৮ ভাগ মাত্র খাদ্য তৈরী করতে পারে। এখন দেখা যাক, ক্লোরোফিল-মানুষকে নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যাপারে কি ভাবে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি? আলোক-সংশ্লেষী গাত্রদেশের আয়তন যদি বাড়ানো যায় তবে খাদ্য তৈরীর পরিমাণও বাড়বে। কিন্তু গাত্রদেশের আয়তন বাড়াতে গিয়ে যদি মানুষের চেহারা দৈত্যের মত হয়ে ওঠে, তবে তার খাদ্যের পরিমাণও বেড়ে যাবে, অর্থাৎ এভাবে আয়তন বৃদ্ধিতে অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। আয়তন না হয় কমিয়েই দেখা যাক! কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্যে আয়তন কমাতে গিয়ে দেখা যায় যে ক্লোরোফিল-মানুষের চেহারা হয়ে উঠবে আলোক-সংশ্লেষী বর্তমানের নিম্নশ্রেণীর এককোষী প্রাণীর মত।

শরীরের আয়তন বাড়লেও বিপদ, কমলেও বিপদ। তবে একটা উপায় আছে, ক্লোরোফিল-মানুষের শরীর থেকে যদি গাছের পাতার মত পাতলা কোষতন্তু উদ্গত হয়, তাহলে আলোক-সংশ্লেষণের জন্যে গাত্রদেশের আয়তন বাড়বে অথচ শরীরের আয়তন বৃদ্ধি পাবে না, অর্থাৎ ক্লোরোফিল-মানুষেরও গাছের মত সর্বশরীরে অনেকগুলি পাতা থাকবে। ক্লোরোফিল-মানুষকে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে নিজ শরীরের আয়তন বর্তমান আয়তন থেকে ২০ গুণ বেশী বাড়াতে হবে—এ-থেকেই তার শরীরের পাতার পরিমাণ কল্পনা করতে পারি। এই বিপুল পাতার বোঝা নিয়ে তার পক্ষে সহজে চলাফেরা করা সম্ভব হবে না, আর আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যখন নিজ খাদ্য তৈরী করবে তখন তার এখনকার মত চলাফেরা করবার দরকারও হবে না। এবার ক্লোরোফিল-মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও দেখা যাবে। তার বর্তমান পাচকতন্ত্র অকেজো হয়ে পড়বে। অবশ্য খনিজ লবণ সংগ্রহের জন্যে কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরণের কোষ থাকলেই হলো। হয়তো গাছের শিকড়ের মত ক্লোরোফিল মানুষের পা থেকে উদ্গত কোষতন্তু থাকবে এবং তারা গাছের মত একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের তার আর প্রয়োজন থাকবে না এবং হৃৎপিণ্ডের স্থান হয়তো দখল করবে উদ্ভিদের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মত কোনরূপ কলাতন্ত্র।

এখন সব মিলিয়ে ক্লোরোফিল-মানুষের চেহারাটা কেমন হবে, দেখা যাক! তার শরীরে রয়েছে ক্লোরোফিল; সুতরাং গায়ের রং হবে সবুজ। আলোক-সংশ্লেষী গাত্রদেশের আয়তন বাড়াতে গিয়ে উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য পাতার। জল ও খনিজ লবণ শোষণের জন্যে পা থেকে উদ্ভব হয়েছে শিকড়ের। পাচকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র হয়েছে অপসারিত। হৃৎপিণ্ডের স্থান নিয়েছে জাইলেম ও ফ্লোয়েম। বিপুল পাতার বোঝা নিয়ে চলাফেরার অসুবিধার জন্যে সে হয়েছে উদ্ভিদের মত স্থির, অর্থাৎ ক্লোরোফিল মানুষ ও উদ্ভিদে আর কোন পার্থক্যই রইল না।

তটরেখার স্থায়ী পরিবর্তন

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র

ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক জায়গায় মধ্যক তটরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে ধরে নিয়েই আমরা এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা থেকে খনির গভীরতা, এই মধ্যক তটরেখার সঙ্গে তুলনা করে মেপে থাকি—যদিও মধ্যক সমুদ্রপৃষ্ঠ জিয়য়েড বা ধরাকৃতি এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় এর দূরত্ব এক নয়। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, দৈনিক জোয়ার-ভাটার কথা বাদ দিলেও যে কোন জায়গায় মধ্যক সমুদ্রপৃষ্ঠ (ও তটরেখা) পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চিরদিন সমান দূরত্বে থাকে না।

করমণ্ডল উপকূলে মাদ্রাজের কাছে মহাবলীপুরমে যাঁরা গেছেন, তাঁরা জানেন গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেখানকার তটরেখা কত উপরে চলে এসেছে। মাত্র ছশ' বছরের মধ্যে ৭টা প্যাগোডার মত আকৃতির মন্দিরের ছয়টাই বঙ্গোপসাগরে ডুবে গেছে—ছয় নম্বর মন্দিরের কিছুটা এখনও দেখা যায় ভাটার সময়। সাত নম্বর মন্দিরটাও এতদিনে জলে ডুবে যেত, যদি সরকার একটা চওড়া বাঁধ দিয়ে সেটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে না দিতেন। এ রকম অগুণ্‌তি উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তটরেখার এসব পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের জন্যে ঘটে নি, স্থলভাগের কিছু অংশ কখনও কখনও নীচে নেমে যায় বলে এ সব ঘটে থাকে। তটরেখার আর এক ধরণের স্থায়ী অথচ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যার জন্যে দায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের অনুরূপ পরিবর্তন। এখানে সেই কথা আলোচনা করবো।

সমুদ্রপৃষ্ঠ যখন সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে নীচে নেমে যায় তখন তটরেখাও নীচে নেমে গিয়ে স্থলভাগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই সময়ে পৃথিবীতে অত্যন্ত দ্রুত সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ঘটে; কিন্তু অবক্ষেপণের স্থান খুব কমে যায়। এই অবস্থাকে বলে সৈকতাপসরণ। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ যখন তীরে ওঠে তখন স্থলভাগের বর্গফল কমে যায় এবং খুব বিস্তৃত জায়গায় অতি মন্থরগতিতে সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ঘটতে থাকে—একে বলে সৈকতাগ্রসরণ। সৈকতাপসরণ ও সৈকতাগ্রসরণের মাঝের সময়কে অবক্ষেপণী ছেদ বলে। কারণ এই সময়ে পৃথিবীর বহু জায়গায় কোন পলল জমা হয় না, পুরনো শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সেখানে স্থলভাগের স্বাভাবিক বন্ধুরতা দেখা দেয় এবং এই ভূসংস্থানের উপর কংগ্লোমারেট নামে এক ধরণের নুড়ি-পাথর সর্বপ্রথমে জমা হয়। সৈকতাগ্রসরণ ও সৈকতাপসরণের মাঝে স্থলভাগের জলে ডুবে-যাওয়া অংশে মোটামুটি ভালভাবেই অবক্ষেপণ ঘটে। অবক্ষেপণী ছেদের উপর ও নীচের শিলাস্তরকে

বিভিন্ন জীবাশ্ম, গঠনবৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয় বিচার করে আলাদা করা হয়।

ভূতাত্ত্বিক অতীতে তটরেখার এরূপ পরিবর্তন বহুবার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভূতাত্ত্বিক সময়কে বিভিন্ন অংশে ভাগ করবার কাজে এদের প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়। অতীতের তটরেখার পরিবর্তনগুলির মধ্যে প্রাগাধুনিক যুগের কয়েকটির বিষয়ে খুঁটিনাটি আমাদের জানা আছে। তটরেখার পরিবর্তনের প্রমাণ হিসাবে অনেক কিছুর উল্লেখ করা যায়; যথাঃ—

১। স্থলভাগের বহু জায়গায় এখন সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্মপূর্ণ পাললিক শিলা দেখা যায়; যেমন—মাদ্রাজ রাজ্যের কিছু অংশে, কচ্ছে, আসাম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে, বাংলার বাঁকুড়া জেলায়, রাজস্থানের কিছু অংশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু জায়গায়। স্বভাবতই এগুলি কোন না কোন সৈকতাগ্রসরণের পরে সৃষ্টি হয়েছে।

২। পৃথিবীর বহু জায়গায় তটরেখার অনেক উপরে পুরনো বেলাভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব সম্ভবতঃ প্রায় আধুনিক যুগের সমুদ্রাগ্রসরণের ফল।

৩। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে, হুড্‌সন উপসাগরে এবং আরো অন্যান্য জায়গায় জলে-ডোবা বড় বড় নদীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অনেকেই প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার (বা ৬০০ মাইল; ১ কিলোমিটার=১,০০০ মিটার, ১ মিটার=৩'২৮ ফুট) লম্বা। নিয়মিত ঢাল ও অন্যান্য সব দিক থেকে বিচার করলে এদের স্থলভাগের পরিণত অবস্থার নদী ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না; অথচ সমুদ্র-গর্ভে এ ধরণের নদী সৃষ্টির কোন সম্ভাব্য কারণও জানা নেই। তাছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এসব নদীর অববাহিকার গভীরতা কখনও ৭০ মিটারের বেশী হয় না। কোন এক সৈকতাপসরণের সময়ে এগুলির সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন।

৪। যে গভীরতায় প্রবাল বেঁচে থাকতে পারে, তার চেয়ে প্রায় ৭০ মিঃ নীচে সমগোত্রীয় প্রবালের রীফ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সৈকতাপসরণ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

শেষের দুই অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায় যে, সৈকতাপসরণের নিম্নতম সীমা খুব সম্ভব এখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মিঃ নীচে। সৈকতাগ্রসরণের চরম সীমা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যদিও পেন্‌ক্ ও জলি এই সীমা যথাক্রমে ৫০০ ও ১,০০০ মিটারে স্থির করেছেন, তথাপি সম্ভবতঃ এ সীমা ১০০ মিটারের বেশী হবে না। স্থলভাগে বিভিন্ন উচ্চতায় মোট বর্গফলের লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ এখন ৫০ মিঃ উপরে উঠলে স্থলভাগের প্রায় ১২% অংশ, ১০০ মিঃ উঠলে প্রায় ২২% অংশ এবং ২০০ মিঃ উঠলে প্রায় ৩৩% অংশ জলে ডুবে যাবে। ভূতাত্ত্বিক অতীতের চেয়ে বর্তমানে ভূভাগের বন্ধুরতা অনেক বেশী; কাজেই তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ মাত্র ১০০ মিঃ উঠলেই ভূভাগের মোটামুটি ৩৩% অংশ জলে ডুবে যেত। প্রত্নভৌগোলিক মানচিত্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মোট স্থলভাগের ৩৩% অংশের বেশী কখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় নি; সুতরাং সৈকতাগ্রসরণের চরম সীমা ১০০ মিটারেই ঠিক করা উচিত।

পৃথিবীর গত ৫০ কোটি বছরের ইতিহাসে মোটামুটি ২ কোটি বছর অন্তর ছোট বা বড় রকমের একটা সৈকতাগ্রসরণ বা অপসরণ ঘটেছে। বর্তমানে সমুদ্রের মোট বর্গফল প্রায় ৩৪ কোটি বর্গ কি. মি. (১ ব. কি. মি.=০'৩৮৬ ব. মাইল)। সমুদ্রপৃষ্ঠকে ৭০ মিটার ওঠা-নামা করতে হলে ২ কোটি বছরে সমুদ্রে প্রায় আড়াই কোটি ঘন কি. মি. (১ ঘ. কি. মি.=০'২৪ ঘ. মাইল) জলের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া চাই। সমুদ্র-জলের এই বাড়্‌তি বা ঘাট্‌তির সম্ভাব্য কারণগুলি মোটমুটি চার ধরণের—

(১) ভূপৃষ্ঠে মোট জলের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি-জনিত,

(২) স্থলভাগের জলীয় অংশের পরিমাণের তারতম্যমূলক,

(৩) ভূপৃষ্ঠস্থ কারণে সাগর-গর্ভের আকার ও আয়তনের পরিবর্তনঘটিত এবং

(৪) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কারণে সাগর-গর্ভের আকার ও আয়তনের পরিবর্তনঘটিত।

আগ্নেয়শিলার উৎস্যন্দ জল ভূপৃষ্ঠে মোট জলীয় অংশের পরিমাণ বাড়াতে পারে। পুরাজীবীয় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বয়সের নানা ধরণের সব আগ্নেয়-শিলার আয়তন থেকে দেখা যায় যে, বছরে ২ ঘ. কি. মিটারের বেশ কিছু কম হিসাবে আগ্নেয়শিলার উৎপত্তি হয়েছে। ম্যাগ্‌মা বা গলিত শিলায় প্রায় ১০% অংশ জল থাকলে তার ৬০% অংশের বেশী কখনও ছাড়া পায় না; কিন্তু এরও সামান্য অংশ আবার ম্যাগ্‌মা অঞ্চলের (ম্যাগ্‌মার সংস্পর্শে যেখানে পুরনো পাললিক ও অন্যান্য শিলা আংশিক-ভাবে গলে যায়) রন্ধ্রদেশ থেকে আসে; সুতরাং সেটাকে সত্যিকার জলীয় অংশের বৃদ্ধি বলা যায় না। কুয়েনেনের মতে এসব হিসাবের পর প্রতি বছরে ছাড়া পাওয়া উৎস্যন্দ জলের পরিমাণ ০'২৫ ঘ. কি. মিটারে দাঁড়ায়। ১০ কি. মিটারের চেয়ে বেশী গভীরতা থেকে জল বেরিয়ে আসতে পারে না, তা না হলে হয়তো উৎস্যন্দ জলের পরিমাণ আরো বেশী ধরা যেত।

এই উৎস্যন্দ জলের বেশ কিছুটা আবার আগ্নেয়-শিলার আবহবিকারের সময় জলযোজনে খরচ হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, শেষ পর্যন্ত মাত্র ০'০৫ ঘ. কি. মি. বাৎসরিক উৎস্যন্দ জল সমুদ্রে এসে জমে, কিন্তু এতে সমুদ্র-পৃষ্ঠের কোন প্রকট পরিবর্তন অসম্ভব; কারণ ২ কোটি বছরে এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ মাত্র ২ মি. উঁচু হতে পারে।

কেউ কেউ বলেন যে, পৃথিবী থেকে জলীয় অংশ প্রতিনিয়ত মহাশূন্যে চলে যাওয়ায় পৃথিবীর জলীয় অংশ কমে যাচ্ছে; কিন্তু ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বাষ্পীয় চাপ অত্যন্ত কম হওয়ায় এ সম্ভাবনা খুবই কম। বায়ুমণ্ডলের চরম আর্দ্রতা ও শুষ্কতার জন্যে সমুদ্র-পৃষ্ঠের ১ মিটারের বেশী ওঠা নামা সম্ভব নয়।

স্থলভাগের উপর প্রচুর বরফ জমলে সমুদ্র-জলের মোট আয়তন কমে যাবে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ নীচে নেমে যাবে। ঐ বরফ গলে গেলে আবার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। কিন্তু দুটা ছোট তুষার যুগের মধ্যের স্বাভাবিক ব্যবধান যত, দুটা সৈকতা-পসরণের মধ্যের ব্যবধান প্রায় তার হাজার গুণ। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য তুষার যুগ ও তটরেখার অসা-ধারণ ওঠা-নামার মধ্যে কোন সম্পর্ক ভূতাত্ত্বিকেরা সব সময় খুঁজে পান না বলে এ মতবাদের উপর বেশী জোর দেওয়া যায় না। আবার হ্রদ ও অন্যান্য স্বাভাবিক জলাশয়ের আয়তন সাগরের আয়তনের তুলনায় এতই কম যে, ভূতাত্ত্বিক অতীতে কখন পৃথিবীতে অসংখ্য হ্রদে বেশ কিছু জল আটকা পড়ে ছিল বলে তটরেখা নীচে নেমে গিয়েছিল, এ কথা বলাও অসঙ্গত মনে হয়।

সমুদ্রগর্ভে পলল পড়ায় সমুদ্রের গভীরতা আস্তে আস্তে কমে যায় এবং সাধারণ শিলার চেয়ে পললের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম বলে এই পললের ভারে সমুদ্রতল বিশেষ নীচে নামে না। ফলে স্থলভাগের সমস্থিতিজনিত উপরে ওঠা প্রায় ঘটেই না। (ভূত্বকের নীচের অংশকে আংশিকভাবে নমনীয় ধরে নিলে আর্কিমিডিসের সূত্রের সাহায্যে দেখানো যায় যে, ভূত্বকের কোন স্তম্ভের ওজন বেড়ে গেলে ভারসাম্য রাখবার জন্যে সেটা নীচে নেমে যাবে এবং আশেপাশের স্তম্ভ কিছু ওপরে উঠে যাবে। কোন স্তম্ভের ওজন কমে গেলে ঠিক বিপরীত অবস্থা ঘটবে। একেই সমস্থিতি বলে)। এ সব বিবেচনা করে দেখা যায় যে, এভাবে সমুদ্র-গহ্বরের আয়তন প্রতি বছরে যা কমতে পারে তাতে ২ কোটি বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠ খুব বেশী হলেও ৮ মিটারের বেশী উঠতে পারে না।

স্থলভাগ থেকে কিছু দূরে সমুদ্রে বাৎসরিক অবক্ষেপণের পরিমাণ খুব কম। প্রকৃতপক্ষে সামু-দ্রিক পললের বেশী অংশ স্থলভাগের কাছে জিওসিনক্লাইন বা মহীখাত নামে এক ধরণের লম্বা

ও সামান্য গভীর খাতে জমা হয়। মহীখাতের বিশেষত্ব এই যে, পলল জমা হতে থাকলে এগুলি ক্রমেই নীচে নেমে যায় এবং পলল পড়া অব্যাহত থাকে। এভাবে বহু কি. মি. গভীর পললের (যা পরে পাললিক শিলা হয়ে যায়) সৃষ্টি হয়। মহীখাত নীচে নেমে যাওয়ার জন্যে আশেপাশের স্থলভাগই সাধারণতঃ সমস্থিতিজনিত কারণে উপরে ওঠে। ফলে সমুদ্র-গহ্বরের আয়তন কমে না; কিন্তু মহীখাতের সরন্ধ্র পললের মধ্যে অনেকখানি জল আটকা পড়ে যায়। এই জলের আয়তন পললের আয়তনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এর ফলে সমুদ্র-জলের পরিমাণ কমে যায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ নীচে নেমে আসে। ২ কোটি বছরে যদি ২০টা সাধারণ ধরণের মহীখাতের (যার দৈর্ঘ্য ২.৫ কি. মি., প্রস্থ ৪০০ মি. এবং গভীরতা ৫০০ মি.) উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ বছরে ৫ ঘ. কি. মি. পলল সমুদ্রে পড়ে, তবেই সমুদ্রে মোট ২ কোটি ঘ. মি. জলের ঘাট্তি পড়বে এবং একটা সৈকতাপসরণ ঘটবে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু অবক্ষেপণের হার এর চেয়ে অনেক কম।

আবার মহীখাতের পলল, অর্থাৎ পাললিক শিলা ক্রমে বলিত হয়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি করে এবং এই সব পর্বতই পরের মহীখাতগুলির জন্যে পলল সরবরাহ করে। সুতরাং নতুন মহীখাতে সমুদ্র-জলের পরিমাণ কমলেও পুরনো মহীখাতগুলির (অর্থাৎ ভঙ্গিল পর্বতের) কাছ থেকে সমুদ্র কিছু জল ফেরৎ পেয়ে যায়; ফলে সমুদ্র-জলের মোট পরিমাণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তাছাড়া একই সময়ে মহীখাতের ভিতরে ও বাইরে (এটাই স্বাভাবিক) অবক্ষেপণের ফল পরস্পরের বিপরীতধর্মী।

কেউ কেউ বলেন যে, মহাদেশগুলি যখন নীচে নেমে যায় তখন সমুদ্রতলের সমস্থিতিমূলক উপরে ওঠবার ফলে সৈকতাগ্রসরণ ঘটে। এ মতবাদ সত্য হলে আজ আর কোন স্থলভাগ সমুদ্রের উপরে থাকতো না; কারণ ভূতাত্ত্বিক অতীতে কোন সত্যিকার সমুদ্রতল কখনও স্থলভাগ হয়ে দেখা দেয় নি।

আর এক মতবাদ অনুযায়ী সমুদ্রতলের এক পর্যায়ক্রমিক স্পন্দনের ফলে সমুদ্র-গর্ভের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এ মতবাদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমগ্রোভের মতে—ইন্দোনেশিয়া, ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে মহীখাত জাতীয় যে সব প্রায় পললহীন খাত আছে তাদের সৃষ্টির ফলে সৈকতাপসরণ ঘটে। যদিও সাম্প্রতিক সৈকতাপসরণ ঘটবার আগেও এ সব খাত পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু তাদের গভীরতা হয়তো আগে কম ছিল। তাছাড়া আমাদের অজানা এ ধরণের আরও খাত সমুদ্রগর্ভে থাকতে পারে। আমগ্রোভ মনে করেন যে, এ সব খাতের গভীরতা বাড়বার ফলে শুধু মহাদেশগুলির সমস্থিতীয় উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু সমুদ্রতলের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এভাবে ৬০ থেকে ৮০ মিটারের সৈকতাপসরণ ব্যাখ্যা করা যায়। এ মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই ধরণের যত খাতের সন্ধান মিলেছে তার বেশীর ভাগ এখনও যৌবনাবস্থায় আছে বলে ভূতাত্ত্বিক অতীতে বহুসংখ্যক এই ধরণের খাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। এদের উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণের সম্পূর্ণ সন্ধান এখনও মেলে নি।

সুয়েস্ বলেন যে, তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর আয়তন ক্রমেই কমে যাচ্ছে, যার জন্যে নমনীয় ভূত্বক সঙ্কুচিত হয়ে সমুদ্রের গভীরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে; ফলে সৈকতাপসরণ ঘটছে। কিন্তু তিনি এই সঙ্কোচনের পর্যায়ক্রমিকতার কোন উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেন নি।

কস্‌মাতের মতানুযায়ী সমুদ্রতলে ভূ-আলোড়ন জাতীয় পরিবর্তন সৈকতাপসরণ ইত্যাদির জন্যে দায়ী; কিন্তু সমস্থিতিমূলক সমতা রক্ষার জন্যে সমুদ্রগর্ভের আয়তন এভাবে কমতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত

কয়েক হাজার কি. মি. লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতমালাকে দেখানো যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ভূত্বকের সিয়াল বা হাল্কা স্তর এখানে যেন উঁচু হয়ে আছে; কিন্তু সমস্থিতিমূলক সমতা রক্ষা করে আছে বলেই এটা থাকা না থাকার উপর সমুদ্রগর্ভের আয়তন একেবারেই নির্ভর করে না; আর সমস্থিতি রক্ষা না করে অনুভূমিক শক্তির প্রভাবে যে এ ধরণের ব্যাপক আলোড়ন সম্ভব নয়, তা ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের সান্দ্রতা, পীড়ন-সহনক্ষমতা ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মান থেকে দেখানো যায়।

জলির মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের বেশী অংশ কঠিন অবস্থায় থাকলেও তাদের তাপমাত্রা গলনাঙ্কের খুব কাছাকাছি। স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদির জন্যে এই তাপমাত্রার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের বর্গফলে অনুরূপ পরিবর্তন আসে. কিন্তু হিসাব করে দেখানো যায় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে এভাবে ১% অংশের বেশী হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না। জলি অবশ্য বলেন যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মহাদেশগুলি নমনীয় ভূত্বকের মধ্যে নেমে যাবে এবং সৈকতাগ্রসরণ ঘটবে, আর তাপমাত্রা কমে গেলে ফল ঠিক বিপরীত হবে। এখানে আবার পৃথিবীর আয়তন বৃদ্ধি ও মহাদেশের নীচে নেমে যাওয়ার ফল বিপরীতধর্মী। জলি তাপমাত্রার এই হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণ দেখিয়েছেন; কিন্তু কুয়েনেন 'তাপমাত্রা বিবর্তন চক্রকে' তটরেখার পরিবর্তনের সন্তোষজনক কারণ বলে মনে করেন না।

সাইনেজ, সমুদ্রে অভিকর্ষের ব্যতিক্রমের যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার উপর নির্ভর করে হোম্‌স্‌ ভূগর্ভের তরল ও নমনীয় স্তরগুলির মধ্যে এক ধরণের পরিচলন স্রোতের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। এই স্রোত উপরে ওঠবার সময় যদি ভূত্বকের যে অংশে স্থলভাগ আছে তার নীচে এসে পৌঁছায় এবং সমুদ্রাঞ্চলের নীচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলতে থাকে তাহলে স্থলভাগ উঁচু হয়ে যাবে, সমুদ্রতল নীচে নেমে যাবে এবং সৈকতাপসরণ ঘটবে; এই ব্যবস্থা বদ্‌লে গেলে সৈকতাগ্রসরণ ঘটবে। এ স্রোতের টান এত প্রবল হবে যে, ভূত্বক এতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এ ধরণের স্রোতের প্রখরতা অনিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমিক হতে পারে এবং গতি সান্দ্র পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতি ধীর হবে। তাই অন্যান্য মতবাদের তুলনায় একে বেশী সন্তোষজনক বলে মনে হয়। কিন্তু এমন কোন স্রোতের অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি; বরং বিভিন্ন ভূকম্পীয় ঢেউয়ের বেগ থেকে নানা জায়গায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরগুলির যে বিন্যাস ও বেধ পাওয়া গেছে, তা এই মতবাদকে সমর্থন করে না।

তটরেখার স্থায়ী ও ব্যাপক পরিবর্তনের যাবতীয় সম্ভাব্য কারণগুলি আলোচনা করে দেখা গেল যে, ভূত্বকের উপরে বা মধ্যে জাত কোন প্রক্রিয়া ছোট পরিবর্তনগুলিরও ব্যাখ্যা করতে পারে না; ভূ-আলোড়ন এবং পৃথিবীর বহিঃস্থ কোন কারণও এজন্যে যথেষ্ট নয়। সম্ভবতঃ ভূত্বকের নীচে কোন পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াতে শেষ পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে একথা ঠিক যে, জলভাগ ও স্থলভাগ সব সময় মোটামুটি এক ধরণের সমতা রক্ষা করে চলেছে। স্থলভাগের পরিমাণ কখনও কোন কারণে বেড়ে গেলে আবহবিকার, বহন এবং গভীর সমুদ্রে অবক্ষেপণ বেড়ে গিয়ে সমুদ্রগর্ভের আয়তন কমে যায়, সৈকতাগ্রসরণ ঘটে ও স্থলভাগের পরিমাণ হ্রাস পায়। স্থলভাগের বর্গফল বা উচ্চতা কম থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠ অল্প উঁচুতে উঠলেই স্থলভাগের অস্তিত্ব লোপ পেত; কিন্তু তখন আবহবিকার ইত্যাদিও কমে যায়। এজন্যে ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগের অস্তিত্ব ছিল না বা সমুদ্রের বর্গফল অত্যন্ত কম ছিল, এমন কখনই ঘটে নি।

মানুষের সময়ের জ্ঞানের তুলনায় এসব পরিবর্তন এত আস্তে আস্তে ঘটে যে, দু-এক শতাব্দী লক্ষ্য করেও মানুষ বিশেষ কোন পরিবর্তন ধরতে পারে না। তাই এসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান এখনও অনেকটা অসম্পূর্ণ।

নিদ্রা

শ্রীসন্তোষকুমার দে

মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ—এমন কি, বৃক্ষলতাও নিদ্রা যায়। নিদ্রা কেন হয়, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঘুমের বিষয়টা যে কি, তা নিয়ে কেবল আজ নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকেই গবেষণা চলে আসছে এবং বিভিন্ন মতবাদও গড়ে উঠেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে হিরাক্লিটাস নামে এক গ্রীক দার্শনিক নিদ্রার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে নিদ্রার কারণ হলো, মানুষের শরীরে যে জল (রস ?) আছে সেই জল যখন অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে, তখন শরীরের যে অগ্নি (উত্তাপ ?), তা নিবে যায় এবং তার ফলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। নিদ্রাকালে অগ্নির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায় এবং যে যার আপন জগতে ফিরে যায়। প্রভাতে উষার আলোর সঙ্গে আমাদের আত্মা (যার মধ্যে অগ্নি ও জল সমপরিমাণে আছে) স্থিরাবস্থায় এসে উপস্থিত হয় এবং এই স্থিরাবস্থাকে আমরা জাগরণ বলি। কিন্তু আত্মার মধ্যে অগ্নি ও জল চিরদিন স্থিরাবস্থায় থাকে না; অগ্নি বা জল, কোনও একটি প্রবল হয়ে ওঠে—ফলে মানুষের হয় মৃত্যু। আজকের দিনে হিরাক্লিটাসের জীবন, মৃত্যু ও নিদ্রার এই তত্ত্বকে লোকে হেঁয়ালি বলেই মনে করবে। তা করুক, কিন্তু তিনি যে মৃত্যু ও নিদ্রার সত্যকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা বোঝা যায়।

পূর্বে কোন কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ বলতেন, মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত সংবাহিত হলে নিদ্রা এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আজ অধিকাংশ লোকই জানে যে, মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চারিত হলে ঘুম তো আসেই না, বরং তাতে ঘুমের ব্যাঘাতই জন্মায়। জাগ্রত অবস্থার চেয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় রক্ত সংবহন বরং কমই হয়। কোন বিষয় অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন অত্যধিক হয় এবং তার ফলে যে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, একথা আজ কারও অজানা নেই।

কোন কোন রসায়নবিদের মতে, কঠিন পরিশ্রমের ফলে সারা দেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে সমগ্র দেহতন্তুর মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষক্রিয়ায় সারা দেহ মুহ্যমান হয়ে পড়ে বলে নিদ্রাকর্ষণ হয়। নিদ্রাকালে দেহযন্ত্র পরিপূর্ণ বিশ্রাম পাওয়ায় দেহে যে বিষ (টক্সিন) ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। কাজেই সকালে যখন ঘুম ভাঙে তখন সবল, সতেজ ও সুস্থ মনে হয়। এই তত্ত্বের মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও একে পুরাপুরি মেনে নেওয়া চলে না। কারণ, এ-কথা অনেকেই জানেন যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিদ্রাকে বিলম্বিত করা চলে; তা ছাড়া সম্মোহনের দ্বারাও নিদ্রাকর্ষণ করা যায়। Dr. Boriee Sydice বিড়াল, কুকুরের চোখ মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে অসময়ে তাদের ঘুম পাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু এ সব তথ্য থেকে নিদ্রার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।

এবার ফ্রয়েডের মত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড বলেন, নিদ্রা হলো শারীর-বিদ্যা ও জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক একটা দুরূহ সমস্যা, যার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত বহু বাদানুবাদ চলছে এবং যার স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং সেটা হলো এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন ধীরে ধীরে নিদ্রা এসে

উপস্থিত হয়। নিদ্রার সময় বহির্জগতের যত কিছু উত্তেজনা, অবসাদ দূরে সরে যায়। এ ছাড়াও যখন ক্লান্তি ও অবসন্নতা আসে তখন যেন ঘুমাতে ইচ্ছা করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, নিদ্রার জীব-বিজ্ঞানগত উদ্দেশ্য হলো, সঞ্জীবনী শক্তিলাভ আর মনো-বিজ্ঞানগত উদ্দেশ্য হলো, বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ। এ জগতে আমরা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় এসেছি এবং এ আসা ও থাকা সম্ভব হয়—ছেদ বা বিরতি আছে বলে। মাঝে মাঝে নিদ্রার মাধ্যমে যখন এ বিরতি আসে, তখন যেন আবার সেই পূর্বজগতে, অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাই বা যাবার চেষ্টা করি। তাই নিদ্রার জন্যে প্রয়োজন হয় মৃদু উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, উত্তেজনার অভাব—যে অবস্থায় ভ্রূণ মাতৃগর্ভে থাকে। মানুষের নিদ্রাকালীন অঙ্গবিন্যাস দেখলে এ সত্য অনেকটা উপলব্ধি হবে। দেখা যাবে, কেউ বলের মত একেবারে গোল হয়ে ঘুমায়—ঠিক যেমন মানুষ ভ্রূণ অবস্থায় ছিল। এই থেকে বোঝা যায় যে, নিদ্রার স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন।

মনে হয় নিদ্রা সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্যাভ্লব নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করে প্যাভ্লব জানতে পারেন যে, মানুষ সারাদিন শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তায় মগ্ন থাকলে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে উত্তেজিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে এই উত্তেজনা মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের কোষগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ক্ষণভঙ্গুর। দীর্ঘকাল পরিশ্রমে স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ক্রমেই দেহযন্ত্রে ও দেহের রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন এসে উপস্থিত হয়। তার ফলে আসে শ্রান্তিবোধ ও অবসাদ। এই অবসাদ রেল-লাইনের বিপদজ্ঞাপক লাল আলোর মত কাজ করে। এখানে মনে রাখা দরকার, শ্রান্তিবোধ ও অবসাদ—এ দুটি শব্দ সমার্থক নয়। শ্রান্তিবোধ হলো—কাজের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, আর অবসাদ হলো—কাজে নিরুৎসাহ বোধ। অবসাদে নেই অনিষ্টকর পরিণতি এবং যথেষ্ট বিশ্রামের পর অবসাদজনিত পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। এ অবসাদ যদি মানুষের না আসতো এবং মানুষ যদি একটানা পরিশ্রম করে যেত, তাহলে মস্তিষ্কের ঐ সূক্ষ্ম কোষগুলির একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো। কাজেই এই অবসাদের ফলে এসে পড়ে নিরোধ (ইনহিবিসন) এবং নিরোধই নিদ্রা এনে দেয়। প্যাভ্লবের নিজের কথা হলো—গুরুমস্তিষ্কের কোষগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল; কাজেই তাদের গুরু পরিশ্রমের ফলে ধ্বংসের হাত থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা দরকার। এই নিরোধই সেই রক্ষাকার্য করে থাকে। মস্তিষ্কের কোষগুলিকে অকালে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা প্রশমনের বিষয়ে নিদ্রা বন্ধুর মত কাজ করে। তাই সে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়। নিদ্রায় মানুষ পায় বিশ্রাম; কিন্তু এ-বিশ্রাম এক বিশেষ ধরণের। এ বিশ্রাম কর্মহীনতা বা আলস্য নয়। এতে জীবনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় না; শ্বাস ও পুষ্টিসাধনের কাজ ঠিকমত চলতে থাকে, একটুকুও স্তিমিত হয় না। মনে হয়, নিরোধ যেন মস্তিষ্কের কোষগুলির পথ বন্ধ করে দিয়ে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে কোষের কাজগুলি ভিন্নপথে প্রবাহিত করে দিয়েছে। নিরোধের কাজ হলো অক্লান্ত পরিশ্রমে দেহযন্ত্রে যে রাসায়নিক উপাদানের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন এসে উপস্থিত হয়, তাকে ধীরে ধীরে দূর করা। শারীরিক যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা, ভয় বা মানসিক উত্তেজনা যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তাহলে কর্টেক্সের উত্তেজিত অংশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে এই নিরোধ বন্ধ করে দিয়ে নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে কর্টেক্সে নিরোধ-বিস্তার প্রতিরোধকারী উত্তেজনাগুলি, যেমন—আলো ও শব্দ দূর করে অন্ধকার, নীরবতা,

মৃদু সংগীতের শব্দ, শীতকালে মৃদু উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালে ফুরফুরে হাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সহজেই ঘুম আসে।

প্যাভ্‌লব বলেন—ক্লান্তি ও অবসাদের হাত থেকে জীবদেহকে রক্ষা করবার জন্যে কর্টেক্সের স্নায়ু-কোষগুলিতে নিদ্রা একটা প্রহরারত নিরোধ সৃষ্টি করে। নিদ্রা হলো একটা নিরোধ, যা গুরু-মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থানে মস্তিষ্কের উভয় গোলার্ধে এবং মস্তিষ্কের নিম্নভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। প্যাভ্‌লব তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন কুকুরের উপর পরীক্ষামূলকভাবে নিরোধ সৃষ্টির দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করে। কুকুরের গুরুমস্তিষ্কে নিরোধ প্রয়োগ করে দেখেছেন, সে নিরোধ গুরু-মস্তিষ্কের চূড়া থেকে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে—ফলে কুকুরটি ঘুমিয়ে পড়ে।

নিদ্রাবিষয়ক যতগুলি তত্ত্বের কথা আগে বলা হয়েছে, যেমন—ক্লান্তি, অবসাদ, মস্তিষ্ককোষে বিষ সঞ্চার, স্নায়ুকোষের উত্তেজনা বা উত্তেজনার অবসান প্রভৃতি কারণে নিদ্রা এসে থাকে। এ সব তত্ত্বগুলি পরস্পর বিরোধী। এই সব তত্ত্বের সমন্বয় সাধন হয়েছে প্যাভ্‌লভের নিরোধ সৃষ্টির তত্ত্বে। আগেই বলা হয়েছে, মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর। প্রবল বা দীর্ঘায়ত ইন্দ্রিয়স্থানের স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনায় এই স্নায়ু-কোষগুলি উত্তেজিত, দুর্বল অথবা অবসাদগ্রস্ত হয়ে নিরোধের পথ প্রশস্ত করে তোলে। উল্লিখিত কারণগুলি এককভাবে অথবা অন্যান্য কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া এনে নিদ্রাকর্ষণ করে। কাজেই এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, নিদ্রাবিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বগুলি প্যাভ্‌লবের তত্ত্বের পরিপন্থী নয়। প্যাভ্‌লবের এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নিস্তব্ধতা, অন্ধকার, মৃদু একটানা শব্দ প্রভৃতি নিদ্রাসহায়ক কারণগুলি ব্যাখ্যা করা চলে। এসব অনুকূল পরিবেশগুলির মধ্যে কোনটা মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার কোনটা নিয়ন্ত্রিত উত্তেজক (Conditioned stimulus) হিসাবে নিদ্রার সহায়তা করে।

নিরোধের ফলে যে নিদ্রার সৃষ্টি হয় তার আর একটা প্রমাণ হলো—অগভীর বা অতি অল্প নিরোধ সমগ্র মস্তিষ্ক-চূড়ায় প্রভাব বিস্তার না করে' যদি মস্তিষ্কের একটি বা দুটি অংশে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে মস্তিষ্কের ঐ অংশগুলি নিস্তেজ হয়ে মাত্র ঐ বিশেষ বিশেষ অংশে নিদ্রার সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত আংশিক নিদ্রাকে সংবেশন বা হিপ্‌নটিজম বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সংবেশনের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এবং নিদ্রা ও সংবেশনের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ রেখাটি ধরতে পারেন নি। প্যাভ্‌লবের এই গবেষণায় সংবেশনের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে।

নিদ্রা বিষয়টা কি ও তার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের তথ্য আলোচনা করা হলো। এবার নিদ্রার আর একটা দিকের বিষয় আলোচনা করা যাক। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ অ্যালফ্রেড এড্‌লার মানুষের নিদ্রা যাবার ভঙ্গী থেকে মানুষের চরিত্র নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষ চিৎ হয়ে, টান হয়ে, উবুড় হয়ে বা কুঁকড়ে বিভিন্নভাবে ঘুমায়। তিনি বলেন, এই বিশেষ বিশেষ ঘুমাবার ভঙ্গী দেখে তাদের চরিত্র এবং আশা-আকাঙ্খার বিষয় নির্ণয় করা চলে। তিনি এর নাম দিয়েছেন জীবন লিপি বা অর্গান ডায়ালেক্ট। তিনি লিখেছেন—

খুব ছোট শিশুরা চিৎ হয়ে শোয় এবং শোবার সময় তাদের হাত দুটা উপর দিকে ওঠানো থাকে। শিশুদের এ অবস্থায় ঘুমাতে দেখলে বুঝতে হবে, তারা বেশ সুস্থ ও রোগশূন্য। পূর্ণবয়স্ক লোককে চিৎ হয়ে হাত-পা লম্বা করে ঘুমাতে দেখলে বুঝতে হবে, তার জীবনে বড় হবার আকাঙ্খা আছে। যে লোক মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে ঘুমায়, বুঝতে হবে সে লোক উদ্যোগী ও পরিশ্রমী তো নয়ই বরং ভীরু কাপুরুষ। উবুর হয়ে যে লোক ঘুমায়, সে লোক হয় একগুঁয়ে।

প্রাণীমাত্রেরই নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন। নিদ্রা আনে নবজীবন। অনাহারে জীবের মৃত্যু হয়, একথা সকলেই জানে; কিন্তু অনিদ্রায় তার চেয়ে কম সময়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এ বিষয়ে কুকুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কুকুরকে দীর্ঘকাল ঘুমোতে না দিলে তার স্নায়ুতন্ত্রের, বিশেষ করে কর্টেক্সের পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই পরিবর্তন কোষগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে। জীবদেহকে ক্লান্তি ও অবসাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্যাভ্‌লব বলেন—স্নায়ুকোষগুলিতে একটা প্রহরারত নিরোধের সৃষ্টি হয়। নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের যে সব অংশ বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখে, প্যাভ্‌লব তার নাম দিয়েছেন কর্টেক্সের প্রহরা-কেন্দ্র। এই প্রহরা-কেন্দ্র কর্তব্যপরায়ণ সতর্ক প্রহরীর মতই সদাজাগ্রত থেকে অনেক সময় মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। তাই দেখা যায়, শুশ্রূষাকারী পীড়িত ব্যক্তির শিয়রে বসে ঢুলছেন; বোমাবর্ষণ, কামান গর্জন বা গৃহপতনের শব্দও হয়তো তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না; কিন্তু রোগীর সামান্যমাত্র কাৎরানিতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। মস্তিষ্কের অতি উত্তেজনা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। উত্তেজনা অতিরিক্ত হলে নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে নিদ্রার দরকার। ঘুমাবার কাল অবশ্য বয়স অনুসারে কম-বেশী হবে। বয়স্ক লোকের অন্ততঃ ৭ ঘণ্টা, আর ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের অন্ততঃ ৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। শিশুদের ঘুমানো দরকার আরও বেশী। ঘুমাবার সময় কোমরের কাপড় ঢিলে করে দেওয়া দরকার, তাতে রক্ত চলাচল ঠিকভাবে হতে থাকবে। কারণ নিদ্রার সময় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ হ্রাস পায়। শ্বাসযন্ত্র ও রক্তসংবহন যন্ত্রের কার্যকলাপে পরিবর্তন আসে, নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হ্রাস পায়। শরীর আড়ষ্ট না রেখে শিথিল করে শোওয়া দরকার এবং ঘরের জানালা খুলে রেখে যাতে বাতাস চলাচল অব্যাহত থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিদ্রার রোগ-নিবারণ ক্ষমতা দেখে বর্তমানে অনেকে মানসিক ও স্নায়ুতন্ত্র রোগ নিদ্রার দ্বারা ভাল করবার চেষ্টা করছেন। একে বলা হয় স্লিপ-থিরাপি। ব্রোমিন ও ইনসুলিন প্রয়োগে ঘুম পাড়িয়ে অনেক মানসিক রোগ উপশম করা সম্ভব। প্যাভ্‌লব এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সঞ্চয়ন

মানব-কল্যাণে জীবাণু

ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান মানব-কল্যাণে জীবাণুর অবদান সম্পর্কে লিখেছেন—জীবাণুর অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়ার অনেক আগে থেকেই জীবাণু নানাভাবে মানুষের সেবা করে আসছে। সেই অতীতের যাযাবর মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের গবাদি পশু, ভেড়া ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীদের জন্যে শ্যামল প্রান্তরের সন্ধানে—সেদিন তাদের দুগ্ধ-সংরক্ষণের জন্যে নির্ভর করতে হতো এই জীবাণুর উপর। ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ব্যাক্‌টেরিয়া দুধ টকিয়ে দই করে দিত এবং তাতে দুধ পচতে পারতো না।

তারপর মানুষ ঘর বাঁধতে শিখলো, জমির উপর নির্ভর করতে লাগলো—শস্য তার অন্ন চিন্তা ঘোচালো। এবার তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল নতুন ধরণের জীবাণু।

‘লেভন’ নামে বিশেষ গাঁজলা মানুষকে রুটি

তৈরী করতে সাহায্য করলো। অন্যান্য জীবাণু আঙ্গুরে গাঁজলা সৃষ্টি করে যোগালো পানীয় মদ, খাদ্যশস্য থেকে তৈরী হলো বিয়ার। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও জীবাণু দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে মানুষের শস্যক্ষেত্রে—শস্যের ফেলে-দেওয়া অংশ থেকে ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এভাবেই শস্যের পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় খোরাক যোগাতে তারা সহায়ক হয়ে উঠেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—বিশেষ করে গত শতাব্দীর শেষার্ধে—জীবাণুর বিষয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের রূপ নিয়েছিল। লুই পাস্তুর, ফার্ডিন্যাণ্ড কোহেন, রবার্ট কক্, পল এরলিখ এবং অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার পর মানব-জীবনে জীবাণুর বিশিষ্ট স্থানের বিষয় অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মোটামুটি দু-শ্রেণীর জীবাণুর অস্তিত্বের বিষয় জানা গেছে—এক ধরণের জীবাণু স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষের মধ্যে নানারকমের রোগ ছড়াচ্ছে, মড়ক আনছে। গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেতের শস্যাদিও এসব জীবাণুর হাত থেকে রেহাই পায় নি। এসব জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে, তাদের ধ্বংস করতে হবে। আর এক ধরণের জীবাণু নানাভাবে গাঁজলা সৃষ্টি করে। এর সাহায্যে মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক নানারকমের রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরী হয়। এদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে চেষ্টা করতে হবে।

প্রাচীন যুগে মানুষ মনে করতো, ব্যাধির মূল হলো দেবতা বা দানব। সে জন্যে দৈববাণী সম্বন্ধে তার আকুতির অন্ত ছিল না, দানবকে দূর করবার জন্যে চলতো নানান প্রচেষ্টা। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই আদিম রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রোগ-সংক্রমণ রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে ব্যাধি-নিয়ন্ত্রণ আজ সম্ভব হয়েছে। প্রথমে কুইনাইনের মত কয়েকটি ভেষজ দ্রব্য, নানা ধরণের টিকা, বিষনাশক ওষুধ ও সিরামের সাহায্যে জ্বর, বসন্ত, ডিপ্থেরিয়া, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হতো। ধীরে ধীরে কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় বা তাদের পরিবর্তে নূতন রাসায়নিক দ্রব্য চালু করা হয়। যেমন পারা ও আর্সেনিক থেকে তৈরী যৌগিক দ্রব্যের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে যৌনব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হয়েছিল। গন্ধক থেকে ওষুধ তৈরী করবার পর থেকে ষ্ট্যাফাই-লোকক্কাস, ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস এবং এণ্টেরিক ব্যাক্টেরিয়াঘটিত অসংখ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে ভাল জীবাণুর উন্নয়ন ও তাদের মানুষের উপকারে লাগাবার জন্যে কাজ চালানো হচ্ছে। অসংখ্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে ব্যাপক হারে জীবাণুর বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে এবং উদ্ভিদ ও জমি রক্ষার জন্যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক শিল্পোন্নয়নের আজ নানা ধরণের সুরাসার, জৈব অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোনের মত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপক হারে তৈরী হচ্ছে। নানা ধরণের এন্‌জাইম ও ভিটামিন, বিশেষ করে বি-৬ ও বি-১২ তৈরী করবার জন্যেও এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবাণু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের ফলেই আজ মদ চোলাই, পনির ও অন্যান্য খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থার এত ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আজ মানুষের সেবায় জীবাণুকে যে কতভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। খাদ্য-সংরক্ষণ থেকে সুরু করে নর্দামার জঞ্জাল সাফ প্রভৃতি সব কাজেই জীবাণুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এভাবে জীবাণুকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কিন্তু অ্যাণ্টিবায়োটিক্স সৃষ্টির ফলে মানুষের সেবায় জীবাণুকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ভাল আর খারাপ জীবাণু

মিলিয়ে তা করা হয়েছে। মানুষের উপকারের জন্যে উপকারী জীবাণু অপকারী জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হয়েছে। উপকারী জীবাণু নানা ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক্স সৃষ্টি করে ক্ষতিকারক জীবাণুর উপর চরম আঘাত দিতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতিতে ঘটেছে বিপ্লব। একদিন যে সব রোগের ফলে মানবজাতি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল, আজ তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কলেরা, প্লেগের মড়কে আগে এত লোক মারা যেত যে, মানুষের ইতিহাসে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতেও অত মানুষ মরে নি। কিন্তু আজ এসব রোগ আর তত মরাত্মক নয়। শিশুদের রোগ প্রায় নেই বললেই চলে। আন্ত্রিক প্রদাহ, গলার রোগ এবং অন্যান্য অসংখ্য সংক্রামক রোগ একা আর আগের মত বিপদ ঘটাতে পারে না। মানুষের আয়ু অনেকটা বেড়ে গেছে। এমন কি, যক্ষারোগ (যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সব চেয়ে বেশী মারাত্মক রোগ বলে পরিগণিত হয়েছে, যার কবলে পড়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোক প্রাণ হারিয়েছে) একেবারে নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে।

রোগ-উৎপাদক জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা কতকগুলি পরিবর্তনশীল দ্রব্যের আছে বলে জানা গেছে। আধুনিক কালের এ হলো অন্যতম অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। মাত্র বিশ বছর আগে এ নিয়ে গবেষণা স্নরু হয়। ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া এবং অ্যাকৃটিনোমাইসেটিসের মধ্যে এক ধরণের জীবাণু যে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে, যাতে বিভিন্ন ধরণের রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা যায়, তা ১৯৩৯ সালের আগেই জানা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছিল; আর পরীক্ষাও চালানো হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টেষ্ট টিউবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। রোগ চিকিৎসার জন্যে তাদের ক্ষমতা পুরাপুরি উপলব্ধি করা হয় নি।

অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক মত আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩৯ সালে। ঐ বছর ডুবয় ব্যাক্টেরিয়াজাত টাইরোথ্রাইসিন সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লোরী, চেন ও তাঁর সহকর্মীরা পুনরায় পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। ঐ বছর আবার গবেষণাগারে উৎপাদন করা হলো অ্যাকৃটিনোমাইসিন। তার পরেই এল ষ্ট্রেপ্টোথ্রাইসিন আর ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন। এসব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার খুলে গেল।

যে সব জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে অ্যাকৃটিনোমাইসেটিসের স্থান পুরোভাগে। সংক্রামক রোগ চিকিৎসার জন্যে বর্তমানে ত্রিশটি বা তারও বেশী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে দুটি বা তিনটি ব্যাক্টিরিয়া থেকে, দুটি বা তিনটি ছত্রাক থেকে, আর বাকী পঁচিশটি অ্যাক্টিনোমাইসেটিস থেকে উৎপন্ন হয়। এ-পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক্সের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেনিসিলিন আর ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন। পৃথিবীতে যত সংক্রামক রোগ আছে তার প্রায় নব্বই শতাংশ এইগুলি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অ্যান্টিবায়োটিক্স শুধু যে মানুষের বন্ধু তা নয়, হাঁস-মুরগীর রোগের চিকিৎসার জন্যেও এগুলির প্রয়োজন। উদ্ভিদের কয়েকটি রোগ দূর করবার জন্যেও এগুলি ব্যবহৃত হয়।

আজ মানুষের জীবনে জীবাণু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—তার খাদ্যশস্যের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে; জঞ্জাল দূর করা, মূল্যবান শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, আর নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তাই জীবাণুকে বলা হয় মানব-বন্ধু।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

ইউ. এস-এর একটি সৌরচুল্লীর একাংশের দৃশ্য। রিফ্লেক্টর থেকে প্রতিফলিত সংহত আলোক-রশ্মিতে একটা কাঠি ধরলেই সেটা দপ করে জ্বলে ওঠে।

কাঁকড়ার কথা

কাঁকড়া আমাদের খুবই পরিচিত প্রাণী। এদের মস্তকের সম্মুখভাগের বোঁটাসংলগ্ন চোখ এবং হাঁটবার বিচিত্র ভঙ্গী সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা চোখ দুটিকে ইচ্ছামত উঁচু-নীচু করতে পারে এবং প্রয়োজনমত মাথার খাঁজের মধ্যে মুড়ে রাখতে পারে। কাঁকড়া এবং চিংড়ি একই জাতীয় প্রাণী। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কাঁকড়ার শৈশব ও পরিণত অবস্থায় দৈহিক গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে—কাঁকড়া ও চিংড়ি একই গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে দৈহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে। চিংড়ি জাতীয় আদিম জলচর প্রাণীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হয়তো প্রাকৃতিক কোন কারণ বশতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর অগভীর জলাশয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কালক্রমে খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় ডাঙ্গায় বিচরণ করবার ফলে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান দৈহিক আকৃতি ধারণ করেছে, অথবা সমুদ্র-জলে যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটায় ক্রমে ক্রমে স্থলে বিচরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে। জলস্রোত বা ঢেউ-এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীটাণু ডাঙ্গায় এসে পড়ে। জল নেমে গেলে ঐসব কীটাণুর কিছুটা তীরে আটকা পড়ে যায়। সম্ভবত চিংড়ি জাতীয় আদিম প্রাণীরা ঐসব কীটাণু খাবার লোভে তীরের দিকে চলে আসতো। বোধ হয়, লেজের জন্যে ডাঙ্গায় বিচরণে এদের অসুবিধা ঘটেছিল। সে জন্যে ডাঙ্গায় বিচরণকারী আদিম চিংড়ি জাতীয় প্রাণীরা কোন কৌশলে লেজটাকে গুটিয়ে বুকের নীচে রাখতো। এর ফলে তাদের তাড়াতাড়ি চলাফেরা, খাদ্য-সংগ্রহ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা হয়েছিল।

কাঁকড়ার শৈশব অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা প্রায় চিংড়ির মতই দেখতে। শিশু কাঁকড়ার লেজ থাকে এবং লেজের সাহায্যেই তারা জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কাঁকড়া পরিণত অবস্থায় লেজ গুটিয়ে একটি মস্তকসর্বস্ব পিণ্ডাকার শরীর নিয়ে স্থলে বিচরণ করতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ জাতের কাঁকড়াই জল ও স্থল—উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণ করে; আবার কয়েক জাতীয় কাঁকড়া উভচর হওয়া সত্ত্বেও জলে বিচরণ করাই বেশী পছন্দ করে।

কাঁকড়ার ডিম ফুটে কতকটা চিংড়ির মত দেখতে, ক্ষুদ্রাকৃতির বাচ্চা বের হয়। হঠাৎ দেখলে বাচ্চাগুলিকে চিংড়ির বাচ্চা বলে মনে হয়। এই অবস্থায় এরা লেজ ও অন্যান্য উপাঙ্গের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটে। এই অবস্থায় এদের 'জোইয়া' বলা হয়। তারপর এরা ক্রমশঃ খোলস বদ্‌লায় এবং ধীরে ধীরে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। আদি, মধ্য ও পূর্ণ জোইয়া—এই তিন অবস্থা পার হয়ে বাচ্চাগুলি ঠিক চিংড়ির মত

দেহাকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় বাচ্চাগুলিকে মেগালোপা বলা হয়। মেগালোপা অবস্থা থেকে খোলস ত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ার রূপ ধারণ করে। তখন এদের লেজটি প্রসারিত থাকে না, বুকের নীচে গুটিয়ে রাখে। ঠিক কাঁকড়ার আকৃতি ধারণ করবার পূর্ব পর্যন্ত এরা জলেই থাকে—তারপর স্থলেও বিচরণ করে। এই ভাবেই সাধারণতঃ কাঁকড়ার বাচ্চারা বার বার খোলস বদলে ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পায়। শৈশবকালে পাতি-কাঁকড়া অবশ্য মাতৃদেহেই পালিত হয় এবং কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে আরম্ভ করে। কাঁকড়াদের মধ্যে কেউ দলবদ্ধভাবে আবার কেউ বা এককভাবে বিচরণ করে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাজাতীয় কাঁকড়া দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ জাপানের রাক্ষুসে কাঁকড়াই সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। এই কাঁকড়া মানুষের পক্ষেও ভীতিজনক। প্রসারিত অবস্থায় এদের দাড়া দুটি ৬/৭ হাতেরও বেশী লম্বা হয় এবং গোল মাথাটি প্রায় দুটি মানুষের মাথার সমান হয়ে থাকে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির উভচর কাঁকড়াই সংখ্যায় বেশী। এছাড়া আর এক জাতীয় অদ্ভুত স্বভাবের কাঁকড়া দেখা যায়, যাদের বলা হয় গেছো-কাঁকড়া। এরা খাদ্যের সন্ধানে নারিকেল গাছে আরোহণ করে এবং দাড়ার সাহায্যে নারকেলের ছোবড়া কেটে ভিতরের শাঁস উদরসাৎ করে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চার-পাঁচ জাতীয় কাঁকড়া দেখা যায়। নোনা জলের ৫/৭ ইঞ্চি চওড়া কাঁকড়াগুলিকে সীলা-কাঁকড়া বলে। চিতি-কাঁকড়া আকারে খুবই ছোট। সাধারণতঃ এদের নোনা জলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। মিঠা জলে হলদে বা বাদামী রঙের এক জাতীয় কাঁকড়া দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় পাতি-কাঁকড়া। সমুদ্রের নিকটবর্তী নদ-নদীতে রাজ-কাঁকড়া দেখা যায়। উভচর হলেও এরা বেশী সময় জলেই বিচরণ করে। সমুদ্রতটে সাধারণত: ক্ষুদ্রাকৃতির দুই জাতীয় কাঁকড়া দেখা যায়। এরা উভচর হলেও বেশীর ভাগ সময় ডাঙ্গায়ই বিচরণ করে। এদের একটিকে বলা হল সন্ন্যাসী—কাঁকড়া এবং অন্যটি সাধারণভাবে লালকাঁকড়া নামেই পরিচিত। সমুদ্রের বালুকাময় তীরে শামুকের পরিত্যক্ত খোলা যথেষ্ট দেখা যায়। সন্ন্যাসী-কাঁকড়া এই পরিত্যক্ত খোলার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে' খোলাসহ তীরভূমিতে বিচরণ করে। সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার এই চলাফেরার দৃশ্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

বালুকাময় তটভূমিতে অসংখ্য লাল-কাঁকড়া দেখা যায়। এরা তটভূমিতে গর্তের মধ্যে বাস করে। খাবারের সন্ধানে এরা যখন গর্তের মুখে মোটা লাল দাড়াটা উঁচু বসে করে থাকে তখন মনে হয়, যেন পালিতা-মাদারের অসংখ্য লাল ফুল তটভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। দূর থেকে বোঝা খুবই কঠিন—সেগুলি ফুল, না—আর কিছু। এদের স্বভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, এরা গর্তের মুখ ছেড়ে খুব দূরে

যায় না এবং ভয় পেলেই চট্ করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এরা খুবই সন্দেহপ্রবণ। একবার আতঙ্কের কোন কারণ ঘটলে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। এদের দৃষ্টি-শক্তিও খুব প্রখর। গর্তের ভিতর থেকে শিকার বা শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখে। শিকারের আশায় দাড়াটাকে উঁচু করে নিশ্চলভাবে অপেক্ষা করে। এদের ধরাও খুব কঠিন। ভয় পেলে চক্ষের নিমেষে যার যার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গর্তের খুব কাছাকাছি থাকে বলে নিজের গর্ত চিনতে ভুল হয় না। তবে হঠাৎ তাড়া করলে দিগ্ভ্রান্ত হয়ে ভুল গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। তখন গর্তের মালিক ও আগন্তুকের মধ্যে ভীষণ লড়াই লেগে যায়। বেশী শক্তিশালী কাকড়াটিই শেষ পর্যন্ত লড়াইতে জয়লাভ করে। পরাজিত কাঁকড়া হয় অন্যত্র পলায়ন করে, নয়তো প্রাণত্যাগ করে।

লাল-কাঁকড়ার আকৃতি খুবই ছোট এবং গোলাকার—লম্বা ও চওড়ায় এক ইঞ্চিরও কম। এদের গায়ের রং খুব লাল না হলেও দাড়ার রং টক্‌টকে লাল। এদের একটি মাত্র দাড়াই আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার এবং দেহ অপেক্ষা দাড়াটি খুবই বড়; কিন্তু অপর দাড়াটি খুব ছোট। গর্তের বাইরে বিচরণ করবার সময় বড় দাড়াটিকে খাড়া করে রাখে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন দাড়াটি দেখলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না যে, অতটুকু প্রাণীর এত বড় দাড়া হতে পারে। অপর দিকের ছোট দাড়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। ঢেউ বা জলের স্রোতে তটভূমি প্লাবিত হলে এরা গর্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। জলের ধাক্কায় বালি পড়ে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জল নেমে যাবার পর এরা গর্তের মুখের বালি সরিয়ে বেরিয়ে আসে এবং ঢেউয়ের সঙ্গে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী চড়ায় আটকা পড়ে, তাদের ধরে উদরসাৎ করে। সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলে লাল কাঁকড়া ও সন্ন্যাসী-কাঁকড়া প্রচুর দেখতে পাবে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানবার কথা

১। জোনাকীর সঙ্গে সবাই পরিচিত। এরা স্নিগ্ধ নীলাভ আলো দেয়। বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা—একদিন হয়তো এই জোনাকীর আলোই জীবনের রহস্য সমাধানের নতুন পথের সন্ধান দেবে। সাধারণ পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হলেও বিজ্ঞানীদের নিকট এর গুরুত্ব অসাধারণ। তাঁরা বলেন—উদ্ভিদ সূর্যের আলো-কে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে। জোনাকী আবার রাসায়নিক শক্তিকে স্নিগ্ধ আলোয় পরিবর্তিত করে। যে কোন বিদ্যুৎ-উৎপাদক কোম্পানী অপেক্ষা এরা ভাল ভাবেই আলো উৎপাদন করতে সক্ষম। একটা বৈদ্যুতিক বাতির অধিকাংশ শক্তিই উত্তাপ রূপে ব্যয়িত হয়ে যায়। এ হিসেবে শতকরা ৯৫ ভাগ উত্তাপহীন আলো উৎপাদনে জোনাকী খুবই সুদক্ষ—অর্থাৎ এরা যে আলো

বিকিরণ করে তাতে উত্তাপ থাকে না। কিন্তু এদের আলো দেবার ক্ষমতা খুবই কম

১নং চিত্র

১৩৭,০০০ জোনাকীর আলো একটি ৬০ ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির আলোর সমান হতে পারে।

২। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতম খনি কোন্‌টি? বিশেষজ্ঞরা বলেন—ভারতবর্ষের মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলের উরেগাম অব্ দি চ্যাম্পিয়ন রিফ স্বর্ণখনিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতম। এই খনির
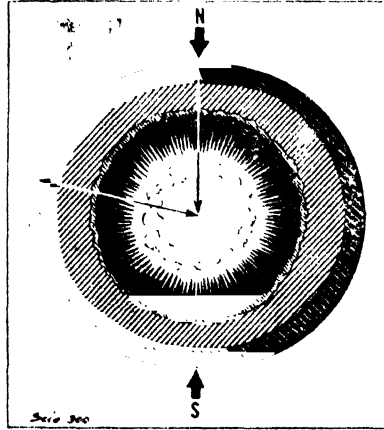
২নং চিত্র

গভীরতম স্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯৮১১ ফুট নীচে অবস্থিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন উরেগাম খনির গভীরতা যে পৃথিবীর কেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটে পৌঁচেছে, এই দাবী করা যায় না। কারণ মেরুদ্বয়ের নিকট পৃথিবী কিঞ্চিৎ চাপা কাজেই মেরু অঞ্চল ভূ-কেন্দ্রের অধিকতর নিকটবর্তী। এই হিসাবে মেরু-অভিযাত্রী রবার্ট ই. পিয়ারী ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল ভূ-কেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থলে প্রথম পদার্পণ করেন।

তারপর অবশ্য ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন নটিলাসের নাবিকেরা পিয়ারীর রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তাঁরা উত্তর মহাসাগরের ৪০০ ফুট নীচুতে অবতরণ করেছিলেন।

৩। মানুষ শক্তি-উৎপাদনের বহু উৎস অনেক কাল পূর্বেই প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় সেই সব উৎস থেকে শক্তি-উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় বাতাস, জলস্রোত, প্রাকৃতিক বাষ্প এবং সৌররশ্মি থেকে শক্তি উৎপাদন করে তাকে
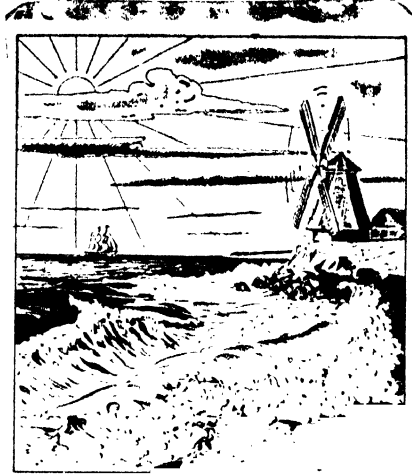
৩নং চিত্র

অনুন্নত অঞ্চল উন্নত করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছেন। কেবল আধুনিক কালেই নয়, অনেক কাল ধরেই মানুষ এই সব শক্তিকে ব্যবহার করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—বাতাসের শক্তিকে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাহাজ চালনা, শস্যাদি —র্করণ, জল তোলা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করে আসছে।

৪নং চিত্র

৪। তারামাছের নাম অনেকেই শুনে থাকবে। এরা একপ্রকার অদ্ভুত সামুদ্রিক

জীব। তারার ন্যায় আকৃতির জন্যে এদের তারামাছ বলা হয়। এদের দেহাকৃতি দেখবার মত। মজার ব্যাপার হচ্ছে—কোন কারণে তারামাছের একটি বাহু শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শরীরের সেই স্থানে নূতন বাহু গজায় এবং বিচ্ছিন্ন বাহুটি একটি সম্পূর্ণ নতুন তারামাছে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চ বাহুবিশিষ্ট তারামাছই সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। কিন্তু কয়েক জাতীয় তারামাছে ৪০টি বাহু আছে বলে জানা গেছে।

৫। মানুষের মাথায় কত চুল আছে? তোমরা হয়তো ভাবছো—একি অদ্ভুত প্রশ্ন! মানুষের চুলের সংখ্যা গুণে বের করা কি সম্ভব? প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত মনে হলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, লাল বর্ণের

৫নং চিত্র

চুলওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষের মাথায় গড়ে ৯০,০০০ চুল আছে, শ্যাম বর্ণের চুলওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষের মাথায় গড়ে প্রায় ১০৫,০০০ চুল আছে এবং পিঙ্গল বর্ণের চুলওয়ালাদের মাথায় আছে প্রায় ১৪০,০০০ চুল।
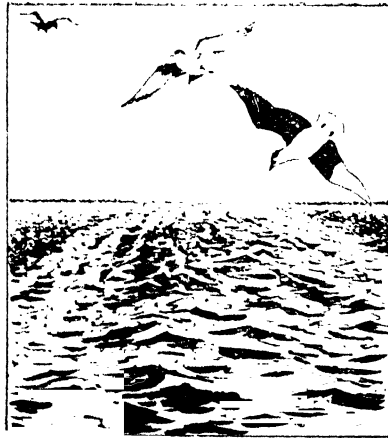
৬নং চিত্র

৬। আমেরিকার অ্যামাজন নদীর কথা সবাই শুনে থাকবে। এই নদীর

স্রোত এত শক্তিশালী যে, আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীর থেকে ১০০ মাইল দূরের জল রাশির লবণাক্ততা দূর করে দেয়।

৭। সব জীবেরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। সাধারণতঃ প্রাণীদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞেরা কিন্তু
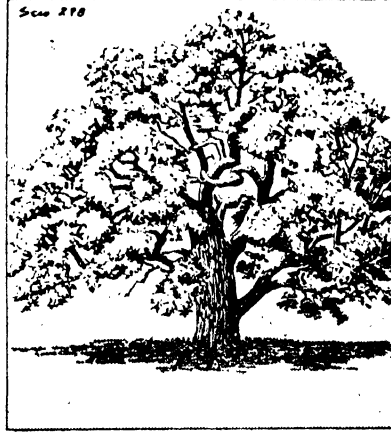
৭নং চিত্র

বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা বলেন—আমৃত্যু উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি হতে থাকে। আবার কোন কোন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র রোগাক্রান্ত অথবা কোন কারণে আহত হলেই উদ্ভিদের মৃত্যু হয়ে থাকে।

৮। ১৯৫৮ সালের ৩রা অগাষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন নটিলাস সর্বপ্রথম উত্তর মেরুতে পৌঁছে যে ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে—সে কথা সবাই
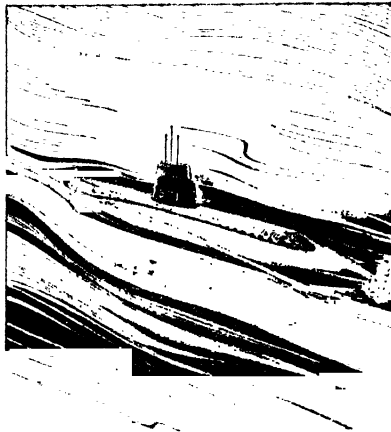
৮নং চিত্র

জান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—যদিও উত্তর মেরু সম্পূর্ণরূপেই সমুদ্রে অবস্থিত তথাপি নটিলাসের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে আর কোন জাহাজের উত্তর মেরুতে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি।

৯। মানুষ নিজের চেষ্টায় বহু বছরের সাধনার ফলে অনেক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে বহু জটিল যন্ত্রপাতির ক্রিয়া-কৌশল খুবই বিস্ময়কর। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—এত বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করা সত্ত্বেও মানুষ

৯নং চিত্র

তার উন্নতির শৈশব অবস্থায় অবস্থান করছে। কেন না, মানুষের তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট বাষ্পীয় ইঞ্জিন শতকরা ৮ ভাগ মাত্র কর্মক্ষম এবং তার সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ডিজেল ও গ্যাসোলিন ইঞ্জিন শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র কর্মক্ষম।

১০। উত্তর মহাসাগরের ভাসমান তুষার-শৈলের তলা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নটিলাস পূর্ব থেকে পশ্চিমের যাত্রাপথে উত্তর মেরুতে পৌঁচেছিল। নটিলাস উত্তর মেরুতে পৌঁছাবার ঠিক পাঁচ দিন পরে যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি

১০নং চিত্র

পরমাণু-শক্তিচালিত সাবমেরিন স্কেট, নটিলাসের যাত্রাপথ অনুসরণ করে' পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার নতুন পথ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। কলাম্বাসের সময় থেকে নাবিকেরা

সমুদ্র-পথে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অর্থাৎ উত্তর মেরুতে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখছিলেন—এই অভিযানের ফলে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

১১। আঙ্গুর আমাদের সকলেরই প্রিয় ফল। ফলগুলি দেখতেও সুন্দর এবং খেতেও সুস্বাদু। পৃথিবীতে আঙ্গুর ফলের চাষ খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই ফল এতই প্রাচীন যে, এর আদি জন্মস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম

১১নং চিত্র

হন নি। তবে একথা সঠিকভাবে জানা গেছে যে, ৬০০০ বছর পূর্বে মিশরবাসীরা আঙ্গুরের চাষ এবং আঙ্গুর থেকে মদ তৈরী করতো। গ্রীক, হিব্রু ও রোমান ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম পুঁথি-পুস্তকেও আঙ্গুর চাষের কথা উল্লেখ আছে।

১২নং চিত্র

১২। বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা—এত দ্রুত-গতিতে জন্মসংখ্যা বাড়তে থাকলে পৃথিবীর অনেক দেশেই স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব দেখা

দেবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশেষজ্ঞগণ চিন্তা করছেন। পৃথিবীতে শতকরা ২০ জন বার্ধক্যের সীমা অতিক্রম করা সত্ত্বেও এখনও কর্মঠ আছে।

১৩। পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি হয়েছে বহু যুগ পূর্বেই। আমরা সকলেই জানি যে, জল না থাকলে জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। এই জল আজও যেমন আমাদের পিপাসা দূর করে, ঠিক তেমনি প্রায় ২,০০০ বছর পূর্বেও সীজারের পিপাসা নিবারণ করতো। জলের ধ্বংস নেই; অর্থাৎ সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি থেকে জল

১৩নং চিত্র

বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘে পরিণত হচ্ছে। বৃষ্টি হওয়ার পর সেই জল আবার সাগর-মহাসাগরে মিশে যাচ্ছে। এভাবেই জলের বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের চক্র অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

২২শে মার্চ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ মৃগাঙ্কশেখর সিংহ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অর্থাভাববশতঃ পরিষদের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা যাইতেছে না বলিয়া তিনি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশের জন্য পরিষদকে এককালীন ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া, পরিষদের জাতিগঠনমূলক কার্যাবলীর উন্নতি ও প্রসারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান

গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের নিকট যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার ভাষণে বলেন—সাধারণ লোকের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১১ বৎসর আগে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকের মধ্যে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা দরকার এবং সেটা সম্ভব হইতে পারে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রচারের দ্বারা। অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ জার্মেনীতে যদি আমরা যাই তাহা হইলে দেখিব, সেখানে শিল্প-কাজে যে সব সাধারণ লোক নিযুক্ত আছে তাহারা অবসর সময়ে জার্মান ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই পড়িয়া নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে। সেখানে সাধারণের উপযোগী বিজ্ঞানের বইও আছে প্রচুর। আমাদের যদি শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়, তবে বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া বা শিল্প শিক্ষার জন্য মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান কয়েকজনকে বিদেশে পাঠাইলে চলিবে না, সাধারণ কারুশিল্পীকে নিজের মাতৃভাষায় নিজের বিষয়টি শিখিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের এমন একটা অভিযান চালাইতে হইবে, যাহাতে যে ভাষায় আমরা কথা বলি, তার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলি সকলে যেন বুঝিতে পারে।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—বিজ্ঞানের প্রচার যে মাতৃভাষায় মাধ্যমে করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। তবে পরিভাষা তৈয়ার করিবার সময় আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত শব্দগুলি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করিব। পরিভাষা সম্পর্কে গোড়ামি থাকা উচিত নহে। পরিশেষে অধ্যাপক কবীর পরিষদের কাজের গুরুত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে আর্থিক সাহায্য দানের আশ্বাস দেন।

সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁহার ভাষণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও সভায় ভাষণ দেন।

বাঁকুড়া ও অণ্ডালে কয়লা খনির সন্ধান

৫ই মার্চ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে খনি ও তৈল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকে. ডি. মালব্য বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় কয়লা খনি সমন্বিত ১৩ বর্গ মাইল এলাকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই এলাকায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা মজুত আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই এলাকায় এই পর্যন্ত চারটি স্তরে কয়লা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে যে ধরণের কয়লা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নাকি নীচু পর্যায়ের।

ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অণ্ডালের নিকট নতুন কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই এলাকায় ৫২ লক্ষ ৬০ হাজার টন কয়লা আছে বলিয়া এই পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই এলাকায় আরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লা থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কয়েকটি স্তরে যে কয়লা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নীচু পর্যায়ের হইলেও অন্য স্তরে প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতে মরু-পঙ্গপালের উপদ্রবের আশঙ্কা

লণ্ডনস্থ পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণা কেন্দ্রের সদ্য প্রকাশিত এক বিবরণী হইতে জানা যায়—ভারতে মরু-পঙ্গপালের উপদ্রব বিস্তারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব আফ্রিকা হইতে আরব উপদ্বীপে পঙ্গপালের আক্রমণ এই বৎসর অনেক তীব্র হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই আক্রমণ আরব দেশের উত্তরে অবস্থিত মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং ইরানে বিশেষ-

ভাবে ব্যাপক হইবে এবং তাহা ক্রমশঃ ভারত, পাকিস্থান এবং আফগানিস্থানে ছড়াইয়া পড়িবে।

বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে, সৌদি আরবের অভ্যন্তরে পঙ্গপালের বংশ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ব্যাপকতা আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকে অবস্থিত দেশসমূহ, ইরান এবং সম্ভবতঃ পাকিস্তানেও লক্ষ্য করা যাইবে।

বৃটেনের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ

বৃটেনে একটি নূতন ৯৮ ইঞ্চি ব্যাসের শক্তিশালী টেলিস্কোপ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বৃটেন ভ্রমণে আসিবেন তাঁহারাও টেলিস্কোপটি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ উক্ত টেলিস্কোপ নির্মাণে ব্যয় হইবে অনুমানিক ৬৬০,০০০ পাউণ্ড এবং ইহা বৃটেনের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ হইবে। বৃটেনের বর্তমান বৃহত্তম টেলিস্কোপের অ্যাপারচারের পরিমাপ হইল মাত্র ৩৬ ইঞ্চি।

টেলিস্কোপটি স্থাপিত হইবে সাসেক্সের অন্তর্গত হার্টমনস্যুর রয়েল গ্রীনউচ অবজারভেটরিতে—ইহা নির্মিত হইতে পাঁচ হইতে ছয় বৎসর সময় লাগিবে। নির্মিত হইবার পর ইহার ওজন হইবে প্রায় ১০০ টন এবং দৈর্ঘ্য হইবে ৩০ ফুট।

বিগবেন শতবার্ষিকী

আগামী ২১শে মে বৃটেনের কমন্স সভার বিখ্যাত ঘড়ি বিগবেন-এর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বি-বি-সি এই ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিই বিশ্বব্যাপী সর্বত্র প্রচার করিয়া থাকে। ঘড়িটি তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে চারবার মাত্র ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ রাখে—একবার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জেপেলিন আক্রমণের জন্য এবং পরে তৃতীয় এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ এবং ষষ্ঠ জর্জের অন্ত্যেষ্টির জন্য।

১৮২৩ সালে বিগবেন প্রথম স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে বি-বি-সির শর্টওয়েভ সার্ভিস প্রবর্তিত হইলে ইহার ঘণ্টাধ্বনি বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হইতে থাকে।

১৮৫৯ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ঘড়িটির দম দেওয়া হইত হাতে। দুইজন লোক এই কাজ সপ্তাহে তিন দিন পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া করিত। পরে মোটর-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে এই দম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এক্ষণে এই কাজ হইতেছে সপ্তাহে তিন বার ৪০ মিনিট করিয়া।

সঠিক সময়ের জন্য বিগবেন বিখ্যাত। কিন্তু তাহাকে আবহাওয়া এবং পাখীর উৎপাতের জন্য কখনও কখনও অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে একবার একটা ময়না পাখী আসিয়া তাহার একটি কাঁটার উপর বসিবার পরদিন সকালে দেখা যায়, ঘড়িটি পাঁচ মিনিট স্লো হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ সর্দির ভাইরাস

বৃটেনের এক চিকিৎসক সাধারণ সর্দির ভাইরাস চিহ্নিত করায় সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া 'ডেইলী মেলে' সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শেফিল্ডের একটি হাসপাতালের গবেষণাগারে ৩২ বৎসর বৎসর বয়স্ক চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ড সাটন এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

অ্যানিটা নাম্নী তিন বৎসর বয়সের একটি জামাইকান বালিকা সর্দিতে ভুগিতেছিলেন। তুলির সাহায্যে অ্যানিটার গলায় অভ্যন্তরের ছোপ লইয়া লইয়া ডাঃ সাটন তাঁহার দ্বারা বানরের তন্তুকোষে সর্দি সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন।

কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর ডাঃ সাটন দেখিতে পান যে, কোষগুলিকে কিছুটা ম্লান দেখাইতেছে—অ্যানিটার সর্দি হইতে কোষগুলি আক্রান্ত হইয়াছে।

সাধারণ সর্দি সম্পর্কে সরকারী গবেষণা ইউনিট জানাইয়াছেন যে, সাধারণ সর্দির ভাইরাস চিহ্নিত করায় ডাঃ সাটন সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

অভিনব ইলেকট্রনিক যন্ত্র

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এমন একটি নূতন ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার সহায়তায় যুগপৎ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর টুকার বলেন, ইহা এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা। বহুক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সম্ভব হইবে। এখন পর্যন্ত আমরা মূলনীতি সম্পর্কেই গবেষণা চালাইতেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ হইয়াছে, তাহাতে আমরা সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইয়াছি।

পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি

জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানীর মতে, আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বর্ষে কুমেরু হইতে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা এই ধারণাই সমর্থিত হয় যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ হইতেছে।

মার্কিন আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ. ই. ল্যাণ্ডস্বার্গ এক বিবৃতিতে বলেন, নব কুমেরু অঞ্চলের উত্তাপ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী ক্রমশঃই উষ্ণ হইতেছে। তিনি বলেন—আমরা ইহার কারণ জানি না, আমরা কেবল ফলটাই জানি। একটি মত হইতেছে, ইহা মনুষ্য-সৃষ্ট; কারণ কয়লা ও তৈল জ্বালাইবার ফলে শূন্যে যে আস্তরণের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বিকিরণের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি ঘটে। আর একটি মত হইতেছে, সূর্যের তাপ-বিকিরণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

নূতন ধরণের যন্ত্রমানব

মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি নূতন ধরণের যন্ত্র-মানব তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা ১০টি শব্দ বুঝিতে পারে এবং ঐ সকল শব্দ সহযোগে ইহাকে কোন আদেশ দিলে, সে তাহা পালন করিতেও পারে। কেবল তাহাই নহে, এক রকম যন্ত্র আছে যাহা যন্ত্রের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। পরিচালনার জন্য কোন মানুষের প্রয়োজন হয় না। মার্কিন বিমান-বাহিনীর কর্মচারী এবং ম্যাসাচুসেট্‌স ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর বিজ্ঞানীরা এই রকম একটি যন্ত্রমানব সম্প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ডগ্‌লাস রস নামে ২৯ বৎসর বয়স্ক বিজ্ঞানী ইহার উদ্ভাবক।

বিমানসমূহ যেখানে তৈয়ার হইয়া থাকে, সেই কারখানাতেই যন্ত্রমানব সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩ কোটি ডলার বিনিয়োগ করিয়াছেন।

উদ্ভিদের ব্যাধি নিরাময়ে শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার

লেবু গাছের সর্বাধিক বিপজ্জনক ব্যাধি 'মাল্‌সেক্‌কো'র বিরুদ্ধে জর্জিয়ার বিজ্ঞানীরা সাফল্যের সহিত শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করিতেছেন। এত দিন পর্যন্ত এই রোগ একেবারেই চিকিৎসার অতীত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে।

এই অভিনব পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হইবার পরে লেবু গাছে সংক্রামিত বা গুরুতররূপে ব্যাধিগ্রস্ত কলমগুলির সমস্ত উপসর্গ ই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মাটিতে পুতিয়া দেওয়ার পরে এই কলমগুলি সুস্থদেহে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

জর্জিয়ার বিজ্ঞানীরা শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের সহজে বহনযোগ্য সরঞ্জাম নির্মাণ করিয়াছেন। লেবু গাছের রোগ সারাইবার কাজে এই উপায় ও উপকরণ অশেষ সহায়ক হইবে।

পৃথিবীর আকার

নিউয়র্ক হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে—মার্কিন উপগ্রহ ভ্যানগার্ড মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর আকার কিছুটা ন্যাশপাতির মত। আঙুর ফলের মত আকারবিশিষ্ট এই উপগ্রহটি দশ মাস পূর্বে নিক্ষেপ করা হয়।

ন্যাশন্যাল এয়ারোনটিক্‌স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাড-মিনিষ্ট্রেশনের তিনজন বিজ্ঞানী আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় উপরিউক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

এতদিন সকলের ধারণা ছিল—পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ কিছুটা চাপা, অর্থাৎ উহার আকার কমলা লেবুর মত।

বিজ্ঞপ্তি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতা-বর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড়-বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব-বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখক-গণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত **কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না**; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী জুন '৫৯ মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩০শে এপ্রিল '৫৯ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ **কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে** পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে-লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

কর্মসচিব,

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৫৯ | চতুর্থ সংখ্যা

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

গ্যালিলিও বলেছিলেন—Nature's great book is written in Mathematical Symbols। কিন্তু তখন পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির এই বিশাল গ্রন্থখানির অতি সামান্য অংশেরই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিল। তারপর তিন শতাব্দী কেটেগেছে, গ্যালিলিও থেকে স্বরু করে আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সেই পাঠোদ্ধার কার্যে এগিয়ে চলেছেন—যত এগিয়েছেন ততই গ্যালিলিওর উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

এ কথা আজকাল অনেকেই জানেন যে, শুধু কতকগুলি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে গতিশীল বিশ্বের নিয়মাবলীকে প্রকাশ করেছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা। বিশ্বরূপ বর্ণনায় সাহিত্যের ভাষা অক্ষম হয়ে পড়েছে, প্রয়োজন হয়েছে গণিতের ভাষার। কিন্তু শুধু বহির্বিশ্বই নয়, মানুষের মনোজগতের নিয়মের ক্ষেত্রেও গণিতের ভাষা প্রবেশ লাভ করেছে। মনোবিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার স্বরু হয়েছে, তর্ক-বিজ্ঞানের সূত্রগুলিও ধরা পড়েছে গাণিতিক চিহ্নের ফাঁদে।

গণিতের সাহায্যে তর্ক-বিদ্যার নতুন রূপায়ণের ফলে যে নব্য বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বলা হয় ম্যাথেম্যাটিক্যাল লজিক বা সিম্বলিক লজিক। পণ্ডিতেরা এই দুইটি নামের মধ্যে কিছু প্রভেদ নির্দিষ্ট করেন। বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা এদের সমার্থবাচক বলেই ধরে নেব।

উনবিংশ শতাব্দীকেই এই ম্যাথেম্যাটিক্যাল লজিক বা গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের যুগ বলা যেতে পারে। তর্ক-বিজ্ঞানকে প্রথমে গাণিতিক ভাষায় লিখবার প্রয়াস পান ইংরেজ গণিতজ্ঞ জর্জ বুল (১৮১৫—১৮৬৪)। বুল যখন এই নব্য গণিতের সৃষ্টি করেন তখন অতি অল্পসংখ্যক গণিতজ্ঞই একে গণিত বলে স্বীকার করেছিলেন। বর্তমানে এই গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান দর্শন এবং বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং বহু গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক এর তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন।

একটু গোড়ার কথায় আসা যাক। বিশুদ্ধ গণিতকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; একটি হলো Mathematics of the conti-

nuous, যাকে আমরা সাধারণতঃ ক্যালকুলাস বলে থাকি; অপরটি হলো Mathematics of the discrete বা Combinatorial analysis। ধারাবাহিক প্রাকৃতিক ঘটনার (Natural phenomena) তত্ত্বানুসন্ধান করে ক্যালকুলাস্; যেমন—সূর্যের চারদিকে গ্রহের গতি, বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালন, গ্যাসের প্রসারণ ইত্যাদি। Combinatorial analysis-এর কাজ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নিয়ে। বিভিন্ন বস্তু তাদের বস্তুস্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজমান। সেই বিভিন্ন বস্তুগুলিকে তাদের সাধারণ কোন গুণ অনুসারে গোষ্ঠিভুক্ত করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর তুলনামূলক তত্ত্ব অনুসন্ধান করা কম্বিনেটরিয়াল অ্যানালিসিসের কাজ। বস্তু বলতে এখানে ব্যবহারিক অর্থে বস্তু বোঝাবে না; বস্তু মানে সংখ্যা হতে পারে, মানুষ হতে পারে, বাক্য হতে পারে বা শুধু কতকগুলি গাণিতিক চিহ্নও হতে পারে। বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন এই তত্ত্বানুসন্ধান যে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবশ্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, তা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় একই সময়ে নিউটন ইংল্যাণ্ডে এবং লাইব্‌নিৎস্ জার্মেনীতে ক্যালকুলাস (of the continuous) আবিষ্কার করেন। গণিতের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু নিউটন প্রকৃতিকে শুধু একই দিক থেকে দেখেছিলেন—সে হলো Continuous; কিন্তু লাইব্‌নিৎসের দৃষ্টি দু-দিকেই ছিল। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, তর্ক-বিজ্ঞান 'কম্বিনেটরিয়্যাল অ্যানালিসিসের'ই অঙ্গ। তাছাড়া তিনি এমন এক বিশ্বজনীন গণিতের (Universal mathematics) কল্পনা করলেন, যার মধ্যে তর্ক-বিদ্যার অবরোহিক পদ্ধতির (Deductive reasoning) সূত্রগুলিকে গাণিতিক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যাবে। একমাত্র গণনার ভুল ছাড়া এই ক্যালকুলাস অব্ রিজ্‌নিং-এ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না। কিন্তু সেই সময়ে নব আবিষ্কৃত 'ক্যালকুলাস অব্ দি কন্টিনিউয়াস' বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এমন ঝল্‌সে দিয়েছিল যে, তাঁরা আর অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পান নি। কাজেই লাইব্‌নিৎসের এই আবিষ্কার একেবারে যবনিকার অন্তরালে রয়ে গেল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে বুল সেই যবনিকা অপসারণ করেন এবং বিংশ শতাব্দীতে রাসেল এবং হোয়াইটহেড প্রণীত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা' তাকে একেবারে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এল।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও নৈয়ায়িক ডি মর্গ্যানের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। ইনি বুলের বিশিষ্ট বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। কোন বিষয় নিয়ে এই ডি মর্গ্যানের সঙ্গে স্কচ্ মেটাফিজিসিয়ান হ্যামিলটনের দ্বন্দ্বে বুল বন্ধুর সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন। এই সূত্রেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম পুস্তিকা "The Mathematical Analysis of Logic" প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যেই ১৮৩০ সালে গণিতজ্ঞ পিকক তাঁর 'Treatise on Algebra' প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন—প্রাথমিক বীজগণিতে বর্ণিত সূত্রগুলিতে [যেমন—$x+y=y+x$, $xy=yx$, $x(y+z)=xy+xz$ ইত্যাদি] ব্যবহৃত x, y, z শুধু কতকগুলি সংখ্যার প্রতীক, এই ধারণা সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক। x, y, z হলো শুধু কতকগুলি গাণিতিক চিহ্ন। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা হচ্ছে আরো কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে; যেমন—+, × ইত্যাদি। এই +, × যে শুধু যোগচিহ্ন বা গুণচিহ্নই হতে হবে, তার কোন মানে নেই। প্রয়োজন অনুসারে স্রষ্টা এদের অর্থ নিরূপণ করে দিতে পারেন। এই x, y, z···+, ×··· ইত্যাদির নতুন নামকরণ হলো—'গাণিতিক উপাদান' (Mathematical elements)।

পিককের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশুদ্ধ গণিতের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত করে দিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এলেন বূল। তিনি প্রথমে এই গাণিতিক উপাদান +, ×-কে তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে x. y. z থেকে পৃথক করেন এবং পৃথকীকৃত চিহ্নগুলির নিজস্ব গুণাগুণ বিচারে অগ্রসর হন। এই অনুশীলনের ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা হলো এই—

'বাস্তবিকই ভাষার প্রকৃতির মধ্যেই এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ভাষার উপাদান গাণিতিক চিহ্নগুলি নির্ধারিত হয়। এই উপাদানগুলির ব্যাখ্যা খানিকটা অনির্দিষ্ট এবং প্রচলিত ব্যবহারগত (Conventional); আমরা এদের স্বেচ্ছানুরূপ অর্থে প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু এই অধিকার দুটি অত্যাবশ্যক সর্তে সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ একবার যে অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, একই প্রক্রিয়ায় আমরা তার পরিবর্তন করতে পারবো না এবং ব্যবহৃত চিহ্নের পূর্বনির্ধারিত অর্থের ভিত্তিতেই তর্কপদ্ধতির সূত্রগুলিকে গঠিত করতে হবে'—(Laws of Thought—Boole)।

এই পদ্ধতির অনুসরণ করে বূল যে নতুন বীজগণিতের সৃষ্টি করেন, পরবর্তী যুগে তার নামকরণ হলো 'বূলিয়ান অ্যালজেব্রা'।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বূলের "An Investigation into the Laws of Thought on which are founded the Mathematical Theory of Logic and Probability" পুস্তক প্রকাশিত হলো। লজিকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট অ্যারিষ্টটলের রাজত্বে বূল তাঁর গাণিতিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করলেন। সাম্রাজ্য জয় করে নিলেন—এ কথা বলা উচিত হবে না, তবে রাজ্যের রূপ বদলে দিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ বূল বলেছেন—

'এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য, মানুষের মনে যুক্তি-প্রক্রিয়া যে নিয়ম অনুসারে সাধিত হয় তার মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধান করা। তাদের গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা এবং সেই ভিত্তিতে তর্ক-বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।'

আগেই বলা হয়েছে, তর্ক-বিজ্ঞানকে গাণিতিক চিহ্নের সাহায্যে সুসংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বূল যে নব বীজগণিত সৃষ্টি করেন, পরবর্তী যুগে তাকেই তাঁর নাম অনুসারে 'বূলিয়ান অ্যালজেব্রা' বলা হয়। এই গণিতে তর্কবাক্যগুলিকে (Proposition) +, −, ×, x, y, z, u, v, w ইত্যাদি চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে x, y, z, u, v, w ইত্যাদি এক একটি শ্রেণী (class) পরিজ্ঞাপক এবং +, −, × ইত্যাদি সেই শ্রেণী-গুলির পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয়ের চিহ্ন। যেমন, x যদি 'সব বাঙ্গালীদের' বোঝায় এবং y 'পৃথিবীর যাবতীয় পক্ককেশবিশিষ্ট মানুষকে' বোঝায়, তাহলে $x+y$ মানে হলো 'পৃথিবীর যাবতীয় পক্ক-কেশবিশিষ্ট মানুষ এবং যাবতীয় বাঙ্গালীর সমষ্টি'। কিন্তু xy বা $x \times y$ হলো শুধু 'পক্ককেশবিশিষ্ট বাঙ্গালী'—তার মানে সেই সব মানুষ, যাদের মধ্যে কেশের পক্কতা এবং বাঙ্গালীত্ব, এই—উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। দেখা গেছে, সাধারণ বীজগণিতে ব্যবহৃত প্রায় সব সূত্রই এই বীজগণিতে প্রযোজ্য। এখানে O মানে এমন একটি শ্রেণী, যার সভ্যসংখ্যা শূন্য (null class) এবং I হলো সার্বজনীন শ্রেণী (Universal class)—মানে যার মধ্যে সবগুলি শ্রেণীই বর্তমান। O এবং I-এর সংজ্ঞা এভাবে নিরূপণ করলেই $x . O = O$. এবং $x . I = x$ হতে পারে। এই বীজগণিতে $x . x = x$। মেটাফিজিক্সের স্বতঃবিরোধ সূত্রটি (Principle of contra-diction)—যেমন, একটি জিনিষের মধ্যে একটি গুণ একই সময়ে বর্তমান থাকা এবং না থাকা অসম্ভব—বূলের ভাষায় অনুবাদ করলে তার রূপ হবে—

$$x = x^2,$$

কারণ $x = x^2$ হলে, $x - x^2 = O$ বা $x(I - x)$

$=0$। x যদি একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক হয়, তাহলে $1-x$ হলো x ব্যতীত সব শ্রেণী এবং $x(1-x)$ হলো সেই শ্রেণী যা একাধারে x এবং x নয়। সুতরাং এর সভ্যসংখ্যা শূন্য বা গাণিতিক ভাষায়—

$$x(1-x)=0$$

এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ। আবার অ্যারিষ্টটলের সিলোজিজম বা 'ন্যায়' বুলিয়ান তর্ক-বিজ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজেই প্রকাশ করা যায়।

বুল অনুসারে 'সব x-ই y'—এই তর্কবাক্যটিকে $x+y=y$—এইভাবে লেখা যেতে পারে। (অবশ্য এখানে বুলের ব্যবহৃত চিহ্নের সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে)। ঠিক সেই ভাবে 'সব z-ই x' হলো $z+x=x$। সুতরাং

$z+y=z+(x+y)=(z+x)+y=x+y=y$, তার মানে 'সব z-ই y'। তাহলে অ্যারিষ্টটলের লজিকের Barbara বুলের লজিকে রূপ নিচ্ছে—

যদি $x+y=y$ এবং $z+x=x$ হয়, তাহলে $z+y=y$ } = সব মানুষই মরণশীল, = রাম একটি মানুষ, = রাম মরণশীল

ঠিক এই ভাবে—

কোন x-ই y নয়,		$x.y=0$		কোনো মানুষই সম্পূর্ণ নয়,
সব z-ই x	=	$z+x=x$	=	রাম একটি মানুষ
∴ কোন z-ই y নয়		∴ $z.y=0$		∴ রাম সম্পূর্ণ নয়

[প্রমাণ : $z.y=z.y+0=z.y+x.y=(z+x).y=x.y=0$]

কিন্তু বুলের এই বীজগণিতে বহু অমীমাংসিত সমস্যা রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী যুগে সি. এস. পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪) এবং ই. শ্রোডার (১৮৪১-১৯০২) এই সমস্যাগুলির সমাধান দিয়ে বুলের বীজগণিতের একটি সুসঙ্গত রূপ দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "A Contribution to the Philosophy of Notation" নামক রচনায় পিয়ার্স তর্কবাক্যের সত্য-মূল্য (truth-value) নিরূপণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানে এ এক নতুন পথ প্রদর্শন।

গণিতজ্ঞ পিয়ানো তাঁর প্রবর্তিত চিহ্নের জন্যেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রাসেল এবং হোয়াইটহেড 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা'তে পিয়ানোর প্রবর্তিত চিহ্নই ব্যবহার করেছেন। পিয়ানো তাঁর 'Formulaire De Mathematiques' নামক গ্রন্থে গণিতের অন্যান্য শাখাতেও গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। [এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সুসাহিত্য রচনার জন্যে সুগঠিত ভাষা যেমন অপরিহার্য, সুসঙ্গত গণিত সৃষ্টির জন্যেও তেমনি উপযুক্ত চিহ্ন অবশ্য প্রয়োজনীয়।]

গণিতজ্ঞ ফ্রীজকেই (১৮৭৯-১৯০৩) তর্ক-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা যেতে পারে। ইনিই প্রথম 'ন্যায়ে'র ভিত্তিতে ১,২,৩,৪, প্রভৃতি সংখ্যাগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এবং পাটীগণিতের অন্যান্য সূত্রগুলিকেও তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নিজের কথায়—"এই ভাবে পাটীগণিত শুধু তর্ক-বিজ্ঞানেরই ক্রমবিকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে—পাটীগণিতের যে কোন সূত্র তর্ক-বিজ্ঞানের একটি তর্ক-বাক্য।" গণিত-শাস্ত্রকে তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে তাঁর 'Foundation of Arithmetic' নামক গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এইখানেই Logistic বা Logicalism মতবাদের জন্ম, পরে রাসেল হলেন যার ধারক।

তারপরে এল রাসেল ও হোয়াইটহেড প্রণীত যুগান্তকারী প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা। এই গ্রন্থখানি গণিতের ভিত্তিগঠনে এক রেনেসাঁর

সূচনা করলো। ফ্রীজ যে বীজ বপন করেছিলেন তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে চারদিক থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গণিতের নিরপেক্ষ সত্যতার ধারণা পূর্বেই শিথিল হয়েছিল, এবারে তা ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

রাসেল বা লজিক্যালিজম মতবাদ অনুসারে গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান গণিতের শাখা নয়, গণিত এবং তর্ক-বিজ্ঞান একই বস্তু; তর্ক-বিজ্ঞান থেকেই গণিতের জন্ম। ১৯০৩ সালে রাসলের 'Principles of Mathematics' নামক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন—

"সমগ্র বিশুদ্ধ গণিত এমন কতকগুলি ধারণার (Concepts) বিষয়ীভূত, যে ধারণাগুলিকে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটি মূল ধারণার (Fundamental concepts) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এর সব তত্ত্বকেই তর্ক-বিজ্ঞানের স্বল্পসংখ্যক মূলসূত্র থেকে গঠিত করা যায়।"

১৯১০ সালে প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সমগ্র বিশুদ্ধ গণিতকে তর্ক বিজ্ঞানের কতকগুলি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে শুধু বিশুদ্ধ গণিতই নয়, গণিতের যে শাখাগুলিকে আমরা ব্যবহারিক গণিতের অন্তর্গত বলে ধরি, যেমন—গতিবিদ্যা, স্থিতিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদিকেও তর্ক-বিজ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে "বিশুদ্ধ গণিতে যখন দেশ (Space) এবং গতির উল্লেখ করা হয়, তখন বাস্তব ক্ষেত্রে অনুভূত দেশ এবং গতির কথা বলা হয় না। সেগুলি বাস্তব দেশ এবং গতির গুণাবলীবিশিষ্ট এমন কতকগুলি জিনিষ, যাদের জ্যামিতি ও গতিবিদ্যার তর্ক-পদ্ধতির মধ্যে ফেলা যায়।" (রাসেল)

প্রিন্সিপিয়া লজিষ্টিক মতবাদকে উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দেয়। কিন্তু তারপরে এ যাবৎ লজিষ্টিক স্কুলে কাজ খুব বেশী এগোয় নি। প্রিন্সিপিয়া যেমন গণিত-জগতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি একে কঠোর সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'Principles of Mathematics'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। এই সংস্করণে রাসেল নিজেই গ্রন্থখানিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয় বলে বর্ণনা করেছেন [যদিও লজিষ্টিক মতবাদ থেকে সরে আসবার কোন কারণ তিনি পান নি]। পরবর্তী যুগে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন রাসেলেরই শিষ্য L. Wittgenstein। কিন্তু তাঁর গবেষণা বহুলাংশেই প্রিন্সিপিয়ার প্রতিকূলে গেছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্স ব্ল্যাক তাঁর 'The Nature of Mathematics' নামক গ্রন্থে Wittgenstein-এর রচনাকে লজিষ্টিক আন্দোলনের আত্ম-ধ্বংসাত্মক আলোচনা বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রিন্সিপিয়াকে যে দুটি দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার একটি হলো ডি. হিলবার্টের (১৮৬২—১৯৪৩) নেতৃত্বে ফর্ম্যালিষ্ট স্কুল এবং অন্যটি এল. ই. জে. ব্রাওয়ারের নেতৃত্বে ইনটুইসনিষ্ট স্কুল। গণিতের ভিত্তি অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি। ১৯২৮ সালে হিলবার্টের Grundzüde der theorétishen Logik [Principles of Mathematical Logic] গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হিলবার্ট রাসেল এবং পিয়ানোর যুগের ঐতিহ্য খানিকটা বজায় রেখে অথচ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান প্রণয়ন করেছেন। [তবে তিনি পিয়ানো-প্রবর্তিত চিহ্ন ব্যবহার করেন নি। প্রিন্সিপিয়ার চাইতে হিলবার্টের ব্যবহৃত চিহ্ন অনেক সুগম।]

হিলবার্ট তাঁর তর্ক-বিজ্ঞান গড়ে তুলেছেন তর্ক-বাক্যের সত্য-মূল্য নিরূপণের ভিত্তিতে। তিনি প্রথমে যাবতীয় তর্কবাক্যগুলিকেই সামান্য অবধারণ-রূপে (Universal judgement) প্রকাশ করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল লজিকে ব্যবহৃত সামান্য অবধারণকেও তিনি প্রথমে এইভাবে সাজিয়েছেন—

সব মানুষ মরণশীল—সব পদার্থই হয় মানুষ নয়, নতুবা মরণশীল। এখন X যদি 'মানুষের' জন্যে বসে এবং Y বসে 'মরণশীলে'র জন্যে তাহলে 'সব মানুষ মরণশীল'—এর গাণিতিক আকার হবে $\overline{X} \vee Y$। ঠিক এভাবে একটি সামান্য নেতিবাচক অবধারণের (Universal negative judgement), যেমন—'কোন মানুষই সম্পূর্ণ নয়; গাণিতিক আকার হবে $\overline{X} \vee \overline{Y}$; যেখানে X—একটি মানুষ, Y—সম্পূর্ণ। হিলবার্টের গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানে অসামান্য তর্কবাক্য (Particular proposition) বলে কিছু নেই। অ্যারিষ্টটেলিয়ান লজিকে যেটা অসামান্য তর্কবাক্য, যেমন—'কিছু মানুষ বুদ্ধিমান', হিলবার্টের লজিকে সেটাকে লিখতে হবে, 'এটা সত্য নয় যে, সব মানুষই বুদ্ধিমান নয়' এবং গাণিতিক রূপ হবে $\overline{\overline{X} \vee \overline{Y}}$, যেখানে X—একটি মানুষ, Y—বুদ্ধিমান জীব। হিলবার্টের লজিক অনুযায়ী Barbara-র রূপ হবে—

$$\left.\begin{array}{c} \overline{X} \vee Y \\ \overline{Y} \vee Z \\ \hline \overline{X} \vee Z \end{array}\right\} \begin{array}{l} \text{— সব মানুষই মরণশীল} \\ \text{— রাম একটি মানুষ} \\ \text{— ∴ রাম মরণশীল} \end{array}$$

হিলবার্টের লজিকে আর একটি বিশেষ সুবিধা হলো, সব বৈধ ন্যায়কে (Valid Syllogism) মাত্র দুটি প্রধান আকারে নিয়ে আসা যায় এবং উদ্দেশ্য বিধেয়-এর স্থান পরিবর্তনে বাক্যের অর্থ বদল হয় না। এর ফলে হিলবার্টের হাতে ক্ল্যাসিক্যাল লজিক অতি সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করেছে।

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানের কাজ অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বুল যেখানে সুরু করেছিলেন, চিন্তাসূত্র (Laws of thought) সেই শৈশব পেরিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে—তার কলেবর প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান আজ বিশুদ্ধ গণিত ও দর্শনের গবেষণায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই তর্ক-বিজ্ঞান যে শুধু ক্ল্যাসিক্যাল তর্ক বিজ্ঞানের নতুন রূপ দিয়েছে তাই নয়, পুরাতন তর্ক-পদ্ধতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ঘটিয়ে নিত্যনতুন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করছে। লাইব্‌নিৎসের বিশ্বজনীন গণিতের স্বপ্ন সফলতার আলোক দেখতে পেয়েছে।

জীবের আঙ্গিক গঠন

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

একটি মাত্র কোষ নিয়েই হয় জীবদেহের সূচনা। নিষিক্ত ডিম্বকোষটি বিভাজিত হতে হতেই ভ্রূণদেহ গঠিত হয়। বিভাজনের ক্রমপর্যায়ে দেখা দেয় কোষ-স্বাতন্ত্র্য, সৃষ্টি হতে থাকে মাথা, ধড় ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। কোথাও কোন অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় না। দুটি নাক, চারটি চোখ নিয়ে কোন শিশু জন্মায় না। জন্মের পরেও কোন অঙ্গ যে ক্রমাগত বেড়েই চলতে থাকে, এমনও নয়—কোন একটা নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে তাকে থামতে হয়। কোন্ সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি মাত্র কোষ থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমন্বিত এই জীবদেহ গড়ে ওঠে? কিরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলেই বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে? এ সব প্রশ্নের কখনও সমধান সম্ভব—এ ধারণা একদিন বিজ্ঞানী-দেরও কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথারই জবাব পাওয়া যাচ্ছে।

এ রহস্য সন্ধানের প্রথম সূত্রপাত হয় জার্মেনীতে। ১৮৮৮ সালে উইলহেম রক্স ব্যাঙের ভ্রূণ পর্যবেক্ষণের একটি চমকপ্রদ ফল প্রকাশ করেন। ভ্রূণ গঠনের দ্বি-কোষিক পর্যায়ে একটি কোষকে মেরে ফেললে অপর কোষটির অবস্থা কিরূপ হয়? এরূপ অবস্থায় দেখা যায় যে, বাকী কোষটি বিভাজিত হয়ে ব্যাঙাচির দেহের অর্ধাংশ গড়ে ওঠে—হয় মাথার দিক, না হয় লেজের দিক। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, কোষদ্বয়ের এক একটি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের অর্ধেকাংশের গঠন নিষ্পন্ন হয় এবং কোন্ অংশের গঠনে সেগুলি নিয়োজিত হবে তা নির্ভর করে কোষদ্বয়ের অবস্থিতির উপর।

কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই নেপল্স্ থেকে এ সম্বন্ধে অনুরূপ আর একটি পর্যবেক্ষণের ফল প্রকাশিত হয়। সেখানে হ্যানস ড্রিয়েস্চ্ একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের ভ্রূণ কয়েকটি কোষের স্তরে উপনীত হলে, সেই কোষগুলিকে বিভক্ত অবস্থায় কালচার করে দেখেন যে, ঐ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকটি কোষ থেকেই এক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের উদ্ভব ঘটে।

দেখা যাচ্ছে যে, এ দুটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ফল পরস্পর বিরোধী। জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে রক্স যে সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন তাতে ভ্রূণের কোন নির্দিষ্ট অংশের উপরই জীবদেহের অংশ-বিশেষের গঠন পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—এ কথাই প্রতিপন্ন হয়। ড্রিয়েসচের পর্যবেক্ষণের ফল থেকে কিন্তু বিপরীত ধারণারই সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের প্রত্যেকটি অংশই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠনের শক্তি ধারণ করে, এ কথাই তার পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পায়।

জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে এরূপ পরস্পর বিরোধী ফল প্রকাশিত হওয়াতেই পৃথিবীর নানাস্থানে এ নিয়ে গবেষণা সুরু হয়ে যায়। অতঃপর হ্যান্স্ স্পেনম্যান এ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার অতি চমকপ্রদ ফল প্রকাশ করেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ বিশেষ এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

তিনি নিউটের ডিম নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, তার দু-দিকের গাঢ় ও হাল্কা রঙের অংশদ্বয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ধূসর স্তরের দ্বারা বিভক্ত রয়েছে। ঐ ধূসর স্তরটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেন এবং ঐ ধূসর

স্তরটিকে যে কোন একদিকে রেখে ডিমটাকে দু-ভাগে বিভক্ত করে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এরূপ পরীক্ষার ফলে তিনি দেখতে পান যে, ধূসর স্তরটি যে অংশে থাকে তার বৃদ্ধির ফলেই একটি পূর্ণাঙ্গ নিউটের সৃষ্টি হয় এবং অপর অংশটির বৃদ্ধিতে কোন কোষ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় না, একই রকমের কতকগুলি কোষ গড়ে ওঠে মাত্র। এ থেকে ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ গঠন যে ভাবেই হোক, ঐ ধূসর পদার্থটির দ্বারা যে প্রভাবান্বিত হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না।

পরবর্তী গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, ঐ ধূসর অংশ থেকে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে কোষজ পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দু-দিকে পরিচালিত করে এবং তা থেকেই দেহের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের গঠন নিষ্পন্ন হয়। ঐ ধূসর পদার্থটির প্রভাবে দেহ-গঠনের এই প্রান্তিক নির্দেশ লাভ হয় বলে তা সংগঠক বা অর্গ্যানাইজার আখ্যা লাভ করে।

এর পরেই আবার গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, ভ্রূণের বিভাজন আরম্ভ হবার পূর্বে ওর কোন স্থানে একটি পিনের দ্বারা আঘাত অথবা অন্য কোনরূপ উত্তেজনা প্রয়োগ করলে তার ফলেও এই প্রান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভ্রূণের বৃদ্ধিতে তার এই প্রান্তিক পরিস্থিতির সঙ্গে ডিমের ধূসর অংশ বিশেষ সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলেও ভ্রূণ-কোষটির যে কোন বিন্দু থেকেই মাথা অথবা দেহের পশ্চাদ্ভাগের গঠন সূচিত হতে পারে। প্রান্তিক সূচনা দেখা দিলে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তখন একদিক থেকে অপর দিকে কোন বিশেষ বার্তা প্রবাহিত হতে থাকে।

কোথা থেকে এই বার্তা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়, ক্রমেলসে হাইড্রা নামক জলজ প্রাণীর উপর এক বিশেষ পরীক্ষা থেকে ডাঃ ব্রিয়েন সে সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোকপাতে সক্ষম হন। হাইড্রা, হ্রদ ও পুকুরের জলের অধিবাসী। এর সূত্রাকার দেহ পর পর কতকগুলি কোষের দ্বারা একটানা-ভাবে গঠিত। এদের মাথার সম্মুখে কয়েকটি সূক্ষ্ম শুঁড় আছে। ডাঃ ব্রিয়েন শিশু হাইড্রার মস্তকের দিকে একপ্রকার রং প্রয়োগ করে তার দেহের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেন। ঐ রঞ্জক পদার্থটি কোষের মধ্যেই থাকে এবং একমাত্র কোষ-বিভাজনের মাধ্যমেই তার ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। ডাঃ ব্রিয়েন ঐ রঞ্জক পদার্থের ব্যাপ্তি থেকে হাইড্রার বৃদ্ধির গতি অনুসরণ করেন। এভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে প্রকাশ পায় যে, বৃদ্ধির ব্যাপারটি মাথার দিক থেকে দেহের নীচের দিকে পরিচালিত হয়। আরও প্রকাশ পায় যে, মাথার দিকের বৃদ্ধির গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত এবং সর্বনিম্ন অংশের বৃদ্ধির গতি সর্বাপেক্ষা মন্থর।

হাইড্রার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বৃদ্ধির ব্যাপারটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির অনুরূপ। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অক্সিন নামক একটি বিশেষ হর্মোন দ্বারা বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অক্সিন ডগার মুকুল থেকে নিঃসৃত হয়ে মূলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এর সাহায্যেই উদ্ভিদের সব রকম গঠন-কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্সিন উদ্ভিদের আঙ্গিক বৃদ্ধি সম্পাদন করে, কুঁড়ি ও মূল গঠন করে। ফুল, ফল ও বীজের গঠনের সঙ্গেও অক্সিন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আবার এর প্রভাবেই ফল, পাতা পরিপক্ক হয়ে গাছ থেকে ঝরে পড়ে।

অক্সিন যে শুধু উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা গঠন-কার্যেই প্রয়োজন এমন নয়, এর প্রভাবেই আবার স্থান-বিশেষের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। দেখা যায় যে, ডগার কুঁড়িটি থাকতে নীচের কুঁড়িগুলি বাড়তে পারে না। ডগাটি কেটে দিলে নীচের কুঁড়ি তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। কিন্তু ঐ কাটা মাথায় একটু অক্সিনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে নীচের কুঁড়ির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এ-থেকে বোঝা যায় যে, ছেটে দিলে নীচের কুঁড়ি গুলি বৃদ্ধি পেয়ে

যে দ্রুত শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয় তা উপর থেকে হর্মোন সরবরাহ বন্ধ হবার ফলেই ঘটে।

টিউবুল্যারিয়া নামক হাইড্রারই অনুরূপ আর একপ্রকার জলজ প্রাণীর উপর নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা ডাঃ রোজ দেখিয়েছেন যে, এদের দেহের বৃদ্ধি বা কোন অংশ ছেদন করলে তার পুনর্গঠন মস্তকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ওর মাথাটি কেটে বাদ দিলেও ঐ কর্তিত স্থানে মাথার পুনরোৎপত্তি ঘটে; অর্থাৎ মস্তকের অভাবে টিউবুল্যারিয়ার প্রত্যেক অংশই মস্তকে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ ভাবে মস্তক গঠনের শক্তি দেহাংশটির উপর দিকে কর্তিত স্থানের কোষেই থাকে। উপরের কোষের স্তর মাথার শূন্য স্থান পূরণ করেই নীচের কোষগুলি যাতে আর মস্তক গঠনে অংশ গ্রহণ না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে। পরবর্তী কোষের স্তর তখন মস্তক গঠনে অংশ গ্রহণ করতে না পেয়ে তার পরবর্তী অংশ গঠনে নিয়োজিত হয় এবং এ ভাবেই পর পর কোষগুলি বিভিন্ন অংশ গঠনে সক্রিয় হয়ে উঠে।

ডাঃ রোজ তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করেন যে, বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক বার্তা রাসায়নিক পদার্থরূপে কোষ থেকে কোষান্তরে, মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে সঞ্চালিত হয় এবং এই কারণেই প্রান্তিক অবস্থা বা পোলারিটি অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তাঁর মতে, এই রাসায়নিক বার্তা ট্রাফিক সিগ্‌ন্যালের মত কাজ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি গাড়ী পার্ক করবার স্থানের উল্লেখ করেছেন। ঐরূপ কোন স্থান পূর্ণ হয়ে গেলে যেমন ষ্টপ সিগ্‌ন্যাল দ্বারা অন্য গাড়ী প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, সেরূপ ভ্রূণ-দেহের কোন অংশের স্থান পূরণ হলেই সেখান থেকে ষ্টপ সিগ্‌ন্যালরূপী রাসায়নিক বার্তার সাহায্যেই ঐ বিশেষ অংশটি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে!

ডাঃ রোজের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য তা যাচাই করতে গিয়ে তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন প্রাণীর উপর বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি পরীক্ষায় অদ্ভুত রকমের ফল লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাঙের ডিম কালচারের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে জলে রেখে তার মধ্যে ব্যাঙের ডিম ফুটিয়ে দেখা দেখা গেল—তা থেকে যে ব্যাঙাচির সৃষ্টি হয়, তাদের হৃৎপিণ্ড থাকে না। হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে জলে মস্তিষ্কের টুক্‌রা দিলে ডিম ফুটে মস্তিষ্কবিহীন ব্যাঙাচি বেরোয়। এরূপে জলে ব্যাঙের রক্ত সংযোজিত হলে রক্তহীন ব্যাঙাচির উদ্ভব ঘটে।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলিকে ব্যাঙাচির অবস্থা প্রাপ্তির পরেও বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কহীন ব্যাঙাচিগুলির অবশ্য কয়েক দিন পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু রক্ত-হীন ব্যাঙাচিগুলিতে রক্ত প্রয়োগের ব্যবস্থা করায় মাসখানেকের মধ্যেই ওরা ব্যাঙে পরিণত হতে পারে। এ থেকে বুঝা যায়, উক্ত বিশেষ অবস্থায় ব্যাঙাচিগুলির রক্ত গঠনকারী যন্ত্রের পূর্ণ বিকলতা ঘটে না; কারণ তা হলে রক্ত প্রয়োগের দ্বারা তাদের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো না।

এ সব পর্যবেক্ষণ থেকে বেশ বুঝা যায় যে, দেহের অন্য তন্তুর প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকতে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, রক্ত থেকে রাসায়নিক ষ্টপ সাইন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

নিম্নতর প্রাণীর উপর এসব পরীক্ষা নরওয়ে ও সুইডেনে মুরগী এবং ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করেও একইরূপ ফল পাওয়া গেছে। সুইডেনে ডাঃ লেনিক নিষিক্ত ডিমে মুরগীর রক্ত ইন্‌জেকসন করে রক্তহীন মুরগী উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। একই রকম পরীক্ষায় সেখানে মস্তিষ্কবিহীন মুরগীও উৎপন্ন হয়েছে। লেনিক দেখিয়েছেন যে, ষ্টপ সাইন সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থটি প্রোটিন জাতীয়।

এদিকে নরওয়ের গবেষণাগারে ডাঃ সিট্রেন কতকগুলি ইঁদুরের দেড়খানা বৃক্ক বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আধখানা বৃক্কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ঐ আধখানা বৃক্কের খুব দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু ঐ অবস্থায় রক্তবহা নালীর মধ্যে নিষ্পেষিত বৃক্কের রস ইনজেকশন করলে তার বৃদ্ধি হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু মস্তিষ্ক, যকৃৎ বা প্লীহা নিষ্পেষণ করে এভাবে ইন্‌জেকসন করে দেখা গেছে যে, তাতে বৃক্কের বৃদ্ধি কিছু মাত্র ব্যাহত হয় না। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক দেহযন্ত্র থেকেই রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তা দিয়ে তার বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অন্য যন্ত্রের উপর ঐ রাসায়নিক পদার্থ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

এরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষার ফল বিচার-বিশ্লেষণ করেই ডাঃ রোজ কোষের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির সময় ভ্রূণ-কোষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Cellular interaction during differentiation) সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন। একটি মাত্র নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে মানুষের মত জটিল দেহধারী জীবের উদ্ভব কি ভাবে সম্ভব, এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব এথেকে মিলতে পারে।

উক্ত মতবাদ অনুসারে নিষিক্ত ডিম্বকোষ বা তার স্বাতন্ত্র্যহীন বিভাজনের অবস্থায় ভ্রূণের প্রত্যেকটি স্থানই জীবের যে কোন অংশ গঠনের উপযোগী থাকে। কিন্তু ভ্রূণের উক্ত অবস্থায় কোন অংশে স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হলেই সেখান থেকে অন্য কোষগুলির প্রতি নিবৃত্তিমূলক রাসায়নিক সঙ্কেত প্রেরিত হতে থাকে।

শুধু মাথা, ধড় ও লেজ নিয়ে দেহটি গঠিত, এরূপ কোন জীবের ভ্রূণ অবস্থায় প্রথমেই মাথার গঠনের সূচনা দেখা দিবে। তারপরে মাথার ঐ প্রাথমিক কোষগুলির প্রত্যেকটি থেকে একটি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে অপর কোন কোষ যাতে মাথার অংশ গঠনে যোগ না দিতে পারে, সে অবস্থার সৃষ্টি করে। সংলগ্ন নীচের কোষগুলি তখন মস্তক গঠনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ ধড় গঠনের সূচনা করে। এভাবে ধড়ের অংশের সূচনা হলে ঐ কোষগুলি থেকেও একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য সুদৃঢ় করে। নীচের কোষগুলির তখন একমাত্র লেজের অংশ গঠনের পথই খোলা থাকে।

কোষের কার্যকারিতাকে এরূপে গণ্ডীবদ্ধ করবার ব্যবস্থা থেকেই প্রাণী-দেহের স্ব স্ব স্বাভাবিক গঠন ও আকৃতি বজায় থাকে। এর ফলেই মানব-শিশু কতকগুলি চোখ বা কতকগুলি নাক নিয়ে জন্ম গ্রহণ না করে' তার স্বাভাবিক আকৃতিতেই ভূমিষ্ঠ হয়। শিশু বড় হতে থাকলে তার অংশগুলির বৃদ্ধি আপন আপন গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রগুলি দেহের অপর অংশের ব্যয়ে আপন আপন গণ্ডী অতিক্রম করে ক্রমাগত বেড়ে চলতে বাধা পায়।

প্রাণী-দেহের জল

শ্রীজয়া রায়

জলকে এক হিসাবে জীবন বলা হয়। কথাটা অত্যুক্তি নয়। প্রাণী-দেহে জল কি ভাবে থাকে এবং কি ভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করলে কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি হবে। জল কিভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে কাজ করে' জীবন-ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলে এই বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে।

সাধারণতঃ প্রাণীদের শরীরে চর্বির পরিমাণের সঙ্গে জলের পরিমাণের একটা বিপরীত সম্বন্ধ দেখা যায়। একটা রোগা বিড়ালের যে ওজন, তার ⅘ ভাগই জলের জন্যে। আবার একটা হৃষ্ট-পুষ্ট শূকরের ওজনের মাত্র ⅖ ভাগ জল। অন্য বয়সের তুলনায় শৈশব অবস্থায় প্রাণী-দেহে জলের অংশ অনেক বেশী থাকে। মানব-শিশুর শরীরে ভ্রূণ-অবস্থায় শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগই থাকে জল। সেই শিশু পূর্ণবয়স্ক হলে জলের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৬০ ভাগ। জন্মের সময় থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত শরীরে জলের অংশ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। তার পরে এর অনুপাত অনেকটা একভাগে থেকে যায়। সাধারণতঃ জীবিতকালের প্রায় ৫ ভাগের একভাগ বয়সেই শরীরের রাসায়নিক পরিপক্কতা (chemical maturity) ঘটে; অর্থাৎ এই বয়সের মধ্যে বিভিন্ন কোষ ও তন্তুর সব রকম জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাবার শক্তি প্রকাশ পায়। এই বয়সের পরে জলের পরিমাণও ক্রমশঃ কমতে থাকে। তারপরে বার্ধক্য পর্যন্ত জলের অনুপাত ধীরে ধীরে আরও কমতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জলের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি এবং বিভিন্ন তন্তুর অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। জলের পরিমাণের সঙ্গে এই রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির সামঞ্জস্য আছে বলেই অনেকে বলেছেন—জলই জীবনের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে।

প্রাণীদের মধ্যে কেঁচোর শরীরে জলের এই গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কেঁচোকে কিছুক্ষণ শুক্‌নো জায়গায় রাখলে তার শরীরের জল এবং চাঞ্চল্য এক সঙ্গেই হ্রাস পেতে থাকে। শরীরের অর্ধেক জল শুকাবার আগেই তার গতি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আবার কিছুক্ষণ জলে রেখে দিলে, সে পুনরায় সজীব ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু আরও বেশী শুকিয়ে গেলে এই সজীবতা আর সহজে ফিরে আসে না। খুব সরল গঠনের কয়েক প্রকার জীব মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবেও জীবিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভার লাঘব এবং পচন নিবারণের জন্যে সেনাবাহিনীর অনেক খাদ্যবস্তুই শুষ্ক বা dehydrated অবস্থায় চালান দেওয়া হতো। জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই সেগুলি রুচিকর খাদ্যে পরিণত হতো। খাদ্যবস্তুকে এভাবে শুকিয়ে রাখলে বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু জীবিত প্রাণীর উপরে এই পরীক্ষা অচল। তবে কোন কোন প্রাণীর খাদ্যে জলের পরিমাণ অল্প থাকলেও খুব বেশী ক্ষতি হয় না। যে সব পোকা ধান, গম ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্যশস্যে অথবা তুলে-রাখা কাপড়চোপড়ে বাস করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের খাদ্যে সাধারণ সময়ে জলের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের বেশী থাকে না। ক্যাঙারু-ইঁদুর স্তন্যপান ছেড়ে দেবার পরে আর জলপান করে না। আফ্রিকার মরু-

ভূমির অধিবাসী কয়েক জাতীয় হরিণ এবং গোবি মরুভূমির বন্য গাধা আহার্য গ্রহণের পরে জলপান করে না। পৃথকভাবে জলপান না করলেও এই প্রাণীদের শরীরে জলের অনুপাত বিশেষ কম নয়। কিন্তু সাধারণ ইঁদুরকে জল পান করতে না দিলে ক্রমশঃ তাদের শরীর শীর্ণ হতে থাকে এবং এভাবে স্বাভাবিক ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ হ্রাস পাবার পর তারা শুক্‌নো খাবার আর খেতে পারে না এবং এর ফলে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের শরীরের ওজন এবং তাতে জলের পরিমাণ প্রায় একই অনুপাতে কম হয়।

শরীরের প্রত্যেকটি তন্তু এবং প্রত্যেকটি যন্ত্রে জলের পরিমাণ যথেষ্ট। শারীরতত্ত্ববিদেরা দেহের জলীয় অংশকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশ রক্তের আকারে সারা দেহে সঞ্চালিত হয়। দ্বিতীয় অংশ থাকে শরীরের কোষগুলির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে। তৃতীয় অংশ থাকে শরীরের ক্ষুদ্র বৃহৎ গহ্বর এবং কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান আছে, তার মধ্যে। অবশ্য এই তিন রকম জলের মধ্যে অহরহ আদান-প্রদান চলছে। রক্তের মধ্যে অবস্থিত জল রক্তবাহী কৈশিক নালীর সূক্ষ্ম পর্দা পার হয়ে বিভিন্ন তন্তু ও কোষে সর্বদাই সঞ্চালিত হয়। যদি কোনভাবে এই জল চিহ্নিত করে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এক মিনিটের মধ্যেই প্রায় অর্ধেক অংশ রক্তের স্রোত ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। কোন এক মুহূর্তে শরীরের মোট জলের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র রক্তের আকারে চলাচল করছে।

শতকরা ২৫ ভাগ জল রক্ত ছাড়া অন্যান্য রসের আকারে তন্তু ও কোষের বাইরে সঞ্চালিত হচ্ছে। আর শতকরা ৬০ ভাগই কোষগুলির ভিতরে থাকে। বাকী অংশ কখনও কোষের ভিতরে আর কখনও কোষের বাইরে থাকে বলে মনে হয়। এই জল পাকস্থলী, অন্ত্রনালী ও শরীরের অন্যান্য গহ্বরগুলিতেও থাকে। কখনও কোষের ভিতরে আর কখনও বাইরে থাকে বলে একে trans-cellular জল বলে। এর বিভিন্ন রকম ক্রিয়া আছে। শরীরের সন্ধিস্থলগুলিকে এই জল ঘর্ষণজনিত তাপ ও ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জলের, এমন কি, চাপেরও সমতা রক্ষিত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় গর্ভাশয়ে ভ্রূণ এবং অক্ষিগোলকের মধ্যে। দুই জায়গাতেই প্রকৃতি সুনিপুণ কৌশলে শুধু জলের সাহায্যেই ভ্রূণ এবং চোখের লেন্স ও রেটিনাকে আঘাত বা স্থানচ্যুতি থেকে রক্ষা করে। গুরুতর রোগ বা আঘাতে এই জলের পরিমাণ কম-বেশী হলে এসব স্থানে নানা রকম বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। তেমনি অন্ত্রনালীতে পরিপাকের সময় যে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, তার অধিকাংশই আবার রক্তে ফিরে যাওয়ায় পরিপাকের পরে অবশিষ্ট খাদ্যাংশ বা মলে জলের ভাগ কম হয়। অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে জলের এই বণ্টন আমাদের অজ্ঞাতেই সহজভাবে চলছে। রোগের সময় এর ব্যতিক্রমে—হয় কোষ্ঠবদ্ধতা, নয় অতিসার আমাদের জানিয়ে দেয় যে, জলের এই ক্রিয়া ঠিকভাবে চলছে না।

প্রাণী-দেহে মোট জলের পরিমাণ জানতে হলে একটি মৃত প্রাণীর শরীর টুক্‌রা করে কেটে তার ওজন নিতে হয়। তারপর আবার সেই টুক্‌রাগুলি ফুটন্ত জলের তাপে ক্রমাগত প্রায় ৭ দিন রেখে শুকাবার পর আর একবার ওজন নিতে হয়। মানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুর ক্ষেত্রে এরূপ করা সহজ নয়। সুতরাং অন্য রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। একটা বৃহৎ জলপাত্রে কতটা জল আছে তা জানবার একটি উপায় হচ্ছে, তার মধ্যে কোন নির্ভেজাল বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাল করে গুলে দেওয়ার পর সেই দ্রাবণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলে নিয়ে তার মধ্যে ঐ দ্রাব্য বস্তু কতটুকু আছে তা নির্ধারণ করতে হয়। তার পর কতটা জলে ঐ দ্রাব্য বস্তুর সব অংশটা থাকা

সম্ভব, তা সাধারণ হিসাবেই বলা যায়। প্রাণী-দেহে মোট জলের পরিমাণ নির্ধারণ করবার সময় অবশ্য দেখতে হবে যে, এই দ্রাব্য বস্তু নির্ভেজাল ও নির্বিষ এবং অল্প পরিমাণে থাকলেও একে চেনা এবং সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। তাছাড়া এই বস্তু শরীরের সব তন্তুতে প্রায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নষ্ট হবে না। এ রকম বস্তু দুর্লভ হওয়াতে সচরাচর ইউরিয়া, অ্যান্টিপাইরিন এবং ডয়টেরিয়াম বা ভারী জল এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীরে প্রবেশের এক ঘণ্টার মধ্যে এই বস্তুগুলি সারা দেহে বেশ সমান-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রক্তের নির্দিষ্ট আয়তনে এর পরিমাণ নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করলে শরীরের জলীয় অংশের মোট পরিমাণ সঠিকভাবে ধরা পড়ে।

কোষগুলির ভিতরে ও বাইরে জলের পরিমাণ জানতে হলে সাধারণ চিনি, থাইওসায়ানেট অথবা তেজস্ক্রিয় ক্লোরাইড, সালফেট বা সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। শরীরে জলের মোট পরিমাণ থেকে কোষের বাইরের অংশ বাদ দিলে কোষের ভিতরের অংশও জানা যায়। তবে যে সব বস্তু কোষের বাইরের জলে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সাহায্যে জলের Trans-cellular অংশ জানা যায় না। তার জন্যে ইভান্স ব্লু নামক রং ব্যবহার করা হয়।

শরীরের বিভিন্ন অংশে জলের এরূপ বণ্টন অতি নিখুঁতভাবে চলছে। ২৪ ঘণ্টায় একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ওজন পাঁচ আউন্সের বেশী তফাৎ হয় না। যদি পরিশ্রমের সময় ঘাম হওয়ার ফলে জলের সাময়িক কমতি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং তৃষ্ণাবোধ হওয়াতে জল পানের ইচ্ছা হয়। আবার অতিরিক্ত জল বা বিয়ার পান করলে অথবা সূচিপ্রয়োগে অতিরিক্ত স্যালাইন দেওয়া হলে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয় এবং তৃষ্ণাবোধ লোপ পায়। ইচ্ছানুসারে শরীরে জলের পরিমাণ কম-বেশী করা সহজ নয়। জলের পরিমাণ শতকরা একভাগ মাত্র হ্রাস পেলেই তৃষ্ণাবোধ হয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হলে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে। জলের অভাবে প্রাণবিয়োগ হলে ঘটনার ঠিক আগে নাকি তৃষ্ণা-বোধ থাকে না। মরুভূমিতে এরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। আবার অতিরিক্ত জলপানের ফলে মাথাধরা, বমনোদ্রেক, দুর্বলতা, বুদ্ধি হ্রাস, চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা, মাংসপেশীর কম্পন, প্রলাপ বা তড়কা সুরু হতে পারে। শরীরে লবণের যে ঘনত্ব (Concentration) দরকার, বেশী জলে তার কমতি হওয়াতেই এসব উপসর্গ ঘটে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জাতীয় সরকার

শ্রীদুর্গাদাস

বেশী দিন আগের কথা নয়, গণিত শাস্ত্রের মৌলিক আবিষ্কারের জন্যে শুধু কিছু কাগজ, পেন্সিল এবং একটু নিরিবিলি জায়গা ছাড়া আর বেশী কিছু দরকার হতো না। আজকের দিনে যে সব ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বা গণন-যন্ত্র তাঁরা ব্যবহার করছেন, তার দাম লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকা। জড়-বিজ্ঞানীরাও শুধু কিছু তার, দড়ি ও গালা দিয়ে আর তাঁদের গবেষণা-যন্ত্র তৈরী করতে পারছেন না। যে সব পারমাণবিক অ্যাক্সিলারেটর আজ তাঁরা ব্যবহার করছেন, তার দাম কোটি কোটি টাকা এবং তা চালাতে বছরে বহু লক্ষ টাকা খরচ হয়। জীব-বিজ্ঞানীরাও দু একটা বোতল, কিছু স্পিরিট ও একটা মাইক্রস্কোপে আর সন্তুষ্ট নন। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ, আলট্রা-সেন্ট্রিফিউজ, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, বহুমূল্য রাসায়নিক পদার্থ এবং হাজার হাজার প্রাণী আজ তাঁরা ব্যবহার করছেন।

গত ২১ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এভাবে অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আকাশে ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্যে নানা ধরণের বেলুন, বিমানপোত এবং রকেট দরকার। সামুদ্রিক গবেষণায় বিশেষ ধরণের জাহাজ দরকার, যাতে সমুদ্রের গভীর অংশ থেকে জল ও তার তলদেশ থেকে পলিমাটি তোলবার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেরু প্রদেশে গবেষণার জন্যে বিমানযোগে অধিবাসীসহ প্রায় একটি বৈজ্ঞানিক গ্রাম সেখানে পাঠাতে হবে, যার অধিবাসীদের জন্যে খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার সরঞ্জাম ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে অনির্দিষ্ট কাল জুগিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণার ফল প্রকাশের জন্যে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশেও যথেষ্ট খরচ আছে।

বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল ব্যয় যে বিনা দ্বিধায় বহন করে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সালে গবেষণায় যে ব্যয় হতো, বর্তমানে তার পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন বছরে ৫০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এত টাকা আমাদের স্বপ্নের অতীত। তবে মনে রাখা ভাল যে, শুধু অর্থ ব্যয় করলেই বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। এর জন্যে চাই বহু উচ্চশিক্ষিত লোক যাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনন-শীলতা, প্রতিভা এবং আত্মোৎসর্গ অসাধারণ।

কি ভাবে ও কি অবস্থায় এই রকমের লোক পাওয়া ও রাখা যায়, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা যাক।

দেড়শ' বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসন প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের কঙ্কাল দিয়ে হোয়াইট হাউসের অনেকগুলি ঘর ভরে ফেলেছিলেন। এটা নিছক পাগলামি নয়, রাষ্ট্রের প্রধান নেতার বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণায় অভিনিবেশের লক্ষণ। এখন সে দেশে সরকারী গবেষণার জন্যে বহু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে দেশের নানা অঞ্চলে সরকারী প্রচেষ্টা বহুযুগ ধরে চলছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই দেশের প্রায় প্রত্যেক গবেষণায় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সরকারী ও বেসরকারী অর্থ-সাহায্যের স্রোত বইতে সুরু করেছে।

দেশের নেতারা শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে, এ

বিষয়ে দলাদলি বা দ্বিধার অবকাশ নেই। একমাত্র রাষ্ট্রই এই কাজের উপযুক্ত ব্যয় বহন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানারকম grant, endowment এবং ছাত্র বেতন থেকে যে আয় আগে ছিল বর্তমানে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তাদের মোট খরচের শতকরা ৭০ ভাগই এখন রাষ্ট্রের কোষ থেকে আসছে। অর্থাৎ বহু দাতার দানের বদলে একটি বিরাট দাতার দানের উপরেই এখন তাদের নির্ভরতা। এই বিরাট দান রাষ্ট্রের পরিচালকেরা যে সুষ্ঠু এবং নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে চলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি ধরণের পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা এবং কি প্রণালীতে এই গুরুদায়িত্ব পালিত হতে পারে, তাই এখন বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ শুধু দানশীলতাই এই পরিচালকদের প্রধান গুণ নয়, দেশের আইনগুলিও তাঁদের আয়ত্তে থাকা চাই। আবার ব্যবসায় বুদ্ধি, রাজনীতি এবং লোক সংগ্রহেও তাঁদের মস্তিষ্ক পরিচালনা দরকার।

আবার এই পরিচালকদের দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলিতে নিয়মিত বা আবশ্যকমত যাওয়া আসার ব্যয়বরাদ্দও করতে হবে। রাজধানীতে বিরাট অফিসে বসে বহুদূরে কর্মরত বিজ্ঞানীদের কাজের প্রোগ্রাম বা রিপোর্ট মাত্র দেখে সন্তুষ্ট না থেকে বিজ্ঞানীদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের অভাব দূর করতে হবে।

আর একটি অসুবিধা এই যে, সাধারণতঃ সরকারী সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য পাওয়ার এক বা দুই বছর আগে তিনি ঠিক কি কাজের জন্যে কি কি যন্ত্রপাতি, কি কি রাসায়নিক বস্তু বা কোন্ পরীক্ষা প্রণালী ও কতটা অর্থ সাহায্য চান, তার খুঁটিনাটির বিস্তৃত ফর্দ দিতে হয়। প্রার্থনা ও তার পূরণের মধ্যে এই যে কালের ব্যবধান, এর মধ্যে এই প্রয়োজনের তালিকার অনেক বদল হয়ে যেতে পারে, যদি (১) বাঞ্ছিত আবিষ্কারটি ইতিমধ্যে অন্য লোকে করে ফেলেন, (২) এই কাজের জন্যে অন্য যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়ে পড়ে, অথবা কাজ আরম্ভের আগে বা পরে সমস্যার প্রকৃতিটাও বদলে যায়। অথচ সরকারী পরিচালকেরা এসব কারণে প্রস্তাবিত প্রোগ্রামটি বদল করতে রাজী হন না। কর্মীদের পুরাতন প্রস্তাব ও পুরাতন প্রণালীতে লেগে থাকতে বাধ্য করেন। আমাদের দেশে অনেক সময় আর্থিক বছর (৩১শে মার্চ) শেষ হওয়ার হয়তো ৩ দিন বা ৭ দিন মাত্র আগে সরকারী সাহায্য কর্মীদের কাছে পৌঁছায় এবং ঐ কয় দিনের মধ্যেই সেই টাকা খরচ করে কয়েক দিনের মধ্যেই খরচের হিসাব ও কাজের রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বলা বাহুল্য, সারা বছর ধরে যে কাজ ও যে ব্যয় চলবার জন্যে এই সাহায্য, সরকারী নিয়মের এই অদ্ভুত ক্রিয়ার ফলে তা আপাতদৃষ্টিতে এক সপ্তাহেই শেষ করতে হয়। সুতরাং হয় কর্মীকে নিজের সামান্য বেতন থেকে অথবা ধারদেনা করে সারা বছরের ব্যয় চালাবার পরে বছরের শেষে ঘাট্‌তি পূরণ করতে হয়, অথবা তিন দিনের মধ্যে বাজারে যা কিছু পাওয়া যায় তাই কিনে সাহায্যের টাকার খরচ দেখাতে হয়। এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ?

আরও কথা আছে। সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা যে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, তাতে প্রায় সারা জীবন লেগে থাকেন। সুতরাং দুই বছরের জন্যে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যে তাঁদের এই দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান হয় না। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে সরকারী ব্যবস্থা অনেক ভাল। বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিটির হাতে প্রতি ৫ বছরের জন্যে তাঁদের দেয় অর্থসাহায্য বরাদ্দ করে দেন। কি ভাবে সেই সাহায্যের ব্যবহার হবে, সে বিষয়ে তাঁরা মন্তব্য করেন না অথবা প্রদত্ত টাকার খুঁটিনাটি হিসাবও চান না। এই কমিটিও অনেকটা এভাবে প্রায় বিনা সর্তে বিশ্ববিদ্যালয়

এবং গবেষণাগারগুলিতে এই সাহায্য বিতরণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা বিভাগগুলি (Army, Navy, Air force) তাঁদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মোট সরকারী সাহায্যের প্রায় অর্ধেক অংশ দান করেন। এতে কতকাংশে কর্মীদের নিজের ইচ্ছা-মত মৌলিক গবেষণা করবার স্বাধীনতা থাকে না। তবে ক্রমশঃ সরকার বুঝতে পারছেন যে, কর্মীদের কয়েক জনকে এই স্বাধীনতা দেওয়া খুবই দরকার। কারণ, আজ যা মৌলিক বা অব্যবহারিক, গবেষণা বলে মনে হচ্ছে, কাল তারই ফলে দেশরক্ষা বা অন্য সরকারী বিভাগের কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাছাড়া কর্মীদের এক অংশকে স্বাধীন মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত থাকতে দিলে যুদ্ধ বা অন্য কোন আকস্মিক গুরুতর অবস্থার সময় যে সব নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলিকে সমাধান করবার কাজে এঁদের লাগানো যায়। তাঁদের মন এবং গবেষণা-কৌশল সাময়িক ব্যবহারিক সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ না থাকায় তাঁরা নতুন সমস্যার সমাধান আরও সহজে করতে পারেন।

চিন্তাশীল লোকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে Natural Science Foundation নামে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান এই বিপুল সাহায্য বিতরণ করেন, তাঁদের উচিত শুধু Research planning বা গবেষণা পরিকল্পনায় বেশী সময় নষ্ট না করে দেশের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন সহজ ও স্বাভাবিক যোগসূত্র স্থাপন করা, যাতে তাঁরা পরস্পরকে পূর্ণ-ভাবে সহায়তা করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেদের এবং Foundation-এরও অজ্ঞাতে পরস্পরকে ভ্রমপ্রমাদ, অপব্যয় অথবা পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন। বহু কষ্টে জাল বুনে মাকড়সা যেমন তার ঠিক মাঝখানে বসে থাকে এবং পোকা ধরবার জন্যে কখনও একদিকের, কখনও বা আর একদিকের সূতায় টান বা আল্গা দেয় Foundation-এর কর্ম-প্রচেষ্টা তেমন হলে, অর্থাৎ সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজের উপর একক কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করলে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমাদের দেশেও বেশ কিছুদিন ধরে University Grants Commission, Indian Council of Agricultural Research, Indian Research fund Association, Indian Council of Medical Research প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির পথ সুগম করবার চেষ্টা চলছে। এদের পরিচালকমণ্ডলী সম্ভবতঃ কতকটা বৃটিশ ও কতকটা আমেরিকান আদর্শে প্রভাবান্বিত। কিন্তু যে আদর্শ কর্মপ্রণালী ও পরিচালকমণ্ডলী সকলের কাম্য তা এখনও গড়ে ওঠে নি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো এখনও কাঠের মত কিছু জড়তাদুষ্ট রয়ে গেছে বললে অপবাদ দেওয়া হবে না—একথা অনেক বিজ্ঞানীই স্বীকার করবেন। আর্থিক বছরের বিভীষিকা, এক বছরের অর্থ সাহায্যের অব্যবহৃত অংশ পর বছরে ব্যবহারের বাধা এবং সাহায্য প্রার্থনা ও সাহায্য লাভের মধ্যে অস্বাভাবিক বিলম্ব দূর করতে না পারলে বর্তমান প্রণালীর অসুবিধাগুলি দূর হবে না। আশা করা যায় যে, এ বিষয় সরকারী পরিচালকমণ্ডলী ক্রমে ক্রমে অবহিত হবেন।

সঞ্চয়ন

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে সৌরশক্তি

কৃত্রিম উপায়ে জল তৈরী করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই বিশুদ্ধ জলের অভাব রয়েছে। এই সব পদ্ধতির সাহায্যে জল উৎপাদন এরূপ ব্যয়সাপেক্ষ যে, অতি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণতঃ এই সব ব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি। স্বল্প ব্যয়ে কিভাবে লবণাক্ত জলকে সুস্বাদু জলে পরিণত করা যেতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে সে সম্পর্কে বহুদিন থেকেই গবেষণা চলছে।

অনেকের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তর এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করে এনেছেন। তাদের চেষ্টায় ফ্লোরিডা রাজ্যের ডেটোনা সমুদ্রোপকূলে লবণাক্ত জলকে সৌররশ্মির সাহায্যে যথাসম্ভব অল্প খরচে পাতন-ক্রিয়ার (Distillation) সাহায্যে সুস্বাদু জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জল থেকে যে লবণ ও অন্যান্য উপকরণসমূহ পৃথক করা যেতে পারে, সেকথা অনেকদিন থেকেই মানুষের জানা ছিল। সূর্যই যে সর্বাধিক সহজলভ্য শক্তির উৎস, সেকথাও মানুষের বহুকাল পূর্বেই অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট সৌরশক্তি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে কেন্দ্রীভূত করে কাজে লাগাবার ব্যাপারটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে কেউ একাজে হাত দেন নি।

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তর সৌরশক্তির সাহায্যে লবণাক্ত জলকে সুস্বাদু জলে পরিণত করবার জন্যে একটি কারখানা নির্মাণ করেছেন। এতে যে ফল পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নিরক্ষবৃত্তের অঞ্চলে সৌররশ্মি-চালিত পাতন যন্ত্রের কারখানা নির্মাণ বিশেষ ব্যয়-বহুল হবে না। এতে জলাভাব দূরীকরণের ব্যাপারে ঐ অঞ্চলবাসীরা বিশেষ উপকৃত হবে এবং তার ফলে এই ধরণের কারখানা চালু রাখা ও নির্মাণের খরচ পুষিয়ে যাবে।

এই কারখানাটি ডেটোনার সমুদ্রোপকূলে একটি ঢালু জায়গায় নির্মিত হয়েছে। এই ঢালু জায়গায় একদিক থেকে জল আসে এবং আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। জলাধারের তলায় রয়েছে কোয়ার্টার ইঞ্চি আলকাৎরার প্রলেপ ও উপরে একটি কাচের ঢাকনা। ঢাকনাটি প্রায় ৮ ফুট চওড়া। সূর্যরশ্মি এই ঢাকনা পেরিয়ে জলাধারের জল স্পর্শ করে এবং যতটুকু সম্ভব তাপ জলে সঞ্চারিত হয়। আল-কাৎরার কালো রং উদ্বৃত্ত তাপ ধরে নেয় এবং তাতে সঞ্চিত থাকে। সৌররশ্মির প্রভাবে ঐ জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্প পুনরায় জল-বিন্দুতে পরিণত হয়ে উপরের কাচের ঢাকনায় লেগে থাকে। উপরের ঢাকনা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বলে ঐ বাষ্প ঢাকনার স্পর্শে জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ঐ জলবিন্দুসমূহ ঢালু ঢাকনা বেয়ে আর একটি আধারে এসে জমা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তরের লবণাক্ত জল বিভাগের বিজ্ঞানী ডাঃ জর্জ ও জি. লফ এই নতুন কারখানা নির্মাণ পরিকল্পনার পরামর্শদাতা। তিনি বলেন, এই কারখানার প্রতি বর্গফুট স্থান নির্মাণে এক ডলারের বেশী খরচ পড়বে না এবং এক বর্গফুট স্থান থেকে প্রায় এক পাউণ্ড সুস্বাদু জল পাওয়া যাবে। পরীক্ষামূলক ভাবে যে কারখানাটি নির্মিত হয়েছে তার আলকাৎরার পলেস্তারা-দেওয়া স্থানের পরিমাপ হলো ২৫০০

বর্গফুট। সেখান থেকে প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন গ্যালন জল পাওয়া যাবে।

যেখানে জল সহজলভ্য, সে সব স্থানে এভাবে লবণাক্ত জলকে বিশুদ্ধ জলে পরিণত করবার ব্যাপারটি জলাভাবগ্রস্ত স্থানের তুলনায় যে ব্যয়বহুল, তাতে সন্দেহ নেই। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপে পানীয় জল বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। এই আমদানী খরচের তুলনায় ঐ সব স্থানে এভাবে পানীয় জল উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়ে এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা এই পদ্ধতি অনুসরণে বিশেষ উপকৃত হয়ে থাকে। তবে এজন্যে প্রচুর জায়গা ও সূর্যালোকের প্রয়োজন।

আর একটা কথা—কেবল দিনের বেলায়ই নয়, রাত্রি বেলায়ও এই পাতন-ক্রিয়া বন্ধ থাকে না। গ্রীষ্মকালে সারাদিনের প্রখর সূর্যালোকে জলাধারের আলকাৎরার পলেস্তারা-দেওয়া তলা এবং তার নীচের জমি উত্তপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্য অস্তমিত হবার পর উপরের কাচের ঢাকনা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু আলকাৎরার কালো রং যে উদ্বৃত্ত তাপ ধরে রাখে, সেই তাপ এবং মৃত্তিকার তাপে জলাধারের জল বাষ্পে পরিণত হয় ও পাতন-ক্রিয়া চলতে থাকে; তবে দিনের বেলার তুলনায় কম হয়।

কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারকল্পে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার নতুন নতুন পদ্ধতি বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পরমাণুর শক্তিকেও একাজে লাগানো হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলস্থিত কারখানায় প্রতিদিন দেড় কোটি গ্যালন সমুদ্রের জল বিশুদ্ধ করে পানীয় জলে পরিণত করা হচ্ছে। এর মধ্যে দুটি কারখানা আছে পারস্য উপসাগরের তীরে তৈলপ্রধান অঞ্চলে। ঐ দুটি কারখানার প্রত্যেকটিতে প্রতিদিন ৫০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল তৈরী হয়। তবে যুদ্ধ-জাহাজ বা বড় বড় জাহাজে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিও খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রে এ-সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহার্য?

স্যার জুলিয়ান হাক্সলি আকাশবাণীতে 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহার্য?'—এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য একজন জীবতত্ত্ববিদ্ হিসাবেই একথা বলছি। বহু কাল ধরেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে বর্তমান যুগের একটা মুখ্য সমস্যা বলে মনে করে আসছি।

আজ সারা বিশ্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বিশ্বের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তবে মোট সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার গত পঞ্চাশ বছরে অত্যধিক বেড়ে গেছে। আজ বিশ্বের জনসংখ্যা দু'শ পঞ্চাশ কোটিরও বেশী। গত বছর লোক-সংখ্যা বেড়েছিল চার কোটি সত্তর লক্ষ। এ বছর অন্ততঃ পাঁচ কোটি লোক বাড়বে।

জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। বর্তমান শতাব্দীতে বৃদ্ধির হার এক শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অনুন্নত দেশ-গুলিতে—যেখানে খাদ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশী—সেখানেই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে লোকসংখ্যা বেড়ে উঠছে। যা কিছুই ঘটুক না কেন, আরও দু-পুরুষে

বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। আজকের বহু লোকের জীবদ্দশাতেই সারা বিশ্বে লোকসংখ্যা ৫০০ কোটিরও বেশী হয়ে দাঁড়াবে।

বস্তুতঃ জনসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির মূলে আছে মৃত্যু-নিয়ন্ত্রণ। বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু লোককে ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুহার কমেছে, অথচ জন্মহার কমে নি। এ অবস্থায় জনসংখ্যার প্রচণ্ড বৃদ্ধি রোধে বিজ্ঞান কি করতে পারে? আমার মনে হয়, বিজ্ঞান শুধু অতিরিক্ত খাদ্যের সংস্থান করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কেউ বলেন, কৃত্রিম খাদ্য তৈরী করতে হবে; কেউ বলেন, নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা দরকার। আবার কারো কারো মতে, নতুন ধরণের শস্যের চাষ করতে হবে যা নতুন অঞ্চল, মরুভূমি ও জঙ্গলে চাষ-আবাদ করে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে কিন্তু শুধু অপচয়ই হবে! কৃত্রিম খাদ্য খুবই অপ্রীতিকর। তাছাড়া লোকবৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তা দ্রুত উৎপাদন করাও সম্ভব নয়। শুধু মাত্র গাণিতিক কারণেই এ ব্যবস্থা চিরকাল ধরে চলতে পারে না। যতদিন জনসংখ্যার সমস্যাকে আমরা নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই অভিযান বলে মনে করবো, ততদিন বিজ্ঞান এ সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। ভোগী মানুষ কোন দিনই স্রষ্টা মানুষকে হারাতে পারবে না।

অপর পক্ষে, বিজ্ঞান আমাদের খুবই কাজে লাগতে পারে, যদি আমরা জনসংখ্যার সমস্যাটিকে মানুষের পরিবেশ-বিজ্ঞানের সমস্যারূপে বিচার করতে পারি; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ আর মানুষের নিজের চেষ্টায় গড়ে-ওঠা সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিক থেকেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এদিক থেকে অবিলম্বে যদি কিছু করা না হয়, তাহলে মানুষই পৃথিবীর পক্ষে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, নিজের ভবিষ্যতের পক্ষেই সে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

বিজ্ঞান বলে আমাদের গৃহের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই সর্বাগ্রে দরকার। যাতে মানব-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে—প্রতিটি মানুষ জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। মোটের উপর, মানুষকে তার বিচরণ ক্ষেত্র পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত জীবনযাপনের কলা-কৌশল শিখতে হবে। পারিপার্শ্বিক সম্পদ অপচয় করা কোন মতেই চলবে না। বরং সব রকমের সম্পদ—যা আমরা উপভোগ করি—সর্ব-প্রকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমরা যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি তা হলো মাটি, বন, খনিজ দ্রব্য, জল, জল-বিদ্যুৎ, আর এমনি ধরণের অন্যান্য জিনিষ। তাছাড়া উদ্ভিজ্জ পদার্থ, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী তো আছেই! আর উপভোগের সম্পদ হলো—বন্য প্রাণী, প্রকৃতির সৌন্দর্য, নির্জনতা আর আমাদের দৈনন্দিন কর্ম-কোলাহল মুখরিত জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার মত সংস্থান। এ সব দেখে স্বতঃই মনে হয় যে, বিশ্বের সর্বাধিক লোকসংখ্যা স্থির করে নিতে হবে। অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য কিছু করতে হলে হু হু করে জনসংখ্যা বাড়তে দেওয়া কোন মতেই চলতে পারে না।

মানুষের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের কোন কিছুও ক্ষয় করা চলবে না। এটা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জনসংখ্যার একটা ন্যূনতম সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি যত বেশী ঘন হবে, তাতে মাথাপিছু স্বাধীনতা ও সুবিধার হারও ততই কমে যাবে। আজ পাঁচ লক্ষ ও এক কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত সহরগুলিতে তা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

জনসংখ্যা যদি খুব বেশী হয়, জনবসতি যদি

খুব ঘন হয় তাহলে সংগঠনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেই হবে, শৃঙ্খলার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হবে, গণতন্ত্রের হানি ঘটবে, আর সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। আজ আমরা যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগ করে থাকি, তার বদলে সে দিন বিশ্ব জুড়ে একঘেয়ে নীরস জীবন ধারার প্রবর্তন হবে। সাধারণভাবে মানবিকতার মূল্য হবে নিম্নগামী। তাই বলছি, বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে লোকসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মানুষের দুঃখ ও হতাশা বাড়তেই থাকবে। এখন থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করতে না পারলে সারা বিশ্ব জুড়ে এই দুঃখ আর হতাশা দেখা দেবে। কিছু যদি না করা হয় তবে আমাদের পুত্র বা পৌত্রেরা বর্তমান জগতের তুলনায় অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ট ও গ্লানিপূর্ণ জগতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে।

বিজ্ঞান যে কতকগুলি অসুবিধা লাঘব করতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান বিজ্ঞান দিতে পারে। লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিবর্তিত করা যায়, জলসিঞ্চণ করে মরুভূমিকে শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত করা যায়, জঙ্গল কেটে সে স্থানকে মানুষের বসবাসের যোগ্য করা চলে—বন্ধ্যা জমিকে করা যায় উর্বরা। কিন্তু এসব তো সামান্য মাত্র, সাময়িকভাবে এতে উপকার পাওয়া যেতে পারে। একে উপশমমূলক ব্যবস্থা বলা চলে। এতে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। মোট কথা, এখনই কিছু না করলে একদিন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় তা ভোগ করবার লোক অনেক বেশী হয়ে যাবে।

আধুনিক জগতের প্রধান অবদান হবে মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্য বিধান করা। ভারত ও জাপানের মত মহান দেশে ইতিমধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যে সরকারী নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তা খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক। কিন্তু এখানেও ফল বিশেষ সন্তোষ-জনক হয় নি। আরও অনেক বেশী কাজ করতে হবে।

একেবারে মূল থেকে কাজ চালানো দরকার। সস্তায় এবং সহজে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা বিজ্ঞান করতে পারে। এমন ধরণের বটিকা আবিষ্কৃত হতে পারে যা খেলে জন্মরোধ করা যাবে। এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এতে উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু এসব গবেষণা চলছে বিক্ষিপ্তভাবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ফলে কাজ খুব মন্থর গতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। আমরা মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে আগের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করেছি। জন্মরোধ করবার পদ্ধতিও আমাদের অজানা নেই।

কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমার মনে হয়, পরমাণু বোমা তৈরী করতে আমাদের যে খরচ ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার এক দশমাংশ বা এক শতাংশও যদি মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে জানবার এবং নিয়ন্ত্রণ করবার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে ব্যয় করা হতো, তাহলে কমপক্ষে দশ বছরের মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো। অবশ্য সেটা হতো সাময়িক সমাধান। তারপরে জনসাধারণ যাতে এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে, তার ব্যবস্থা করবার জন্যে বিভিন্ন সরকারকে প্ররোচিত করতে হতো।

মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন না করলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই নিদারুণ সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান কোন দিনই সম্ভব হবে না। এই সমস্যা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করবার জন্যে বহু নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এর জন্যে দরকার সমীক্ষা, পরিকল্পনা বোর্ড, উপদেষ্টা পরিষদ, গবেষক

সংস্থা এবং এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠানের। এদেশে জীবতাত্ত্বিক সমীক্ষা, উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা আছে। ইংল্যাণ্ডে কৃষি গবেষণা পরিষদ ও চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ আছে। আমার মনে হয়, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে সমীক্ষার দরকার। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ও এ বিষয়ে গবেষণা এবং গবেষণার ফল কাজে লাগাবার জন্যে জনসংখ্যা-গবেষণা-পরিষদ গঠন করতে হবে।

বর্তমানে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। জনসংখ্যার জন্যে আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে না কেন? কেন আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে না সমাজ উন্নয়নের জন্যে? আমার মনে হয়, জনসংখ্যার সমস্যাটি এত জরুরী যে—শুধু বর্তমানে নয়, নিকট ভবিষ্যতেও—এদিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সারা বিশ্বকে এদিকে নজর দিতে হবে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের উচিত এই জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা—সর্বদেশে প্রযোজ্য একটা নীতি নির্ধারণ করা।

আমার ধারণা, সব দেশেই—বিশেষ করে তথা-কথিত অনুন্নত দেশগুলিতে—যেখানে বেশীর ভাগ লোকের পেটে অন্ন নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, উন্নয়নের উপায় নেই—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বর্তমানের তুলনায় বেশী অর্থ ব্যয় করলে ফল খুবই ভাল হবে। গবেষণার জন্যে অর্থ ব্যয় করুন, জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করুন, সারা দেশে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করুন, পরিবার নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে আর্থিক ও সামাজিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করুন—জীবনের লক্ষ্য হোক গুণ, সংখ্যা বৃদ্ধি নয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে যে ফল ভাল হবে, একথা বলবার কারণ হলো বর্তমান মুহূর্তে জন-সাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, শিক্ষার সুব্যবস্থা, চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে আমাদের, আপনাদের এবং চীনবাসীদের সবরকম প্রচেষ্টা পুত্রকন্যার সংখ্যাধিক্যের চাপে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। নবজাতকদের মুখে অন্ন জোগাতে হচ্ছে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই নতুন মুখ-গুলিতে অন্ন যোগাতে গিয়ে, তাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে, তাদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের আরব্ধ কাজ অগ্রসর হতে পারছে না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি যদি রোধ করা যেত, তাহলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে আরও অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হতো, নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যেত, নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হতো।

এ বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী হতে চাই না। আমি মনে করি যে, এই নিদারুণ অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্যে সব দেশকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্যে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে। এজন্যে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে; কারণ বিজ্ঞানই বাস্তব সমস্যা সমাধানের উপায়। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানকে ঠিকমত কাজে লাগানো সম্ভব, যদি তার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়—যদি প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষার জন্যে অর্থ ও লোকবল নিয়োগ করা যায়। আর বিজ্ঞান বলতে আমি শুধু কারিগরী বিজ্ঞানের কথাই বলছি না, অথবা শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং বা ঐ ধরণের কোন কিছুকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি না। তাছাড়া কেবল জীব-বিজ্ঞান, ফলিত জীব-বিজ্ঞান বা কৃষি-বিজ্ঞানের কথাও নয়, আমি বলছি বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রের কথা, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা আর বিশেষ করে জনসংখ্যা বিষয়ে গবেষণার কথা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হবার জন্যে আমি সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রহাণুপুঞ্জের সন্ধানে

সৌরমণ্ডলে আছে নয়টি গ্রহ আর এই নবগ্রহের মধ্যে একটি হলো আমাদের এই পৃথিবী। তাছাড়া এই সৌরমণ্ডলে আছে হাজার হাজার অতি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহাণুপুঞ্জ বা অ্যাস্টারয়েড্‌স্।

এই গ্রহাণুগুলির মধ্যে যেটি বৃহত্তম, সেটির নাম সেরেস; এর ব্যাস মাত্র ৪৭১.২৫ মাইল। আর সবচেয়ে ছোট গ্রহাণুটির ব্যাস প্রায় আধ মাইল।

গ্রহাণুগুলির অধিকাংশেরই কক্ষপথ, অর্থাৎ যে পথ ধরে তারা সূর্যের চারদিকে ঘোরে—মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবর্তী। কিন্তু এমন কতকগুলি গ্রহাণু আছে যেগুলির কক্ষপথ এই সীমার বাইরে। সুতরাং গ্রহাণুপুঞ্জের দূরত্ব পৃথিবী থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাছাড়া এরা আকারেও খুব ছোট; তাই খালি চোখে এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়—সবচেয়ে বড়টিকেও খালি চোখে দেখা যায় না। এমন কি, গ্রহাণুগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উজ্জ্বল, সেটিকে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও সহজে দেখতে পাওয়া যায় না—রাত্রির আকাশের অসংখ্য তারার মধ্যে এদের অতি ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হারিয়ে যায়। এই জন্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে গ্রহাণুপুঞ্জের আবিষ্কার এবং তাদের সম্পর্কে রীতিমত অনুশীলন সুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল আগে।

ইটালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াৎসি ১৮০১ সালে সর্বপ্রথম সেরেস গ্রহাণুটিকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই এই গ্রহাণুটি তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গস্ গাণিতিক হিসাব করে এর কক্ষপথ নির্দিষ্ট করবার পর সেরেস পুনরায় আবিষ্কৃত হয়। অধিকাংশ গ্রহাণুর আকার সেরেসের চেয়ে অনেক ছোট হবার ফলে তাদের ঔজ্জ্বল্যও সেরেসের তুলনায় যৎসামান্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ-পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার গ্রহাণুকে চিহ্নিত করেছেন, তাদের কক্ষপথ নির্ণয় করেছেন এবং তাদের চালচলন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। এগুলি ছাড়া আরও অনেক অজ্ঞাত গ্রহাণু আছে বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু কি ভাবে এত ছোট আর দুর্নিরীক্ষ্য গ্রহাণুকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন? এগুলি ধরা পড়েছে ফটোগ্রাফির সাহায্যে।

আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে তারাগুলি আকাশের বুকে তাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে স্থির হয়ে রয়েছে; আর ছোট-বড় সব গ্রহই এই মহাকাশের পটভূমিকায় তাদের স্থান পরিবর্তন করছে। বলা বাহুল্য, এ-রকম মনে হবার কারণ, তারাগুলি এত দূরে রয়েছে যে, তাদের স্থান পরিবর্তন বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। গ্রহগুলি সেই তুলনায় ঢের বেশী কাছে বলে তাদের গতি আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। বাস্তবিক পক্ষে, এই ভাবেই আমরা বুঝি, কোন্‌টা তারা আর কোন্‌টা গ্রহ। তাছাড়া পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, আর সেই সঙ্গে আমরাও ঘুরছি বলেই সমগ্র আকাশটাই যেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আমাদের চতুর্দিকে ঘুরছে বলে মনে হয়।

পৃথিবীর উপরে এক জায়গায় স্থিরনির্দিষ্ট একটি ক্যামেরার সাহায্যে (এক্ষেত্রে টেলিস্কোপ-ক্যামেরা) যদি অনেকক্ষণ ধরে এক্সপোজার দিয়ে আকাশের একাংশের ছবি তোলা যায়, তাহলে ফটোগ্রাফির প্লেটটিতে গ্রহ-নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটি আলোকবিন্দু এক-একটি আলোকরেখা এঁকে যাবে। কারণ যতক্ষণ ধরে এক্সপোজার দেওয়া হয়েছে, সেই সময়টুকুর মধ্যে পৃথিবী ঘুরে যাবার ফলে ক্যামেরাটিও ঘুরে গেছে। কিন্তু যদি এমন একটা ব্যবস্থা করা যায়, যার ফলে

পৃথিবী যেদিকে ঘুরছে, ঠিক তার সমান গতিতে ক্যামেরাটিও উল্টো দিকে ঘুরছে, তাহলে আপেক্ষিক গতির নিয়মে ক্যামেরার চোখে তারাগুলি একই জায়গায় স্থিরভাবে থাকবে, কিন্তু গ্রহগুলি সরে যেতে থাকবে। সে ক্ষেত্রে ফটোপ্লেটের উপরে প্রত্যেকটি তারা এক-একটি আলোকবিন্দু হিসাবে, আর গ্রহগুলি আলোকরেখা হিসাবে প্রতিফলিত হবে।

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে এক্সপোজার দিয়ে ফটো তুলে খুব ক্ষীণ আলোকে প্লেটের উপর চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং ফটোগ্রাফটিতে আলোর বিন্দু আর আলোর রেখা দেখে বোঝা যাবে, কোন্‌গুলি তারা আর কোন্‌গুলি গ্রহ বা গ্রহাণু। গ্রহগুলি তো জানাই আছে; অতএব গ্রহাণুগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

ঠিক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ফটোগ্রাফের সাহায্যে গ্রহাণুগুলিকে আবিষ্কার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, যত সহজে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হলো, কার্যক্ষেত্রে এটা ঠিক ততটা সহজ নয়। সবচেয়ে জটিল হলো ঘড়ির মত যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে টেলিস্কোপ-ক্যামেরাটিকে নিখুঁতভাবে পৃথিবীর সমান গতিতে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের অনেকগুলি মানমন্দিরে এই রকম টেলিস্কোপ-ক্যামেরার সাহায্যে অনেকদিন থেকেই গ্রহাণুপুঞ্জ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা হচ্ছে। সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে তোলা এসব ফটোগ্রাফ মিলিয়ে গাণিতিক উপায়ে প্রত্যেকটি গ্রহাণুর কক্ষপথ, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বের করা হচ্ছে। এমন কি, এই সব গ্রহাণুর অতি ক্ষীণ আলোর বর্ণালী-বিশ্লেষণ করবার জন্যে অতি সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর স্পেক্ট্রোগ্রাফ বা বর্ণালীলেখ যন্ত্রও তৈরী করা হয়েছে। এসব বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ্রহাণুগুলির উপাদান ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।
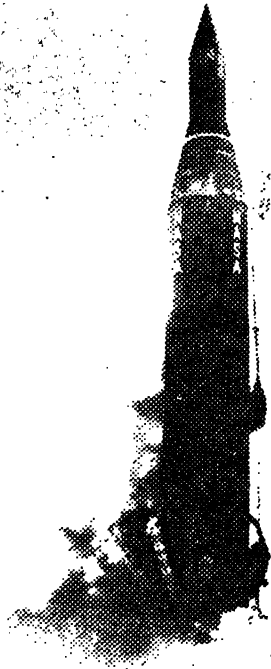
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অন্তরীপ থেকে তাদের তৈরী প্রথম রকেট 'জুনো-২' গত ডিসেম্বর মাসে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করেছিল। এই রকেটের সঙ্গে ছিল 'পায়োনিয়ার-৩' কৃত্রিম উপগ্রহ। রকেটটি চাঁদের কাছে পৌঁছাতে না পারলেও এই পরীক্ষা-কার্য খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। উপগ্রহের মধ্যে স্থাপিত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে।

এর্‌রেনিয়াস

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শতবর্ষ পূর্বে সেণ্ট অগাষ্ট এর্‌রেনিয়াস (Saint August Arrhenius) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা হিসেবে তাঁর স্থান অক্ষয় হয়ে আছে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সুইডেনের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী উপ্‌শালার নিকটে উইজ্‌কের দুর্গে তাঁর জন্ম হয়েছিল। উপ্‌শালা ছোট্ট একটি শহর, আজও লোকবসতি মাত্র ৬৩,০০০-এর মত। শালা নামে ছোট্ট একটি নদী এই শহর ঘেঁসে চলে গিয়েছে। শৈশবকালেই এর্‌রেনিয়াসের অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়েছিল—বিজ্ঞানকে তিনি তাঁর জীবনের সাধনার বিষয় হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন কিশোর বয়স থেকেই।

সতেরো বছর বয়সে উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। বিস্ময়ের কথা এই যে, একশ' বছর পরেও যেখানের লোকসংখ্যা এক লাখেরও অনেক কম, সেখানে তখন থেকেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে বিদ্যাচর্চার পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার সময় পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তথাকার পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের ব্যবস্থায় তিনি মোটেই সন্তোষলাভ করতে পারেন নি। উপ্‌শালা থেকে ৪৫ মাইল দূরে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোল্‌ম। তিনি ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরিক্‌ এড্‌লাণ্ডের খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে এর্‌রেনিয়াস বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।

রাসায়নিক দ্রবণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রেরণ করলে কি হয়, ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি সে সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

এ সম্বন্ধে মাইকেল ফ্যারাডে বিস্তর পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষার ফলে ফ্যারাডে দেখেছিলেন যে, বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণের উপর রাসায়নিক দ্রবণের বিশ্লিষ্ট হওয়ার পরিমাণ নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ-স্রোত যত বাড়ানো যাবে, বিশ্লেষণ ক্রিয়াও তত বৃদ্ধি পাবে। রূপা ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিশ্রণ সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত চালিত করলে রূপা ও ক্লোরিন বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কতটুকু রূপা বা ক্লোরিন বিশ্লিষ্ট হবে তা নির্ভর করে বিদ্যুৎ-স্রোতের পরিমাণের উপর। শোনা যায়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম হোয়েল ফ্যারাডের নতুন পরীক্ষার বিষয়বস্তুর নামকরণে সহায়তা করেছিলেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের মত বিদ্যুতের সাহায্যে বিশ্লিষ্টকরণের নাম হলো ইলেক্ট্রোলাইসিস (বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ)। বিদ্যুৎ পাঠাবার দুটি ধাতব দণ্ডকে বলা হলো ইলেকট্রোড। ধনাত্মক ধাতব দণ্ডের নাম অ্যানোড, আর ঋণাত্মক ধাতব দণ্ডের নাম ক্যাথোড। রাসায়নিক দ্রবণের নাম হলো ইলেকট্রোলাইট।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর গবেষণার বিস্তর ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে থাকে। নানা রকমের ব্যাটারী আবিষ্কৃত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্ল্যাণ্টের আবিষ্কৃত লেড-অ্যাসিড ব্যাটারী। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাইরে থেকে বিদ্যুৎ চালিয়ে পুনরুদ্ধার করা যায় বলে এর বিস্তর প্রচলন হয়েছিল।

ব্যাটারীতে কেমন করে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়,

সে সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানী চিন্তা করেছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রুডলফ্ ক্লসিয়াস প্রমাণ করেন যে, রাসায়নিক দ্রবণের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমন্বিত অণুসমূহ—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আয়ন বলা হয়—পরস্পর কোন বিশেষ নিয়মে যুক্ত নয়। বাইরের বিদ্যুৎ-স্রোত এ সব আয়ন তৈরী করে না, এদের কেবল ইলেকট্রোডের দিকে চালিত করে। আবার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে দেখা যায়, ক্লোরিন আয়নের গতি হাইড্রোজেন আয়নের মত দ্রুত নয়। বিভিন্ন আয়নের গতির পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেন উইলহেল্‌ম্ হিটর্ফ ও ফ্রেডারিক কোল্‌রস। তাঁদের ব্যাখ্যায়, ইলেকট্রোলাইসিসের সময় প্রতিটি আয়ন একটা নিজস্ব গতিবেগে ভ্রমণ করে। ঐ গতিবেগের উপর বিপরীত-ধর্মী অপর আয়নের কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। ১৮৬৯-১৮৮০ খৃষ্টাব্দব্যাপী প্রায় এক যুগ ধরে পরীক্ষার পর কোল্‌রস রাসায়নিক দ্রবণের বৈদ্যুতিক বিরোধীতা বা পরিবহনযোগ্যতা নির্ণয়ের একটি প্রক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

জার্মেনীতে কোল্‌রস যখন পরীক্ষায় ব্যস্ত, ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ে এরেনিয়াসও তখন অনুরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল। এ সব পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি ডক্টরেট থিসিস তৈরী করেন।

তাঁর মতে, কোন দ্রবণে বিদ্যুৎ-স্রোতের ফল দ্রবণের আয়নসমূহের গতিতে প্রকাশিত হয় বলে তাদের বিদ্যুৎ-পরিবহনতার মাপ সমসংখ্যক আয়নের তুল্য হবার কথা। কোন দ্রবণে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-পরিবহনতা দেখা যাবে তা নির্ভর করবে দ্রবণের ঘনত্বের উপর। কারণ ঘনত্ব যত কম হবে সমপরিমাণ ইলেকট্রোলাইটের আয়ন সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাবে।

এরেনিয়াস দেখালেন যে, কোন দ্রবণে বিদ্যুৎ-স্রোত পরিচালন ব্যতীতই আয়ন বর্তমান থাকে। খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে মেশালে সোডিয়াম ও ক্লোরিন জাতীয় দু-রকমের বিভিন্ন আয়নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুরা সোডিয়াম ক্লোরাইড বিভক্ত হয় না; কিছু অংশ যুক্ত থাকে। এরেনিয়াস প্রমাণ করেন—বিদ্যুৎ পরিবহনতার পরিমাপ দেখে বলা চলে, একটা ইলেকট্রোলাইটের অণু কি অনুপাত আয়নে পরিণত হয়েছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এরেনিয়াস এই গবেষণার জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিচারকেরা তাঁকে ডক্টরেটের জন্যে সর্বন্যূন সমর্থন জানিয়েছিলেন—আর একটু হলেই তাঁর থিসিস বাতিল হয়ে যেত। এই থিসিস সম্বন্ধে এরেনিয়াস নিজে লিখেছেন—আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্লীভের নিকট গিয়ে বললাম—রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত বিদ্যুৎ-পরিবহনতা সম্পর্কে আমার একটা নতুন থিওরী আছে। তিনি বললেন, সে তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটু পরেই বললেন আচ্ছা, আসতে পার। পরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অনেক থিওরী গঠিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ভুল; কারণ কিছুদিন পরেই তাঁদের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব সংখ্যাতত্ত্বের গড়পড়তা হিসেবের ধারণায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আমার থিওরীও বেশী দিন টিকে থাকবে না।

এরেনিয়াস ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, বিভিন্ন অ্যাসিডে পরিবহনতা এবং রাসায়নিক কার্যকারিতার মধ্যে একটা যোগ-সূত্র রয়েছে; সমান ঘনত্বের বিভিন্ন অ্যাসিডে এই দুটা ধর্মের অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। পরিবহনতা বৃদ্ধির সঙ্গে রাসায়নিক কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। এরেনিয়াস তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ওষ্টওয়াল্ডকে জানিয়েছিলেন। ওষ্টওয়াল্ড অনেক দিন ধরে এ বিষয়ে চর্চা করেছিলেন। এরেনিয়াসের মতবাদ ও পরীক্ষার মধ্যে তিনি নিজের চিন্তাধারার মিল দেখতে

পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হন এবং এরেনিয়াসকে তাঁর গবেষণাগারে এসে পরীক্ষাকার্য চালাতে আহ্বান করেন। এরেনিয়াস সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন; কারণ ষ্টকহোল্‌মের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর গবেষণা ও মতবাদকে সন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ওষ্টওয়াল্ডের গবেষণাগারে তিনি বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা করেন। এ সব পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত বিশ্লেষণ (electrolytic dissociation) মতবাদ আরও পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন।

এরেনিয়াসের মতে, একটা ইলেকট্রোলাইট দুটি বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এই দুটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ব্যতীতই এদের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এক অবস্থা অণুর সঙ্গে জড়িত থাকে, অপরটি আয়নের সঙ্গে। অণু এবং আয়ন একটি দ্রবণে একসঙ্গে বিরাজ করে। আয়নিত অবস্থার পরিমাণ এবং আণবিক অবস্থার পরিমাণের অনুপাতকে বলা হয় বিশ্লিষ্ট হওয়ার মাত্রা (Degree of dissociation)। আয়ন থাকবার ফলে ইলেকট্রোলাইটের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চলন সম্ভব হয়। এই কারণে কোন দ্রবণের পরিবহনতা তার বিশ্লিষ্ট হওয়ার মাত্রার সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হবে।

একটা ইলেকট্রোলাইটে অণু ও আয়ন একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে বলে এরেনিয়াস মনে করলেন যে, এতে ভরসূত্র (Law of mass action) প্রয়োগ করা চলবে। ভরসূত্র প্রয়োগ করে তিনি ওষ্টওয়াল্ডের আবিষ্কৃত Dilution law নির্ণয় করতে সক্ষম হন।

কোন দ্রবণে বিভিন্ন ইলেক্‌ট্রোলাইট থাকলে কি অবস্থা হবে, সে সম্বন্ধে এরেনিয়াস একটা থিওরী দাঁড় করিয়েছিলেন। কেবল থিওরী দেওয়া নয়, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে পরীক্ষা করে এই মতবাদ তিনি প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আরও অনেক পরীক্ষায় তাঁর মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল।

ইলেকট্রোলাইটে সাধারণতঃ Osmotic pressure-এর সূত্র কার্যকরী হয় না। বিভিন্ন দ্রবণে এই Osmotic pressure দেখা যায়। এই pressure-এর সহায়তায় উদ্ভিদের কোষে রস চলাচল করে থাকে। এরেনিয়াস তাঁর ইলেকট্রোলাইট থিওরীর ভিত্তিতে এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি কতকগুলি ইলেকট্রোলাইটের বিশ্লিষ্ট হওয়ার মাত্রার সঙ্গে Osmotic pressure-এর সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

এ সময় ভ্যাণ্ট হফ্ Osmotic pressure সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। তিনি এরেনিয়াসের মতবাদে আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ উভয়ের মধ্যে সুমধুর বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে।

ভ্যাণ্ট হফ, এরেনিয়াস ও ওষ্টওয়াল্ড—এই তিন বন্ধুর শুধু মতের নয়, মনের মিলও হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক মহলে এঁদের মতবাদ প্রথমে সমাদর লাভ করে নি। তাই তাঁরা তিনজন একত্রে তাঁদের মতবাদের স্বীকৃতির জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্রের গঠনে এই তিনজন পথিকৃতের মিলন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

ক্রমে ক্রমে এই তিনজনের মতবাদ বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯০১, ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ভ্যাণ্ট হফ্, ওষ্টওয়াল্ড এবং এরেনিয়াস—এই তিন বন্ধু।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এরেনিয়াস জার্মেনীতে আমন্ত্রিত হন অধ্যাপক হিসেবে। তিনি জার্মেনীতে যেতে অস্বীকার করেন এবং ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ থেকে

১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরও ছিলেন।

এ সময় তিনি ইলেকট্রোলাইট মতবাদ, বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ও বায়বীয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছিলেন। কেবল সুইডেনের নয়, বিদেশের বহু ছাত্রও তাঁর নিকট অধ্যয়ন করতে আসেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর Treatise on Theoretical Electro-chemistry নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহাকাশ সম্বন্ধে তাঁর পুস্তক Treatise on Cosmic Space মুদ্রিত হয়।

জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এর্‌রেনিয়াসের ছিল জাগ্রত দৃষ্টি। গণিতবিদ্যায় তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরক্তি, রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষায় অদম্য কৌতূহল, ভেষজ-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর অসীম আকর্ষণ। তিনি যে কেবল এ সব বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনাই করেছিলেন তা নয়, সমকালীন চিন্তা-ধারাকে পুষ্টতর করতেও এগিয়ে এসেছিলেন।

জীবন সম্বন্ধে তিনি এক নতুন মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, জীবন অতি ক্ষুদ্র বীজরূপে সারা জগৎব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। অতি ক্ষুদ্র বীজগুলি যুগ যুগ ধরে মহাশূন্য পরিক্রমা করছে। জ্বলন্ত তারকার উত্তাপে অধিকাংশ বীজ নষ্ট হয়ে যায়—কয়েকটি আবার বাসযোগ্য স্থানে পড়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত করে। তাঁর এই মতবাদ এখনও পরীক্ষিত হয় নি। আজ পর্যন্ত জীবনের লক্ষণ পৃথিবীর বাইরে কোথাও দেখা যায় নি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Worlds in the Making নামক গ্রন্থে এ মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

মহাশূন্যে আলোকের চাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেছিলেন। ধূমকেতুর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকবার কারণ হচ্ছে, সূর্য-র রশ্মির প্রভাব—এ তথ্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Destinies of the Stars নামক গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা, তাও তিনি ভেবেছিলেন।

তিনি দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খুব ভালবাসতেন। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তাঁর গৃহেও ছাত্রদের অবাধ আনাগোনা ছিল। এই লোকটির কাছে আসতে যেমন ছিল সকলের আগ্রহ, তেমনি এঁকে বিভিন্ন ব্যাপারে আহ্বান করতেও সকলের ছিল তীব্র উৎসাহ। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ঐ সব বক্তৃতায় তিনি বিভিন্ন বিষ ও প্রতিষেধকে রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার জার্মেনীতে অধ্যাপকের পদ ও পরীক্ষাগারের সুবিধা প্রত্যাখ্যান করেন। সুইডেন এতদিনে তার দেশভক্ত, কৃতী সন্তানের পূর্ণ মর্যাদা দিতে এগিয়ে এলো। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত রসায়ন-বিজ্ঞানের [নোবেল ইন্‌ষ্টিটিউটের] কর্ণধারের পদ তিনি লাভ করেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই ইনষ্টিটিউটে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিভিন্ন দেশ তাঁকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করে। এ সব সম্মানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যুক্তরাজ্যের রয়েল সোসাইটির ডেভি পদক এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক সমাজের উইলিয়ার্ড গিব্‌স্‌ পদক।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর লিখিত পুস্তক Quantitative Laws in Biological Chemistry ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর আর একটি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ Chemistry in Modern Life প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ

ইউরোপের অনেক ভাষায়, বিশেষ করে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর শবদেহ তাঁর কৈশোরের লীলাভূমি উপ্‌শালায় সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর ৩১ বছর পার হয়ে গেছে। এই কালের ব্যবধানে বিস্ময়কর প্রগতি ঘটেছে বিজ্ঞানে। এরেনিয়াসের বিভিন্ন মতবাদ পরবর্তী কালের পরীক্ষায় পুরাপুরি সত্য বলে বিবেচিত হয় নি। ইলেকট্রোলিসিস সম্পর্কিত মতবাদের ভিত্তিতে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেই মতবাদ আজকাল সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃত হয় না। তবু রসায়ন-বিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করেন যে, দীর্ঘ ৭২ বছর পূর্বে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই আধুনিক ইলেকট্রো-লিসিস থিওরী রচিত হয়েছে। আধুনিক মতবাদ তাঁর মতেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। তিনি যে বীজ রোপণ করেছিলেন আজ তা বিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের এক অসামান্য সাধক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চিরকালের জন্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে।
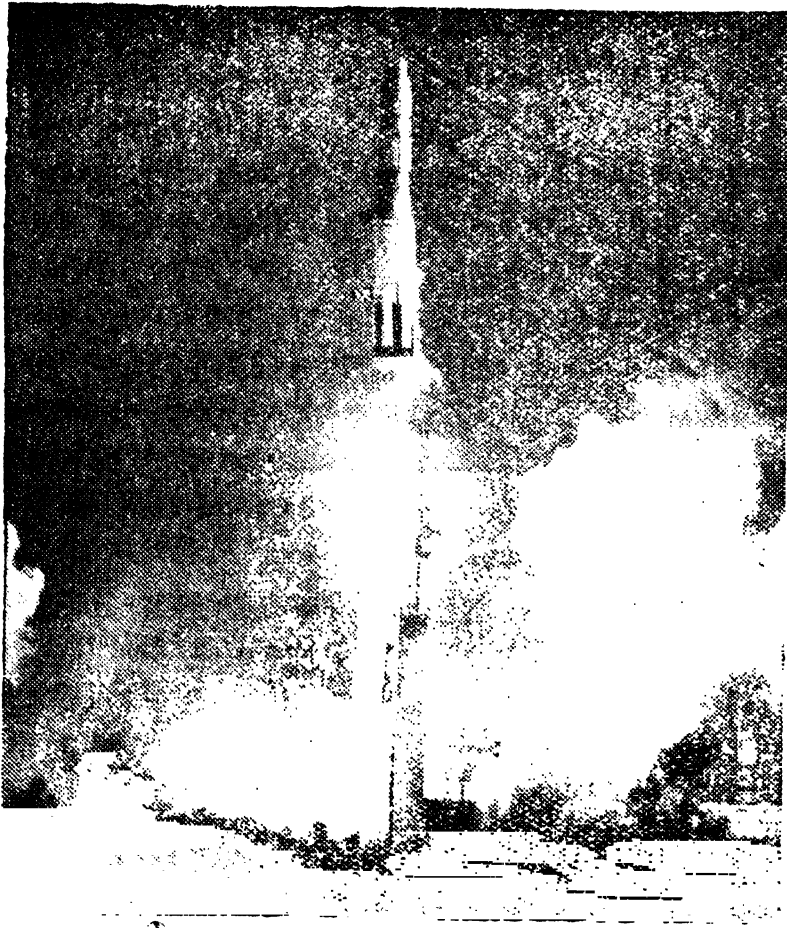
ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অন্তরীপ থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নবতম আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 'টাইটান' নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই নতুন ক্ষেপণাস্ত্রটি 'অ্যাটলাস' ক্ষেপণাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং এর গঠনমূলক জটিলতাও কম। 'টাইটান' ক্ষেপণাস্ত্র ৯০০০ মাইল পর্যন্ত উঁচুতে উঠতে পারে।

পার্বত্য পথ নির্মাণ

শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর—হু হু করে বাস ছুটে চলেছে পাহাড়ের বুকে এঁকেবেঁকে—এধার-ওধার হেলে ন'হাজার ফুটের উপর। কিন্তু এ রকম সুন্দর পার্বত্য পথ নির্মাণ কেমন করে সম্ভব হলো? এ ধরণের পার্বত্য পথ নির্মাণ এবং তার স্থায়িত্ব বজায় রাখবার ব্যাপারে অনেক রকম বাধা আসতে পারে। সে বাধাগুলি কি এবং সেগুলিকে দূর করবার উপায়ই বা কি, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক সন্ধান ভূতাত্ত্বিকেরাই দিতে পারেন। কোন পার্বত্য রাস্তা বা বাঁধ কিম্বা কোন সুড়ঙ্গ তৈরী করতে হলে কি রকম পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন, কি রকম পাথর দরকার—প্রথমতঃ সে বিষয় স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে এটুকুই তো সব নয়! প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। সুতরাং পার্বত্য পথ নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহজলভ্যতা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়, যেটা ভূতাত্ত্বিককে পূর্বেই স্থির করে নিতে হয়। তাছাড়া এরূপ পার্বত্য পথ নির্মাণের ফলে যাতে কোন মূল্যবান খনিজের আকর হারাতে না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। তার উপর নতুন নতুন খনিজ অবক্ষেপের (Mineral deposit) সন্ধান নেওয়ার ব্যাপার তো আছেই। এতদ্ব্যতীত পাহাড়টির স্থায়িত্ব এবং ধস্ বা ভূমিস্খলন ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। কাজেই এরূপ একটা পরিকল্পনার উপদেষ্টা হিসাবে ভূতত্ত্ববিদ্‌কে অনেক কিছুই অতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধস্ তিন প্রকারের। জার্মান ভাষায় এদের বলা হয়—(১) Feldsturze, (২) Feldschlippe, (৩) Schutlrutschungen। সাধারণভাবে প্রথমটিকে পাথরের পতন বলা চলে। প্রায় সব পাথরেরই একটা স্থিতি-কোণ (Angle of repose) আছে। সেটি সাধারণতঃ ২০° থেকে ২৫° ডিগ্রীর মধ্যে। যখন কোন পাথরের নতি (Inclination) ঐ কৌণিক পরিমাপকে অতিক্রম করে, তখন নৈসর্গিক কারণে চূর্ণীত বা ক্ষয়িত ঐ প্রস্তররাশি স্থানচ্যুত হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রস্তর-স্খলন। শ্যাওলায় যেমন পা পিছলে যায় এ ক্ষেত্রে অনেকটা সেরূপ অবস্থা হয়। তৃতীয়টি হলো মাটির ধস্। মাটির ভিতর জল প্রবেশ করে যখন তার ওজন বাড়িয়ে তোলে তখন যে ভূস্তরের নতি ২০° ডিগ্রীর বেশী তা বিপজ্জনকভাবে স্খলিত হয়।

এ থেকে ভূস্খলন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। পার্বত্য পথ নির্মাণে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ভূতত্ত্ববিদের প্রথম কাজই হলো যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ তৈরী হবে তার স্খলন কোন্ শ্রেণীর, তা নির্ধারণ করা। তারপর তাঁকে স্খলনের কারণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সব স্খলনের সহায়ক কারণগুলি হলো এরূপ—

(ক) ঢালের নতি। সাধারণ নিয়ম এই যে, ঢালের নতি যত বেশী, স্খলনের সুযোগ-সুবিধাও তত বেশী। ৪০° ডিগ্রীর উপর যে কোন ঢালই বিপজ্জনক। তাকে যে কোন কাজের অনুপযুক্ত বলে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে একটা

কথা—ঐ ঢাল যদি শুধু কয়েক গজের জন্যে হয়, অর্থাৎ সমগ্র পাহাড়টির ঢাল ভিন্ন এবং আরও কম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দু'এক জায়গায় খুব অল্প খানিকটা পরিসরে ঢালটি খাড়াই হয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে ৪০° ডিগ্রীরও বেশী থাকে—তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিকারের কোন উপায় চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। তবে ব্যাপকভাবে বলতে গেলে ২৫° ডিগ্রীর কম যে কোন ঢাল বেশ কতকটা সন্তোষজনক এবং সেক্ষেত্রে কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্যে অনেকটা সহজেই চেষ্টা করা যায়। আসল কথা ২৫° ডিগ্রী থেকে ৪০°

বৃষ্টির সময় এসব পাথরের জলে দ্রবীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যদি কোন চুনাপাথরের পাহাড়ে ধ্বংস বা চ্যুতি থাকে, তাহলে সেগুলি পাথর গলবার ফলে ক্রমশঃই বেড়ে যাবে। শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে যে, বড় বড় স্তূপ স্খলিত হতে থাকবে। সুতরাং এদিক থেকে মার্বেল, চুনাপাথর প্রভৃতি সন্তোষজনক নয়।

গ্র্যানিট, বেসাল্ট, নাইস প্রভৃতি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য; তবে লক্ষ্য রাখা দরকার, সেগুলি যেন খুব বেশী ক্ষয়িত বা চূর্ণীকৃত অবস্থায় না থাকে।
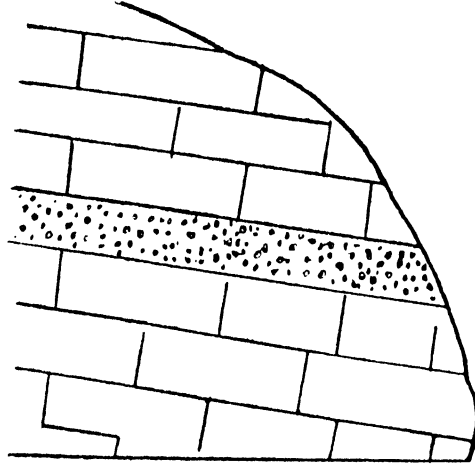
১নং চিত্র

ডিগ্রী পর্যন্ত ঢালের ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ববিদের ঠিকমত উপদেশ দরকার।

(খ) পাহাড়ের উপাদান। পাহাড়ের উপাদান সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ যত রকম পাথরের কথা জানা আছে, তার কতকগুলি বেশ উপযোগী এবং কতকগুলি খুবই অনুপযোগী।

শেল, শ্লেট, ফিলাইট প্রভৃতি পাথরগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত; কেন না, তাদের উপরিতল এতই মসৃণ যে, সহজেই সেগুলি স্খলিত হতে পারে।

মার্বেল, চুনাপাথর প্রভৃতি যদিও শক্ত, তাহলেও

(গ) পাহাড়ের ঢাল ও স্তরের বিনতি। পাহাড়ের ঢাল এবং পাহাড়টি যে সব স্তরের সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলির বিনতি (Dip) পরীক্ষা করলে তিন রকমের বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যেতে পারে—

(১) স্তরগুলি ঢালের দিকেই বিনত, কিন্তু বিনতির পরিমাণ ঢাল অপেক্ষা কম। এই রকম ক্ষেত্রে যদি স্তর-বিনতি ১৫° ডিগ্রীর কম হয় তাহলে একরকম ভাল; কিন্তু যদি বেশী হয়, তাহলে সেটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। আবার তার উপর যদি দুটি স্তরের মাঝে শেলের একটি স্তর থাকে তাহলে সেটা খুবই বিপজ্জনক; কারণ ফাটল দিয়ে

চোঁয়ানো জল পাথরকে আল্‌গা করে দেয় এবং তার ফলে কোন বড় রকমের স্খলন হতে পারে (১ম চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(২) স্তরগুলি ঢালের দিকে বিনত, কিন্তু বিনতি ঢাল অপেক্ষা বেশী। এক্ষেত্রেও জল চ্যুতি-পথে প্রবেশ করতে পারে এবং পাথরগুলিকে আল্‌গা করে স্খলনের সৃষ্টি করতে পারে। তবে খুব বড় রকমের কোন ধস্ নামা সম্ভব নয় (২য় চিত্র

২নং চিত্র

(৩) পাহাড়ের ঢালের বিপরীত দিকে স্তর-বিনতি এবং পরিমাণ অনির্দিষ্ট; পাহাড়ে যদি বিশেষভাবে প্রকট কোন জোড়, ভ্রংস বা চ্যুতি না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অবস্থা। উপরে যে তিনটি অবস্থার কথা বলা হলো তার মধ্যে তৃতীয়টিই সবচেয়ে নিরাপদ। তবে প্রথমেই বলেছি—লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জোড় যেন বিশেষভাবে প্রকট না থাকে। কারণ জোড়ের অবস্থিতি সব রকমের পরিস্থিতিকেই নির্মাণ কাজের অযোগ্য করে তোলে (৩য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) অন্তঃঅবরোহ পরিবেশ (Sub-aerial condition)। একথা সবারই জানা আছে যে, সিক্ত অবস্থা অপেক্ষা শুষ্ক অবস্থায় সব পাথরই বেশী স্থায়ী হয়। বহুদিন ধরে সিক্ত পরিবেশে থাকলে স্তরগুলি ক্ষয়িষ্ণু ও অস্থায়ী হয়ে ওঠে

৩নং চিত্র

এবং কালক্রমে কুঁকড়ে যায়। তাছাড়া জল যদি বেশী পরিমাণে থাকে তাহলে একই পরিমাণ স্থানের ওজন বাড়িয়ে তোলে—ফলে স্খলনের সুবিধাই হয়ে যায়; তার উপর পাথরের শক্তিও কমে যায়। তাই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পাহাড়টি শুষ্ক পরিবেশে আছে কিনা।

ঢালে যদি নদী-নালার সাহায্যে আণ্ডারকাটিং-এর সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা ভয়ানক বিপজ্জনক। কেন না, আণ্ডারকাটিং-এর জন্যে অনেক সময়েই অংশবিশেষ ভিত্তিশূন্যভাবে ঝুলে থাকে এবং কালক্রমে সেটি কুঁকড়ে যায়।

(৬) ভূ-কম্পন। সবশেষে ভূতাত্ত্বিককে ভূ-কম্পনের বিষয়ও চিন্তা করতে হয়। যেসব পার্বত্য অঞ্চলের উপর রাস্তা তৈরী হয়েছে সে সব স্থানে যদি ভূমিকম্প হয় অথবা স্থানটি যদি ভূমিকম্পের এলাকাভুক্ত হয় তাহলে সে সব অঞ্চলে নির্মিত রাস্তাঘাট কখনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তাই ভূতত্ত্ববিদ্‌কে ঐ সব অঞ্চলের পুর্বেকার ভূ-কম্পনের বিবরণ সংগ্রহ করে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

অবশ্য উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিচার করে ক্ষেত্রবিশেষে অনুপযোগী পরিবেশকেও কৃত্রিম উপায়ে উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাকে স্থায়ীভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

অবশ্য চেষ্টা চলছে, কি ভাবে অনুপযোগী পার্বত্য পরিবেশকে পথ-নির্মাণের উপযোগী করে কার্যকরী করে তোলা যায়। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিকেরা কৃত্রিম উপায়ে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

(১) ঢালের নতি কমাবার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কিন্তু সেটা স্বভাবতঃই স্থানীয়ভাবে—অল্প পরিসরের মধ্যে। যেখানে সামগ্রিক ঢাল খুব বেশী নয়, কিন্তু আংশিকভাবে চড়াই খুব বেশী, সেক্ষেত্রে বেঞ্চ বা থাক কেটে চড়াই কমানো হয়। কিন্তু এর অপকার হলো এই যে, এক দিকটার ঢাল যেমন কমে যায়, অন্য দিকের ঢাল তেমনি বেড়ে যায়। কাজেই এই উপায় অবলম্বন করা হয় তখনই, যখন পাহাড়ের বুকে কোথাও ছোট সহর গড়ে তুলতে হয়। সে সব ক্ষেত্রে বেঞ্চ কাটিং-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খাড়াই-এর

৪নং চিত্র

দিকে শিষ্ট-প্রাচীর দিয়ে সহজেই মসৃণ ও ঢালু অংশে পার্বত্য সহর গড়ে তুলতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না (৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(২) ঢালের জন্যে ঝর্ণার মত জলধারা পৃষ্ঠদেশ প্লাবিত করে; ইংরেজীতে একে বলা হয় Seepage। এই জলধারা ঢালের স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ঢালের পাশে ঘাস এবং গাছ পুঁতে এর প্রতিকার করা যায়।

(৩) ঢালের ভিতর যে জল জমে, তাও সরিয়ে দেওয়া দরকার। কেন না, আগেই বলেছি যে, পথ নির্মাণের কাজে সিক্ত অপেক্ষা শুষ্ক অবস্থার প্রয়োজনীয়তাই বেশী। এই কারণে ঢালের উপরে নল প্রবেশ করিয়ে তার মধ্যদিয়ে জল নির্গমনের ব্যবস্থা করা যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যবস্থাটি অনেকটা ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন গ্যালারীর মত।

(৪) সবশেষে শিষ্ট-প্রাচীর (Retaining wall) নির্মাণের ব্যবস্থা। এই শিষ্ট-প্রাচীর হলো পর্বত-গাত্রের খাড়াই অংশে নির্মিত ১০ ফুট চওড়া একরকম প্রাচীর। এর উপযোগিতা হলো ভূ-কম্পন থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে। যদিও এর দ্বারা ভূমিকম্প পুরাপুরিভাবে এড়ানো যায় না বটে, তবে স্থানীয় এবং সাময়িকভাবে ভূ-কম্পনের পূর্বে একটা বিপদজ্ঞাপক ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
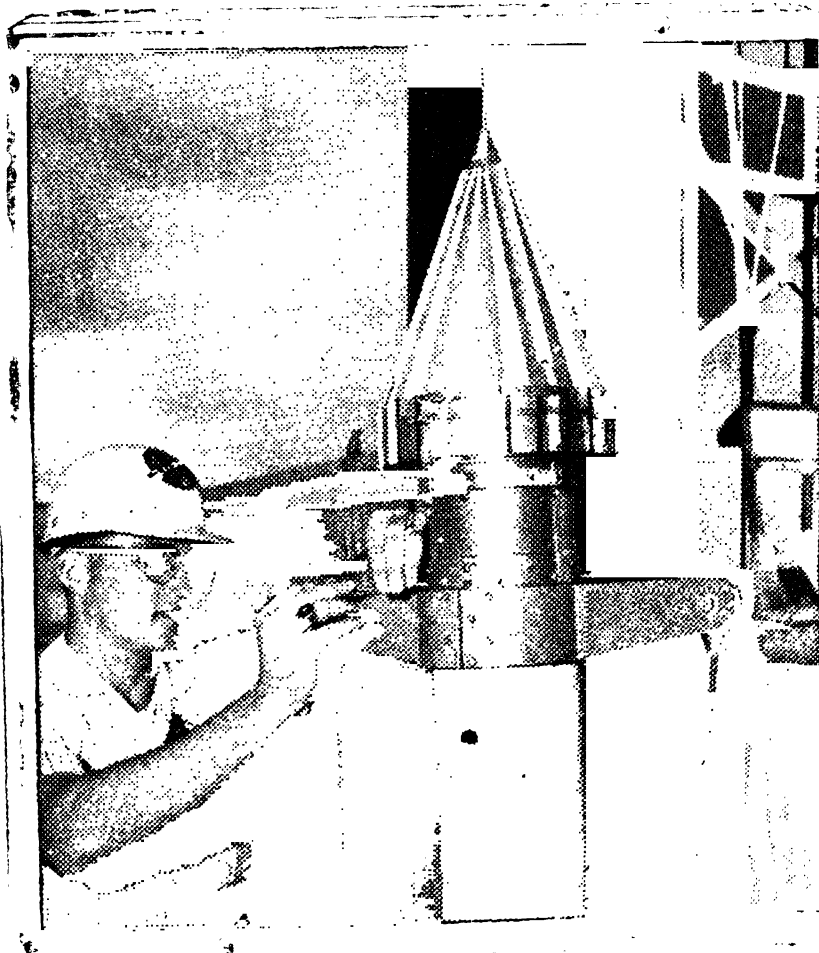
'পায়োনিয়ার-৩' নামক এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ১২·৯৫ পাউণ্ড। 'জুনো-২' নামক রকেটের সাহায্যে এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৃথিবী থেকে ৬৬,৬৫৪ মাইল দূরে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল।

অতিকায় সৌরচুল্লী

১৯৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। একটি বিশাল আকৃতির সৌরচুল্লীর উদ্বোধন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর কাজও আরম্ভ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সূর্যের উত্তাপকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে পৃথিবীতে প্রচণ্ড শক্তিশালী যে সব যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সৌরচুল্লীটি তাদের অন্যতম। এই চুল্লীটি ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যের অন্তর্গত নোটিকে অবস্থিত। চুল্লীটি ৪ ইঞ্চি তাপরশ্মি বিকিরণ করে এবং ৫০০০ ডিগ্রী ফারেন-হাইট পর্যন্ত তাপ উৎপাদন করে। পারমাণবিক
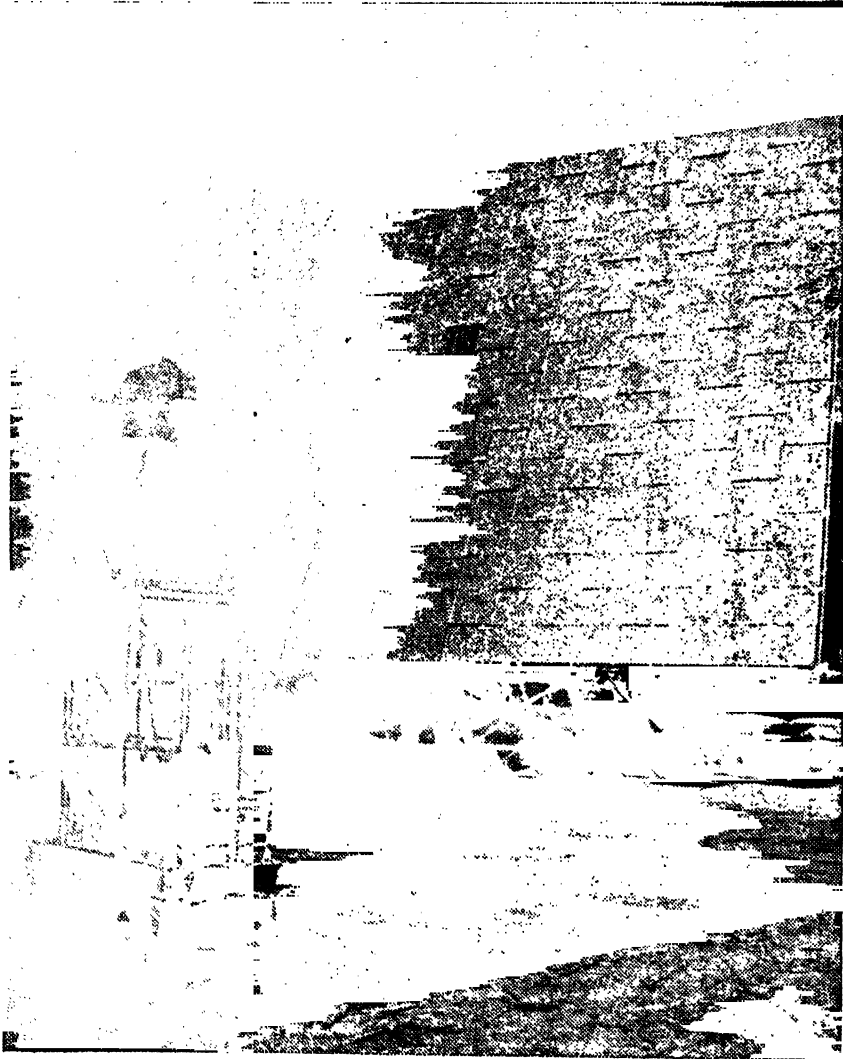
নোটিকের (ম্যাসাচুসেট্স্) নব-নির্মিত সৌরচুল্লীর হেলিওষ্টাটটিতে প্রতিফলক আয়নাগুলি কিভাবে সজ্জিত আছে তা ছবিতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে।

বিস্ফোরণে যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সমপরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করে এই চুল্লীটি। এক অভিনব পদ্ধতিতে সজ্জিত আয়নার সাহায্যে উৎপাদিত এই তাপরশ্মিকে পারমাণবিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাটি সামরিক প্রতিরক্ষা গবেষণার জন্যে পরিকল্পিত হলেও এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর জ্ঞান সঞ্চয়ে সহায়তা করবে। বিভিন্ন প্রকার বস্তুর তাপ-নিরোধক
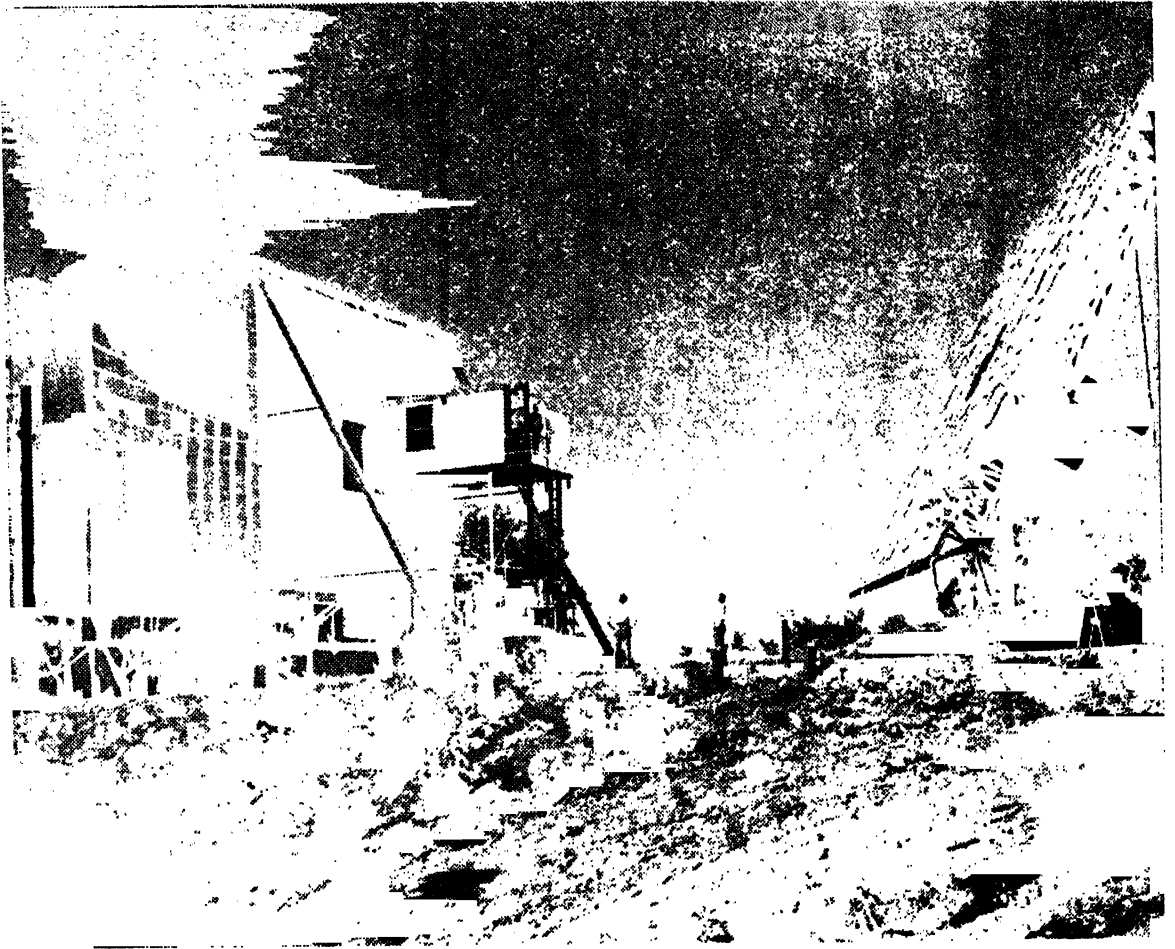
৫০০০° ফাঃ তাপ-উৎপাদক সৌরচুল্লী। এই বিরাট সৌরচুল্লীটি যেভাবে স্থাপিত হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য। ডানদিকের হেলানো হেলিওষ্ট্যাট থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি বাঁ-দিকের কন্‌সেনট্রেটরের (রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত বা সংহত করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা) সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরীক্ষা-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে। পরীক্ষা-কক্ষ ও কনসেনট্রেটরের মধ্যবর্তী অংশে জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা-করা সাটারটি রয়েছে। সাটার এই তীব্র রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অস্ত্রশস্ত্রের তাপ বিকিরণ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কাজে ব্যবহার করা হবে।

সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার এই নতুন ক্ষমতা কতখানি এবং উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এলে এগুলিতে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা নির্ধারণের জন্যে এই বস্তুগুলিকে সৌরচুল্লীর

সৌরচুল্লী থেকে যে প্রচণ্ড তাপরশ্মি (৫০০০° ফা.) নির্গত হয়ে থাকে তার শক্তি পরীক্ষার জন্যে চার ইঞ্চি পুরু লোহার বিমটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে—দর্পণে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে সেই চার ইঞ্চি পুরু লোহার বিমটির যে জায়গায় পড়েছে, সেই জায়গাটা গলে গিয়ে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

প্রচণ্ড উত্তাপের সামনে আনা হয়। বিজ্ঞানীরা কতকগুলি ধাতু ও কাচের তাপ-নিরোধক শক্তি সম্পর্কে এবং তাপরশ্মির সম্মুখীন হলে যে সব পদার্থের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হবেন। নোটিকে অবস্থিত সৌরচুল্লীটি চা'রটি প্রধান অংশে বিভক্ত। এই সৌরচুল্লীটি ১২৫ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ ফুট প্রশস্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে।

৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৩৬ ফুট প্রশস্ত একটি বৃহৎ রয়েছে। প্রতিফলকটি সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে এই সমাহরকটির উপর। সমাহরকটি ১,৪২০ বর্গফুট প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি সংহত করে' তাকে ৪ ইঞ্চি রশ্মিতে পরিণত করে। দু-ফুট সমচতুষ্কোণ ১৮০টি অবতল আয়নার সাহায্যে এই সমাহরকটি নির্মিত হয়েছে। ভ্যাকুয়াম প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রতিটি আয়নার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এর উপরিভাগ রক্ষার জন্যে সিলিকন মনোক্সাইডের একটা আস্তরণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিফলিত সূর্য-

লোহার বিমটির যেখানটায় কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি পড়েছিল সেখানের লোহা গলে গিয়ে একটা ডিম্বাকার গর্ত উৎপন্ন হয়েছে।
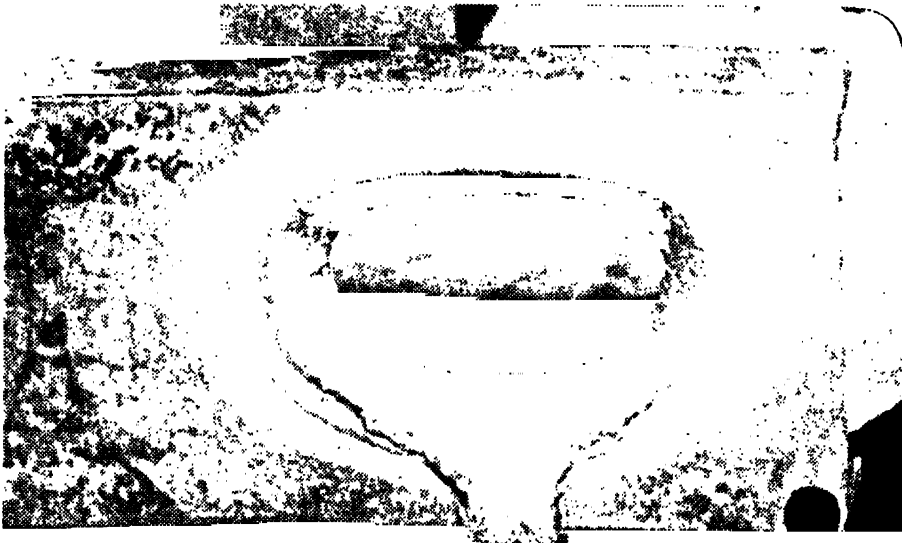
প্রতিফলক সূর্যের রশ্মি সংগ্রহ করে। ২ ফুট সমচতুষ্কোণ ৩৫৫টি আয়না পর পর সাজিয়ে নির্মিত হয়েছে এই বৃহদাকার প্রতিফলকটি সিকি ইঞ্চি পুরু স্বচ্ছ কাচের পিছন দিকে পারদ লাগিয়ে প্রতিফলকের আয়নাগুলি তৈরী। প্রতিফলকটি একটি ফ্রেমের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত রয়েছে যে, এটিকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে সূর্যরশ্মিকে অনুভূমিক (horizontal) রশ্মিতে পরিণত করা যায়।

সৌরচুল্লীর প্রধান অংশ সমাহরকটি (concentrator) প্রতিফলক থেকে প্রায় ২৬ ফুট দূরে রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করাই এই সমাহরকের কাজ।

প্রতিফলক ও সমাহরকের মাঝখানে রয়েছে ১৬ ফুট সমচতুষ্কোণ একটি কক্ষ। এখানে পরীক্ষার কাজ চালানো হয়। এই পরীক্ষা-কক্ষটিতে থাকে একটি নিঃস্রাবক-যন্ত্র ও তার পরিচালকেরা। মাটি থেকে ২০ ফুট উঁচুতে ইস্পাতের পায়ার উপর নির্মিত হয়েছে এই পরীক্ষা-কক্ষটি।

সৌরচুল্লীর চতুর্থ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি সাটার। পরীক্ষা-কক্ষ অভিমুখে প্রেরিত

কেন্দ্রীভূত সৌররশ্মিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা হলো এই সাটারের কাজ। এই অভিনব সাটারটি খড়খড়ির পাখির মত ব্যবস্থায় ১৭টি ফলক দিয়ে তৈরী। সাটারের মুখটি পুরাপুরি খুলে দিলে উচ্চ তাপবিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত সৌররশ্মি পরীক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করে। তবে পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজন অনুসারে এই কেন্দ্রীভূত রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময় যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তারই সমতুল্য তাপ সৃষ্টি করে এই সৌরচুল্লী। এই সৌরচুল্লীর সাহায্যে বিবিধ গবেষণার ফলে মানুষের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

বিজ্ঞান সংবাদ

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার

কৃত্রিম উপায়ে হৃৎপিণ্ডের কাজ চালাবার জন্যে প্লাষ্টিকের আধারে রক্ষিত একপ্রকার ছোট বৈদ্যুতিক পাম্প উদ্ভাবিত হয়েছে। স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের ন্যায় পাম্পটি বরাবর কাজ করতে থাকবে। পরীক্ষাগারে প্রাণী-দেহে সাফল্যের সঙ্গে এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ার আমেরিকান সোসাইটি ফর আর্টিফিসিয়্যাল ইনটারন্যাল অর্গ্যান্স-এর এক সভার বিবৃতিতে প্রকাশ যে, তিন পাউণ্ড ওজনের এই অভিনব বৈদ্যুতিক পাম্পটি দেহের মধ্যে স্থায়ী ভাবে সংযোজিত হলে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের মতই এর দ্বারা সব কাজ সম্পন্ন হবে।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির ডাঃ কুসেরো ঐ সভায় বলেন যে, এই যান্ত্রিক পরিকল্পনাটি এখন পর্যন্ত পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে নি। তথাপি স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে ছোট কৃত্রিম পাম্প দেহে স্থায়ীভাবে সংযোজনের দ্বারা রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া অব্যাহত রাখবার এই হলো সর্বপ্রথম সাফল্যজনক প্রচেষ্টা।

পাম্প ও বিদ্যুৎ-চালিত ছোট মোটরটি সর্বসমেত সাত ইঞ্চি লম্বা ও পৌনে তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি প্লাষ্টিকের গোল কৌটার মধ্যে এঁটে শরীরের ভিতরে বসানো থাকে। তা থেকে দুটি তার প্লাষ্টিক নলের মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে এনে দেয়ালের প্লাগে সংযোগ করলে মোটরটি চলতে থাকে।

পরীক্ষাগারে প্রাণী-দেহের হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের অংশটির পরিবর্তে এই বৈদ্যুতিক পাম্প বর্তমানে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণী-দেহে সংযোগের সময় সেটি পেটের মধ্যে রাখা হয়। পেটের মধ্যে সংযোগ করবার কারণ হলো এই যে, এতে ফুস্‌ফুসের কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না। এখন পর্যন্ত প্রাণী-দেহে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে এই বৈদ্যুতিক পাম্প ব্যবহার করে প্রাণীটিকে সাড়ে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির তারতম্য ঘটিয়ে পাম্পের গতি মিনিটে ৪০ থেকে ১৮০ বার করা যেতে পারে। এতে প্রতি মিনিটে ৬০০ থেকে ৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার রক্ত দেহে সঞ্চালিত হতে পারে।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত পাম্পটি হলো বাটির আকারের একটি লুসাইট পাম্প। এর মধ্যস্থিত একটি রবারের পর্দা একটি ষ্টেনলেস ষ্টীলের পাতের সম্মুখে ক্রমাগত সঞ্চালিত হতে থাকে।

ডাঃ কুসেরো বলেন যে, পাম্পটিকে নিখুঁত করবার জন্যে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। রক্তের উপাদানের ভাঙ্গন রোধ করাই হলো প্রধান সমস্যা। যেমন—প্রাণী-দেহে পাম্পটি সংযোজন করবার পর প্লাজমা ও হেমোগ্লোবিনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে।

আকাশে উড্ডীয়মান বিমানের সাহায্যে বাতাস থেকে ইন্ধন সংগ্রহ

সানফ্রানসিস্কোর আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় একপ্রকার অভূতপূর্ব বিমানের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। চালক-বিহীন এই ছোট বিমানকে কোন ইন্ধন বহন করতে হবে না; ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থিত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য থেকে বিমানটি প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহ করে নেবে।

বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, পরিকল্পনাটি কার্যতঃ সফল হলে এর চেয়ে বৃহত্তর বিমান উদ্ভাবন সম্ভব হবে। এই বিমান ক্রমাগত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার সময় বাতাস থেকে ইন্ধন সংগ্রহ করে মজুত করতে থাকবে। তখন মহাশূন্যে পরিক্রমণের উপযোগী কোন যান পৃথিবী থেকে প্রোপেলারের সাহায্যে উঠে উক্ত বিমান থেকে ইন্ধন সরবরাহ নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে।

হাগ্‌স্ এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ কোম্পানীর মিঃ ফারবার প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০ মাইল উচ্চে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন পারমাণবিক অবস্থায় থাকে। তারই সাহায্যে উক্ত বিমান চালানো সম্ভব। সাধারণ গ্যাসীয় অবস্থায় দুটি পরমাণুর দ্বারা গঠিত অক্সিজেন আণবিক অবস্থায় থাকে। রকেটের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, উচ্চাকাশে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন পারমাণবিক অবস্থায় আছে। অক্সিজেনের দুটি পরমাণু মিলিত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠিত হবার সময় প্রচুর পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত হয়ে থাকে। এই শক্তি পরিকল্পিত বিমানের ইন্ধনরূপে কাজ করবে।

অদূর ভবিষ্যতেই এইরূপ বিমান নির্মিত হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। এই বিমান হওয়া চাই অত্যন্ত হাল্কা অথচ আয়তনে বিশাল। কাজেই এটা খুব পাতলা ধাতব পাত থেকে তৈরী করতে হবে। দূর পাল্লার টেলিভিশনের কাজে এটা প্রতিফলকের কাজও করবে।

বৈদ্যুতিক চার্জ-যুক্ত বাতাসের সাহায্যে বেদনা উপশম

আগুনে পুড়ে-যাওয়া রোগীর যন্ত্রণা উপশম করতে হলে অধিক পরিমাণে অবসাদক ওষুধ প্রয়োগের দরকার হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়ার এক হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড এক বিবৃতিতে বলেন যে, ঐ সব ক্ষেত্রে অবসাদক ওষুধের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন বাতাসের দ্বারা যন্ত্রণার উপশম করা সম্ভব হয়েছে।

৭৫টি অল্প-বিস্তর পুড়ে-যাওয়া রোগীর উপর ডাঃ ডেভিড নেগেটিভ আয়নায়িত বাতাস প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছেন। ছোট যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসকে আয়নায়িত করে রোগীর ঘরে সঞ্চালিত করা হয়। বিশ মিনিট করে ঐ বাতাস দিনে দু'বার সঞ্চালিত করলে আর কোনও ওষুধের প্রয়োজন হয় না।

বাতাসের অণুগুলিকে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করে আয়নায়িত বাতাস উৎপন্ন হয়। উক্ত বৈদ্যুতিক বিভবযুক্ত তারের উপর দিয়ে বাতাস সঞ্চালিত করলে বাতাসের অণুগুলি আয়নায়িত হয়ে যায়।

আগুনে পোড়া সব রোগীদের জন্যে বর্তমানে ঐ হাসপাতালে আয়নায়িত বাতাস ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে অ্যাসিড বা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা পুড়ে গেলে এই ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী হয় না।

কোনও একটি রোগীর দেহের প্রায় শতকরা ৫০।৬০ ভাগ পুড়ে যায়। তার বেদনা উপশমের পক্ষে এই ব্যবস্থা এতই চমৎকার ফলপ্রসূ হয়েছে যে, তার জন্যে অন্য কোনও অবসাদক ওষুধ মোটেই দরকার হয় নি। এমন কি, তার ব্যাণ্ডেজ পরিবর্তন করবার সময়েও অন্য কোন যন্ত্রণা-নিবারক ওষুধ ব্যবহার করতে হয় নি। পূর্বপ্রচলিত ব্যবস্থায় এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রচুর পরিমাণে অবসাদক ওষুধের দরকার হয়ে থাকে।

আয়নায়িত বাতাস প্রয়োগে কেমন করে বেদনার উপশম ঘটে, সে রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। এন্‌সেফালোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, অবসাদক ওষুধ ও আয়নায়িত বাতাস—উভয়েরই মস্তিষ্কের উপর প্রভাব একই প্রকার।

ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু লোক আহত হলে সমষ্টিগতভাবে আয়নায়িত বাতাস প্রয়োগে যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হবে।

ভিটামিন-এ প্রয়োগে পায়ের কড়া নিরাময়

সাধারণতঃ জুতার গঠনের ত্রুটির জন্যে পায়ের আঙ্গুল বা গোড়ালিতে কড়া হয়ে থাকে। অনেকের কড়া এমন যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, তারা জুতা পরবার পূর্বেই ভয় পায় এবং সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে, পাছে অসাবধানে কড়ার উপর কোন আঘাত লাগে। কড়ার যন্ত্রণা নিবারণের জন্যে কয়েক রকম ওষুধ এবং চিকিৎসাও প্রচলিত আছে। কিন্তু দেখা গেছে যে, ঐ সব চিকিৎসা কেবল সাময়িক-ভাবে কড়ার যন্ত্রণা লাঘব করে। কাজেই অল্প কয়েক দিন অন্তর ওর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে থাকে। যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেউ কেউ ক্যাম্বিস বা ঐরূপ কোন নরম জুতা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাতেও নিস্তার না পেয়ে কোন কোন লোককে কড়ার উপরের জুতার অংশটি নতুন অবস্থাতেই কেটে বাদ দিয়ে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের ডাঃ বার্ণার্ড ড্রামার প্রকাশ করেছেন যে, যে সব কড়া প্রচলিত কোন ব্যবস্থাতে নিরাময় হয় না, সে সব ক্ষেত্রেও কড়ার তলায় ভিটামিন-এ ইনজেকসন করবার ফলে যন্ত্রণার সম্পূর্ণরূপে উপশম হতে পারে।

এ বিষয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে ২১জন রোগীর পায়ের যন্ত্রণাদায়ক কড়ার চার পাশে ভিটামিন-এ ইনজেকসন করবার ফলে কড়ার যন্ত্রণার সম্পূর্ণরূপে উপশম হতে দেখা যায়। এর আগে তাদের প্রায়ই সিলভার নাইট্রেট, প্রোকেন বা অন্যান্য ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করতে হতো।

ক্রমাগত ঘর্ষণজনিত উত্তেজনার ফলে ত্বকের উপরের অংশের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবার ফলে কড়ার উৎপত্তি হয়। ভিটামিন-এ প্রয়োগে এই বৃদ্ধি কমে যাওয়ার ফলেই কড়া ছোট হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারে মিলিয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে না গেলেও কড়ার যন্ত্রণা ইনজেকসন করা মাত্র উপশম হয়।

নিউ ইয়র্কের ক্যাম্পবেল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে ভিটামিন-এ সমন্বিত কেরামিন নামে একপ্রকার ওষুধ বের করেছেন। প্রাণী-দেহের ত্বকের উপর ভিটামিন-এ-র প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্যে এই ওষুধটি ব্যবহৃত হয়েছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ডাঃ জুয়েল খরগোসের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভিটামিন ইনজেকসনের ফলে ত্বকের কোষগুলির মৃত্যু পিছিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় কোষগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের স্তরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং উপরের স্তরে পৌঁছে সেগুলি জীবনহীন হয়ে খরখরে অবস্থায় পরিণত হয়। ভিটামিন প্রয়োগের ফলে কোষ-গুলি তন্তুর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ত্বকটি স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে প্রায় চার-পাঁচ গুণ মোটা হয়ে যায়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

নভোচারী রকেটের চন্দ্রের রহস্যোদ্ঘাটন

বি. কুকারকিন

চন্দ্রাভিমুখী মহাশূন্যচারী সোভিয়েট রকেটের সফল অভিযান সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। অবশেষে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার (১ কিঃ মিঃ—⅝ মাইল), অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক গতিবেগ লাভ করা সম্ভব হলো। সকলেরই জানা আছে যে, প্রাথমিক মহাজাগতিক গতিবেগ (অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার) পৃথিবীর মহাকর্ষসৃষ্ট ত্বরণের সঙ্গে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ-সঞ্জাত ত্বরণের একটা সমতা রক্ষিত হয়ে থাকে। তত্ত্বগতভাবে তাই একটি বস্তুর অনন্তকাল ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাবারই কথা; কিন্তু কার্যতঃ আবহমণ্ডলের সামান্যতম বাধাই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে স্বল্পায়ু করে ফেলে।

বেগ যত বাড়ে, উপগ্রহগুলির উপবৃত্তাকার কক্ষপথও ততই দীর্ঘতর হতে থাকে। তারপর সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগ লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূন্যচারী রকেট পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং যদি কোন প্রকারে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে চিরতরে পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে যায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, আন্তগ্র্হ পরিক্রমার জন্যে সেকেণ্ডে অন্যূন ১১·২ কিলোমিটার বা তদপেক্ষা অধিক বেগ প্রয়োজন। ঘটনাক্রমে গত ২রা জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্যচারী রকেট সর্বপ্রথম এই আন্তগ্র্হ মহাকাশে প্রবেশ করতে পেরেছে।

চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং মহাকাশে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবীর চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষে সে নিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে নিকটতম ব্যবধান হচ্ছে ৩,৬৩,৩০০ কিলোমিটার, আর দীর্ঘতম ব্যবধান হলো ৪,০৫,৫০০ কিলোমিটার। চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৩ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী এবং ভর হলো পৃথিবীর $\frac{1}{81}$ ভাগ মাত্র। ২৯·৫৩ দিনে নিজের অক্ষের উপরে চাঁদ একবার আবর্তন করে। এই আবর্তন-কাল পৃথিবীর চারদিকে তার প্রতীয়মান প্রদক্ষিণকালের সমান। এই কারণেই চিরদিন চাঁদ পৃথিবীর দিকে তার এক পিঠ ফিরিয়েই থাকে; যদিও ঈষৎ হেলে থাকবার জন্যে আমাদের পক্ষে তার পৃষ্ঠদেশের শতকরা ৫৯ ভাগ দেখা সম্ভব হয়ে থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে চাঁদে কোন আবহমণ্ডল নেই। এর শৈলমালার তাপ-পরিবাহী ক্ষমতাও এত নগণ্য যে, প্রতিফলিত সূর্য-কিরণে সহজেই তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শীতলও হয় ঠিক একই মাত্রায়। এখানকার দৈনিক তাপ ওঠা-নামা করে ২৭০° থেকে ২৯০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। এর পৃষ্ঠদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সমতলভূমি, অসংখ্য পর্বতমালা, সুউচ্চ শৈলশীর্ষ এবং বহু বৃত্তাকার গহ্বর। গহ্বরগুলির কোন-কোনটা এমনই বিশাল যে, ২৩৫ কিলোমিটার ব্যাস পরিমিতও হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এগুলির উদ্ভব হয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। অন্ততঃ পুকোভা মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ এন. এ. কাজিরেফের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে এ-কথাই মনে হয় যে, চাঁদে আগ্নেয়-প্রক্রিয়া আজও চলছে। চাঁদের গড়পড়তা ঘনত্ব হলো প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৩·৩৪ গ্র্যাম।

চাঁদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করে চলেছেন এবং তাঁদের সংগৃহীত তথ্যগুলি খুবই মূল্যবান। এতদিন পর্যন্ত আমরা একটি মাত্র গ্রহ, অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কেই অবহিত ছিলাম। আজ প্রথম সোভিয়েট আন্তগ্র্হ রকেট আমাদের অনেক

কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে; যেমন—চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তেজস্ক্রিয়তার প্রকৃতি কিরূপ? এসব প্রশ্নের সদুত্তর পেলে গ্রহগুলির প্রকৃতি, উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিও যথেষ্ট প্রসারিত হবে।

চাঁদের পৃষ্ঠদেশের গঠন সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর সঠিক জবাব আজও পাওয়া যায় নি। সংগৃহীত তথ্যসমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছানোর যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, এর পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার চূর্ণীকৃত সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আচ্ছাদিত। বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র-পৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মহাশূন্যচারী রকেটের চাঁদের দিকে এই প্রথম উড্ডয়নই ভবিষ্যৎ মহাজাগতিক পর্যটনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বহু সংখ্যক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সহায়তা করবে এবং গ্রহগুলির বিকাশ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথও সুগম হবে।

চাঁদের মহাকর্ষ-শক্তি পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। ফলতঃ চাঁদ থেকে অন্য কোন গ্রহে যেতে হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক বেগ হবে সেকেণ্ডে ২.৪ কিলোমিটারের কিছু কম। কে. ই. ৎসিওখকোভ্স্কি বলেছিলেন যে, একদিন চাঁদ হবে ভবিষ্যৎ আন্তগ্র্হ পরিক্রমার পা-দানী স্বরূপ। একথা খুবই সত্য যে, চাঁদ থেকে যাত্রা করতে হলে ঘননিবিড় কোন আবহমণ্ডল পাড়ি দিতে হবে না, অথবা সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার বেগ সঞ্চয়ের প্রয়োজনও হবে না। পর্যায়ক্রমিক রকেটের পরবর্তী ধাপগুলিতে ত্বরণ সৃষ্টিতে যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানীর দরকার তা তখন বেঁচে যাবে, সারা পথে গতিনিয়ন্ত্রণ ও উড্ডয়নের আড়াআড়ি ভাব বজায় রাখতে।

মহাশূন্যচারী রকেটের চাঁদে পৌছানোর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সাধারণভাবে সবারই একটা কৌতূহল রয়েছে। পৌছানো সম্ভব বটে, কিন্তু চাঁদকে তাক্ করে প্রথম যে সোভিয়েট রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তার লক্ষ্য মোটেই তা ছিল না।

প্রথম সোভিয়েট মহাকাশ-যান চাঁদকে বহু সহস্র কিলোমিটার ব্যবধানে রেখে পাড়ি জমিয়েছে এবং অবশেষে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের সৌর-জগতের মানুষের হাতে-গড়া প্রথম গ্রহে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর সঙ্গে এর পুনর্মিলন—এমন কি, প্রথমে যে স্থান থেকে সে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল তারই নিকটবর্তী কোন বিন্দুকে অতিক্রম করবার সম্ভাবনাও একেবারে বাতিল করা যায় না। কেবলমাত্র সূর্যের অভিকর্ষ-শক্তির দ্বারাই যদি এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে মহাকাশের যে বিন্দুতে প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল, ঠিক সেখানেই সে ফিরে আসতে পারতো। কিন্তু যেহেতু সৌর জগতের অন্যান্য বস্তুসমূহের দ্বারাও এর গতিবিধি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, সেহেতু তার কাছাকাছি জায়গাতেই কেবল ফিরে আসবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই কারণেই পৃথিবীতে রকেটটির ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে পৃথিবীর কাছ দিয়ে যেতে পারে এবং তখনই একে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আমরা স্থিরনিশ্চিত যে, আগামী কয়েক বছরে আন্তগ্র্হ অভিযানে এবং পরে আন্তর্নক্ষত্র বিষয়ক গবেষণায় অনেক কিছু নতুন সাফল্য লাভ হবে এবং নিঃসন্দেহে চাঁদ হবে প্রত্যক্ষ-দর্শনজাত অভিযানে প্রথম অবলম্বন। আমাদের সৌরজগতের একটি স্বাধীন উপগ্রহ হিসাবে চন্দ্র থেকে এই অভিযান গ্রহ-উপগ্রহের গঠন ও বিকাশ-সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহ অনুধাবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং অন্যান্য গ্রহ-পরিক্রমার দুরূহ অভিযানে এ হবে শিক্ষণালয় স্বরূপ। ইউক্রেনীয় সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞান মান-মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ আচার্য এ. এ. ইয়াকভ্কিন্ একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব হলো, চাঁদের একটি উপগ্রহ তৈরী করা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর জন্যে সেকেণ্ডে ১ থেকে ২ কিলোমিটারের বেশী বেগের প্রয়োজন হবে না। অথচ এর অবস্থানের দ্বারা চাঁদের ভর সম্পর্কে নিখুঁততম তথ্যাদি পাওয়া যাবে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যাবে। উপরন্তু, পর্যাপ্ত পরিমাণ উজ্জ্বল হলে চাঁদের চেয়ে অনেক সহজেই এর অবস্থান পরিদৃষ্ট হবে।

আন্তগ্র্হ মহাশূন্য অভিযানে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যে আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহই নেই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

মস্কোর শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রকেটের অগ্রভাগ। এই রকেটটি ৪৫০ কিলোমিটার উচ্চে উঠাইয়া নামাইয়া আনা হয়।

চাঁদের দেশের নতুন খবর

"এক যে ছিল চাঁদের দেশে চরকাকাটা বুড়ি, পুরাণে তার বয়স লেখে একশ' হাজার কুড়ি।" লাখ লাখ বছর ধরে সেই বুড়ি চরকা কাটছিল, আর মাঝে মাঝে পেঁজা তুলা আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মেঘের সৃষ্টি করছিল। পৃথিবীর মানুষ দূর থেকে তার রূপ দেখে খুসী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পর তার ভিতর দিয়ে চাঁদকে দেখে বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, বুড়িটা নেহাৎই বুড়ি, একেবারে মরে কাঠ। বৈজ্ঞানিকেরা নাছোড়বান্দা, তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কিছু বের করলো—চাঁদটা আছে আমাদের কাছ থেকে দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। তার মধ্যে নিজস্ব উত্তাপ বলতে কিছু নেই। চাঁদে না আছে জল, না আছে বায়ু, না আছে কোন জীবন্ত প্রাণী—আছে শুধু ধু ধু মরু প্রান্তর, মস্ত মস্ত গহ্বর, আর আছে বিরাট সব আগ্নেয় পর্বত; তারা তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগ্নেয় গহ্বর নিয়ে হাঁ করে আছে। এমন সব মজার মজার হাজারো রকম খবর তোমরা বিজ্ঞানের বইতে পড়ে থাকবে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে বৈজ্ঞানিকদের মাথায় আর এক খেয়াল চাপলো। তাঁরা বললেন, এতদূর থেকে কি ভাল দেখা যায়? আমরা চাঁদে যাব, চাঁদ গিয়ে চোখের উপর সব কিছু জলজ্যান্ত দেখে আসবো। সবাই ভাবলো, বৈজ্ঞানিকদের "চাঁদে পেয়েছে"! আমাদের বিশু পাগলা যেমন মাঝে মাঝে হাওড়া ব্রিজের চূড়ায় চেপে বলে, 'চাঁদে যাব'। বৈজ্ঞানিকেরা কিছু না বলে ভিতরে ভিতরে তোড়জোড় করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সারা জগৎ স্তম্ভিত হয়ে শুনলো, রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা 'স্পুটনিক' পাঠিয়েছে আকাশে। সেটা নাকি আমাদের চাঁদের মত পৃথিবীর চারদিকে বন্ বন্ করে ঘুরছে। এরপর তারা পাঠালো আরো দুটা। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাও কম যান না; তাঁরাও পাঠালেন দুটা। এখন চলেছে এসব নকল গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পালা। এরা হচ্ছে মানুষের আকাশ-বিজয়ের অগ্রদূত।

মানুষ অবশ্য এখনও চাঁদে গিয়ে পৌঁছাতে পারে নি; কিন্তু তার সেখানে পৌঁছাতেও বোধ হয় বেশী দেরী হবে না। ইতিমধ্যে এই অগ্রদূত উপগ্রহেরা চাঁদের দেশে যে সব মজাদার নতুন খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই এখন বলছি। অবশ্য এদের অনেকগুলি খবরই বৈজ্ঞানিকেরা ঘরে বসে বড় বড় টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে এবং নানারূপ জটিল পরীক্ষার সাহায্যে জানতে পেরেছেন।

চাঁদের উপর নামতে হলে মানুষকে অনেকগুলি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যেমন ধর, মাধ্যাকর্ষণ—চাঁদের টানটা পৃথিবীর টানের মাত্র $\frac{1}{6}$ অংশ। ধর, তোমার ওজন এখানে ৩৬ সের, চাঁদে গিয়ে হবে মাত্র ৬ সের। ভারি মজা! লাফালাফি,

দৌড়-ঝাঁপ করাটা ভারী সহজ হবে। তা ছাড়া চাঁদ ছাড়িয়ে যদি অন্য কোন গ্রহে যেতে হয়, তবে চাঁদটাই সবচেয়ে ভাল ঘাঁটি হবে। কারণ মাধ্যাকর্ষণটা যত কম হয়, ততই বেরিয়ে যাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যেতে হলে আকাশ-যাত্রীকে অন্ততঃপক্ষে সেকেণ্ডে প্রায় ৭ মাইল বেগে চলতে হবে; কিন্তু চাঁদের টান ছাড়াতে সেকেণ্ডে ১½ মাইল বেগই যথেষ্ট।

চাঁদের উপর ওই যে ছোট-বড় কালো কালো দাগগুলি, যারা চিরকাল চাঁদকে কলঙ্কিত করে রেখেছে, সেগুলি হলো আসলে বড় বড় গর্ত। ঝক্ঝকে বিন্দুগুলি হলো পাহাড়-পর্বতের চূড়া। চাঁদের উপরে আছে বহু আগ্নেয় পর্বত। সেগুলি কোথাও দীর্ঘ শ্রেণীতে, কোথাও বা চক্রাকারে ঘিরে আছে। এদের আগ্নেয় গহ্বরগুলিও কালো দাগের মত দেখায়।

আমেরিকার জ্যোতির্বিদেরা চাঁদের যেসব ফটোগ্রাফ তুলেছেন, তাথেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এখনও চাঁদের উপর কয়েকটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে এবং সেগুলি থেকে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। চাঁদের মাটিটা কেমন? বিভিন্ন তিথিতে চাঁদের উপর আলোর প্রতিফলন পরীক্ষা করে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, চাঁদের মাটিটা খুবই বন্ধুর এবং একেবারে ঝাঁঝরা, ঠিক স্পঞ্জের মত। এই মাটিটা গঠিত হয়েছে আগ্নেয় লাভা, গাদ (slag) আর ছাই দিয়ে। চাঁদের উপর যে জায়গাগুলি সমতল দেখায়, সেগুলিও পৃথিবীর সমতল জায়গার মত নয় মোটেই, খুব বেশী উঁচু-নীচু।

চাঁদের চারদিকে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল নেই। এর ফলে সেখানে এমন কয়েকটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়, পৃথিবীতে বসে যা কল্পনাও করা যায় না। প্রথমে ধর, আমরা যে কথাবার্তা বলি, নানা রকমের শব্দ শুনি, সেটা বয়ে নিয়ে যায় কে? বাতাস। চাঁদে বাতাস নেই, তাই শব্দও নেই—একেবারে নীরব নিথর। তুমি সপ্তম স্বরে গান ধরলেও ছ'হাত দূরে তোমার বন্ধু তা শুনতে পাবে না। চাঁদের যাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলবে কেমন করে? রেডিও যন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই।

পৃথিবীতে গোধূলি ও ঊষা বলে যে দুটা ব্যাপার আছে, সেটা বায়ুমণ্ডলের জন্যেই সম্ভব হয়। সূর্য দিগন্তের নীচে থাকলেও তার আলো উপরের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণায় প্রতিফলিত হয়ে কিছুটা পৃথিবীতে পৌঁছায়; কিন্তু চাঁদে সেটি হবার উপায় নেই। সূর্য অস্ত গেলেই একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদে যা কিছু ছায়া পড়ে সব একবারে গভীর কালো। সেখানে আব্‌ছা আলো-আঁধারের লুকোচুরি নেই। একটা পাহাড়ের ছায়ায় যদি তুমি দাঁড়িয়ে থাক, ছায়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তোমাকে আর দেখাই যাবে না।

চাঁদের আকাশে ধূলিকণাও নেই, জলীয় বাষ্পও নেই; তাই সেখানে মেঘ জমে না। আকাশটাকে দেখায় গভীর কালো। আমাদের আকাশের এমন চমৎকার ঝল্‌মলে

নীল চাঁদোয়াটা সেখানে দেখা যাবে না। সেখানে সূর্যের আলো ঠিক 'জ্বলন্ত তরবারি'র মত গায়ে বিঁধবে। আর সূর্যের দিকে তাকালেই বাস্—একেবারে অন্ধ। চাঁদের যে পিঠটায় সূর্যের আলো পড়ে, সেটা হয়ে ওঠে ভয়ানক উত্তপ্ত। জল সেখানে আপনিই ফুটবে, আগুন জ্বালাতে হবে না, রান্নাবান্না করবার খুবই সুবিধা! সৌরচুল্লী, সৌর-ব্যাটারী ইত্যাদি জিনিষগুলি সেখানে প্রায় বিনা খরচায় চলবে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন খুবই সহজসাধ্য হবে। কিন্তু যেই সূর্য অস্ত যাবে, অমনি চট্‌পট্ কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উত্তাপ নেমে যাবে বরফ-জমবার অনেক ডিগ্রি নীচে। তখন কিন্তু ভারী অসুবিধা। চাঁদে আবার দিনে একবার করে দিন আর রাত্রি হয় না। সূর্য উঠলো তো অস্ত যাবার নাম নেই; একটানা প্রায় ১৫ দিন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে। আবার অস্ত গেলেও ১৫ দিনের মধ্যে আর তার টিকি দেখা যাবে না। অবশ্য এটা আমাদের দিনের হিসাব। চাঁদের একটা পূরা দিন আমাদের হিসাবে প্রায় ২৯½ দিন।

চাঁদ থেকে সূর্যের বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল বেশ স্পষ্ট দেখা যাবে, পৃথিবীর মত সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণের জন্যে ঘাঁটি করে টেলিস্কোপ নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। তারাগুলি সেখানে মিট্‌মিট্ করবে না, পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করবে। পৃথিবীকে দেখাবে একটা নীলাভ গোলকের মত—আমরা চাঁদকে যত বড় দেখি তার চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বড়। খালি চোখে পৃথিবীকে লাট্টুর মত পাক খেতে দেখা যাবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রমাণ করবার জন্যে সেখানে রাশি রাশি পরোক্ষ প্রমাণ যোগাড় করে ভূগোলের পাতা ভরাতে হবে না।

চাঁদের দেশে যে সব উল্কাপাত হয়, তারা আমাদের পৃথিবীর মত হাউই বাজীর সৃষ্টি করে না, একেবারে বোমার মত প্রচণ্ড বেগে এসে মাটি, পাহাড়-পর্বত ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়।

আগেই বলেছি, চাঁদে কোন প্রকার জীবনের লক্ষণ নেই; তবে খুব নিম্নস্তরের জীবাণুর মত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ থাকলেও থাকতে পারে। মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের কীট-পতঙ্গের মত কোন প্রাণীও চাঁদে থাকতে পারে না। চাঁদের একটা পিঠই আমরা বরাবর দেখে আসছি; অন্য পিঠটায় যে কি আছে, তা আর চাঁদে না গেলে জানবার উপায় নেই।

চাঁদের যাত্রীদের আমাদের মত খালি গায়ে বা জামা-কাপড় পরে হেঁটে বেড়াবার উপায় নেই। তাদের পরতে হবে আপাদমস্তক-ঢাকা বিশেষ ধরণের পোষাক। তার মধ্যে রাখতে হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, পৃথিবী থেকে নিয়ে-যাওয়া বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, রেডিও-যন্ত্রের ব্যবস্থা, অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা। তাছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হবে, তাকে আবার অক্সিজেনে ফিরিয়ে আনবার

ব্যবস্থা রাখতে হবে, যে কাজটা পৃথিবীতে গাছপালা করে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে। খুব তাড়াতাড়ি কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অক্সিজেনে পরিণত করতে পারে, এমন একটা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

তোমরা ভাবছ, এমন পোড়া চাঁদে গিয়ে কি লাভ? বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিটা চিরদিনই বেয়াড়া। তাঁরা চিরকাল অজানাকে জানবার জন্যে মরণপণ করে এসেছে। তোমরা এখন তাঁদের চাঁদে যাবার দিন গুণতে থাক।

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা

অণু পরমাণু

দুই প্রকার পদার্থের সমন্বয়ে পৃথিবী গঠিত—মৌলিক ও যৌগিক। মৌলিক পদার্থকে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একের অধিক বিভিন্ন পদার্থে ভাগ করা যায় না। কিন্তু যৌগিক পদার্থকে রাসায়নিক উপায়ে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে ভাগ করা যায়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হলো মৌলিক পদার্থ; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এদের আর ভিন্ন প্রকার কোন পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। কিন্তু জল হলো যৌগিক পদার্থ; কারণ জলকে বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করা যায়।

রসায়নবিদ্ অন্ততঃ ছিয়ানব্বইটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে দশটি বায়বীয়, দুটি তরল (পারা ও ব্রোমিন) এবং আর সবগুলি কঠিন। দুই কিংবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগেই নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যৌগিক পদার্থের গুণাবলী তার অংশীভূত মৌলিক পদার্থসমূহের গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যেমন—স্বাভাবিক অবস্থায় জল তরল; কিন্তু এর উপাদান দুটি—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়বীয়। হাইড্রোজেন কিংবা অক্সিজেনের গুণাবলী এবং জলের গুণাবলীর তফাৎ অনেক। সাতটি স্বরগ্রামের সাহায্যে যেমন বিচিত্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়, তেমনি এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবী যে অসংখ্য যৌগিক পদার্থ দিয়ে গঠিত, তাদের মূলে রয়েছে এই ছিয়ানব্বইটি মৌলিক পদার্থ।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের দুটি কিংবা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি অণু। যেমন, দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু সংযোগ করলে হয় একটি জলের অণু। কাজেই যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো অণু; অর্থাৎ যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণুকে ভাগ করলে বিভিন্ন গুণাবলীর মৌলিক পদার্থের দুই বা ততোধিক পরমাণু উৎপন্ন হবে। যেমন—একটি জলের অণুকে ভাগ করলে

আর জলের গুণ থাকবে না ; পরন্তু ভিন্ন গুণসম্পন্ন তুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন হবে। সবচেয়ে সরল অণুতে থাকে মাত্র তুটি পরমাণু। যেমন—একটি কার্বন মনক্সাইডের অণুতে থাকে মাত্র একটি কার্বন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু। আবার প্রোটিন, সেলুলোজ কিংবা রবারের ন্যায় বড় বড় জটিল অণুতে থাকে শত শত পরমাণু। সবচেয়ে বড় অণু এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট হবে। অণুর আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন—এক ফোঁটা জলকে ফুলিয়ে পৃথিবীর আয়তনের সমান করলে সেই ফোঁটার ভিতরে যতগুলি জলের অণু থাকবে তারা এক একটি ক্রিকেট বলের চেয়ে বড় হবে না।

একটি অণুর অংশ হলো পরমাণু। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে পরমাণু। আমরা বলি—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা কিংবা রূপার পরমাণু। কিন্তু আমরা জলের পরমাণু বলি না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, একটি জলের অণু গঠিত হয় তিনটি পরমাণুর সমন্বয়ে, যাদের গুণের সঙ্গে জলের গুণের সামঞ্জস্য নেই। যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বোঝাতে 'অণু' এবং মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নির্দেশ করতে 'পরমাণু' কথা তুটি ব্যবহার করা হয়।

অণুর ভিতরে পরমাণুগুলি একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত হয় ; অর্থাৎ যখন একটি মৌলিক পদার্থ আর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, তখন একটি মৌলিক পদার্থের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে মিলনের ফলেই এই সংযোগ সম্ভব হয়। যেমন—তুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যখনই একটি অক্সিজেন পরমাণুর মিলন হবে, তখনই জল উৎপন্ন হবে। কিন্তু তুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগ হলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড পাওয়া যাবে। জলের গুণের সঙ্গে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের গুণের অনেক প্রভেদ, যদিও যৌগিক পদার্থ তুটি অনুরূপ তুটি মৌলিক পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

জল

জল যে কি অদ্ভুত জিনিষ তা খুব কম লোকেই উপলব্ধি করতে পারে। অতি সাধারণ জিনিষ বলেই এর অসাধারণত্ব আর অনুভব করা যায় না। জল না হলে কোন প্রাণীই বাঁচতো না। মানুষের শরীরের একশ' ভাগের সত্তর ভাগই জল। প্রতিদিন আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে অনেক জল থাকে। এক সপ্তাহ স্নান না করলে শরীর ময়লা হয়ে যাবে এবং চর্মরোগ হবে। বাড়ীঘর ধোলাই করতে না পারলে অপরিষ্কার হয়ে তুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হবে। যদি একটি বড় সহরের জল সরবরাহ এক মাসের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নানাপ্রকার ব্যাধিতে লোকজন মারা পড়বে। বৃষ্টির জল না পেলে ফলমূল, শাকসব্জী, খাদ্যশস্য প্রভৃতি

কিছুই উৎপন্ন হবে না। গৃহপালিত পশুও খাবার জন্যে ঘাস পাবে না। এভাবে খাদ্যের অভাব হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অতি সাধারণ ও সুলভ পদার্থ—জল, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দরকারী জিনিষ।

বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব এক ধরে, অন্যান্য জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। জলের রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নেই। পৃথিবীর যাবতীয় যৌগিক পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ও সবচেয়ে সরল হলো জলের অণু। দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় একটি জলের অণু। এর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, একে তরল অবস্থা থেকে জমিয়ে বরফ করলে আয়তনে বেড়ে যায়। একে স্বাভাবিকভাবেই কঠিন (বরফ), তরল (জল) ও বায়বীয় (বাষ্প)—এই তিন অবস্থাতেই দেখা যায়। জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয়, যখন এর উষ্ণতা হয় ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, হিমাঙ্কের চার ডিগ্রী উপরে। চার ডিগ্রী উষ্ণ জল গরম কিংবা ঠাণ্ডা করলে ঘনত্ব কমে যাবে। ঠাণ্ডা জলের ঘনত্ব গরম জলের চেয়ে বেশী। বরফের ঘনত্ব ঠাণ্ডা জলের চেয়ে কম এবং এই কারণেই বরফ জলে ভাসে। জল জমে বরফ হলে আয়তন এত বেড়ে যায় যে, একটি বদ্ধমুখ পাইপ ভর্তি জল জমে বরফ হলে পাইপটি ফেটে যাবে।

শীতপ্রধান দেশে হ্রদের জল এভাবেই জমে বরফ হয়—গরম জল ঠাণ্ডা জলের চেয়ে হাল্‌কা হওয়াতে হ্রদের উপরিভাগে ভেসে ওঠে এবং ঠাণ্ডা জল নীচে চলে যায়। যদি বায়ুর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা আরও কম হয়, তাহলে উপরের জল ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমে চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়। এই উষ্ণতায় জল সবচেয়ে ঘন বলে হ্রদের তলায় চলে যায়। অধিকতর গরম জল উপরে ভেসে ওঠে এবং ঠাণ্ডা হতে থাকে, যতক্ষণ উষ্ণতা চার ডিগ্রী না হয়। এভাবে প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না সবটা হ্রদের জলের তাপমাত্রা হয় চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তারপর জল উপর থেকে জমে বরফ হতে থাকে।

জলের হিমাঙ্ক হলো শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা বত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং স্ফুটনাঙ্ক হলো একশ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা দু-শ' বারো ডিগ্রী ফারেনহাইট। বরফের ঘনত্ব হলো জলের ঘনত্বের দশ ভাগের নয় ভাগ। এজন্যে ভাসমান তুষার-পর্বতের দশ ভাগের একভাগ মাত্র জলের উপরে ভাসতে দেখা যায়।

গ্লাসের জলে এক টুক্‌রা বরফ দিলে, বরফ গলবার সময় জল থেকে তাপ শোষণ করে নেয়; সেজন্যে গ্লাসের জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জলের তাপমাত্রা একশ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা দু-শ' বারো ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে ওঠে না। তাপমাত্রা তার বেশী হলেই জল বাষ্প হতে থাকে।

পশু-পক্ষীর শরীরের চার ভাগের তিন ভাগ, অনেক উদ্ভিদের দশ ভাগের নয় ভাগ এবং ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগই জল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

জানবার কথা

১। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আদি বাসস্থান কোথায়—তা এতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। এখন তাঁরা আশা করেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের রক্তের শ্রেণী (blood grouping) পরীক্ষা করে এদের আদিম বাসস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন

১নং চিত্র

যে, পূর্বে এরা এশিয়ার কোন দ্বীপপুঞ্জে বাস করতো—আবার কারো কারো মতে, দক্ষিণ আমেরিকা এদের আদিম বাসস্থান। নৌ-চালনার দক্ষতায় এরা যে পৃথিবীর সুদক্ষ নাবিকদের সমকক্ষ—সে বিষয়ে সকলেই একমত।

২নং চিত্র

২। আমরা যে সব মাছ দেখি—তাদের প্রত্যেকেরই দুটি করে চোখ থাকে

কিন্তু এমন মাছের কথা শুনেছ কি, যাদের চারটি করে চোখ থাকে? এই চার চক্ষুবিশিষ্ট মাছ মধ্য-আমেরিকার নদীগুলিতে দেখা যায়। এদের নাম হচ্ছে অ্যানাব্লেপ্‌স্। এরা সাঁতার কাটবার সময় এক জোড়া চোখ সর্বদাই খাদ্যের সন্ধানে জলের নীচের দিকে সতর্কভাবে নিবদ্ধ রাখে এবং অপর জোড়া চোখের সাহায্যে জলের উপরিভাগের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। ফলে এরা একই সঙ্গে শিকার এবং শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে।

৩। জেব্রার গায়ে যে ডোরাকাটা দাগ আছে তা যারা চিড়িয়াখানায় গিয়েছ, তারা সবাই দেখে থাকবে। অনেকেরই ধারণা—সব জেব্রার গায়ের ডোরাকাটা দাগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেকটি জেব্রার গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে, অর্থাৎ ডোরাকাটা দাগগুলি

৩নং চিত্র

প্রত্যেকের গায়ে একভাবে সজ্জিত থাকে না। বিভিন্ন গোত্রের জেব্রাদের মধ্যে তো বটেই—এমন কি, একই গোত্রের জেব্রাদের মধ্যেও ডোরাকাটা দাগগুলির বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, জেব্রারা কালো ডোরাবিশিষ্ট সাদা রঙের প্রাণী।
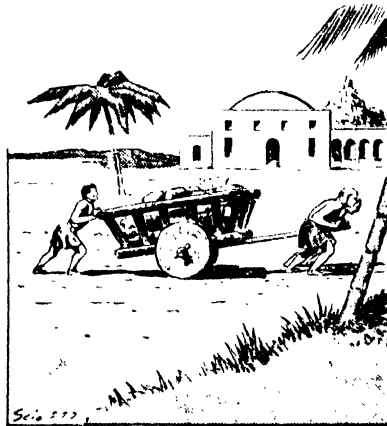
৪নং চিত্র

৪। মানুষ এ-যাবৎ বহু সূক্ষ্ম এবং জটিল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্-

দের মতে, মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির মধ্যে গাড়ীর চাকাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক আবিষ্কার। তাঁদের মতে, প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে গাড়ীর চাকা উদ্ভাবিত হয়েছে।

৫। ইস্পাতকে পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি বলা যেতে পারে। আধুনিক ভারী শিল্পের মূল উপাদান হচ্ছে ইস্পাত। ইস্পাত ধ্বংস ও গঠনমূলক—এই উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে—একটি আধুনিক ভারী যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক নির্মাণ

৫নং চিত্র

করতে যে পরিমাণ ইস্পাতের প্রয়োজন হয়—তার দ্বারা ৬০০০ লাঙ্গল অথবা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত আধুনিক ১০০টি ট্র্যাক্টর তৈরী করা যেতে পারে।
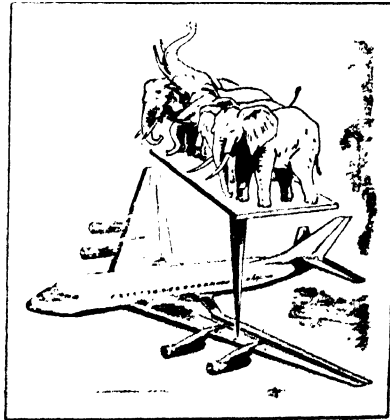
৬নং চিত্র

৬। বর্তমানে যে সব দ্রুত-গতিবিশিষ্ট যাত্রীবাহী বিমান নির্মিত হচ্ছে—তাদের

ডানার প্রতি বর্গইঞ্চি স্থান ১৮ টন চাপ সহ্য করতে পারে। চারটি হাতী চাপালে যে ওজন হয়, বিমানের ডানার পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গইঞ্চিতে এই চাপ তার সমতুল্য।

৭। বিশেষজ্ঞদের মতে—একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ লোকের স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে হলে প্রায় তিন একর চাষযোগ্য জমির প্রয়োজন। কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বর্তমানে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে এক একর।

৭নং চিত্র

তাছাড়া পৃথিবীর জমির ১/১০ ভাগ মাত্র এখন চাষ-আবাদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কারণে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পতিত জমিকে চাষযোগ্য করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যাপকভাবে চেষ্টা হচ্ছে।
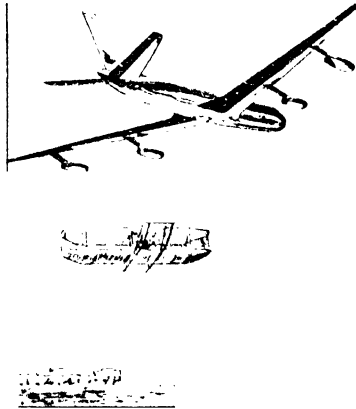
৮নং চিত্র

৮। আকাশে ওড়বার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে ১৯০৩ সালে। সেই বছর রাইট ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক

উদ্ভাবিত বিমান ১২০ ফুট উঁচুতে উঠেছিল। তার পর থেকে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন— বিমানের গতিবেগ আরও বাড়াবার জন্যে। তাঁদের বহুদিনের চেষ্টায় বর্তমানের দ্রুতগামী বিমান নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে কোন কোন বিমান না থেমে একটানা ১০,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিকের প্রায় অর্ধেক পথ উড়ে যেতে সক্ষম।

৯। বিজ্ঞানীরা চাঁদের আলোর ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ স্থির করেছেন। তাঁদের

৯নং চিত্র

মতে, একগজ দূর থেকে একটি সাধারণ মোমবাতির আলো যতটা উজ্জ্বল দেখায়- পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বল্য তার ১/৪ ভাগ মাত্র।

১০নং চিত্র

১০। জীবনধারণের জন্যে আমাদের শরীরে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, একথা

আমরা সবাই জানি। বিজ্ঞানীরা বলেন—বেঁচে থাকবার জন্যে কমপক্ষে আমাদের দৈনিক ৭০০ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন। তাঁরা আরও বলেছেন যে, এই পরিমাণ ক্যালরি গড়ে তিন কাপ ভাত থেকে পাওয়া যায়। একজন লোক ৩০ থেকে ৪০ দিন কোন খাদ্য না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে; কিন্তু জলপান না করে ৩ থেকে ৫ দিনের বেশী থাকতে পারে না।

১১। পৃথিবীব্যাপী পরীক্ষা চালিয়ে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, বর্তমানে মানুষের প্রত্যাশিত জীবনের সীমা হচ্ছে ৫২ বছর। গড়ে তাদের ওজন ও উচ্চতা হচ্ছে, যথাক্রমে
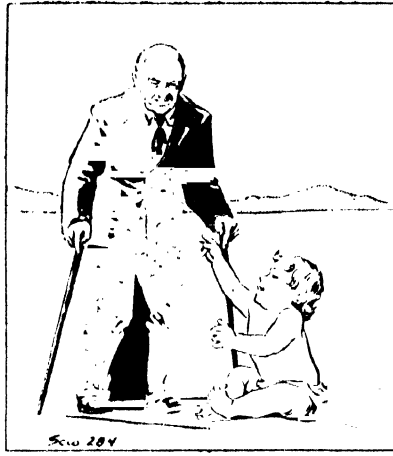
১১নং চিত্র

১৩১ পাউণ্ড এবং ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। অবশ্য মেয়েদের উচ্চতা সামান্য কিছু কম। গায়ের রং ও অন্যান্য বাহ্যিক পার্থক্য বাদ দিলে—পৃথিবীর সব মানুষই শারীরিক দিক থেকে সমান।

বিবিধ

রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী

রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে স্বাধীন দুনিয়ায় পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পদ্রব্যাদির উৎপাদন দেড়গুণ এবং কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়াছে।

ইহাতে দেখা যায়, ১৯৫০ সাল হইতে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা ১'৬ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ে শিশু-মৃত্যুর হারও খুবই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ২২৪ কোটি ৬০ লক্ষ। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫০ সালে ২৪৯ কোটি ৩০ লক্ষে এবং ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২৭৯ কোটি ৫০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই, যেমন—পূর্ব জার্মেনী, পূর্ব বার্লিন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত হারে মহাদেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—এশিয়া ও আফ্রিকায় শতকরা ১'৭ জন, ইউরোপে শতকরা ০'৭ জন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শতকরা ২'১ জন এবং অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ২'২ জন।

ধাতব লবণের সাহায্যে উদ্ভিদের রোগ নিরাময়

ওয়ারউইকশায়ারের জাতীয় উদ্ভিদ গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ ধাতব লবণের সাহায্যে উদ্ভিদের নানাবিধ রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করিতেছেন এবং উক্ত চেষ্টায় তাঁহারা যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, মালয়ে যে সকল রবার গাছে গুরুতরভাবে ছাতা ধরিয়াছিল, সেগুলিকে জিঙ্ক সলিউশন শোষণ করিতে দিয়া তাহাদের উক্ত রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব হয়। বৃটেনের অন্তর্গত ডরসেট ও লিঙ্কনশায়ারে ওয়াটারক্রেশ নামক একজাতীয় জলজ উদ্ভিদের একপ্রকার গুরুতর রোগ সারাইবার জন্য জলের মধ্যে জিঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করা গিয়াছে এবং জলে জিঙ্ক ছাড়িবার ফলে মাছেরও কোন ক্ষতি হয় নাই।

বৃটেনের জাতীয় উদ্ভিদ গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ এখন জিঙ্ক ও অন্যান্য ধাতব লবণের সাহায্যে কপি, গাজর, শসা প্রভৃতি উদ্ভিদের ছত্রাক ও অন্যান্য রোগ দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই চেষ্টায় তাঁহারা বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন।

পুষ্টির অভাব দৃষ্টি-ক্ষীণতার অন্যতম প্রধান কারণ

ট্যাঙ্গানাইকার অন্তর্গত মোয়ানজার মেডিক্যাল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে চিকিৎসকগণ গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহারা জানাইয়াছেন—দৃষ্টিক্ষীণতার অন্যতম প্রধান কারণ হইল পুষ্টির অভাব। চিকিৎসদের এই দলটি বুগিরিতে অবস্থিত চার্চ আর্মি স্কুল ফর দি ব্লাইণ্ড-এর ৪৩ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সকল ছাত্রের অর্ধেকের মধ্যেই রহিয়াছে পুষ্টির অভাব।

উক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রায় ২,৫০০ শিশুর

জন্মবৃত্তান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম অবস্থাতে যাহাদের মধ্যে পুষ্টির অভাব হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার

সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় প্রকাশ, বৃটেনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এমন একটি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ফলে যথেষ্ট নূতন পেনিসিলিন প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই পদার্থটি হইল ৬ অ্যামিনো পেনিসিলিনিক অ্যাসিড—পেনিসিলিনের একটি মৌল অণু। সহ-আবিষ্কর্তা (অপর আবিষ্কর্তা হইলেন আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আর্নেষ্ট বি. চেইন বলেন—এই পদার্থটি পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে।

সারের বীচাম গ্রুপ লিমিটেডের গবেষণাগারগুলিতে চারজন বিজ্ঞানী গত তিন বৎসর ধরিয়া এই অণু স্বতন্ত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নূতন অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে এখন কুষ্ঠ, যক্ষা প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার পরিকল্পনা হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে জীবজন্তুর দেহের উপর পরীক্ষা-কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ক্যান্সার রোগোৎপত্তির রাসায়নিক কারণ

মস্কোতে বর্তমানে মেণ্ডেলিফ রসায়ন-বিজ্ঞান কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন চলিতেছে। সেই কংগ্রেসের ভৌত রসায়ন শাখার অধিবেশনে বিশিষ্ট সোভিয়েট জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক নিকোলাই ইম্যানুয়েল "রাসায়নিক গতিবিদ্যার (কেমিক্যাল কাইনেটিক্স) পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্সার রোগের কার্যকারণ" বিষয়ক যে নিবন্ধটি পাঠ করেন তাহা বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে। এই নিবন্ধে অধ্যাপক ইম্যানুয়েল ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা দূষিত অর্বুদ উৎপত্তির রাসায়নিক কারণ সংক্রান্ত তাঁহার অভিমতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জোরালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেন।

"নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া" (কণ্ট্রোল্ড চেন রিয়্যাকশন) সম্পর্কে অধ্যাপক ইম্যানুয়েলের গবেষণা সুপরিচিত। তিনি এবং ডাক্তার লিপশিনা একযোগে সর্বপ্রকার ইঁদুরের লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে সাফল্য লাভ করেন।

ক্যান্সার রোগের রাসায়নিক কার্যকারণ সম্পর্কে অধ্যাপক ইম্যানুয়েলের মতবাদের মূল তত্ত্বটি মোটামুটি এই—ক্যান্সারে আক্রান্ত দেহকোষের বৃদ্ধি এবং বিস্তারের পিছনে আছে শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ এক-প্রকার রাসায়নিক পদ্ধতি। অতএব পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই ভাবে অনুঘটক (ক্যাটালিষ্ট) ও প্রত্যনুঘটক (ইন্‌হিবিটর) প্রয়োগ করিয়া ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টিউমারকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া অসংখ্য পরীক্ষা করিয়া এই তত্ত্বটির সারবত্তা প্রমাণিত হইয়াছে। ইন্‌হিবিটর হিসাবে অধ্যাপক ইম্যানুয়েল বিউটাইল-অক্সি-টলুয়ল' ও প্রোপিল-গ্যালাট ব্যবহার করেন।

পৃথিবীর আকার ও আন্তঃগ্রহ দূরত্ব

পৃথিবীর আকার ও আন্তঃগ্রহ দূরত্ব পরিমাপের এক অভিনব ও নির্ভরযোগ্য কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। নৈনীতাল মানমন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ বৈনী বাপ্পু জানাইয়াছেন যে, দূরবীক্ষণের সাহায্যে উপগ্রহের পরিক্রমার পথ নির্ধারণ করিয়া ইহা করা সম্ভব হইয়াছে। উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ ও আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে ১২টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৈনীতাল একটি।

উপগ্রহের পরিক্রমার পথের আলোক চিত্র

গ্রহণের পর তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট এক রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে।

শুক্রগ্রহে রেডার-সঙ্কেত প্রেরণ

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে রেডার-সঙ্কেত প্রতিফলিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এই জন্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে মোট ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল পর্যটন করিতে হইয়াছে।

বিজ্ঞানীরা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শুক্রগ্রহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরণ করেন। এই জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং প্রতিফলিত তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পুরা এক বছর সময় লাগিয়াছে।

এতদ্বারা মহাশূন্যের অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটনের কাজ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে আন্তঃগ্রহের দূরত্ব নির্ণয়ও এই প্রথম সম্ভবপর হইল।

শুক্রগ্রহে পৌঁছাইতে রেডার-সঙ্কেতের ঠিক আড়াই মিনিট সময় লাগিয়াছে—ফিরিয়া আসিতেও ঠিক সে পরিমাণ সময়ই লাগিয়াছে।

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হইতেছে শুক্র। মেঘাচ্ছন্ন এই গ্রহটি পৃথিবী হইতে সামান্য ছোট।

চন্দ্রলোক ও মানুষ

মহাকাশ ভ্রমণে উৎসাহী ছোট ছোট দলকে রাশিয়া চন্দ্রে প্রেরণ করিবে। সেখানে মাটির নীচের আবাসে তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে। 'স্পুটনিক ও তাহার পর' শীর্ষক পুস্তিকায় সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক কার্ল গিলৎসিন রাশিয়ার মহাকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যসূচীর খসড়া প্রকাশ করিয়া উপরিউক্ত তথ্য জানাইয়াছেন।

সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী রকেটযোগে মহাকাশ ভ্রমণের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহারা যাওয়ার পর মহাকাশ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবে বলিয়া এখনও নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে বলিয়া প্রথমে সেখানেই যাওয়া হইবে। তবে পরে মঙ্গল ও শুক্রগ্রহেও যাওয়া হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রে পৃথিবীর মত সব আরাম পাওয়া যাইবে, এমন আশা করা উচিত হইবে না। চন্দ্রে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে এবং বাঁচিবার জন্য তাহাকে সবকিছু আহরণ করিতে হইবে।

বেতার-সঙ্কেত প্রতিফলনের কাজে চন্দ্র উপগ্রহ

বেতারবার্তা পুনঃ প্রচারের ঘাঁটি হিসাবে চন্দ্র উপগ্রহকে কাজে লাগাইয়া ওয়াশিংটন ও হাওয়াই দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার একটি পরিকল্পনা মার্কিন নৌ-দপ্তর গ্রহণ করিয়াছেন।

নৌ-দপ্তরের কর্মচারীরা এই সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তত্ত্বগত দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের সামরিক ঘাঁটি হইতে ওয়াশিংটনের মধ্যে সকল প্রকার সামরিক তথ্যাদিরই আদান-প্রদান এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হইতে পারিবে। বেতারবার্তা প্রেরণ এবং বেতারবার্তা গ্রহণ কেন্দ্রের কাজকর্ম ইতিমধ্যেই স্থুরু হইয়াছে।

৮৪ ফুট ব্যাসের বিরাট বাটির মত একটি এরিয়েল বেতার-তরঙ্গগুলিকে চন্দ্রের দিকে প্রেরণ করিবে এবং চন্দ্র হইতে ঐ সকল তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে। বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র মেরিল্যাণ্ডের আন্নাপোলিস এবং হাওয়াই দ্বীপের ওয়াহু ও ওয়াকিওয়াতে স্থাপিত হইবে। গ্রাহক যন্ত্রসমূহ স্থাপন করা হইবে মেরিল্যাণ্ডের চেল্‌টিংগ্যাম, ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী কোন একটি স্থান এবং ওপানা ও ওয়াহুতে।

যে কোন বৈদ্যুতিক সঙ্কেত চন্দ্র হইতে প্রতি-

ফলিত হইয়া ৪৬০,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গ্রহণ-কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে আড়াই মিনিট সময় লাগিবে। হাওয়াই ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ব্যবধান ৪৫১৯ মাইল।

হাওয়াই ও যুক্তরাষ্ট্রের বেতার-কেন্দ্রের মধ্যে চন্দ্রের মাধ্যমে বেতারে যোগাযোগ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হইবে, যতক্ষণ চন্দ্র উভয় কেন্দ্রেরই দৃষ্টিপথে থাকিবে।

বেতারবার্তা সোজাসুজি মহাশূন্যে প্রেরণ করিলে তাহাতে অন্তরীক্ষ ও আবহাওয়ার নানা গোলমাল ও ধ্বনির জন্য পরিষ্কার শোনা যায় না। সমপরিমাপের বেতার-তরঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বার্তা প্রেরিত হইলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পূর্বোল্লিখিতভাবে বার্তা প্রেরিত হইলে এই সব গোলযোগের কোন কারণ থাকিবে না।

দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে গবেষণা

ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন নামে আমেরিকার একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার পরিচালনাধীনে দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নূতন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। মেরু-অঞ্চল সম্পর্কে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট পি. ক্রেরীর উপর এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল কার্যভার অর্পণ করা হইয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানী ক্রেরীর যে বিপুল অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তাহা ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যালেন টি. ওয়াটারম্যান একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ পালন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার অধিনায়কের পদে তিনি ঐ অঞ্চলে আড়াই বছর ছিলেন। ক্রেরী সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাহার উপ-প্রধান বিজ্ঞানীর পদেও তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চল সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে যে সকল সরকারী সংস্থা বিশেষ আগ্রহশীল, তাহাদের কাজকর্মের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং মেরু অঞ্চল সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চালাইবার জন্য এই নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার

সাপ্তাহিক বৃটিশ পত্রিকা (মেডিক্যাল) ল্যান্সেটের খবরে প্রকাশ যে, ৭ বৎসরের একটি বালিকার হৃদ্‌যন্ত্রকে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে কয়েকদিন সঞ্জীবিত রাখা হইয়াছিল। দুইটি তড়িদ্দ্বার হৃদ্‌যন্ত্রের সহিত সেলাই করিয়া দেওয়া হয় এবং ব্যাটারী-চালিত 'পেস মেকারে'র সহিতও তড়িদ্দ্বারের সংযোগ স্থাপন করা হয়।

অস্ত্রোপচারের এক মাস পরে বালিকাটিকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সে ভাল আছে বলিয়া জানা যায়।

'পেস মেকার' যন্ত্রটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দশ ইঞ্চি দীর্ঘ। লণ্ডনের গাইজ হাসপাতালের পদার্থবিদ্যা বিভাগে ইহা নির্মিত হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে হৃৎস্পন্দন অব্যাহত রাখাই ইহার কাজ।

মৌমাছির লালা থেকে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক

ইউক্রাইনের একজন বিজ্ঞানী পুরুষ-মৌমাছির লালা থেকে মেলিসিন নামে একটি নতুন অ্যান্টি-বায়োটিক তৈরী করেছেন। উচ্চ রক্তচাপজনিত স্নায়বিক ব্যাধিতে যারা ভুগছে তাদের দেহে এই মেলিসিন প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। মেলিসিন অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তের উচ্চ চাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়ে আনতে পারে। হাঁপানি, হৃদ্‌রোগ, পুরনো বাতরোগ ইত্যাদির

ক্ষেত্রেও এই মেডিসিন খুব উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্লাষ্টিকের ধমনী

রাশিয়ার সভের্দলোভ্স্ক-এর এক হাসপাতালে কিছুদিন আগে এমন এক রোগীকে আনা হয়েছিল, যার একটি ধমনীতে ক্ষত হবার ফলে প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বললেই চলে। এই হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ভিক্টর ক্রিলফ রোগীটির এই ধমনীর ক্ষতদুষ্ট অংশটুকু বাদ দিয়ে সেই জায়গায় প্রায় সওয়া এক ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাষ্টিকের ধমনী জুড়ে দেন। এই অস্ত্রোপচার সফল হয়। কিছু দিনের মধ্যেই এই প্লাষ্টিকের ধমনীটি রোগীর দেহের অংশে পরিণত হয় এবং সে সেরে উঠে' স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকে।

ডাক্তার ভিক্টর ক্রিলভ অনেক দিন থেকেই প্লাষ্টিকের ধমনী ব্যবহার করা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। উপরিউক্ত রোগীটির ক্ষেত্রে তিনি কেপ্রন জাতীয় প্লাষ্টিকের ধমনী জুড়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আরও চার রকমের প্লাষ্টিকের ধমনী মানুষের দেহে জোড়া যায়। এ-সম্পর্কে তিনি কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদি জন্তু নিয়ে ১৫০ বার পরীক্ষামূলক অস্ত্রোপচার করে সফল হবার পর মানুষের দেহে অনুরূপ অস্ত্রোপচার করেন। এমন কি, হাড়ের রোগদুষ্ট অংশবিশেষ বাদ দিয়েও এভাবে প্লাষ্টিকের হাড় জুড়ে ডাক্তার ক্রিলফ সফল হয়েছেন। ডাক্তার ক্রিলফ মনে করেন, কেপ্রন আর লাভসান জাতীয় প্লাষ্টিকের ধমনী আর হাড়ই মানুষের দেহের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

নূতন ঔষধ আবিষ্কার

বুলগেরিয়ার তরুণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ডি. পাস্কভ ও ডাঃ এল. ইভানোভা "নিভালীন" নামক একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন; ঔষধটি শিশুদের পক্ষাঘাত বা পোলিও রোগের ক্ষতিকর বিকৃতি নিরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। 'স্নো-ড্রপ' বা তুষারবিন্দু নামক একপ্রকার অবনতমুখী সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদের নির্যাস হইতে এই ঔষধের উপাদান সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদটির মাটির উপরের অংশ এবং প্রধানতঃ ফুল হইতেই উক্ত উপাদান সংগৃহীত হয়। ইহাদের ফুল ফুটিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর নিভালীনের উপাদান পাওয়া যায় না।

রোগ-নিরাময়ে 'স্নো-ড্রপ' উদ্ভিদের গুণাগুণ লোকায়ত চিকিৎসকদের নিকট অবিদিত ছিল না। বহু শতাব্দী যাবৎ লোকায়ত চিকিৎসকগণ এই উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহার করিয়া রক্ত চাপের অত্যধিক বৃদ্ধি, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ নিরাময় করিয়া আসিতেছিলেন।

ডাঃ পাসকভ্ ও ডাঃ ইভানোভ; লোকায়ত চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিয়া ও রোগীদের উপর নিভালীননের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল, জননশীল (Vegetative) স্নায়ুমণ্ডল ও গতিজনক (motor) স্নায়ুমণ্ডল সমূহের আবেগে ইহা বিশেষ-ভাবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে। কিউরারা নামক একপ্রকার বিষের (যাহা রেড ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের তীরের ফলায় ব্যবহার করিত) পক্ষঘাত উৎপাদক ক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবেও নিভালীন বিশেষ ফলপ্রদ। পোলিও রোগ হইতে উদ্ভূত মুখমণ্ডলের স্নায়ুর পক্ষাঘাত, পেশীসমূহের রোগ, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের বিকৃতিজনিত পক্ষাঘাত, পেরিটোনাইটিস ইত্যাদি রোগের পক্ষেও নিভালীন বিশেষ উপকারী।

ইলেকট্রনিক রক্ত-বিশ্লেষক

সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের ইনষ্টিটিউট অব্ বায়োফিজিক্স কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় রক্ত-বিশ্লেষক যন্ত্র রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের

অন্যান্য ক্ষেত্রে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

এই দৃষ্টিসহায়ক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত একটি টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের কাজ আরও সহজসাধ্য হইবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম জিনিষকে ২০ হাজার গুণ বড় করিয়া দেখা যাইবে।

সমুদ্রের নোনাজল সুস্বাদু করিবার ব্যবস্থা

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সমুদ্রের নোনাজলকে অল্প খরচে লবণমুক্ত সুস্বাদু জলে পরিণত করিবার একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি গোলাকার চক্রের সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলি বালতির সাহায্যে সমুদ্র হইতে জল উত্থিত হয়। চক্রটি ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বালতির তলায় উচ্চতাপে বাষ্প প্রয়োগ করিয়া ঐ জলকেও বাষ্পে পরিণত করা হয়। এই বাষ্প পুনরায় জলে পরিণত হয়।

বজ্রপাত ঘটিয়ে ফসল বাড়ানো

ঝড়-ঝঞ্ঝার সময়ে আকাশের বুকে যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে, প্রচণ্ড আওয়াজে বাজ পড়ে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বহু দিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সেই বজ্র-বিদ্যুৎকে বাগ মানিয়ে ফসল বাড়ানোর কাজে লাগাচ্ছেন।

দেখা গেছে, আকাশের বুকে প্রত্যেক বার বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, আর নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। এই নাইট্রোজেন অক্সাইড খুব ভাল সার। বৃষ্টিতে শোষিত হয়ে এই সার জলের সঙ্গে মাটিতে প্রবেশ করে' জমিকে উর্বর করে তোলে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি বছর এক হেক্টার বা প্রায় সাড়ে সাত বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রায় দেড় টনের মত নাইট্রোজেন অক্সাইড সার প্রবেশ করে।

বজ্র-বৃষ্টির সময়ে ফসলের জমির উপরের আকাশেই যাতে বিদ্যুৎ চমকায়, তার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। খুব সরু ধাতব তারে লাগানো রবারের বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হয় তড়িতাবিষ্ট মেঘের মধ্যে। এই তারের অপর প্রান্তটি আটকানো থাকে ফসলের ক্ষেতের উপরে। ধাতব তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর সেই প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক তাপে ধাতব তারটি পুড়ে ধোঁয়ায় পরিণত হয়। এভাবে ফসলের মাঠের উপরে বাজ ফেলা হয় আর বৃষ্টির সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইড জমিকে উর্বর করে তোলে।

অতি দ্রুত ছবি তুলিবার ক্যামেরা

লেনিনগ্রাডের একদল ইঞ্জিনিয়ার অতি দ্রুত-গতিতে ছবি তুলিতে সক্ষম একটি অভিনব চলচ্চিত্র-ক্যামেরা নির্মাণ করিয়াছেন। এই ক্যামেরার সাহায্যে এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময় "এক্সপোজার" দিয়া নিখুঁত ছবি তোলা যায়; অর্থাৎ চলচ্চিত্র গ্রহণের কালে এই ক্যামেরার সাহায্যে এক সেকেণ্ডে দশ কোটি "শট" ছবি তোলা যায়।

এই ক্যামেরায় সাধারণ ফিল্মের মত ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ছবি তুলিবার এই প্রচণ্ড গতিকে সম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে কতকগুলি ঘূর্ণায়মান আয়নার জটিল ব্যবস্থায় এবং পয়েণ্ট রাষ্টার নামক অনেকগুলি লেন্সের সমন্বয়ে গঠিত একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে। এই রাষ্টার-এর সাহায্যে একটি প্লেটের উপরেই শত শত ছবি তোলা হয় এবং পরে আবার রাষ্টার-এর মারফতেই প্লেটের প্রত্যেকটি ছবিকে আলাদা-ভাবে একটি পর্দার উপরে প্রক্ষেপ করিয়া সাধারণ ফিল্মের উপরে উহার ছবি লওয়া হয়। এইভাবে ফিল্ম তুলিয়া সাধারণ সিনেমা প্রোজেক্টরের সাহায্যে চিত্রটিকে পর্দার গায়ে দেখা চলে।

অক্সিজেন ব্যবহার করিয়া ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব

লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত স্ক্যানথর্পের ইস্পাত কারখানায় ৩৫০ টনের টিল্‌টিং ওপেন হার্থ ফার্নেসে অক্সিজেন ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় এখন অনেক বেশী ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৫০ সাল হইতে এপ্লেবি-ফ্রডিংহামে ওপেন হার্থ চুল্লীগুলিতে অক্সিজেন ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা হইতেছিল। এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা দেখা দেয়, সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য চুল্লীর ডিজাইন এবং কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহাতে অক্সিজেন প্রয়োগ-পদ্ধতি অনেক বেশী কার্যকরী হয়।

প্রচলিত চুল্লীগুলি ঘণ্টায় ১০ হইতে ১২ টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু অক্সিজেন ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় এই উৎপাদনের পরিমাণ ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৩৫ টন হইয়াছে।

স্ক্যানথর্প ইস্পাত কারখানায় অক্সিজেন সংক্রান্ত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে সেখানে একটি নূতন অক্সিজেন প্ল্যাণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দৈনিক অক্সিজেন উৎপাদনের পরিমাণ হইল ২০০ টন।

প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কার

নিউ ইয়র্কের একজন তরুণ শিক্ষয়িত্রী ফ্রান্সের পেরিজিও নামক স্থানে একটি ২০ হাজার বৎসরের প্রাচীন ক্ষোদিত মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। দশ হাজার হইতে ৮৫ হাজার বৎসর পূর্বে যে মানব-জাতি পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহাদের কঙ্কালও এই খানেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

চিকিৎসাক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় ভেষজ

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ উইলার্ড এফ. লিবি বলেন যে, রোগার্ত মানবের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় ভেষজ ও পারমাণবিক বটিকার ব্যাপক প্রয়োগ অপরিহার্য। পার্ডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্রে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উল্লিখিত মন্তব্য করেন এবং জীব-বিজ্ঞানের উপর পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আরগণ জাতীয় গবেষণাগারে এবং রিচমণ্ডস্থিত ভার্জিনিয়া মেডিক্যাল কলেজের গবেষণাগারে বিভিন্ন ভেষজের আইসোটোপ প্রস্তুত হইতেছে। ডাঃ লিবি বলেন যে, বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে সকল ঔষধাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা তেজস্ক্রিয় করিয়া প্রস্তুত করিতে পারি। এই সকল তেজস্ক্রিয় ঔষধ সম্ভবতঃ যে কোন মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি অথবা প্রজনন-শক্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, এই সকল গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রকার গাছগাছড়া হইতে জৈবরাসায়নিক ঔষধ ও অন্যান্য ভেষজ প্রস্তুতের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। রোগ-নির্ণয়ে এই সকল তেজস্ক্রিয় ভেষজ বিশেষ সহায়ক হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে ইহাদের প্রয়োগ করা হইবে এবং জীব-বিজ্ঞানীরা শারীরক্রিয়া সম্পর্কে ইহাদের সাহায্যে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন।

স্বপ্ন বিলাস

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত স্বপ্ন সম্মেলনে নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম সিলভারবেক বলেন, স্বপ্ন জিনিসটা কবিতার মত—শব্দের সমাবেশে যেমন কবিতার জন্ম, ঘটনার সমাবেশে তেমনই স্বপ্নের জন্ম হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকই স্বপ্ন দেখে। অধিকাংশ লোকই প্রতি রাত্রিতে তিন হইতে পাঁচবার স্বপ্ন দেখে; যদিও তাহারা জানে না যে, তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘুম যখন গাঢ় থাকে না, তখন চক্ষুও স্থির থাকিতে চাহে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও শিরার স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠে। বুঝিতে হইবে, নিদ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে একটা কিছু আলোড়ন চলিতেছে। আলোড়নের সংবাদ তিনি রাখেন না—হয়তো নিদ্রাবসানে তাহা স্মরণ করিতেও পারেন না।

মহাকাশে মৃত্তিকার অভিশাপ

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক নেসমিয়ানোভ মহাকাশ গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করিয়া বলেন, পৃথিবীতে কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে পারমাণবিক ভস্মরাশি মহাকাশকেও কলুষিত করিয়া তুলিতে পারে।

তিনি বলেন, পৃথিবীর নিকটে দুইটি অত্যধিক তেজস্ক্রিয় স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলি পারমাণবিক ভস্মরাশি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

একটি স্তর তিন নম্বর স্পুট্‌নিক ও মহাকাশ-রকেটের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তরটি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দশ গুণ দূরত্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর চতুর্দিক জুড়িয়া যে জ্যোতির্মণ্ডল রহিয়াছে তাহা বিপুল শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ইলেকট্রনপুঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুতে পৃথিবীর দিকে নামিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ও অধিকতর তীব্র স্তরটি আরম্ভ হইয়াছে আনুমানিক ৬২৫ মাইল উর্ধ্বে হইতে। পশ্চিম গোলার্ধে উহা মাত্র ৩৭৫ মাইল উর্ধ্বে রহিয়াছে।

অধ্যাপক নেসমিয়ানোভ বলেন, মহাজাগতিক রকেটের সাহায্যে যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, আয়নমণ্ডলের বাহিরে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তিন-চার গুণ দূরে ইলেকট্রনের প্রবাহ রহিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে চৌম্বক ঝঞ্ঝা ও মেরুজ্যোতির রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হইবে।

বোর্ণিওর আদিম নরমুণ্ড শিকারী জাতি

বৈজ্ঞানিকেরা বোর্ণিওর গভীর জঙ্গলসমূহে নরমুণ্ড শিকারীর একটি আদিম জাতির মধ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধান-কার্য চালাইতেছেন। এই আদিম জাতি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই জাতির নাম মুরুটস জাতি। প্রস্তর যুগের এই আদিম জাতি বিষাক্ত তীর দিয়া নরহত্যা করিত। এখনও তাহারা নরহত্যার অভিযানে বাহির হয় কিনা, তাহা জানা যায় নাই।

মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীলয়েড ডেভিসই সর্বপ্রথম উহাদের সঙ্গে বাস করেন।

৮৭ ঘণ্টায় বিশ্ব পরিক্রমা

১লা এপ্রিল হইতে বৃটিশ ওভারসিজ এয়ার-ওয়েজ কর্পোরেশন পৃথিবী বেষ্টনকারী জেট বিমান সার্ভিসের প্রবর্তন করিয়াছেন।

এখন হইতে বি. ও. এ. সি-র একখানি বৃটানিয়া বিমান লণ্ডন বিমান ঘাঁটি হইতে যাত্রা সুরু করিয়া আটলাণ্টিক পার হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌছিবে এবং তৎপরে সেখান হইতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া টোকিও ও হংকং-এ উপস্থিত হইবে।

টোকিও হইতে আবার একখানি বিমান (কমেট-৪) ব্রহ্মদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ ঘুরিয়া লণ্ডনে আসিয়া পৌছিবে।

বর্তমান সময়সূচী অনুযায়ী লণ্ডন হইতে যাত্রা সুরু করিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া (২৫০০০ মাইল) পুনরায় লণ্ডনে আসিয়া পৌছাইতে মাত্র ৮৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময় লাগিবে। কয়েকমাস পরে এই সময় আরও কমিয়া মাত্র ৮০ ঘণ্টায় দাঁড়াইবে।

নূতন সার্ভিসটি অনেক দিক দিয়া প্রথমত্বের

গৌরব অর্জন করিয়াছে। বৃটিশ বিমান কোম্পানী কর্তৃক ইহাই প্রথম পৃথিবী বেষ্টনকারী জেট সার্ভিসের প্রবর্তন।

স্বয়ংক্রিয় লৌহখনি

ক্রিভয়-রোগ অববাহিকার নিকটে একটি অতি বৃহৎ আকরিক লৌহের খনিকে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় করিবার কাজ সুরু করা হইয়াছে। ইহাই হইবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্বয়ংচালিত লৌহখনি। এখানকার আকরিক লৌহ উত্তোলনের সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হইবে। এই বিরাট খনি হইতে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ উত্তোলিত হইবে।

ক্যামেরুন পর্বতে অগ্ন্যুৎপত্তি

লাগোস (নাইজিরিয়া)—ক্যামেরুন পর্বতের সাড়ে তেরো হাজার ফুট উচ্চ আগ্নেয়গিরি হইতে প্রচণ্ড বেগে গলিত লাভা নামিয়া আসিতেছে। উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা একবার সর্বজ্ঞ যাদুবিদের নিকট ছুটিয়া যাইতেছে, আবার ক্রুদ্ধ দেবতাকে শান্ত করিবার জন্য লাভাস্রোতের কাছে পশুবলি দিতেছে।

ত্রিশ ফুট পুরু এবং ১০০ গজ প্রশস্ত গলিত লাভার দুইটি স্রোত পর্বত-উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্য ও শস্য-ক্ষেত্রকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। পূর্বে যেখানে ছিল শীর্ণকায় স্নেহময়ী নদী, এখন সেখানে দুইটি শীর্ণরেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। উপত্যকার অতিকায় পাষাণ স্তূপকে বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিশিখা আগাইয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞানীর স্বপ্ন

বৃটেনের একজন সহ ৫০ জন মহাশূন্য বিশেষজ্ঞ যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই মানুষ মহাশূন্যে এক বিরাট ষ্টেশন নির্মাণ করিতে পারিবে। বিষুব রেখাঞ্চল হইতে ইহার বিভিন্ন অংশ সমূহ আকাশে প্রেরণ করা হইবে এবং মহাশূন্যেই সেইগুলিকে টানিয়া একত্রিত করা হইবে।

তাহা ছাড়া মনুষ্য-চালিত সরবরাহ এবং রক্ষণা-বেক্ষণকারী মহাশূন্য-যানগুলি বিষুবরেখা হইতে প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহগুলিতে আসা-যাওয়া করিবে।

দশ বৎসরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক টেলিভিসন প্রচারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া বৃটিশ আন্তর্গ্রহ সমিতির আর্থার ক্লার্ক মনে করেন। উপগ্রহগুলি হইতে অনুষ্ঠানগুলি রীলে করা হইবে।

নিম্নে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত দেওয়া হইল—

মানুষ ১৯৬৯ সালে প্রথম চন্দ্রে পদার্পণ করিবে। তাহার কিছু পরেই মানুষ মঙ্গল ও শুক্র-গ্রহে যাইতে পারিবে।

৪০ বৎসরের মধ্যেই মানুষ হয়তো ঘণ্টায় ৬৭ কোটি মাইল বেগে গমনাগমন করিতে পারিবে। ২০০০ সালের পূর্বেই আন্তর্মহাদেশীয় রকেটে ডাক চলাচল করিবে।

উপগ্রহগুলি পৃথিবীর যে কোন স্থানের আবহাওয়া ও ঝড়ের সঙ্কেত দিবে।

মৃত্যুরশ্মি দ্বারা কয়েক শত মাইল দূর হইতেই উড়ন্ত জিনিষকে ধ্বংস করা যাইবে।

কেবলমাত্র একজন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ ১৯৫৯ সালেই মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং সে হইবে একজন রুশ।

বিজ্ঞপ্তি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায় জটিলতা-বর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড়-বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব-বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত **কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না**; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী জুন '৫৯ মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩০শে এপ্রিল '৫৯ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ **কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে** পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে-লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

কর্মসচিব,

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | মে, ১৯৫৯ | পঞ্চম সংখ্যা

আরথ্রাইটিসের চিকিৎসা

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

বর্তমান কালের জটিল রোগসমূহের মধ্যে আরথ্রাইটিস অন্যতম। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এই রোগের প্রতীকার সম্ভব। অনেক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, কিন্তু কোন্‌টি কোন্ রোগীর পক্ষে কার্যকরী হবে, তা স্থির করা একমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেই সম্ভব।

প্রকৃত প্রস্তাবে আরথ্রাইটিস রোগ উপশমের জন্যে তেমন কোন বিস্ময়কর ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিছুদিন আগেও কর্টিসোন এবং এ. সি. টি. এইচ.—এই দুটি ওষুধকে আরথ্রাইটিস রোগের মোক্ষম ওষুধ বলে মনে করা হতো। কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। এ. সি. টি. এইচ. আজকাল খুব কম ব্যবহৃত হয়; হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কর্টিসোনের ব্যবহারও বন্ধ হয়ে যাবে।

আরথ্রাইটিস রোগে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এক শ্রেণীর ওষুধ ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও পাওয়া যায়, অন্য শ্রেণীর ওষুধ কেবলমাত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে কিনতে পারা যায়। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যে সব ওষুধ পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রথমেই অ্যাসপিরিনের নাম করা যেতে পারে।

যে শ্রেণীর ওষুধ চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কিনতে পাওয়া যায় না, তার মধ্যে প্রথমেই হর্মোনের নাম করা যায়। এই শ্রেণীর ওষুধ কেবল মাত্র গাঁট বা অস্থি-সন্ধির যন্ত্রণা উপশম করে না, উপরন্তু ফুলা ও আক্রান্ত স্থানের রোগ-নিরাময়ে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর ওষুধ আরথ্রাইটিস রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে বলে অনেকের ধারণা আছে। কিন্তু এটাও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত নয়।

আরথ্রাইটিস রোগে ব্যবহৃত ওষুধের বিবরণ জানবার আগে প্রত্যেকটি ওষুধ প্রতিদিন কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, তার একটা মোটামুটি হিসাব সবারই জানা প্রয়োজন। ২৮৪ জন আরথ্রাইটিস বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে ১৩,০০০ আরথ্রাইটিস রোগীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ওষুধের পরিমাণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে

অ্যাসপিরিন	৮০%
স্বর্ণঘটিত ওষুধ বা গোল্ড সল্ট	২৮%
হাইড্রোকর্টিসোন	২১%
প্রেডনিসোলোন	২১%
কর্টিসোন	১৯%
প্রেডনিসোন	১৯%
ফিনাইল বুটাজোন	১৩%
এ. সি. টি. এস.	৩%

এবার প্রত্যেকটি ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

অ্যাসপিরিন—অ্যাসপিরিন কেবলমাত্র গাঁটের ব্যথা বা যন্ত্রণা কমায় না, কোন এক বিশেষ শ্রেণীর আরথ্রাইটিসের প্রাথমিক অবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহৃত হলে রোগ উপশমে সাহায্য করে। কিন্তু অ্যাসপিরিনের দোষ হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় ততদিন পর্যন্ত রোগের উপসর্গাদি প্রশমিত থাকে; কিন্তু বন্ধ করলেই রোগের পুরনো উপসর্গ আবার ফিরে আসে। রাত্রি বেলায় এবং খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠবার সময় গাঁটের ব্যথা বাড়ে, সব জায়গা শক্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এ সময় অ্যাসপিরিন খেলে সুফল পাওয়া যায়।

অ্যাসপিরিন নির্ভয়ে খাওয়া চলে। দিনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দু'বার দুটি অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলেই যথেষ্ট। অনেক সময় রাত-দিনে ১৪ থেকে ১৬টি পর্যন্ত বড়ি খাওয়া যেতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলেও তেমন কোন খারাপ উপসর্গ দেখা যায় না। হয়তো পাঁচশ' জন রোগীর মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মাত্র বিপরীত ফল পাওয়া যেতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে অ্যাসপিরিনের মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

গোল্ড সল্ট—প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এক বিশেষ শ্রেণীর আরথ্রাইটিসের (Crippling Arthritis) চিকিৎসায় স্বর্ণঘটিত ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বর্ণঘটিত ওষুধ ইনজেকসন দেবার পর ওষুধটি দেহের তন্তুর মধ্যে জমা হতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, গোল্ড সল্ট দেহ-কোষের মধ্যে রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। প্রতি তিন জন রোগীর মধ্যে দু'জনই এই ওষুধ ব্যবহারে সুফল লাভ করে। স্বর্ণ-ঘটিত ওষুধ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগ উপশম করে। মাঝখানে কিছুদিন স্বর্ণঘটিত ওষুধের সুনাম হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু হর্মোনের ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে এর সুনাম পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আধুনিক পদ্ধতিতে এই ওষুধ ব্যবহারে দেহে এর কার্যকরী ক্ষমতা দীর্ঘদিন অটুট থাকে।

পূর্বে এই ওষুধ কয়েক সপ্তাহ—এমন কি কয়েক মাস ধরে ইনজেকসন দেওয়া হতো। রোগের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হওয়ার অবস্থায় এলেই ইনজেকসন বন্ধ করা হতো। ওষুধের কার্যকরী ক্ষমতাও কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতো। আবার রোগাক্রমণ সুরু হলে, ইনজেকসন দেওয়া আরম্ভ করতে হতো। বর্তমানে পূর্বোক্ত প্রথায় ইনজেকসন বন্ধ না করে দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর একটি ইনজেকসন বেশ কিছু দিন ধরে দেওয়া হয়। ফলে দীর্ঘদিন এই রোগের আক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না।

ক্রিপল্ড আরথ্রাইটিসের প্রথম অবস্থায় স্বর্ণঘটিত ওষুধ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। ইনজেকসন ছাড়া অন্য কোন ভাবে ওষুধ ব্যবহার করলে কার্যকরী হয় না। এই ওষুধ ব্যবহার করবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর কার্যক্ষমতা উপলব্ধি করা যায় না।

বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্যে অনেক সময় দু'মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় এই ওষুধ ইনজেকসন দেবার পর অস্থি-র সন্ধি-স্থলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যন্ত্রণা খুবই কম সময় স্থায়ী হয়। কোনরূপ পর্যবেক্ষণ না করেই অনেকে এই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে দেন। কখনও কখনও এই ইনজেকসন দেবার পর নানা অবাঞ্ছিত

উপসর্গ দেখা যেতে পারে। তখন অবস্থা বুঝে ওষুধের মাত্রা হ্রাস করে দেওয়া দরকার।

হর্মোন—হর্মোনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হলেও আরথ্রাইটিসে আক্রান্ত স্থান রোগমুক্ত করবার জন্যে হর্মোন খুব ভালভাবে কাজ করে। বিশেষ কয়েক শ্রেণীর আরথ্রাইটিসের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হর্মোন অদ্ভুতভাবে কাজ করে। এই হর্মোনের মধ্যে কর্টিসোনের নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেহের দুটি কিডনীর অগ্রভাগে একটি করে গ্রন্থি থাকে। এর নাম অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে স্বতঃই কর্টিসোন নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়।

চিকিৎসকেরা যে কর্টিসোনের ব্যবস্থা দেন তা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। মূল কর্টিসোন থেকে নানা ধরণের ওষুধ তৈরী করা হয়। এই ওষুধগুলির উপকারিতা মূল হর্মোনের মত অথচ ক্ষতিকারক নয়। কর্টিসোনের কার্যকারিতা দেখে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, সব রকম আরথ্রাইটিস রোগে এর প্রয়োগে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা হয় না।

কর্টিসোন পরিবারের দুটি নতুন ওষুধ পাওয়া গেছে। এদের নাম প্রেডনিসোন ও প্রেডনিসোলন। দুটি ওষুধই কর্টিসোন থেকে ভাল। কারণ এদের কার্যকরী ক্ষমতা বেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। সর্বোপরি এদের বিষক্রিয়া খুবই কম। কিভাবে হর্মোন আমাদের দেহে কাজ করে তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। কর্টিসোন ব্যবহার করবার পর ওষুধটি দেহের সংযোজক তন্তুর মধ্যে গিয়ে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। আরথ্রাইটিসের উৎস হলো সংযোজক তন্তু। মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অবস্থিত পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে এ. সি. টি. এইচ. নিঃসৃত হয় এবং অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে' সেখানেও হর্মোনের নিঃসরণ ঘটায়। এই হর্মোন প্রয়োগে খুবই সুফল পাওয়া গেছে; সে জন্যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রোগগ্রস্ত সংযোজক তন্তুর মধ্যে হর্মোন কোন অজ্ঞাত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়।

কর্টিসোনের বিস্ময়কর কার্যকারিতা দেখে প্রথমে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি রোগগ্রস্ত হলে অথবা হর্মোন নিঃসরণে ঘাটতি পড়লেই আরথ্রাইটিসের আক্রমণ হয়। কিন্তু এ ধারণা কিছু দিনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে; কারণ এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সুস্থ ও সতেজ থাকে।

পূর্বে কর্টিসোন ইনজেকসনে ওষুধের প্রাথমিক মাত্রা খুব বেশী দেওয়া হতো। অস্থি-সন্ধিতে যন্ত্রণা, ফুলা বা কাঠিন্যের মাত্রা হ্রাস পেলেই কর্টিসোনের মাত্রা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হতো। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমানে চিকিৎসকের পক্ষে হর্মোনঘটিত ওষুধের ন্যূনতম মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিমিত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগে কোন নতুন উপসর্গ দেখা যায় না।

অধিক পরিমাণে হর্মোন প্রয়োগের ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। পেপ্টিক আলসার, দেহের হাড় দুর্বল হওয়া, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, মানসিক অবসাদ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনেকের দেহে লবণ এবং জল ক্রমাগত সঞ্চিত হতে থাকে। যক্ষ্মারোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর অতিরিক্ত মাত্রায় হর্মোনঘটিত ওষুধ ব্যবহারে আবার ঐ রোগের আক্রমণ হতে পারে।

এছাড়া আরও ছোটখাটো উপসর্গ দেখা দেয়। মুখ ও দেহের সর্বত্র মেদ বৃদ্ধি হয় এবং ওজন বাড়ে। স্ত্রীলোকের দেহের নানাস্থানে অস্বাভাবিকভাবে লোম গজাতে থাকে এবং আরও নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। হর্মোনের মাত্রা হ্রাস করলেই এই ধরণের ছোটখাটো উপসর্গ দূর করা যায়।

ফিনাইল বুটাজোন—কর্টিসোনের মত ফিনাইল বুটাজোন ক্রিপিলিং আরথ্রাইটিস রোগে ব্যবহার করা হয়। ফিনাইল বুটাজোন হর্মোন নয়, একটি

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ মাত্র। কর্টিসোন এবং এ. সি. টি. এইচ-এর সুনাম যখন সর্বত্র প্রচারিত, তখন ফিনাইল বুটাজোন প্রথম তৈরী হয়। তার ফলে এটা পূর্বোক্ত দুটি হর্মোনের মত সুনাম বা দুর্নাম কোনটিরই অংশভাগী হয় নি। যখন কর্টিসোন এবং এ. সি. টি. এইচ-এর সুনাম ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগলো, তখনই চিকিৎসকেরা প্রথম ফিনাইল বুটাজোন সম্পর্কে অবহিত হন। তারপর চার পাঁচ বছর বিশেষজ্ঞেরা হাসপাতালে আরথ্রাইটিস রোগীদের উপর ফিনাইল বুটাজোন ব্যবহার করে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সঠিক অবহিত হন। অন্যান্য ওষুধ থেকে ফিনাইল বুটাজোনের কর্মক্ষমতা কোন অংশে কম নয় এবং এই ওষুধ প্রয়োগে যাদের কোন বিপরীত উপসর্গ দেখা দেয় না, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

পরীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে যে, এই ওষুধ প্রাথমিক অবস্থায় যে কোন যন্ত্রণা উপশম করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে ফিনাইল বুটাজোন হর্মোন নয়। কাজেই এর কার্যকারিতা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। এই ওষুধ ব্যবহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অস্থি-সন্ধি বা গাঁটের কাঠিন্য ক্রমশঃই কমতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে জ্বালা কমে যায় এবং যন্ত্রণা একেবারেই থাকে না।

দীর্ঘদিনের রোগী অথবা যাদের হৃৎপিণ্ড বা কিড্নীর অসুখ আছে তাদের কোন মতেই এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। আরথ্রাইটিস-বিশেষজ্ঞদের কোন ওষুধ নিয়ে রুটিন অনুসারে চিকিৎসা চালানো উচিত। বিভিন্ন ওষুধ রোগীর উপর প্রয়োগ করে কোন্‌টি রোগীর পক্ষে কার্যকরী হবে, তা জানা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।
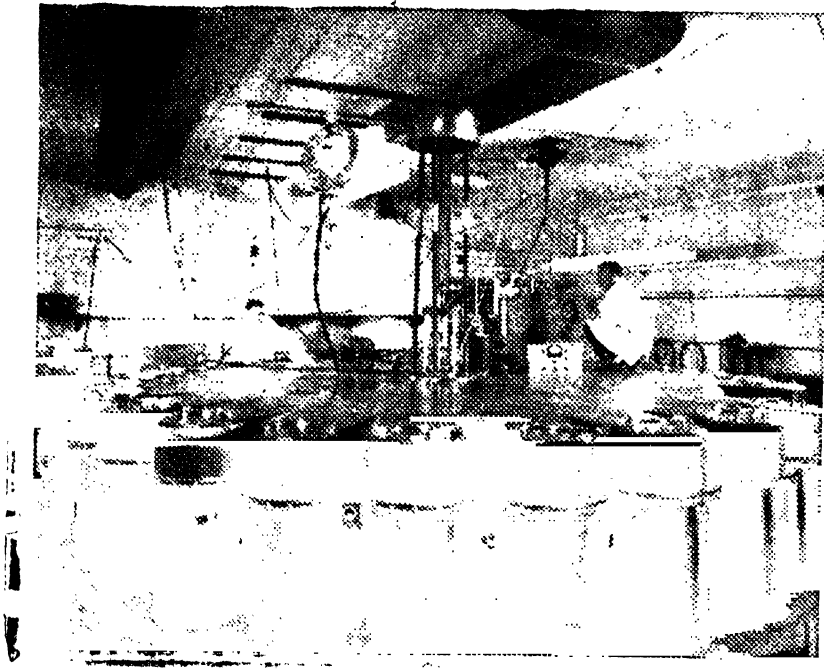
যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণায় খুব সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। নিউ মেক্সিকোর লস্ আলামোস সায়েন্টিফিক লেবরেটরীতে থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তিবিষয়ক গবেষণার জন্যে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে (ছবিতে দেখা যাচ্ছে)। যন্ত্রটির নাম কলম্বাস-২। "পিঞ্চ এফেক্ট" নামে অভিহিত তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনা সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণার জন্যেই যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে।

চিকিৎসায় রসায়ন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

মানুষ যখন গাছগাছড়া, তার রস ও ছাল রোগ নিবৃত্তির জন্যে নিয়োগ করতে শিখলো, তখন থেকেই রসায়ন ও চিকিৎসা-বিদ্যার যোগ সাধিত হলো। এভাবে চললো পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ডাঃ পারাসেলসাস এ ক্ষেত্রে মোড় ফেরালেন। গাছ-গাছড়া ব্যবহার না করে তিনি কেবল খনিজ পদার্থ থেকে ওষুধ আবিষ্কার করেন। এ-থেকেই রসায়ন ও চিকিৎসা-বিদ্যার যোগ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলো। তারপর তিন শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নবিদেরা এ বিষয়ে আরও সহায়তা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল এরলিকের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ট্রাইপান রেড মূলক অতি নিদ্রার ওষুধ আবিষ্কার করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো স্যালভারসন—উপদংশের ওষুধ।

এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রসায়নবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্যানাডার বিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রেডারিক জি. ব্যান্টিং কর্তৃক বহুমূত্র রোগের ওষুধ ইনসুলিন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে রসায়নবিদেরা অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁরা এরূপ উৎসাহে গবেষণা করতে সুরু করেন যে, প্রায় বছর দশেকের মধ্যেই আশ্চর্য বিস্ময়কর ফল পেতে লাগলেন। এরপর ওষুধের নবযুগের সূচনা হলো। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সর্বপ্রথম বিস্ময়কর সালফা ওষুধসমূহ আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে এত অদ্ভুত ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কৃত হতে লাগলো যে, চিকিৎসকদের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল।

সালফা ওষুধগুলির মধ্যে সালফানিলামাইডেরই প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। জার্মেনীর রং ও রাসায়নিক পদার্থের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আই. জি. ফারবেনের গবেষণাগারেই এ সম্বন্ধে কাজ সুরু হয়। আলকাতরা থেকে নানাপ্রকার রং সংশ্লেষণ করবার কাজে এই কারখানাটির বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। রসায়নবিদেরা পরীক্ষার পর রংগুলি গুদামে রেখে দিতেন এবং এ বিষয়ে আর কোন খবর রাখতেন না। পঁচিশ বছর পরে এই গুদাম ঘর থেকেই অতি মূল্যবান রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফারবেন ইনষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল প্যাথোলজির ডিরেক্টর ডাঃ গারহার্ড ডোম্যাগ গুদামের কতকগুলি রং পরীক্ষা করছিলেন, তাদের জীবাণু ধ্বংস করবার যোগ্যতা নির্ণয় করবার জন্যে। তিন বছর পরে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা সন্ধান পেলেন যে, একটি বিশেষ লাল রং ইঁদুরের দেহাভ্যন্তরস্থ ষ্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং তাতে কোন অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হয় না। তিনি এই পদার্থটির নাম দেন প্রণ্টোসিল। তখনও মানুষের উপর এর ফল পরীক্ষা করা হয় নি। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, এই রঞ্জক পদার্থের প্রথম পরীক্ষা হয় তাঁরই ছোট মেয়ের উপর। মেয়েটির রোগ সংক্রমণ হয়েছিল সূচের খোঁচায়। অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। চিকিৎসকের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা হলো নৈরাশ্যজনক। তখন হঠাৎ ডাঃ ডোম্যাগের লাল রঞ্জক পদার্থটির ইঁদুরের উপর আশ্চর্য কার্যকারিতার কথা স্মরণ হলো। তাঁর মনে হলো যে, মানুষের উপরও এই পদার্থটির সুফল পাওয়া যেতে পারে। রক্তের

গুঁড়ার একমাত্রা তিনি মেয়েকে খেতে দিলেন। অদ্ভুত ফল দেখা গেল। জ্বর কমে গেল, সংক্রামিত ব্যাধি উপশমিত হলো এবং মেয়েটি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরে পেল। তাঁরা যদিও প্রণ্টোসিল তৈরীর ব্যবস্থা করতে লাগলেন, কিন্তু তখনও জানতেন না যে, রঞ্জক পদার্থটির ভিতরে কোন্ দ্রব্যটির আরোগ্য করবার ক্ষমতা রয়েছে। পরে প্যারিসের পাস্তর ইনষ্টিটিউটের দু'জন ফরাসী রসায়নবিদ্ আবিষ্কার করেন যে, রঙের ভিতরে সালফানিলামাইড-ই এই রোগ প্রতীকারের জন্যে দায়ী। টনসিলের প্রদাহ, কণ্ঠের প্রদাহ, বিসর্প, রক্তদুষ্টি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে এই ওষুধ প্রযোজ্য।

যথেষ্ট ব্যবহারের পর চিকিৎসকেরা সালফা ওষুধগুলির অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। এসব ওষুধ প্রয়োগে চর্মরোগ দেখা দেয় ও জ্বর হয় এবং রক্তের লোহিত ও শ্বেত—উভয়বিধ কোষেরই ক্ষতি সাধিত হয়। সালফানিলামাইডের ব্যবহার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য ওষুধ হলো - সালফাপিরিডিন, সালফাথিয়াজোল, সালফাডিয়াজিন, সালফাগুয়ানিডিন, সালফামেরাজিন এবং সালফামেথাজিন। রসায়নবিদেরা সালফা গোষ্ঠীর আরও উন্নতি সাধনের জন্যে গবেষণা করছেন। কয়েক শ্রেণীর জীবাণু সালফা ওষুধগুলির আরোগ্য করবার ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে পারে—এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উদ্দীপক অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের সন্ধান পাওয়ার ফলে সালফা গবেষণা অনেক কমে যায়। বর্তমানে রসায়নবিদেরা এই অত্যদ্ভুত ওষুধসমূহের উন্নতির জন্যে মনোনিবেশ করেছেন। জীবাণুই অ্যান্টিবায়োটিক দ্রব্যগুলি উৎপাদন করে। এই দ্রব্যগুলি অন্যান্য অনিষ্টকর জীবাণু ধ্বংস করতে পারে; কাজেই মানুষের শরীরে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে ওষুধরূপে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর এনেছেন। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলির সাহায্যে চিকিৎসকেরা এখন প্রায় সব সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ও উপশম করতে পারেন—অবশ্য কয়েকটি বিশেষ রোগ ব্যতিরেকে; যেমন—সর্দি, পোলিওমায়েলাইটিস, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনের সেণ্ট মেরি হাসপাতালের ডাঃ আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে অ্যান্টিবায়োটিক সম্বন্ধে নবযুগের সূচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, এই রহস্যজনক রাসায়নিক দ্রব্যটির সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। ঐ সময়ে এ বিষয়ে আর কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হাওয়ার্ড. ডব্লু. ফ্লোরী ও ডাঃ আর্ন্‌ষ্ট চেন এই পদার্থটি নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং কয়েকটি রোগীর উপর প্রয়োগ করে আশ্চর্যজনক ফল লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী একজন পুলিশের উপর সর্বপ্রথম পেনিসিলিন ইনজেক্‌সন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই অ্যান্টিবায়োটিকের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল; কিন্তু গবেষণাগার থেকে খুব কম পরিমাণেই এই পদার্থটি তৈরী করা সম্ভব ছিল।

গবর্ণমেণ্ট ও শিল্প-বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এই পদার্থটি অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করবার জন্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরী ও চেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। অবশেষে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে এ ওষুধটি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হলো এবং দামেও বেশ সস্তা হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ কয় বছর এই ওষুধটি অনেক সৈন্যের জীবন রক্ষা করেছে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান এবং তাঁর সহকর্মীরা আর একটি প্রসিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক—স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কার করেন।

এই দ্রব্যটি পেনিসিলিনের ন্যায়ই কয়েক ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ। তাছাড়া পেনিসিলিন কিংবা সালফা ওষুধে সুফল পাওয়া যায় না, এরূপ কয়েকটি ব্যাধিতেও এই দ্রব্যটি ফলদায়ক। কয়েক প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মেনিনজাইটিস রোগে এই ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। স্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত ডাইহাইড্রোস্ট্রেপ্‌টো-মাইসিনের সর্বাধিক কৃতিত্ব হলো ক্ষয়রোগের উপর কার্যকারিতায়। এ দুটি ওষুধ অনেক ক্ষেত্রেই রোগের গতিরোধ করেছে—এমন কি, কয়েক ক্ষেত্রে ব্যাধি নিরাময়ও করেছে।

চিকিৎসকেরা শীঘ্রই রোগীর উপর স্ট্রেপ্‌টো-মাইসিনের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। অনেক ক্ষেত্রেই রোগী বমন, বৃক্কের গোলযোগ, স্নায়ুর গোলযোগজনিত বধিরতা প্রভৃতিতে ভুগতো। তাছাড়া আরও লক্ষ্য করা গেল যে, সংক্রামক জীবাণু অন্য নতুন জীবাণু উৎপাদন করে অথবা ওষুধের গুণ নষ্ট করে। যাহোক, অনেক গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের এই সব অনিষ্টকারিতা দূরীকরণে সক্ষম হন। তাঁরা সাবধানতার সঙ্গে ওষুধের মাত্রা ঠিক করেন এবং ওষুধের সঙ্গে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা সালফা ওষুধ মিশিয়ে ব্যবহার করেন।

পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা আরও নতুন নতুন জীবাণুর সন্ধান করতে লাগলেন, যারা ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। ওষুধ প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণ-মেণ্টের গবেষণাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ মাটি ও আবর্জনার নমুনা এনে এসব জীবাণুর সন্ধানে কষ্টসাধ্য গবেষণা চলতে লাগলো। অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হলো অরিওমাইসিন ও ক্লোরোমাইসেটিন। পেনি-সিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনে আরোগ্য হয়, এই জাতীয় ব্যাধিতেও এই পদার্থ দুটি ফলপ্রদ। তার উপর জীবাণু ও ভাইরাসের মাঝামাঝি অন্য এক প্রকার জীবাণুর সংক্রমণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। এই দুটি ওষুধে টাইফয়েড ও প্যারট ফিবারও আরোগ্য করা যায়।

সাধারণতঃ অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। কারণ যে সব জীবাণু এই পদার্থ উৎপাদন করে তাদের বৃদ্ধি হয় খুব মন্থর গতিতে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জীবাণুর সাহায্য ছাড়াই ক্লোরো-মাইসেটিন উৎপাদন করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ উৎপাদনের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত।

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের পর ডাঃ ওয়াক্সম্যানের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো নিও-মাইসিন। এটির সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে। বীজবারক হিসাবেই একে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। উদরের অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে এই ওষুধ খাওয়ানো হয়।

আমেরিকার ভেষজ প্রতিষ্ঠান চার্লস এফ. ফাইজার কোম্পানীর বিশেষজ্ঞেরা একটি শক্তিশালী দ্রব্য আবিষ্কার করেন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে। এর নাম হলো টেরামাইসিন। এ ওষুধটি প্রায় একশ' রোগ সারাতে পারে।

সম্প্রতি আরও কয়েকটি অদ্ভুত পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—অ্যানিসোমাইসিন, ব্যাসিট্রেসিন, সেলেষ্টিসেটিন, স্পাইরামাইসিন, সাইক্লোসেরিন এবং ম্যানামাইসিন। এদের সম্বন্ধে গবেষণা এখনও শেষ হয় নি।

আশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধের সন্ধান ছাড়াও রসায়ন-বিদেরা অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিন সংযোগ করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই উপায়ে মারাত্মক সংক্রমণ প্রতিরোধ করবার সঙ্গে সঙ্গে অসুখের সময়ও রোগীর বল রক্ষা করা যায়।

কিঞ্চিদধিক দশ বছর হলো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতি-মধ্যেই এরা ব্যাধি আরোগ্য করবার কর্মপ্রণালীর

আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। নিউমোনিয়া, হাম জ্বর, বাতিক জ্বর, বসন্ত রোগ, সান্নিপাতিক জ্বর, পীত জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি আর তেমন মারাত্মক নয়। যে সব ব্যাধি শত শত বছর ধরে মানুষকে বিব্রত করেছে, তাদের এক শ্রেণীর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিনিয়োগ করে এরূপ কল্পনাতীত উপায়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসায় রসায়নের সাফল্য কেবলমাত্র উপরিউক্ত আশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়। কর্টিসোন ও এ-সি-টি এচ্-এর ন্যায় হর্মোন শ্রেণীর ওষুধগুলির আবিষ্কারও বিস্ময়কর। আমাদের দেহে জীবন-ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি আছে, যেমন—অ্যাড্রিন্যাল, থাইরয়েড, গর্ভাশয়, অগ্ন্যাশয়, মস্তিষ্কের পিটুইটারি ও অণ্ডকোষ—এগুলিকে বলা হয় এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি অনবরত রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে এবং সেগুলি সোজা রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশে যায়। রাসায়নিকদ্রব্যগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এদের সমবেতভাবে বলা হয় হর্মোন। শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্যে হর্মোনই দায়ী। বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন যে, হর্মোনগুলি স্টেরোল পদার্থের সাহায্যে গঠিত, যারা স্টেরয়েড যৌগিক পদার্থসমূহ উৎপন্ন করে। এই ষ্টেরয়েডের জন্যেই হর্মোনের বিস্ময়কর কার্যকারিতা দেখা যায়।

আমেরিকার মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ এড্ওয়ার্ড সি, কেণ্ডল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হর্মোন, কর্টিসোন পৃথক করেন, যা যৌগিক পদার্থ "ই" নামেও পরিচিত। এটি অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির হর্মোন। প্রায় পনেরো বছর পরে ওষুধটির কার্যকারিতা অনুভূত হয়। পাণ্ডুরোগজনিত পঙ্গুতা, বাতিক জ্বর, কয়েক প্রকার চোখের রোগ, হাঁপানি, কয়েকটি মারাত্মক চর্মরোগ এবং আরও প্রায় ত্রিশটি ব্যাধিতে এই ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ।

আমেরিকার আর্মার লেবরেটরির ডাঃ জন. এ. মোট এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এ. সি. টি. এচ্ হর্মোনটি পৃথক করেন। পিটুইটারি গ্রন্থি হলো এর উৎপত্তি স্থান। এটি হলো একটি প্রোটিন হর্মোন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আর একটি হর্মোনের সন্ধান পেয়েছেন—সেটি হলো হাইড্রোকর্টিসোন বা যৌগিক পদার্থ 'এফ'। ফ্লোরো-হাইড্রোকর্টিসোন, মেটাকর্টাণ্ড্রালোন ও মেটাকর্টাণ্ড্রিনিন নামক তিনটি হর্মোনেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। শেষোক্ত ওষুধ দুটি কর্টিসোনের চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ শক্তিশালী। টেস্টোস্টেরোন ও এস্ট্রোজেন প্রভৃতি আরও অন্যান্য হর্মোন সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এই নতুন হর্মোনগুলি কয়েক প্রকার ক্যান্সার এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় ফলপ্রদ হবে।

বর্তমানে ভিটামিন বি ১২ নামক একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। রক্তের লোহিত কণিকার রোগে রক্তাল্পতা হলে এই ওষুধটি ফলদায়ক। পূর্বে এরূপ রোগীকে যকৃৎ খাওয়ানো হতো। যকৃতের ভিতরে ভিটামিন বি-১২ থাকে সামান্য পরিমাণে। এক টন যকৃতে থাকে প্রায় কুড়ি মিলিগ্র্যাম বা চায়ের চামচের ছ'শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পূর্বে যেখানে রোগীকে দৈনিক আধ পাউণ্ড যকৃৎ খাওয়ানো হতো, বর্তমানে সেখানে এই ওষুধটির এক কণিকা খাওয়ালেই সাংঘাতিক রক্তাল্পতা রোগ সংযত থাকে। সৌভাগ্যক্রমে এই রাসায়নিক দ্রব্যটি পাওয়া যায় ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন উৎপন্ন করবার সময় উপজাত পদার্থ হিসাবে। জাপানের মৃত্তিকায় প্রাপ্ত একপ্রকার জীবাণু দ্বারা এ দ্রব্যটি উৎপাদন করা যায়।

সম্প্রতি ঘনত্ব-বারক এক রকম ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কারণে রক্ত-তঞ্চন করাতে হলে এ সব ওষুধ প্রয়োগে ঘনত্ব নিবারিত হয়। এ সব ওষুধের নাম হলো—ডাইকামেরল, ট্রমেক্সান, হেপারিন, হেড্রুলিন এবং ষ্ট্রেপ্টোকিনেজ ষ্ট্রেপ্টো-

ডরনেজের মিশ্রণ। করোনারি থ্রম্বোসিসের ন্যায় কয়েক প্রকার হৃদ্‌রোগে এ শ্রেণীর ওষুধ বিশেষ ফলপ্রদ।

উপরিউক্ত ওষুধগুলির বিপরীত ফলদায়ক, অর্থাৎ রক্ত জমাতে পারে, এরূপ এক রকমের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় কঠিন আঘাত পেলে অথবা অস্ত্রোপচারের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা অনেক সময় রক্ত বন্ধ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন এ সব ওষুধ প্রয়োগে রক্ত জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে যায়। এ শ্রেণীর ওষুধ হলো—থ্রম্বিব, জেলফোম ও স্টার্চ স্পঞ্জ।

মানুষের রক্ত পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা আরও ফলদায়ক রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। ভয়ানক আঘাত পেলে এবং অতিশয় দাহজনিত ক্ষত হলে রক্তরসের পরিবর্তে সিরাম অ্যালবুমেন খুবই উপকারী। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, ডিপ্‌থেরিয়া, হাম-জ্বর, পাণ্ডুরোগ, পোলিও প্রভৃতি রোগে গামা গ্লোবিউলিন যথেষ্ট ফলদায়ক।

সিনকোনা গাছের ছাল থেকে যে কুইনাইন পাওয়া যায়, সেটিই ছিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওষুধ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা জাপানীদের দখলে আসে তখন মিত্রশক্তিবর্গ মুস্কিলে পড়েন; কারণ ঐ এলাকাতেই সিনকোনা গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে। ম্যালেরিয়াও ঐ এলাকাতেই অত্যধিক। কাজেই ওখানে থেকে যুদ্ধ করতে হলে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে কুইনাইনের পরিবর্তে অপর কোন ওষুধের দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে অ্যাটাব্রিনের সন্ধান পান। জার্মেনীর রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেই পদার্থটি সংশ্লেষণ করেন। কিন্তু তখনও এটি চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয় নি। অ্যাটাব্রিন কুইনাইনের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী।

মানসিক পীড়ার চিকিৎসায় চিকিৎসকেরা খুবই বিব্রত হন। সম্প্রতি রসায়নের সাহায্যে চিকিৎসকেরা দুটি কার্যকরী ওষুধ পেয়েছেন। সে দুটি ওষুধ হলো—ক্লোরোপ্রোম্যাজিন ও রেজার্পিন। এই দুটি ওষুধ প্রয়োগ করে ক্ষিপ্ত রোগীকেও সংযত করা যায়। ইতিমধ্যে রোগীকে আরোগ্য করবার অন্য ব্যবস্থাও করা যেতে পারেন। রেজার্পিন উচ্চ রক্তচাপের জন্যেও ব্যবহার করা যায়। হেক্সামেথোনিয়াম এবং হাইড্রালেজিনও উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ।

পোলিওমাইলাইটিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে রসায়নের সাম্প্রতিক বিশিষ্ট অবদান হলো সল্ক্‌ ভ্যাকসিন। এই পঙ্গুত্বকারক ও মারাত্মক ব্যাধিটি ভাইরাস সংক্রমণের ফলেই সৃষ্ট হয়। এ রোগটি বহুকাল ধরেই চিকিৎসকদের নিকট রহস্যময় ছিল। গবেষণা করবার সময় বিশেষজ্ঞেরা লক্ষ্য করলেন যে, পোলিও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে একপ্রকার পদার্থের উদ্ভব হয়, যা আক্রমণকারী ভাইরাসের গতি প্রতিরোধ করতে পারে। এই প্রতিরোধক দ্রব্য উদ্ভবের ফলে রোগী কিছুকাল রোগমুক্ত থাকতে পারে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই এ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে পোলিও ভাইরাসের সিরাম তৈরী করবার কল্পনা হয়। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ জন. এফ. এণ্ডারস্‌ গবেষণাগারে ভাইরাস কর্ষণের উপায় উদ্ভাবন করে নোবেল পুরস্কার পান। পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জোনাস. ই. সল্ক্‌ ও তাঁর সহকর্মীরা অনেক জটিল উপায়ে প্রায় সত্তরটি পদার্থ মিলিত করে ভ্যাক্‌সিনটি তৈরী করেন। এই ভ্যাক্‌সিন প্রয়োগে রোগী ত্রিশ মাস কাল রোগমুক্ত থাকে। আরও অধিক সময় রোগমুক্ত রাখতে পারে, এরূপ শক্তিশালী ভ্যাক্‌সিন তৈরী করবার জন্যে তাঁরা গবেষণা করছেন।

চিকিৎসায় রসায়নের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান চিকিৎসা-ব্যবস্থায় যুগান্তর এনেছে। গত পনেরো বছরে এই প্রভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে, যার ফলে মানুষ আরও নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী হবে।

দিনটা কত বড় ?

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

একজন স্কুলের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আর শীতকালে ছোট হয় কেন? ছাত্রটি উত্তর দিয়েছিল—কারণ উত্তাপে সব কিছু বাড়ে, আর ঠাণ্ডায় কমে। উত্তর শুনে মাষ্টার মশাই হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি। ছেলেটির মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উর্বর! ভূগোলটা ভাল করে পড়া থাকলে সে অবশ্য অন্য উত্তর দিত। উত্তরটা যে কোন স্কুলপাঠ্য ভূগোলে লেখা আছে এবং এ সম্বন্ধে সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু যদি কাউকে প্রশ্ন করা যায়—বলতে পারেন, আজকের দিনটা কত বড়, অর্থাৎ ঠিক কত ঘণ্টা, কত মিনিট, কত সেকেণ্ড? অনেকেই হয়তো সরে পড়বেন, কেউ বা বলবেন—পাঁজি দেখলেই পারেন; বেশী বুদ্ধিমান কেউ হয়তো বলবেন—দাঁড়ান একটু, হিসাব করে দিচ্ছি। পাঁজি থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়টা দেখে নিয়ে বিয়োগ করে দিনের পরিমাণটা এক মিনিটের মধ্যে হিসাব করে দিয়ে তিনি বাহাদুরী নিয়ে নেবেন। কিন্তু এর পরেও একটা 'কিন্তু' থেকে গেল—ওই সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় দুটা পাওয়া গেল কেমন করে? বাহাদুর অমনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন। ভূগোল দেখে লাভ নেই, এটা ভূগোলের আওতার বাইরে। এটা সমাধান করতে হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু জ্ঞান লাভ করতে হবে।

এখন দেখা যাক, ভূগোল এ সম্বন্ধে কি বলে। ভূগোল খুললে দেখা যাবে—লেখা আছে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ দু-দিন সারা পৃথিবীতে দিন-রাত্রির পরিমাণ সমান, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করে প্রত্যেকটি। ২১শে জুন সূর্য কর্কট ক্রান্তির (২৩½° উঃ) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে দিন বৃহত্তম এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম, আর দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য মকর ক্রান্তির (২৩½° দঃ) উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে রাত্রি বৃহত্তম এবং দিন ক্ষুদ্রতম, আর দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত। এর মধ্যবর্তী সময়ে দিন-রাত্রি ক্রমশঃ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে থাকে।

এ-থেকে দুটি প্রশ্ন মনে আসে। প্রথমতঃ ওই প্রদত্ত তারিখগুলি স্থির কিনা, অর্থাৎ ঠিক ওই তারিখগুলিতে চিরকাল ধরে দিন-রাত্রি সমান, বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম হয়ে আসছে কি না? আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, দিন বা রাত্রি সমান, বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম হবার পর কি হারে প্রতিদিন বাড়তে বা কমতে থাকে?

প্রথম প্রশ্নটার সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে করতে চাই না, তবে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে, ভূগোলের প্রদত্ত তারিখগুলি একটা মোটামুটি হিসাব মাত্র; এরূপ কোন তারিখ চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। বর্তমানে দিন-রাত্রি সমান হচ্ছে ২২শে মার্চ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর। দিন বৃহত্তম হচ্ছে ২৩শে জুন, ক্ষুদ্রতম হচ্ছে ২৩শে ডিসেম্বর। এই তারিখগুলিও কিছুদিন পরে বদলে যাবে এবং একটু একটু করে পিছিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর কারু কারুর কাছে খুব সোজা মনে হতে পারে। দিন রাত্রি সমান হবার পর সব থেকে কতখানি বাড়লো বা কমলো, জেনে নিয়ে মধ্যবর্তী দিনের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিলেই তো প্রতিদিনের হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া

যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়। পৃথিবীর গতিটাই আসলে বেয়াড়া ধরণের। একে পৃথিবীর মেরু-রেখাটা তার কক্ষ-পথের সঙ্গে একটা বিশেষ কোণে (৬৬½°) হেলে-থাকে ; তার উপর তার গতিবেগটাও মোটেই ঐকিক নিয়ম মেনে চলে না। এর ফলে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা ছাড়বেন কেন, তাঁরা এ সম্বন্ধে একটা অঙ্কের সূত্র বের করলেন। এই বিষয়টাই এখন আলোচনা করবো।

দিন-রাত্রি বাড়ছে বা কমছে—দুটা জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথমটা হচ্ছে, যে স্থানের দিন-রাত্রির পরিমাণ জানতে চাই তার অক্ষাংশ, আর একটা হচ্ছে সূর্যের বিষুব-লম্ব। বিষুব-লম্ব হচ্ছে খ-বিষুব থেকে সূর্যের দূরত্ব। পৃথিবীর বিষুব রেখাটাকে যদি শূন্যে অনন্ত ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটাই হবে খ-বিষুব; আর খ-গোলকের উপর সূর্য যেখানে আছে, সেটা খ-বিষুবের সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, সেটাই হলো সূর্যের বিষুব-লম্ব। সূর্য যখন উত্তরায়ণে থাকে, তখন তার বিষুব-লম্বকে বলা হয় উত্তর, আর দক্ষিণায়নে থাকলে বলা হয় দক্ষিণ। খ-বিষুবের উপর সূর্য থাকলে বিষুব-লম্ব হয় O°। ২২শে মার্চ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর এই অবস্থা হয়। ২২শে জুন সূর্যের বিষুব-লম্ব হয় বৃহত্তম উত্তর (২৩°২৭' উঃ *) এবং ২৩শে ডিসেম্বর হয় বৃহত্তম দক্ষিণ (২৩°২৭' দঃ *)। নৌ-সারণী (Nautical Almanac) ও বিলাতী পঞ্জিকাতে (Ephemeris) সূর্যের প্রতিদিনের বিষুব-লম্ব সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করে লেখা থাকে। অক্ষাংশের জন্যে আমাদের কোন ভাল অ্যাটলাস বা অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের বইয়ের সাহায্য নিতে হবে।

এখন দেখা যাক, অক্ষাংশ ও সূর্যের বিষুব-লম্ব নিয়ে কি ভাবে দিবা-রাত্রির মাপ পাওয়া যেতে পারে। ১নং চিত্রে যে কোন দিনে যে কোন স্থানে খ-গোলকের চিত্র দেখানো হয়েছে। পূ প-দিগন্ত রেখা, ব ব'—খ-বিষুব, গ গ'—সূর্যের দৈনিক গতিপথ, ঘ সু বিন্দু, ধ—খ-মেরু (ধ্রুব), স—দিগন্তের উপর সূর্যের অবস্থান। ঘ ধ স এই গোলীয় ত্রিভুজটি সমাধান করলে ∠ঘ ধ স নির্ণয়

১নং চিত্র

* বর্তমানে সূর্যের প্রকৃত বৃহত্তম বিষুব-লম্ব ২৩° ২৩'৪২", এটা প্রতি বছর খুব ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে আসছে। বৈদিক যুগে এটা ২৪° ছিল, সূর্য-সিদ্ধান্তেও একে ২৪° ধরা হয়েছে। সিদ্ধান্ত-দর্পণে ধরা হয়েছে ২৩°৩০'। এর হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণীগুলিও অচল হয়ে যাচ্ছে।

করা যাবে। এটা হচ্ছে 'আওয়ার অ্যাঙ্গল'। জানা আছে যে, সূর্য ৩৬০° কোণ ২৪ ঘণ্টায় ঘুরে আসে; সুতরাং ∠ঘ ধ স ঘুরে আসতে যে সময়টা লাগবে তা হবে অর্ধদিনের পরিমাণ। দ্বিগুণ করে নিলে পুরা দিন পাওয়া যাবে। ঘ ধ স গোলীয় ত্রিভুজের তিনটি বাহুই জানা আছে; ঘ ধ = ৯০° − অক্ষাংশ, ঘ স = ৯০°, ধ স = ৯০° − বিষুব-লম্ব। এ-থেকে গোলীয় ত্রিকোণমিতির সাহায্যে সূর্যের 'আওয়ার অ্যাঙ্গল' নির্ণয় করবার একটা সূত্র পাওয়া যায়। গোলীয় ত্রিভুজ সমাধান করা বেশ জটিল ব্যাপার এবং সমতল কাগজের উপর ছবি এঁকে এর ধারণা দেওয়াও শক্ত। একটা সমতল চিত্রের সাহায্যে অন্য ভাবে অপেক্ষাকৃত সহজে সূত্র নির্ণয় করা হয়েছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এর জন্যে সামান্য ত্রিকোণমিতির জ্ঞানই যথেষ্ট।

মনে করা যাক—ক পৃথিবীর কেন্দ্র; পূ প—পৃথিবীর বিষুবরেখা, উ দ—মেরুরেখা, স—পৃথিবী-পৃষ্ঠে একটি নির্দিষ্ট স্থান। এর অক্ষাংশ ধরা যাক—অ (উত্তর), ল—সূর্যের বিষুব-লম্ব (উত্তর), ব—পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, ব'—স-স্থানের অক্ষবৃত্তের (Latitude circle) ব্যাসার্ধ এবং ক' ওই বৃত্তের কেন্দ্র; ঐ দিন সূর্যরশ্মি পৃথিবীর উপর যে ছায়া-বৃত্তের সৃষ্টি করবে তার ব্যাস ছ ছ'। ছায়াবৃত্ত অক্ষবৃত্তকে ন বিন্দুতে ছেদ করেছে। স ত ছায়া-বৃত্তের এক চতুর্থাংশ।

এখন ক' স অক্ষবৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে, ক'স = ক'ন = ব', ক স = ব, ∠স ক প = অক্ষাংশ অ এবং ∠স ক উ = ৯০ − অ। ∠ত ক ন = বিষুব-লম্ব ল। পৃথিবী স ক' ন কোণটি ঘুরতে যে সময় নেবে তা দিবামানের অর্ধেক। ∠স ক' ত ঘুরতে পৃথিবীর ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে; কারণ স ত অক্ষবৃত্তের এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং ∠ত ক' ন ঘোরবার সময়টুকু

২নং চিত্র

নির্ণয় করলেই চলবে। মনে করা যাক, ∠ত ক' ন = চ, হিন্দু জ্যোতিবিজ্ঞানে এর নাম চর।

চর নির্ণয়—ক' স = ব' = ক স কোসাইন অ = ব কোসাইন অ, ত ক = ব সাইন অ, ত ন = ক ত ট্যান ল = ব সাইন অ ট্যান ল...(১)। আবার ত ন = ক' ন সাইন চ = ব' সাইন চ = ব কোসাইন অ সাইন চ...(২)। (১) ও (২) সমীকরণ থেকে ব কোসাইন অ সাইন চ = ব সাইন অ ট্যান ল

∴ সাইন চ = ব ট্যান অ ট্যান ল।

এটাই হলো চর নির্ণয়ের সূত্র। এ-থেকে লগ্‌ টেবিলের সাহায্যে সহজেই চর নির্ণয় করা

যায়। চর নির্ণয়ের পর একে চরকালে পরিণত করতে হবে। পৃথিবী ৩৬০° ঘুরতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়; সুতরাং 'চ' কোণ ঘুরতে কত সময় নেবে? এ-থেকে পাওয়া গেল চরকাল $=\frac{1}{15}$ চ ঘণ্টা। অক্ষাংশ ও বিষুব-লম্ব দুটাই যদি উত্তর বা দক্ষিণ হয়, তবে চরকাল হবে ধন-চিহ্নযুক্ত, অর্থাৎ ৬ ঘণ্টার সঙ্গে চরকাল যোগ করলে অর্ধদিনের পরিমাণ পাওয়া যাবে। অক্ষাংশ ও বিষুব-লম্ব পরস্পর বিপরীত হলে চরকাল হবে ঋণ চিহ্নযুক্ত, অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে। এখন সাধারণ সূত্রটা দাঁড়ালো সূর্যের অর্ধদিন = ৬ ঘণ্টা ± চরকাল। একে দ্বিগুণ করলে পুরা দিনের পরিমাণ পাওয়া যাবে। ২৪ ঘণ্টা থেকে দিনের পরিমাণ বিয়োগ করলে রাত্রির পরিমাণ পাওয়া যাবে।

এবার দেখা যাক, এই সূত্র প্রয়োগ করে বিষুব ও মেরুদেশে দিনের পরিমাণ কি পাওয়া যায়।

(১) বিষুবদেশের অক্ষাংশ = O°, ট্যান O° = O, সুতরাং সূত্র থেকে চরকাল = O, তাই দিনের পরিমাণ ১২ ঘণ্টা। বিষুবদেশে যে কোন দিনে দিবা পরিমাণ যে ১২ ঘণ্টা তা আমরা জানি।

(২) মেরুদেশের অক্ষাংশ = ৯০°, ট্যান ৯০° = অসীম সংখ্যা। তাই চরকালের পরিমাণ হবে অসীম, দিনের পরিমাণও হবে অসীম। যে কোন বিষুব-লম্বের জন্যেও দিনের পরিমাণ অসীমই থাকবে। মেরুদেশের ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রির ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যাবে।

এখন আমরা দেখতে চাই—কোন স্থানে, কোন দিনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কখন হবে? আমরা দেখলাম, বিষুব-দেশে যে কোন দিনের দিবামান ১২ ঘণ্টা। এখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রতিদিন একই সময়ে হয়। এখানে সূর্যোদয়কে স্থানীয় সময়ের ৬টা বলে ধরা হয়েছে; তাই সূর্যাস্ত ৬টাতে হবে। বিষুব-দেশ ছেড়ে উত্তরে বা দক্ষিণে যে কোন অক্ষাংশে গেলে প্রথমে বিষুব-লম্ব ও অক্ষাংশ থেকে চরকাল নির্ণয় করে নিতে হবে। তারপর অক্ষাংশ ও বিষুব-লম্বের উত্তর দক্ষিণ বিচার করে ৬টার সঙ্গে চরকাল যোগ বা বিয়োগ করলে সূর্যোদয়—সূর্যাস্তের সময় পাওয়া যাবে। এ সময়টা অবশ্য স্থানীয় কাল। একে প্রয়োজনমত ভারতীয় প্রমাণ-কাল বা অন্য কোন সময়ে পরিণত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের পঞ্জিকাগুলি কলকাতার অক্ষাংশ (২২°৩৬´) ধরে বিষুব-লম্ব অনুসারে চরকাল নির্ণয় করে এবং স্থানীয় সময় থেকে ভারতীয় প্রমাণ সময়ে পরিণত করে' প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় লিখে দেয়।

জীবদেহের রঞ্জক পদার্থ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

জীবদেহের রঞ্জক পদার্থগুলি জীবকে শুধু নানা-প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করবার জন্যেই সৃষ্টি হয় নি, জীবন-ক্রিয়ার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। একাধারে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও কার্যকারিতার এমন অপূর্ব সমন্বয় প্রকৃতির রাজ্যে সাধারণতঃ বিরল। উদ্ভিদের যে সবুজ রং পৃথিবীকে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত করে, তার সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতার উপর কেবল উদ্ভিদেরই নয়, যাবতীয় জীবনই নির্ভরশীল। তরুণীর গণ্ডে যে রক্তরাগ অপরূপ শ্রী ফুটিয়ে তোলে, রক্তের সেই লালিমার অক্সিজেন পরিবহনের ব্যবস্থাতেই আবার যাবতীয় জীবন রক্ষা পাচ্ছে। জীবদেহের অপরাপর রঞ্জক পদার্থগুলি কোথাও পুষ্টি, কোথাও দৃষ্টিশক্তি, কোথাও বা বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে; আবার কোথাও জীব এই রঞ্জক পদার্থের মধ্যেই আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছে।

পদার্থবিদের কাছে সবুজ, লাল ও নীল প্রধান বর্ণরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এদের প্রথম দুটি, জীবতাত্ত্বিকের কাছেও প্রধান বর্ণরূপে গণ্য হতে পারে। উদ্ভিদ-জগতের প্রধান বর্ণ—সবুজ। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম—এমন কি, সামুদ্রিক উদ্ভিদে পর্যন্ত ক্লোরোফিলের সবুজ রং ছড়িয়ে আছে। প্রাণী-জগতে আবার রক্তের লাল রংটিই প্রাধান্য লাভের অধিকারী। রক্তের এই রঞ্জক পদার্থটির নাম হিমোগ্লোবিন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ক্লোরোফিল ও হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক সম্বন্ধও খুব নিকট। কেবল ক্লোরোফিলের ম্যাগ্নেসিয়ামের স্থানটি হিমোগ্লোবিনে লৌহের দ্বারা পূরণ হয়েছে।

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, রক্তধারী প্রাণীকেও অন্য সব প্রাণীদের মতই বাঁচবার জন্যে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। সবুজ উদ্ভিদ অঙ্গারাত্মকরণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল কণিকার সাহায্যে সৌরশক্তির সান্নিধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সমন্বয়ে কার্বহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই ভাবে সৌরশক্তির রাসায়নিক রূপায়ণ সম্ভব হওয়াতেই তা থেকে সমগ্র জীব-জগতের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে।

ছত্রাক, জীবাণু প্রভৃতি ক্লোরোফিল বর্জিত নিম্ন স্তরের উদ্ভিদ, উচ্চস্তরের উদ্ভিদ থেকেই তাদের শক্তির সরবরাহ লাভ করে। নিরামিষভোজী প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকেই তাদের শক্তির সরবরাহ ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। আমিষভোজী প্রাণী আবার অন্য প্রাণীর মাধ্যমে এই সরবরাহ পেয়ে থাকে। এ ভাবে জীব-জগতের শক্তির উৎস খুঁজতে গেলে সবুজ উদ্ভিদে গিয়ে পৌছাতে হবে। সমগ্র প্রাণী-জগতের এই শক্তির সরবরাহ যোগাতে সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয় এবং তা থেকে ৫০০ বিলিয়ন টন উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রস্তুত করে।

পারমাণবিক শক্তির সন্ধান লাভের পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদ জীব-জগতের খাদ্য শক্তির উৎস ছাড়াও সর্বপ্রকার ইন্ধনের উৎস বলেও গণ্য হয়ে এসেছে। আজ আমরা কয়লা, পেট্রোলরূপে যে সব জ্বালানী ব্যবহার করে শক্তি লাভ করছি তার সবটাই সবুজ উদ্ভিদের দান। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন না কোন সময়ে উদ্ভিদে সঞ্চিত শক্তিই ভূপ্রোথিত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল।

এখন জানা গেছে যে, অঙ্গারাত্মকরণের কৃতিত্ব একমাত্র ক্লোরোফিলেরই প্রাপ্য নয়। পীত এবং কমলা রঙের কোন কোন পদার্থও সৌরশক্তি আহরণ করে অঙ্গারাত্মকরণে ক্লোরোফিলের সহযোগিতা করে। এই পদার্থগুলি ক্যারোটিন শ্রেণীর। কোন কোন জাতীয় জীবাণুর মধ্যে বেগুনী রঙের একটি পদার্থ পাওয়া যায়—তারও সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা আছে। অবস্থাবিশেষে ঐ সব জীবাণুতে ঐ পদার্থের সাহায্যেই অঙ্গারাত্মকরণ ঘটে থাকে। বর্তমানে জানা গেছে যে, কোন কোন শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে লাল রঙের একটি পদার্থ থাকে। তার অঙ্গারাত্মকরণের শক্তি ক্লোরোফিলের চেয়ে অনেক বেশী। এ আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অঙ্গারাত্মকরণে যে সৌরশক্তি সংহত হয়, তার মোট পরিমাণের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থলভাগের উদ্ভিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে; বাকী সবই সামুদ্রিক উদ্ভিদের দান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডায়েটম প্রভৃতি অতি নিম্ন স্তরের উদ্ভিদই সামুদ্রিক অঙ্গারাত্মকরণের প্রধান অবলম্বন। এই উদ্ভিদাণুসমূহ নানা বর্ণে রঞ্জিত।

সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা ব্যতীত ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থে অন্য গুণও অনেক আছে। গাজরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকে বলে তার ইংরেজী নাম হয়েছে ক্যারোট। গাজরের কমলা রংটি এই ক্যারোটিন থেকেই পাওয়া। তেমনি আবার ডিমের কুসুম, ভুট্টা প্রভৃতির সোনালী রং-ও ক্যারোটিনের দান। তা ছাড়া টোম্যাটোর লাল রং, চিংড়ির খোলার সবুজ রং, পাখীর পালকের বিচিত্র রং সৃষ্টিতে ক্যারোটিনের হাত অনেকখানি। জ্যান্থোফিল নামক অপর একটি রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে এই ক্যারোটিন ফুলের নানাবিধ রং সৃষ্টিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। শরৎকালে পত্রবিমোচনের সময় পাতার রং পরিবর্তিত হয়ে গাছ যে রূপসজ্জা গ্রহণ করে, তাও ক্লোরোফিল ও জ্যান্থোফিলের জন্যেই ঘটে থাকে।

উদ্ভিদ-খাদ্যের সঙ্গে ক্যারোটিন প্রাণীদেহে গৃহীত হলে তা আংশিকভাবে ভিটামিন-এ-তে রূপান্তরিত হয়। এই ভিটামিনটি আমাদের পুষ্টির একটি বিশেষ উপাদান এবং শুধু মানুষেরই নয়, যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের পুষ্টিই এই ভিটামিনটির উপর নির্ভরশীল। এই ভিটামিনটি একমাত্র জীবদেহেই সৃষ্টি হতে পারে এবং এর জন্যে তাকে উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়। প্রাণীরা যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, এটিও তারই একটি উদাহরণ।

প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তির সঙ্গেও ভিটামিন-এ বিশেষভাবে যুক্ত রয়েছে। অক্ষিপটের রডের মত কোষগুলির মধ্যে বেগুনী রঙের একটি পদার্থ থাকে। সেটি ভিটামিন-এ থেকে দেহের মধ্যেই তৈরী হয়। অক্ষিপটের ঐ রডের মত কোষের উপর আলো পড়লে ঐ বেগুনী রং পীত বর্ণ ধারণ করে এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আলোর উত্তেজনা স্নায়ুতে সঞ্চালিত হয়। এই রডের মত কোষগুলির কার্যকারিতার উপরই অল্প আলোতে দেখবার শক্তি নির্ভর করে। খাদ্যে ক্যারোটিন বা ভিটামিন-এ'র অভাব থাকলে রডের মত কোষগুলির মধ্যে ঐ বিশেষ রঞ্জক পদার্থটির অভাবের দরুণ রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয়।

রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থটি বর্তমান থাকবার জন্যেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে। হিমোগ্লোবিনের সাহায্যেই এই জটিল দেহধারী প্রাণীদের সর্বস্থানের কোষ অক্সিজেনের সরবরাহ লাভ করতে পারে। রক্তধারার মধ্যে হিমোগ্লোবিন সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়। অক্সিজেনের অভাবে এই পদার্থটি নীলাভ বেগুনী বর্ণ ধারণ করে এবং অক্সিজেন সংযুক্ত অবস্থায় পদার্থটিকে টকটকে লাল দেখায়। এজন্যেই

আমাদের ধমনীর রক্ত লাল আর শিরার রক্ত নীলাভ বেগুনী হয়ে থাকে।

মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যতীত অনেক নিম্নস্তরের প্রাণীর রক্তেও হিমোগ্লোবিন থাকে। আবার অক্টোপাস, শম্বুক, কর্কট, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীদের রক্তের বর্ণ নীলাভ বেগুনী। এদের রক্তে অক্সিজেন পরিবহনের জন্যে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে হিমোসায়েনিন নামক অপর একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের অবস্থিতির জন্যেই রক্তের বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। হিমোগ্লোবিনের ধাতব উপাদান হচ্ছে লৌহ, আর হিমোসায়েনিনের হচ্ছে—তাম্র।

একপ্রকার সামুদ্রিক কীটের রক্তে ক্লোরো-ক্রোরিন নামে একটি রঞ্জক পদার্থ আছে। পদার্থটিকে একাধারে লাল ও সবুজ বলা যায়। ঘন দ্রাবণে পদার্থটিকে দেখায় লাল, আর পাত্‌লা দ্রাবণে দেখায় সবুজ। অণুবীক্ষণে দেখবার সময় সেক্সনটি পুরু হলে ঐ পদার্থটিকে লাল দেখায়, আর পাত্‌লা সেক্সনে দেখায় সবুজ।

কোন কোন অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে হিমোরিথ্রিন নামে একটি রঞ্জক পদার্থ আছে। পদার্থটি লৌহযুক্ত এবং ঐ প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাচ্ছে যে, প্রাণীর শ্বাসক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট পদার্থগুলি সবই বর্ণযুক্ত। এই অতি প্রয়োজনীয় জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে সক্ষম কোন বর্ণহীন পদার্থের সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

অতি ক্ষুদ্র নানাপ্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বাস-ক্রিয়া সংঘটনে আবার কোন রঞ্জক পদার্থেরই প্রয়োজন হয় না। সে ক্ষেত্রে তাদের দেহ-রসেই প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন শোষিত হতে পারে।

শ্বাসক্রিয়া ব্যতীত প্রাণীদেহে অনুরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যেও অনেক রঞ্জক পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে। বাইরের রূপসজ্জার জন্যেও প্রাণীদেহে রঞ্জক পদার্থের অভাব নেই। প্রাণীদেহের এই রঞ্জক পদার্থের কতকগুলি প্রাণীদেহেই উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গেও গৃহীত হয়। দৈহিক গঠনের বিশেষত্বের জন্যেও প্রাণীদেহে রঙের প্রকাশ ঘটতে পারে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জন টিনড্যাল আবিষ্কার করেছিলেন যে, আলোক বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে নীলরঙের প্রকাশ ঘটে। এখন জানা গেছে, নীল নয়নের নীলাভাও এরূপ আলোক বিচ্ছুরণের ফলেই উৎপন্ন হয়। চোখের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন নীলরঙের পদার্থ নেই। নীল ও সবুজ বর্ণের পাখীর পালকে যে রং প্রকাশ পায়, তাও ঐ বিচ্ছুরণের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ ও প্রতিফলিত আলোকে পরীক্ষিত হওয়ায় ফলে এই বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রত্যক্ষ আলোকে ঐ পালকগুলিকে বর্ণহীন দেখায়।

লাল বা পীত বর্ণের পালকগুলির বেলায় কিন্তু তা নয়। তাদের নিজস্ব রঞ্জক পদার্থ আছে। প্রত্যক্ষ ও প্রতিফলিত আলোকে তাদের একই রকম দেখায়।

তেল বা সাবানের বুদ্বুদ জলে ভাসালে তার উপর আলো পড়ে যেমন একপ্রকার রামধনু রঙের প্রকাশ ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণী-দেহের রঙের প্রকাশও ঐ ভাবে ঘটে থাকে। এই প্রকার বর্ণোৎপত্তিকে ইরিডেসেন্স বলে। দুটি ঘন সন্নিবিষ্ট স্তর থেকে একযোগে আলো প্রতিফলিত হওয়ার ফলেই এরূপ বর্ণ সৃষ্টি হয়। ময়ূরের পালক, প্রজাপতির ডানা, ঝিনুকের খোলার ভিতর দিকটায় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এভাবে বর্ণোৎপত্তি ঘটে।

প্রজাপতির ডানার উপর এক ফোঁটা ইথার ফেলে দিলে তার চক্‌চকে রং অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ইথার উবে গেলেই ঐ বর্ণ ফুটে ওঠে। প্রজাপতির ডানা স্তরে স্তরে পাত্‌লা আঁশ দ্বারা গঠিত। ঐ স্তরের মধ্যবর্তী বায়ুপূর্ণ ফাঁকগুলি ইথারে পূর্ণ হয়ে গেলে আলো পড়ে' আর ঐ ভাবে ঝিক্‌মিকে রং উৎপন্ন হতে পারে না।

প্রাণীদের অঙ্গাবরণে যে সব বর্ণ রঞ্জক পদার্থের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থ তাদের একটি প্রধান উপাদান। ক্যারোটিন সহযোগে যে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন জাতীয় কর্কট ও চিংড়ির খোলা এবং দাড়া সবুজ আর কমলা রঙের মিশ্রণে রঙীন হয়ে থাকে। ঐ সব বর্ণ সৃষ্টিতে প্রোটিন ও ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক মিলন ঘটে। এজন্যেই জলে সিদ্ধ করলে তারা লাল বর্ণ ধারণ করে। প্রোটিনের অংশ জমে যাওয়ায় ক্যারোটিনের আসল রংটি ফুটে ওঠে।

যে সব রঞ্জক পদার্থ প্রাণীদেহে গঠিত হয় হিমোগ্লোবিন তাদের মধ্যে প্রধান। আমাদের দেহে মজ্জায় এ পদার্থটি নিরন্তর গঠিত হচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের দেহে প্রায় ৩০ হাজার লোহিত কণিকা গঠিত হয়ে থাকে। আবার ক্রমাগত এই কণিকাগুলির ধ্বংস হতেই পিত্তরসের সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে লোহিত কণিকার ধ্বংসাবশেষ পিত্তরসরূপেই আমাদের দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে। পিত্তরসের রঞ্জক পদার্থ থেকে আবার বিশেষ বিশেষ পাখীর ডিমের খোলা নীল রং প্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। গারফিস নামক এক জাতীয় মাছের অস্থি-র অংশবিশেষ পিত্তরস থেকে রঞ্জক পদার্থ গ্রহণের ফলে সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের মত কীট-পতঙ্গের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সবুজ বর্ণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ নানা প্রকার শূককীট, কয়ার ফড়িং প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খাদ্যের সঙ্গে ক্লোরোফিল গ্রহণ করে যে এরা সবুজ বর্ণ লাভ করে, এমন নয়। পীত রঙের ক্যারোটিন ও পিত্তরসের সংমিশ্রণে কীটের দেহে ঐ সবুজ রঙের সৃষ্টি হয়।

প্রাণীদেহে মেলানিন নামে আর একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ত্বক ও চুলের কালো রং এই মেলানিন থেকেই আসে। শুধু কালো চুল নয়, সোনালী চুলেও মেলানিন থাকে।

তাম্র সংযুক্ত একটি বিশেষ এন্‌জাইমের ক্রিয়ায় টাইরোসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে দেহের মধ্যে ধাপে ধাপে মেলানিনের গঠন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অ্যালবিনো শ্রেণীর যে সব সাদা রঙের মানুষ ও জন্তুজানোয়ার আমরা দেখতে পাই, তাদের দেহে ঐ বিশেষ এন্‌জাইমটির অভাবের ফলেই ঐরূপ হয়।

টেরিন (Pterin), পরফাইরিন প্রভৃতি আরও কয়েক রকমের রাসায়নিক পদার্থ প্রাণীদের বহিরাবরণের বর্ণ সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন কারণে একইরূপ বর্ণের প্রকাশ ঘটতে পারে। এক লাল বর্ণ সৃষ্টিই ছয় রকম ভাবে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্যারোটিন শ্রেণীর পদার্থের প্রভাবে লাল রঙের সৃষ্টি হয়। কেঁচোর লাল রং হিমোগ্লোবিন থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রজাপতি বা কোন কোন জাতীয় ব্যাঙের গায়ে যে লাল রং থাকে তা টেরিন থেকে উৎপন্ন হয়। পরফাইরিন অনেক পাখীর পালকে লাল রঙের সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রবিশেষে একিনোক্রোম নামক একটি পদার্থও লাল রং সৃজনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। আবার কোন কোন কীটের লাল রং তাদের দেহের গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্যেও প্রকাশ পায়।

অনেক জীবের দেহের রং তার আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অনেক কীট-পতঙ্গের রং হুবহু কাঁচা, পাকা বা শুকনো পাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। তারা পরিবেশের সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিলিয়ে যথাস্থানে আশ্রয় নেয় এবং শত্রুর দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়ে আত্মরক্ষা করে। শীতপ্রধান দেশে আবার এইরূপ কোন কোন কীটের শীত ও গ্রীষ্মকালে গায়ের রঙের পরিবর্তন ঘটে। এভাবে তারা গ্রীষ্মকালে গাছের রঙের সঙ্গে মিশে থেকে শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করে। শীতকালে আবার তুষার-বর্ণ ধারণ করে' বরফের সঙ্গে মিশে আত্ম-গোপন করে।

জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও যে গায়ের রং আত্ম-

গোপনের সহায়ক হয়ে থাকে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বহুরূপী নামক একপ্রকার গিরগিটির কথা অনেকেরই জানা আছে। তারা প্রয়োজন মত গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে। জেব্রা প্রদোষকালে খুব সক্রিয়ভাবে বিচরণ করে। তার ডোরাকাটা গায়ের রঙের জন্যে প্রদোষের স্বল্পালোকে সে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে থাকে; ফলে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে।

দেহের রঞ্জক পদার্থের প্রভাব কোন কোন জীবের যৌন ব্যাপারের সঙ্গেও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ফুলের রং তার পরাগমিলনের পক্ষে সহায়তা করে। যৌন মিলনের সময় ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে' রঙের জৌলুষে ময়ূরীকে মুগ্ধ করতে প্রয়াস পায়। মানুষের গাত্রবর্ণও স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের একটি প্রধান বস্তু।

যে ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে, প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজনন যন্ত্রে তার অস্তিত্ব অতিমাত্রায় থাকে। প্রাণীর যৌনগ্রন্থি, পুষ্পরেণু, ডিম, ফল প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

দেখা যাচ্ছে যে, জীবদেহের রঞ্জক পদার্থ এক-দিকে যেমন দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, অপর দিকে তেমনি আবার জীবনধারণের পথও সুগম করে দেয়।
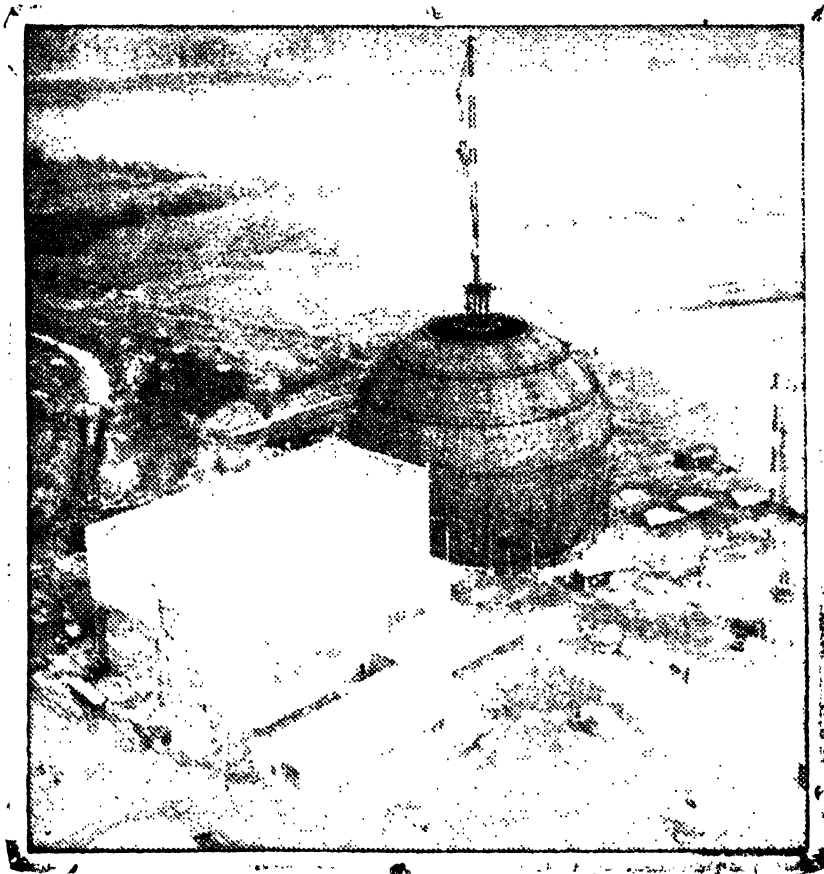
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ড্রেসডেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দৃশ্য। ১৯০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ইস্পাতের বর্তুলের মধ্যে পারমাণবিক চুল্লীটি স্থাপিত হবে। এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ১৮০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে।

এন্‌জাইম

শ্রীজয়া রায়

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এন্‌জাইম নানাবিধ রোগের চিকিৎসায় নানাভাবে সাহায্য করে যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টি করছে বটে, তবুও এ-কথা ঠিক যে, এন্‌জাইম জাতীয় পদার্থগুলি মোটেই নতুন নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্নদেশে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। আদিম মানুষও আঙুরের রস গাঁজিয়ে মদ প্রস্তুত করবার প্রক্রিয়া জানতো। তারা শুধু জানতো না, যে বস্তু দ্রাক্ষারসকে মদ্যে রূপান্তরিত করে তা একটি এন্‌জাইম। তাছাড়া তারা কল্পনাও করতে পারে নি যে, শরীরের কোন অংশে সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে জমে-ওঠা রক্তের একবিন্দু ডেলা গলিয়ে দিতে সাহায্য করে এই এন্‌জাইম অথবা সারিয়ে তুলতে পারে দুরারোগ্য ব্রঙ্কাইটিস রোগ।

এন্‌জাইমের স্বরূপ এবং আবিষ্কারের ইতিহাস বলতে হলে আগে ফার্মেণ্টেশন বা কিণ্বকরণের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্রাক্ষারসের ভিতরকার দ্রাক্ষাশর্করা ঈষ্ট নামক উদ্ভিদকোষের সাহায্যে অ্যালকোহল (মদ্য) ও কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কার্বনিক অ্যাসিড প্রস্তুত হওয়ার ফলে রস ফেনায়িত হয় এবং তাথেকে বুদ্বুদ উঠতে থাকে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম দিয়েছিলেন ফার্মেণ্টেশন। কি কারণে ফার্মেণ্টেশন হয় তা জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বহু আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করেছিলেন। তারই ফলে তাঁরা ঈষ্টের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার এককোষী, সংখ্যায় দ্রুতবর্ধমান জীবাণুর সন্ধান পান। জীবাণুগুলি ছত্রাক শ্রেণীর। দুধ টকে যাওয়া বা অ্যালকোহল থেকে ভিনিগার তৈরী হওয়া ইত্যাদি পরিবর্তনের কারণ এই ধরণের জীবাণু। এগুলি জীবদেহ বা উদ্ভিদদেহের জীবন্ত কোষের ভিতরকার প্রোটোপ্লাজমে থাকে এবং কিছু আর্দ্রতা ও প্রায় ৪০°সে. তাপে এই জীবাণুদেহ থেকে একরকম দানাদার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ দানাদার বস্তুই এন্‌জাইমের পূর্ববর্তী পদার্থ (Precursor)। যে সব কোষ থেকে এন্‌জাইম নিঃসৃত হয় সেগুলিতে ঐ দানাদার বস্তু থাকে। যখন বিশেষ বিশেষ স্নায়ু এন্‌জাইম-স্রাবী কোষগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তখনই ঐ পূর্ববর্তী পদার্থ এন্‌জাইমে পরিণত হয় এবং রসের মত নিঃসৃত হতে থাকে। যেমন—পেপ্‌সিনোজেন থেকে পেপ্‌সিন, ট্রিপসিনোজেন থেকে ট্রিপসিন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

এন্‌জাইম শরীরে নানারকমের ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় যে সব এন্‌জাইম সাহায্য করে সেগুলির কথা শ্রেণীপরম্পরায় বলা হলো।

১। অ্যামাইলোলাইটিক—এগুলি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে শর্করা ও অন্যান্য যৌগিকে পরিণত করে; যেমন—টায়ালিন। এই এন্‌জাইমটি মুখের লালার সঙ্গে নিঃসৃত হয়।

২। ডাইস্যাকারেজ—এগুলি সুক্রোজকে সম-পরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে পরিণত করে; যেমন—আন্ত্রিক রসের ইনভার্টেজ, মল্টেজ ইত্যাদি।

৩। লিপোলাইটিক—চর্বিজাতীয় বস্তুকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। যেমন—অগ্ন্যাশয়ের লাইপেজ।

৪। প্রোটিওলাইটিক—প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বস্তুকে প্রোটিওজ, পেপ্‌টোন, পলিপেপ্‌টাইড ও অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে দেয়; যেমন—পাচক রসের পেপ্‌সিন ও অগ্ন্যাশয়ের ট্রিপসিন।

৫। পেপ্‌টোলাইটিক—পূর্বোক্ত প্রোটিওজ ও পেপ্‌টোনকে পলিপেপ্‌টাইড ও অ্যাসিড করে দেয়, যেমন—আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন।

উপরিউক্ত সব এন্‌জাইমগুলি বস্তুর অণুর (Substrate) সঙ্গে জলের অণু যুক্ত করে ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এছাড়া আরও কতকগুলি এন্‌জাইম আছে; যেমন—

৬। কোয়াগুলেটিভ—এগুলি দ্রাব্য প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে অদ্রাব্য বস্তুতে পরিণত করে; যেমন—পাচক রসের রেনিন।

৭। অক্সিডেজ—এগুলি অক্সিজেন বহন করে এনে তন্তুর মধ্যেকার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালায়।

৮। রিডাক্টেজ-উপরিউক্ত পদার্থগুলির বিপরীত-ধর্মী; এগুলির কাজ হলো তন্তুর মধ্যে বিজারণ ঘটানো।

৯। ডিয়েমিনেজ—এগুলি অ্যামিনো যৌগিক পদার্থ থেকে অ্যামিনো শ্রেণী সরিয়ে দেয়।

১০। ইনট্রাসেলুলার এন্‌জাইম — কোষের ভিতরকার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এগুলিকেও পরিপাকক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় এন্‌জাইমগুলির মত বস্তুর উপর ক্রিয়া অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যেমন—অ্যাসিলোলাইটিক ইত্যাদি। মৃত্যুর পরেও এই এন্‌জাইমের কাজ চলতে থাকে, যদি মৃতদেহকে উপযুক্ত অবস্থায় রাখা যায়।

এন্‌জাইমের কাজ হলো রাসায়নিক কোনও বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা। যেমন—ঈষ্টের এন্‌জাইম জাইমেজ, দ্রাক্ষাশর্করাকে মদে পরিণত করে, টায়ালিন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যবস্তুকে ডেক্সট্রিন ও ম্যাল্টোজ করে দেয় বা পেপসিন প্রোটিন জাতীয় খাদ্যবস্তুকে প্রোটিওজ ইত্যাদিতে পরিণত করে। এন্‌জাইমের শক্তিকে পারমাণবিক বোমার সঙ্গে তুলনা করা যায়; কারণ পদার্থটির সামান্য পরিমাণেরও অসাধারণ কর্মক্ষমতা দেখা যায়। সামান্য একটু এন্‌জাইম প্রভূত পরিমাণ বস্তুর উপর কাজ করে; অথচ রূপান্তর সাধনের পর এন্‌জাইম নিজে অবিকৃত অবস্থায়ই থেকে যায় এবং অন্য নতুন বস্তুর উপর কাজ করতে পারে। সাধারণতঃ ৪০° সে. তাপেই এন্‌জাইমের কাজ ভাল করে চলে। অতিরিক্ত উত্তাপ এর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমাদের জীবনধারণও অনেকটা এন্‌জাইমের উপর নির্ভরশীল। পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-ক্রিয়া, পেশীচালনা বা মূত্রগ্রন্থিকে সচল রাখতে এন্‌জাইমের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এমন কি এন্‌জাইমের অভাবে স্নায়বিক উত্তেজনাবোধও কিছুটা কমে যায়। বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর দেহে এন্‌জাইমের বিভিন্ন রকমের ক্রিয়া দেখা যায়।

যে ধরণের খাদ্য আমরা গ্রহণ করি না কেন, সেটা যতক্ষণ কোনও সরল বস্তুতে রূপান্তরিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তার দ্বারা শরীরের কোনও পুষ্টি সাধিত হতে পারে না। এই সরলতর বস্তুগুলি শরীরের তন্তু গঠনের কাজে লাগে। ঈষ্টের মত এককোষী জীবদেহেই হোক বা জটিল মানবদেহেই হোক, এন্‌জাইম সর্বদা তার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে জীবদেহের উপযোগী তন্তুতে পরিণত করে।

পরিপাক ক্রিয়ায় এন্‌জাইমের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। কোনও খাদ্যবস্তু চিবানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থেকে যে লালা বেরোতে থাকে, তারই একটি উপাদানের নাম টায়ালিন। এই এন্‌জাইমটি খাদ্যের মধ্যেকার শ্বেতসারের অণুগুলিকে ডেকষ্ট্রিন নামক সরল শর্করায় পরিণত করে। সামান্য অম্ল ও লবণের উপস্থিতিতে টায়ালিনের কাজ ভাল হয়। অম্লের পরিমাণ বাড়লেই এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে পাকস্থলীতে খাদ্য বস্তু পৌছাবার পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ স্রাবক গ্রন্থি থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না বেরোয়, ততক্ষণ টায়ালিনের কাজ চলতে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, এই এন্‌জাইমের অনুপস্থিতিতে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যাংশগুলি কি

শর্করায় পরিবর্তিত হতো না? হতো, কিন্তু এত ধীরে ধীরে হতো যে, ধরাই পড়তো না। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ও জল একত্রে থাকলে প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে শ্বেতসার অণুগুলি জল টেনে নিয়ে শর্করায় পরিণত হতো। আবার যদি সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রাবণে ঐ জাতীয় খাদ্য ফোটানো হয় তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটে থাকে; কিন্তু দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এন্‌জাইম এর চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এন্‌জাইম অজৈব অণুঘটকের মত কাজ করে; অর্থাৎ এন্‌জাইমের উপস্থিতি রাসায়নিক ক্রিয়াকে দ্রুততর করে।

খাদ্য পাকস্থলীতে যাওয়া মাত্রই পাচক রস নিঃসৃত হয়। এই রসের তিনটি উপাদানের নাম হচ্ছে—পেপ্‌সিন, রেনিন ও লাইপেজ নামক এন্‌জাইম। তাছাড়া পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও থাকে। এই অ্যাসিড পেপ্‌সিন সহযোগে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে (মাছ, মাংস ইত্যাদি) প্রোটিওজ, পেপ্‌টোন ও অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। নামগুলি জটিল মনে হলেও আসল প্রোটিনের চেয়ে এগুলি অধিকতর সরল উপাদান। এই উপাদানগুলিই প্রোটিন-পরিপাকে সাহায্য করে। গবেষণাগারে এই রূপান্তর সাধন করতে হলে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন। অথচ শরীরের ভিতরে কোন গাঢ় অ্যাসিডের দ্বারা এই রূপান্তর ঘটে না। এন্‌জাইম হাল্‌কা ধরণের অ্যাসিড দ্বারাই অল্প তাপে এই পরিবর্তন ঘটায়।

রেনিন দুধ বা ঐ ধরণের কোনও দ্রব্যকে ছানায় পরিণত করে। ছানায় কিছু মাখন ও কেজিন থাকে। দুধ নষ্ট হয়ে বা টকে গেলে বুঝতে হবে যে, কোনও জীবাণুর দ্বারা দুধের মধ্যে কেজিন সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছানার পরিপাক হয়। চবি, তেল বা ঘি জাতীয় জিনিষের সঙ্গে যদি প্রোটিন জড়িত থাকে তবে তা পেপ্‌সিন + হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্বারা গলে যায় এবং লাইপেজ চবির অণুগুলিকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল উৎপাদন করে।

ট্রিপসিন অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থির কোষ থেকে তৈরী হয়। এই এন্‌জাইমটির কাজের সঙ্গে পেপ্‌সিনের কার্যপ্রণালী তুলনীয়; অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাক হওয়ার উপযোগী করাই এর কাজ। পেপ্‌সিন অম্ল সংযোগে প্রোটিনের পরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু ট্রিপসিন ক্ষার-ধর্মী পদার্থ সহযোগে অতিক্রুত একই কাজ করে। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধরণের প্রোটিন—ইলাষ্টিন ইত্যাদির পেপ্‌সিন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ট্রিপসিন কিন্তু তা পারে। তাছাড়া প্রোটিওজ বা পেপ্‌টোনকে পুনরায় অধিকতর সরল করে প্রথমে পলিপেপ্‌টাইড ও পরে নানারকম অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। তবে পেপ্‌সিন যদি প্রোটিনকে প্রথমে সরল করে না দেয় তবে ট্রিপসিনের দ্বারা কোন কাজ হয় না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ট্রিপসিন নামক এন্‌-জাইমটিকে অন্য কাজেও লাগিয়েছেন। এই এন্‌জাইমটিকে দানাদার করা যায়। সেই অবস্থায় এন্‌জাইমটি শুভ্র এবং সূক্ষ্ম আঁশের মত দেখায়। বস্তুটি জলে গুলে অথবা মলমের আকারে বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুঁকে ব্যবহার করা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, নিউমোনিয়া সেরে যাবার পরেও রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। এই রকম ক্ষেত্রে রঞ্জেন রশ্মির দ্বারা ছবি নিলে দেখা যায় যে, রোগীর বক্ষগহ্বরে কিছুটা ক্লেদ বা পুঁজ রয়ে গেছে এই রোগকে এম্পাইয়েমা বলা হয়। অনেক সময় ফুস্‌ফুসের আবরণীর ভিতরেও গাঢ় ক্লেদ জমে থাকে। তার ফলে ফুস্‌ফুস যথারীতি প্রসারিত হতে পারে না এবং রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হয়। বেশী রকম হলে রোগী ভাল

করে খেতেও পারে না। সূচিকাযোগে ক্লেদ টেনে বার করাও সহজসাধ্য নয়। এই রকম একটি রোগীর বুকে আধ আউন্স ট্রিপসিন সূচিকা দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, পরদিনই তার ক্লেদ হাল্কা হয়ে গেল এবং সূচিকার সাহায্যে তা টেনে বের করা সম্ভব হলো। ফলে রোগীটির ফুসফুস যথারীতি প্রসারিত হতে লাগলো। ঐ ক্লেদে কিছু কিছু প্রোটিন জাতীয় উপাদান থাকে এবং বিজ্ঞানীরা এরূপ ক্ষেত্রে ট্রিপসিনের প্রোটিন সরল করবার শক্তির সদ্ব্যবহার করেন।

Bronchiectasis রোগ হলে রোগীর শ্লেষ্ম-শাখাগুলি (Bronchioles) ফুলে যায় ও ক্লেদে ভরে ওঠে। সাধারণতঃ এই রোগ নিউমোনিয়া বা হুফিং কাশির পরেই হয়ে থাকে। অবশ্য ফুসফুসের অন্যান্য সংক্রমণের পরেও হতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে এই রোগ ধাতুগত (chronic) হয়ে যায় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই খুব কাশি হতে থাকে। এই রোগে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ট্রিপসিন দ্রাবক শুঁকলে শ্লেষ্মা পাত্‌লা হয়ে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে বলে রোগীর কষ্টের উপশম হয়; অবশ্য শ্লেষ্মশাখাগুলি তখনই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। কিন্তু কষ্ট লাঘব হলেই রোগী স্বস্তি পায়। অগ্ন্যাশয়ের আরও একটি এন্‌জাইম হচ্ছে ডরমেজ। এই এন্‌জাইমটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে সরল করে দিয়ে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। চিকিৎসকেরা এই এন্‌জাইম প্রয়োগ করে ব্রঙ্কাইটিস ও ফুস্‌ফুসের অন্যান্য প্রদাহে ট্রিপসিনের চেয়েও বেশী সুফল পেয়েছেন।

অগ্ন্যাশয়ের আরও দুটি এন্‌জাইম আছে। এদের নাম মল্টেজ বা অ্যামাইলেজ এবং লাইপেজ। প্রথমোক্তটি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যবস্তুকে আরও সহজপাচ্য করে দেয়। অসিদ্ধ শ্বেতসারকেও মল্টোজে পরিণত করে।

লাইপেজ স্নেহজাতীয় খাদ্য, অর্থাৎ তেল, ঘি ইত্যাদি দ্রব্যকে ক্ষারের মাধ্যমে অবদ্রব বা দুধের মত বস্তুতে পরিণত করে। আবার এই এন্‌জাইমই স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। ফ্যাটি অ্যাসিড ও অগ্ন্যাশয়ের ক্ষারত্ব মিশে সাবান জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ সাবান স্নেহদ্রব্যের বিন্দুগুলিতে লেগে যায়। তার ফলে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয় না। প্রোটিনের উপস্থিতিতে ঐ অবদ্রব স্থায়ী হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় এন্‌জাইম সুশৃঙ্খলায় কাজ করে যায়। সেজন্যে এর ব্যতিক্রম ঘটলে চিকিৎসকেরা বিভিন্ন রোগ নির্ধারণের কিছুটা সঙ্কেত পেতে পারেন। কোনও রোগী তলপেটে প্রবল বেদনার উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হলে চিকিৎসকেরা হঠাৎ রোগ স্থির করতে পারেন না। তাঁরা কেবল মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন যে, হয়তো রোগীর অ্যাপেনডিক্স বা কোনও আন্ত্রিক ক্ষত ফেটে গেছে অথবা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হয়েছে। অথচ প্রথম দুটি রোগে সত্বর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, কিন্তু তৃতীয়টিতে অস্ত্রোপচার না করেও রোগীকে আরাম করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে রক্তের মধ্যে অ্যামাইলেজ নামক এন্‌জাইমের পরিমাণ স্থির করে রোগ নির্ধারণ করা সম্ভব। এন্‌জাইমের পরিমাণ বেশী হলে বোঝা যাবে যে, রোগটি অগ্ন্যাশয়ঘটিত।

এবার ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরকার এন্‌জাইমের কথায় আসা যাক। এখান থেকে তিনটি এন্‌জাইম বেরোয়। যেমন—

১। ইনভার্টেজ বা সুক্রেজ

২। মল্টেজ

৩। ল্যাক্টেজ

সুক্রেজ ইক্ষুশর্করাকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে পরিণত করে। সুক্রেজ ইক্ষুশর্করার সঙ্গে কিছু জল যুক্ত করে ঐ পরিবর্তন ঘটায়।

$$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O = C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$
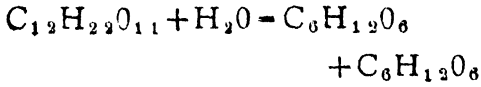
সুক্রোজ+জল=গ্লুকোজ+ফ্রাক্‌টোজ

এন্‌জাইমের পরিবর্তে কোন অ্যাসিড দ্বারা দেহের উত্তাপের সমান তাপে ইক্ষুশর্করাকে বিশ্লিষ্ট করতে হলে এন্‌জাইমের চেয়ে ১০ কোটি গুণ বেশী পরিমাণ অ্যাসিডের প্রয়োজন হতো। এই দৃষ্টান্ত থেকেই এন্‌জাইমের শক্তি সম্পর্কে কিছু ধারণা হবে।

অ্যামাইলেজ দ্বারা পরিবর্তিত মল্টোজ ক্ষুদ্র অন্ত্রের মল্টেজ নামক এন্‌জাইম দ্বারা গ্লুকোজে পরিণত হয়। ল্যাক্টেজ দুধের উপর কাজ করে ও তাকে ল্যাক্টোজ করে দেয়। এক কথায় ক্ষুদ্র অন্ত্রের এন্‌জাইমগুলি শ্বেতসার জাতীয় অণুগুলিকে সরল শর্করায় পরিণত করে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ক্ষুদ্র অন্ত্র ডাইস্যাকারাইডকে মনোস্যাকারাইড করে দেয়। এ ছাড়া অন্ত্রে ইরেপসিন নামক আরও একটি এন্‌জাইমের সন্ধান পাওয়া যায়। এই এন্‌জাইম প্রোটিওজ ও পেপটোনকে সরল করে অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য নানা রকম জটিল জৈব পদার্থে পরিণত করে। এন্‌জাইম দ্বারা রূপান্তরিত পদার্থগুলি ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরের কোষের দ্বারা শোষিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন তন্তুর পুষ্টিসাধন করে।

আমাদের শরীরের মধ্যে সর্বদাই শ্বাসক্রিয়া চলছে। কিন্তু একমাত্র ফুস্‌ফুসই শ্বাসক্রিয়ার যন্ত্র নয়। শরীরের বিভিন্ন তন্তুর মধ্যেও গ্যাসীয় আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চলে থাকে। তন্তুর মধ্যে গ্যাসীয় পরিবর্তন ঘটায় এন্‌জাইম। পূর্বে বলা হয়েছে যে, অক্সিডেজ জাতীয় এন্‌জাইম এই কাজ করে। এই এন্‌জাইমের নাম ট্রান্স-পোর্টেজ। আবার রিডাক্টেজ জাতীয় এন্‌জাইম তন্তুর মধ্যে বিজারণ ঘটায়

আগে বলা হয়েছে যে, ট্রিপসিন প্রোটিনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের কোষ দ্বারা শোষিত হয়ে এই অ্যাসিডগুলি রক্ত-স্রোতের সঙ্গে মেশে ও রক্তবাহিত হয়ে বিভিন্ন তন্তুতে পৌঁছে তন্তু সংশ্লেষণে সাহায্য করে। সেখান থেকে তারা যকৃতে আসে এবং ডিয়ে-মিনেজ জাতীয় এন্‌জাইমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। মূত্রের সঙ্গে সেগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে। তবে সব ইউরিয়াই এই উপায়ে তৈরী হয় না। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আর্জিনেজ নামক আর একটি এন্‌জাইম আছে। বিশেষ ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় ও ইউরিয়া তৈরী করে' রক্ত থেকে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক দ্রব্য মূত্রের সাহায্যে বের করে দেওয়াতেও এন্‌জাইমের সাহায্য প্রয়োজন।

ফস্‌ফোরিক এষ্টারেজ বা ফস্‌ফেটেজ নামক এন্‌জাইম অস্থি ও দন্তগঠনে সাহায্য করে। থ্রম্বেজ নামক একটি এন্‌জাইম রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে। কোনও স্থান অল্প কেটে গেলে দেখা যায়, কিছু রক্ত ক্ষরণ হওয়ার পর জমাট বেঁধে গেছে। রক্ত স্রোতের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। এছাড়া থ্রম্বেজের পূর্ববর্তী বস্তু প্রোথম্বিন থাকে। এই বস্তুটি রাসায়নিক পরিবর্তনে থ্রম্বেজে পরিণত হয় এবং থ্রম্বেজ ও ফাইব্রিনোজেন মিলে ফাইব্রিন তৈরী হয়। ফাইব্রিন রক্তের পিণ্ডাকারে ক্ষতের উপরে জমে গিয়ে পুনরায় রক্তক্ষরণ হতে দেয় না।

প্রত্যেকটি এন্‌জাইমের নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী আছে। একটির উপস্থিতিতে অন্যটির কাজে কোনও ব্যাঘাত হয় না। কেবল রোগ হলেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ ট্রান্সঅ্যামিনেজ এন্‌জাইমটির কথা ধরা যাক। হৃদ্‌যন্ত্র, মাংসপেশী, যকৃৎ এবং গাঢ় অবস্থায় মস্তিষ্কে এই এন্‌জাইমের সন্ধান পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুসে এই এন্‌জাইম নেই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ট্রান্সঅ্যামিনেজ অনেক সমস্যার সমাধান করে এনেছে।

কিছুকাল আগেও রোগীর (থ্রম্বোসিসের)

দেহে রক্তপিণ্ড কোথায় আছে তা স্থির করতে চিকিৎসকদের বিশেষ বেগ পেতে হতো। কারণ এক্স-রে দ্বারা ছবি নিয়ে বা বিশেষ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের রেখাচিত্র নিয়েও (Electro-cardiogram) রক্তপিণ্ডের অবস্থান সঠিক জানা যেত না। অথচ তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা না করতে পারলে এই ধরণের রোগীর জীবনহানির আশঙ্কা যথেষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন বিজ্ঞানী ভাবলেন যে, শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে যখন ট্রান্স-অ্যামিনেজ নামক এন্‌জাইম আছে, তখন হৃদ্‌যন্ত্র বা যকৃতের রোগে রোগীর রক্ত পরীক্ষার দ্বারাই রোগ নির্ধারণ করা যাবে। প্রথমে তাঁরা স্বাস্থ্যবান লোকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাদের রক্তে ঐ ট্রান্সঅ্যামিনেজের পরিমাণ ১০-৪০ ইউনিট। যকৃতের দোষ বা হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীতে রক্তপিণ্ড থাকলে (Coronary thrombosis) এন্‌জাইমের পরিমাণ বেড়ে ৬০০০ ইউনিট পর্যন্ত হয়ে যায়।

৩০০ জন করোনারী থ্রম্বোসিসের রোগীকে পরীক্ষা করে শতকরা ৯৭ জনের ক্ষেত্রে ট্রান্স-অ্যামিনেজ পরীক্ষায় ঠিক ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু ফুস্‌ফুসে রক্তপিণ্ড থাকলে এই পরীক্ষা ফলপ্রদ হয় না।

আগে ইনট্রাসেলুলার এন্‌জাইমের কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর পর পেশী সঙ্কোচনের (Rigor mortis) কথা সকলেই জানেন। এর মূলে রয়েছে মাইয়োসিন নামক এন্‌জাইম। মাংসপেশী, মূত্রগ্রন্থি ও প্লীহাতে পেপ্‌সিন ধরণের এই এন্‌জাইম থাকে। মাইয়োসিন মৃতদেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করে এবং ক্রমশঃ শরীরটি শক্ত হয়ে ওঠে। রক্ত জমাট বাঁধতে যে সব অবস্থার প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রেও তা দরকার।

নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য এন্‌জাইমের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বাধা ঘটায়; যেমন—আয়োডিন, পটাসিয়াম সায়নাইড ও ফরম্যাল ডিহাইড ইত্যাদি। এগুলিকে অ্যান্টি-এন্‌জাইম বলে। অনেক রোগীর দেহে পেনিসিলিন প্রয়োগ করলে নানাবিধ খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই সর্বরোগহর ওষুধটি কি ভাবে বিকৃত হয়ে ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটায় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, কতকগুলি জীবাণু পেনিসিলিন প্রয়োগে নিস্তেজ তো হয়ই না, উপরন্তু তার ফল নষ্ট করে দেয়। ঐ জীবাণুগুলির দেহ-নিঃসৃত যে কোনও বস্তুই পেনিসিলিনের ক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পেনিসিলিনেজ নামক এন্‌জাইমের সন্ধান পেয়েছেন। তা থেকে একরকম ওষুধ তৈরী করে পেনিসিলিন-সচেতন রোগীর উপর প্রয়োগ করে পেনিসিলিন-প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যপ্রণালী সহজভাবে বোঝবার জন্যে এবং রোগ নির্ধারণের জন্যে এন্‌জাইম সম্বন্ধে চিকিৎসকদের পক্ষে সুষ্ঠু জ্ঞান-লাভের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। জীবাণু সংক্রমণ কি ভাবে এবং কি কারণে হয়, এন্‌জাইমের প্রকৃতি লক্ষ্য করে তা বোঝাও সহজ হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে ঠিকই, তবুও অনেক এন্‌জাইমের ক্রিয়া এবং অবস্থান সঠিক নির্ধারিত হয় নি। এখনও বহু পরীক্ষা বাকী। সেগুলি শেষ হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বহুলাংশে এন্‌জাইম, বিশেষ করে প্রোটিন-বিশ্লিষ্টকারী এন্‌জাইম দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে।

মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর মধ্যে যে সব জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া চলছে; এন্‌জাইম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তা অধিকতর সহজবোধ্য হবে। চিকিৎসা ও জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, এন্‌জাইমের গবেষণায় মানুষ এক দিন তার জন্ম-রহস্যের সন্ধান পাবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

অন্ধের জন্যে ইলেকট্রনিক পঠন-সহায়

অন্ধদের পড়বার জন্যে এক রকম উঁচু-নীচু হরফের লেখা প্রচলিত আছে, কিন্তু এখানে সেটা আলোচ্য বিষয় নয়। সাধারণ হরফে লেখা পুস্তক, এমন কি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টাইপ করা চিঠি-পত্রাদি যাতে অন্ধেরা পড়তে পারে, তার জন্যে সম্প্রতি একরকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এ বিষয়ে এটাই হলো সর্বপ্রথম সাফল্য-জনক প্রচেষ্টা। ওহিয়োর বাট্‌লি মেমোরিয়্যাল ইন্‌স্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটির পরিকল্পনা করেছেন।

এখন পর্যন্ত যন্ত্রটি যে পর্যায়ে এসেছে তাতে প্রত্যেক অক্ষরকে সঙ্গীতের সুরের মত স্বর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে অন্ধদের এই স্বরগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা এ-থেকে শব্দ ও বাক্যাংশগুলি বুঝে নিতে পারবে। দেখা গেছে যে, অন্ধেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে মিনিটে ১৫ থেকে ২০টি শব্দ পড়তে পারে।

কাঠের বাক্স সমেত একটা ছোট রেডিও যন্ত্রের মত যন্ত্রটির ওজন প্রায় সাড়ে চার সের। এতে একটা বৈদ্যুতিক সুইচ এবং শব্দ ও আলোক রশ্মির তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়েকটি ছোট হাতল আছে। ব্যবহারকারী যন্ত্রের সঙ্গে তার দিয়ে সংযুক্ত একটা ছোট নল হাতে করে ধরে লেখার উপর দিয়ে এক দিক থেকে অপর দিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। নলের ভিতর দুটা ছোট বৈদ্যুতিক বাতি ও একটা লেন্স আছে। লেন্সের মাধ্যমে ছাপা অক্ষরগুলির প্রতিচ্ছবি কতকগুলি ফটো সেলের উপর পড়ে। এর ফলে বাক্সের মধ্যে অবস্থিত অসিলেটর উত্তেজিত হয়ে তা থেকে বিশেষ ধরণের বিভিন্ন সুর বেরুতে থাকে। কাজে লাগানো টেলিফোনের সাহায্যে বিভিন্ন সুর থেকে শব্দ ও বাক্যাংশগুলি অনুবাদ করা হয়।

বর্তমানে অন্ধেরা যাতে ইংরেজী অক্ষরের ছাপা লেখা এই যন্ত্রের সাহায্যে পড়তে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহাশূন্যে অভিযানের সহায়ক শ্যাওলা

অতিদ্রুত বর্ধিষ্ণু একজাতীয় শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির সংখ্যা দিনে প্রায় ১০০০ গুণ বাড়তে পারে। এর সঙ্গে তুলনায় দেখা গেছে, আগে যে দ্রুত বর্ধিষ্ণু শ্যাওলার কথা জানা ছিল, সেগুলি দিনে মাত্র ৮ গুণ বাড়তে পারে।

এই নতুন শ্যাওলা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের মহাশূন্যে অভিযানের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হবে বলে আশা করা যায়। জেনারেল ডায়নামিক্স করপোরেশনের মিঃ টি. এ. গাউচার এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, পৃথিবীর পরিবেশে প্রাণীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হলে উদ্ভিদ যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বন আত্মসাৎ করে বাতাসের অক্সিজেন-সাম্য রক্ষা করে, সেরূপ মহাশূন্য-যানের বদ্ধ কামরার ভিতর ঐ শ্যাওলার সাহায্যে যাত্রীদের জন্যে অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে। এ ছাড়া ঐ শ্যাওলা থেকে যাত্রীদের দেহ-পুষ্টির খাদ্য, প্রোটিন এবং ভিটামিনও পাওয়া যাবে।

অতি তীব্র আলোকরশ্মি প্রয়োগ করে খুব অল্প পরিসর স্থানে এই নতুন-রকমের শ্যাওলা থেকে সুষ্ঠুভাবে এই কাজ পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অতি তীব্র আলোক রশ্মি উৎপাদনকারী একপ্রকার ক্ষুদ্র

বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেছেন। এই বাতি থেকে সূর্যরশ্মি অপেক্ষা অনেক গুণ তীব্র আলো উৎপন্ন হয়।

শ্যাওলা মেশানো ঘন জল পাম্পের সাহায্যে একদিক থেকে অন্য দিকে চালিত হয় এবং পেন্সিলের মত সরু তীব্র আলোক রশ্মি তার উপর সবিরামভাবে পড়তে থাকে। সবিরাম আলোক-পাতের ফলে শ্যাওলাগুলিতে দ্রুতগতিতে ফটো-সিন্থেসিসের কাজ চলে এবং অন্ধকারের সময় বিশ্রাম পায়। এই অবস্থাতেই তাদের কার্যকরী ক্ষমতা সর্বাধিক হয় বলে দেখা গেছে। শ্যাওলা-গুলির দ্বারা এভাবেই বদ্ধ বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসৃত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অক্সিজেন উৎপন্ন হতে থাকে।

সাবমেরিন চালনায় পারমাণবিক শক্তি প্রযুক্ত হওয়াতে এটাকে পৃথিবীর উপগ্রহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর নির্ভর না করে এই সাবমেরিন অনির্দিষ্ট কাল জলের তলায় থাকতে পারে। কেবল যাত্রীদের খাদ্য ও অক্সিজেনের সরবরাহ করাই হলো এর একমাত্র সমস্যা। এদিক থেকেও শ্যাওলা নিয়ে গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

রাত্রি-অন্ধতা সম্বন্ধে গবেষণা

রাত্রি-অন্ধতার কারণ ও তা নিরাময়ের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ই. ডাউলিং প্রমুখ কয়েক জন বিজ্ঞানী এ-ভিটামিনের অভাব ঘটলে দেহে এবং বিশেষ করে চোখের ভিতর কি কি পরিবর্তন ঘটে, সে সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। এ-ভিটা-মিনের অভাবেই রাত্রি-অন্ধতা রোগ জন্মে বলে জানা আছে।

তাঁরা দেখেছেন যে, ইঁদুরকে ভিটামিন-এ বর্জিত খাদ্য দিলে ওরা প্রথমে লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন-এ ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু লিভারের সঞ্চিত ভিটামিনের পরিমাণ সকলের সমান না হওয়ায় কারও ক্ষেত্রে রাত্রি-অন্ধতার লক্ষণ কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা দেয়, আবার কারুর ক্ষেত্রে কয়েক বছরও লেগে যায়। লিভারের ভিটামিন নিঃশেষ হয়ে যাবার অল্প দিন পরেই দেহের রক্ত ভিটামিন-শূন্য হয়ে পড়ে। এর পর থেকেই রেটিনার রঞ্জক পদার্থ কমতে থাকে; কারণ ভিটামিন ছাড়া এই রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন হয় না।

প্রথম দিকে রঞ্জক পদার্থ কমতে থাকলেও তার মধ্যস্থিত প্রোটিন অংশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ এই ভাবে থাকবার পর প্রোটিন অংশটির ভাঙ্গন ধরে। এই সময়ে ভিটামিন প্রয়োগ করলে তন্তুগুলি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে আরম্ভ করে। কিন্তু রেটিনার তন্তুগুলির ভাঙ্গন আরম্ভ হয়ে গেলে ভিটামিন প্রয়োগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে অনেক দেরী লাগে।

তবে ভিটামিন-এ প্রকৃতপক্ষে কি উপায়ে এই পরিবর্তন ঘটায়, সে সম্বন্ধে কেউই এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারেন না।

দেহের বিপাক-ক্রিয়া মন্দীভূতকরণ

ইউনাইটেড স্টেট্সের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কতিপয় বিজ্ঞানী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন যে, ডয়টিরিয়াম-ঘটিত ভারী জল ইঁদুরদের অধিক পরিমাণে খাওয়ালে তাদের দেহের বিপাক-ক্রিয়া মন্দীভূত হয়ে যায়। তবে সারা দেহের জলের ভাগ অপেক্ষা যদি ভারী জল শতকরা ৩০ ভাগ অতিক্রম করে তবে ইঁদুরগুলি মরে যায়। কিন্তু তা শতকরা ২৪ ভাগ রাখলে তাদের দেহের কোন বিকার লক্ষিত হয় না।

সাধারণ জলের মধ্যেই অতি সামান্য পরিমাণে ভারী জল আছে। এর মধ্যে সাধারণ হাইড্রোজেনের বদলে দুটি ডয়টিরিয়ামের পরমাণু বর্তমান। পার-

মাণবিক শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রে ভারী জলের দ্বারা নিউট্রন কণিকাগুলির গতি মন্দীভূত করা হয়ে থাকে। বর্তমান পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারী জল বিশেষ কাজে লাগবে। জীবদেহে ক্যান্সার কোষগুলি অতিদ্রুত বর্ধনশীল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ক্যান্সারের ন্যায় বর্ধনশীল কোষের বৃদ্ধিও ভারী জলের প্রভাবে কমে যেতে পারে। এক পরীক্ষায় তাঁরা কতকগুলি ইঁদুরের দেহে ক্যান্সার-কোষ সংযোগ করে তাদের ভারী জল খাওয়াতে থাকেন। এতে দেখা যায়—যে ইঁদুরগুলি সাধারণ জল পান করে তাদের অপেক্ষা এদের দেহে ক্যান্সারের বৃদ্ধি অনেক কম।

আরও একটি বিষয়ে প্রাণী-দেহে ভারী জল ব্যবহারের সুযোগ আছে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। কতকগুলি ওষুধ দেহের ভিতরে কাজ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে রোগীকে ভারী জল পান করাতে থাকলে তার দেহের বিপাক-ক্রিয়া মন্দীভূত হয়ে যায়। এর ফলে ওষুধটির দ্বারা কাজ হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

উত্তাপ প্রয়োগে সরাসরি বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন

পিট্‌স্‌বার্গের এক খবরে প্রকাশ যে, পটারি ও ইট তৈরীর মাল-মসলা ব্যবহার করে উত্তাপের দ্বারা সরাসরি বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন করবার এক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

কোনও রূপ ঘূর্ণীয়মান বা গতিশীল যন্ত্র ব্যবহার না করে কেবল উপরিউক্ত মাল-মসলার সাহায্যে ছোট ছোট বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র নির্মিত হতে পারে। কেবল উত্তাপ দিলেই এ থেকে কার্যকরী বৈদ্যুতিক-শক্তি পাওয়া যাবে। ক্ষেপণাস্ত্র ও কৃত্রিম উপগ্রহে এই যন্ত্র সহজেই বসানো যাবে। ওয়েষ্টিং হাউস রিসার্চ লেবোরেটরির অধ্যক্ষ ডাঃ সি. জেনার থার্মো-ইলেকট্রিসিটি সংক্রান্ত এক সভায় উত্তাপ থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করবার উপযোগী পদার্থের এক বিবরণ দেন। ঐ সব পদার্থ উত্তপ্ত হলেই তা থেকে কাজে লাগাবার মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে।

পূর্বে উত্তাপ প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে সব দ্রব্য ব্যবহৃত হতো, তার তুলনায় এই নব আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির ব্যবহারে অনেক সুবিধা আছে। এগুলি খুবই সাধারণ পদার্থ—নিকেল এবং ম্যাঙ্গানিজঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলিকে ব্যবহার করবার জন্যে নিখুঁত-ভাবে পরিশোধনের দরকার নেই এবং এর জন্যে বায়ুশূন্য আধার বা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয় না।

এক্স-রে পরীক্ষায় আয়ুক্ষয়

বার্লিংটনের ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেসের এক খবরে প্রকাশ যে, রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্যে এক্স-রে পরীক্ষার বিশেষ দরকার হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোগীর পরমায়ুও কিছু ক্ষয় পায়।

ডাঃ কার্টিস এবং ডাঃ ক্রস বলেন, এটা যে কি কারণে ঘটে, সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নি। কারণ দৃশ্যতঃ কোনরূপ অসুস্থতা বা কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায় না।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানবদেহে প্রত্যেক রয়েণ্টগেন এক্স-রে বিকিরণের ফলে ১২ দিন করে পরমায়ু কমে যায়। রয়েণ্টগেন হলো এক্স-রে বিকিরণের মাত্রার পরিমাপ। এক এক বার এক্স-রে পরীক্ষায় শরীরের উপর কতিপয় রয়েণ্টগেন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জীবন রক্ষার জন্যে বা তাহার জীবন-কাল বাড়াবার জন্যে এক্স-রে পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁরা বলেন যে, রোগীর পক্ষে এক্স-রে'র মাত্রা

এবং তার উপকারিতা ও বিপত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সচেতন থাকা উচিত।

বিলাতে অনেক জুতার দোকানে নিখুঁতভাবে মাপ নেবার জন্যে ফ্লুয়োস্কোপের ব্যবস্থায় পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এই ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটা ক্রেতাদের পক্ষে বিপজ্জনক এবং দোকানদারের পক্ষে আরও বেশী ক্ষতিকর; কারণ তার শরীরে প্রত্যহ অনেক পরিমাণে এক্স-রে'র বিকিরণ লাগে।

ডাঃ কার্টিস ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানুষের উপরও অনুরূপ ফল হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বলেন—জন্তুদের দেহে এক্স-রে বিকিরণের ফল বিচিত্র। জন্তুগুলির স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন বুঝা যায় না; অথচ যতই এক্স-রে বিকিরণ লাগে ততই তাদের পরমায়ু কমে যায়। আর এক বিচিত্র ব্যাপার এই যে, অল্প মাত্রায় অধিকক্ষণ স্থায়ী বিকিরণের ফলে আয়ুক্ষয় হয় না।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
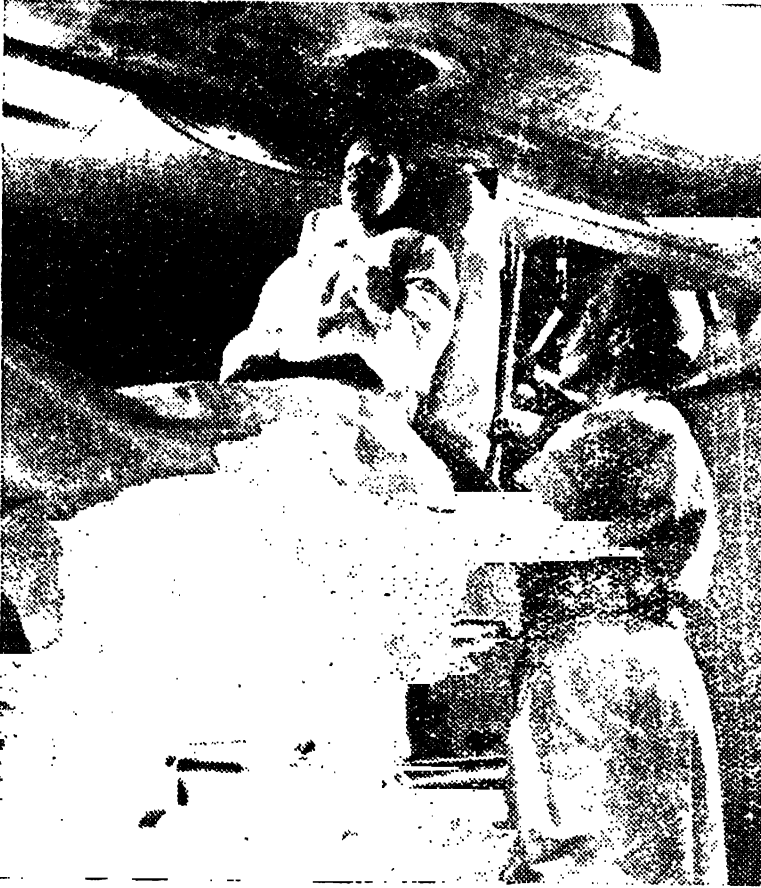
চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা, রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে খুব সুফল পাওয়া গেছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল করা সম্ভব হয়েছে। ছবিতে বোষ্টনে অবস্থিত ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজিতে মস্তিষ্কের টিউমার রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে।

প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাচ

শ্রীপার্থসারথি সেন

চশমার কাচ কবে ও কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং কে তার আবিষ্কর্তা, সে কথা জানা যায় নি। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব ২২৮৩ সালে চীন সম্রাট শিলা-পাথর, কাচ, টোপাজ প্রভৃতি দিয়ে লেন্স তৈরী করে তার সাহায্যে আকাশের নক্ষত্রাদি দেখতেন। ঋষি কনফুসিয়াসের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালে তিনি এক মুচীকে চশমা তৈরী করে দিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু এমন কোন কথা জানা যায় নি যা থেকে মনে করা যায় যে, তিনি কাচ শিল্পের বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকেফহাল ছিলেন। হয়তো তিনি এটুকু জানতেন যে, বিশেষ ধরণের কাচের সাহায্য নিলে স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা ভালভাবে দেখতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো চীনদেশে গিয়ে দেখেছিলেন—সেখানকার লোকেরা খুব ছোট ছোট লেখা পড়বার জন্যে কাচ ব্যবহার করে। সেকালে চীনারা যে কাচ ব্যবহার করতো সেগুলি ছিল ডিম্বাকৃতি। চশমার ফ্রেম শিং-এর হাড় দিয়ে তৈরী করা হতো। নাকের উপর চশমার যে অংশ থাকতো, সেখানে একটা কব্জা তৈরী করা হতো যাতে খুশীমত চশমা খুলে ভাঁজ করে রাখা যেতে পারে। গ্রীক এবং রোমানরা আগুন জ্বালাবার জন্যে মোটা কাচ ব্যবহার করতো। মোম দেওয়া টেবিল থেকে লেখা মুছে ফেলবার জন্যে অথবা শত্রুর জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে ঐ ধরণের কাচ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩৮৫ অব্দের পূর্বে নাট্যকার অ্যারিষ্টোফেনিস আগুন ধরানো কাচের উল্লেখ করেছেন। ৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সেনেকা দেখেছিলেন যে, জলপূর্ণ কাচ-গোলকের ভিতর দিয়ে তাকালে অক্ষরগুলি বেশ বড় ও পরিষ্কার দেখায়। চশমার ইতিহাসে রোজার বেকনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গবেষণা করে বললেন যে, ক্ষীণদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে দেখবার কাচ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে মিঃ গিল্ড আধুনিক পদ্ধতিতে চশমা প্রস্তুত করেন। তখনকার দিনে তৈরী-করা চশমা রাস্তায় বিক্রী করা হতো।

চশমা-প্রস্তুতকারীরা নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর সুদক্ষ শিল্পী। প্রাচীনকালে এরা বিভিন্ন ধরণের সৌখিন চশমা তৈরী করে ধনীদের কাছে বিক্রী করতো। চশমা পরা তখন একটা ফ্যাসান বলে মনে করা হতো। ধনীরা পাল্লা দিয়ে নানাপ্রকার সৌখিন চশমা পরে গর্ব অনুভব করতেন।

গোড়াতে চশমার কাচ ছিল গোলাকৃতির। চশমার ফ্রেমের সঙ্গে পিন দিয়ে কাচ আটকে কাচির মত ছড়িয়ে পড়া হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে চশমার ধরণ পাল্টে গেল। এই সময় থেকে চশমাকে নাকের উপর ধরে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। এই চশমাকে বলা হতো Nose-pinchers। এরপর Spy-glass নামে নতুন এক ধরণের চশমার প্রচলন হয়। এতে একটি মাত্র কাচ থাকতো এবং কাচের সঙ্গে ঝোলানো থাকতো একটি সরু চেন। এই চেন ঘাড়ের চারপাশে জড়িয়ে রাখা হতো। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরণের চশমার প্রচলন হয়। এত রকম আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিহীনতা দূর করবার জন্যে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে অনেকেই চশমা নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে নি।

সান-গ্লাস—১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সবুজ রঙের কাচ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সর্বপ্রথম সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কাচের প্রচলন হয়। তখন সূর্যের তাপ থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে রঙীন কাচ ব্যবহার করা হতো। তীব্র আলো চোখকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে বরফের গা থেকে প্রতিফলিত সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মি লেগে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং রোগ সারতে দীর্ঘসময় লাগে। অতি-বেগুনী রশ্মির প্রভাবে কর্ণিয়া বা অচ্ছোদপটোলের কিছু সংখ্যক কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই রোগকে Snow-blindness বলে।

পর্বত-আরোহণকারী এবং যাদের চোখের ছানি অস্ত্র করা হয়েছে, তারা সবাই এক বিশেষ ধরণের চক্ষুরোগে ভোগে। চোখের ছানি অস্ত্র করবার পর প্রত্যেকেই প্রথমে বেশ কয়েক দিন সব জিনিষকেই বেগুনী দেখে। পর্বত-আরোহণ-কারীদের অনেকের চোখ বরফ থেকে প্রতিফলিত অতি-বেগুনী রশ্মি প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারাও অনেক সময় সব জিনিষ বেগুনী দেখে। এই রোগকে Erythropia বলা হয়। এই রোগে চোখের সামনে কখনো যাতে জোরালো আলো না পড়ে, তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। Snow-blindness দূর করবার জন্যে এস্কিমোরা বহু যুগ ধরে কাঠ অথবা শিলের হাড় বা দাঁত দিয়ে তৈরী নৌকার মত বাঁকানো গগল্‌স্ পড়তো। এর মধ্যে সরু এবং লম্বা করে এক ফালি অংশ কেটে নেওয়া হতো। এই গগল্‌স্ চামড়ার দড়ি দিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো। উজ্জ্বল আলো থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে এই প্রথায় ট্যারাদের চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পরে এই ধারণা পাল্‌টে যায়। তখনই সর্বপ্রথম কাচের প্রিজম ব্যবহার করে চোখের ঐ বিশেষ রোগ সারানোর চেষ্টা হয়।

চোখ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে অনেক সময় রঙীন কাচ ব্যবহার করা চলতে পারে, কিন্তু চিরদিন ঐ ধরণের কাচ ব্যবহার করা যুক্তি-সঙ্গত নয়। আজকাল বহু কলকারখানায় বিভিন্ন ধরণের চোখ-ঝল্‌সানো আলোর মধ্যে অনেকের কাজ করতে হয়। লোহার যন্ত্রপাতি মেরামত করবার কারখানায় অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের আলো চোখের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করে। চোখ ধাঁধানো আলোর হাত থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে আজকাল Soft-Lite নামে নতুন এক ধরণের কাচ বেরিয়েছে। এই কাচের চশমা পড়লে আলো অনেকটা স্নিগ্ধ বলে মনে হয়। এই কাচের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এ আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। কারখানার বাইরে এ-ধরণের কাচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাইফোক্যাল লেন্স—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বাইফোক্যাল কাচ আবিষ্কার করেন। বেঞ্জামিনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু বাইফোক্যাল কাচ বেরিয়েছে, কিন্তু বর্তমানের জমানো এবং একখানি কাচের তৈরী বাইফোক্যাল লেন্স ও Cemented wafer নামে কাচ সব চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগেকার এবং আজকের দিনের বাইফোক্যাল কাচের তফাৎ অনেক। আকৃতি ও স্থায়িত্বে আজকালকার কাচ আগেকার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। আধুনিক বাইফোক্যাল লেন্স সাধারণ কাচের মতই দেখতে। হঠাৎ দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, কাচটি বাইফোক্যাল কিনা। তিনটি—এমন কি, চারটি বিভিন্ন দিক এক সঙ্গে দেখবার জন্যে ট্রাইফোক্যাল, কোয়াড্রুফোক্যাল কাচ তৈরী করা হচ্ছে। ট্রাইফোক্যাল লেন্সের সুবিধার কথা বলছি। মনে করুন, কোন ঘড়ি-বিক্রেতা যদি ট্রাইফোক্যাল কাচের চশমা পড়ে থাকে তাহলে সে একই সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন কাজ করতে পারবে। সে কাচের নীচের

অংশ দিয়ে ঘড়ির সূক্ষ্ম মেরামতের কাজ করতে পারবে, কাচের মাঝখানের অংশ দিয়ে পাশের টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র তুলে নিতে পারবে এবং কাচের উপরের অংশ দিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো খদ্দেরকে দেখে ডাকতে পারবে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সর্বাঙ্গসুন্দর চশমার কাচ ব্যবহার করা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হেল্‌মহোল্‌ৎস্ অপথ্যালমোস্কোপ নামে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে চোখের ভিতরের অংশ, বিশেষভাবে রেটিনা ভাল ভাবে পরীক্ষা করা যায়।

চশমার শ্রেণী বিভাগ ও ব্যবহার—একশ' বছর আগেও চশমা কেনা বেশ কৌতুকপ্রদ ছিল। দোকানে অনেকগুলি কাচ লাগানো চশমা থাকতো। ক্রেতা তার পছন্দ মত যে কোন একটি চশমা ক্রয় করতো। আজও এমন অনেককে দেখা যায়, যারা সস্তার দোকান থেকে পছন্দমত তৈরী চশমা কিনে নেয়।

কিন্তু চশমা কেনা কাজটি মোটেই সহজ নয়। চিকিৎসকের নির্দেশ মত উপযুক্ত কাচ এবং বেশ শক্ত ফ্রেম কেনা উচিত। চশমাটিকে নাকের উপর এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে চশমার কাচ চোখ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর পর্যন্ত চশমার ফ্রেম শিং থকে তৈরী করবার রীতি প্রচলিত ছিল। তার পরে সোনার ফ্রেম লাগানো চশমা চালু হয়। আজকাল হয়তো সোনার দুর্মূল্যতার জন্যে চশমার ফ্রেম আগেকার মত জন্তুর শিং থেকে তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া প্লাষ্টিক দিয়ে শেল তৈরী করা হচ্ছে এবং এই শেল দিয়ে চশমার ফ্রেম তৈরী করা হয়।

প্রাচীন ও বর্তমান কালের চশমার কাচের ধরণ ও প্রস্তুত-প্রণালীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাধারণতঃ পাঁচ রকমের চশমা ও চশমার কাচের প্রচলন আছে; যথা—

১। সব সময়ের জন্যে পরে থাকবার চশমা।

যারা কাছের বা দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখতে পায় না অথবা যাদের রেটিনা রোগগ্রস্ত, তারা সবাই সর্বক্ষণ চশমা পরে থাকতে চিকিৎসক কর্তৃক আদিষ্ট হয়।

২। শিশুদের ট্যাঁরা ভাব সারিয়ে তোলবার জন্যে বিশেষ ধরণের চশমা।

৩। অধিক বয়স্কদের দূরের জিনিষ দেখবার জন্যে চশমা।

৪। কাছের কাজ করবার জন্যে চশমা।

৫। বাইফোক্যাল কাচের চশমা।

যাদের এক চোখ দিয়ে দেখতে হয় তাদের চশমার কাচ এবং ফ্রেম বিশেষভাবে তৈরী করা হয় এবং চশমাধারী যে কোন সময় তার খুশীমত চশমার কাচ ঘোরাতে পারে।

পূর্ববর্ণিত প্রথম চার ধরণের কাচের মধ্যে সাধারণ কাচ বা Plane glass চ্যাপ্‌টা হয় এবং দামেও বেশ সস্তা। তাছাড়া এই ধরণের কাচ চশমার বাক্স ছাড়া যে কোন জায়গাতে রাখা চলে, অথচ কাচের গায়ে কোন দাগ পড়ে না।

Toric শ্রেণীর কাচ—এই কাচ দিয়ে অনেকটা জায়গা এক সঙ্গে দেখা যায়। কিন্তু সামনের দিকে বাঁকানো থাকায় সহজেই কাচের গায়ে কাটা দাগ লাগে। তাছাড়া এই ধরণের কাচে আলোর প্রতিফলনের জন্যে অনেক সময় বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কণ্টাক্ট লেন্স—বিশেষ কয়েকটি চক্ষুরোগে সাধারণ চশমার কাচ ব্যবহার করে কোন উপকার পাওয়া যায় না। সে সব ক্ষেত্রে চোখের কর্ণিয়ার উপর বসানো যেতে পারে, এরূপ ধরণের কাচের প্রয়োজন। খুব পাত্‌লা কয়েকটি কাচের পাত্‌ একসঙ্গে অথবা প্লাষ্টিকের খুব পাত্‌লা পাত্‌ চোখের পাতার ভিতর দিক দিয়ে কর্ণিয়ার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কথাটা বলা যত সহজ কাজটি তত সহজ নয়। লবণাক্ত পদার্থ দিয়ে এই কাচটিকে

কর্ণিয়া থেকে একটু পৃথক করে লাগিয়ে রাখা হয়। একবার লাগাতে পারলে দীর্ঘদিন বেশ আরামে থাকা চলে। রোগীর চোখের কর্ণিয়া, কাচ এবং চোখের মধ্যেকার তরল পদার্থের ঘনত্ব এক। কাজেই আলোক রেখা বাতাস থেকে কাচের মধ্যে ঢোকবার সময়ে মাত্র বেঁকে যায়। এ-ধরণের কাচ ক্ষতিগ্রস্ত কর্ণিয়ার পক্ষে খুবই ভাল। কারণ আলো প্রথমেই কাচের উপর পড়ে; সেহেতু কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও আলোক রেখার কোন পরিবর্তন হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় চশমা এবং চশমার কাচের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। চশমার জন্যে যে ধরণের কাচ ব্যবহার করা হয়, সেই কাচ প্রিজম, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির লেন্সের চেয়ে ভিন্ন রকমের। বর্তমানে পঁচিশ রকমের কাচ তৈরী করা হচ্ছে। এ-থেকেই বুঝতে পারা যায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ থেকে আমরা কতদূর এগিয়ে এসেছি।
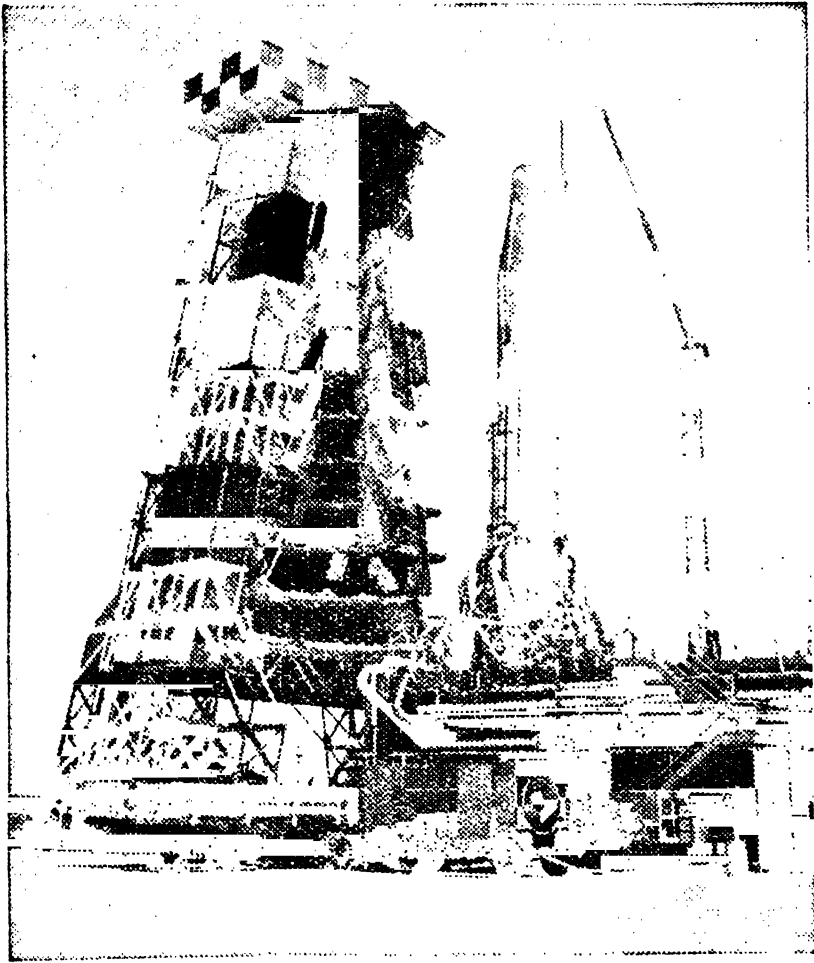
ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অন্তরীপে নির্মিত ৭৫ ফুট উঁচু একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাটলাস্‌কে মহাকাশে নিক্ষেপের পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি চলছে।

পারমাণবিক শক্তি

শ্রীকমলেশ মজুমদার

পারমাণবিক শক্তি কথাটার প্রকৃত সংজ্ঞা হইল পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি। এক মৌলিকের পরমাণু যখন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি নূতন মৌলিক পরমাণু সৃষ্টি করে, ঠিক সেই মুহূর্তে নির্গত তেজ বা শক্তিকে পারমাণবিক শক্তি বলা হয়। রেডিয়াম হইতে ক্রমাগত তাপ-শক্তি বিকিরিত হইবার পরেও ইহার ওজনের উল্লেখযোগ্য তারতম্য না হওয়ার কুরী দম্পতী স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, ইহার পরমাণু প্রভূত শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। রাদারফোর্ড আরও উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া কুরী দম্পতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। রাদারফোর্ড তেজষ্ক্রিয় পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ কণিকার সংখ্যা গণনা করিয়াছিলেন। ক্রমাগত তেজ বিকিরিত হইবার ফলে পরমাণুর ভরের যে তারতম্য হইয়াছিল তাহা অতি নগণ্য। এই অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁহার আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে, ভর এবং শক্তি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি বলিলেন যে, পরমাণু হইতে শক্তি বিচ্ছুরিত হইলে সেই শক্তির অনুপাতে পরমাণুর ভর হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে পদার্থ বা বস্তু হইতেছে শক্তি।

আইনষ্টাইনের সূত্র অনুসারে $E=mc^2$ এখানে m=লুপ্ত বস্তুর ভর। c=সেন্টিমিটার বা মাইল সেকেণ্ডের মাপে আলোকের গতি; E=শক্তি। আলোকের গতি যদি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হয় তাহা হইলে উপরিউক্ত সমীকরণ অনুসারে উৎপন্ন শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা করিতে পারি। এক আউন্স পরিমাণ পদার্থ হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা দিয়া এক মিলিয়ন টন জল বাষ্পে পরিণত করা যায়।

এক গ্র্যাম পরিমাণে কোন পদার্থ যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তবে তাহা হইতে শক্তি পাওয়া যাইবে ৯×১০^২০ আর্গ।

১৯৩২ সালে ক্যাভেণ্ডিস পরীক্ষাগারে ককক্রফ্ট ও ওয়ালটন প্রোটনকে প্রায় আট লক্ষ বিভবযুক্ত করিবার কাজে ব্যস্ত। তখন শ্যাডউইক নিউট্রনের অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের ভর প্রায় প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু ইহার কোন তড়িৎ-শক্তি নাই। তড়িৎ-শক্তি না থাকায় পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া নূতন মৌলিক পদার্থে পরিণত করিবার ক্ষমতা নিউট্রনের আছে।

এইবার পারমাণবিক শক্তির উৎসের কথা বলা যাউক। ইউরেনিয়াম ধাতু পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের আদি উৎস। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অটো হ্যান ও ষ্ট্রাসম্যান পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আরো ভারী পরমাণুতে পরিণত করা যায় না বটে, কিন্তু ইহাদিগকে অসমান খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। বৈজ্ঞানিক ফ্রিস্ এই পরমাণু-বিভাজনের নাম দেন 'নিউক্লিয়ার ফিসন্'।

জোলিও কুরী গবেষণার ফলে প্রমাণ করেন যে, নিউট্রন যখন ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে তখন তাহা হইতে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন নামে দুইটি নূতন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় এবং আরও নিউট্রন নির্গত হয়। এই নিউট্রন অন্যান্য ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া আরও নূতন নিউট্রনের সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রতিবারেই নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নূতন নূতন ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার ফলে প্রভূত পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি উদ্ভূত হয়। এই

পদ্ধতিকে বলা হয়, শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া বা চেন রিয়্যাক্সন।

প্রতিটি নিউট্রন যদি খুব দ্রুত বিভাজন ঘটাইতে পারে তাহা হইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়। ১০০০ টন কয়লা পোড়াইলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, ১ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম হইতে সেইরূপ শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে; অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ইউরেনিয়ামকে যদি নিউট্রন দিয়া আঘাত করা যায় তবে তাহা হইতে এককোটি কিলোওয়াট ঘণ্টার শক্তি নির্গত হইবে।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ধাতু বেশ জটিল প্রকৃতির। ইহার তিন প্রকারের আইসোটোপ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫, ইউ-২৩৪ পরমাণু।

তৃতীয়টির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। প্রথম দুইটি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরস্পর মিশিয়া আছে। এই অনুপাত ১৩৯ : ১। দেখা গিয়াছে যে, প্রায় প্রতি ১৩৮৫৬ ইউ-২৩৮ পরমাণুর সঙ্গে ১৪২টা ইউ-২৩৫ পরমাণু এবং একটা ইউ-২৩৪ পরমাণু থাকে।

ইউ-২৩৮ এবং ইউ-২৩৫, এই দুই প্রধান আই-সোটোপের সঙ্গে নিউট্রনের ব্যবহার বিভিন্ন প্রকৃতির। নিউট্রন অতি সহজেই ইউ-২৩৫ আইসোটোপের ফিসন ঘটাইতে পারে; অর্থাৎ একটা নিউট্রন ইউ-২৩৫-কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তিনটি নিউট্রন এবং পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি করে। এক তাল ইউ-২৩৫ পরমাণু দ্বারা তৈয়ারী ধাতুপিণ্ড এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে প্রায় ত্রিশ হাজার টন টি-এন-টি'র বিস্ফোরণের সমান শক্তির তাপ এবং তেজরূপে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি এই আইসোটোপের তাল ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে নিউট্রন ইহার গাত্রের বহির্ভাগ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যায় এবং সুসংবদ্ধ শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হয় না। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার জন্য এই তালের ন্যূনতম পরিমাপ হওয়া উচিত একটি ক্রিকেট বলের মত।

ইউরেনিয়াম অক্সাইডের কতকগুলি তাল এবং ছয় টন ইউরেনিয়াম ধাতু বিশুদ্ধ কার্বনের মধ্যে জাফরির আকারে সাজাইয়া প্রায় গোলাকার একটি পদার্থে পরিণত করা হয়। ইহার নাম 'পাইল'। ইউরেনিয়ামের দণ্ডগুলি হইতে নির্গত দ্রুতগতি-সম্পন্ন নিউট্রন কার্বনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কার্বন অ্যাটমের সহিত সংঘর্ষে ইহাদের গতিবেগ মন্দীভূত হয়। মন্দগতি নিউট্রন ইউ-২৩৫কে আঘাত করিয়া ফিসন সৃষ্টি করে। ফিসনের হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গেলে শৃঙ্খল-ক্রিয়া স্থাপিত হয়। ইউরেনিয়ামের শৃঙ্খল-ক্রিয়ার নানাবিধ সর্ত আছে। একটি হইতেছে, ফিসন হইতে উদ্ভূত নিউট্রন এমন শক্তিশালী হওয়া উচিত যাহাতে সে আর একটি ফিসন সৃষ্টি করিতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ধীরে কোন প্রকারেই হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহার কোনটিতেই শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হয় না।

খনিজ ইউরেনিয়ামে ইউ-২৩৮ পরমাণুর (আইসোটোপ) পরিমাণ ইউ-২৩৫ হইতে বেশী থাকে বলিয়া ফিসন সৃষ্টিতে বাধা দেয়। সেহেতু চেন রিয়্যাক্সন চালু রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসরণ করা হয়।

(ক) রিয়্যাক্সনের জন্য ইউ-২৩৫-এর মাত্রা বাড়ান উচিত। কিন্তু তাহার জন্য ইউ ২৩৫ আই-সোটোপগুলিকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করিতে হয়।

ফিসনের গতি আয়ত্তে রাখিবার জন্য মডারেটর ব্যবহার করিতে হয়। ইউ-২৩৮ পরমাণু চেন রিয়্যাক্সনের গতি হ্রাস করিতে পারে বলা হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় 'নিউট্রন-ট্র্যাপ' তৈয়ারী হইয়া ফিসনের গতি হ্রাস করে। ফিসনে উদ্ভূত নিউট্রন মডারেটরের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে শক্তি হারাইয়া ফেলে। মডারেটর এমন বস্তু হওয়া উচিত, যাহা সহজে নিউট্রনকে

শোষণ করিতে না পারে। ইহার কাজ হওয়া উচিত দ্রুতগতির নিউট্রনকে মন্দগতিসম্পন্ন করা। যে বস্তুর হাল্‌কা নিউক্লিয়াস আছে, সেই বস্তুই মডারেটর হইবার উপযুক্ত। এই প্রকৃতির পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন ও কার্বনের নাম করা যায়।

ইহাদের মধ্যে লিথিয়াম ও বোরন হাল্কা ধরণের নিউট্রন শোষণ করিতে পারে। কাজেই ইহা ব্যবহারের অযোগ্য। হিলিয়াম বায়বীয় পদার্থ। কাজেই তাহাকেও সহজে ব্যবহার করা যায় না। বেরিলিয়াম দিয়া ফিসন সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। হাইড্রোজেন এবং ভারী হাইড্রোজেন উভয়কেই মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু হাইড্রোজেন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারে অসুবিধা আছে। কার্বন যেমন অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায় তেমন ইহার দ্বারা কাজও খুব ভাল হয়। কাজেই কার্বনকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'পাইল' তৈয়ারী করা হইয়াছিল। সেখানে চেন-রিয়্যাক্‌শনের কাজও খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু ইহা হইতে উদ্ভূত পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাহা দিয়া একটা সিগারেট লাইটারকে জ্বালান গেল না। এই পরীক্ষার পরে টেনিসির অন্তর্গত ওকরিজে এক বিরাটাকার 'ইউরেনিয়াম-কার্বন' পাইল তৈয়ারী করা হয়। এই পাইলে ১০০০ অশ্বশক্তি পরিমাপের পারমাণবিক শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে ইউ-২৩৫-এর পরিমাণ শতকরা ০·৭ ভাগ এবং অন্যান্য আইসোটোপ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা খুবই কষ্টকর। এমন কি, ইউ-২৩৫ আইসোটোপের কয়েক পাউণ্ড মাত্র সংগ্রহ করাও গুরুতর ব্যয়সাধ্য। কিন্তু ইউ-২৩৮ আইসোটোপ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃতি ২৩৫ অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও অনেক মূল্যবান। যদি একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রকে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ইহা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে ৯২-ইউরেনিয়াম-২৩৯ নামক এক তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করে। নবোদ্ভূত তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক অবিলম্বে ভাঙিয়া গিয়া নূতন একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। নবতম তেজস্ক্রিয় পদার্থটির নাম নেপচুনিয়াম। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা এবং পারমাণবিক ভর ২৩৯। নেপচুনিয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া প্লুটোনিয়াম নামে নূতন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা ৯৪। এই দুইটি পদার্থকে ট্র্যান্স-ইউরেনিক মৌলিক পদার্থ বলা হয়। ফিসনের সময় বিটা-কণিকা এবং গামা-রশ্মি বাহির হয়। নীচে উদাহরণ দেওয়া গেল।

৯২-ইউ-২৩৮ + নিউট্রন → ৯২-ইউ-২৩৯ + গামা-রশ্মি

৯২-ইউ-২৩৯ → ৯৩-নেপচুনিয়াম-২৩৯ + বিটা-কণিকা

নেপচুনিয়াম → প্লুটোনিয়াম + বিটা-কণিকা + গামা-রশ্মি

প্লুটোনিয়াম পরিশেষে নিজদেহ হইতে আল্‌ফা কণিকা বিকিরণ করিয়া ইউ-২৩৫ পরমাণুতে পরিণত হয় এবং মন্দগতিসম্পন্ন নিউট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষে ফিসন সৃষ্টি করে এবং নিউট্রন মুক্ত করে।

প্লুটোনিয়ামের শৃঙ্খল-ক্রিয়া ইউরেনিয়ামের শৃঙ্খল-ক্রিয়ার সমতুল্য। সেহেতু পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা সম্ভব।

এস্থলে ইউ-২৩৫ পরমাণুর ফিসনের একটি ছক দেওয়া হইল।
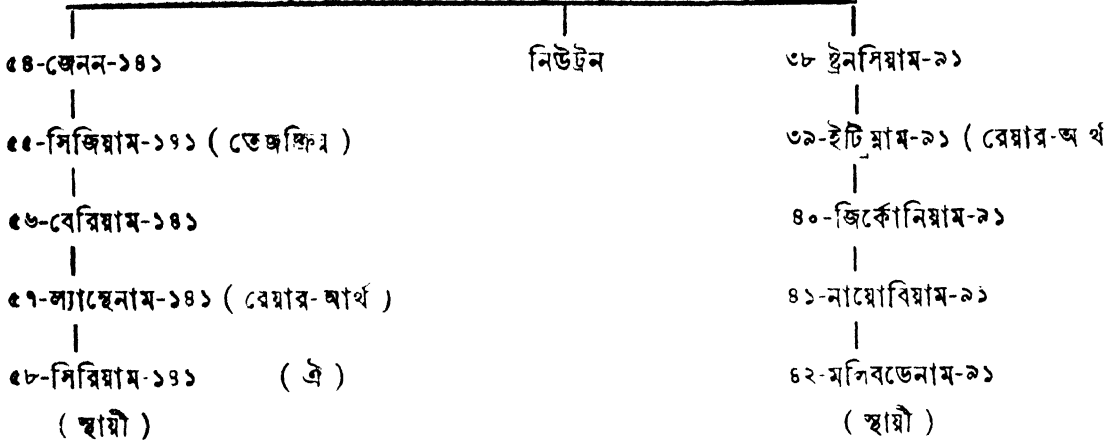
উভয় স্থান হইতে বিটা কণিকা বহির্গত হয়।

একটি নিউট্রন ইউ-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রবেশ করিয়া যে পরিবর্তন ঘটায় তাহারও একটি ছক দেওয়া হইল।

নিউট্রন→ইউ-২৩৫ = বেরিয়াম-১৩৭+
ক্রিপ্‌টন-৮৩+২ নিউট্রন+২০০,০০০,০০০
ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি।

পারমাণবিক শক্তির প্রথম ব্যবহার পারমাণবিকবোমা। পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। পারমাণবিক শক্তি এবং কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উভয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাসায়নিক গবেষণা এবং কৃষি-বিজ্ঞানে অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিতেছে। ইহা ছাড়া চেন-রিয়্যাকশনে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাহা জ্বালানী হিসাবে কয়লা, তেল, কাঠ প্রভৃতির সমতুল্য।

পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের হিতার্থে ব্যবহার করিলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
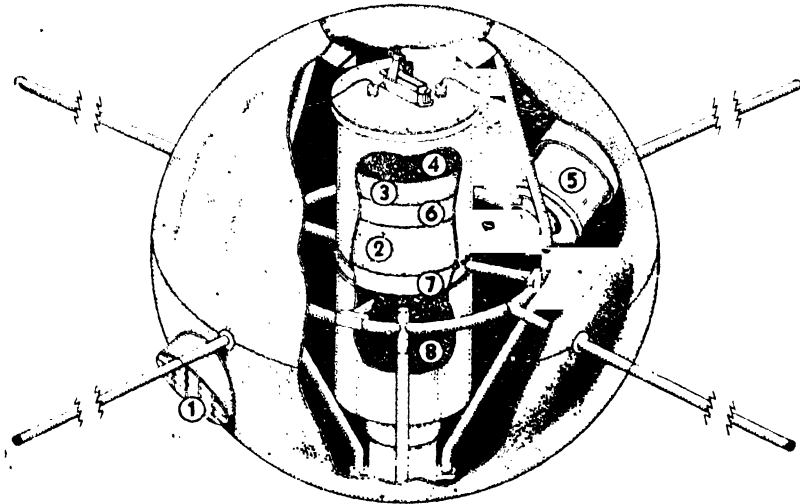
যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড-২-এর আভ্যন্তরীণ নক্সা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। ১। ফটোসেল লাইটশীল্ড। ২। রেকর্ডার। ৩। ইনটারোগেসন রেডিও রিসিভার। ৪। মিটিওরোলজিক্যাল ডেটা ট্র্যান্সমিটার। ৫। ফটো সেল। ৬। ডেটাইলেক্‌ট্রনিক্‌স্‌। ৭। ট্র্যাকিং ট্র্যান্সমিটার। ৮। মার্কারি সেল ব্যাটারি।

সঞ্চয়ন

কুষ্ঠরোগের নূতন ঔষধ

কুষ্ঠরোগের নতুন ঔষধ সম্পর্কে জন এইচ. নীল লিখিয়াছেন—বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা কুষ্ঠরোগের এক-প্রকার নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে এই দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার সময় অনেক কমাইয়া ফেলা সম্ভব হইবে। ঔষধটির কথা ঘোষণা করিবার পূর্বে পূর্ব-নাইজেরিয়ায় বহু কুষ্ঠরোগীর উপর দুই বৎসর ধরিয়া ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

বৃটেনের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর ভেষজ বিভাগের গবেষণা-কর্মীরা এই নূতন ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছেন। ঔষধটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'এটিশুল'। গবেষণাগারে ইহার গুণাগুণ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইবার পর ১৯৫৭ সালে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষ বিমানযোগে উজুয়াকোলির (পূর্ব-নাইজেরিয়া) নাইজেরীয় কুষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ টি. এফ. ডেভির নিকট ঔষধটি প্রেরণ করেন। সম্প্রতি টোকিওতে অনুষ্ঠিত ৭ম আন্তর্জাতিক কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা সম্মেলনে ঔষধটির কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন।

এটিশুলের একটি প্রধান গুণ হইল এই যে, ইহা রোগীর চর্মের উপর ঘষিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং তাহাতেই বেশ কাজ দেয়। বস্তুতঃপক্ষে এটিশুলই হইল একমাত্র জীবাণুনাশক ঔষধ যাহা এইভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োগ করিবার পর সারা দেহের ভিতরে গিয়া কাজ করে। ঔষধটির প্রয়োগ অতি সহজ বলিয়া রোগী নিতান্ত অকর্মণ্য না হইলে নিজেই দেহের রোগাক্রান্ত স্থানে ইহা ঘষিয়া দিতে পারে। ইহার কিছুটা মনস্তাত্বিক সুফলও আছে।

এটিশুল ব্যবহারের দ্বারা রোগীদের কুষ্ঠাশ্রমে অবস্থানের সময় অনেক কমানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে যে সকল চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাতে রোগীদের অনেক সময় দুই বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখিতে হয়। তাহার পূর্বে তাহাদের নিরাপদে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু এই নূতন ঔষধটি ব্যবহার করিলে তাহাদের তিন মাসের বেশী কুষ্ঠাশ্রমে রাখিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য তিন মাসে যে তাহাদের রোগ সারিয়া যাইবে তাহা নয়। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, তিন মাস পরে তাহারা আর অপরের বিপদের কারণ হইয়া থাকিবে না এবং সকলের সহিত তাহারা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করিতে পারিবে।

চিকিৎসক এবং দেশের শাসনকর্তারা এই নূতন ঔষধটির আবিষ্কারে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আশান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, আর সামান্য কিছু বেশী ব্যয় করিলেই বর্তমানে যে কুষ্ঠাশ্রমগুলি আছে, সেগুলিতে এখনকার তুলনায় প্রতি বৎসর অনেক অধিক সংখ্যক কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে।

দীর্ঘকাল পরিবার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে, এই আশঙ্কায় ইতিপূর্বে বহু রোগী নিতান্ত বাধ্য না হইলে কুষ্ঠাশ্রমে আসিতে রাজী হইত না। এখন এই নূতন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে অনেক রোগী স্বেচ্ছায় চিকিৎসার জন্য আগাইয়া আসিবে এবং রোগের বাড়াবাড়ি হইবার আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ইহা রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই ভাল।

কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার

লবণ হয়তো মানুষের সবচেয়ে পরিচিত পণ্য—মানুষের নানা কাহিনী ও কুসংস্কারের সঙ্গে যে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা স্বীকার করতেই হবে। শরীরের জন্যে লবণের প্রয়োজনীয়তা বহু যুগ ধরে উপলব্ধি করা হয়েছে। এর ফলে লবণের সাহায্যে বন্ধুত্ব রক্ষার প্রথার উদ্ভব হয়; সৃষ্টি হয় "নিজের লবণের যোগ্য হওয়া"র মত প্রবাদের। ইতিহাসে লবণ, বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়েছে। বাণিজ্যে তা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রোমান সৈন্যদের বেতন দেওয়া হতো লবণ দিয়ে। বেতনের ইংরেজী শব্দ 'স্যালারি' রোমান শব্দ 'স্যালারিয়াম' (লবণ মুদ্রা) থেকে এসেছে।

আধুনিক কালে লবণ—কেমিষ্টের ভাষায় সোডিয়াম ক্লোরাইড শিল্পের মূল কাঁচা মাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ লবণের অধিকাংশ পরিমাণই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সোডা অ্যাশ (সোডিয়াম কার্বনেট), কষ্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড), ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম সালফেটের মত ভারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাবান, তেল, রঞ্জক দ্রব্য, চামড়া, কাপড়, কাচ, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতিতেও লবণের যথেষ্ট প্রয়োজন। বিশুদ্ধ অবস্থায় লবণ খাদ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সহ ৬২টি বড় শিল্পে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিল্পের ক্ষেত্রে লবণ এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে বলেই আজ লবণ, সালফিউরিক অ্যাসিড ও ইস্পাতের উৎপাদন ও ব্যবহার দিয়ে একটা জাতির সমৃদ্ধির পরিমাপ করা হয়। ১৯৫০ সালে ভারতে মাথাপিছু লবণ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৯ পাউণ্ড। তখন বিশ্বে গড়পড়তা মাথাপিছু ৪০ পাউণ্ড লবণ ব্যবহৃত হতো। সেই বছরে সারা বিশ্বে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টন লবণ উৎপাদিত হয়েছিল, ভারতে তৈরী হয়েছিল ৩১ লক্ষ টন।

অতীতে কর্তৃপক্ষ লবণ-শিল্পকে প্রধানতঃ রাজস্ব সংগ্রহের উপায় বলে মনে করতেন। এই শুল্ক আদায়ের জন্যে কঠোর নিয়মকানুন তৈরী হয়েছিল, কিন্তু লবণের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। আবার উৎপাদনের পরিমাণও আমাদের চাহিদার উপযোগী ছিল না।

এর ফলে ভারতের লবণের চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রত্যেক বছর কয়েক লক্ষ টন লবণ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। ১৯৫০ সালে পর্যন্ত তা চলে এসেছে। ভারতের সাড়ে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ উপকূল ভাগে লবণ উৎপাদনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লবণের জন্যে আমাদের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর লবণ-শিল্প সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। এই শিল্প যাতে অনতিকালের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা পায়, সে জন্যে চেষ্টা করা হয়।

লবণ ও লবণ-শিল্পের উপজাত দ্রব্য—যার দিকে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি—ব্যবহার করবার জন্যে ব্যাপক গবেষণা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এজন্যেই শিল্প ও বিজ্ঞান পরিষদ ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভবনগরে কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার স্থাপন করেন।

এই গবেষণাগার নানা বিষয়ে গবেষণা সুরু করে। যেমন—গৃহে ও শিল্পে প্রয়োজনীয় লবণের মান নির্ধারণ, কম ব্যয়ে 'বিটার্ন' (লবণাক্ত জল থেকে লবণ ক্রিষ্ট্যাল বের করে নেবার পর অবশিষ্ট তরল পদার্থ) থেকে নানা মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশনের পদ্ধতি উদ্ভাবন, লবণ ও তার উপজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য বাণিজ্যিক হারে ব্যবহারের জন্যে উপায় নির্ধারণ।

ভারতে উৎপাদিত লবণের সত্তর শতাংশ হলো সমুদ্রের দান। সমুদ্রের লবণ বের করে নেবার পর যে তরল পদার্থ পড়ে থাকে তাতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও পটাসিয়াম থাকে। তাছাড়া ব্রোমিন পাবার একমাত্র উপায় হলো সেই তরল পদার্থ।

কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে সস্তায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড ও ব্রোমিন নিষ্কাশনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। পটাসিয়াম ক্লোরাইড নিষ্কাশনের যে পদ্ধতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কম ব্যয়ে এই মূল্যবান রাসায়নিক সার উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ভারতে উৎপাদিত লবণের ত্রিশ শতাংশ রাজস্থানের প্রাচীন সম্বর হ্রদ থেকে পাওয়া যায়। সম্বর হ্রদের 'বিটার্নে' দুটি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য, সোডিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম কার্বনেট প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু সম্বর হ্রদের জল থেকে সেগুলি নিষ্কাশন করতে গিয়ে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ভারত সরকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করেন। গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ এই অসুবিধা দূর করবার পদ্ধতি এখন আবিষ্কার করেছেন।

সম্বর হ্রদের জলে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের অস্তিত্ব লবণ উৎপাদনের আর একটি বাধা। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কাঁচা মালের রং ও গন্ধ দুটিই দূর করা সম্ভব হয়েছে। ফলে আরও বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

লবণের নমুনা দ্রুত ও সস্তায় পরীক্ষার পদ্ধতিও এই গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাজারে সাধারণতঃ যে টেব্‌ল্‌ সল্ট পাওয়া যায় তার কতকগুলি দোষ আছে। এগুলি গবেষণাগারে সযত্নে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং লবণ যাতে ডেলা পাকিয়ে না যায়, সে জন্যে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতির জন্যে পেটেন্টও নেওয়া হয়েছে। লবণ যাতে ডেলা পাকিয়ে না যায় সে জন্যে এর ক্রিষ্ট্যালগুলিকে গোলাকার এবং আর্দ্রতা নিরোধক করা হয়।

ম্যাগ্‌নেসিয়ামবিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যগুলি শিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। গবেষণাগারে অক্সিক্লোরাইড সিমেন্টের মেঝের টালি নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঔষধপত্র, রবার, কাগজ ও অন্যান্য শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর এপ্‌সম সল্ট উৎপাদনের পদ্ধতিও এই গবেষণাগারে উদ্ভাবিত হয়েছে।

উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে এই গবেষণাগারে কার্যসূচী রচিত হয়। ভারতের লবণ-শিল্প যাতে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে, এই গবেষণাগার সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

আখের ছিব্‌ড়া হইতে কাগজ ও প্লাষ্টিক

আখের ছিব্‌ড়াকে আজ উন্নত রাষ্ট্রসমূহে নানাভাবে কাজে লাগানো হইতেছে। আমেরিকার নিউ অরলিন্‌স্‌-এর আশেপাশে চিনির বড় বড় কারখানা রহিয়াছে। পূর্বে এই ছিব্‌ড়া পোড়াইয়া ঐ সকল কারখানা চালাইবার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইত এবং এই ভাবে ছিব্‌ড়ার বহু অপচয় হইত। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আখের পরিত্যক্তাংশকে কাজে

লাগাইবার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই গবেষণার ফলে ১৯২১ সালে একপ্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ রোধক বা ইনস্যুলেটিং বোর্ড প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সেলোটেক্স কর্পোরেশন নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই জিনিষটি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত করিবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষিদপ্তরের দুইটি গবেষণাগারে যে গবেষণা চালানো হইয়াছিল তাহার ফলে ১৯৩২ সালে ছিব্ড়া হইতে প্লাষ্টিক উৎপাদন করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। কাগজ প্রস্তুতিতেই আখের ছিব্ড়ার সর্বাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ছিব্ড়া হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিবার পন্থা ১৮৭৯ সালের প্রথমভাগে আবিষ্কৃত হইলেও ১৯৩৬ সালের পূর্বে ছিব্ড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার কাজে কেহ আত্মনিয়োগ করেন নাই। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দরুণ ছিব্ড়ার মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার খরচ, কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুতের খরচের তুলনায় ভবিষ্যতে যে কম পড়িবে, সে সম্পর্কে অনেকেই অবহিত ছিলেন। কাজেই ছিব্ড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল। ১৯৩৭ সালে লুই-জিয়ানার চিনি উৎপাদক ক্লাব বলিলেন যে, দশ বৎসরে যে পরিমাণ শুষ্ক আঁশের কাঠ পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ ও তাহার তুলনায় অধিকতর শুষ্ক আঁশের ছিব্ড়া এক বৎসরেই পাওয়া যাইতে পারে। ১৯৫৩ সালে ভ্যালাইট কর্পোরেশন নামে (ব্যালেন-টাইন পাল্প অ্যাণ্ড পেপার কোম্পানীর শাখা) একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লুইজিয়ানার লকপোর্টে আখের ছিব্ড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানার বর্তমান কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ২৫০০০ টনেরও বেশী।

ইহার পর এই প্রকার কাগজের অনেক উন্নতি হইয়াছে। লিখিবার পরিষ্কার সাদা কাগজও এখন আখের ছিব্ড়া হইতে প্রস্তুত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাতা, জলপাত্র প্রভৃতি এই কাগজ হইতে তৈয়ার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি সংবাদপত্রের নিউজপ্রিণ্টও এই কারখানা হইতে সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাজেও এই কারখানায় প্রস্তুত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী নিউ অরলিয়ন্সের বিপরীত দিকে অবস্থিত ম্যারেরোতে সেলোটেক্স কর্পোরেশনের যে বিরাট কাগজের কারখানা আছে তাহাতে আখের ছিব্ড়া হইতে এক ধরণের বোর্ড তৈয়ার করা হইতেছে। বিশেষ করিয়া প্রেক্ষাগৃহ ও বেতার ও বেতারবীক্ষণের স্টুডিওসমূহে এইসব বোর্ড ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল বোর্ড ভেদ করিয়া বাহির হইতে কোন শব্দ আসিতে পারে না। রেঁস্তোরা, বৈঠকখানা প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগ নির্মাণেও এই সকল বোর্ড ব্যবহার করা হইতেছে।

তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ছিব্ড়াকে প্লাষ্টিকে পরিণত করিবার ব্যাপারটি সর্বাধিক লাভজনক হইয়াছে। ইহাকে রজনে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই সকল রজন দ্বারা গ্রামোফোন রেকর্ড এবং রজন হইতে প্রস্তুত প্লাষ্টিকের সাহায্যে নানা রকম বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, পাখার ব্লেড, বোতলের ছিপি, কেট্‌লির হাতল প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়।

আখের ছিব্ড়াকে কংক্রীটের রাস্তা তৈয়ার করিবার কাজেও লাগানো হয়। তাপজনিত সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে রাস্তার যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তদুদ্দেশ্যে দুইটি কংক্রীট খণ্ডের মাঝখানে ছিব্ড়া হইতে প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্য আলকাত্‌রার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা হয়।

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে আখ প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেই সকল স্থানে কি ছিব্ড়াকে আরও সস্তায় উন্নততর শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের কাজে প্রয়োগ করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভ্যালেনটাইন পাল্প

অ্যাণ্ড কোম্পানীর একজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ড. এল. পাওয়েল বলিয়াছেন যে, ইহা প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কাঠ অথবা অন্যান্য দ্রব্যের মণ্ড হইতে দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার খরচ ছিব্‌ড়ার মণ্ড হইতে তৈয়ার করিবার খরচের তুলনায় কতখানি লাভজনক হইবে, তাহার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ ছিব্‌ড়া পাওয়া যায় তাহার তুলনায় ছয়গুণ বেশী ছিবড়া পাওয়া যায় ভারতে। তবে ভারতে বাঁশ ও সাবাই ঘাসের মণ্ড হইতে ইহার তুলনায় আরও সস্তায় কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে।

তবে নিরক্ষবৃত্ত এলাকার যে সকল অঞ্চলে কাঠের মণ্ডের অভাব রহিয়াছে, অথচ প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানেই আখের ছিব্‌ড়াকে লাভজনকভাবে কাগজ উৎপাদনের কাজে লাগানো যাইতে পারে।

পরমাণু-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কতখানি উন্নতি হবে, সে সম্পর্কে শিল্প-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ দু-জন আমেরিকান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পরমাণু-বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতির ফলে সেদিন আমেরিকাবাসীরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনে বসবাস করবেন, গৃহিণীরা একটি বোতাম-টিপে রান্নাবান্নার কাজ সারবেন। আর জনসাধারণ জেট-চালিত বাস ও রেলগাড়ী, পরমাণু-শক্তিচালিত বিমান ও সাবমেরিনে যাতায়াত করবেন।

সম্প্রতি আটলাণ্টিক সিটিতে পরমাণু সম্পর্কে যে জাতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় সাতশ' ছাত্রছাত্রী যোগদান করে-ছিলেন। এই অধিবেশনেই জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর পরমাণু সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ফ্রান্সিস কে. ম্যাকিউন এবং ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট চার্লস্ এইচ. উইভার এই কথা বলেন।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা পরমাণু যুগের প্রথম দিকে কৃষি, ভেষজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে যে সব উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে এখানে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্যে বর্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে পারে, তাদের নমুনা ও পরিকল্পনা এতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০০০ খৃষ্টাব্দের পরমাণু-বিজ্ঞান সমৃদ্ধির যুগে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পর্কে ম্যাকিউন এবং উইভার বলেন যে, সেদিন জন-সাধারণ জেট-চালিত বাস ও রেলগাড়ীতে যাতায়াত করবে। তখন চাকার বদলে ব্যবহার করা হবে স্লাইড। আর সে সব গাড়ী ঘণ্টায় দুশ' মাইল বেগে চলবে।

ঐ সময়ে তিন প্রকার যানবাহন চালু হবে। প্রথমতঃ বিদ্যুৎ-শক্তিচালিত যান। এই সব গাড়ীর রিচার্জিং করতে হবে না। বিনা চার্জিং-এ এই সব গাড়ী আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করতে পারবে। আর এক রকম গাড়ী চালিত হবে ইণ্টারন্যাল কম্বাসশন ইঞ্জিন-এর সাহায্যে। যান্ত্রিক দিক থেকে এই সব গাড়ীও প্রায় বিদ্যুৎ-শক্তিচালিত গাড়ীর মতই হবে। রাজপথে চলবার সময়ে এদের গতি ও পথ নিয়ন্ত্রণের

যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া যেখানে সেখানে ওঠা-নামা করা ও সোজাসুজি আকাশে ওঠবার মত একরকম আকাশচারী যানও সেদিন চালিত হবে। এ সব আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে যাবে না। এরা যাবে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই যানবাহন প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন হলেও কোন ভয় থাকবে না, নিরাপদেই ভ্রমণ করা যাবে।

ম্যাকিউন এবং উইভার উভয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই পরমাণু-শক্তি-চালিত প্রথম বিমান বিনা ইন্ধনেই ছয় বার পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে পারবে।

তাছাড়া পরমাণু-শক্তিচালিত অসামরিক সাব-মেরিনসমূহও ১৯৮৫ সালের মধ্যেই চালু হবে। এসব যাত্রী ও মালবাহী সাবমেরিন ৫০ থেকে ৬০ নট গতিতে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যাতায়াত করবে। তখন থেকে পৃথিবীর বহু পরিমাণ পণ্যই ঐ ভাবে পরিবাহিত হবে।

পারমাণবিক শক্তিচালিত মহাশূন্যগামী আর একপ্রকার যান নির্মাণের কাজকর্মও ২০০০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হবে বলে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই সব যান ঘণ্টায় ১০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করবে। এই সকল মহাশূন্যগামী যান ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রীদের মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে দেবে। প্রচণ্ড-বেগে এই পথ অতিক্রম করতে বিমান-যাত্রীদের আদৌ কোন কষ্ট পেতে হবে না।

তাঁরা দু-জনেই বলেছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাই যে ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে, তা নয়। তবে ঐ সময়ে পরমাণুর সংযোজনের দ্বারা তাপ উৎপাদনের সব কৌশল মানুষের অধিগত হবে, ন্যায়সঙ্গত খরচে মানুষ সৌরশক্তিকেও কাজে লাগাতে পারবে। তবে সমুদ্রের নোনা জলকে সস্তায় ও প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু জলে পরিণত করবার কৌশল আয়ত্ত করতে আরও কিছু সময় লাগবে।

রোচেষ্টার নিউইয়র্কের গ্যাস অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রবার্ট, ই, গিনা তরুণ বিজ্ঞানীদের বলেছেন যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ-শক্তির শতকরা ২৫ ভাগই পরমাণু-শক্তি থেকে উৎপাদন করা হবে।

তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ কারখানাসমূহ মোট ১৫ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু ১৯৮০ সালের মধ্যে ৬০ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হবে। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী ১১ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে তিনশ' পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত খরচে সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছে।

নিউইয়র্কের ইথাকাস্থিত কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশন বায়োলজী লেবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ সাইরিল এ. কোমার বলেন যে, আগামী কালে কৃষি-সমস্যা সমাধানে পরমাণু-শক্তি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এজন্যে পৃথিবীর সব দেশেই কৃষি-পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন হবে।

নিউইয়র্কের স্লোন কেটারিং ইনষ্টিটিউটের ডাঃ জন এস. লাফলন বলেন যে, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষেত্রে আইসোটোপ প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে।

আর্গন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ডাঃ ফ্রাঙ্ক ই. মায়ার্স তরুণ বিজ্ঞানীদের বলেছেন যে. আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং পৃথিবীর জনসংখ্যা তখন ৮০০ কোটিতে এসে দাঁড়াবে। এই অবস্থায় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সমাজ-সেবার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে এবং সুযোগের ক্ষেত্রও অনেকখানি সম্প্রসারিত হবে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সেমিওনভের নতুন তত্ত্ব

গত মার্চ মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত মেণ্ডেলিভীয় কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে বহু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য নিকোলাই সেমিওনভ-এর নতুন তত্ত্বটি অত্যধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ১৮ই মার্চ বিজ্ঞানাচার্য তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রদান করেন। তত্ত্বটি হচ্ছে, মুক্ত পরমাণুর রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন-বিজ্ঞানের বহু জরুরী সমস্যার সমাধান সম্ভব হলো; সম্ভব হলো বস্তু ও তার গঠনের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র খুঁজে বের করা।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস অধিবেশনে সেমিওনভ-এর গবেষণা খুবই আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই নতুন তত্ত্বে মুক্ত পরমাণু ও অণুর মধ্যের যোগসূত্র সম্পর্কে সাধারণ নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলকারখানায় রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণের বাস্তব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলো। তিনি বলেছেন, প্রস্তাবিত পদ্ধতি প্রয়োগে কেবল মাত্র তাপমাত্রা অনুধাবন করেই বিক্রিয়াশীল পরমাণু ও অণুর শক্তি নিরূপণ সম্ভব। এতে হিসাব-নিকাশের কাজ খুবই সহজ হয়ে যাবে। বিভিন্ন ধরণের ৭০টি বিক্রিয়ার উপর এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ হয়েছে।

বিশ্ববিজ্ঞানে নিকোলাই সেমিওনভের নাম আজ আর অজানা নয়। রাসায়নিক-পদার্থবিদ্যা নামে রসায়ন-বিজ্ঞানের নতুন মুখ্য শাখাটির তিনি হচ্ছেন উদ্ভাবক। নিরবচ্ছিন্ন এবং শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নিরবচ্ছিন্ন বিক্রিয়ায় তত্ত্বের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই তত্ত্বের দ্বারা অধিকাংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই ব্যাখ্যা সম্ভব। বিজ্ঞানাচার্য সেমিওনভ বলেছেন যে, উচ্চস্তরের স্থায়ী ও সুগ্রাহী চৌম্বক অনুবাদক যন্ত্রের সাহায্যে কোন কোন অণুসমষ্টি বা পলিমারের অত্যদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যে সব পলিমারের অণুতে অর্ধপরিবাহীর ধর্ম প্রকাশমান, তাদের সংশ্লেষণ করাও সম্ভব হয়েছে।

এসব ধর্ম বা লক্ষণগুলিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানাচার্য অবশ্য কিছু বলতে চান নি। কিন্তু তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, সব ব্যাপারটাই অতীব অপ্রত্যাশিত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এসব লক্ষণের প্রকাশ নাইট্রোজেনের অণুগুলির মধ্যে কোনও প্রকার ধাতুর অবস্থিতি এবং অণুগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষ এক ধরণের গ্রন্থির অস্তিত্বই সূচিত করে।

বিজ্ঞানাচার্যের এই নতুন তত্ত্ব পর্যালোচনায় একটি বড় অংশই জুড়ে ছিল মুক্ত অণু, তথা রাসায়নিকভাবে ক্রিয়াশীল সেই সব তলানি যা রাসায়নিক ও জৈব বিক্রিয়ায়, বিশেষভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিক্রিয়ায় তাদের ধর্ম বা লক্ষণ বর্ণনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তারপরে সেমিওনভ আলোচনা করেন, ক্যান্সার বা কর্কট রোগের রাসায়নিক উৎপত্তি নিয়ে যিনি দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন, সেই আচার্য নিকোলাই ইম্যানুয়েল এবং সজীব তন্তুসমূহের মধ্যে ধাতু ও অ্যান্টি-ফেরোম্যাগ্‌নেটিকের সমতুল্য ধর্ম বা লক্ষণের আবিষ্কর্তা লেভ্‌ ব্লুমেনফিল্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে।

রাসায়নিক গতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলিকে বিজ্ঞানাচার্য সেমিওনভ একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান বলে দাবী করেন।

সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য

মানুষ যেদিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে, সেই দিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—সে এলো কোথা থেকে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্ট-বস্তুগুলির সম্পর্কই বা কি? বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরদানে কতদূর সাহায্য করতে পারে তা দেখা যাক।

স্পষ্টতঃই একটি প্রাণী আর একটি প্রাণী থেকে জন্মায়। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদেরও একটি আদিপুরুষ ছিল। এখন প্রশ্ন ওঠে—এই আদিপুরুষ এলো কোথা থেকে? এটা নিশ্চিতরূপেই ধরতে হবে যে, এই আদিপুরুষ পৃথিবীরই একটা কিছু থেকে এসেছিল, হঠাৎ শূন্য থেকে আমদানী হয় নি। সুতরাং মানুষের এই আদিপুরুষেরও নিশ্চয়ই একটা পূর্বপুরুষ ছিল।

ডারুইন তাঁর বিবর্তনবাদের সমর্থনে দেখিয়েছেন যে, মানুষের এই পূর্বপুরুষ হলো বনমানুষ জাতীয় জীব। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, বনমানুষ আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এভাবে নিম্নস্তর থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হওয়ার ফলে সকল জীবের মূল উৎপত্তি স্থল দাঁড়ায় এককোষী আদিম প্রাণীতে। এই এককোষী প্রাণীর ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের ফলে এত প্রকার বহুকোষী জীবের উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতিতে এককোষী প্রাণীর নিকটবর্তী সৃষ্টি হলো এককোষী উদ্ভিদ, যারা জীবাণু নামে পরিচিত। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই এককোষী উদ্ভিদাণু থেকেই বিবর্তনের ধারায় একদিকে উদ্ভিদ-জগৎ এবং অপরদিকে প্রাণী-জগতের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—এই এককোষী উদ্ভিদ এলো কোথা থেকে? কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। নিম্নে সেই তথ্যগুলির কয়েকটির কথা বলা হলো।

প্রথমতঃ, জন্মের পর প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধির কথা ধরা যাক। প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় আহার্য বস্তু দেহসাৎ করবার ফলে। এই আহার্য বস্তু হলো জড় পদার্থ। এই জড় পদার্থ প্রাণবস্তের দেহের মধ্যে কোন অদ্ভুত প্রক্রিয়ার ফলে জীবন্তদেহের বৃদ্ধি সাধন করে; অর্থাৎ জড় পদার্থই দৈহিক পরিপুষ্টি সাধন করে—জীবদেহের চেতনা অব্যাহত রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পরে যে দেহটি পড়ে থাকে, সেটা একটা জড় পদার্থ, যার সঙ্গে জীবন্ত দেহের একমাত্র প্রাণশক্তির অভাব ব্যতীত আর কোন পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হয় না।

তৃতীয়তঃ, এমন অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, যাদের জীবনক্রিয়া এতই স্তিমিত যে, সেগুলি জড় কি চেতন, তা বুঝাই যায় না। সুতরাং জড়ের জড়ত্ব ও জীবের জীবনক্রিয়ার মধ্যেও সৃষ্টির একটা ক্রমবিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী শীতকালে ভেক প্রভৃতি জীব জড়বৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, প্রাণক্রিয়ার কোনও লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হয় না। এথেকে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনে জীবনক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ, দেখা গেছে যে, যখন কোন জড় পদার্থ অতি সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হয় তখন কণাগুলি একপ্রকার গতিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রাউনিয়ান সঞ্চরণ বলা হয়। অর্থাৎ বিশেষ

বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থে চেতন পদার্থের কোন কোন গুণ প্রকাশ পায়।

ষষ্ঠতঃ, বর্তমানে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ তেজসমূহই জৈব পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম। পরীক্ষাগারে ও শিল্পে সাধারণ শক্তিসমূহের প্রয়োগে বর্তমানে বহু জটিল জৈব পদার্থের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সরল জড় পদার্থগুলির মধ্যে অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তেজ প্রয়োগ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালবুমিন উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই অ্যালবুমিন জীবদেহের একটি মূল উপাদান। এথেকে আমরা মনে করতে পারি যে, পৃথিবীর আদিম যুগের এককালে যখন উচ্চতাপ এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফূরণ হতো, তখন এরূপ প্রক্রিয়ার ফলেই হয়তো একটা জটিল জৈব পদার্থের উৎপত্তি ঘটেছিল, যা আবার প্রাকৃতিক বিভিন্ন তেজের ঘাত-প্রতিঘাতে চেতন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সপ্তমতঃ, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, যাবতীয় সৃষ্টির উদ্ভবই হয়েছে এক মূলের দিক থেকে। সুতরাং উদ্ভিদ ও জড় সৃষ্টির মধ্যে যে একটা মূলগত সংযোগ আছে, সেকথা যুক্তিযুক্তভাবেই অনুমান করা যায়। কাজেই একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, জড় সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ফলেই উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। উপরের তথ্যগুলিও এই ধারণাকে সমর্থন করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, জড় পদার্থের উদ্ভব হলো কেমন করে? বিজ্ঞানের যেসব তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে তাথেকে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। রসায়ন-বিজ্ঞান দেখিয়েছে, বিশ্বের যাবতীয় জড় পদার্থই হলো কতকগুলি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ অথবা যৌগিক পদার্থ। আজ পর্যন্ত প্রায় ৯৩টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বের অগণিত জড় পদার্থ এই ৯৩টি মৌলিক পদার্থ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই মৌলিক পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলি প্রত্যেকেই অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। আবার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলি এক বা একাধিক প্রোটন ও ইলেকট্রন কণিকার সাহায্যে তৈরী। প্রোটন কণিকা ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি এবং ইলেকট্রন কণিকা ঋণাত্মক তড়িৎ-শক্তি সমন্বিত। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন এবং অন্যান্য পরমাণুগুলিতে একাধিক প্রোটন ও ইলেকট্রন কণিকা দেখা যায়। তাছাড়া সেগুলির মধ্যে নিউট্রন নামে আর একপ্রকার কণিকাও দেখা যায়। নিউট্রন কণিকাগুলি প্রোটন কণিকার মতই কিন্তু তড়িৎ-শক্তিবিহীন। প্রত্যেক মৌলিক পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী হয়ে থাকে; সেজন্যে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, অন্য সব মৌলিক পরমাণুই একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণুর বিশেষ প্রকার সংযোগে সৃষ্ট। সুতরাং বলা যায় যে, হাইড্রোজেনই যাবতীয় জড় পদার্থের মূল।

এই হাইড্রোজেন আবার কিভাবে উৎপন্ন হলো, দেখা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাইড্রোজেন পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন কণিকার দ্বারা তৈরী হয়েছে। তন্মধ্যে প্রোটন কণিকাটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় সবটা ভর ধারণ করেও ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন এবং ইলেকট্রন কণিকা ভরবিহীন ও ঋণাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ ইলেকট্রন কণিকাটি একটি ভরবিহীন তেজোময় কণিকা। সুতরাং এখানে আমরা পদার্থের একটি চতুর্থ রূপ দেখতে পাই। সেটা হলো ঘনীভূত তেজোময় রূপ। এ থেকে বলতে পারা যায় যে, তেজই ঘনীভূত রূপ নিয়ে পদার্থে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে তেজের ক্রম-পরিণতির ফলে। বর্তমানে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী বৈজ্ঞানিকদের যে গবেষণা চলছে তাতে এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হচ্ছে যে, তেজই পদার্থে পরিণত হয় এবং পদার্থও আবার তেজে

পরিণত হতে পারে। সুতরাং তেজ থেকে পদার্থের উদ্ভব হয়েছে—এ-কথা যুক্তিযুক্তভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

এই তেজ কেমন করে উদ্ভূত হলো দেখা যাক। তেজের বিনাশ নেই, কিন্তু রূপান্তর আছে। যদি ধরা যায় যে, তড়িৎ-শক্তি বা তেজই পদার্থে পরিণত হয়েছে তাহলে প্রশ্ন আসে—তড়িৎ-তেজের উদ্ভব হলো কোথা থেকে? একথা বলা যায় যে, এটা অপর একজাতীয় তেজের রূপান্তরণের ফলে হয়েছে। ধরা যাক, সেই তেজ হলো চৌম্বক তেজ। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, এক তেজ, অর্থাৎ তড়িৎ-তেজ অপর তেজ, অর্থাৎ চৌম্বক তেজে পরিণত হবার কালে প্রথম তেজটি ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, যা একটা নির্গুণ অবস্থা, অর্থাৎ প্রথম তেজও নয় দ্বিতীয় তেজও নয়। এই নির্গুণ অবস্থায় আসবার পর অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী তেজটি অপর একটি গুণযুক্ত তেজে পরিণত হয়। সুতরাং বলা চলে যে, সব রকম তেজের মূল উৎস হলো এই নির্গুণ তেজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে—এই নির্গুণ তেজের উৎস কি? যেহেতু তেজের মোট পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না, সেহেতু এর কোন উৎপত্তি স্থল থাকতে পারে না। কেন না, সেরূপ ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সৃষ্টির ফলে এর মোট পরিমাণের বৃদ্ধি দেখা যেত। কাজেই এই নির্গুণ তেজকে স্বয়ম্ভূ ও সৃষ্টির মূল বলা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, নির্গুণ তেজ থেকে সগুণ তেজ, সগুণ তেজ থেকে জড় পদার্থ, জড় পদার্থ থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে মনুষ্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন আসে, নির্গুণ তেজ যদি নির্গুণই হয় তবে কাজ করে কেমন করে, আর পরিবর্তনই বা হয় কি করে? এর কারণ হলো, তেজের এই নির্গুণত্ব গুণের একেবারে অভাব নয়, পারস্পরিক বিপরীত গুণের সমতার ফলেই এই নির্গুণত্ব। এই বৈপরীত্য হলো ঋণাত্মক ও ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তির মধ্যের বৈপরীত্যের মত। তেজ হিসাবে তা একই, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে তারা পরস্পর বিপরীতমুখী। একই সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণের অবস্থান কষ্টকল্পিত বলে মনে হতে পারে; কিন্তু বাস্তব জগতে এর উদাহরণ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় চুম্বকের মধ্যে। একটি চুম্বক পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এর প্রান্তদেশ দুটি বিপরীত-ধর্মী চুম্বকত্ববিশিষ্ট, যথা—উত্তর-সন্ধানী চুম্বকত্ব এবং দক্ষিণ-সন্ধানী চুম্বকত্ব। কিন্তু চুম্বকের মধ্যাংশটি চুম্বকশক্তি বর্জিত। কিন্তু মধ্যস্থলের এই চৌম্বক শক্তিহীনতা চৌম্বক শক্তির অভাবের ফলে ঘটে নি। এই চৌম্বক শক্তিহীনতার কারণ হলো, সেস্থানে দুটি পরস্পর বিরোধী চৌম্বক শক্তির সমতা। সেটা আমরা দেখতে পাই চুম্বকটির ঠিক মধ্যস্থলে ভেঙে দু-খণ্ড করলে। তখন দেখা যাবে, ভগ্ন স্থানের একদিকে দক্ষিণ-সন্ধানী ও অপরদিকে উত্তর-সন্ধানী চৌম্বক শক্তি রয়েছে।

পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছুরই দুটি অংশ দেখা যায়; যেমন—পদার্থ এবং তন্মধ্যস্থ তেজ। আমরা জানি যে, পদার্থ হলো তেজেরই এক ঘনীভূত রূপ। সুতরাং সৃষ্টির সব কিছুকেই তেজের এক একটি বিকশিত রূপ বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি সৃষ্টিই হলো নির্গুণ তেজ ও তার বিপরীত সগুণ তেজের সমাবেশযুক্ত এক একটি আধার বা সীমায়িত রূপ মাত্র। এই সগুণ তেজই দৃশ্যবস্তুর গুণ, প্রকৃতি বা স্বভাব রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। পরস্পর বিরোধী তেজের সমতার ফলে যে নির্গুণ অবস্থা, তাই সৃষ্টির রূপ বা গঠনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা
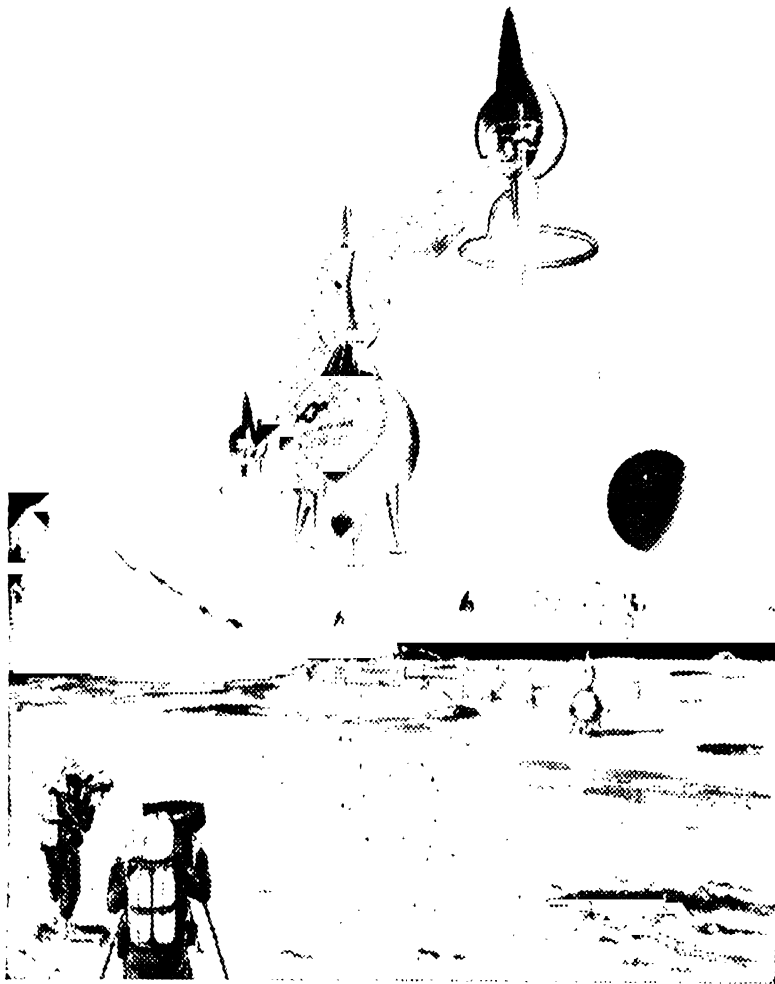
কয়েকজন আরোহীসহ চন্দ্রের পৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য অধুনা পরিকল্পিত অভিনব আকাশ-যানের নমুনা। পারমাণবিক শক্তি ও তড়িৎ-বিভবযুক্ত আয়নের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র এই আকাশ-যান পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতেছে।

জলহস্তী

কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটা পুকুরের মধ্যে তোমরা হিপো বা জলহস্তী দেখে থাকবে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিৎ এরা। অনেকে বলে থাকেন জলহস্তী ভয়ঙ্কর জন্তু, এদের সামনে পড়লে বাঁচবার কোন উপায়ই থাকে না। ওদের মধ্যে অনেকে দুর্দান্ত প্রকৃতির বটে, তবে সাধারণতঃ জলহস্তীরা খুবই শান্তিপ্রিয়। পুরুষেরা স্ত্রী-জানোয়ারদের চেয়ে ওজনে, আয়তনে সবদিকেই বেশ বড়। লম্বায় এরা ১১ থেকে ১৪ ফুটের মধ্যে এবং ওজন ৫০০০ থেকে ৮০০০ পাউণ্ডেরও বেশী হতে পারে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানাতে ৮,৯৬০ পাউণ্ড ওজনের পুরুষ জলহস্তী দেখা গেছে। বিরাট আকারের জলহস্তীদের মাথার দিকটা অদ্ভুত ধরণের। মোটা মাথাটাই ওজনে প্রায় এক টন।

এদের চোখ দুটি যেন মাথার উপর আল্‌তোভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত বিরাট দেহ অথচ কান দুটি এতই ছোট যে, দেখে অবাক হতে হয়। উত্তেজনার সময় কান দুটি সামনে ও পিছনে দুলতে থাকে। একটি কান যখন সামনের দিকে এগিয়ে আসে অপরটি তখন পিছনের দিকে যায়।

জলহস্তীদের অনুভূতি খুব প্রবল। খুব তাড়াতাড়ি তারা কোন আগন্তুকের অস্তিত্ব টের পায়। এদের নাকের ছিদ্র দুটি এমনভাবে আছে যে, জলের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গেলেও নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় না। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর এদের হা। এরা যখন হাই তোলে তখন গোলাপী রঙের চামড়ায় ঢাকা মুখের ভিতরের অংশ এবং হাতীর দাঁতের মত চক্‌চকে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। এদের শ্ব-দন্ত দুটি বেশ লম্বা হয়ে বেঁকে থাকে। এদের মাড়ি এতই শক্ত যে, কচ্ছপের খোলাও অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারে। এরা খেতে পারে প্রচুর। একটা তরমুজ এদের কাছে আমাদের একটা কালো জামের মত। ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চি লম্বা পাকস্থলীকে ভরাতে দৈনিক প্রায় ৪।৫ মণ গাছপালার প্রয়োজন হয়।

জলহস্তীর চামড়া দেহকে অনেকাংশে রক্ষা করে। চামড়া থেকে ঘন, চট্‌চটে, বাদামী রঙের জলীয় পদার্থ বের হয়। জলের মধ্যে অথবা ডাঙায় সব রকম অবস্থায় এই জলীয় পদার্থ এদের চামড়াকে রক্ষা করে।

দেহের কোঁচকানো চামড়া স্থানে স্থানে প্রায় দু-ইঞ্চি পুরু হয়, আর সে সব জায়গায় প্রচুর পরিমাণ চর্বি জমে থাকে। এদের গায়ে লোম নেই বললেই চলে। মাত্র উপরের ঠোঁট, কানের ডগা এবং পিছনের পায়ের দিকে অল্প অল্প লোমের গোছা দেখা যায়।

নদীর খাড়া পাড় অথবা অন্য যে কোন ঢালু দেয়াল বেয়ে এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠতে পারে। এদের চলার ভঙ্গীর সঙ্গে অন্য কোন জন্তুর চলবার ভঙ্গীর মিল নেই। শক্ত, মোটা, ছোট ছোট পা দিয়ে এরা মানুষের চেয়ে জোরে দৌড়াতে বা লাফিয়ে চলতে পারে। কিন্তু এদের চলনভঙ্গী এত অদ্ভুত যে, দেখলেই মনে হয় কোন সার্কাসের ক্লাউন হেঁটে চলেছে।

দৌড় বা সাঁতার কোনটাতেই এরা সুদক্ষ নয়। দৈহিক শক্তি এদের প্রধান সম্বল। এরা জলের মধ্যে অনায়াসে ৫।৬ মিনিট ডুবে থাকতে পারে। জলের মধ্যে ঘণ্টায় ৮ মাইল চলতে এদের কোন অসুবিধা হয় না। জলের ভিতর চলবার সময় এরা নাকের ছিদ্র দুটি বন্ধ করে রাখে। যখন ডাঙায় ওঠে তখন সশব্দে নাকের ছিদ্র খোলে।

জলহস্তী সাধারণতঃ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। দিনের অধিকাংশ সময় তারা জলের ভিতর কাটায়। আবার অনেক সময় ডাঙায় উঠে উন্মুক্ত জায়গায় বিচরণ করে। সময় সময় তিন-চারটা একত্রিতভাবে প্রকাশ্য রাজপথে বসে বিশ্রাম করে।

জলহস্তী নানারকম শব্দ করতে পারে। এক মাইল দূর থেকেও এদের চীৎকার শোনা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা যে ভাবে ডাকে তার সঙ্গে ক্রুদ্ধ ঘোড়ার শব্দের তুলনা করা চলতে পারে। রসালাপ অথবা যুদ্ধ করবার সময় এদের চীৎকার বিভিন্ন ধরণের। রাত্রে এদের চীৎকারকে সিংহ বা মোষের চীৎকার বলে মনে হয়।

বাচ্চাগুলির মাথা অসম্ভব রকমের বড়। বাচ্চাগুলির প্রতি মায়ের খুবই দরদ। দেখলে অবাক হতে হয়। মায়েরা সব সময় বাচ্চাদের কাছে কাছে রাখে। ক্ষিধের সময় খাবার জোগায়, শত্রুদের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু পুরুষ হিপোর সঙ্গে বাচ্চাদের ভাব নেই মোটেই। পুরুষ হিপোরা তাদের বাচ্চাদের ভীষণ হিংসা করে, আর সুবিধা পেলেই তেড়ে মারতে যায়। তখন মায়েরা বাচ্চাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। স্ত্রী-জলহস্তীরা ৭২-৮ মাসের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করে এবং মাস দু-এক পরে আবার গর্ভবতী হয়। অল্প জল বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে এরা বাচ্চা প্রসব করে। জন্মাবার পরে বাচ্চাদের রং থাকে বেগুনের রঙের মত, আর ওজন ৫০ থেকে ৭০ পাউণ্ডের মধ্যে। কয়েক মাসের মধ্যেই দেহের রং গাঢ় বেগুনী এবং সর্বশেষে কালো হয়ে যায়। বাচ্চারা জলের মধ্যে মিনিট খানেক ডুবে থাকতে পারে। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে ভেসে ওঠে, পরক্ষণেই আবার ডুব দেয়। বাচ্চারা প্রথমে সাঁতার কাটতে শেখে, পরে হাঁটতে পারে। জলে কুমীর এবং হিংসুটে পুরুষদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাচ্চারা প্রায়ই তাদের মায়ের পিঠের উপর চড়ে বসে থাকে।

জলহস্তীদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এরা নৌকা ডুবিয়ে দেয়, এরূপ কথা

হামেশাই শোনা যায়। কেন এরা এরকম করে সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। আগেই বলেছি, বাচ্চাদের নিয়ে মায়েদের ঝামেলার শেষ নেই। কুমীর জলহস্তীর বাচ্চাদের বড় শত্রু। জলে ঘোরাফেরা করবার সময় নৌকা বা ওরূপ কোন কিছু দেখলেই জলহস্তীরা মনে করে কুমীর এসেছে বাচ্চাদের ধরবার জন্যে। সেই ভয়ে তারা আগে থেকেই ধাক্কা দিয়ে নৌকা-রূপী কুমীরকে ধ্বংস করে। সাধারণ অবস্থায় এরা খুব শান্ত প্রকৃতির এবং মারামারি করতে ভালবাসে না। অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনা থেকেই হটে আসে।

তবে দলের নেতৃত্বলাভের জন্যে এরা ভীষণ যুদ্ধ করে। দু'জন সমধর্মীর মধ্যে প্রায় সাত-আট ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় আবার যুদ্ধ করে। যুদ্ধের সময় এরা পিছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে' কামড়ে ধরে। যুদ্ধে কারো দাঁত ভাঙে, কারো পায়ের, কারোর বা ঘাড়ের হাড় ভাঙে, চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। যুদ্ধের শেষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দু-জনেই প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধ হলে এদের আর সমাজে ঠাঁই নেই। সমাজচ্যুত হয়ে তাদের মেজাজ আরো চড়ে যায়। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তারা। সামনে যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে। ডাঙায় দূরে এককোণে নিজেদের চর্বির থলির উপর বসে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা পুরনো সঙ্গীদের জলক্রীড়া দেখে। সঙ্গীরা জল থেকে ডাঙায় উঠে এলে তারা বিমর্ষ চিত্তে দূরে সরে যায়। সমাজচ্যুতদের মধ্যে যারা দুর্দান্ত প্রকৃতির তারা সব সময়েই ফিকির-ফন্দী খোঁজে, কি ভাবে সঙ্গীদের বেকায়দায় ফেলবে।

জলহস্তীরা এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যাবার সময় নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে। চলার পথের উপর চিহ্নিত নিশানা রেখে যায়। পুরুষেরা নদীর পাড়ে ছোট ছোট জমিখণ্ড বেছে নেয় নিজের পরিবারের জন্যে। এর মধ্যে আবার হারেমের জায়গা নির্দিষ্ট আছে। চারপাশে দাগ দিয়ে প্রত্যেকে নিজেদের এলাকা ঠিক রাখে। ঐ এলাকার মধ্যে অন্য কারোর প্রবেশ নিষেধ। নিজের এলাকার মধ্যে থাকবার জায়গা, খাবার জায়গা ঠিক করা থাকে। বয়স্ক পুরুষ জলহস্তীরা নিজেদের এলাকার চারদিকে চিহ্ন দিয়ে রাখে—সে চিহ্নগুলি ওদের কাছে সঙ্কেতসূচক। এই চিহ্ন দেখলেই আগন্তুকেরা বুঝতে পারে—আর এগোলেই বিপদ।

পোলিও রোগের টিকা আবিষ্কর্তা—ডাঃ জোনাস ই. সল্ক্

(কথায় ও চিত্রে)

১। ডাঃ জোনাস ই. সল্ক্—নিউইয়র্ক শহরের এক পোষাক প্রস্তুতকারীর ৪৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র ডাঃ সল্ক্ মানুষের এক পরাক্রান্ত শত্রুরূপী রোগ নিধনের উপায়
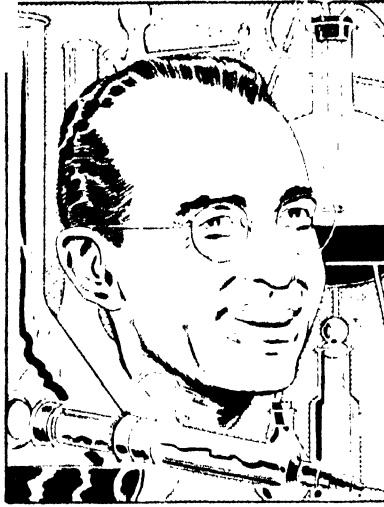
১নং চিত্র

আবিষ্কার করেছিলেন। ডাঃ সল্ক্ পোলিওমায়েলাইটিস রোগের টিকার আবিষ্কর্তা। এই টিকা প্রয়োগে মানুষের জীবনহানিকর এবং পঙ্গুত্ব আনয়নকারী পোলিওমায়েলাইটিস রোগ শতকরা ৯০% নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

২নং চিত্র

২। জন্ম ও পারিবারিক অবস্থা—১৯১৪ সালে ড্যানিয়েল ও ডোরা সল্কের

জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সল্ক্ পরিবারে জোনাস সল্ক্ জন্মগ্রহণ করেন। এদের সাংসারিক বন্ধন ছিল খুব সুদৃঢ়। জোনাসের বাবা-মা তাঁদের ছেলের প্রতিভার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে ছেলেকে সব কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতেন। তাঁর পিতা পোষাক তৈয়ারীর কারখানায় ভাল মাইনে পেতেন।

৩। যৌবন—শৈশবাবস্থাতেই তাঁর বিশ্লেষণ-স্পৃহা এবং সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখবার বাসনা বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠলো। তাঁর প্রতিভা এবং জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দেখে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বালক জোনাসকে বিশেষ প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্যে উচ্চতর

৩নং চিত্র

বিদ্যালয়ে পাঠালেন। সেখানে তিনি এত ভাল ফল দেখালেন যে, তাঁর শিক্ষকেরা সব সময় বলতেন যে, জোনাস হাতের কাছে যে বই পায় সেই বই-ই পড়ে ফেলে এবং স্কুলের কাজে তার মত দক্ষ ছাত্র খুব কম এসেছে।

৪নং চিত্র

৪। শিক্ষা—ডাঃ সল্ক্ ১৯৩৪ সালে নিউইয়র্ক কলেজ থেকে বিজ্ঞানের ডিগ্রি

লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। নিজের খরচ জোগাবার জন্যে তিনি ছুটির সময় ছেলেদের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের পরিদর্শক হিসাবে এবং সাধারণ দিনে তার নিজের ক্লাশের পর পরীক্ষাগারের টেক্‌নিসিয়ান হিসাবে কাজ করতেন।

৫। বিবাহ—নির্দিষ্ট পড়াশুনা এবং অপরিমিত কাজের মধ্যেও ডাঃ সন্ক্‌ রোমান্সের আস্বাদ গ্রহণ করতেন। তিনি ডোনা লিণ্ডসে নাম্নী এক সমাজ-সেবিকার প্রেমে পড়েন। ১৯৩৯ সালে মেডিক্যাল স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর তাঁরা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ

৫নং চিত্র

হন। বর্তমানে তাঁদের তিন ছেলে। ডাঃ সন্ক্‌ মাঝে মাঝে তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে খেলাধুলা করতে ভালবাসেন।

৬নং চিত্র

৬। **কার্যে অন্তরীণ**—ডাক্তারী উপাধি লাভ করবার পর কিছুদিনের জন্যে ডাঃ সন্ক্‌

জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিসাবে কাজ করেন। পরীক্ষাগারের কাজে ব্যাপৃত থাকতে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন যে, তাঁকে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হবে। সে জন্যে তিনি পুরা দুটি বছর হাসপাতালের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে কাজের অবসরের মধ্যেও ডাঃ সল্ক্ হাসপাতালের পরীক্ষাগারে গভীর-ভাবে ব্যাপৃত থাকতেন।

৭। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে—১৯৪২ সালে ডাঃ সল্ক্ সর্বপ্রথম পুরাপুরিভাবে নিজেকে পরীক্ষাগারের গবেষণা-কার্যে নিয়োগ করেন। তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের

৭নং চিত্র

রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁকে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা বের করবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। ডাঃ সল্ক্ ঐ কাজে অপূর্ব সাফল্য লাভ করতে পারতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি।

৮নং চিত্র

৮। পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে—১৯৪৭ সালে তিনি পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস

গবেষণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। যদিও তিনি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার টিকা আবিষ্কারের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন তবুও পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে তাঁর মন ব্যগ্র হয়ে উঠলো। তাঁর পূর্বে এই রোগের টিকা আবিষ্কারের জন্যে অনেক গবেষণা করা হয়েছিল, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৯। পোলিও রোগ—পোলিও রোগ মানুষের এক প্রবল শত্রু। এই রোগ তার শিকারকে অথর্ব করে ফেলে; এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটায়। ১৮৯৪
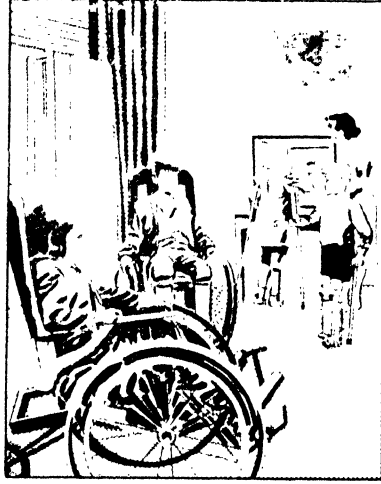
৯নং চিত্র

সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ৫৭ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হতো। মহামারীর সময়ে বছরে প্রায় ৩,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

১০নং চিত্র

১০। গভীর সমস্যা—মানব-সমাজের প্রতি চিরন্তন সহানুভূতি ডাঃ সল্ক্‌কে

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কার্য থেকে পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের দিকে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হলো, কত রকমের পোলিও-ভাইরাস আছে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা। এই রোগের বিভিন্ন শ্রেণীর অনুসন্ধান করতে হলে প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর কোনটাই ছিল না। তাই মানব-দরদী ডাঃ সল্ক্ সমস্যার সমাধান না করতে পেরে বিষাদগ্রস্ত হলেন।

১১। পরীক্ষা ও পর্যালোচনা—জনসাধারণের সাহায্যে স্থাপিত জাতীয় পোলিও-গবেষণাগার ডাঃ সল্ককে তাঁর কাজে সাহায্য করতে রাজী হলেন। ডাঃ সল্ক এবং অন্যান্য
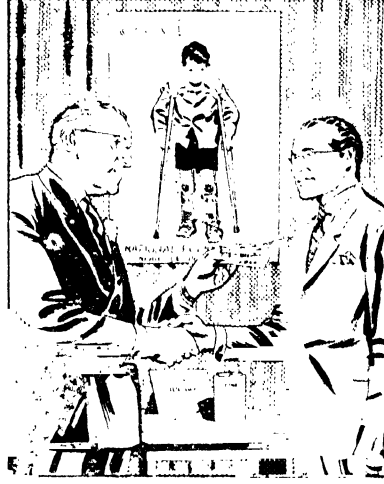
১১নং চিত্র

বিজ্ঞানীরা অবিলম্বে এই কাজ গ্রহণ করলেন। তাঁরা পোলিও রোগে আক্রান্ত ১,০০০ রোগীর দেহ থেকে পোলিও-ভাইরাস সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিন বছর দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তিন শ্রেণীর পোলিও রোগ আছে।

১২নং চিত্র

১২। রোগের প্রতি চ্যালেঞ্জ—ডাঃ সল্ক্ এবং তার সহকারীরা স্থির করলেন যে,

তাঁরা তিন শ্রেণীর পোলিও রোগেরই প্রতিষেধক আবিষ্কার করবেন। ১৯৪৯ সালে তাঁরা গভীরভাবে গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁরা জানতেন—হয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবেন, নয়তো যতদিন লাগুক সাফল্য লাভ করবেনই। দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে তাঁদের সাধনা চলতে লাগলো।

১৩। কর্মব্যস্ত ডাঃ সল্ক্—ডাঃ সল্ক্ সপ্তাহে ছ'দিন দৈনিক ১৬ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। ডাঃ সল্কের স্ত্রী বলেছেন যে, ছুটির দিনেও ডাঃ সল্কের মন সর্বদাই গবেষণাগারে পড়ে থাকতো। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম—দেহে ক্লান্তি; কিন্তু

১২নং চিত্র

মনে অদম্য উৎসাহ। অবশেষে ক্লান্তির অবসান হলো। ১৯৫৩ সালে ডাঃ সল্ক্ পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে সাফল্য লাভ করেন। জন্তু-জানোয়ারের উপর পরীক্ষা করে তিনি সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু তখনও সমস্যা রইলো—মানুষের উপর প্রয়োগেও কি এমনি সফলতা অর্জন করা যাবে?

১৪। সাফল্য লাভ—ডাঃ সল্ক্ সর্বপ্রথম নিজে এবং নিজের পরিবারের সবাইকে এই রোগের টিকা ইনজেক্‌সন করে দিলেন। টিকা দেবার পর কোন খারাপ উপসর্গ দেখা দিল না। তখন ডাঃ সল্ক্ মনে জোর পেলেন। তারপর ৫,০০০ শিশুকে এই রোগের প্রতিষেধক ইনজেক্‌সন দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে দশ লক্ষ শিশুকে ইনজেক্‌সন দেওয়া হয়। বর্তমানে আমেরিকায় বয়স্ক ও শিশু মিলে প্রায় সত্তর মিলিয়ন লোককে

এই ইনজেকসন দেওয়া হয়। ফলে সেখানে পোলিও রোগ শতকরা ৯০ ভাগ কমে

১১নং চিত্র

গেছে

১৫। ভবিষ্যৎ—ডাঃ সল্ক্ তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের লভ্যাংশ নিজে গ্রহণ করেন নি। সমস্ত পৃথিবীকে তিনি তাঁর আবিষ্কারের বিষয়বস্তু এবং প্রতিষেধক প্রস্তুত-প্রণালী জানিয়ে দেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ দানে পৃথিবী আজ সর্বনাশা পোলিও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এই সাফল্যের পরে ডাঃ সল্ক্ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি।

১৫নং চিত্র

বিশ্বপ্রেমিক ডাঃ সল্ক্ তাঁর গবেষণাগারে আবার কঠোর পরিশ্রমে ব্যাপৃত হন। এবার তিনি মানব-সমাজের আর একটি ভয়ঙ্কর শত্রু ক্যান্সার বা কর্কট রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাজে ব্যাপৃত আছেন। সমগ্র বিশ্বের ঐকান্তিক কামনা এই যে, ডাঃ সল্ক্ দীর্ঘজীবন লাভ করে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

বিবিধ

ভারতে প্রথম পলিথিন কারখানা

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ২রা মে, (পশ্চিমবঙ্গ, রিষড়ায়) ভারতের প্রথম পলিথিন কারখানার উদ্বোধন করেন।

এই কারখানায় পলিথিন নামে যে রাসায়নিক দ্রব্যটি উৎপন্ন হইবে, তদ্বারা বর্তমান শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থাৎ প্লাষ্টিক শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে একদিকে যেমন বিদেশী মুদ্রা বাঁচিবে, অপর দিকে তেমনই নানাপ্রকার কুটীর শিল্প সৃষ্ট হইয়া বেকার সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করিবে।

ভারতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজেরই এক প্রতিষ্ঠান অ্যালকেলি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন এই কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৯৩৩ সালে মিঃ আর. ও. গিবসন এবং মিঃ ই. ডব্লিউ. ফসেট নামে আই-সি-আই-এর দুইজন বৈজ্ঞানিক ইহা আবিষ্কার করেন।

কারগালিতে এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা ধৌতাগার

ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলে কারগালিতে কয়লা ধৌতাগারের উদ্বোধন হইয়াছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতে সরকারী উদ্যোগে এই ধরণের শিল্প-সংস্থার কয়লা ধৌতকরণের কারখানা হিসাবে ইহা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বোখারো অঞ্চলে এই ধৌতাগারটি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এখানে যেন ২২ লক্ষ টন কাঁচা কয়লা ধৌত করা যাইতে পারে, এমনভাবে পরিকল্পনাটি তৈয়ারী করা হইয়াছে। কারগালিতে যে কয়লা ধৌত করা হইবে তাহা রুরকেলা ও ভিলাই ইস্পাত কারখানায় সরবরাহ করা হইবে।

ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁক প্রবেশের সম্ভাবনা

আন্তর্জাতিক মরু-পঙ্গপাল তথ্য সরবরাহ দপ্তর সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, এই বৎসর বসন্তকালে ভারতে পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে পারে। ইহার কারণ স্বরূপ তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে এবং ওমানে পঙ্গপালের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইরানে পঙ্গপালের অস্বাভাবিক প্রজনন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

এই পঙ্গপালের কয়েকটি ঝাঁক মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং তুরস্ক আক্রমণ করিতে পারে। অন্য ঝাঁকগুলি পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করিয়া পাকিস্তানে এবং সম্ভবতঃ পরে ভারতে প্রবেশ করিতে পারে।

মে মাসে এবং পরে সৌদি আরব ও মধ্য প্রাচ্যের প্রজনন ক্ষেত্র হইতে পঙ্গপালের নূতন নূতন ঝাঁক পশ্চিমমুখে যাত্রা করিয়া মিশর, সুদান এবং উত্তর ইথিওপিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করিতে পারে।

চিকিৎসায় পারমাণবিক শক্তি

সারের অন্তর্গত সাটন ডাউন্‌স্-এ রয়েল মার্সডেন হাসপাতালের একটি নূতন বিভাগ গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সেখানে চিকিৎসায় পার-

মাণবিক শক্তির প্রয়োগ এবং মনুষ্যদেহের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা হইবে।

সাটন ডাউন্‌স্‌-এ উক্ত হাসপাতাল নির্মাণের দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হইল, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী দপ্তরের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ ভোল্টের ব্যয়সাধ্য রেডিয়েশন চিকিৎসা জনসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, ঔষধে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের ব্যাপকতর সম্ভাবনা পরীক্ষা করা, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা করা এবং আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।

হারওয়েলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা-কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি শিক্ষাকোর্স পরিচালনা করা হইয়া থাকে; কিন্তু ঔষধে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার সম্পর্কে কোথাও কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সাটন ডাউন্‌স্‌-এ এইরূপ একটি শিক্ষাকোর্স পরিচালনা করা হইবে। এতদ্ভিন্ন এখানে এরূপ একটি গবেষণাগার থাকিবে। যেখানে বৃটেন এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও আসিয়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করিতে পারিবেন।

ভূগর্ভের তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

কামচাট্‌কা উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পাউ-ঝেৎস্ক্‌-এর উষ্ণ প্রস্রবণগুলির কাছে একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদনের স্টেশন নির্মাণের কাজ গত ২রা এপ্রিল থেকে সুরু করা হয়েছে। ইতিপূর্বেই নিখিল-সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের তত্ত্বাবধানে এখানে একটি বিশেষ গবেষণা বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে ভূগর্ভের তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং এটাই হবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

বিশেষ ধরণে নির্মিত কূপের মধ্যে পাম্প বসিয়ে গরম জল আর বাষ্প উপরে তুলে আনা হবে এবং সেই তাপ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হবে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে ৫০০ মিটার গভীর একটি কূপ খনন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন এই উষ্ণ জল আর বাষ্পের বিশেষ ভৌতিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। ভূগর্ভস্থিত এই বয়লার-এর এলাকার বিস্তৃতি ও সর্বাধিক গভীরতা নির্ণয়ের জন্যেও নানা জায়গায় ড্রিলিং-এর কাজ চালানো হচ্ছে।

পৃথিবীর বুকে এই কামচাট্‌কাই হলো ব্যাপকতম ভূ-আগ্নেয় এলাকা। এখানে এখনও অনেক-গুলি জলন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, আর আছে শত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। কামচাট্‌কার কোন কোন জায়গায় জমির উপরের তাপ এত বেশী যে, শীতপ্রধান এই এলাকার চারদিক যখন বরফে ছেয়ে যায় তখন সে সব জায়গা বরফ-গলা জলে ভর্তি হয় থাকে, আর সারা বছর এই জায়গাগুলি সবুজ শ্যাওলা আর ঘাসে আচ্ছন্ন থাকে।

পরমাণু-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি

পরমাণু শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার একটি নূতন প্রক্রিয়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে পরমাণুকে তাপ উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া সেই তাপে বাষ্প উৎপাদন করা হয়। এই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যেই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, এই প্লাজমা থার্মোকাপল এক্সপেরিমেণ্ট এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এই পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় যে, ইহার দ্বারা একটি বাল্‌ব ১২ ঘণ্টা জলিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ভবিষ্যতে মহাশূন্যে গমনাগমনের ব্যাপারে খুবই সহায়ক হইবে।

রেশম-চাষে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার

সোভিয়েট আর্মেনিয়ায় জীবাণু-বিজ্ঞানী এড্‌রিক

আক্রিকিয়ান কতকগুলি নতুন ধরণের অ্যান্টি-বায়োটিক প্রয়োগ করে রেশম-কীটের জীবাণু-সংক্রামিত ব্যাধি নিরাময়ে সাফল্যলাভ করেছেন।

রেশম-কীট বা পোলুগুলি যখন বেড়ে উঠতে থাকে তখন তাদের তুঁত গাছের পাতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই তুঁত পাতা খেয়েই পোলু বেড়ে ওঠে। বিজ্ঞানী আক্রিকিয়ান পরীক্ষামূলকভাবে তুঁত গাছের কচি পাতার উপরে তাঁর আবিষ্কৃত এই অ্যান্টিবায়োটিক ছড়িয়ে দেন। তারপর এই পাতাগুলি খাদ্যোপযোগী হলে, গাছ থেকে তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে রেশম-কীটগুলিকে খেতে দেওয়া হয়। দেখা যায়, এই পাতা খেয়ে রেশম-কীটগুলির শুধু যে জীবাণু-সংক্রামিত ব্যাধির প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ছে তাই নয়, সেই সঙ্গে তাদের ওজনও স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে বেশী হচ্ছে এবং উৎকর্ষ আর পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্মেনিয়ার রেশম চাষের কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ পোলু-পোকার মৃত্যুর হার হলো—জীবাণু-সংক্রামিত ব্যাধির ফলে শতকরা ২৪ এবং স্বাভাবিক কারণে শতকরা ৮ থেকে ১২; অর্থাৎ প্রতি এক-শতটি রেশম-কীটের মধ্যে গড়পড়তা ৩৪টি কীট গুটি বাঁধতে সুরু করবার আগেই মারা পড়ে। কিন্তু আক্রিকিয়ান-উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, রেশম-কীটের মৃত্যুর হার কমে গিয়ে হাজারকরা মাত্র ছ'টিতে (শতকরা ০.৬) দাঁড়িয়েছে। কোন কোন রেশম-চাষের কেন্দ্রে রেশমকীটের মৃত্যুর হার শূন্যে নেমে এসেছে। বলা বাহুল্য, এই অ্যান্টিবায়োটিক মিশ্রিত তুঁত পাতা খাবার ফলে রেশম-কীটের জৈব-ক্রিয়াকলাপে কোন রকম অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা দেয় নি।

ভাইরাস-ব্যাধি নিরাময়ে অক্সিজেন প্রয়োগ

ভাইরাস আক্রমণের ফলে যে সব ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এক বিশেষ পদ্ধতিতে আক্রান্ত স্থানে অক্সিজেন প্রয়োগ করে রোগ সারিয়ে তোলবার কাজে পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন লেনিনগ্রাডের দু-জন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী।

ভাইরাস-আক্রান্ত প্রাণী-কোষগুলিতে কোষ-বিপাকক্রিয়া (সেল মেটাবোলিজ্‌ম্‌) অনেক কমে যায়। লেনিনগ্রাডের ভাইরাস-গবেষণা ভবনের দু জন বিজ্ঞানী, আলেকজাণ্ডার পানফ ও পাভেল রেমেজফ লক্ষ্য করেন—বাইরের কোন প্রভাবে যদি এই কোষ-বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাহলে ভাইরাসগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে—তাদের আর রোগ-বিস্তারের ক্ষমতা থাকে না। কিভাবে এই ভাইরাস-আক্রান্ত কোষের বিপাকক্রিয়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, সে সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, কম্‌প্রেস্‌ড্‌ অক্সিজেন ব্যবহার করে এ-ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

পানফ ও রেমেজফ পরীক্ষামূলকভাবে ইঁদুরের দেহে এন্‌সেফালোমায়েলাইটিস (মস্তিষ্ক-স্নায়ুর অসাড়তা) রোগের ভাইরাস এত বেশী মাত্রায় ঢুকিয়ে দেন যাতে ইঁদুরটির মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। রোগের লক্ষণ প্রকট হবার পর ইঁদুরটিকে এঁরা স্বাভাবিক বায়ুচাপের চেয়ে এক অ্যাট্‌মোস্‌ফিয়ার বেশী চাপে কম্‌প্রেস্‌ড্‌ অক্সিজেন গ্যাসে ভরা একটি কাচের বাক্সের মধ্যে রেখে কয়েকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ চালান। এ-পর্যন্ত এঁরা বিভিন্ন রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৭০০ ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এভাবে চিকিৎসিত হয়ে শতকরা ৭০টি ইঁদুরই সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠেছে। বাকী শতকরা ৩০টি ইঁদুর আংশিক আরোগ্য লাভ করেছে কিংবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় যতদিন বাঁচবার কথা তার চেয়ে ঢের বেশী দিন বেঁচেছে।

মরুভূমিতে জল-বিদ্যুৎ ষ্টেশন

সোভিয়েট তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমির

বুকে জল-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্টেশন নির্মাণের কাজ শীঘ্রই সুরু হবে।

গত বছরের শেষের দিকে এই মরুভূমির বুক চিরে ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রণালী সৃষ্টি করা হয়েছে। মরুভূমির বুকের উপরে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী এই কারাকুম খালটি সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এক বিরাট সাফল্য। গত জানুয়ারী মাস থেকে এই খাল দিয়ে মালবাহী ও যাত্রীবাহী ষ্টীমারের নিয়মিত চলাচল সুরু হয়েছে। তুর্কমেনিয়ার কৃষকেরা এই খাল বরাবর বিরাট এক এলাকা জুড়ে কারাকুম মরুভূমিকে সুফলা করে তুলেছে। এই প্রণালীর দুই ধারে বড় বড় বয়েকটি শহর ও জনবসতি গড়ে তোলবার কাজ সুরু হয়েছে।

এই কারাকুম প্রণালীর জল-শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক স্টেশন তৈরী করা হবে। এই জল-বিদ্যুৎ স্টেশন নির্মাণের কাজটি চল্‌তি সাত-সালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

কৃত্রিম কিড্‌নি

কয়েক ধরণের ব্যাধি কিড্‌নির কাজে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। বিপাকক্রিয়ার ফলে দেহের অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলিকে মল-মূত্রাকারে বের করে দেওয়া হলো কিড্‌নির কাজ। কিড্‌নির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা অস্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

অস্ত্রোপচারের সময়ে এই কিড্‌নির কাজ যাতে স্বাভাবিকভাবে চলে, তার জন্যে মস্কোর শল্য-চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ভবনের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম কিড্‌নি তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রের একটি নলের সঙ্গে মূত্রনালী কিংবা মূত্রাশয়কে যুক্ত করে দিয়ে অস্ত্রোপচারের কাজ চালানো হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত এই কৃত্রিম কিড্‌নি মল-মূত্র নিঃসরণের কাজ আপনা থেকেই চালায়।

এই কৃত্রিম কিড্‌নির কাজ পরীক্ষামূলকভাবে সফল হবার পর এখন ব্যাপক হারে এই যন্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে।

ইস্পাতের চেয়ে শক্ত প্লাষ্টিক

খুব দ্রুতগতিতে তেলের কূপ খননের জন্যে সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারেরা বিশেষ এক ধরণের প্লাষ্টিকের টার্বোড্রিল তৈরী করেছেন। এতদিন পর্যন্ত এই টার্বোড্রিলের জন্যে সব চেয়ে মজবুত ইস্পাত ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এই প্লাষ্টিকের টার্বোড্রিল ইস্পাতের চেয়েও মজবুত আর টেঁকসই বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এই প্লাষ্টিক উৎপাদনের খরচও ইস্পাত উৎপাদনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।

বিষ ও অমৃত

হাইড্রোজেন বোমার অন্যতম উপাদান ট্রাই-টিয়াম ক্যান্সার রোগের উৎপত্তি নির্ণয়ের সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকার ব্যবহারিক জীব-বিজ্ঞান সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় এই সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

বলা হয় যে, ট্রাইটিয়াম মানবদেহে এমন একটি তেজস্ক্রিয় চিহ্ন রাখিয়া যায় যে, বিজ্ঞানীরা উহারই সহায়তায় অণুকোষের সৃষ্টি ও মানবদেহে বিষ-সঞ্চারের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারেন।

উল্কাপিণ্ডের জীবন-কথা

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারল্ড উরে ওয়াশিংটনে মহাকাশ আলোচনা চক্রে বক্তৃতাকালে বলেন, পৃথিবীতে যে সব প্রস্তরময় উল্কাপিণ্ড এসে পড়ছে, সেগুলি চন্দ্রদেহেরই বিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর আকাশে ছিল অন্ততঃ তিনটি চন্দ্র। দুটি চন্দ্র পরস্পরকে প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা মারে, ফলে সৃষ্টি হলো

বহু ক্ষুদ্রতর চন্দ্রের। এরা আবার পরস্পরকে আঘাত করলো, জড়িয়ে ধরলো, ভেঙ্গেচুরে খান খান করে দিল একে অন্যকে। এরাই আজ অসংখ্য উল্কাপিণ্ড-রূপে আদি ইতিহাসের দুটি নির্বাপিত চন্দ্রের ইতিকথা বহন করে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এটা হলো প্রস্তরময় উল্কাপিণ্ডের কথা। লৌহময় উল্কাপিণ্ডও রয়েছে; কিন্তু সেগুলির জন্ম-ইতিহাস স্বতন্ত্র। সে আদিযুগে চন্দ্রদেহের খানিকটা গলে যায়। ঘূর্ণায়মান চন্দ্রের দেহ থেকে বিক্ষিপ্ত বিগলিত লৌহস্রোত দানা বেঁধে বিভিন্ন আকারের উল্কাপিণ্ডরূপে আকাশে ছুটে চলতে থাকে।

শুক্রগ্রহে রকেট উৎক্ষেপণ

১লা মে, ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, শুক্রগ্রহে রকেট প্রেরণের চেষ্টা এই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। মার্কিন জাতীয়-মহাকাশ-সংস্থা এই জন্য যান্ত্রিক অসুবিধাকেই দায়ী করিয়াছেন।

স্থির ছিল যে, আগামী জুন মাসে শুক্র প্রায় যখন পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটে, অর্থাৎ ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিবে, তখন উহাকে লক্ষ্য করিয়া রকেট উৎক্ষেপণ করা হইবে।

১৮ মাস পরে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে শুক্র গ্রহ আবার এ স্থানটিতে আসিবে।

তিনশত কোটি বছর আগে

সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাঃ এল. স্কলভস্কী একটি প্রবন্ধে বলেছেন, মঙ্গল গ্রহের যে দুটি উপগ্রহ রয়েছে, সেগুলি কৃত্রিম। আজ থেকে দুশ' বা তিনশ' কোটি বছর পূর্বে মঙ্গল গ্রহবাসীরা এ দুটাকে শূন্যলোকে স্থাপন করেছিল। কিন্তু মঙ্গল গ্রহের সে সব অধিবাসীরা বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিন মঙ্গল গ্রহের আকাশে ও মৃত্তিকায় অক্সিজেন ছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী প্রাণীর অস্তিত্বও সে জন্যেই অসম্ভব ছিল না।

স্কলভস্কী বলেন, তিন শ' কোটি বছর আগে মঙ্গল গ্রহের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী প্রাণীরা অতীত-কালে হয়তো মহাশূন্য অভিযানে বহির্গত হয়েছিল। সে অভিযানের স্বাক্ষর বহন করে আজও কৃত্রিম উপগ্রহ ফবোস ও ডিমোস মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর কত পরিবর্তনই না ঘটেছে! উত্তপ্ত পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ দেহে প্রথম জলধারা নেমে আসলো, মরুভূমিতে অরণ্যের সৃষ্টি হলো, দেখা দিল পৃথিবীর সমুদ্রতলে জীবনের প্রথম খেলা।

মঙ্গল গ্রহ থেকে মাত্র ৫,৮০০ মাইল দূরে থেকে ফবোস প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিঃ-এ একবার মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। ডিমোস রয়েছে ১৪,৬০০ মাইল দূরে; ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে তার একবার প্রদক্ষিণ শেষ হয়। মঙ্গল গ্রহের এই দুটি উপগ্রহের উৎপত্তি বা তাদের গতি সম্পর্কে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কোন নিয়মই খাটে না। সৌরমণ্ডলে আর যে সব উপগ্রহ রয়েছে, তার কোনটিই এদের মত ক্ষুদে নয় বা গ্রহের গা ঘেঁষেও তারা চলে না।

ফবোস তার কক্ষপথ থেকে আড়াই ডিগ্রী সরে গেছে এবং গতিও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, সে মঙ্গলের আরও কাছে চলে গেছে। আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলির হালচালও ঠিক এ রকম। তারাও কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়, ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে চলে আসে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে তারা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ফবোস ও ডিমোস উভয়েরই ভিতরটা ফাঁপা। কিন্তু আকাশে সঞ্চরমান কোন প্রাকৃতিক পদার্থেরই অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা হতে পারে না; অতএব এরা নকল—মঙ্গল গ্রহবাসীরাই তাদের গৌরবময় অতীতকালে আকাশে এদের ভাসিয়ে দিয়েছিল।

স্কলভস্কী বলেন, তাদের পক্ষে কাজটি খুব কঠিন ছিল না। কেন না, সেখানে মাধ্যাকর্ষণের টান

দুর্বল। আমাদের রকেট বা কৃত্রিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সব চাইতে বড় সমস্যা হলো, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। সে কেবলই টে'ন রাখতে চায়, শূন্যলোকের দিকে যারা চলেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ নির্বিকার।

মহাকাশ বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক অধ্যায়ের সূচনা

মার্কিন বিজ্ঞানী ও রকেট বিশেষজ্ঞগণ ১৩ই এপ্রিল ৬ ঘণ্টা অন্তর তিনটি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করিয়া এক ইতিহাস সৃষ্টি করিতে চলিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিরাট ব্যর্থতাই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে।

একজোড়া কৃত্রিম উপগ্রহকে একটি ভ্যানগার্ড রকেটের নাসিকাগ্রে জুড়িয়া মহাকাশের দিকে উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উহা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়া যায়। একটি উপগ্রহে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের যন্ত্রাদি ছিল—অপরটিতে ছিল মাধ্যাকর্ষণ ও মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ পরিমাপের অন্যান্য যন্ত্র। কিন্তু দুইটি উপগ্রহ সহ সমগ্র ভ্যানগার্ড রকেটটি কিছুক্ষণ পরেই আটলান্টিকে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিপূর্ণ অপর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। "২নং ডিস্‌কভারার" উপগ্রহটি আজ প্রতি ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঘণ্টায় ১৭॥ হাজার মাইল বেগে উহা পৃথিবীর এক মেরু হইতে অন্য মেরুর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে উহার দূরত্ব হইতেছে ১৫৬ মাইল—সর্বাধিক দূরত্ব হইতেছে ২৪৫ মাইল।

এর পরে আধারটিকে উপগ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইবে। শূন্যলোক হইতে কোন কিছু অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের ইহাই প্রথম চেষ্টা। পৃথিবীতে একটি বিস্ফোরণ ঘটাইয়া "ডিস্‌কভারার" সংলগ্ন ধাতব আধারটি মূল উপগ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

সঙ্গে সঙ্গেই আধারটিতে রক্ষিত একটি বিপরীত-গতি রকেট চালু হইয়া পৃথিবীর দিকে উহার গতি মন্দীভূত করিবে।

ইহার কিছুক্ষণ পর একটি প্যারাসুট আপনা হইতেই খুলিয়া যাইবে এবং পৃথিবীর দিকে আধারটির গতি আরও মন্দীভূত করিবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া আধারটি যাহাতে ভস্মীভূত না হয়, তজ্জন্যই উপরিউক্ত দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্যারাসুটে-গাঁথা আধারটি আরও নামিয়া আসিলে হাওয়াই দ্বীপে প্রতীক্ষারত ৮ খানা বিমান প্রতি দশ মিনিট অন্তর আগাইয়া যাইবে এবং আকাশে ভাসমান ধাতব আধারটিকে সেখানেই বন্দী করিয়া পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবে। কিন্তু এই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়?

তজ্জন্য মার্কিন নৌবহরের বহু ডেষ্ট্রয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া টহল দিতে থাকিবে এবং আধারটিকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের মতে, কাজটি দুঃসাহসিক—সাফল্যের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু উহা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে মহাকাশে কোন বস্তুকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা অনেকটা আগাইয়া যাইবে এবং উহাই হইবে এই পরীক্ষার বৃহৎ সার্থকতা।

চাঁদের রং

চাঁদের মাটির রং কি রকম? পৃথিবীতে আমরা যে জ্যোৎস্না—অর্থাৎ চাঁদের দেহ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো উপভোগ করি, তার রং খানিকটা নীলাভ দেখায়। কিন্তু এই আলোর

বর্ণালী বিশ্লেষণ করে লাল, হলুদ, নীল আর সবুজ বর্ণরেখা পাওয়া যায়।

সোভিয়েট কাজাকস্তানের আলমা-আতা মানমন্দির থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভিক্টর টেইফেল দীর্ঘকাল ধরে এ সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তিনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে চন্দ্রদেহের রঙীন ফটোগ্রাফ তুলে এবং চাঁদের প্রতিফলিত আলোর অতি সূক্ষ্ম বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, চাঁদের মাটির রং স্থানবিশেষে হাল্‌কা লাল, নীল আর সবুজ হয়ে থাকে। চাঁদের আগ্নেয়-গিরির মুখগুলির আশেপাশে মাটির রং বেশ নীল। চাঁদের যে পিঠটি পৃথিবী থেকে দেখা যায়, সেদিকে এই মৃত আগ্নেয়গিরি প্রচুর সংখ্যায় থাকবার ফলে এবং মহাশূন্য ও বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত অন্যান্য কতকগুলি কারণে পৃথিবীতে আমরা জ্যোৎস্নার রং হাল্‌কা নীল দেখি।

উজ্জ্বলতর সূর্য

পাঁচ বৎসর পূর্বেকার তুলনায় সূর্য শতকরা দুই ভাগ বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—এই কথাটি বলিয়াছেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দির লাওয়েল অবজারভেটরীর গবেষকবৃন্দ। অবশ্য তাঁহারা এই সান্ত্বনাবাণী শুনাইয়াছেন যে, পৃথিবীর বিপদ ঘটিবার মত অবস্থা দেখা দেয় নাই।

৭ জন বিজ্ঞানী গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের উপর সূর্যালোকের প্রতিফলন পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়।

উক্ত গবেষকদলের নেতা জনসন বলেন, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইলেও সূর্যদেহ হইতে বিচ্ছুরিত শক্তি বা তাপের কোন তারতম্য ঘটে নাই। হয়তো সৌরকলঙ্কের সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে—কিন্তু ব্যাপারটি আরও গবেষণাসাপেক্ষ।

জলস্রোত বা বায়ুস্রোতের সহায়তায় বিদ্যুৎ বা শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি জানা আছে। কিন্তু কালস্রোত বা সময়ের ধারাও শক্তির উৎস হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কোজিরেফ 'টাসের' নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্বে এই বিজ্ঞানীই চন্দ্রদেহে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করিয়াছেন। 'মৃত' চন্দ্রের এই আকস্মিক তৎপরতার সংবাদে সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছেন।

কোজিরেফ বলেন, বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রাদির সাহায্যে উত্তর মেরু অঞ্চলে গবেষণা চালাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে অসীম শক্তি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর এই লীলাবৈচিত্র্য হইতে আমরা পৃথিবীর যে কোন পদার্থের আবর্তনের মধ্যে নূতন বেগ ও নূতন শক্তির আবির্ভাব খুঁজিয়া পাইব। সে শক্তির উৎস হইতেছে—'কালস্রোত'—এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞানের কাছে ছিল অজ্ঞাত।

অন্যান্য সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কোজিরেফ যে শক্তির কথা বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ পৃথিবীর বায়ু-প্রবাহ, পৃথিবীর সঙ্কোচন ও সম্প্র-সারণের উপর উহার প্রভাব রহিয়াছে।

কোজিরেফ যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেগুলির বিশ্লেষণ করা হইতেছে। বিশ্লেষণ শেষ হইলে আবার তিনি উত্তর মেরুতে যাইবেন এবং নূতন করিয়া গবেষণা সুরু করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | জুন, ১৯৫৯ | ষষ্ঠ সংখ্যা

এক্স-রে, অ্যাটম ও ম্যাক্স ফন লাউয়ে

বিমলেন্দু মিত্র

এ বছর, অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে ম্যাক্স ফন লাউয়ের (M. V. Laue) আশী বছর বয়স পূর্ণ হলো। বর্তমান যুগের পদার্থতাত্ত্বিকদের কাছে লাউয়ের নাম অত্যন্ত পরিচিত। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত যখন পদার্থতত্ত্ব অতিশয় দ্রুতবেগে আধুনিক হয়ে উঠছে, যখন প্রতিদিন নতুন ভাবধারা ও নতুন আবিষ্কারের জোয়ারে পুরনো অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে ভাসিয়ে দিতে হচ্ছে, তখনই নতুন পদার্থ-বিদ্যার কারিগরদের পুরোভাগে লাউয়ে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। লাউয়ের একটি মাত্র যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে পদার্থতত্ত্বে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেকগুলি মূলগত চিন্তার সমর্থন পাওয়া গেছে। লাউয়ের আবিষ্কারের ফলেই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেলাসিত পদার্থের ভিতর পরমাণুগুলি জ্যামিতিক সুসংবদ্ধতায় পরিপাটী রূপে সজ্জিত, যা আগে কেবল অনুমানসাপেক্ষ মাত্র ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, লাউয়ের পরীক্ষার ফলেই সর্বপ্রথম পরমাণুর অস্তিত্ব, তত্ত্বের জগৎ ছেড়ে পরীক্ষার বাস্তব জগতে রূপ গ্রহণ করলো।

লাউয়ে জার্মেনীর কবলেন্‌ৎস্-এ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ সালে। পিতা ছিলেন সামরিক কর্মচারী। গ্যয়টিংগেন, মিউনিশ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পাঠ নেন ম্যাক্স। বিশ্ববিখ্যাত ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের তিনি ছাত্র। প্ল্যাঙ্কের কাছে আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯০৬ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দু-বছর পরে মিউনিশে যোগদান করেন। মিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপক স্বয়ং বিখ্যাত রোয়েণ্টগেন—এক্স-রে'র আবিষ্কর্তা। অন্য অধ্যাপকদের মধ্যে প্রধান সমারফেল্ড।

সে সময়ে পদার্থতত্ত্বে সবচেয়ে বেশী কৌতূহল আকৃষ্ট করেছিল নতুন আবিষ্কৃত এক্স-রে। এক্স রে'র আবিষ্কারই পদার্থতত্ত্বের মোড় ফিরিয়ে দিল। উনবিংশ শতকের তথাকথিত প্রাচীন পদার্থ-বিজ্ঞান দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠতে লাগলো। তত্ত্বের দিক দিয়ে প্ল্যাঙ্কের যুগান্তকারী অবদান কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও মৌলিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে এক্স-রে এবং তার অব্যবহিত ফলস্বরূপ তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার, ইলেকট্রন আবিষ্কার

প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানকে তার বর্তমান রূপদানে সহায়ক হয়। যাহোক, এক্স-রে সম্বন্ধে তখন, অর্থাৎ ১৯০৬-৮ সালেও গবেষকদের আকর্ষণ সর্বাধিক। তখনও কিন্তু প্রমাণিত হয় নি এই অদৃশ্য রশ্মির বহুবিধ ধর্ম। রোয়েণ্টগেন বিশ্বাস করতেন, এই অদৃশ্য রশ্মি ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টি—ক্যাথোড রশ্মি যেমন ইলেকট্রনের স্রোত। অন্য অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, এক্স-রে'র আসল রূপ হলো দৃশ্য আলোর মতই—বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ রূপ। নানা পরীক্ষায় তাঁদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যটুকু কেবলমাত্র খুব ছোট, তাছাড়া দৃশ্য আলোক তরঙ্গের সঙ্গে এই তরঙ্গের কোন পার্থক্য নেই।

লাউয়ের নিজস্ব গবেষণার বিষয় ছিল—আলোক-তরঙ্গের মিশ্রণের প্রতিক্রিয়া বা interference সম্বন্ধে। তরঙ্গের বিশেষ ধর্ম হচ্ছে interference ও diffraction। দুটি বিভিন্ন তরঙ্গ যখন মিশ্রিত হয় তখন যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, একটি তরঙ্গের শীর্ষ অপর তরঙ্গটির অবনমনের উপর পড়ে তবে দুটির ফলাফল পরস্পর বিপরীত-ধর্মী হওয়ায় ঐ মিশ্রণের ফলে সেই স্থানটিতে কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটবে না—দুটি তরঙ্গ যদিও আলাদাভাবে সব জায়গাতেই আলোক-শক্তির তীব্রতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তথাপি পরস্পর মিশ্রণের ফলে কোন কোন জায়গায় এইভাবে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় এবং যেসব জায়গায় দুটিরই, শীর্ষ বা দুটিরই অবনমন মিলে যায়, সে সব জায়গায় তীব্রতর শক্তি জমা হয়। মোটামুটি এই হচ্ছে interference-এর তত্ত্ব। এ তত্ত্বের কথা এখানে বলে এইটুকুই শুধু বিশেষভাবে বোঝাতে চাই যে, এই প্রক্রিয়ার ফলে আলোর তরঙ্গ-ধর্মের বিষয় সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করা যায়। অন্য যে কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটবে—যেমন, শব্দ-তরঙ্গ। তরঙ্গ না হয়ে আলো যদি শক্তিবিশিষ্ট কণার সমষ্টি হতো (নিউটন যেমন ভাবতেন) তবে এই ব্যাপার, অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রণের ফলে স্থলবিশেষে শক্তি-বিলুপ্তির কোন রকমেই ব্যাখ্যা করা যেত না। ঠিক একই কথা ডিফ্র্যাক্‌শন সম্বন্ধেও খাটে! সামনে কোন বাধা পেলে যে কোন তরঙ্গ সেই বাধার ধার ঘেঁষে বেঁকে যায়। চলার পথে কোন কাঠি বা ছোটখাটো কোন বস্তু থাকলে পুকুরের ঢেউ তার পাশ দিয়ে বেঁকে যায়—অর্থাৎ ঢেউয়ের সামনে একটি সরু কাঠি থাকলে সেই কাঠি-বরাবর চলার দিকে একটি 'ছায়া' প্রসারিত হয় না—ঢেউ মিশিয়ে যায় না, বরং কাঠির ঠিক উল্টো দিকেও ঢেউয়ের আবির্ভাব সহজেই দেখা যায়।

আলোর ক্ষেত্রে ডিফ্র্যাক্‌শন-গ্রেটিং নামে একটি যন্ত্র আছে। এটি হচ্ছে এমন একটি ঝাঁঝ্‌রি, যার সমদূরত্বসম্পন্ন ফাটলগুলি দিয়ে আলোক-তরঙ্গ নির্গত হয়, কিন্তু বন্ধ জায়গাগুলি আলোক-তরঙ্গকে বাধা দেয়। কিন্তু আলো যেহেতু তরঙ্গ, সেহেতু বন্ধ জায়গাগুলির ধার ঘেঁষে নির্গত আলোক-তরঙ্গ বেঁকে যাবে। ১নং ছবি অনুযায়ী তখন আলোক-তরঙ্গ ঝাঁঝ্‌রি থেকে নির্গত হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে শূন্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তীব্রতা নিয়ে দেখা দেবে। কোন জায়গায়—যেখানে দুটি তরঙ্গের শীর্ষ ও অবনমনের মিলন ঘটেছে সেখানে অন্ধকার এবং যেখানে শীর্ষে শীর্ষে অথবা অবনমনে-অবনমনে মিলেছে সেখানে তীব্রতা। ঠিক ছবির মতই, ঝাঁঝ্‌রির উল্টোদিকে টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে দেখলে শূন্যে দাঁড়িটানা আলো ও অন্ধকারের একটি ঝালরের মত জিনিষের উপস্থিতি চোখে পড়বে। এভাবে ডিফ্র্যাক্‌শন ঘটিয়েও প্রমাণ করা যায় যে, আলো হচ্ছে তরঙ্গ মাত্র।

মিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থতত্ত্বের ইন-ষ্টিটিউটে লম্বা লম্বা করিডোর আছে। সে সময়ে এই করিডোরগুলির দু-পাশে সাজানো থাকতো বিভিন্ন রকমের স্ফটিক বা কেলাসিত পদার্থের মডেল। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বস্তুই গড়ে ওঠে

কেলাসিত চেহারা নিয়ে। একটি লবণের দানা বা চিনির দানা ভালভাবে দেখলে দেখা যাবে, তার একটি বিশেষ জ্যামিতিক সুমিত চেহারা রয়েছে। আরও আশ্চর্য এই যে, প্রতিটি লবণের দানার ঐ একই চেহারা! পৃথিবীর কেলাসিত বস্তুগুলিকে তাদের বাইরের বিশিষ্ট জ্যামিতিক চেহারা অনুযায়ী ঐ বড় দানাটির মত। এটা কল্পনা করা অন্যায় নয় যে, যে কোন স্ফটিকই আণবিক স্তর থেকে একই আকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটির পর একটি সজ্জিত হয়ে গড়ে ওঠে—যেমন করে একখানির পর একখানি ইট সাজিয়ে একটি বড় ইটের পাঁজা গড়ে তোলা হয়। সুতরাং সেই প্রাথমিক স্ফটিক
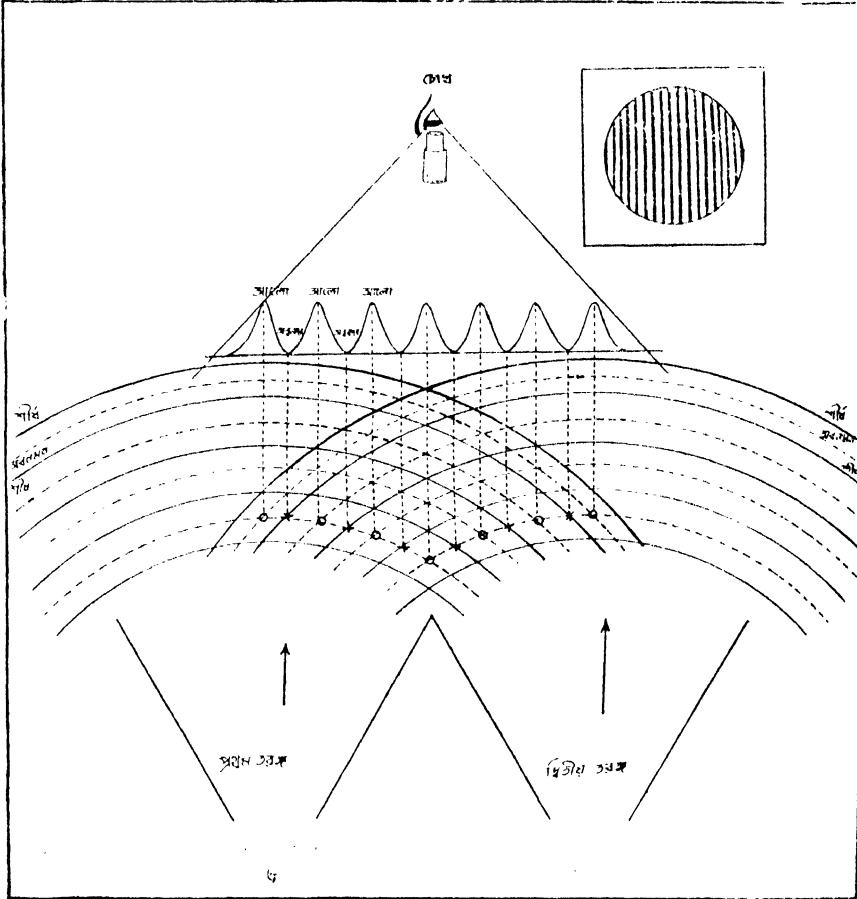
১নং চিত্র

দুটি আলোক-তরঙ্গের মিশ্রণে অন্ধকার ও আলোকের সৃষ্টি

সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কিউবিক, টেট্রাগোনাল, অর্থোরম্বিক, মনোক্লিনিক, হেক্সাগোনাল, রম্বোহেড্রাল, ট্রাইক্লিনিক। শুধুমাত্র বাইরের সুসম জ্যামিতিক চেহারাটুকুই যে স্ফটিকের বিশেষত্ব তা নয়। দেখা যায় যে, যে কোন মোটা-দানার স্ফটিককে সাবধানে ঘা মেরে ভাঙলে ছোট ছোট যেসব দানা পাওয়া যায়, তাদেরও চেহারা ঠিক বা ইটটি হচ্ছে আণবিক-মাপের জিনিষ, যার কয়েকটি পরমাণু একটি বিশেষ জ্যামিতিক চেহারায় সাজানো আছে। পরমাণুর পারস্পরিক বাঁধন একটি বিশেষ ধরণের বলের (force) জন্যেই সম্ভব হয়েছে। ঐ যে জ্যামিতিক চেহারা যা প্রাথমিক স্ফটিকের বিশেষত্ব, তা সম্ভব হয়েছে পারমাণবিক বলের দ্বারা বাঁধা পরমাণুগুলির একটি প্রাথমিক

ত্রিমাত্রিক জাল (Lattice) গড়বার দরুণ। দেখা গেছে, ১৪ রকম বিভিন্ন উপায়ে ঐ জাল গড়া সম্ভব, তবেই ৭ রকম বিশেষ জ্যামিতিক চেহারার স্ফটিক পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, প্রাথমিক জালের মধ্যেকার পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব খুবই ছোট।

এক্স-রে আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই এই স্ফটিক-গঠন তত্ত্বের বিষয় প্রচলিত ছিল। কিন্তু এর সবটাই ছিল পদার্থতাত্ত্বিকদের অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়া। অণু বা পরমাণু কোন উপায়েই

এমন সময় একদিন পি. পি, ইভান্স নামে অধ্যাপক সমারফেল্ডের এক ছাত্র লাউয়ের কাছে এলেন স্ফটিক-গঠন তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে। এই কথাবার্তার সময়েই ফন লাউয়ের মস্তিষ্কে তড়িৎশিখাবৎ একটি নতুন চিন্তার উদয় হলো।

এক্স-রে তখন বেশ পরিচিত বস্তু, অ্যাটম বা পরমাণু সর্বাধিক আলোচিত জিনিষ, স্ফটিক-গঠন তত্ত্ব বহু গবেষিত—কিন্তু লাউয়ে হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যাঁর চিন্তায় ঐ তিনটি বিভিন্ন জিনিষ একটি
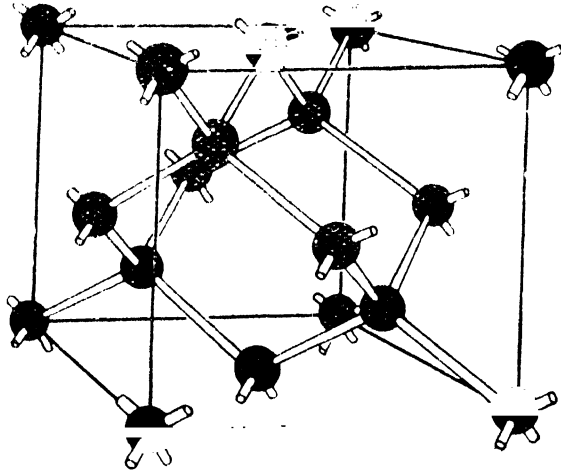
২নং চিত্র
হীরক কৃষ্ট্যালের পরমাণু-সজ্জার মডেল

দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং প্রাথমিক জাল বা প্রাথমিক স্ফটিককে কখনও দেখা যাবে না। বহুকোটি গুণ বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত স্ফটিকটি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসবে না।

মিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে সাজানো স্ফটিক মডেলগুলির সব কয়টিই পদার্থতাত্ত্বিকদের অনুমানমূলক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। একথা কেউ বলতে পারতো না যে, পদার্থতাত্ত্বিকদের জানা কোন অস্ত্র দিয়ে স্ফটিকের প্রাথমিক গঠনের স্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তবে ঐ চেহারাগুলি গড়া হয়েছে। শুধু বৃহদাকার স্ফটিকের বাইরের সুসম চেহারা দেখে অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মাত্র নতুন সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। স্বয়ং রোয়েণ্টগেনের স্ফটিক-গঠন তত্ত্বের উপর প্রায় ৫৮টি গবেষণা-পত্র রয়েছে। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মি ও স্ফটিকের সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব লাউয়ের।

লাউয়ের মনে যে চিন্তার উদয় হলো তা হচ্ছে এই রকম—এক্স-রে যদি বস্তুকণা না হয়ে (রোয়েণ্টগেন যা ভাবতেন) ঈথারে উত্থিত তরঙ্গই হয়, তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতিশয় ক্ষুদ্র। ইভান্সের সঙ্গে যে কথাবার্তা হলো, তাতে স্ফটিকের প্রাথমিক পারমাণবিক দূরত্ব—তাও অতি ক্ষুদ্র বলে বোঝা গেল। এই স্ফটিকের মধ্যস্থিত পরমাণুর যে জ্যামিতিক জাল বিস্তৃত রয়েছে, তাকে স্বচ্ছন্দেই একটি ত্রিমাত্রিক ডিফ্র্যাক্‌শন-গ্রেটিং-এর সঙ্গে তুলনা

করা চলে। গ্রেটিং-এর আলোক-তরঙ্গ যাবার পাশাপাশি ফাটলগুলি সব সমদূরবর্তী। স্ফটিকেও পরমাণুগুলি সব সমদূরবর্তী (যে কোন একটি দিক বরাবর)। আমরা জানি, এক্স-রে কেবলমাত্র পরমাণুর ওপর থেকে বিচ্ছুরিত হয়। সুতরাং সমদূরবর্তী পরপর সাজানো পরমাণুগুলিই ডিফ্র্যাক্‌শন-ঝাঁঝরির (গ্রেটিং) ফাটল হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। ঐ ফাটলের পারস্পরিক দূরত্ব—হিসাবমত এক্স-রে'র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় সমতুল্য। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি, একটি স্ফটিকের মধ্য দিয়ে এক্স-রে পাঠালে আলোর ডিফ্র্যাক্‌শনের মতই এক্স-রে'রও ডিফ্র্যাক্‌শন ঘটবে। ফলে যেমন দেবে। সমগ্র প্লেটটিতে একটি জ্যামিতিক নক্সার চেহারা দেখা যাবে।

যদি এ রকম ঘটে, তবে একই সঙ্গে অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে—এক্স-রে'র তরঙ্গ-ধর্মের বাস্তবতা, বোঝা যাবে স্ফটিকের অনুমিত গঠন-তত্ত্বের সত্যতা—আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই হবে যে, এই পরীক্ষার সফলতাই পরমাণুর অস্তিত্বের বিষয় সর্বপ্রথম দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত করবে।

স্ফটিকের হচ্ছে এক্স-রে'র ক্ষেত্রে স্বভাবসৃষ্ট গ্রেটিং; এক্স-রে'র মত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে নকল গ্রেটিং তৈরী করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত।
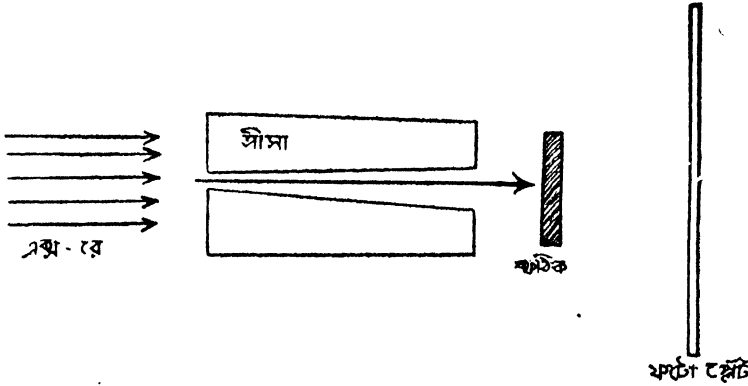
৩নং চিত্র
লাউয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি

গ্রেটিং-নির্গত আলোক-তরঙ্গগুলি পারস্পরিক জড়াজড়ির ফলে টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে আলো-আঁধারির ঝালর সৃষ্টি করে, স্ফটিক থেকে নির্গত এক্স-রেও তেমনি কোন কোন জায়গায় বিলুপ্ত আবার কোন কোন জায়গায় বেশী তীব্রতা নিয়ে দেখা দেবে। শুধু তফাৎ হচ্ছে এই যে, স্ফটিক দ্বিমাত্রিক গ্রেটিং না হয়ে ত্রিমাত্রিক গ্রেটিং-এর মত ব্যবহার করবে। স্ফটিক থেকে নির্গত এক্স-রে'র ক্ষেত্রে যদি একটি ফটোগ্রাফের প্লেট রাখা যায়, তবে সেই প্লেটে যে ছবি উঠবে তা হবে কালো কালো কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টি—অর্থাৎ যে যে জায়গায় 'তীব্রতা' জড়ো হয়েছে, সেই জায়গাগুলি কালো বিন্দু হয়ে দেখা

এভাবে ম্যাক্স ফন লাউয়ের প্রতিভা এ-রকম একটি সম্ভাবনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে এক মুহূর্তে অবহিত হয়ে উঠলো। ১৯১২ সাল। মিউনিশে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা-চক্রে প্রথম লাউয়ে তাঁর এই চিন্তার কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, রোয়েন্টগেন, সমারফেল্ড প্রভৃতির মত বিখ্যাত চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরাও এ কথা বিশ্বাস করলেন না—হেসে উড়িয়ে দিলেন। একি কখনও সম্ভব? তাঁরা লাউয়েকে—এসব বাজে চিন্তা ত্যাগ করবার উপদেশ দিলেন। তাঁদের ধারণামত, শক্তিশালী

এক্স-রে স্ফটিককে ভেদ করে সরাসরি নির্গত হবে, ডিফ্র্যাক্‌শন ঘটবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু লাউয়ে অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। অধ্যক্ষ হচ্ছেন সমারফেল্ড; তাঁর অমতে কোন পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। তবুও লাউয়ে অধ্যাপক সমারফেল্ডের এক সহকারী, ডাঃ ফ্রিয়েডরিশ-এর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে একটি যন্ত্র খাড়া করলেন।

তারপর দু-জনে মিলে সামান্য একটু কৌশল করে তাঁর মত আদায় করলেন—ঐ যন্ত্রটি ব্যবহার করবার জন্যে।

প্রথম পরীক্ষা ব্যর্থ হলো, কল্পনা অনুযায়ী ব্যাপার ঘটলো না। দ্বিতীয়বার লাউয়ে একটুক্‌রা তুঁতে বা কপার সালফেট স্ফটিক, একটি সরু পথ-দিয়ে আসা তীক্ষ্ণ এক্স-রে'র সামনে ধরলেন। তার পিছনে কিছুদূরে (প্রায় ৫ সেন্টিমিটার) রইলো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফির প্লেট। কয়েক ঘণ্টা পরে প্লেটটি বের করে নিয়ে ডাঃ ফ্রিয়েডরিশ্‌ ডার্ক-রুমে ঢোকলেন যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারা ইনষ্টিটিউটে কেউ নেই, তিনি একা। ডার্ক-রুমে প্লেটটি ডেভেলপ করা মাত্র তাঁর চোখে ফুটে উঠলো কালো কালো বিন্দু দিয়ে গড়া যেন একটি জ্যামিতিক নক্সা!

তাঁদের পরীক্ষা সার্থক হলো, প্রমাণিত হলো কপার সালফেট স্ফটিকের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এক্স-রে'র ডিফ্র্যাক্‌শন ঘটেছে! পরীক্ষা শেষে একা, রাত্রে সেই ইনষ্টিটিউটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাঃ ফ্রিয়েডরিশের উত্তেজনা ও আনন্দ আমরা কল্পনা করতে পারি। পরদিন তিনি লাউয়ে ও সমারফেল্ডকে জানালেন পরীক্ষার সাফল্যের কথা। এতদিনে সমারফেল্ড উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি লেবরেটরীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন লাউয়ের নির্দেশমত কাজে। অধ্যাপক রোয়েন্টগেন কিন্তু তখনও অবিশ্বাসীই রইলেন।

৪নং চিত্র

কার্বোর‍্যাণ্ডাম ক্রিষ্ট্যালের লাউয়ে ফটোগ্রাফ

লাউয়ে এরপর প্রাকৃতিক স্ফটিক কর্তৃক এক্স-রে'র ডিফ্র্যাক্‌শনের সম্পূর্ণ তত্ত্ব খাড়া করলেন। সব কিছুই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হলো। এক্স রে'র প্রকৃতরূপ যে ঈথারে উত্থিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ছোট তা প্রমাণিত হলো—সেই সঙ্গে প্রমাণিত হলো স্ফটিকের গঠন, যা বাইরের চেহারা থেকে অনুমান করা হতো, তার সত্যতা। পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্বের এই প্রথম সরাসরি প্রমাণ! ১৯১২ সালের ১২ই জুন—অর্থাৎ ঠিক ৩৭ বছর আগে, বার্লিনে পদার্থতত্ত্ব সমিতির সামনে তিনি বক্তৃতা দিলেন। সমবেত বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, কতবড় ও কতপ্রয়োজনীয় আবিষ্কার লাউয়ে করেছেন। ১৯১৪ সালে লাউয়ে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

লাউয়ের আবিষ্কারের ফলস্বরূপ গড়ে উঠ্‌লো X-ray Crystallography ও X-ray Spectroscopy নামে বিজ্ঞানের দুটি শাখা। ব্র্যাগ ও বার্কলা ইংল্যাণ্ডে এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপী বা বর্ণালীবীক্ষণের গোড়াপত্তন করলেন—ব্র্যাগ সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে স্ফটিক থেকে এক্স-রে'র interference-কে সহজ করে সরল গাণিতিক নিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্র্যাগের সমীকরণ এক্স-রে বর্ণালীবীক্ষণের পথ সহজ করে দিল। মোসলীর কাজ, বহুবিধ পদার্থ থেকে উদ্ভূত এক্স রে'র বর্ণালীবীক্ষণের পথ সহজ করে দিল। মোসলীর কাজ, বহুবিধ পদার্থ থেকে উদ্ভূত এক্স-রে'র বর্ণালীবীক্ষণের ফল পরমাণুর গঠনের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে গড়ে উঠতে সাহায্য করলো। এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শন ও এক্স রে-ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী আজ শিল্পজগতে অতি প্রয়োজনীয় কাজে লাগছে। তাছাড়াও রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শন মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিষ। প্রোটিন বা চর্বিজাতীয় পদার্থের কেলাসিত গঠন-প্রণালী জানবার কাজ—প্রাণের বিকাশের স্বরূপ জানবার জন্যে প্রয়োজন। গত বছরই রাসায়নিক ডাঃ স্যাঙ্গার প্রোটিনের কেলাস-গঠন বা Crystal Structure সম্বন্ধে কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

আদিমতম এককোষী প্রাণীতেও এই প্রোটিনের অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রোটিনই হচ্ছে জীবন উৎপত্তির মূল রহস্য। হয়তো এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শন এই প্রোটিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে জীবন উৎপত্তির মৌলিক রহস্যের কিনারা করবে। পেনিসিলিন, সর্পগন্ধা প্রভৃতি ঔষধেরও গঠন পরীক্ষায় এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শনের দান কম নয়। High polymer বা বিরাটাকৃতির অণুসমন্বিত জৈব পদার্থের গঠন জানবার কাজে এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শনের বর্তমানে প্রয়োগ হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে লাউয়ে, ডি-ব্রলি আবিষ্কৃত বস্তু-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও নিজের গবেষণার ফল প্রসারিত করেন। ১৯৪৭ সালে তাঁর আর একটি বিখ্যাত গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়—তা হলো সুপ্রা-কণ্ডাক্‌টিভিটির তত্ত্ব। অনেক ধাতু, সীসা, টিন প্রভৃতিকে যদি তরল হিলিয়ামের তাপে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রায় শূন্য ডিগ্রী অ্যাবসলিউট-এর কাছে তার উত্তাপ রাখা যায় (০° সেণ্টিগ্রেড = ২৭৩° অ্যাবসলিউট; সুতরাং ০° অ্যাবসলিউট = −২৭৩° সেণ্টিগ্রেড) তবে দেখা যায়, সেসব ধাতুর বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকতা বা electrical resistance সহসা লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় ঐ ধাতুর মধ্যে অতি সামান্যমাত্রও আবিষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে বহুক্ষণ ধরে প্রবাহিত হবে। এই ধরণের পদার্থকে সুপ্রা-কণ্ডাক্টর বলা হয় এবং এই ব্যাপারটিকে সুপ্রা-কণ্ডাকটিভিটি নাম দেওয়া হয়েছে। এই সুপ্রা-কারেণ্ট পদার্থের উপরে অতি ক্ষীণ আস্তরণে মাত্র প্রবাহিত হয়, পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে না। এই বিশেষ বিষয়টি বৈজ্ঞানিকদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়। লাউয়ে এর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিখ্যাত আবিষ্কারক ছাড়াও অন্য একটি বিশেষ

ভূমিকার জন্যে লাউয়ের নাম পৃথিবীতে বিজ্ঞানী-সমাজের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেটি হলো—আইনষ্টাইনের আবিষ্কর্তার ভূমিকা। আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে লাউয়েই প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৯০৫ সালে যখন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন নামের কোন বিজ্ঞানীকে জগৎ চিনতো না, তখন তাঁর প্রথম গবেষণা-পত্র লাউয়েকে আকৃষ্ট করেছিল। লাউয়ে তৎক্ষণাৎ সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণে ছুটলেন সেখানকার পেটেন্ট অফিসের কর্মচারী আইনষ্টাইনের কাছে। জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের সেখানেই সূত্রপাত। লাউয়ের চেষ্টার ফলে আইনষ্টাইন অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই সরাসরি জুরিখে অধ্যাপক হন। তাঁর এই পদপ্রাপ্তি অনেকেরই ভাল লাগে নি তখন, অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু প্রধানতঃ লাউয়ের চেষ্টাতেই আইনষ্টাইনের প্রতিভা অবশেষে সমাদর লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে নাৎসী উন্মত্ততার কবল থেকে আইনষ্টাইনকে রক্ষা করে তাঁকে বাইরে সরিয়ে দেওয়াতেও লাউয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি নিজেও ফ্যাসীবাদের পরম শত্রু ছিলেন।
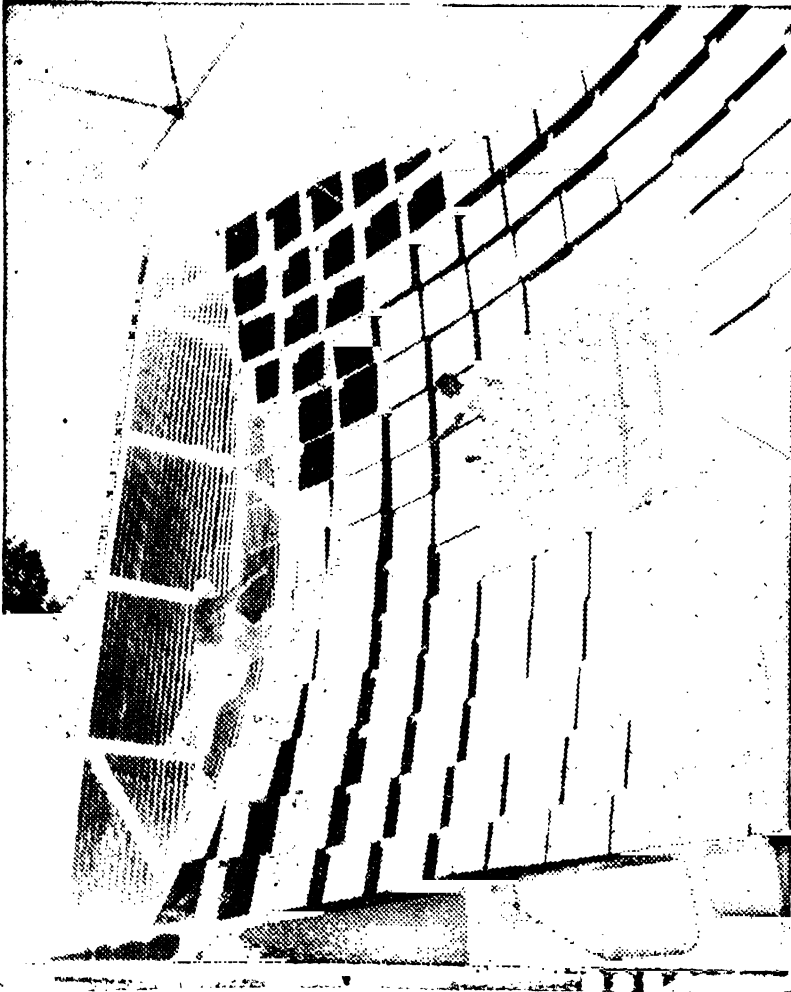
নেটিকের (ম্যাসাচুসেট্‌স্) নবনির্মিত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সৌরচুল্লী। ৩০ বর্গফুট পরিমিত এই অবতল সমাহরকটির (Concentrator) মধ্যে ১৯০টি বর্তুলাকৃতির আয়না সজ্জিত আছে। এই আয়নাগুলির সাহায্যে ৫০০° ফারেনহাইট তাপ উৎপাদন করা যায়। হেলিওষ্ট্যাট কর্তৃক এর উপর প্রতিফলিত ১৪২০ বর্গফুট সূর্যরশ্মিকে সমাহরকটি ৪ ইঞ্চি রশ্মিতে পরিণত করে।

গণিতে রহস্যবাদ

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

আদিম মানব পৃথিবীকে দেখেছিল ভয় ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে; তাই তার শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুর মধ্যে রহস্য জড়িয়ে গিয়েছিল। এই রহস্য ঘনীভূত করেছিল আদিম মানবের দীক্ষাদাতারা। দীক্ষার ভার প্রথমে দলপতি থেকে ক্রমে এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে এসে পড়ে—ইতিহাসে যাদের বলা হয়েছে পুরোহিত সম্প্রদায়। এরা ছিল বুদ্ধিজীবী। সাধারণ মানুষের চিন্তার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেবার ফলে সাধারণ মানুষ স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারিয়ে পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল। এরা কখনও অজ্ঞতার ফলে, কখনও বা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আদিম মানবের সব জ্ঞানকে রহস্যাবৃত করে রেখেছিল। এমনিভাবে আদিম গণিতশাস্ত্রও রহস্যের মধ্যে জন্মলাভ করে। গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা বোধ হয় প্রাচীনতম। আকাশের দীপ্তিশীল জ্যোতিষ্কেরা আদিম মানবকে রহস্যময় হাতছানি দিত; তাই এরা দেবতার আসন অধিকার করেছিল। এই জ্যোতির্দেবতাদের আগমন ও অবস্থানের জন্যে প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং গ্রীকরা মন্দির নির্মাণ করে দিত। চেওপ্‌সের বিখ্যাত পিরামিডটি যে কেবল সমাধির জন্যেই রচিত হয়েছিল তা নয়, এর একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় সার্থকতাও ছিল। উত্তর গোলার্ধের আকাশে সবচেয়ে যে উজ্জ্বল তারাটি—গ্রীকরা যাকে কুকুর তারকা বলতো, হিন্দুরা যার নাম দিয়েছিল লুব্ধক—যখন মিশরের আকাশে পূর্বদিগন্তে প্রথম আবির্ভূত হতো, তখনই মিশরের প্রাণস্বরূপ নীল নদে বন্যা আসতো; যার ফলে উত্তর মিশর শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো। এই জ্যোতির্দেবতাটি ছিল মিশরের ভাগ্যবিধাতা শুভ তারকা। চেওপ্‌সের পিরামিডটি এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে, লুব্ধক যখন খ-মধ্য অতিক্রম করতো তখন তার আলো পিরামিডের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর লম্বভাবে পড়তো এবং একটা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে মৃত ফেরাওর মমির ঠিক মাথার উপর পড়তো।

গণিতের জন্ম দিয়েছে কারা? অনেকের ধারণা, বুদ্ধিজীবী পুরোহিত সম্প্রদায়ই এর জন্মদাতা। কিন্তু এটা ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে নিজেদের বাঁচবার তাগিদেই এর জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু উচ্চ চিন্তাশক্তির অভাবে তারা এর বিশেষ উন্নতি করে উঠতে পারে নি, নিজেদের ছোটখাটো সমস্যাগুলি সমাধান করবার মত জ্ঞানলাভ করেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। এমন সময় সমাজের আয়েসী বুদ্ধিজীবীরা, যাদের চিন্তা করবার সুযোগ ও অবসর ছিল, তারা এর চর্চার ভার গ্রহণ করলো। এর ফলে গণিতশাস্ত্রের একদিক দিয়ে যেমন অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, অন্যদিক দিয়ে তেমনি এক বিপদ উপস্থিত হলো। মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের যোগাযোগ না হওয়ার ফলে গণিতশাস্ত্র শীঘ্রই বাস্তবতার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দার্শনিকতার শূন্যমার্গে অবস্থান করতে লাগলো। প্রাচীন গ্রীকরা বিশুদ্ধ জ্যামিতির অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেছিল; কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে তারা বিশেষ ঘৃণার চোখে দেখতো। এ কাজটা করতো ক্রীতদাসেরা। গ্রীক গণিতবিদেরা জ্যামিতি থেকে সংখ্যা ও পরিমাপ বিসর্জন দিয়ে সংখ্যা নিয়ে এক খেলা আরম্ভ করেছিল, আমরা যেমন করি শব্দশৃঙ্খল (cross word) নিয়ে। অন্যদিকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যামিতি হয়ে পড়লো দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত। প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খৃঃপূঃ)

প্রচার করেন যে, জ্যামিতি হচ্ছে এক ধরণের উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক চর্চা; এতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। প্লেটো ছিলেন দার্শনিক, কিন্তু তিনি জ্যামিতির মধ্যে হস্তক্ষেপ করে এর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর শিক্ষার ফলে গ্রীক গণিতের উপর এক রহস্যের যবনিকা নেমে এসেছিল। প্লেটো বললেন, এই যে দৃশ্যমান জগৎ, এটা প্রকৃত জগতের একটা ছায়ামাত্র। এই প্রকৃত জগতের কোন কিছুই আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়, তা শূন্যে অবস্থান করে। তিনি এদের নাম দিলেন ইউনিভার্স্যালস্। ইউনিভার্স্যালসের জগতের সমূহ বস্তু, কথাবার্তা ও সংখ্যার মধ্যে আছে গভীর রহস্য। মানুষ বা পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে তার জড় দেহটার সম্বন্ধেই জ্ঞানলাভ হয়, আসল বস্তুর নাগাল পাওয়া যায় না। সংখ্যা নিয়ে কারবার করতে গেলেও তাদের আসল স্বরূপটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। প্লেটো জ্যামিতির রহস্যজনক ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন—মাটি জগৎটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ, মাটি জল হলো সমকোণী ত্রিভুজ, মাটি আগুন হলো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং মাটি বায়ু হলো বিষমবাহু ত্রিভুজ। এমন সব রহস্যজনক ব্যাখ্যার ফলে জ্যামিতির পরিধি অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

আদি গ্রীক গণিতজ্ঞদের মধ্যে অবশ্য উদারপন্থী কয়েকজন ছিলেন। এঁদের মধ্যে থ্যালেস (৬৩০—৫৪৭ খৃঃ পূঃ), পিথাগোরাস (৫৮২—৫০৭ খৃঃ পূঃ) এবং ডিমোক্রিটাসের (৪৬০ খৃঃ পূঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করে নিজেদের আবিষ্কৃত তথ্য ব্যাখ্যা করতেন। ডিমোক্রিটাস বলতেন, জ্ঞান কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়, সকলের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করবার মধ্যেই এর সার্থকতা। পিথাগোরাসও গণিত সম্পর্কে যথেষ্ট উদার মত পোষণ করতেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কতকগুলি গোপন সমিতি গঠন করে। এদের নাম পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ (Pythagorean Brotherhoods)। এরা গণিতকে রহস্য ও গোপনীয়তার আড়াল করে দেয়। এই সব সমিতির সভ্যদের শপথ করতে হতো যে, তারা তাদের জ্ঞাত বা আবিষ্কৃত কোন তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করবে না। কথিত আছে যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে হিপাসাস নামে এইরূপ একটি সমিতির সভ্য সাধারণ্যে প্রচার করেছিলেন যে, তিনি একটি নতুন দ্বাদশতল ঘন আবিষ্কার করেছেন। এর জন্যে তাঁকে তাঁর স্নানের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। এর বহু পরে পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ অবশ্য তাদের নিয়মকানুন শিথিল করে তাদের আবিষ্কৃত তথ্য সম্পর্কে বই প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিল; কিন্তু তখন গ্রীক জ্যামিতি এবং সংখ্যাবিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দে যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিয়াম স্থাপিত হলো, তখন গ্রীক প্রতিভার সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এর পর গ্রীক গণিতে আর বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নি। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন তুর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপোলের পতন হলো তখন গ্রীসদেশে সজীব গণিতের অবসান হয়ে গেছে। তার স্থলে আরম্ভ হয়েছে গণিতের মৃতদেহ নিয়ে এক ভুতুড়ে খেলা। এই খেলার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক বর্গ (Magic Square)। এ হচ্ছে সংখ্যা নিয়ে এক ধরণের খেলা। একটা বর্গাকার ক্ষেত্রকে আড়ে-লম্বে কয়েকটা সমান অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক ঘরে কতকগুলি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে প্রত্যেক স্তম্ভে, সারিতে এবং কোণাকুণি সংখ্যাগুলি যোগ করলে একই হয়। এরূপ ম্যাজিক বর্গের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি এবং ব্যাধি নিরাময় করবার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হতো। গ্রীকরা কোনরূপ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হলে, এরূপ নতুন নতুন ম্যাজিক বর্গের সৃষ্টি করতেন। এই ম্যাজিক বর্গ যে

গ্রীকদের প্রথম সৃষ্টি, তা মনে হয় না। গ্রীক ও রোমে এটা বোধ হয় প্রবেশ করেছিল ফিনিসীয়দের মারফতে বাণিজ্যের পথ ধরে। ফিনিসীয়রা সম্ভবতঃ এটা চীন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছিল। ইতিহাসে প্রথম ম্যাজিক বর্গের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে লিখিত একখানি চীনা পুস্তকে। এতে প্রত্যেক স্তম্ভে, সারিতে এবং কোণাকুণি সংখ্যাগুলি যোগ করলে ১৫ হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চিত্র থেকে তখনকার চীনাদের সংখ্যালিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা হবে। এরূপ সংখ্যা নিয়ে খেলা এককালে ছিল। কিন্তু ভারতীয় গণিতের মধ্যে এর বাড়াবাড়ি কোন দিন হয় নি। বরং ভারতবর্ষে এর পরোক্ষ শুভ ফল রূপে সংখ্যার শ্রেণী (series) নিয়ে বহু জটিল সমাধান হয়েছিল, যা গ্রীকদেশে সম্ভব হয় নি। এর কারণ ভারতীয় গণিতবিদেরা এক পরিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, গ্রীকরা যার ধারেকাছেও যেতে পারে নি।

গ্রীকরা সংখ্যাগুলিকে জীবন্ত মনে করতো, এবং এদের উপর নানাপ্রকার গুণ আরোপ
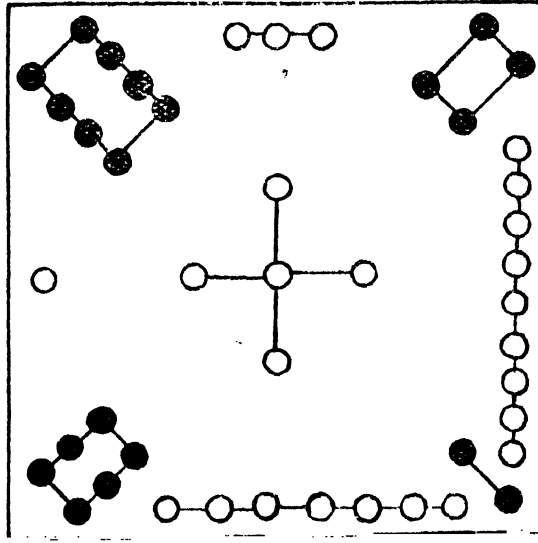
প্রথম চীনা ম্যাজিক বর্গ

১নং চিত্র

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে একটা ম্যাজিক বর্গ রূপার পাতের উপর খোদাই করে প্লেগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হতো। ভারতবর্ষেও এর ব্যবহার দেখা যায় ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে। হিন্দু জ্যোতিষে ৩২-এর ঘর পূরণ বলে একটা ম্যাজিক বর্গ আছে। মনে হয় এটা শিশু ও প্রসূতিদের রক্ষাকবচরূপে ব্যবহৃত হতো। এ জিনিষটা সম্ভবতঃ ভারতীয় জ্যোতিষের উপর গ্রীক (যবন) জ্যোতিষের প্রভাবের ফলে এসে- করতো। প্রথমতঃ সংখ্যাগুলিকে পুরুষ ও স্ত্রী—দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিযোড় সংখ্যাগুলি পুরুষ আর যোড় সংখ্যাগুলি স্ত্রী। সংখ্যার স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ প্রথম চীনারা করেছিল। ১নং চিত্রের চীনা ম্যাজিক বর্গের চিত্রে দেখা যাবে, যোড় সংখ্যাগুলিকে কালো বৃত্তের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে—এরা স্ত্রী সংখ্যা। বিযোড় সংখ্যাগুলিকে সাদা বৃত্তের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে—এরা পুরুষ সংখ্যা। হিন্দু জ্যোতিষের মধ্যেও দেখা যায়, রাশিচক্রের বিযোড় ঘরগুলিকে

পুরুষ এবং যোড় ঘরগুলিকে স্ত্রী মনে করা হয়েছে। এটাও সম্ভবতঃ গ্রীক প্রভাবের ফল।

আগেই বলেছি, পিথাগোরাস গণিত সম্পর্কে উদারপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনিও সংখ্যা সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত ছিলেন না। তিনি সংখ্যার নানা-প্রকার নৈতিক গুণ কল্পনা করেছিলেন। এক-কে সংখ্যা না মনে করে, সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তিস্থল মনে করা হতো। 'এক' ছিল বিচারশক্তির প্রতীক, 'দুই' যুক্তি-শক্তির, 'তিন' যৌন-শক্তির, 'চার' ন্যায়-পরায়ণতার এবং পাঁচ বিবাহের প্রতীক; কারণ পাঁচ হচ্ছে, তিন (প্রথম পুরুষ সংখ্যা) এবং দুইয়ের (প্রথম স্ত্রী সংখ্যা) যোগে গঠিত। পিথাগোরাসের মতে, পাঁচের মধ্যে আছে বর্ণের রহস্য, ছয়ের মধ্যে শীতলতার, সাতের মধ্যে স্বাস্থ্যের এবং আটের মধ্যে আছে প্রেমের রহস্য; কারণ আট হচ্ছে তিন (যৌন-ক্ষমতা) এবং পাঁচের (বিবাহ) দ্বারা গঠিত। চার সংখ্যাটাকে গ্রীকরা বিশেষ পবিত্র জ্ঞান করতো; চার ছিল সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। ছয় তলবিশিষ্ট ঘন বস্তুর মধ্যে ছিল পৃথিবীর রহস্য, পিরামিডের মধ্যে আগুনের এবং দ্বাদশতল ঘন বস্তুর মধ্যে ছিল আকাশের রহস্য। গোলককে মনে করা হতো সবচেয়ে নিখুঁত ঘন পদার্থ। মানুষের মাথাটা যেহেতু গোল, সেহেতু দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মাথাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হতো। সংখ্যাগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। সংখ্যাগুলি যেন কতকগুলি-ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে কেউ চট্‌পটে, কেউ ক্যোকাটে, কেউ বা মিট্‌মিটে। আরও এক রকম সংখ্যা ছিল যারা হচ্ছে একেবারে নিখুঁত। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের সমস্ত উৎপাদকগুলি যোগ করলে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায়। এদের প্রথমটা হলো ৬(১+২+৩=৬), পরেরটা ২৮(১+২+৪+৭+১৪=২৮)। সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪ – ৪৩০ খৃঃ) মনে করতেন যে, ভগবান যে ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন তার কারণ ৬ হচ্ছে নিখুঁত সংখ্যা। একই কারণে চন্দ্র ২৮ দিনে পৃথিবী পরিক্রমণ করে। এর পরের দুটি নিখুঁত সংখ্যা বের করতে গ্রীকদের বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সে সংখ্যা দুটি হচ্ছে ৪৯৬ এবং ৮১২৮। এর পরের সংখ্যাটা আলেকজান্দ্রিয়ার নিকোমেকাস (১০০ খৃঃ) আবিষ্কার করেছিলেন বহু বছর পরে। সেটা হচ্ছে ৩৩৫৫০৩৩৬। নিকোমেকাস এথেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাল এবং সুন্দর সংখ্যাগুলি খুবই বিরল; বাজে, কুৎসিত সংখ্যাগুলি গাদাগাদা। এই সিদ্ধান্তটা গ্রীকদের দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আর এক রকমের সংখ্যা ছিল, তাদের বলা হতো মিত্র সংখ্যা; যেমন—২২০, ২৮৪। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ২২০-এর উৎপাদকগুলি (১,২,৪,৫,১০,১১,২০,২২,৪৪,৫৫,১১০) যোগ করলে ২৮৪ হয় এবং ২৮৪-এর উৎপাদকগুলি (১,২,৪,৭১, ১৪২) যোগ করলে ২২০ হয়। আর এক শ্রেণীর সংখ্যা হলো—ত্রিভুজ সংখ্যা; এরা ছিল শুভসূচক। এরা গঠিত হতো ১ থেকে পর পর কতকগুলি সংখ্যা যোগ করে। এদের প্রথমটা ৩(১+২), পরেরটা ৬(১+২+৩), তার পরেরটা ১০(১+২+৩+৪)। এছাড়া বর্গ সংখ্যা, পঞ্চভুজ সংখ্যা, ষড়ভুজ সংখ্যা, তারকা সংখ্যা—এমন বহু প্রকার জ্যামিতিক সংখ্যার কল্পনা করা হয়েছিল (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এসব সংখ্যাগুলিকে বিশেষ জ্যামিতিক ক্ষেত্রাকারে সাজানো যেত বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল।

এর পরে সংখ্যা নিয়ে গ্রীকরা আর এক রকম ম্যাজিক আরম্ভ করে; তার নাম জিমেট্রিয়া। গ্রীকরা বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা লিখতো এবং এথেকেই জিমেট্রিয়ার জন্ম হয়। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে যে বর্ণগুলি আছে, তাদের প্রতীক সংখ্যাগুলি যোগ করলে যে সংখ্যাটা হতো, সেই সংখ্যাটাকে সেই শব্দের প্রতীক মনে করা হতো। একিলিস যে হেক্টরকে পরাজিত করেছিল, তার কারণ Achillis শব্দের সংখ্যাটা হলো ১২৭৬, কিন্তু Hector-এর সংখ্যাটা হলো ১২২৫। জিমেট্রিয়ার

প্রভাব ইউরোপের আকাশকে বহুদিন ধরে কুয়াসাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের বিবাদের ফলে যে সব পুস্তিকার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। পিটার বাঙ্গাস নামে একজন রোমান ক্যাথলিক প্রমাণ করেছিলেন যে, মার্টিন লুথারের নামের সংখ্যা ৬৬৬ দ্বারা 'পশু' বুঝায়। মার্টিন লুথারের এক শিষ্য ষ্টাইফেল এর কথা আগেই বলেছি। এখনও আমরা কতকগুলি সংখ্যাকে বিশেষ শক্তিশালী বলে মনে করি। আমাদের চলিত প্রবাদে বলে, 'নয় ছয় ভাগ্যে হয়'। পরীক্ষার রোল নম্বর, লটারির টিকিট ইত্যাদির শেষ অঙ্কটা শূন্য হওয়া খুবই খারাপ। দান করতে হলে ১০১, ১০০১ টাকা দিতে হয়। জোরালো শপথ করতে "তিন সত্যি" করা হয়। পাশ্চাত্য-জগৎ এখনও ১৩ সংখ্যাটাকে অমঙ্গল সূচক মনে

২৭২ চিত্র

জবাব দিয়েছিলেন যে, ৬৬৬ সংখ্যাটা পোপ দশম লিও-এর প্রতীক।

সংখ্যার মধ্যে রহস্যের মিশ্রণের ফলে গ্রীস দেশে গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতি এক সময়ে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক-গণিতের প্রাণ-স্রোত একদিন কুসংস্কারের শৈবালে রুদ্ধ হয়ে যাবার পর ভারতীয়-গণিতের প্রবল প্রাণ-প্রবাহ বহু পরে ইউরোপকে নবধারার সন্ধান দেয়। ভারতবর্ষ যে সংখ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। হিন্দু-জ্যোতিষের উপর গ্রীক প্রভাবের করে। তারা ১৩ জন এক জায়গায় বসবে না, ১৩ জন মিলে কোন কাজ করবে না, কমিটির মেম্বার ১৩ জন হবে না। এ সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার কিন্তু কিছুদিন আগে হয়ে গেছে। এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং ও হিলারীর দলে ছিল ১৩ জন লোক। এমনি করে বারে বারে আমাদের কুসংস্কারে আঘাত পড়েছে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর পরমাণু-যুগেও সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পায় নি।

মরুভূমি

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমিগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বিষুবরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে বিশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার বৃহৎ মরুভূমিগুলি অবস্থিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপই একমাত্র মহাদেশ যেখানে কোন মরুভূমি নেই। ইউরোপের ক্ষুদ্র আয়তন এবং ভৌগলিক অবস্থিতিই মরুশূন্যতার কারণ বলে মনে করা হয়। মরুভূমিকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

১। উষ্ণ মরুদেশীয় অঞ্চল--পৃথিবীর কর্কট ও মকরক্রান্তি রেখাদ্বয়ের নিকট বায়ুর চাপ অধিক। জল যেমন উচ্চ থেকে নিম্নস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়, বায়ুও তেমনি উচ্চ-চাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে অগ্রসর হয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখাদ্বয়ের নিকট বায়ুর চাপ বেশী হওয়ায় এ দুই রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বায়ু-প্রবাহ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমন করে। বিষুবরেখার দিকে প্রবহমান বায়ুস্রোত আয়ন-বায়ু নামে পরিচিত এবং মেরুপ্রদেশের দিকে প্রবহমান বায়ুস্রোতের নাম প্রত্যায়ন বায়ু। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি থেকে বায়ুস্রোত উত্তরে এবং দক্ষিণে প্রবাহিত হয়; কিন্তু কোন সজল বায়ুপ্রবাহ এখানে সাধারণতঃ আসে না। তাই এখানে কোন বৃষ্টিপাত হয় না। ক্রমাগত অনাবৃষ্টির ফলে মাটি প্রথমে শুষ্ক ও অনুর্বর হয়ে পড়ে—তারপর ধীরে ধীরে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে বালিতে পরিণত হয়। তখন দিনে প্রখর উত্তাপ, রাত্রিতে প্রচণ্ড শীত। কারণ বালুকারাশি যেমন সূর্যকিরণে অতিক্রত উত্তপ্ত হয়, তেমনি সূর্যাস্তের পর আবার অতিশীঘ্র শীতল হয়ে পড়ে। শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্যও চরমে ওঠে।

উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, পশ্চিম এশিয়ায় আরব মরুভূমি, ভারতবর্ষে থর মরুভূমি এবং উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকোর মরুভূমি কর্কট-ক্রান্তি রেখার নিকট অবস্থিত। অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি ও দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি মকরক্রান্তি রেখার অদূরে বিস্তৃত রয়েছে। অধিকাংশ মরুভূমিই মহাদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

কর্কট বা মকরক্রান্তি রেখার নিকট অবস্থিত হলেই যে কোন স্থান মরুভূমিতে পরিণত হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের সুজলা, সুফলা বাংলা দেশ কর্কটক্রান্তি রেখার উপর রয়েছে; কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ এবং হিমালয়ের কল্যাণে এখানে বারিপাতের অভাব নেই। তাই বাংলা দেশ নদ-নদীতে পরিপূর্ণ; তার অরণ্যে ও প্রান্তরে সবুজের বিপুল সমাবেশ। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই কর্কট বা মকরক্রান্তি রেখার নিকট মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় না এবং হিমালয়ের মত বিশাল পর্বতও নেই।

বিষুবরেখার নিকটবর্তী উষ্ণ মণ্ডলীয় তৃণভূমির উত্তরে বা দক্ষিণে ক্রান্তিরেখা দুটির নিকটবর্তী হলে দেখা যায় যে, উক্ত অঞ্চলসমূহ ক্রমশঃ বৃক্ষবিরল হয়ে উঠেছে; তারপর ছোট ছোট কাঁটাঝোপ এবং আরও অগ্রসর হলে বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মরুভূমিতে গাছ যে একেবারেই জন্মে না, তা নয়। এমন গাছ আছে যা অতি সামান্য জল পেলেও বেঁচে থাকতে পারে এবং যার দীর্ঘ শিকড় বালির অনেক নীচে গিয়ে জল ও খাদ্য সংগ্রহ করে। মরুভূমির প্রখর উত্তাপে উদ্ভিদ-

দেহের জলীয় অংশ দ্রুতগতিতে বাষ্পে পরিণত হবার সম্ভাবনা। টিকে থাকবার তাগিদে মরু অঞ্চলের উদ্ভিদের পাতা জন্মায় না বললেই চলে। আর যা-ও জন্মায় তা-ও ঝাউগাছের পাতার মত অতি সরু। এ রকম গাছের কাণ্ডে ও অন্যান্য সবুজ অংশে জল সঞ্চয় করে রাখবার বন্দোবস্ত থাকে। ফণীমনসা এ-জাতীয় গাছ। বৃক্ষ-পরিপূর্ণ বাংলা দেশে কয়েক জাতীয় সীজগাছ আগাছা হিসেবে পরিত্যক্ত স্থানে জন্মায়। তরুশূন্য মরুভূমিতে ধূসর বালুকারাশির মধ্যে নানা জাতীয় সীজগাছ স্বাভাবিকভাবেই জন্মে থাকে।

উষ্ণ মরুভূমির প্রধান জন্তু হচ্ছে উট। পায়ের পাতা চওড়া বলে বালির উপর চলতে উটের অসুবিধা হয় না। উট পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে এবং কিছু দিন জলপান না করেও মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে পারে। উটের দুধ ও মাংস মরুবাসীর প্রধান খাদ্য।

অধিকাংশ মরুবাসীই যাযাবর ও পশুপালক। তারা উটের পিঠে চড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। মরুভূমিতে তাঁবু ফেলে বাস করে।

নলকূপ বসিয়ে আমরা যেমন মাটির নীচের জল উপরে এনে ব্যবহার করি, মরুভূমির বালির তলায়ও সেরূপ জল আছে, তবে সাধারণতঃ অনেক নীচে। স্থানে স্থানে এই জল ঝর্ণার মত বেরিয়ে আসে। ঝর্ণার জলে চারদিকের তৃষ্ণার্ত বালুকারাশির পিপাসা মেটে—কিছু বালি জমাটবেঁধে মাটিতে পরিণত হয়। এই মাটিতে খেজুর ও পামজাতীয় গাছ জন্মে। এই উর্বর ভূমিই মরূদ্যান বলে পরিচিত। বড় বড় মরূদ্যানে লোকের বসতি আছে। তারা চাষ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে।

মরুভূমিতে দিনে যাতায়াত কষ্টকর বলে রাত্রিতে চলাফেরা করতে হয়। প্রাচীন কালে মরুবাসীরা রাত্রিতে যাতায়াতের জন্যে আকাশে তারার অবস্থিতি দেখে দিক ঠিক করতো। মরুবাসীর মনে তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব ছিল বেশী। মরুভূমির দেশ মিশরে অতীত কালে এই কারণেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল।

২। নাতিশীতোষ্ণ মরুদেশীয় অঞ্চল—উষ্ণ মণ্ডলের বাইরে আর এক শ্রেণীর মরুভূমি দেখা যায়। এগুলি সাধারণতঃ উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত। এ শ্রেণীর মরুভূমির অন্তর্গত হচ্ছে, মধ্য এশিয়ার গোবি ও ইরানের মরুভূমি, উত্তর আমেরিকার কলরাডো মরুভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়ার মরুভূমি। তিব্বতের মালভূমিও এসব মরুভূমিরই সমগোত্রীয়। এসব মরুভূমিতে শীতকালে তীব্র শীত—কোন কোন স্থান তুষারপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিষুবরেখা থেকে দূরবর্তী বলে এবং গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টি হবার দরুণ উষ্ণতা খুব তীব্র হয় না। এজন্যে এদের নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি বলে। এ অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়ায় গাছপালা জন্মে না বললেই চলে। অধিবাসীরা প্রধানতঃ যাযাবর পশুপালক।

এস্থলে পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমিগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হলো।

১। তিব্বতের মরুভূমি—তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম মালভূমি নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চলের অন্তর্গত। হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম এই মালভূমি। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এর গড়পড়তা উচ্চতা ১৩,০০০ থেকে ১৭,০০০ ফুটের মত। উত্তরাভিমুখী জলবাহী মেঘ হিমালয়ে বাধা পেয়ে সব জল নিঃশেষে ভারতে উজাড় করে দেয় বলে তিব্বতে বারিপাত অতি বিরল। তিব্বতের মরুভূমিতে ঝঞ্ঝার বড় উপদ্রব; কিন্তু ঝড়ের শেষে বারিবর্ষণ নেই। জলের অভাবে তিব্বতের মরুভূমি তাই অত্যন্ত শুষ্ক। শুষ্কতা এবং তুষারপাতের জন্যে তিব্বতে বৃক্ষাদি জন্মে না—স্বল্প তৃণের সবুজের আভাস দেখা যায়। তিব্বতের মরুভূমির আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৩০

হাজার বর্গমাইল—তিব্বতের মোট আয়তন ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গমাইলের প্রায় অর্ধেক। তিব্বতের মোট লোকসংখ্যা প্রায় তিরিশ লক্ষ, কিন্তু মরুভূমিতে লোকসংখ্যা অতি অল্প বলে অনুমিত হয়। ইয়াক হচ্ছে তিব্বতের প্রধান জন্তু। মরুবাসী যাযাবর তিব্বতীরা ইয়াকের লোম ও চর্মে তৈরী তাঁবুতে বাস করে। ইয়াকের দুধ তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। মাখন-মিশ্রিত চা তিব্বতীদের প্রিয় পানীয়। প্রায় ৫০ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার তুষার যুগ চলেছিল। তখন তিব্বতে মরুভূমির সৃষ্টি হয় এবং তার অনেক পরে বাইরে থেকে লোক সেখানে যায়।

২। গোবি মরুভূমি—এশিয়ায় আল্‌তাই ও ইয়াব্লোনয় পর্বত দুটির দক্ষিণে এবং আল্‌তিন পর্বতের উত্তরে অবস্থিত এক বিশাল নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি।

গোবি মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত অতি অল্প। শীতকালে এই মরুভূমি বরফে আচ্ছাদিত থাকে। সে জন্যে এখানে উদ্ভিদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। নদীতীরে তৃণ ও সামান্য ফসল উৎপন্ন হয়। উট, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও ইয়াক বা চমরী গরু এখানকার প্রধান জন্তু। অধিবাসীরা তাদের পশুর পাল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায় জীবিকার তাগিদে।

গোবি মরুভূমির একটা অংশ চীনদেশের উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে। এর পরিমাণ প্রায় ৩,৩৫,০০০ কিলোমিটার বা ১,২৯,৩৪৪ বর্গমাইল। সমগ্র চীনের এগারো ভাগের এক ভাগ হচ্ছে মরুময় পীত ড্রাগনের এলাকা। তা ছাড়া বালিঝড় মরুভূমির নিকটবর্তী আরও প্রায় ৩১ হাজার বর্গমাইলব্যাপী কৃষিভূমির উপর দিয়ে মৃত্যুর বার্তা বহন করে নিয়ে যায় এবং প্রায় ৪ কোটি জীবজন্তুর প্রাণ দুর্বিষহ করে তোলে। ক্রমশঃ এগিয়ে-আসা বালির আক্রমণে শিল্প-কারখানা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত অচল হয়ে পড়বার উপক্রম হয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত বালুকাভূমির তাপাঙ্ক ৩১° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ প্রায় ৮৮° ফারেনহাইটের মত হয়। শীতকালের গভীর রাত্রিতে হিমশীতল মরুভূমির তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে ৩৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায়। তখন ধূসর বালির উপর সাদা বরফের আস্তরণ পড়ে।

৩। সাহারা মরুভূমি—উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। আয়তন ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল—সমগ্র ভারতবর্ষের দ্বিগুণ। এটি একটি অনুচ্চ মালভূমি—কোথাও শিলাগঠিত, কোথাও বা বালুকামণ্ডিত। উত্তর ও পশ্চিমাংশ অপেক্ষাকৃত নীচু। মরুভূমির উচ্চতা কোথাও সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ ফুট নীচে, আবার কোথাও বা ১১,২০১ ফুটের উপর (তিবেত্‌সি অঞ্চলে)। সাহারা মরুভূমির স্থানে স্থানে কিছু জল আছে। ঐ জলে লবণের ভাগ খুব বেশী। জলের চারদিকে মরূদ্যান গড়ে উঠেছে। মরূদ্যানে খেজুর গাছ বেশী হলেও জলসেচের সাহায্যে যব, ভুট্টা ও কদলীর চাষও হয়ে থাকে। যাযাবর অধিবাসীরা মেষ, ছাগল ও উট পালন করে' জীবিকানির্বাহ করে। সাহারা মরুভূমির অধিকাংশই ফ্রান্সের অধিকারে—স্পেন; ইটালী এবং গ্রেট বৃটেনেরও উপনিবেশ রয়েছে। উত্তর সাহারার কিছু কিছু স্থান রেল-পথের দ্বারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী নগরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পশ্চিম সাহারার নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত টিম্বাক্টু মরূদ্যানের সহর।

৪। কালাহারি মরুভূমি— দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় এই উষ্ণ মরুভূমি অবস্থিত। এর উত্তরে নগামী হ্রদ, দক্ষিণে অরেঞ্জ নদী। এর আয়তন প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার মাইল। এর দক্ষিণ অঞ্চলে মলোপো এবং কুরম্যান নদীদ্বয়ের শুষ্ক খাত অতীত জলধারার স্মৃতি বহন করছে। এর গড়পড়তা উচ্চতা ৩,০০০ ফুট। বুশম্যানরা এখানকার অধিবাসী। এখানে গাছপালা বলতে ঘাস ও ঘন ঝোপ মাত্র—তা-ও উত্তর ও পশ্চিম

অঞ্চলেই দেখা যায়। মাত্র ১১০ বছর পূর্বে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংষ্টোন এবং উইলিয়াম অস্ওয়েল এই মরুভূমি প্রথম অতিক্রম করেন এবং তারপর এর কথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হয়ে পড়ে।

৫। আরব মরুভূমি—আফ্রিকার সুবিশাল সাহারা মরুভূমি এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ আরব মরুভূমির মধ্যে ব্যবধান রচনা করছে লোহিত সাগরের সংকীর্ণ জলধারা। এই অপরিসর বিভেদ রেখাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বালুকা-ঝড়ের আক্রমণের বিরাম নেই। এই মরুভূমির আয়তন প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল—লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটির মত। এখানকার আবহাওয়া অতিশয় শুষ্ক ও উষ্ণ। এজন্যে কোন ফসল বা গাছপালা জন্মাতে পারে না। স্থানে স্থানে কণ্টকিত তৃণ দেখা যায়। এই কাঁটা ঘাস উটের খাদ্য। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ওমান উপকূলে ও লোহিত সাগর সংলগ্ন ইমেন উপকূলে সামান্য বৃষ্টিপাত হবার দরুণ লোকবসতি আছে। এখানে গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। আরবের খেজুর ও মোকা কফির সুনাম সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত। আরবদেশের ঘোড়ার খুব খ্যাতি আছে। ঘোড়া, গাধা, উট, ভেড়া ও ছাগল আরবীয়দের গৃহপালিত জন্তু।

আরবগণ সেমেটিক জাতীয় মুসলমান। এরা বলিষ্ঠকায় এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। মরুভূমির যাযাবর অধিবাসীরা বেদুইন নামে পরিচিত। বেদুইনরা পশুপালসহ নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। উট হচ্ছে তাদের প্রধান বাহন। মদিনা থেকে দামস্কাস আরবের একমাত্র রেলপথ।

৬। ইরানের মরুভূমি—ইরান বা পারস্যের অধিকাংশই এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে গ্রীষ্মকালে দুঃসহ উষ্ণতা, শীতকালে সুতীব্র শৈত্য। শীতকালে অতি অল্প বৃষ্টিপাতে মরুভূমি কিঞ্চিৎ সিক্ত হয়। ইরান মরুভূমির মধ্যভাগে লবণাক্ত হ্রদ ও জলাভূমি রয়েছে। এর কারণ হলো, ইরানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি সমুদ্র থেকে লবণাক্ত জল বহন করে দেশের ভিতরে নিয়ে আসে। অধিবাসীরা মরূদ্যানেই বাস করে। এ সব মরূদ্যানে তুলা, তামাক, আফিং ও ভূমধ্যসাগরীয় ফলের চাষ হয়। পার্বত্য অঞ্চলে পশুপালন প্রচলিত আছে।

৭। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি—এই মরুভূমির আয়তন সমগ্র মহাদেশের অর্ধেকেরও বেশী। গড়পড়তা উচ্চতা ৩০০ থেকে ১৫০০ ফুট—স্থানে স্থানে এই উচ্চতা ৩০০০ ফুটেরও বেশী। মরুভূমিতে লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে। বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি এবং ভিক্টোরিয়া মরুভূমি এই মরুপূর্ণ মালভূমির অংশভুক্ত। পূর্বদিকে এই মালভূমি ঢালু হয়ে সমভূমিতে মিশে গেছে। দক্ষিণদিকে এই মালভূমি নুলারবোর সমভূমির সঙ্গে একত্রিত হয়েছে। মালভূমির মধ্যভাগে ও পশ্চিমাংশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও অনতি-উচ্চ পর্বত আছে। ম্যাক্‌ডোনেল এবং ম্যাসগ্রেভ পর্বতদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি—দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাজ্যের এন্টোফাগাস্তা এবং আটাকামা প্রদেশ দুটি জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ভাগে এই আটাকামা মরুভূমি। আন্দিজ পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ার দরুণ এই মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত অতি নগণ্য। এ মরুভূমি অতিশয় অনুর্বর এবং এর মধ্যে বোরাক্স ও লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে—তা ছাড়া রয়েছে প্রচুর নাইট্রেট। অনেক বছর ধরে পৃথিবীতে নাইট্রেট সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এ মরুভূমি গণ্য হয়ে আসছে।

৯। উত্তর আমেরিকার মরুভূমি—মেক্সিকোতে মরুভূমি আছে। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে এরিজোনা, ক্যালিফোর্ণিয়া ও সংলগ্ন প্রদেশগুলিতে মরুভূমি বিস্তৃত রয়েছে। এ সব মরুভূমিতে অনেক পাহাড় আছে। দিনের

তাপে পাথর উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, রাত্রির শীতে হয় শীতল ও সঙ্কুচিত। দ্রুত প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে পাথরে ফাটল ধরে। ফাটলধরা পাহাড় ধীরে ধীরে চৌচির হয়ে মরুভূমির বালুকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই মরুভূমিতে লবণাক্ত হ্রদ, মরূদ্যান এবং তৃণগুল্ম ও ক্যাক্টাসজাতীয় গাছ আছে। কয়েক প্রকার পশুপাখীও দেখা যায়।

১০। ভারতবর্ষের থর মরুভূমি—উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বালুকাময় থর মরুভূমির সীমারেখা পূর্বে আরাবল্লী পর্বতমালা, পশ্চিমে সিন্ধুনদ, উত্তরে শতদ্রুনদ এবং দক্ষিণে আরব সাগর দ্বারা চিহ্নিত। এই মরুভূমি দৈর্ঘ্যে পাঁচ শ' মাইল, আয়তনে এক লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এর গড়পড়তা উচ্চতা ২৫০ থেকে ৭৫০ ফুটের মত। সর্বোচ্চ স্থান এক হাজার ফুট উঁচু। এখানে বার্ষিক বারিপাত ১৫ ইঞ্চিরও কম—কাজেই এ স্থান প্রায়ই শুষ্ক। এখানে তাপমাত্রা সর্বদাই খুব বেশী। সিন্ধু প্রদেশের জেকোবাবাদ পৃথিবীর একটি উষ্ণতম স্থান। এখানে গ্রীষ্মের তাপাঙ্ক ১২৭° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে থাকে।

থর মরুভূমি পাকিস্তানের পূর্ব সিন্ধুপ্রদেশের ভাওয়ালপুর রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত—ভারতবর্ষে এর বিস্তার রাজপুতানার বিকানীর, যোধপুর এবং জয়পুরে।

মরুজয়ের চেষ্টা—অতি আধুনিক কালের পূর্বেও মানুষ কৃষিকার্যে এক অতিলোভী স্বার্থপরের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। জমি থেকে যে কোন উপায়ে হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেশী ফসল পাবার লোভে জমির উর্বরা শক্তিকে তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। মানুষের এই অতিলোভের ফলে অরণ্য লোপ পেয়েছে, জমাট মাটি আলগা হয়ে গেছে এবং সেই আলগা মাটিতে হয়েছে সর্বগ্রাসী বন্যার আক্রমণ—শ্যামল মাটির রং বালির ধূসরতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত, চীন, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায় মানুষের এই অবিমৃষ্যকারিতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। একদা সিন্ধুনদের তীরে মানবসভ্যতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল—আজ সেখানে উষ্ণতার রাজত্ব। প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্যের খাদ্য সংগৃহীত হতো উত্তর আফ্রিকার শস্য-ভাণ্ডার থেকে—সেই শস্য-ভাণ্ডারে আজ রিক্ততার ছবি। জমির উপর এই মানবিক আক্রমণ সব মহাদেশে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রাকৃতিক কারণে কোথাও—যেমন ইউরোপে, এর ফল মরুভূমিতে প্রকাশ পায় নি, কোথাও আবার প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সহায়তা করেছে মরুভূমির বিস্তারে। বাইরে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সভ্য জাতিরা গিয়ে এমনি লোভের তাড়নায় কৃষি-ভূমির সর্বনাশ করেছে। স্বার্থের তাড়নায় মানুষের দৃষ্টি ছিল অতি সঙ্কীর্ণ; তারা ভাবতেও পারে নি যে, কত বড় বিপদের মুখে ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে এগিয়ে দিচ্ছে! আজ পৃথিবীর লোকসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বর্ধিত হচ্ছে; কিন্তু এত লোকের খাবার জোগাবার মত কৃষিভূমি কোথায়? আজকে তাই কথা উঠেছে, জমি বাড়াবার এবং সংরক্ষণেরও। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করবার সমস্যায় মানুষের দৃষ্টি পড়েছে মরুভূমির উপর।

১। চীন দেশ—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ায় এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের গোবি মরুভূমিতে বৃক্ষ-রোপণের কাজ স্কুরু হয়। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫,৪০০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে গাছ লাগানো হয়েছে। ১২,৭০০ বর্গমাইল জায়গায় তৃণ-গুল্মের আবাদ হয়েছে। মরুঝড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রায় পনেরো হাজার মাইল দীর্ঘ প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। প্রায় ২৪৫ বর্গমাইল স্থানে জলসেচের বন্দোবস্তও সমাপ্ত।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম চীনে প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ এক প্রাচীরের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। এর নামকরণ হয়েছে চীনের 'বিরাট সবুজ প্রাচীর'। চীনের কাংসু প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে স্কুরু হয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহা-

প্রাচীরের সমান্তরালে চলে গেছে এই সবুজ প্রাচীর। বায়ুঝঞ্ঝার গতিবেগ মন্থর করবার জন্যে এ রকম প্রাচীরের উপযোগিতা খুব বেশ। ঘণ্টায় ৩৮ মাইল বেগবান বায়ুপ্রবাহকে মাত্র ১৫.৫ মাইল বেগে মন্দীভূত করবার কাজ সফল হয়েছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কাংসু এলাকায় প্রায় ৭ লক্ষ লোক কাজ করেছে।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে গোবি মরুভূমিতে বন, মরূদ্যান পশু-চারণভূমি সৃষ্টি করবার এক বিরাট আয়োজন হয়েছে চীনে। এত বড় পরিকল্পনা চীনে আর কখনও হয় নি।

প্রায় ৪৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছোট বড় গাছ, ঝোপঝাড়, ঘাসের আবরণ রচনা এবং জলসেচের উদ্দেশ্যে খাল খননের জন্যে উট, ঘোড়া এসেছে অনেক—লক্ষ লক্ষ কৃষকের আগমনে মুখর হয়ে উঠছে মরুভূমির শত শতাব্দীর স্তব্ধতা। শতাধিক হাল্‌কা উড়োজাহাজে করে প্রায় একশ' ফুট উঁচু থেকে মরুভূমিতে বীজ ছড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছে। চীনদেশেরই তৈরী 'An-Two' বিমানে এ কাজ করা হবে।

জলসেচের জন্যে কূপ খনন করা হবে এবং ভূগর্ভস্থ জল বের করে খাল কাটা হবে। খালের জল যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়—সে জন্যে ছোট ছোট নুড়ি খালের উপর ছড়াবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

গোবি মরুভূমির যে অংশ চীনদেশে বিস্তৃত হয়েছে, তাকে মাত্র সাত বছরের মধ্যে উর্বর, বৃক্ষশোভিত অঞ্চলে পরিণত করবার বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে চীনদেশ।

২। ইস্রায়েল—আরব মরুভূমির স্থানীয় অঞ্চলকে কৃষিভূমিতে পরিণত করবার কাজ ইস্রায়েলের বীরসেবা গবেষণা মন্দিরে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এখানকার কাজ তিনটি ধারায় অগ্রসর হচ্ছে; যথা—

(ক) মরু অঞ্চলের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ আবিষ্কার করা—মরুভূমিতে কৃষিকার্য, আবহাওয়া, জলবিদ্যা এবং মৃত্তিকা-ক্ষয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। এ কাজে মার্কিন দেশের বৃক্ষবিদ্যা কেন্দ্রের সহযোগিতা রয়েছে। মার্কিন বৃক্ষবিদ্যা কেন্দ্রটি মার্কিন মুলুক, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার মরু অঞ্চলে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করছে। অষ্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের স্থানে স্থানে গরু-ভেড়ার উপযোগী তৃণ ও গুল্ম জন্মায়। বীরসেবার আশেপাশে এ ধরণের পশু-চারণ অঞ্চল সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলছে। মার্কিন দেশের এরিজোনার মরু অঞ্চলের লবণাক্ত নদী-উপত্যকায় লবণ রোধক একপ্রকার খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ-রকম খেজুর গাছ ইস্রায়েলে জন্মাবার চেষ্টা চলছে।

(খ) সৌরশক্তির প্রয়োগ—সৌরশক্তির সাহায্যে মরু অঞ্চলস্থিত শিল্প-কারখানার জন্যে জলীয় বাষ্প উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই দিনে এক টন বাষ্প উৎপাদনের উপযোগী একটি সৌর-কারখানা স্থাপিত হবে। এই বাষ্প বিভিন্ন বস্ত্র-ধৌতাগার (লণ্ড্রী), রাসায়নিক কারখানা এবং শিল্পোদ্যোগে সরবরাহ করা হবে।

(গ) পানীয় জল উৎপাদন—বালির নীচে যে লবণাক্ত জল রয়েছে তাকে লবণমুক্ত পানীয় জলে পরিণত করবার জন্যে একটি গবেষণাগার ও একটি পাইলট প্ল্যাণ্ট প্রায় প্রস্তুতির মুখে।

বীরসেবা গবেষণা কেন্দ্রটি ইউনেস্কো থেকে অর্থ ও কারিগরী সাহায্য পেয়ে থাকে।

৩। ফ্রান্স—সৌরশক্তি-চালিত গরম জল উৎপাদনের হিটার সাহারা মরুভূমিতে আজ হাতে হাতে দেখা যাচ্ছে। ফরাসীরা লবণাক্ত জল ফুটিয়ে পানীয় জলে পরিণত করবার জন্যে সৌরশক্তি প্রয়োগের বিশেষ চেষ্টা করছে।

৪। সোভিয়েট রাশিয়া—জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির আয়তন রাশিয়ায় যথেষ্ট হওয়ায় মরুভূমি জয় করবার তেমন জোরদার চেষ্টা চলছে না—

অন্ততঃ শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রকম চলছে। তবে অনগ্রসর দেশের তুলনায় রাশিয়ার প্রয়াস অনেক বৃহত্তর। বৃক্ষরোপণ, পশু-চারণ ভূমি সৃষ্টি করা, খাল কেটে জল সেচের বন্দোবস্ত করবার ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে করা হচ্ছে সোভিয়েট দেশে।

ঊষর অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যাপারে সোভিয়েট গবেষকগণ বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। সৌরশক্তির সাহায্যে এ কাজটা সহজেই করা যাবে বলে আশা করা যায়। দুটা বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ-কেন্দ্রটি যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন সেই উষ্ণতার দরুণ ধাতুদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। একে বলা যায় তাপ-বিদ্যুৎ। তাসখেণ্ডে অধ্যাপক বমের গবেষণাগারে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ৬½ ফুট ব্যাসের একটি অধিবৃত্ত (Parabolic) আয়নার সাহায্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত ধাতুদুটিকে উত্তপ্ত করেন। উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ ছিল ৪০ ওয়াট। কূপ থেকে জল তুলে ক্ষেতের খালে জল সরবরাহ করবার জন্যে একদল চাষীর যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তা এই সৌরশক্তির দ্বারা মেটানো চলে।

অধ্যাপক বমের আশা আরও বেশী। তিনি মনে করেন, সৌরশক্তি-চালিত অনেক বৃহৎ বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত করা সম্ভব এবং এ সব বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাহায্যে মরুভূমিতে মরূদ্যান সৃষ্টি দুরূহ ব্যাপার নয়। তাসখেণ্ডে এরূপ একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় নির্মিত হয়ে গেছে। আনুমানিক পাঁচ একর পরিমাণ আয়তক্ষেত্রের দর্পণ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ১২০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক বম উপরিউক্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছিলেন আর্মেনিয়ার রাজধানী এরিভানের নিকটবর্তী উপত্যকায় ব্যবহারের জন্যে। এই উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ জলাভূমি, এক তৃতীয়াংশ শুষ্ক ও ঊষর ভূমি এবং অবশিষ্ট কৃষিক্ষেত্র। জলাভূমির জল নিষ্কাশনে, শুষ্কভূমিতে জলসেচনে এবং কৃষি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই সৌরশক্তি-চালিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি পরিকল্পিত হয়েছিল।

৫। ভারতবর্ষ—থর মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল কৃষি অঞ্চলে পরিণত করবার প্রয়াস চলছে ভারতে। দিনের পর দিন এই মরুভূমি তার করাল বাহু বিস্তার করে চলেছিল, এমন কি আর কয়েক বছর পর ভারতবর্ষের রাজধানী নয়াদিল্লীর পর্যন্ত এই মরুভূমির কবলে পতিত হবার আশঙ্কা ছিল। আজ সে আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। রাজস্থানের সুরতগড়ে তিরিশ হাজার একর পরিমাণ মরুভূমি যন্ত্র ও মানুষের সহায়তায় আজ কৃষিভূমিতে পরিণত হয়েছে। সতেরো হাজার একর জমিতে আজ ফসলের সোনালী হাসি ঝলমল করছে। ভাখরা-নাঙলের জলের অপেক্ষায় রয়েছে বাকী তেরো হাজার একর জমি। ভারত ও রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় আজ থর মরুভূমি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান।

রাজস্থানের হনুমানগড়ের নিকট পৃথিবীর বৃহত্তম খাল খননের কাজ সুরু হয়ে গেছে। খালের ধারে ধারে বসাবার জন্যে ইট তৈরীও আরম্ভ হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, এ খালের সাহায্যে রাজস্থানের মরুভূমি আমাদের বিশ লক্ষ টন গম, তুলা ও ডাল সরবরাহ করতে পারবে।

শিল্পে ধাতুর ব্যবহার

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

যদিও রসায়নবিদেরা প্লাষ্টিক, অ্যান্টিবায়োটিক প্রভৃতির ন্যায় অভিনব আশ্চর্যজনক পদার্থসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তথাপি তাঁরা পুরনো দ্রব্য-সম্ভারের গুণাবলীর অধিকতর উন্নতি বিধান করে আরও সাফল্যজনকভাবে সেগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নন। এরূপ এক শ্রেণীর দ্রব্য হলো বিবিধ রকমের ধাতু। শিল্পের আবশ্যকতা অনুসারে লোহা প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ ধাতুর গুণাবলীর অনেক উন্নতিসাধন করা হয়েছে। অপর পক্ষে, পূর্বে কেবলমাত্র গবেষণাগারের কৌতূহল নিবৃত্তি করতো, এরূপ কয়েকটি দুর্লভ ধাতু আবশ্যকীয় কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। নানাপ্রকার ইস্পাত তৈরী হচ্ছে, তাদের ক্ষয় ও মরিচা প্রতিরোধ, কাঠিন্য, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণানুসারে। ম্যাঙ্গানিজ কিংবা নিকেলের খাদ মিশিয়ে ইস্পাতের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অনেক বেড়ে গেছে। শতকরা প্রায় তের ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাতের দ্রব্যের উপর যত কাজ করা যাবে ততই তার কাঠিন্য বেড়ে যাবে। ইস্পাতকে শক্ত করা ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের আর একটি বিশেষ গুণ হলো, তৈরীর সময় গলিত ইস্পাত থেকে অক্সিজেন ও গন্ধকের ময়লা শোষণ করে নেওয়া। রেল ও বাড়ীঘর নির্মাণের কাজে ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। নিকেল প্রয়োগ করেও ম্যাঙ্গানিজের ন্যায় প্রায় একই প্রকারের গুণাবলী ইস্পাতের মধ্যে প্রকাশ পায়। নিকেল-ইস্পাত ব্যবহৃত হয় যুদ্ধের ট্যাঙ্ক ও ষ্টীমার প্রভৃতি তৈরী করতে।

বর্তমান মোটর গাড়ীর যুগে ক্রোম-ইস্পাতের খুবই প্রচলন হয়েছে। কয়লা-চুল্লীর পরিবর্তে অত্যুচ্চ তাপ-উৎপাদক বৈদ্যুতিক চুল্লীর আবিষ্কার হওয়াতে এ দুটি ধাতুকে তরল করে ক্রোম-ইস্পাত করা খুব সুবিধাজনক। ইস্পাতে শতকরা প্রায় পঁয়ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত ক্রোমিয়াম যোগ করে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, সেটি হয় নিষ্কলঙ্ক ও উজ্জ্বল। তাপ, মরিচা ও ক্ষয় প্রতিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট গুণ থাকাতে এ নিষ্কলঙ্ক ধাতুটি অনেক প্রকার কাজেই লাগানো হয়। দ্রুতগামী রেলগাড়ী নির্মাণে এ ধাতুটি খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। সহজে পরিষ্কার করা যায় বলে গৃহস্থালী, হাসপাতাল এবং সাধারণ ভোজনালয়ের নানাপ্রকার উপকরণ তৈরীর জন্যে এ ধাতুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মোটর গাড়ীর বাম্পার ও অন্যান্য আলঙ্কারিক অংশে ক্রোমের পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয় আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা ও সুদৃশ্য করবার জন্যে।

টাংষ্টেন, মলিবডিনাম ও ভ্যানাডিয়াম নির্দিষ্ট পরিমাণে যোগ করলে ইস্পাতে কয়েকটি বাঞ্ছনীয় গুণের প্রকাশ পায়। সব ধাতুর মধ্যে টাংষ্টেনের গলনাঙ্কই সর্বাধিক—৬১০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই জন্যে এটি বিজলী বাতির ফিলা-মেণ্ট তৈরীর আদর্শ ধাতু। তাপ-সহনক্ষম ধাতু হিসাবে জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার আছে। টাংষ্টেন-ইস্পাত খুব শক্ত। কাজেই ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কঠিন ধাতু কাটবার যন্ত্রের মুখের দিকে টাংষ্টেন-ইস্পাত থাকে। টাংষ্টেন-কারবাইড হীরকের ন্যায় কঠিন। এই ধাতু দিয়ে তেলের কূপ খননের যন্ত্র তৈরী হয়। টাংষ্টেন এবং ক্রোমিয়ামের ন্যায় মলিবডিনামও ইস্পাতের কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। ভ্যানাডিয়ামের প্রধান গুণ হলো ইস্পাতকে শক্ত করা।

বর্তমানে একদিকে প্রচলিত ধাতুসমূহের সম্বন্ধে

আবিষ্কৃত হচ্ছে বহুগুণসম্পন্ন সঙ্কর ধাতুসমূহ, আবার অন্য দিকে কয়েক বছর পূর্বের অব্যবহৃত ধাতুগুলিকেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হচ্ছে। শেষোক্ত শ্রেণীর ধাতু হলো টিটানিয়াম, জার্মেনিয়াম, লিথিয়াম ও জির্কোনিয়াম। ম্যাগ্নেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামেরও অনেক উন্নতি করা হয়েছে। তাদের ব্যবহারের সীমা বাড়ানো হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি, এরোপ্লেন ও ইলেকট্রনিকস্-এর জন্যে শিল্পে হাল্কা ধাতুসমূহেরও উন্নতি করা আবশ্যক হয়েছে। টিটানিয়ামের গুণ হলো—এটি হাল্কা, উচ্চতাপে অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও কাঠিন্য বেশী রক্ষায় রাখে এবং প্ল্যাটিনামের ন্যায় ক্ষয়-প্রতিরোধক। উচ্চ তাপ-উৎপাদক জেট ইঞ্জিনে ব্যবহারোপযোগী। রঞ্জন-শিল্পে সীসার পরিবর্তে টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার অধিকতর বাঞ্ছনীয়। টিটানিয়াম অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে সহজেই মিলিত হয় বলে ইস্পাত-শিল্পে শোধক হিসাবে এটি অত্যাবশ্যক।

জার্মেনিয়াম খুব লঘু এবং যথেষ্ট বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই জন্যে ইলেকট্রনিক শিল্পের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। সম্প্রতি ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রব্য হলো সিলিকন, যা ধাতু না হয়েও ধাতু-বিদ্যায় যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে। এটির প্রথম সঙ্কর ধাতু হলো ফেরোসিলিকন। ইস্পাত তৈরীতে সিলিকন গ্যাসীয় ও অক্সাইডের ময়লা শোষণ করে নেয়। সিলিকন প্রয়োগ করলে ইস্পাতে অসাধারণ চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক বিশেষত্ব উৎপন্ন হয়। এ জাতীয় ইস্পাত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়—তড়িৎ-চুম্বক, বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র এবং আরও অনেক বৈদ্যুতিক উপকরণে।

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার হওয়াতে জির্কোনিয়াম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ধাতুটি যথেষ্ট তাপ ও ক্ষয়-প্রতিরোধক হওয়াতে এই ধাতুর তৈরী দণ্ড দিয়ে পারমাণবিক চুল্লীর বিভাজন প্রক্রিয়া ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পারমাণবিক শক্তির জন্যে রক্ততশুভ্র সোডিয়াম ধাতুর উপকারিতাও বেড়ে গেছে। পারমাণবিক চুল্লীতে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপ তরল সোডিয়ামে শোষণ করানো হয়। তৎপর উত্তপ্ত সোডিয়াম অন্তত্র বয়লারে পরিচালনা করে জল গরম করা হয়, বাষ্প উৎপাদনের জন্যে। রকেট-প্রথায় পরিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র ও এরোপ্লেনে এই ধাতুটিকে শক্তিশালী পরিচালকরূপে নিয়োগ সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও লিথিয়াম অত্যাবশ্যক। অ্যাটম বোমা তৈরীর জন্যেও ইউরেনিয়ামই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। থোরিয়াম থেকে বিভাজনক্ষম পরমাণু তৈরীর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এখনও থোরিয়াম থেকে পারমাণবিক শক্তি আহরণ করবার ব্যবস্থা হয় নি। লিথিয়াম থেকে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ট্রাইটিয়াম—হাইড্রোজেন বোমার একটি প্রধান উপাদান। মৃৎ, ভেষজ, ধাতব প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে লিথিয়ামের প্রয়োগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা হলো লিথিয়াম, যদিও ম্যাগ্নেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামও যথেষ্ট লঘু। গুরুত্বে লিথিয়ামের পরেই ম্যাগ্নেসিয়ামের স্থান। বিমান-শিল্পে ম্যাগ্নেসিয়ামের খুবই চাহিদা। ধাতুটি ভঙ্গুর বলে অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা কিংবা ম্যাঙ্গানিজের মিশ্রণে সঙ্কর ধাতু তৈরী করে নির্মাণ-কার্যে ব্যবহার করা হয়, যাতে লঘুত্ব বিশেষ হ্রাস না করেও দ্রব্যটির কাঠিন্য বৃদ্ধি করা যায়।

লঘু ও দৃঢ় ধাতু হওয়াতে অনেক দিক থেকেই অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা রয়েছে, বিশেষতঃ মোটর গাড়ী ও বিমান-শিল্পের জন্যে এর প্রচলন আরও বেড়ে গেছে। পূর্বে এটির প্রধান ব্যবহার ছিল রন্ধন-পাত্রাদি নির্মাণের উপকরণ হিসাবে। বর্তমানে এই বহুগুণসম্পন্ন ধাতুটি নিয়োজিত হয় খেলনা

তৈরী, ক্রীড়ার উপকরণ নির্মাণ, বৈদ্যুতিক উপাদান এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্মাণের মালমসলায়। অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা, নিকেল কিংবা দস্তার মিশ্রণে সঙ্কর ধাতু তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারিক ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সিলিকন মিলিয়ে এরূপ একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে যা খুবই দৃঢ় এবং লবণাক্ত জলের ক্ষয়কারী শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে। এ দ্রব্যটি জাহাজ নির্মাতাদের নিকট খুবই মূল্যবান। অ্যালুমিনিয়ামঘটিত কয়েকটি পদার্থ পেট্রোলিয়াম, রবার, কাগজ, প্লাষ্টিক ও কাচ শিল্পে বিশেষ প্রয়োজনীয়।
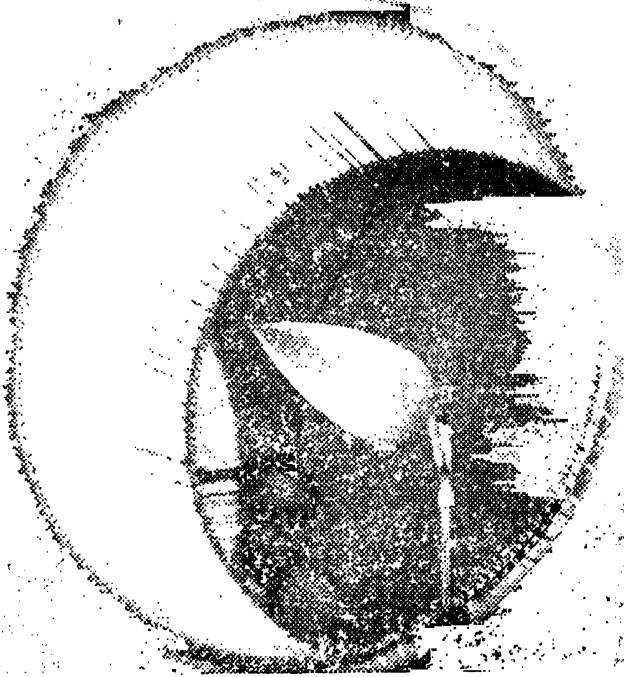
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা। গগল্‌স্ পরিহিত এবং কাচের সার্সীর দ্বারা সুরক্ষিত একজন বৈজ্ঞানিক ২২৪টি কোয়ার্ট্‌জ বাতির রিং থেকে উৎপন্ন আলোকে উত্তপ্ত রকেটের নাকের কোণাকৃতি অংশ পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো—উত্তাপ-নিরোধক কোন ধাতব পদার্থ নির্ণয় করা। কারণ মহাকাশ-যানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে উদ্ভূত প্রচণ্ড উত্তাপে সেটি ভস্মীভূত না হয়ে যায়—এরূপ কোন পদার্থ আবিষ্কার করা দরকার।

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় বৃহদাকার কতকগুলি কীট-পতঙ্গের অসাধারণ দৈহিক শক্তি ও ক্রিয়া-নৈপুণ্য সম্বন্ধে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এদের শারীরিক আয়তনের তুলনায় দৈহিক শক্তির আতিশয্য দেখে স্বভাবতঃই মনে হয়—ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং তাদের ধ্বংস-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কীট-পতঙ্গই হয়তো সর্বাধিক বিস্ময়কর। পৃথিবীতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর আবির্ভাবের বহু
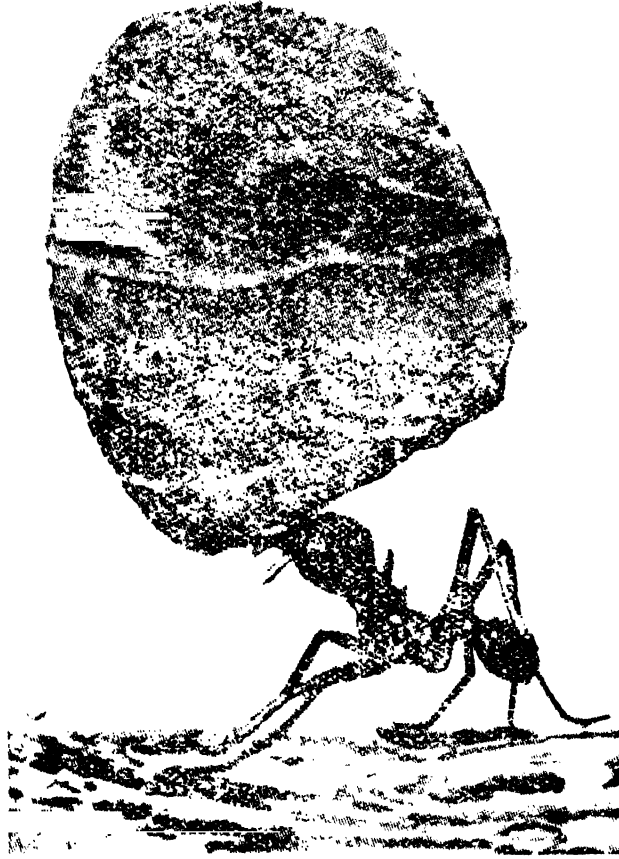
পাতা-কাটা পিঁপড়ে বেশ বড় একখণ্ড পাতা মুখে নিয়ে অনায়াসে বহুদূর চলে যায়।

এরাই হয়তো একদিন মানব-সভ্যতার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে তুলবে। এ-সম্বন্ধে মিসিসিপি ষ্টেট কলেজের প্রাণী ও কীটতত্ত্ব বিভাগের অধিনায়ক ডাঃ রস্ হাচিন্‌স্ বলেছেন—বৃহদাকারের দুর্ধর্ষ পিঁপড়ে প্রভৃতির মত কয়েক জাতীয় কীট-পতঙ্গের পূর্বেই এদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানুষের আবির্ভাব তো মাত্র সে দিনের ঘটনা! পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আনুমানিক ১০০,০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা (যাদের মধ্যে

সবচেয়ে বৃহত্তম ছিল একরকম বৃহদাকারের দ্বিপদী ফড়িং) যে কার্বনিফেরাস যুগের কয়লাস্তর গঠিত
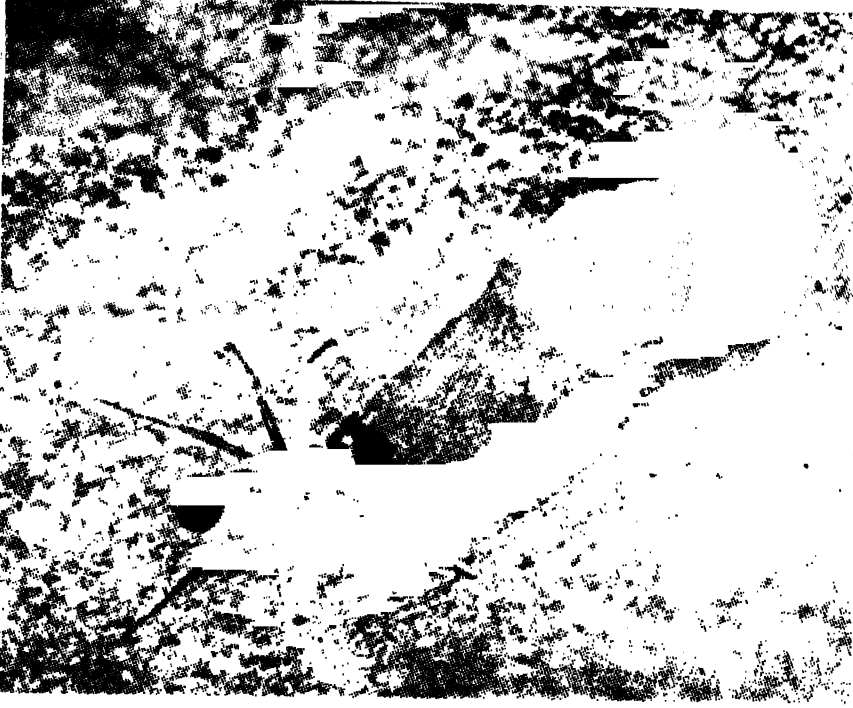
শস্যসংগ্রাহক পিঁপড়ে তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৫২ গুণ ভারী একটুক্রা পাথর গর্তের মুখ থেকে টেনে সরিয়ে ফেলছে।

হবার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজা সলোমন নাকি এক জাতীয়

বেট্‌সি-বাগ তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৯০ গুণ বেশী ভারী একটা খেলনা ট্রাককে অনায়াসে টেনে নিচ্ছে।

শস্য-সংগ্রহকারী পিঁপড়েকে শরীরের ওজনের চেয়ে অনেক গুণ ভারী বীজ বহন করতে দেখে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সে থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ এদের অদ্ভুত শক্তি ও বিস্ময়কর ক্রিয়া-নৈপুণ্যের বহুবিধ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আসছে। বাস্তবিকই এসব নিম্নস্তরের প্রাণী-দের মধ্যে এমন অদ্ভুত শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা শরীরের আনুপাতিক তুলনায়

মানুষ অথবা অন্য কোন জীব-জন্তুর মধ্যে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীতে বহু জাতের গুব্‌রে পোকা দেখা যায়। এদের মধ্যে বড় বড় কয়েক জাতের গুব্‌রে পোকার শারীরিক শক্তির ব্যাপার দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এরা শরীরের ওজন অথবা আয়তনের তুলনায় অসম্ভব রকমের গুরুভার পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে—এ রকমের একটা গুব্‌রে পোকা তার শরীরের ওজনের প্রায় ৮৫০ গুণ ভারী একটা জিনিষ অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই হিসেবে তুলনা করলে একটা হাতীর পক্ষে আজ-কালকার বিরাট আকারের একটা যুদ্ধ জাহাজ পিঠের উপর অনায়াসে বহন করা উচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, একটা হাতী কিন্তু তার সমান ওজনের একটা হাতীর ভারও বইতে পারে কিনা সন্দেহ!

গুব্‌রে পোকার দৃশ্যতঃ এরূপ অদ্ভুত পেশী-শক্তির কারণ কি—সে কথা আলোচনা করবার আগে অন্যান্য কতকগুলি কীট-পতঙ্গের বিস্ময়কর শক্তি-সামর্থ্যের কথা বলছি।

একবার শস্য-সংগ্রহকারী পিঁপড়েদের ছবি তোলবার সময় ডাঃ হাচিন্‌স্ দেখতে পান—একটা পিঁপড়ে তার গর্তের মুখে আট্‌কানো একখণ্ড পাথর টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর পিঁপড়েটা গর্তের মুখ থেকে পাথরের টুক্‌রাটা টেনে তুলে দূরে সরিয়ে রাখলো। তিনি পিঁপড়েটাকে বন্দী করে তার ওজন এবং পাথরের টুক্‌রাটারও ওজন করে দেখলেন, পাথরটার ওজন পিঁপড়ের ওজনের চেয়ে ৫২ গুণ বেশী। এ হিসেবে একজন লোকের পক্ষে চার টন ওজনের একটা ভারী জিনিষ টেনে তোলা উচিত। কিন্তু সাধারণ কোন মানুষ তো দূরের কথা, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন

হরিণের শিঙের মত দাড়াওয়ালা পুরুষ গুবরে পোকাদের লড়াই।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের পক্ষেও এরূপ ভারোত্তলন সম্ভব নয়।

সজী-শামুক ১১ গ্র্যাম ওজনসহ সহজভাবেই উপরে উঠে যাচ্ছে।

দেখা গেছে—একটা পুং-মৌমাছি তার শরীরের ওজনের চেয়ে ১৫ গুণ ভারী বস্তু উত্তোলন করতে পারে; আর কর্মী-মৌমাছি তুলতে পারে তার দেহের চেয়ে প্রায় ২৪ গুণ ভারী বস্তু। তুলনামূলক হিসেবে দেখতে গেলে, একটা ঘোড়া তার শরীরের ওজনের অর্ধেকের বেশী ভারী কোন জিনিষ

উত্তোলন করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বড় বড় এক রকম গুবরে পোকা দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা তাদের বলে বেট্‌সি-বাগ। এই পোকাগুলির পিঠের উপর ছোট্ট বড়শীর মত একটা পদার্থ আছে। ওই দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেট্‌সি-বাগের পিঠের কাঁটার সঙ্গে সুতা বেঁধে ভার বোঝাই খেলনা গাড়ী চালিয়ে মজা দেখে। মিসিসিপি ষ্টেট কলেজের কীট-তত্ত্ব গবেষণাগারে এই পোকাগুলির ভারবহন ক্ষমতার হতো তবে সে একটা বোঝাই মালগাড়ী অনায়াসে টেনে নিয়ে চলতে পারতো।

কানকোটারী নামে একরকম ডানাওয়ালা পোকার সঙ্গে অনেকেরই হয়তো পরিচয় আছে। কারণ আমাদের দেশে ছোট-বড় অনেক রকমের কানকোটারীর অভাব নেই। এই কানকোটারীর দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় দেখা গেছে—এরা তাদের দেহের ওজনের চেয়ে ৫৩০ গুণ ভারী কোন জিনিষ অনায়াসে টেনে নিতে পারে। এই হিসেবে একজন

পিঠের উপর দু-তিনটি শামুক নিয়ে সঙ্গী বাগানের শামুক অনায়াসে উপরে উঠে যাচ্ছে।

পরীক্ষা করা হয়েছিল। পোকাগুলিকে ছোট ডায়নামোমিটারের উপর বসিয়ে তাদের টানবার ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। এতে দেখা যায়—১.৮৮ গ্র্যাম ওজনের একটা বেট্‌সি-বাগ ১৪ গ্র্যাম, অর্থাৎ তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৭½ গুণ ভারী কোন বস্তুকে অনায়াসে টেনে নিতে পারে। কিন্তু একটা চাকাওয়ালা খেলনা গাড়ীতে জুড়ে দিলে ১৭৫ গ্র্যাম ভার টানতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। দৈহিক শক্তিতে মানুষ যদি বেট্‌সি-বাগের সমতুল্য মানুষের পক্ষে চাকার উপরে স্থাপিত ৪০ টন ওজনের জিনিষ অনায়াসে টেনে নেবার কথা! কীট-পতঙ্গের কথা বাদ দিলেও ছোট ছোট অন্য অনেক প্রাণীই তাদের দৈহিক ওজনের তুলনায় অনেক বেশী ভার বহন করতে পারে। ডাঙ্গার ছোট ছোট শামুকের কথাই ধরা যাক—আধ আউন্সেরও কম ওজনের ছোট্ট শামুক মসৃণ জায়গায় এক পাউণ্ড ওজনের জিনিষ অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—১.৪৮

গ্র্যাম ওজনের একটা শামুক ১১ গ্র্যাম ওজনের জিনিষ নিয়ে একটা মসৃণ পেন্সিলের গা বেয়ে অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারে।

উল্লম্ফনের ক্ষেত্রেও মানুষের তুলনায় কীট-পতঙ্গ কতদূর অগ্রগামী তা সহজেই বুঝা যায়। ১৯৩৬ সালের সোজাসুজি লম্ফনের অলিম্পিক রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট ৫ ৫/১৬ ইঞ্চি এবং ১৯৫২ সালে উচ্চ লম্ফনের বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ৬ ফুট ৮.৩২ ইঞ্চি। এর সঙ্গে

	সোজাসুজি লম্ফন (ফুট)	উচ্চ লম্ফন (ফুট)
মানুষ (রেকর্ড)	২৬ ফুট ৮ ১/৪ ইঞ্চি	৭ ফুট ১/২ ইঞ্চি
শ্বেতপুচ্ছ হরিণ	৪০ „	৮ „
ক্যাঙ্গারু	৩২ „	৯ „
ঘোড়া	২৭ „	৮ ফুট ৬ ইঞ্চি
খরগোস	২৩ „	৭ ফুট

(মানুষের ক্ষেত্রে এই রেকর্ড সাধারণভাবে প্রযুক্ত নয়)
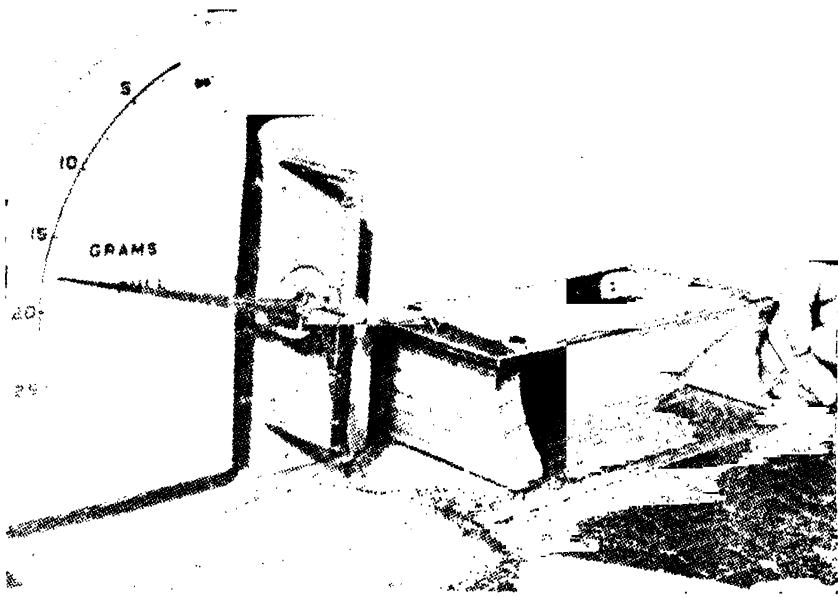
ডায়নামোমিটার যন্ত্রে গণ্ডারে-গুবরে পোকার শক্তি পরীক্ষা হচ্ছে।

আকৃতিগত তুলনায় বিচার করলে দেখা যায়—একটা কয়ারফড়িং লাফাতে পারবে প্রায় ৬০০ ফুট; অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে দুটি ফুটবল মাঠের সমান। একটি লাফানো-মক্ষিকা সোজাসুজি ১৩ ইঞ্চি এবং উপরের দিকে প্রায় ৮ ইঞ্চি লাফাতে পারে। মানুষের সঙ্গে তুলনায় এর পরিমাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্যে ৭০০ ফুট এবং উচ্চতায় ৪৫০ ফুট। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের উল্লম্ফন ক্ষমতার তুলনা করলে দেখা যায়—

প্রাণী-জগতে কীট-পতঙ্গেরাই যে সর্বপ্রথম উড্ডয়ন ক্ষমতা অর্জন করেছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কতকাল পূর্বে তারা এই অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করেছিল, তা বলা যায় না; তবে একথা ঠিক যে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে পক্ষিকুলের আবির্ভাবের বহু পূর্বে কীট-পতঙ্গের পূর্ব-পুরুষেরা বাতাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে কয়েক রকমের কীট-পতঙ্গ এমনই উড্ডয়ন ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে যে, অতি দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপিয়ে তারা একই স্থানে নিশ্চলভাবে

অবস্থান করতে পারে। এমন কি, বড় বড় ফড়িংগুলি যখন ছোট ছোট উড়ন্ত ফড়িং শিকার করবার জন্যে ছুটে যায় তখন তাদের গতিবেগ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এখানে কতকগুলি পতঙ্গের তুলনামূলক গতিবেগ দেওয়া হলো—

সাধারণ মাছি	৫ মাইল ঘণ্টায়		
বোলতা	১২	„	„
ভীমরুল	১৩৩	„	„
কয়ার ফড়িং	১৫	„	„
মৌমাছি	২৫	„	„
ঘোড়া-মাছি	৩০	„	„
ভোমরা	৩৫	„	„
ফড়িং	৬০	„	„

কিন্তু এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতি দ্রুত ডানা কাঁপিয়ে এরা অনায়াসেই বহুদূরে উড়ে যেতে পারে। ওড়বার সময় দেখে মনে হয় যেন ডানাবিহীন বেশ বড় একটা কালো বল বাতাসে ভেসে চলে যাচ্ছে। হরিণের শিঙের মত চোয়াল-বিশিষ্ট বৃহদাকারের পুরুষ গুব্‌রে পোকারা সঙ্গিনী নির্বাচনের সময় ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে তারা একে অন্যকে সাঁড়াশীর মত চোয়াল দিয়ে চেপে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছোট ছোট গেঁড়ী শামুকগুলির ভারবহন ক্ষমতাও অসাধারণ, একথা পূর্বেই বলেছি। একটা গেঁড়ী শামুক আরও দু-তিনটা শামুক পিঠে নিয়ে অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারে।

কয়ারফড়িং-এর লম্ফন

কয়ারফড়িং যদি মানুষের সমান বড় হতো তবে হিসাবমত সে বিশতলা উঁচু স্কাইস্ক্র্যাপারের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারতো।

আমাদের দেশে একরকম বড় গুব্‌রে পোকা দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ পোকাদের মাথার দিকে একটা বাঁকানো শিং থাকে। এদের শরীরের আয়তন দেখে অনেকেই মনে করেন, এত বড় ভারী দেহ নিয়ে এরা মোটেই উড়তে পারে না।

এ ছাড়া নিম্নস্তরের কতকগুলি প্রাণী অদ্ভুত শারীরিক কৌশলের পরিচয় দেয়। এক জাতের ডাঙ্গার শামুক দেখা যায়, তাদের শক্ত খোলা নেই। এরা দু-তিন ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়। কতকগুলি সূক্ষ্ম সূচীমুখ পেন্সিল খাড়াভাবে

সাজিয়ে এই জাতের শামুককে তার উপর ছেড়ে দিলে, সে অনায়াসে তার উপর দিয়ে চলে যায়।

বড় ফড়িংটি ছোট ফড়িংটাকে ধরবার জন্যে ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে উড়ে যাচ্ছে।

এতে তাদের পায়ের তলায় একটুও আঁচড় লাগে না। এই জাতের আর একরকম শামুককে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ

খোলা-শূন্য একরকম শামুক ক্ষুরের ধারালো ফলার উপর দিয়ে অক্ষত-দেহে হেঁটে যাচ্ছে।

ফলার উপর দিয়ে চলতে বাধ্য করে দেখা গেছে—তারা সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহে তীক্ষ্ণ ফলার উপর দিয়ে পিছলে যেতে পারে।

আফ্রিকার পঙ্গপাল ভয়ানক ক্ষতিকারক প্রাণী। স্থানত্যাগের সময় এরা যখন দল বেঁধে উড়তে থাকে তখন মনে হয় যেন সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে। ওড়বার সময় এদের কতটা শক্তিক্ষয় হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—তারা শরীরের ওজনের অনুপাতে গ্র্যাম পিছু ঘণ্টায় ১৩.৭ ক্যালোরী শক্তি ক্ষয় করে।

এ-হিসেবে দু-গ্র্যাম পরিমিত একটা পঙ্গপাল ঘণ্টায় যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে তাতে তিন পাউণ্ড ওজনের একটা ভারী বস্তুকে ২৭ ফুট উঁচুতে টেনে তোলা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে কীট-পতঙ্গের এই অদ্ভুত দৈহিক শক্তির ব্যাপারটাকে রহস্যজনক বলেই

পেন্সিলের সরু মুখের উপর দিয়ে খোলা-শূন্য শামুক অক্ষতভাবে হেঁটে যাচ্ছে।

মনে হয় বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কোন বস্তুকে বাড়িয়ে দিলে তার ওজন আনুপাতিক হারে না বেড়ে বিপরীত অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যেমন, এক ইঞ্চি পরিমিত কোন ঘনবস্তুকে সবদিকে দু-ইঞ্চি বাড়িয়ে দিলে প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায় ৮ ঘনইঞ্চি। এ-হিসেবে এক টুক্‌রা পাথর বা একটা পোকাকে বাড়িয়ে তুললে তার ওজন আয়তনের আনুপাতিক না হয়ে অনেক বেশী হয়ে যাবে; অর্থাৎ বস্তুটা আগের তুলনায় বেশী ভারী হবে। কাজেই মানুষ অথবা অন্য জন্তু-জানোয়ারদের তুলনায় কীট-পতঙ্গের শারীরিক শক্তি অসাধারণ বলেই প্রতীয়মান হয়। পেশী-শক্তির দিক থেকে হিসেব করলেও দেখা যায়—একটা গুব্‌রে পোকাকে হাতীর মত বাড়িয়ে তুললে, দেহের ভারে সেটা চলতেই পারবে না; সেরূপ একটা লাফানো-মাছিকে ক্যাঙ্গারুর মত বড় করলে দেহের ভারে সেটা হয়তো লাফাতেই পারবে না!

—গ—

মঙ্গলগ্রহের কথা

শ্রীজয়া রায়

পৃথিবী-কক্ষের বহির্ভাগে যে গ্রহটি দেখা যায় সেটি মঙ্গলগ্রহ নামে পরিচিত। উজ্জ্বল, রক্তাভ রঙের জন্যে প্রাচীন গ্রীক যুদ্ধদেবতার নামানুযায়ী এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহ অনেকটা ছোট। এর ব্যাস ৪২০০ মাইলের কিছু বেশী। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ ভূপৃষ্ঠের সাত ভাগের এক ভাগ এবং এর ওজন পৃথিবীর নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। যে সব উপাদানে মঙ্গলগ্রহ নির্মিত, তাদের গড় ঘনত্ব পার্থিব উপাদানের গড় ঘনত্বের চেয়ে কম। মঙ্গল-গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পৃথিবীর তুলনায় শতকরা আটত্রিশ ভাগ মাত্র; অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কোনও বস্তুর ওজন হয় ১০০ পাউণ্ড, তবে মঙ্গলগ্রহে তার ওজন হবে ৩৮ পাউণ্ড।

সূর্য থেকে মঙ্গলগ্রহ যে পরিমাণ আলোক ও উত্তাপ পায়, পৃথিবী পায় তার দ্বিগুণ। এই তথ্য থেকে মনে হয় যে, মঙ্গলের জলবায়ু খুবই শীতল। আবার কেউ কেউ বলেন—মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল খুব হাল্কা; কাজেই সূর্যরশ্মি প্রচুর পরিমাণে তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে। সে জন্যে মঙ্গলের আবহাওয়া উষ্ণতর হওয়াই সম্ভব।

মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন তার দূরত্ব হয় ৩৫,১৩১,০০০ মাইল এবং যখন সবচেয়ে দূরে যায় তখন দূরত্ব হয় প্রায় ৭৫,০০০,০০০ মাইল। এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর নিকটে আসে তখন খুব উজ্জ্বল দেখায়।

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে মঙ্গলগ্রহের লাগে প্রায় ৬৮৭ দিন। এর আহ্নিক গতি শেষ হতে পৃথিবীর চেয়ে ৩৭ মিনিট বেশী সময় লাগে। পৃথিবীর মতই মঙ্গলের মেরুদ্বয় চাপা। অনুকূল আবহাওয়ায় মেরুপ্রদেশের তুষার-আস্তরণ দেখেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃথিবীর অক্ষরেখাটি যেমন নিরক্ষরেখার উপর ২৩½° হেলে আছে, মঙ্গলগ্রহও সেরূপ ২৩½° হেলে সূর্য পরিক্রমণ করে। অতএব বোঝা যায় যে, মঙ্গলেও ঋতু-পরিবর্তন হয়। মঙ্গলের তুষার-আস্তরণ এক সময়ে বেড়ে ওঠে, আবার দ্রবীভূত হয় এবং তাছাড়া অন্যান্য পরিবর্তনও দেখা যায়। এসব ব্যাপার থেকেও ঋতু-পরিবর্তনের কথা প্রমাণিত হয়। মঙ্গলের ঋতু-পরিবর্তন ঠিক পৃথিবীর ঋতু-পরিবর্তনের অনুরূপ নয়।

এই গ্রহটি পৃথিবীর কক্ষের বাইরে থাকবার ফলে তার কলার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায় না। তাহলেও সময়ে সময়ে মঙ্গলের আকৃতি শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদের মত দেখায়। সূর্য, পৃথিবী এবং মঙ্গল যখন পরস্পরের সঙ্গে এক সমকোণ সৃষ্টি করে তখনই এই ধরণের আকৃতি দেখা যায়।

বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে—মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু তাতে জলীয় বাষ্পের অংশ বেশী পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা সূর্যালোকের বর্ণালী লক্ষ্য করে যেমন কালো কালো রেখা পেয়েছেন, মঙ্গলেরও সে রকম বর্ণালী দেখা গেছে। অবশ্য সেই আলো যে মঙ্গলেরই, তা জোর করে বলা যায় না; কারণ সেই আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে আসে। সুতরাং উপরি-উক্ত তথ্য সম্পর্কে প্রামাণ্য সংবাদ পাওয়া যায় নি।

মঙ্গলের ডিমস ও ফিবাস নামে দুটি উপগ্রহ আছে। এগুলি মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট দিয়েই

আবর্তিত হচ্ছে। উপগ্রহগুলি এত ক্ষুদ্র যে, ১৮৭৭ সালের আগে এগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। মঙ্গলের যে দুটি উপগ্রহ আছে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন আগে থেকেই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এদের সঠিক সন্ধান পান নি। মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ডিমসের দূরত্ব ১৪,৬০০ মাইল। এই উপগ্রহটি প্রায় ৩৭ ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফিবাস মাত্র ৫৮০০ মাইল দূরে থেকে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টায় মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে; অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের একদিনের মধ্যে ফিবাস তাকে প্রায় তিনবার প্রদক্ষিণ করে। এই দুটি উপগ্রহের একটির উদয়াস্তের মাঝখানে সময় থাকে আড়াই দিন। অন্যটি দিনে ৩ বার উদিত হয় এবং অস্ত যায়।

হার্শেলের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ মঙ্গলগ্রহের কতকগুলি চিহ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিকমহলে যথেষ্ট মতদ্বৈধ চলে আসছে। প্রথমে মনে করা হতো যে, মঙ্গলগ্রহে যে গাঢ় রঙের এলাকা দেখা যায়, সেগুলি সমুদ্র এবং হাল্কা রঙের এলাকাগুলি মঙ্গলের স্থলভাগ। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে স্থায়ী কোনও জলভাগ নেই। তাছাড়া সেই গভীর বর্ণযুক্ত অঞ্চলে সরু সরু রেখার মত অংশ দেখা যায়। সেগুলি সমুদ্রে থাকা অসম্ভব। এই দাগগুলি জিওভ্যানি সিয়াপেরিলি আবিষ্কার করেন এবং এগুলিকে তিনি ইটালীয় ভাষায় Canale বা খালই বলেন।

লাওয়েল বলেছিলেন যে, ঐ সূক্ষ্ম রেখাগুলি মঙ্গলের অধিবাসীদের কোন রকম চিরস্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা। যদি তাই স্বীকার করা যায় তবে নিশ্চয়ই সেখানে মানুষের মত প্রাণীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবাই এই বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। লাওয়েল আমরণকাল মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে গেছেন। তাঁর মানচিত্র থেকেই জানা যায় যে, এই খালগুলি লম্বা এবং সম্পূর্ণ সরল রেখায় চলে গেছে। এগুলিকে কখনও কয়েক শত মাইল, কখনও বা হাজার মাইলেরও উপর লম্বা দেখা গেছে। সবচেয়ে যেটি লম্বা, সেটির দৈর্ঘ্য ৩৫০০ মাইল। লাওয়েল বলেন, কোনও কোনও খাল সমান্তরালভাবেও চলে গেছে। এই তো গেল খালের কথা। বৈজ্ঞানিকেরা এর বেশী কিছু দেখতে পান নি। জ্যোতির্বিদেরা আরও দেখেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে কেন্দ্রের চেয়ে ধারগুলি উজ্জ্বল। এই ঔজ্জ্বল্য থেকে বোঝা যায়, সূর্যরশ্মি এমন এক স্তরে পৌঁছায় যেখান থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হতে পারে। সেই বিখ্যাত চিহ্নগুলি কেন্দ্রের দিকেই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। দৈনিক গতির ফলে সেই চিহ্নগুলি ধারে এসে পড়লে সেগুলিকে আর দেখা যায় না। মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে শীতকালে বরফ জমে এবং গ্রীষ্মকালে গলে যায়। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয়ই কিছু আর্দ্রতা আছে। সেই সামান্য জলই শীতকালে বরফে পরিণত হয়। সেখানে কতকগুলি সাদা বিন্দুর মতও দেখা যায়। সেই সময়কার বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলিকে মঙ্গলের মেঘ বলে মনে করেছিলেন। এসব তথ্য ১৯২৪ সাল এবং তার আগে-পরের কয়েক বছরের তথ্য। কারণ ১৯২৪ সালে মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটে এসেছিল। জ্যোতির্বিদ্‌মহলে সেই সময়ে নানারকম বিতর্ক চলে মঙ্গলকে নিয়ে।

আবার ১৯৫৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গল পৃথিবীর ৩৫,১৩১,০০০ মাইল নিকটে এসেছিল। ১৯৭১ সালে মঙ্গল আবার এই রকম দূরত্বে আসবে। এই সময় বৈজ্ঞানিকেরা ৪টি বিভিন্ন পন্থায় মঙ্গলগ্রহকে লক্ষ্য করেছেন। প্রথম—ব্যাপকভাবে মঙ্গলের বর্ণালী সম্পর্কে পরীক্ষা; দ্বিতীয়—বিপরীত প্লেটের উপর নানা রঙের আলোর সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ; তৃতীয়—মঙ্গলের উপগ্রহগুলির সঠিক অবস্থা জানবার জন্যে ঐ গ্রহের চতু-

পার্শ্বের তারকার প্রতি দৃষ্টি রাখা। চতুর্থ—চোখের সাহায্যে নিরীক্ষণ।

১৯১৬ সালের ৩রা জুন যে সব আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছে তাথেকে বিশেষ কোনও তথ্য জানা যায় নি। আবহাওয়া শান্ত থাকায় কেবল দক্ষিণ মেরুর দিকটাই পরিষ্কার দেখা গেছে। আমেরিকার অনেক বৈজ্ঞানিক এই সময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, রক্তাভ পৃষ্ঠদেশের মাঝখানে নীল শিরার মত কতকগুলি দাগ দেখা যাচ্ছে। এগুলি সেই পূর্ব-কথিত খাল—যদিও এগুলি আগে কালো বা ধূসর রঙের দেখা গিয়েছিল। কতকগুলি ছবি খুব বড় করে দেখালে খালগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এর পরে আরও অনেক দিন খালগুলি দেখা যায় নি।

সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে আসে তখন সেখানে ধূলিঝড় হওয়ায় গ্রহের বায়ুমণ্ডল ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। তার ফলে বিশেষ পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা যায় নি। অক্টোবরের এক রাত্রে মঙ্গলের দক্ষিণ প্রান্তের সিময়স ও আর্মাডন খাল দুটি পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছিল।

অগাষ্ট মাসে কমলা রঙের আলোর সাহায্যে তোলা এক আলোকচিত্রে গেহগু, হিডেকেল, ক্যান্টাব্রাস, অ্যাগাথাডেমন, গঙ্গা, নেক্টার, নিলোকেরাশ, যমুনা ইত্যাদি খালগুলি পরিষ্কার দেখা গেছে।

আবার আমেরিকা থেকে মেরুর কাছে একটা ফাটলও বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পেয়েছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী আগেও ঐ ফাটলটিকে দেখা গিয়েছিল। এই ফাটলটি দেখে বোঝা গেল যে, মঙ্গলগ্রহের গ্রীষ্মকাল বসন্তকালের একমাস পরেই আবির্ভূত হয়। এই সময় বরফ গলে এই ফাটল ক্রমশঃ লম্বা হয়ে তুষার-ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অংশ পরে আবার আলাদা সাদা বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সাদা বিন্দুগুলিই মিচেলের পর্বত নামে বিখ্যাত।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, মঙ্গলগ্রহে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এক পর্বতশ্রেণী আছে। সেই পর্বতের উপরে যে বরফ জমে থাকে, সেই বরফকেই দূর থেকে বিন্দু বিন্দু দেখায়।

মঙ্গলগ্রহের অভ্যন্তর ভাগ কি উপাদানে গঠিত, এখনও তা জানা যায় নি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের গঠনের মত মঙ্গলের গঠনও কি ঘন? এই গ্রহ নিরক্ষরেখার কাছে কতখানি স্ফীত এবং মেরু-প্রদেশের কাছে কতখানি চাপা, সে কথা জানতে পারলে এই সমস্যার কিছু সূত্র পাওয়া সম্ভব। কাজটি কিন্তু যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয়। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে রঙের এত বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, ছবি তুললে তাকে জাপানী লণ্ঠনের মত দেখাবে। তবে আরও একটি উপায় আছে। যে কোনও গ্রহের নিরক্ষ-রেখার স্ফীতি গ্রহের উপগ্রহগুলির গতিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বছরের পর বছর উপগ্রহগুলির গতি-বিধি লক্ষ্য করলে মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগের উপাদান সম্বন্ধে হয়তো সঠিক বিবরণ জানা যেতে পারে।

আধুনিক স্পেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে মঙ্গলের মেঘ ও কুয়াসা দেখে বোঝা যায় যে, মঙ্গলেও বায়ু-মণ্ডল বর্তমান; কিন্তু সেই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে কিনা তা জানা যায় নি। যদি শতকরা ৫ ভাগও অক্সিজেন থাকতো তাহলে স্পেক্‌ট্রোস্কোপে ধরা পড়তো। এর চেয়ে কম থাকলে অবশ্য জানা যাবে না।

মঙ্গলগ্রহে CO_2-এর অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণে CO_2 আছে তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশী মঙ্গলগ্রহে আছে। মঙ্গলগ্রহে হয়তো আরও নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যেমন—নাইট্রোজেন, আর্গন প্রভৃতি থাকতে পারে।

লক্ষ্য করবার মত আরো একটি বিষয় এই যে, নীলাভ বা ধূসরকৃষ্ণ যে জিনিষগুলি পূর্বে এবং সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেগুলি যদি খাল মারফৎ জলসেচের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে তার

সঙ্গে উদ্ভিদেরও সংস্রব থাকা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা ঐ অঞ্চলের রং কখনও নীলাভ, কখনও বা ধূসর সবুজ দেখেছেন। এই পরিবর্তন হয়তো ঋতু পরিবর্তনের ফল। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, ঐ কালো দাগগুলি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পতিত কোনও খনিজ পদার্থ। পত্রহরিৎযুক্ত উদ্ভিদ যেমন ইনফ্রারেড আলো প্রতিফলিত করে, এখানকার ঐ অংশ থেকে সে রকম আলো প্রতিফলিত হয় না, বরং মশ্‌ ও লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদের মত আলো বিকিরণ করে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে সব তথ্য জানা এখনও সম্ভব হয় নি। কিন্তু এর পরও গ্রহটি বহুবার পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বে আসবে। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো উন্নত ধরণের যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে মঙ্গলের সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন।
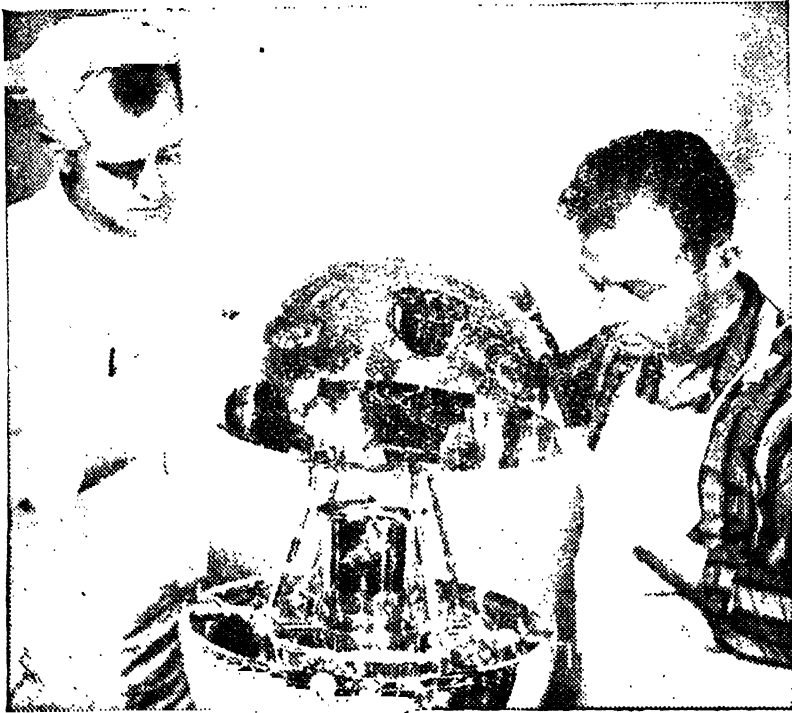
২০ ইঞ্চি পরিমাপের ২১½ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্র সমন্বিত ভ্যানগার্ড-২ নামক কৃত্রিম উপগ্রহের ছবিটি দেখা যাচ্ছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ভ্যানগার্ড তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সঞ্চয়ন

বরফাচ্ছাদিত সুমেরু মহাসাগর

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তিক সুমেরু মহাসাগর সম্পর্কে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা বিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধানের ফলে ক্রমেই অপসৃত হইতেছে। চন্দ্রগ্রহের অনাবিষ্কৃত একটি দিকের ন্যায় এই মহাসাগরের ৫৪০০০০০ বর্গমাইল স্থান বহু শতাব্দী ধরিয়া অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রখ্যাত ভূপর্যটক ন্যানসেন জাহাজযোগে এই বরফাচ্ছন্ন সুমেরু অঞ্চল পর্যটন করিয়া না আসা পর্যন্ত এই অঞ্চল সম্পর্কে কেহই তেমন কিছু জানিতেন না। তখন সকলেরই ধারণা ছিল, এই অঞ্চলে যদি কোন মহাসাগর থাকিয়াও থাকে তবে তাহা তেমন গভীর নহে এবং মহাসাগর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেই রকম মহাসাগর সেখানে নাই। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বিশেষজ্ঞগণ সুমেরু অঞ্চলে মহাদেশ আবিষ্কারের আশা করিতেন। ধীরে ধীরে তথ্যানুসন্ধানের ফলে সেই ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। এই জন্য বহু প্রাণও বিসর্জন দিতে হইয়াছে। আজ সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল ঘাঁটিতে নিয়মিতভাবে কাজকর্ম পরিচালিত হইতেছে। দুইটি মার্কিন পরমাণু-শক্তিচালিত সাবমেরিনও এই বরফাচ্ছাদিত সুমেরু মহাসাগর পাড়ি দিয়া আসিয়াছে। মহাসাগরের তলদেশ দিয়া ইহাদের যাইতে হইয়াছে। সুমেরু অঞ্চলের উপর দিয়া বর্তমানে নিয়মিতভাবে যাত্রীবাহী বিমানও চলাচল করিতেছে।

এই দুইটির মধ্যে নটিলাস নামে সাবমেরিনের অধিনায়ক ছিলেন কম্যাণ্ডার উইলিয়াম আর. অ্যাণ্ডারসন। এই অঞ্চল ঘুরিয়া আসিবার পর এই মহাসাগর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সুমেরু মহাসাগর খুবই গভীর। তবে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশ মুখেই গভীরতা বেশী এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে গভীরতা তুলনায় কম। এই মহাসাগরের গভীরতা পূর্বে যাহা অনুমান করা হইয়াছিল তাহার তুলনায় প্রকৃত গভীরতা এক মাইলেরও অধিক। এই মহাসাগরের যে অঞ্চলে গভীরতা সর্বাপেক্ষা বেশী তাহার পরিমাণ হইল ১৭ হাজার ১২৪ ফুট।

অ্যাণ্ডারসন এই অঞ্চল সম্পর্কে আরও জানাইয়াছেন যে, এখানকার সমুদ্রের তলদেশ খুবই বন্ধুর। এই রকম উঁচু-নীচু বন্ধুর তলদেশ এবং উপরের দিকে বিপুল পরিমাণ পুঞ্জীভূত বরফরাশির কথা কল্পনা করাও কঠিন।

কোন কোন আশাবাদীর ধারণা, সুমেরু অঞ্চলের শীতলতা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সেখানে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল সম্ভব হইবে। কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ বরফ জমা হইয়া আছে তাহাতে এখানকার সমুদ্রের উপর দিয়া নিয়মিতভাবে জাহাজ চলাচল কোন দিনই হয়তো সম্ভব হইবে না। তবে সেখানকার সমুদ্রের নিম্নদেশ দিয়া পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল যে সম্ভব তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এখানকার ৯০০০ ফুট উচ্চ লোমোসোনভ পর্বতমালার অবস্থিতি হইল আর একটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। রাশিয়ান বিজ্ঞানী লোমোসোনভের নামেই এই পর্বতমালার নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ তিনিই এই সমুদ্রনিমজ্জিত পর্বতমালার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-

ছিলেন। এই পর্বতমালা সুমেরু মহাসাগরকে দুইটি বিরাট বিস্তৃত অববাহিকায় বিভক্ত করিয়াছে। ইহাদের একটির স্রোতাবর্ত, ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে সেই দিকগামী; আর একটি তাহার বিপরীত দিকগামী। যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যে ধারা প্রবহমান, তাহা অন্যটির তুলনায় উষ্ণতর।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ উপলক্ষে সুমেরু অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহে পৃথিবীর ১২টি রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হইলে এই অপরিজ্ঞাত অঞ্চল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাইবে।

সুমেরু অঞ্চলকে ইংরেজিতে বলে আর্কটিক। আর্কটিক শব্দটি গ্রীক শব্দ আর্কটস হইতে আসিয়াছে। আর্কটসের অর্থ উত্তর দিক। খৃষ্টের জন্মের ৩২৫ বৎসর পূর্বে গ্রীক ভূপর্যটক পাইথিয়াস বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি হয়তো প্রথম সুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি আসিয়াছিলেন।

সুমেরু মহাসাগর উত্তর আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের প্রান্তসীমা দ্বারা পরিবৃত। গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিট্স্বার্জেন, ফ্র্যানটস, জোসেফল্যাণ্ড, নোভাইয়া জ্যামেলা ব্যতীত সেখানে আরও অসংখ্য দ্বীপ রহিয়াছে। সাইবেরিয়া হইতে এই অঞ্চলের বিস্তৃতি পাঁচশত মাইলেরও বেশী এবং মহাসাগরের গভীরতাও খুবই কম। গ্রীনল্যাণ্ডই উত্তর মেরুর সর্বাধিক নিকটে অবস্থিত। স্পিট্স্বার্জেন হইতে আলাস্কা পর্যন্ত মহাসাগরের দূরত্ব হইল ১৮০০ মাইল।

সাধারণ সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা এবং সাইবেরিয়ার বড় বড় নদী সুমেরু সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া এই সাগরের জল লোনা নয়। এই অঞ্চল সারা বৎসরই বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এখানে যে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, তাহা নহে। এই অতি শীতল স্থানে শীল, তিমি প্রভৃতি বিরাট মৎস্য-জাতীয় সামুদ্রিক জন্তু এবং বড় বড় কাঁকড়া, মৎস্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্বেতভল্লুক এবং শৃগালের সন্ধানও এখানে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়া হইতে যে অভিযাত্রীদল এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহারা উত্তর মেরুতে উড়ন্ত পাখীও দেখিয়া গিয়াছেন।

সামুদ্রিক আগাছার রাসায়নিক মূল্য

সামুদ্রিক আগাছার রাসায়নিক মূল্য সম্বন্ধে ক্রিষ্টিন রস্ লিখেছেন—অনেকের ধারণা সামুদ্রিক আগাছা একটা অতি বিরক্তিকর জিনিষ। যাঁরা জাহাজ নিয়ে কারবার করেন তাঁরা বিশেষভাবে এই আগাছাকে একটা উৎপাত বলে মনে করেন; কারণ তাতে জাহাজের গতি হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে যাঁরা দূর প্রাচ্যের দেশগুলি ঘুরে এসেছেন তাঁরা জানেন, এই আগাছা একদল লোকের কাছে খাদ্যবিশেষ। কিন্তু কেউ কি জানেন, এই আগাছা বৃটেনে বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প উন্নয়নের কাজে কিভাবে সাহায্য করছে?

অতীতে সামুদ্রিক শ্যাওলা বা অ্যাল্‌গি, বহুবিধ সামুদ্রিক আগাছা যে শ্রেণীর জিনিষ—পটাসিয়াম এবং আয়োডিনের উৎস হিসাবে সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এসব পদার্থ সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশন করা মোটেই লাভজনক নয়।

কিন্তু এই ধরণের সামুদ্রিক আগাছা, যেমন—আইরিশ মস্, নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দিয়ে তৈরী হয় জেলি (blancmange) এবং পুডিং ইত্যাদি। মদ্য প্রস্তুতকারীরা এগুলি ব্যবহার করে বিয়ার তৈরীর কাজে। ঔষধ এবং কস্‌মেটিক প্রস্তুতকারীরা এবং অন্যান্য অনেকে এই ধরণের আগাছা ব্যবহার করে থাকে।

সামুদ্রিক আগাছা কিংবা তজ্জাত অ্যাসিডের

ব্যবহার সম্পর্কে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৪ সাল থেকে। এই উৎসাহের কারণ হলো স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত মাসেলবার্গের নিকটে অবস্থিত ইনভেরেস্ক-এর ইনষ্টিট্যুট অব সি-উইড রিসার্চ-এর গবেষণামূলক কাজকর্ম। এখানকার এই কাজকর্মে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সামুদ্রিক দেশ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহ-যোগিতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপুরাতন ব্যক্তিগত শ্রমশিল্প গবেষণা সংস্থা মাসাচুসেট্সের আর্থার ডি. লিট্‌ল রিসার্চ অর্গেনাইজেশন অব কেম্ব্রিজ এবং কতিপয় বিশিষ্ট বৃটিশ বিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় আগ্রহশীল অনেকে এই প্রতিষ্ঠানে এসে যোগদান করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

আর্থার ডি. লিট্‌ল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট নামে পরিচিত এই নূতন সংস্থাটি যুক্তভাবে ইঙ্গ-মার্কিন পরিচালন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। তার কাজকর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হলেন ইনষ্টিট্যুট অব সি-উইড রিসার্চ-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ এস. নেভিল উডওয়ার্ড।

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে টেক্সটাইল প্রিণ্টিং-এর জন্যে উদ্ভাবিত নতুন ধরণের রঞ্জক দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটেনের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কয়েকটি ভেষজ প্রস্তুতকারী ফার্মের জমাট-নিরোধক শক্তি উদ্ভাবন সংক্রান্ত কাজের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভিটামিন ও দেহপুষ্টি

প্রাণীদেহের স্বাভাবিক পুষ্টিসাধনের জন্যে ভিটামিন যে অপরিহার্য, সে কথা সকলেই জানেন। ক্ষুদ্রতম জীবাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীর পক্ষেই ভিটামিন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাণীদেহে বিপাকক্রিয়ায় (মেটাবোলিজম) অনুঘটক (ক্যাটালিষ্ট) হিসাবে ভিটামিনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যে বিপাকক্রিয়ার ফলে জৈব-গ্রন্থিগুলির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলে এবং প্রাণীদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং আঙ্গিক সংগঠন হয়ে থাকে, সেই বিপাকক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা করে ভিটামিনগুলি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দেহে ভিটামিন বি-১২-এর অভাব ঘটলে রক্তাল্পতা রোগ বা অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে। খাবার ইচ্ছা কমে গেলে, শরীরের ওজন হ্রাস পেলে রোগীকে ভিটামিন বি-১২ মেশানো খাদ্য দেওয়া হয়। বাত রোগ হলে বুঝতে হবে, দেহের ক্রিয়ায় ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতি হচ্ছে।

উদ্ভিদদেহে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদেহে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই ভিটামিন সৃষ্টি হয়। আমরা উদ্ভিদের ফল-মূল ইত্যাদি খেয়ে দেহের ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করে থাকি। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভিটামিন তৈরী করা হচ্ছে। সোভিয়েট লাটভিয়ার রাজধানী রিগার বিজ্ঞানীরা সেখানকার কয়েকটি হ্রদের কর্দম থেকে ভিটামিন বি-১২ উৎপাদন করছেন। ফলে এই দুর্মূল্য ভিটামিনটি খুব সহজলভ্য আর সস্তা হয়ে পড়েছে। হাঁস-মুরগী-গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীদের খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন বি-১২ মিশিয়ে দেবার ফলে এসব পশুদেহের দৈনিক বৃদ্ধির হার ও ওজনের হার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বেড়ে যায়। মানুষের বেলায় তো এই ভিটামিন বি-১২ ইদানীং সোভিয়েট দেশের সব হাসপাতাল, চিকিৎসালয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৈশিক নালী বা ক্যাপিলারিকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে আরেকটি খুব দরকারী

ভিটামিন হলো ভিটামিন-পি। এই ভিটামিনটি ইদানীং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা উৎপাদন করেছেন চায়ের পাতা থেকে। আমরা যে তরল চা পান করি, তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে এই ভিটামিন থাকে—যার জন্যে ক্লান্তির সময়ে চা পান করলে কিছুটা স্নায়বিক আরাম বোধ হয়। সোভিয়েট দেশে আজকাল সরাসরি তাজা ও সবুজ চা পাতা থেকেই ভিটামিন-পি তৈরী করা হচ্ছে। কারণ, তাজা ও সবুজ শাক-সব্জি, পাতা ও ফলমূলেই ভিটামিনের পরিমাণ ঢের বেশী হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে যে সব সব্জি বা ফল তুলে এনে ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে ভিটামিনের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। শীতকাল আর বসন্তকালে প্রাণীজাত খাদ্য, যেমন—দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে ভিটামিনের পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যায়। তাছাড়া গমের রুটি বা পাউরুটি, চাল, চিনি, মার্গারিন ইত্যাদি প্রধান খাদ্যবস্তু-গুলিতে ভিটামিন প্রায় নেই বললেই চলে।

সে জন্যেই আজ বিশ্বের সর্বদেশে কৃত্রিম পদ্ধতিতে লেবরেটরিতে উৎপন্ন ভিটামিনের ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সাত-সালা পরিকল্পনার আমলে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভিটামিনের উৎপাদন বেড়ে যাবে ৬ গুণ। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক ভিটামিনের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য রকম বাড়ানো হবে; যেমন—অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে টোম্যাটো, ভুট্টা, আলু, বীট ইত্যাদির ভিটামিনের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ানো যায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় সার প্রয়োগে ও অন্যান্য উপায়ে তুলা, তামাক ইত্যাদির ভিটামিনও অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব এবং পরে সেই ভিটামিনকে আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে।

মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্যে যা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশী ভিটামিন উৎপাদন করা হবে প্রধানতঃ হাঁস-মুরগী-গরু ইত্যাদির পুষ্টিসাধনের জন্যে, এরা যাতে আরও বেশী পরিমাণে ডিম, দুধ, মাংস দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। এদের খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ আর বায়োমাইসিন নামে একরকম অ্যান্টিবায়োটিক মিশিয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। লাটভিয়ার একটি খামারে এই উপায়ে শুয়োরের মাংসের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত। যেমন—আগে যে শুয়োরটি—ধরা যাক, ১০ রুবল দামের খাদ্য খেয়ে ১০ পাউণ্ড মাংস দিত, এই নতুন ভিটামিন-মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াবার পর সেই শুয়োরটিই দিচ্ছে ১৩ পাউণ্ড মাংস। কিন্তু এই নতুন খাদ্যের জন্যে খরচ বাড়ছে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ; অর্থাৎ দশ রুবলের জায়গায় সাড়ে-দশ রুবল খরচ করে ১০ পাউণ্ডের জায়গায় ১৩ পাউণ্ড মাংস পাওয়া যাচ্ছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা
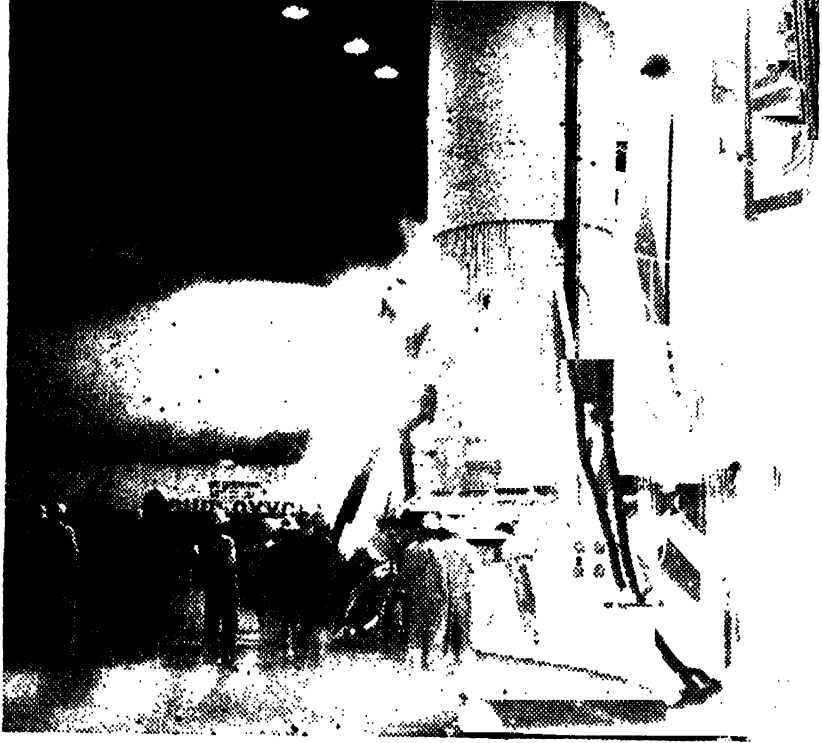
৩রা মার্চ (১৯৫৯) বিবিধ পরিমাপক যন্ত্রাদি সহ ১৩.৪ পাউণ্ড ওজনের স্বর্ণমণ্ডিত কোণাকৃতির পাইওনিয়ার-৪ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অন্তরীপ থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং পরের দিন থেকেই সূর্য পরিক্রমা আরম্ভ করে। পাইওনিয়ার-৪কে ঊর্ধ্বাকাশে চালিয়ে নেবার জন্যে ৭৬ ফুট লম্বা ৬০ টন ওজনের জুনো-২ নামে চার পর্যায়ী রকেট ব্যবহৃত হয়েছিল। পাইওনিয়ার-৪ ঘণ্টায় ২৪,৮৯০ মাইল প্রাথমিক গতিবেগ অর্জন করে। ছবিতে পাইওনিয়ার-৪ সহ বিশাল আকৃতির জুনো ২ রকেটকে মহাকাশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখা যাচ্ছে।

পেন্সিলের কথা

আমরা যে পেন্সিল দিয়ে লিখি, তার নাম কি তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। তার নাম লেড পেন্সিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, এটি 'লেড'ও নয়, 'পেন্সিল'ও নয়। লেড মানে সীসা, আর পেন্সিল শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'পেনিসিলাম' থেকে, যার অর্থ 'ছোট লেজ'। পেন্সিল কথাটি প্রচলিত হবার একটা কারণ আছে। পেন্সিল যখন প্রথম তৈরী হয় তখন এখনকার মত ছিল না। ছোট কাঠির ডগায় জন্তু-জানোয়ারের লোম বা লেজ কেটে লাগিয়ে দেওয়া হতো। অনেকটা তুলির মত। রঙে ডুবিয়ে লেখা হতো।

লেখার যত জিনিষপত্র বেরিয়েছে তার মধ্যে পেন্সিল সবচেয়ে সুলভ এবং সস্তা। তবুও পেন্সিলের কদর খুব বেশী নেই।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই পেন্সিলের ব্যবহার অনুভূত হয়। বর্তমানে ৩৭০ রকমের এবং ৭০টি বিভিন্ন রঙের পেন্সিল তৈরী হচ্ছে। কোন পেন্সিল থেকে খুব মোটা কালো দাগ পড়ে, আবার কোন পেন্সিল থেকে সরু ফিকে দাগ পড়ে। এ রকম ১৮টি বিভিন্ন মাত্রায় পেন্সিল তৈরী করা হয়। কাচ এবং প্লাষ্টিকের উপর লেখবার জন্যে এক ধরণের পেন্সিল আছে, অস্ত্র চিকিৎসকেরা রোগীর দেহে অস্ত্র করবার আগে যে জায়গায় অস্ত্র করবেন, সে জায়গাটিকে এক বিশেষ ধরণের পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেন। মাংস ভরা কৌটার গায়ে লেখবার জন্যে আর এক ধরণের পেন্সিল তৈরী করা হয়। আবার ইলেকট্রিক মেসিন পরীক্ষা করবার কাজে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন এক ধরণের পেন্সিল প্রস্তুত করা হয়। চর্বি-লাগা হাতে সাধারণ পেন্সিল ধরলে হাত থেকে ফস্কে যায়, সে জন্যে আর এক ধরণের পেন্সিল তৈরী করা হয়েছে, যাকে চর্বি-লাগা হাতে ধরা যায়। মাংস-বিক্রেতার কাছে এ ধরণের পেন্সিল খুবই প্রয়োজনীয়।

এছাড়া আরও অনেক ধরণের পেন্সিল আছে। কোন পেন্সিলের গায়ে পবিত্র 'দশ আজ্ঞা' বা টেন কম্যাণ্ডমেন্টস ছাপা থাকে। কোন পেন্সিলের গায়ে বারো মাসের ক্যালেণ্ডার ছাপা, আবার কোন পেন্সিলের গায়ে মুদ্রা পরিবর্তনের হিসাব লেখা থাকে। পেন্সিলের আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়। কোনটি দেখতে ছাতার মত, কোনটি বেতের মত, কোনটি বেস্-বলের মত, কোনটি আবার ট্র্যাফিক সিগ্‌ন্যালের মত। কোন পেন্সিল লম্বায় ১২ ফুট, কোনটি আবার লম্বায় আধ ইঞ্চি মাত্র।

আজকাল একরকম পেন্সিল বেরিয়েছে যার মধ্যে কাগজ মোড়া থাকে। কাগজের একটা ছোট মোড়ক পেন্সিলটির মাঝখানে জড়ানো থাকে। পেন্সিলের গায়ে এক ধারে একটা গোল ছিদ্র দিয়ে ঐ কাগজ বের করা যায়। তুমি হয়তো

কোথাও ঐ পেন্সিল নিয়ে গেছ—কোন কারণে কাগজের দরকার হলে কি সুবিধা, সহজেই বুঝতে পার।

অনেকের ধারণা আছে যে, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বা চিঠি পেন্সিল দিয়ে লেখা চলে না এবং ঐ লেখা অসিদ্ধ। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। যেখানে লেখা নেই যে, কালি দিয়ে লিখতে হবে, সে সব জায়গাতে পেন্সিল দিয়ে লেখা মোটেই বেআইনী নয়।

১৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে গ্রীক এবং রোমানরা ফিকে দাগ দেবার জন্যে বা চিত্রের রেখা টানবার জন্যে সীসা ব্যবহার করতেন। তার পরে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গ্র্যাফাইটের প্রচলন হয়। আমরা যে পেন্সিল দিয়ে লিখি, সেগুলি গ্র্যাফাইট দিয়ে তৈরী। দীর্ঘদিন গ্র্যাফাইটের দণ্ডটির উপরে কোন আবরণ দেবার প্রচলন ছিল না। গ্র্যাফাইট পদার্থটি কি? এটি এক বিশেষ শ্রেণীর কার্বন। গ্র্যাফাইট এবং কার্বন মূলতঃ এক।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম গ্র্যাফাইটের প্রচলন হয়। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত কাম্বারল্যাণ্ডে একটা বড় এবং ভারী ওক গাছ ঝড়ে পড়ে যায়। কিছুদিন পর সেখানে মাটি খুঁড়ে এক বিরাট গ্র্যাফাইটের পাহাড় পাওয়া গেল। কাম্বারল্যাণ্ডের মেষ-পালকেরা তাদের নিজ নিজ দলের ভেড়াগুলিকে চিহ্নিত করবার জন্যে ঐ গ্র্যাফাইট ব্যবহার করতো। মাটির ভিতর থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় যে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায় তা দিয়েই লেখা চলে। পরিশেষে ধনী মহাজনেরা এর প্রয়োজনীতা দেখে গ্র্যাফাইটের পাহাড় থেকে ছোট ছোট টুক্‌রা বের করে বিক্রী করতো। একটা অসুবিধা ছিল, এই শ্রেণীর গ্র্যাফাইট দিয়ে এক ধরণের অস্পষ্ট লেখা পড়তো।

তখন পেন্সিল প্রস্তুতকারীরা নীচু স্তরের গ্র্যাফাইট গুঁড়িয়ে তা থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়ে নতুন করে পেন্সিল তৈরী করবার মনস্থ করলো। কিন্তু কালো গুঁড়াগুলিকে কি করে আবার শক্ত অবস্থায় এনে পেন্সিলরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেটা জানা ছিল না। জার্মেনীর কাস্পার ফেবার নামে এক বিজ্ঞানী এক উপায় উদ্ভাবন করেন। গ্র্যাফাইটের গুঁড়ার সঙ্গে গন্ধক, অ্যান্টিমনি এবং রেজিন নামে এক ধরণের আঠালো পদার্থ মিশিয়ে শক্ত করা যায়। এ-রকমের শক্ত পদার্থ দিয়ে কিন্তু ভাল পেন্সিল তৈরী করা যায় না।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক নিকোলাস কন্টে বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট পাউডারের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে উনুনে পুড়িয়ে খুব শক্ত দণ্ড তৈরী করেন। মাটির জিনিষপত্র যেমন উনুনে পোড়ানো হয়, এও ঠিক তেমনি।

তারপরে জার্মান বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত পন্থাটিকে আরও উন্নত করেন এবং জন-সাধারণের কাজে লাগান।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম মন্‌রো এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে কাঠের টুক্‌রা ছোট ছোট করে কাটা যেত। ঐ যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, দুটি কাঠের টুক্‌রার মাঝখানে লম্বালম্বি খাঁজ কাটা যেত। দুটি কাঠের টুক্‌রার মধ্যভাগে গ্র্যাফাইটের দণ্ডটি বসিয়ে দুটি কাঠকে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হতো। আজকালও এই প্রথাই প্রচলিত।

যে সব পেন্সিল আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি লম্বায় ৭ ইঞ্চি। এরূপ একটি পেন্সিল দিয়ে ৩৫ মাইল লম্বা রেখা টানা বা ৪৫,০০০ শব্দ লেখা যেতে পারে।

লক্ষ্য করে থাকবে, পেন্সিলের রং বেশীভাগই হল্‌দে। তার কারণ জানা যায় নি। তবে ছুতারেরা যে পেন্সিল ব্যবহার করে, সে পেন্সিলগুলি গাঢ় লাল রঙের। তারা যাতে অনেক কাঠের টুক্‌রার মধ্যে পেন্সিল খুঁজে পায়, সে জন্যেই এ-রকম ব্যবস্থা।

এবার আধুনিক কালের পেন্সিল তৈরীর ব্যবস্থার কথা বলছি। প্রথমে গ্র্যাফাইট বেশ করে পিষে মাটির সঙ্গে খুব ভাল করে মেশানো হয়। তারপর জল দিয়ে লেই তৈরী করা হয়। তোমরা দেখে থাকবে কোন পেন্সিলের সীসা বেশ শক্ত, কোনটি বা নরম। গ্র্যাফাইট চূর্ণের সঙ্গে যত বেশী মাটি মেশানো যায়, গ্র্যাফাইট দণ্ডটি তত বেশী শক্ত হয়। এরপর নরম লেই নিয়ে একটা নলের মধ্যে পুরে চাপ দেওয়া হয়। নলের মুখে থাকে সরু ছিদ্র। চাপের জন্যে ছিদ্র দিয়ে লেই সরু হয়ে বেরিয়ে আসে। সরু নরম দণ্ডগুলিকে তখন পেন্সিলের মাপে কেটে শুকোতে দেওয়া হয়। শুক্‌নো দণ্ডগুলিকে এরপর আগুনে পোড়ানো হয়। পোড়ানো হয়ে গেলে সেগুলিকে গলিত মোমের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর সেগুলিকে তুলে নিয়ে খাঁজকাটা কাঠের টুক্‌রার মধ্যে বসিয়ে অনুরূপ আর একটি কাঠের টুক্‌রা তার উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দেওয়া হয়। দুটি কাঠ বেশ ভালভাবে আট্‌কে গেলে পেন্সিলের ছাঁচের মধ্যে বসিয়ে চাপ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি কেটে বাদ দেওয়া হয়।

মাপ অনুযায়ী পেন্সিল তৈরী হলে তাকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়। তারপর রং লাগিয়ে পালিশ করে গায়ে ছাপ মারবার পর পেন্সিল বাজারে আসে। তাহলে বুঝতে পারছো, যে পেন্সিল আমরা কয়েক আনার বিনিময়ে কিনি, তা তৈরী করতে কত মেহনৎ, যত্ন ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন!

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

সেলাই-কল আবিষ্কারের কথা

(কথায় ও চিত্রে)

১। বর্তমানে—মানুষের অতি প্রয়োজনীয় যতগুলি যন্ত্র পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সেলাই-কল একটি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আজ সেলায়ের মেসিন দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার একটি মেসিন কোম্পানী সম্প্রতি চুয়ান্নটি বিভিন্ন ভাষায়

১নং চিত্র

সেলাই-কল ব্যবহারের নিয়মাবলী ছাপছেন। ব্যবসায় অথবা গৃহকর্ম, উভয় প্রকার কার্যে ব্যবহৃত সেলাই-কলের আধুনিক সংস্করণ দিয়ে পোষাক সেলাই করা, সূচের কাজ করা, বোতাম সেলাই করা, বোতামের ঘর তৈরী করা ইত্যাদি সব রকম কাজ করা সম্ভব।

২নং চিত্র

২। পূর্বে—১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কেবলমাত্র হাত দিয়ে সেলাইয়ের সব কিছু কাজ করতে হতো। তখন কোন কারখানায় তৈরী পোষাক পাওয়া যেত না। ফলে

গৃহকর্ত্রীকে পরিবারের সব সেলাইয়ের কাজ নিজহাতে করতে হতো। একটি বৃহৎ পরিবারের বাড়ীর কর্ত্রীকে বহুক্ষণ সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো এবং বাড়ীর অন্য সব কাজ করতে যত সময় লাগতো, একমাত্র সেলাইতে তার চেয়ে বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। ফলে ১ ঘণ্টায় যে কাজ করা যায়, সেই কাজে তাদের ১৪ ঘণ্টা লাগতো।

৩। সুরুতে—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টমাস সেণ্ট নামে একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম নিজস্ব পন্থায় সেলাই-কল তৈরী করেন। চামড়া সেলাইয়ের কাজে তাঁর আবিষ্কৃত কলের ব্যবহার সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় লোকে সহজেই এই কলের কথা ভুলে গেল। ১৮৩০

৩নং চিত্র

খৃষ্টাব্দে বার্থেলেমি থিম্‌নিয়ার নামে একজন ফরাসী, ব্যবহারোপযোগী কাপড় সেলাইয়ের কল তৈরী করেন। মেসিনটি অনেক ত্রুটিপূর্ণ হলেও ফরাসী সরকার সেনাবাহিনীর পোষাক তৈরী করবার জন্যে ৮০টি মেসিন ক্রয় করেন।

৪নং চিত্র

৪। জনমনে প্রতিক্রিয়া—থিম্‌নিয়ারের সেলাই-কলের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের

মনে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগলো। মেসিন ব্যবহরের ফলে কর্মচ্যুত দর্জীরা এক উন্মত্ত জনতা সঙ্গে নিয়ে কারখানা এবং মেসিন সব ভেঙে চুরমার করে দিতে লাগলো। তখন লোকেরা বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যতে এই সেলাইয়ের মেসিনই হাজারো রকমের কর্মপন্থার সন্ধান দেবে।

৫। হাওয়ের মেসিন—ইলিয়াস হাওয়ে নামে একজন আমেরিকানও একটি সেলাই-মেসিন তৈরী করেন। তাঁর মেসিন চালু হলেও বহু ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম তাঁর নিজের তৈরী মেসিন বাজারে বের করেন। কিন্তু তিনি
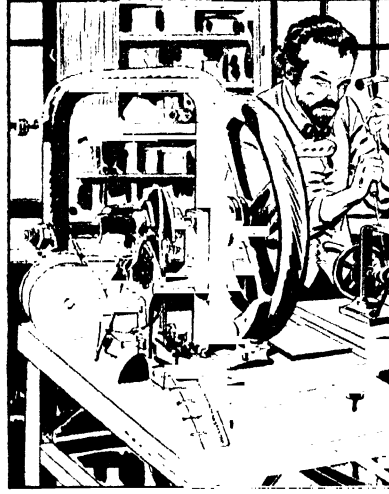
৫নং চিত্র

দেখলেন যে, এই মেসিন তৈরী বা বিক্রয় করা সম্বন্ধে কেউ বিশেষ আগ্রহশীল নয়। অনেক বছর চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত তিনি একটি কোম্পানীকে দিয়ে মেসিন তৈরী করাতে সক্ষম হন। কিন্তু সেই মেসিনের ক্রেতার সংখ্যা ছিল দু-চারজন মাত্র।

৬নং চিত্র

৬। আমেরিকার আদি মেসিন—হাওয়ের মেসিনে অনেক দোষত্রুটি ছিল।

মেসিনে একবারে বেশী সেলাই করা যেত না। অনবরত সুতা কেটে যেত, সুচের নীচে কাপড়ের সুতা সব জট পাকিয়ে থাকতো; এছাড়া সেলাইও নিখুঁত হতো না। কিন্তু সেলাইয়ের কাজটা মেসিনে কতকটা সহজ হতো বলে দু-চারজন লোক কোন রকমে এই মেসিন ব্যবহার করতো।

৭। আইজাক সিঙ্গার—বাস্তুত্যাগী এক গরীব জার্মান দম্পতীর ছেলে আইজাক সিঙ্গার পূর্বেকার সেলাই মেসিনের দোষত্রুটি সংশোধন করে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান করেন। স্কুলের লেখাপড়া না শিখেও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সিঙ্গারের জ্ঞান ছিল

৭নং চিত্র

অপরিসীম। তিনি পাথর ছেঁদা করবার এবং কাঠ খোদাইয়ের স্বয়ংক্রিয় মেসিন আবিষ্কার করেছিলেন। তারপরে সেলাই-মেসিনের সমস্যার দিকে তাঁর নজর পড়ে।
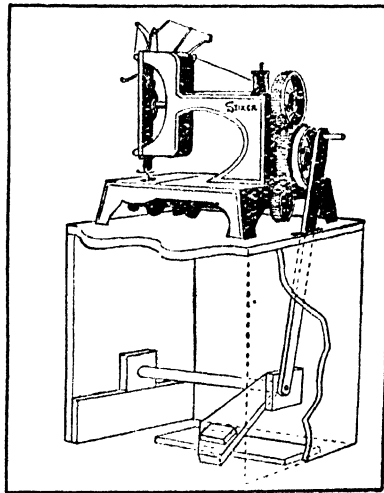
৮নং চিত্র

৮। সিঙ্গারের নির্মিত মেসিন—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪০ ডলার মুদ্রা ধার করে ১১

দিনে তিনি একটি সেলাইয়ের মেসিন তৈরী করেন। সূচের তলা দিয়ে যাবার সময় কাপড় যাতে সমতল থাকে, মেসিনে তিনি তার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি পা-দানি লাগানো মেসিন তৈরী করেন এবং হাওয়ের মেসিনের অনেক ত্রুটি সংশোধন করেন।

৯। সংগ্রাম—আইজাক সিঙ্গারের নির্মিত মেসিনের উন্নততর সংস্করণ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে। কিন্তু এই মেসিন তিনি যখন তৈরী করেন তখন ক্রেতা খুব কমই ছিল। অনেকে মনে করতেন যে, এই মেসিনের জটিলতা অত্যন্ত বেশী এবং

৯নং চিত্র

স্ত্রীলোকদের পক্ষে ব্যবহার করা শক্ত হবে। এই অজ্ঞানতা দূর করবার জন্যে তিনি বহু মহিলা-কর্মী নিযুক্ত করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর মেসিনের কার্যকারিতা দেখান। দেখা গেল, মেসিনের ব্যবহার মোটেই জটিল নয়।

১০নং চিত্র

১০। মজুরী—পোষাক প্রস্তুতকারীরা বেশীদিন লোকের এই অবিশ্বাসকে মেনে

নেন নি। তারা শীঘ্রই সিঙ্গারের তৈরী উন্নততর মেসিন ক্রয় করতে লাগলো। কিন্তু কর্মীরা প্রথমে এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা মনে করতো যে, ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করে যে কাজ করা যায়, মেসিন ব্যবহারের ফলে ১ ঘণ্টায় সে কাজ হলে বহুলোক বেকার হয়ে পড়বে।

১১। পোষাকের ব্যবসায়—সেলাই-কল আবিষ্কারের পূর্বে সেলাই-শিল্পের কর্মীরা অত্যন্ত কম মাইনে পেতো। হাতের প্রভূত পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা প্রস্তুত পোষাকের

১১নং চিত্র

যে সর্বোচ্চ মূল্য পেতো, সেটা কর্মীদের কাছে অত্যন্ত সামান্য হতো। এই শিল্পে সর্বত্র অসন্তোষ লেগেই থাকতো এবং তাতে কিছুই করবার ছিল না।

১২। ইউনিয়ন—সেলাইয়ের মেসিন ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বহু পোষাক

১২নং চিত্র

তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলো। ফলে, লোকেরা পূর্বাপেক্ষা অনেক কম দামে পোষাক

কিনতে পারতো। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক নতুন নতুন পোষাক-শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ পেতে লাগলো। কিন্তু তাহলেও কর্মীদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন হয় নি। তখন আমেরিকার পোষাক-শিল্পের কর্মীরা তাদের ইউনিয়ন মারফৎ ধর্মঘট ঘোষণা করে। তার ফলে তাদের মজুরীর হার বাড়ানো হয় এবং কর্মতালিকা বেঁধে দেওয়া হয়।

১৩। বর্তমান সময়ে—পোষাক তৈরী-কারখানার কর্মীদের বিরাট ইউনিয়ন—আন্তর্জাতিক মহিলা পোষাক-প্রস্তুতকারী কর্মীদের ইউনিয়ন বর্তমানে বহু সুযোগ-সুবিধা

১৩নং চিত্র

লাভ করেছে; যেমন—ভাল বেতন, সুনির্দিষ্ট কর্মতালিকা, কাজের উত্তম সর্তাবলী, স্বাস্থ্যবীমা, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা, পীড়িতদের জন্যে হাসপাতাল ইত্যাদি।

১১নং চিত্র

১৪। স্বাচ্ছন্দ্য ও মিতব্যয়িতা—সেলাইয়ের মেসিন আজকের দিনে আমাদের গৃহকর্ম সাধনের হিতৈষী বন্ধু। ভারী ত্রিপল সেলাই থেকে সুরু করে মিলের পোষাক

সেলাই এবং বাড়ীর নানাবিধ কাজেও এর ব্যবহার যথেষ্ট। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এবং পরিমিত অর্থ ব্যয়ের কাজে সেলাই-মেসিনের দান অপরিসীম। সেলাই-মেসিন আবিষ্কৃত না হলে আজ পৃথিবীতে সস্তায় পোষাক পাওয়া যেত না এবং বাড়ীতে বসেও সূচের নানাবিধ কাজ করা খুব শ্রমসাধ্য হতো।

১৫। অবদান—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেলাই-মেসিনের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সেলাই-মেসিনের ব্যবহারে বহু জিনিষ সুষ্ঠুভাবে এবং অল্প সময়ে তৈরী করা যাচ্ছে।
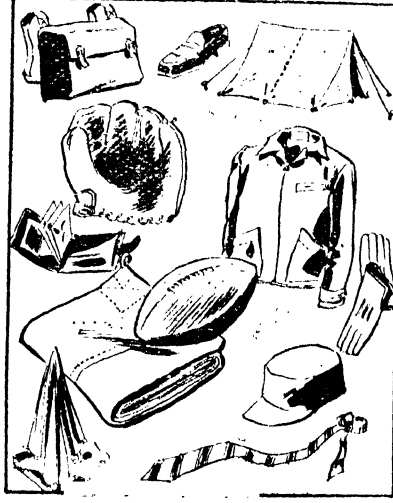
১৫নং চিত্র

তাছাড়া হাতে-তৈরী পোষাকের দামের চেয়ে মেসিনে তৈরী পোষাকের দাম অনেক কম। সে জন্যে ক্রেতারা অনেক পোষাক ক্রয় করতে পারে। ক্রেতাদের চাহিদা মিটাবার জন্যে পোষাক-শিল্প কারখানায় প্রচুর লোক কর্মে নিযুক্ত হয়েছে এবং মেসিন আবিষ্কারের পূর্বে তারা যে আয় করতো তার চেয়ে এখন অনেক বেশী আয় করছে।

বিবিধ

মধ্যপ্রদেশে নূতন কয়লাখনির সন্ধান

খনি ও তৈলমন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্য ৬ই মে লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রদেশে একটি নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে ৫ কোটি টনেরও অধিক কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

তাঁহার এই ঘোষণায় সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। রাজ্যসভায় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহও অনুরূপ বিবৃতি দেন।

শ্রী কে. ডি. মালব্য লোকসভায় জানান যে, ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা মধ্যপ্রদেশে একটি নূতন কয়লা খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই।

শ্রীমালব্য বলেন, আমি এই সভাকে জানাইতে চাই যে, কিছুকাল আগে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভূতাত্ত্বিকগণ মধ্যপ্রদেশের সিংরৌদি কয়লা খনি অঞ্চলে ড্রিলিং করিবার সময় ১৩০ ফুট গভীরে ৫৪ ফুট পুরু একটি কয়লাস্তরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আরও উত্তরে উহার সম্প্রসারণ লক্ষ্য

করিবার উদ্দেশ্যে ড্রিল করিবার ফলে ভূতাত্ত্বিকেরা ৯০ ফুট পুরু একটি কয়লাস্তরের সন্ধান পাইয়াছেন। উহার মাঝখানে ১৫ ফুটের একটি ফাঁক রহিয়াছে।

এই নূতন স্তরগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নীচের দিকে এক মাইল ব্যাপিয়া কোয়েরি করা হইতে পারে। স্তরের দৈর্ঘ্য এক বা দুই মাইলের অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। উহাতে কোয়েরি-যোগ্য ৫ কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। তবে আরও ড্রিলিং করিলে কয়লার পরিমাণ আরও বেশী হইয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কয়লা-খাদে ড্রিলিং করিবার সাজসরঞ্জামের অভাবে আমাদের পক্ষে ড্রিলিং কার্য ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন কয়লা সম্বন্ধে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া উচিত হইবে না। কারণ, প্রাপ্ত তথ্যের সাধারণ পর্যালোচনার দ্বারা ঐ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ড্রিলিং শেষ হইলেই সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব হইবে।

এই কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়ার ফলে কয়লার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

নন্দকোট শৃঙ্গ অভিযান

২৮শে মে, ভারতীয় নৌ-বিভাগীয় সদর দপ্তরে প্রাপ্ত এক তারবার্তায় জানা গিয়াছে যে, নন্দকোট শৃঙ্গে (২২,৫১০ ফুট) প্রথম ভারতীয় নৌ-বিভাগীয় অভিযান সফল হইয়াছে এবং অভিযাত্রীদল ২৫শে মে বেলা ২-২০ মিনিটের সময় শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অভিযাত্রী দলের নেতা সিনিয়র কমিশনার ইনষ্ট্রাক্টর অফিসার এম. এস. কোহলি এবং কে. পি. শর্মা চূড়ান্ত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। নৌ-বিভাগীয় এই অভিযাত্রী দলটি সম্ভবতঃ আগামী ৬ই জুন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবে।

এই অভিযাত্রী দল গত ২৭শে এপ্রিল দিল্লী ত্যাগ করে।

কোহলি ও কে. পি. শর্মা ছাড়াও এই অভিযাত্রী দলে ছিলেন ওয়াই. সি. শর্মা, শ্রী এ. এস. পাবরেজা, বি. বি. অস্পস্থা এবং উঁচু পর্বতে উঠিতে অভ্যস্ত দার্জিলিং হইতে আগত দুইজন শেরপা।

কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি

শারীর-বিজ্ঞানীরা জানেন, মানুষের সাধারণ শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নির্ভর করে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (এণ্ডোক্রাইন সিস্টেম) স্বাভাবিক কার্যকারিতার উপর। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির (প্যাংক্রিয়াস, থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল প্রভৃতি) স্বাভাবিক কাজ যদি ব্যাহত হয় তাহা হইলে মানুষের নানারকম মানসিক ও দৈহিক বিকৃতি ঘটে, দেহের স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধি হয় না এবং বুদ্ধিবৃত্তিও স্বাভাবিকরূপে বিকশিত হয় না।

খর্বাকৃতি লোকদের কৃত্রিম উপায়ে দেহের দৈর্ঘ্য বাড়াইবার পদ্ধতি আবিষ্কারের কাজে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি মস্কোর শিশু-পক্ষাঘাত রোগসংক্রান্ত গবেষণা-ভবনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী নিনা কাদিসেভা খর্বাকৃতি কিশোর-কিশোরীদের এণ্ডোক্রাইন-তন্ত্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিগুলি বদল করিয়া—অর্থাৎ রোগগ্রস্ত গ্রন্থির স্থানে নূতন সুস্থ গ্রন্থি বসাইয়া তাহাদের দৈহিক বিকৃতি সারাইয়া তোলা ও স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ফিরাইয়া আনিবার কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই অস্ত্রোপচারের কাজটি মোটেই কঠিন নয়। ডাক্তার কাদিসেভা এই অস্ত্রোপচারের কাজে এমন দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন যে, একটি গ্রন্থি কাটিয়া বাদ দিয়া সেখানে অন্য একটি গ্রন্থি বসাইয়া দিতে তাঁহার সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন মিনিট হইতে আট মিনিট। তিনি প্রথমে কুকুর ও বানরের দেহে পরীক্ষামূলকভাবে অস্ত্রোপচার চালাইয়া এই কাজে দক্ষতা অর্জন করেন।

এই ভাবে গ্রন্থি পরিবর্তন করিবার পর রোগীর বয়স অনুসারে তাহার দেহের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ফিরিয়া পাইতে সময় লাগে ২০ হইতে ৪০ সপ্তাহ।

রক্তাল্পতা রোগের নূতন ঔষধ

রক্তাল্পতা রোগ বা অ্যানিমিয়ায় যাঁহারা ভোগেন, চিকিৎসকেরা তাঁহাদের পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি পশুর যকৃৎ বা মেটুলি খাইতে বলেন। ইহা রক্তাল্পতা রোগের বিরুদ্ধে এক অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। পাঁঠার মেটুলি অল্প পরিমাণে রোজ সিদ্ধ করিয়া খাইলে (কাঁচা খাইতে পারিলে আরও ভাল) সাধারণ ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা রোগ সহজেই নিরাময় হয়, রোগীর দেহে রক্তকণিকা বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সে ক্রমে সারিয়া ওঠে।

কিন্তু রক্তাল্পতা রোগের সঙ্গীন অবস্থায় আর এই ব্যবস্থায় ফল হয় না। যাঁহারা অত্যধিক রক্তাল্পতা রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী কোন ঔষধ আবিষ্কারের কাজে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক দিন হইতেই গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি উজবেকিস্তানের রসায়ন-বিজ্ঞানী ম্যানন আজিজফ কোঅ্যামাইড নামে যে রাসায়নিক পদার্থটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অত্যধিক রক্তাল্পতায় খুব ফলপ্রদ ঔষধ হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

মানবদেহে কোবাল্ট ধাতুর অস্তিত্বই যে স্বাভাবিক রক্ত সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখে তাহা বিজ্ঞানীরা অনেক দিন হইতেই অবগত আছেন। এই কোবাল্টকে কি ভাবে রক্তাল্পতার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায়, তাহাই ছিল আজিজফের গবেষণার বিষয়। দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের পর তিনি কোবাল্টের সহিত নিকোটিন-অ্যামাইড অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটাইয়া এই কোঅ্যামাইড প্রস্তুত করেন। এই কোঅ্যামাইড এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধের চেয়ে যেমন দামে সস্তা তেমনই ঢের বেশী কার্যকরী। এই নূতন ঔষধটি সোভিয়েট দেশের হাসপাতালগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

রক্তে ক্যান্সার রোগ

৫২ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা লিউকেমিয়া (রক্তে ক্যান্সার রোগ) হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া নিউইয়র্কের জনৈক চিকিৎসক জানাইয়াছেন। এই রোগে সাধারণতঃ কেহ বাঁচে না।

মার্কিন চিকিৎসক সমিতির মুখপত্রে ডাঃ কার্ল রিচ লিখিয়াছেন যে, আয়ারল্যাণ্ডের লিমারিকের অধিবাসিনী এই মহিলা কেমন করিয়া আরোগ্য-লাভ করিলেন তাহা তিনি জানেন না।

ডাঃ রিচ বলেন যে, তাঁহার রোগিণী নিউইয়র্কে বাস করেন। ১৯৫১ সালে উক্ত মহিলা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বীক্ষণাগারে সর্বরকম পরীক্ষায় লেমফোসাইটিক লিউকেমিয়া রোগ সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়। রক্তের শ্বেতকণিকার উপর এই রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে।

ডাঃ রিচ বলেন, ১৯৫৩ সালে উক্ত রোগিণীর দেহে রক্ত সঞ্চালন ও অন্যান্য চিকিৎসার পর লিউকেমিয়া রোগের সমস্ত লক্ষণ দূরীভূত হয় এবং তখন হইতে তাঁহার শরীরে উক্ত রোগের আর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ যিনি রক্ত দান করিয়াছেন তাঁহার রক্তে এমন কোন পদার্থ ছিল যাহা উক্ত রোগিণীর রোগ মুক্তিতে সহায়তা করিয়াছে।

রক্তচাপাধিক্যের নূতন ঔষধ

নিউজার্সির সিবা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্ট্‌স্‌ নামে একটি ভেষজ প্রতিষ্ঠান রক্তচাপাধিক্যের সম্প্রতি একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধটির নাম সিঙ্গো সার্প।

রোগীর দেহে ঔষধের ক্রিয়া সহজে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন সহযোগে রেসারপিন নামে একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াই উল্লিখিত ভেষজটি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

রেসারপিনের মত এই নূতন ভেষজ সর্পগন্ধা

হইতে প্রস্তুত ভেষজসমূহের মতই কার্যকরী। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগে রোগীর দেহে আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অন্য ঔষধের সঙ্গে ইহার মিশ্রণও চলে।

বিগত দেড় বৎসর ধরিয়া তিন হাজারের বেশী রোগীর দেহে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান

রাশিয়ার চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ব্যবহারিক শারীরতত্ত্ব গবেষণাগারের অধ্যক্ষ প্রফেসর নেগোভস্কী বিভিন্ন জীবের উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক হইতে মৃত্যু ঘটিবার পাঁচ-ছয় মিনিট পরে নহে, আরও বহু সময় পরেও নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করা অসম্ভব নহে।

কুকুরের উপর অসংখ্য পরীক্ষা চালানো হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, প্রচুর রক্তপাতের ফলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যে কুকুরের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে তাহার দেহ শীতল করিয়া এবং ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ত্রিশ মিনিট, এমন কি এক ঘণ্টা পরেও তাহাকে বাঁচাইয়া তোলা সম্ভব।

গবেষণাগারের অবস্থার মধ্যে কৃত্রিম শীতলতা প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক হইতে মৃত্যু ঘটিবার এক ঘণ্টা পরেও মস্তিষ্কসহ সকল ইন্দ্রিয়কে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হইয়াছে।

জল ও মৃত্তিকাস্পর্শী অভিনব যান

বৃটিশ মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হোভারক্র্যাফ্‌ট্ বা সমুদ্রগামী উড়ন্ত পিরীচ প্রথম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ওয়াইট দ্বীপের একটি কারখানায় ইঞ্জিনটি এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

অর্ধেক জাহাজ ও অর্ধেক বিমান, পিরীচের আকৃতিবিশিষ্ট যান হোভারক্র্যাফ্‌ট্ সমুদ্রের উপর দিয়া জল ছুঁইয়া ছুটিয়া চলিবে—আবার মৃত্তিকার মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া মাঝে মাঝে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া উহা বিমানের ন্যায় উড়িয়া চলিবে।

আকাশে মঞ্চ স্থাপন

বেতার-তরঙ্গের পুঞ্জীভূত শক্তি দ্বারা শীঘ্রই হয়তো ১০০ ফুট বিস্তৃত পিরিচের ন্যায় একটি মঞ্চকে পৃথিবী হইতে অনেক উচ্চে শূন্যে ধরিয়া রাখা যাইবে। রেথিয়ন কোম্পানী ১৭ই মে, ওয়ালথাকে—(ম্যাসাচুসেট্‌স্) এই সংবাদ ঘোষণা করেন।

এই কোম্পানী কর্তৃক উচ্চ শক্তি এবং দ্রুত অণুতরঙ্গের এক ধরণের কল নির্মিত হইবার ফলেই এই ফল লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকিয়াই মঞ্চটি আকাশে উড়িয়া বেড়াইবে।

মঞ্চের হেলিকপ্টারের মত ঘূর্ণায়মান পাখাগুলিকে ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত বেতার-কেন্দ্র হইতে অণু-তরঙ্গের সাহায্যে পরিচালনা করা করা হইবে।

এই ধরণের মঞ্চের সাহায্যে সামান্য খরচে টেলিভিসন অনুষ্ঠান এক স্থান হইতে বহু দূরে অন্য স্থানে সহজে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

দ্রষ্টব্য—গত মে সংখ্যায় (১৯৫৯) প্রকাশিত "দিনটা কত বড়" প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন—উক্ত প্রবন্ধের নির্দেশিত স্থানগুলিতে নিম্নোক্ত সংশোধিত পাঠ হইবে—

২৬৭ পৃঃ—পাদটীকা—বিষুবলম্ব ২৩°২৩´৪২´ স্থলে বিষুবলম্ব ২৩°২৬´৪২´´ হইবে।

২৬৮ পৃঃ—২য় স্তম্ভ ৩য় লাইন—স ত ছায়াবৃত্তের এক চতুর্থাংশ স্থলে অক্ষবৃত্তের এক চতুর্থাংশ হইবে।

২৬৮ পৃঃ—২য় স্তম্ভ ২০-এর লাইন—∴ সাইন চ—ব ট্যান অ ট্যান ল স্থলে 'ব' অক্ষরটি কাটা যাইবে। —স—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৫৯ | সপ্তম সংখ্যা

অবকাশ পরিমাপক যন্ত্রাদির ব্যবহার ও তৎসাহায্যে সময় নিরূপণ

শ্রীদেবপ্রসাদ মৈত্র

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বহু বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সাফল্য হইয়াছে আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্বের ব্যাপারে। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে ইহাই বোধহয় সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।

আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানের মূল চিন্তাধারার এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করিয়াছে, যাহাতে দেশ এবং কালের সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই সম্বন্ধে মিনকাওস্কি বলিয়াছেন—এখন হইতে কেবল দেশ বা কেবল কাল ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়াছে; এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের যোগাযোগেই মাত্র ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

আপেক্ষিকতাবাদ সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে কালাবকাশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী সংজ্ঞা অনুসারে না হইলেও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অল্প-বিস্তর পরিমাণবোধক। এমন কোন কোন প্রয়োগের কথা বলিতে পারা যায় যাহা বাস্তবিকই সংঘটিত হইয়াছে, অথবা যাহা হয় নাই অথচ সহজেই করা যাইতে পারে। আবার এমন প্রয়োগের কথাও চিন্তা করা যায় যাহা বহু আয়াসসাধ্য, অথবা যাহা একেবারেই সম্ভব নহে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আবার এমনও হইতে পারে যে, কতকগুলি কখনও কখনও সম্ভব হয়। দেখা যাইতেছে যে, একাধারে আমাদের দৃষ্টির প্রসারতা সীমাবদ্ধ এবং জ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে আবার তেমনই উপলব্ধি অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু জিজ্ঞাসা আমাদের অনন্ত। জ্ঞান-পিপাসুর মনে অনেক অসঙ্গত প্রশ্নেরও উদয় হয়, আর বিজ্ঞানের কতকগুলি বিখ্যাত আপাতবিরোধী সত্যেরও উৎপত্তি হয় এইভাবে। উদাহরণস্বরূপ ম্যাক্সওয়েলের ডেমনের (দৈত্যের) কথা অথবা এমন অনেক পরীক্ষার কথা বলা যায় যাহার জন্য পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করিবার কল্পনার প্রয়োজন।

ম্যাক্সওয়েলের ডেমনের ব্যাপারটি বর্তমান ক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। তাপ-সঞ্চরণ তত্ত্বের (থার্মোডাইনা-

মিক্সের) দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে অসম তাপমাত্রাসম্পন্ন দুইটি বস্তুর পাশাপাশি অবস্থান অসম্ভব, অর্থাৎ দুইটি বস্তুর উষ্ণতা আলাদা হইলে দুইটির মধ্যে তাপ-বিনিময় হইবে এবং উভয়েই একটি সাধারণ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। 'কাইনেটিক থিয়োরী' অনুযায়ী কোন একটি গ্যাসের উষ্ণতা নির্ভর করে সেই গ্যাসের অণুগুলির গতিশীলতার উপর। কিন্তু এই অণুগুলির সব কয়টি একই গতিসম্পন্ন নহে—উষ্ণতা অনুযায়ী গতির গড় পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়িলে অধিক গতিবিশিষ্ট অণুর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। সেইজন্য একই উষ্ণতাবিশিষ্ট গ্যাসের মধ্যে বিভিন্ন-গতিসম্পন্ন অণুগুলি চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে বলিয়া ধরা হয়। ম্যাক্সওয়েল কল্পনা করিলেন যে, যদি এমন কোন একটি দ্বাররক্ষী পাওয়া যায় যাহার কাজ হইবে, একটি গ্যাসপূর্ণ ও অন্য একটি শূন্য আধারের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিয়া কেবল অধিক গতিসম্পন্ন অণুগুলিকে শূন্যপাত্রে যাইতে দেওয়া। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই পাত্রে সঞ্চিত অণুগুলির গড় গতি প্রথম আধারের অণু হইতে অনেক বেশী হইবে। অর্থাৎ একটি পাত্রের গ্যাস অপর পাত্রের গ্যাস হইতে উষ্ণতর হইবে এবং তাপ-সঞ্চরণ তত্ত্বের বিপরীত-ধর্মী ফল পাওয়া যাইবে। উপর্যুক্ত ঘটনা সম্পূর্ণই নির্ভর করিতেছে এমন একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দ্বাররক্ষকের উপর, যাহার অস্তিত্ব কল্পনাতেই সম্ভব এবং তাহাকেই ম্যাক্সওয়েলের ডেমন বলা হয়।

সময় ও অবকাশ

সময়ের পরিমাপ বলিতে মূলতঃ কোনও আবর্তমান ঘটনার পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বুঝাইয়া থাকে; কোনও পরিমাপক মানের প্রয়োজন হয় না। দৈর্ঘ্য মাপিতে হইলে সব সময়েই দুইটি দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক হিসাব করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে একটি হইল দৈর্ঘ্যের একক ও অন্যটি হইল, যে দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে। কিন্তু সময় পরিমাপ করিতে এইরূপ কোনও তুলনামূলক হিসাবের প্রয়োজন নাই, সময়ের এককগুলির পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি গণনা করিলেই মাপ পাওয়া যায়। কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপিতে হইলে দৈর্ঘ্যের একক কতবার তাহার মধ্যে যায় তাহা হইতেই দৈর্ঘ্যের মাপ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু কোনও ঘটনার সময় বুঝাইতে হইলে সেই ঘটনা অবধি পৌঁছিতে বাস্তবিক কতগুলি সময়ের একক অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই হইবে। দেখা যাইতেছে, সময়ের পরিমাপের সহিত সমকালিনতা, অর্থাৎ দুইটি ঘটনা একই সময়ে ঘটিতেছে কি না তাহা বিচার করিবার প্রশ্ন জড়িত।

যদিও সময় পরিমাপ করিতে হইলে নীতিগত-ভাবে কেবল গণনার প্রয়োজন তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন কারণে সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য পরিমাপের প্রশ্নও অঙ্গীভূত হয়। এই কারণ দুইটির প্রথমটি হইল, সময় বিভাগ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করা (সহায়ক হিসাবে) এবং দ্বিতীয়টি হইল, যে কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা (সহায়ক হিসাবে)। উভয় ক্ষেত্রেই মূলনীতির কোন ব্যত্যয় হয় না। সম্ভবতঃ প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা সুবিধার জন্যই এইরূপ করা হইয়া থাকে। অবকাশ বিবর্ধনের যন্ত্র অপেক্ষা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির পরিমাণ বহুগুণ বেশী হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারও প্রয়োগ আছে। সূর্যগ্রহণের সময় নির্দেশ করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে সূর্য এবং একটি ঘড়ির চলচ্চিত্র একই সঙ্গে গ্রহণ করা এই ধরণের একটি প্রয়োগ। সমকালিনতা বিচার করিতে হইলে ইহাদের মধ্য হইতে এমন একটি চিত্র বাহির করিতে হইবে যাহাতে সর্বপ্রথম সূর্যের কোন অংশই ধরা পড়ে নাই।

যে মুহূর্ত হইতে সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য সময়ের এককগুলির গণনা সুরু করা হয়, তাহাকে আমরা প্রাথমিক ইপক (Fundamental epoch) বলিতে পারি। ইহার নির্বাচন সম্পূর্ণই আমাদের

ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—তবে রীতি ও সাধারণ স্বীকৃতি অনুযায়ীই ইহা গ্রহণ করা হয়; যেমন—প্রচলিত রীতি অনুসারে খৃষ্টের কাল হইতে বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। মাস গণনা সুরু হয় বৎসরের প্রথম হইতে, মাসের প্রথম হইতে দিন এবং এইরূপ ভাবেই ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড গণনা করা হয়। দিন ও বৎসরের মধ্যে খুব সোজাসুজি কোন সম্বন্ধ না থাকিবার জন্যই প্রধানতঃ দিনপঞ্জীতে নানারূপ পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

কোন দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন মোটামুটিভাবে দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক মানের আদর্শ অনুযায়ী একটি প্রতিলিপি। ঠিক সেইরূপ আমরা সাধারণ ঘড়িগুলিকেও সময়-নির্ধারক আদর্শ মানের মোটামুটি প্রতিলিপি বলিয়া ধরিতে পারি।

'ইপক' বলিতে একটি বিশেষ মুহূর্ত বুঝান হইলে, দুইটি পৃথক ইপকের মধ্যে যে অবকাশ তাহাই পরিমাপযোগ্য সময়। যখনই কোন একটি বিশেষ ঘটনা বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলা হয় তখনই ধরিতে হইবে যে, তাহার সহিত একটি পরিমাপযোগ্য অবকাশের প্রশ্নও জড়িত আছে। এই অবকাশ হইতেছে প্রাথমিক ইপক ও ঘটনার ইপকের মধ্যে। সময় নিরূপণের কথা বলিলে সেইজন্য এক হিসাবে প্রাথমিক ইপক হইতে অবকাশ পরিমাপ করা বুঝায়। সেইজন্য আমরা সময় নিরূপণ না করিয়া কেবল অবকাশ পরিমাপ করি—একথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। যখনই কোন একটি বিশেষ ঘটনার কাল নিরূপণ করা হয় তখনই অবকাশটির অন্য প্রান্ত, অর্থাৎ প্রাথমিক ইপকও আমাদের জানা থাকে। কিন্তু সময়ের অবকাশের কথা বলিলে তাহা কালপ্রবাহে অনির্দিষ্ট থাকে। যদি বলা হয়, আমি আমার বন্ধুর সহিত আধঘণ্টার জন্য দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তদপেক্ষা আমার বন্ধুর সহিত রাত্রি ৮টা হইতে ৮৷৷০টা পর্যন্ত দেখা করিতে গিয়াছিলাম বলিলে সময় সম্বন্ধে অনেক নির্দিষ্টভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হইবে। যদি ইহার সহিত দিন, মাস ও বৎসরের কথাও বলা থাকে তাহা হইলে ঘটনার কাল সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না।

পরীক্ষার যাথার্থ্য প্রতিপাদন

অনেক পরীক্ষাতেই কোন একটি পার্থিব ঘটনা অথবা অবস্থার পরিবর্তন হার, অর্থাৎ সময়ের সহিত তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই সকল ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্‌গণ কোন ঘড়ির প্রয়োজন অনুভব করেন না—একটি ষ্টপ-ওয়াচের সাহায্যে আরও ভালভাবে কাজ চালান সম্ভব। এখানে প্রয়োজন, যে কোন একটি পূর্ব-নির্ণীত কালাবকাশ; কালপ্রবাহে তাহার অবস্থান অজ্ঞাত থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কালপ্রবাহ সম্বন্ধে পদার্থবিদ্‌গণ একান্ত নিস্পৃহ থাকিতে পারেন। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী জ্যোতির্বিদ্ তাহাকে কালাবকাশের যে পরিমাপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাতেই তাহার সম্পূর্ণ আস্থা বর্তমান এবং অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, পদার্থবিদের অন্যান্য যে সমস্ত পরিমাপ করা প্রয়োজন তদপেক্ষা কালাবকাশের পরিমাপ অনেক বেশী নির্ভুল। সম্ভবতঃ এই কারণে যখনই কোন বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা প্রয়োজন তখনই সময়ের পরিমাপটিকে স্বাধীনভাবে পরিবর্তনশীল বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু এমন কোনও মৌলিক কারণ নাই যাহার জন্য ইহা নিঃসন্দেহে ধরা যায় যে, সময়ের পরিমাপ অন্যান্য বিষয়ের পরিমাপ হইতে অধিকতর নির্ভুলভাবে করা যাইবেই। বাস্তবিকপক্ষে সময়-নির্ধারণ সকল সময়ে নির্ভুল না-ও হইতে পারে। কোন পরীক্ষার যাথার্থ্য প্রতিপাদন বিষয়ে এই যুক্তির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বস্তুতঃ যে পরীক্ষায় সময়ের পরিমাপ প্রয়োজন সেই পরীক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হইয়াছে,

এই কথা বলা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত কালাবকাশের যাথার্থ্য প্রমাণিত না হইতেছে।

কোন পরীক্ষার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায় কিনা তাহা হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষাটি বৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে অন্য যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে সেই একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। কোন কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে উহা দ্বিতীয়বার পরিমাপ করা প্রয়োজন। উষ্ণতার পরিবর্তন এবং দৈর্ঘ্যের উপর ক্রিয়াশীল অন্যান্য কারণগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত থাকিয়া এরূপভাবে পরিমাপ করিতে হইবে, যাহাতে এই সকলের দরুণ কোনরূপ ভ্রান্তি না ঘটিতে পারে। অতঃপর অবকাশ পরিমাপ যথার্থ হইয়াছে কিনা তাহা কিভাবে বিচার করা যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। একবার যে কালাবকাশ অতিবাহিত হইয়াছে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। সেই কারণে আজ আমরা যেটুকু কালাবকাশকে সেকেণ্ড বলিয়া অভিহিত করি এবং একটি ষ্টপ-ওয়াচের সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারি, তাহাই যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নির্ণীত সেকেণ্ডের সমান অথবা তাহার সহিত কোন একটি স্থির সম্বন্ধযুক্ত, এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, কালাবকাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত পরীক্ষা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেমন সত্য ছিল আজও তাহা সমানভাবে সত্য। অবশ্য উত্তরটি সম্পূর্ণ হয় নাই। কাল নিরূপণ এবং কালাবকাশ পরিমাপ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে দেখিতে হইবে যে, পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনা এবং ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনার কাল গণনার সাহায্যে নিরূপণ করা যায় কিনা এবং গণনার সহিত পর্যবেক্ষিত ঘটনা বা ঘটনার বর্ণনার মিল আছে কিনা। এখানে যে সকল ঘটনার কথা ধরা হইতেছে, সেগুলি অবশ্য সবই নৈসর্গিক এবং মনুষ্য-নিয়ন্ত্রণশূন্য। এই সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঘটনাবলী পাওয়া যায় আকাশচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণে। সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রদ্বারা বিভিন্ন তারকার সমাবরণই ইহাদের মধ্যে প্রধান। কালনির্ণয় (এবং কালাবকাশ পরিমাপ) যথার্থ হইয়াছে কিনা, প্রতিপাদন করিতে হইলে একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঘটনাটি সময়ের উপর নির্ভর করিতেছে না ধরিয়া সময়ই যেন ঘটনার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধারণা করিতে হয়। এক হিসাবে সময় যেন স্বাধীনভাবে পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার স্থলে পরাশ্রয়ী হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। দুইটি অথবা ততোধিক সংখ্যক অপরিবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত করে, এরূপ একটি সমীকরণের সাহায্যে কোন একটি ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু যে বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের সাহায্যে এইরূপ হয়, সেগুলির প্রত্যেকটি কোন এক সময়ে স্বাধীন এবং অন্য সময়ে পরনির্ভরশীল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণই নির্ভর করে ঘটনাটি কিভাবে ঘটিতেছে তাহার উপর।

পরীক্ষার যাথার্থ্য প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিতে এমন সমস্ত পরীক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে কালাবকাশ পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যাহাতে সময় পরিমাপের ন্যায় সমান সঠিকভাবেই সময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য একটি পরিবর্তনশীল বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বেগ ও ত্বরণ পরিমাপের কথা ধরা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাদের ফলের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে কোন্ পরিমাপটির সঠিকতার অভাবে ইহা হইয়াছে তাহা বিচার্য হইয়া পড়ে। যদি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি হইতে কালাবকাশটিকে কালস্রোতের কোন নির্দিষ্ট কক্ষভুক্ত করিয়া লওয়া যায়—অর্থাৎ যে দুইটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের মধ্যে পরীক্ষা চালান হইয়াছে তাহাদের

যদি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, তবে সময়ের পরিমাপ যে সঠিক হইয়াছে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল বলিয়া ধরা যায়।

কালক্রম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যবহার হইতে তাহাদের অবস্থান অথবা তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনার কথা পূর্ব হইতেই নির্দেশ করা যায় এবং পরেও—এইরূপ ঘটনা ইতিপূর্বে কবে ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায়। কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা এবং তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত তুলনামূলক বিচার করাকেই আমরা সেই ঘটনার সম্বন্ধে মতবাদের পরীক্ষা বলিয়াই সাধারণতঃ ধরিয়া থাকি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এইরূপ অনেকগুলি ঘটনার বিষয়ই জানা যায়, যাহাদের সম্বন্ধে মতবাদগুলি সম্পূর্ণ সঠিক নহে বলিয়াই বোধ হয়। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায়—এই সকল ক্ষেত্রে গণনা এতই কঠিন যে, তাহা সঠিকভাবে করা ক্ষমতা-বহির্ভূত। এই জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটিই উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্তন সমগতিসম্পন্ন নহে এবং উহার ত্বরণও অসম। সেইজন্য যে কোন দুইটি বিভিন্ন সময়ে পাঁচ বৎসরের দুইটি কালাবকাশ লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একটিতে দিনের গড়মাপ অন্যটির গড়মাপ হইতে সামান্য পৃথক। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থার জন্যই যে এরূপ হয় তাহা অনুমান করা যায়, কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

আগেই বলা হইয়াছে যে, কোন আবর্তনশীল ঘটনা কোন কালাবকাশের মধ্যে কতবার সংঘটিত হইতেছে, তাহা গণনা করিয়াই মূলতঃ সময়ের পরিমাপ করা হয়। কয়েকটি ঘটনা হইতে এই কথা খুব সহজে বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ শুনিয়া অথবা বৈদ্যুতিক সঙ্কেত হইতে সময়ের পরিমাপ পাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু এইরূপ পরিমাপ বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না, কারণ ইহা সকলের নিকট সহজলভ্য নয় এবং কালস্রোতের মধ্যে ইহার স্থায়িত্বের স্বল্পতাও আর একটি কারণ। সময়ের মৌলিক পরিমাপের জন্য প্রয়োজন এমন একটি ঘটনার, যাহা যে কোন সময়ে যে কেহই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে পরিদর্শন করিতে পারে এবং তাহা হইতে সর্বত্রই একটি সুসমঞ্জস ফল পাইতে পারে। সাধারণভাবে সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণকাল হইতেই সময়ের পরিমাপ করা হয়। কিরূপভাবে পৃথিবীর পরিক্রমণ-হার গণনা করিতে হইবে, তাহা ঠিক করা অবশ্য অত্যন্ত দুরূহ। বিষয়টি খুবই জটিল। সেইজন্য পৃথিবীর আবর্তন-হার কিরূপে সুষ্ঠুভাবে গণনা করা যায়, প্রথমে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর আবর্তন-হার

সাধারণভাবে এই আবর্তন-হার গণনা করিতে আমাদের প্রয়োজন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের। ওলন-দড়ির সাহায্যে প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে উল্লম্বভাবে বসাইয়া তাহার ফোকাসে অতি সরু একটি তার উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বিভাবে টানা দিয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে অবস্থিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির মধ্য দিয়া কোন তারকা দেখিতে পাওয়া যায় কিনা—পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কোন তারকা দেখিতে পাওয়া গেলে সেটি ঠিক কোন্ সময়ে তারের প্রতিবিম্বের আড়ালে ঢাকা পড়িতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একই তারকার পরপর দুইবার তারটি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে, তাহাই মোটামুটিভাবে পৃথিবীর আবর্তনের পর্যায়কাল। এই পরীক্ষায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবার জন্য।

এইরূপ স্থূলভাবে পরিমাপকালে পর্যবেক্ষকের অবস্থিতি যদি ৪০° ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পরিমাপে ভ্রমের পরিমাণ ১০^৬-এর মধ্যে ১ ভাগ হয় এবং ইহার অধিকাংশই

হয় পর্যবেক্ষকের দোষে। যদি পরিমাপকালে যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এই ত্রুটির পরিমাণ আরও কমিয়া ১০⁷ ভাগের মধ্যে একভাগে দাঁড়ায়। আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ভুল পরিমাপ পাইতে হইলে নিউটনের বলবিদ্যা অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে অক্ষ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করা হয়। পৃথিবীর বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল কিঞ্চিৎ স্ফীত এবং সেই কারণে সূর্য ও চন্দ্রের মহাকর্ষজনিত বল এই অঞ্চলের উপর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী। এতদ্ব্যতীত সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর বিষুবরেখার একই সমতলে অবস্থিত নহে। উল্লিখিত অক্ষ-বিচলনজনিত ভ্রমের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য যে সকল ভ্রম থাকিয়া যায় তাহাদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ-কালীন আকস্মিক ভ্রমগুলিই প্রধান। একটি তারকা পর্যবেক্ষণ করিবার পরিবর্তে অনেকগুলি তারকা লইয়া পরীক্ষা চালাইলে এই ভ্রমের পরিমাণ দশভাগ কমাইয়া ফেলা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভ্রমের পরিমাণ ১০⁸ ভাগের কয়েক ভাগে আসিয়া ঠেকে। ইহারও পরে যে ভ্রম থাকিয়া যায় তাহা প্রধানতঃ কোনও একটি মাত্র কারণের জন্য নহে; অনেকগুলি কারণ একই সঙ্গে তাহার জন্য দায়ী। যেমন, তারকাগুলির একটির সহিত অপরটির গতিবেগের পার্থক্য, পর্যবেক্ষক ও পৃথিবীর অক্ষের মধ্যে আপেক্ষিক পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণকালীন অন্যান্য আকস্মিক ভ্রম। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে বিশেষরূপে পরিদর্শিত পরীক্ষার দ্বারা ভ্রমের মাত্রা ১০⁸ ভাগের একভাগে কমাইয়া আনা যায়। ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে এই সকল ভ্রম বিচার করিবার কোন সার্থকতা নাই।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, কোন মাপ করিতে হইলেই একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে পরিদৃশ্যমান তারকারাজিই এই কাঠামোর স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি তারকা অন্য যে কোন একটি তারকা হইতে ভিন্ন গতিসম্পন্ন বলিয়াই গতির গড় শূন্য ধরিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, বরং ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমগ্র তারকারাজির একই সঙ্গে সামান্য কিছু আবর্তনিক গতি আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ঠিক এবং এই পরিশিষ্ট আবর্তনিক গতি স্থিতিবিদ্যা (Kinematics) এবং গতিবিদ্যার (Dynamics) সাহায্যে দুইটি বিভিন্ন উপায়ে পরিমাপ করা সম্ভব। বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সেকেণ্ড

প্রায় অর্ধশতাব্দী হইল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আবর্তন হইতে সময়ের যে পরিমাপ পাওয়া যায় তাহা যথেষ্ট সূক্ষ্ম নহে। স্বাভাবিকভাবেই বহু শতাব্দী ধরিয়া যে ভিত্তি মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। এই কারণে বহুভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। বাস্তবিক, পূর্বে পৃথিবীর আবর্তন-হার ব্যতীত সময়ের অপরিবর্তনশীল একক পাইবার অন্য কোন পন্থা নাই বলিয়া ধারণা এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, সাধারণভাবে এই মতের বিপক্ষে যাওয়া কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। তারপর ই. ডাবলিউ. ব্রাউন (১৯২৬), ডাব্লিউ. ডি. সিটার (১৯২৭), এইচ. স্পেনসার জোন্স (১৯৩৯) প্রভৃতির ন্যায় চিন্তাশীল মনীষীর দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহারা দেখাইলেন যে, পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর সঠিক সমন্বয় সাধন করিতে হইলে পুরাতন মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাবধারার সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। ইদানীং কালে ইহাদের যুক্তিজাল এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, বর্তমানে সেকেণ্ডের সংজ্ঞা বিশ্বসংস্থা কর্তৃক পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। পূর্বে সেকেণ্ড বলিতে গড় সৌর দিবসের $\frac{1}{86400}$ ভাগ বুঝাইত; এখন কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কাল (Ephemeris Time) অনুযায়ী

১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী দ্বিপ্রহর যে ট্রপিক্যাল বৎসরের আরম্ভ, তাহার ৩১৫৫৬৯২৫.৯৭৪৭ ভাগের একভাগ ধরা হয় এক-একটি সেকেণ্ডের পরিমাণ।

নূতন সংজ্ঞা অনুযায়ী সেকেণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সেকেণ্ডের গড় মাপের সমান। পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী সময়ের মাপ হইতে গড় সৌরকাল (যদি গ্রীণউইচে মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরেখা ধরিয়া কালনির্ণয় করা হয় তাহা হইলে সার্বিক কাল পাওয়া যায়), এখন নূতন নিয়মের সময়কে বলা হয় Ephemeris time বা ঐক্যবদ্ধ কাল। এই দুইটি কালের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ যে, ঐক্যবদ্ধ কাল অনুযায়ী চালিত ঘড়ি সার্বিককাল নির্দেশকারী ঘড়ি হইতে প্রায় ৩০ সেকেণ্ড আগাইয়া থাকিবে। এই জন্য কোনরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবার কারণ নাই; যেহেতু ঘড়িগুলি পূর্বের ন্যায় সার্বিক কালই নির্দেশ করিতে থাকিবে। প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্র যথাযথভাবে সংশোধিত করিয়া তাহা হইতে ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করা যায়। উক্ত পন্থার বিকল্প হিসাবে ঘড়িগুলি ঐক্যবদ্ধকাল নির্দেশ করিতে পারে, এরূপভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইলেও চলিতে পারিত; কিন্তু ইহাতে নাবিক ও অন্যান্য পরিমাপকদের ন্যায় যাহাদিগকে পরীক্ষাগারের বাহিরেই দ্রাঘিমা নির্ণয় করিতে হয়, তাহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কারণ, তাহাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করিবার সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও আয়োজন রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্য অসুবিধা যদি সম্পূর্ণ দূর করিতে না পারা যায় তবে যাহাদের পক্ষে সেইগুলি কাটাইয়া উঠা সম্ভব তাহাদের পক্ষেই এইগুলি থাকা ভাল, অর্থাৎ বিশেষ ধরণের মানমন্দিরে কালনির্ণয় করিয়া প্রচারিত হইলেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়।

সেকেণ্ডের নূতন ও পুরাতন সংজ্ঞার মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে কালনির্ণয় করিতে হইলে বর্তমান ট্রপিক্যাল বৎসরের সহিত ১৯০০.০ ট্রপিক্যাল বৎসরের সকল সময়ের সম্বন্ধ জানা থাকা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত ট্রপিক্যাল বৎসর বলিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের কাঠামোর মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের গড় সময় বুঝাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা কোন একটি বিশেষ পরিক্রমণের সময় চিহ্নিত করা হয় না। বস্তুতঃ, কোন একটি বিশেষ পরিক্রমায় অন্য একটি হইতে ২০ মিনিট, অথবা ৩×১০⁴ ভাগের একভাগ সময় বেশী লাগিতে পারে। কিন্তু গড় সৌর দিবস বলিতে আমরা পৃথিবীর যে কোন আবর্তনকালকেই ধরিয়া থাকি।

সূর্য পরিক্রমা

ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয়ের প্রণালী আলোচনা করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে, কিভাবে কোন মতবাদের সাহায্য না লইয়াই কোন একটি বিশেষ সূর্য পরিক্রমা লক্ষ্য করা যায়। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমণের ফলে তারকারাজির পটভূমিকায় সূর্যের গতি লক্ষিত হয়—তারকাসমূহের অবস্থান স্থির ধরিয়া দেখা যায় যে, সূর্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে খ-গোলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকে। যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সূর্যের সহিত তাহার পশ্চাৎপটে অবস্থিত নিকটস্থ তারকার কৌণিক সম্বন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। সাধারণভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী পন্থাতেই এই কোণ নির্ণয় করা সম্ভব, কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া সূর্যের এই আপাতদৃষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিলে খ-গোলের উপর একটি বৃত্ত পাওয়া যাইবে। এই বৃত্তটি নিজেই ইহার কোন একটি ব্যাসকে অক্ষ করিয়া এক শতাব্দীতে ৪৭ সেকেণ্ড (কৌণিক পরিমাপ) হারে আবর্তিত হইতেছে। এই বৃত্তের উপর হইতে সূর্যের অবস্থানগত বিচ্যুতির সর্বাধিক পরিমাণ এক সেকেণ্ডেরও (কৌণিক) কম। এই (সূর্যপথ) বৃত্তের ঘূর্ণন এবং এই পথ হইতে সূর্যের বিচ্যুতি—উভয়ের কারণই এক। নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে

পৃথিবীর উপর শুক্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের মহাকর্ষের দরুণই এইরূপ হইয়া থাকে। সূর্যপথ-বৃত্তের অক্ষটির সন্নিহিত কোন নক্ষত্র বাছিয়া লইয়া খুব সহজেই পরপর দুইবার এই নক্ষত্রটি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহা পরিমাপ করা যায়। এইভাবে একটি সূর্য-পরিক্রমার সময় নির্ণীত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন গণনার ন্যায় ইহাতেও একই পরিমাপের কাঠামোর সাহায্য প্রয়োজন এবং সেই কারণে ইহাও যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

Ephemeris Time বা ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করিতে হইলে গ্রহসমূহের গতির সমীকৃত ফল জানা চাই। এইরূপ সূত্রগুলি হইতে নক্ষত্ররাজির মধ্যে সূর্যের কৌণিক অবস্থান ও ঐক্যবদ্ধ কালের পারস্পরিক সম্বন্ধ বাহির করা যায় এবং তাহা হইতে যে কোন সময়ে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া কাল-স্রোতে সেই বিশেষ মুহূর্তটি নির্দিষ্ট করিয়া রাখা যায়।

গ্রহপুঞ্জের গতিনিয়ামক সূত্র আপেক্ষিকতা-বাদের সাধারণ সূত্র হইতে উদ্ভূত হইলেও সাধারণতঃ যে ভাবে ইহার ব্যবহার হয় তাহাতে নিউটনীয় মতানুযায়ী সূত্রগুলি বাহির করিয়া আপেক্ষিকতার ফল আরোপ করাই সহজসাধ্য। সূত্রগুলি স্থানাঙ্কের উপর নির্ভরশীল বলিয়া দেখা যায়।

ধীরগতিতে ঘূর্ণায়মান সূর্যপথ-বৃত্ত যে দিকে চলিয়াছে, সেইদিকে সূর্যের কৌণিক দূরত্বজ্ঞাপক দ্রাঘিমার জন্য নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাওয়া যায়:—

$$L = C + Nt + St^2 + E \text{ সাইন } [C - P + (N - R)t] + \text{পর্যাবৃত্ত রাশিসমূহ}$$

L দ্বারা দ্রাঘিমার পরিমাপ বুঝান হইতেছে এবং C, N, E ও P এই চারিটি ধ্রুবকের সাহায্যে সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। ১৯০০ শতাব্দীর প্রথমে যে সময় হইতে ঐক্যবদ্ধ কালের পজিটিভ ও নেগেটিভ মাপের সূচনা ধরা হয় তাহাকে বলা হয় মূল 'ইপক'। এই মুহূর্তটির দ্রাঘিমার পরিমাপ হইতে সমস্ত পর্যাবৃত্ত রাশির ফল বাদ দিলে C ধ্রুবকের চাপ পাওয়া যায়। N দ্বারা যে ধ্রুবক-কোণ বুঝা যায় তাহাকে গড়-গতি (Mean motion) বলা হয়। স্বভাবতঃই যে মাত্রায় সময়ের (t) পরিমাপ করা হয় তাহার উপর N-এর সংখ্যা-গত মান নির্ভর করে। যে মাত্রায় t-এর পরিমাপ করা হয় তাহা এরূপভাবে নির্বাচন করা যায় যাহাতে N-এর মান এক দাঁড়ায়; কিন্তু এইরূপ করা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। t-এর মাপ পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রাখাই বাস্তব প্রয়োজনে শ্রেয়; কারণ, তাহা হইলে ঐক্যবদ্ধ কাল ও গড় সৌরকালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ঘূর্ণন সমগতিসম্পন্ন এবং t-এর মান ঠিক ৩৬৫.২৫-টি আবর্তন বলিয়া ধরা হইত। তখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ ফল একত্রে পরীক্ষা করিয়া N-এর পরিমাপ পাওয়া যাইত। N-এর সংখ্যাগত মান এখনও সেই একই ধরা হয় এবং তাহা হইতে t-এর মাপের একক হিসাবে পাওয়া যায় ঐ দুইটি শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় আবর্তনের ৩৬৫.২৫-টি। N-এর মাপ প্রায় ২π রেডিয়ান সংখ্যক। E এবং P, এই দুইটি ধ্রুবক সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই। S-ধ্রুবকটির মাপ গণনার সাহায্যে বাহির হয় $১০^{-১১}$। এই ধ্রুবকটির মান যদিও ত্বরণের মাপ, তবু ইহাকে ত্বরণ মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ, ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে মাত্র সমীকরণটির সমাধানের বিশেষ ধারার উপর। সমাধানের এমন ধারা আছে যাহার সাহায্যে S-এর মাপ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ গণনা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। পর্যাবৃত্ত রাশিগুলির সংখ্যা কয়েক শত এবং তাহাদের সব-গুলিই R সাইন (nt+K)—এই গঠনের। ইহাতে ব্যবহৃত R, n এবং K ধ্রুবকগুলির মান সমীকরণ সমাধানকালে বাহির করা যায়। R-ধ্রুবকটির মান সাধারণতঃ $১০^{-৪}$ পর্যন্ত হইয়া থাকে এবং এই

রাশিগুলির পর্যায় একমাস হইতে ১৮০০ শত বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে। সর্বশেষে R-ধ্রুবকটির মান নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে দাঁড়ায় ৩×১০⁻⁸ ; কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব হিসাবে ইহার মান প্রতি ১৫০০ শত ভাগে একভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। R-ধ্রুবকের এই সামান্য বৃদ্ধিই এই সমীকরণটির নিউটনীয় তত্ত্বানুসারে সমাধান ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসরণের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য। সূত্রটির সমাধান হইয়া গেলে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত t এবং L-এর মান লইয়া একটি তালিকা গঠন করা যায় এবং তাহা হইতে যে কোন পর্যবেক্ষিত L-এর জন্য t-এর মান নিরূপিত হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই তালিকা হইতে সেকেণ্ডের নূতন সূত্র অনুযায়ী যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের একটি সেকেণ্ডের মান নিরূপিত হইতে পারে।

নিউটনীয় বলবিদ্যা অপেক্ষা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মত কোন যুক্তিই এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় স্থানলাভ করে নাই। যদি সূর্যের অবস্থান ও গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াই ঐক্যবদ্ধ কালের সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয়, তাহা হইলে একটি মতের বদলে অন্যটি প্রয়োগ করিবার কোনই হেতু নাই। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে পূর্বনির্দেশিত সমীকরণটির অনুরূপ সূত্রের সাহায্যে অন্যান্য গ্রহ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির প্রধান উপগ্রহগুলির অবস্থান ও গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াও ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এইরূপ করিবার সময় বুধ ও মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণজনিত ফলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ আরোপিত R-ধ্রুবকের পরিবর্তিত মান গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুক্র ও সূর্যের অবস্থানজনিত ফলের তুলনা হইতেও পূর্বোক্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগুলির বেলায় এইরূপ কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

পরিমাপ কাঠামো

পৃথিবীর পরিক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, L-এর মান নির্ণয়ের মূল (Origin) স্থিতিবিদ্যার সাহায্যে নির্দেশ করা যায়। গতিবিদ্যার সাহায্যেও ইহা করা সম্ভব। বিভিন্ন গ্রহের সাহায্যে নির্ণীত ঐক্যবদ্ধ কালের তুলনা করিয়াও ইহা পাওয়া যায় (ক্লেমেন্স, ১৯৫১)। ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের ধরিতে হইবে যে, আমরা যে কাঠামোর সাহায্যে L-এর মান নির্ণয় করিতে চাই তাহা কোন একটি অক্ষের উপর ধীরে আবর্তিত হইতেছে। খ-গোলের যে বৃত্তের উপর L-এর পরিমাপ করা হয়, সেই বৃত্তপথেও এই আবর্তনের প্রতিফলন হয়, কিন্তু তজ্জনিত ফল পূর্বোক্ত সমীকরণের অংশীভূত N এবং N−R-এর মধ্যে নিহিত থাকে। N—R-এর যৎসামান্য পরিবর্তনের জন্য L-এর মানে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন দেখা যায়। ইহার পর্যায় N−R-এর সমান, ইহার অবস্থা (Phase) E গুণাঙ্ক সমন্বিত অংশের ¼ পর্যায় পৃথক এবং ইহার বিস্তার t-এর আনুপাতিক। যেহেতু L-এর মান হইতে ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণীত হয়, সেহেতু L-এর এই পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঐক্যবদ্ধ কালের মাপকেও প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু কেবল সূর্যের অবস্থান ও গতি পর্যালোচনা করিয়া যে ঐক্য বদ্ধকাল নির্ণীত হয়, তাহাতে এই ত্রুটি থাকে না। এখন ধরা যাক যে, অন্য কোন একটি গ্রহের অবস্থান হইতে কৌণিক দূরত্বজ্ঞাপক দ্রাঘিমার (L) সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ কাল পরিমাপ করা হইয়াছে। এই গ্রহটি ও সূর্যের কৌণিক অবস্থান প্রায় একই সমতলগত ধরা যাক। সূর্য এবং গ্রহটির দরুণ C, P এবং N-এর মান ভিন্ন হওয়াতে ঐক্যবদ্ধ কালের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের হার ও অবস্থা ভিন্ন হইবে এবং সূর্য ও গ্রহটির পর্যবেক্ষণের ফলজনিত ঐক্যবদ্ধ কালের তুলনা করিলে তাহাদের মধ্যে একটি পর্যাবৃত্ত পার্থক্য লক্ষিত হয়। N-এর মান সামান্য পরিবর্তন করিয়া

এই পার্থক্য বিলোপ করা যায়—পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামোর সামান্য পরিবর্তনের দ্বারাই ইহা করা সম্ভব। অল্পকথায় বলিতে হয় যে, পূর্বের সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, গতিশীল পরিমাপের কাঠামোর প্রয়োগ এরূপভাবে করিতে হইবে, যাহাতে শূন্যে ভ্রাম্যমান যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া একই ঐক্যবদ্ধ কাল নিরূপিত হয়।

গতিসূত্র (Equation of motion) হইতে আমরা সময়ের সহিত স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের দ্বিতীয়বার অন্তরকলনের (Second derivative) ফল জানিতে পারি। সেইজন্য যে সকল পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের কথা কিছু পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, সেইগুলি পর্যাবৃত্ত ত্বরণের দ্বিতীয় বার সমাকলনের (integration) পরিণাম। কার্যবিধির দিক দিয়া দেখিলে আমরা গতিশীল কাঠামোর একটি সহজ ধারণা করিতে পারি। ইহা এমনই একটি কাঠামো, যাহার মধ্যে গ্রহগুলির চলাফেরা সাধারণভাবে গতিসূত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্য কোন পর্যাবৃত্ত ত্বরণের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না।

বিভিন্ন গ্রহের জন্য N-এর মান পরিবর্তন করা ও নিউটনীয় মতানুসারে প্রাপ্ত R-এর মান সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের দরুণ যে ভাবে পরিবর্তিত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব সহজে ধরা যায় না বলিয়া নিউটনীয় পরিমাপের কাঠামো ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গঠিত পরিমাপের কাঠামোর বিভিন্নতা সহজে পরিস্ফুট হয় না। এই পার্থক্য আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। বিভিন্ন গ্রহের জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে R-এর মান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়; কিন্তু N-এর জন্য সকল গ্রহের সম্পর্কে একই হারে পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তনের পরিমাণ পাওয়া যায় তত্ত্বগত ফল ও পর্যবেক্ষিত ফলের তুলনামূলক বিচার হইতে। সেইজন্য নিউটনীয় গতিসূত্র অনুসারে গতিশীল কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হইলে প্রত্যেক গ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর প্রয়োজন।

কালনির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় এতক্ষণ দৈর্ঘ্য-নির্ণায়ক কোন পরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা কাল-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবান্তর। গণনার সুবিধার জন্যই স্থানাঙ্ক-বিচার প্রয়োজন হইয়াছিল মাত্র। ঐক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করিতে কেবল সূর্য ও চন্দ্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট—সূর্য ও চন্দ্র হইতে আলোকরশ্মি আমাদের কাছে পৌছিবার মধ্যে তাহাদের স্থান-পরিবর্তনজনিত কোন সমস্যার সমাধান করিতে হয় না; কারণ ইহার ফল সমাকলন কালীন ধ্রুবক-গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অবশিষ্ট ত্রুটি যাহা থাকিয়া যায় তাহার জন্য পর্যবেক্ষিত ফল ও তত্ত্বগত ফলের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়; কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত অল্প বলিয়া স্থিরভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। সাধারণভাবে, জ্যোতিষ সম্পর্কিত সমস্ত দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনে আলোকরশ্মির সীমিত বেগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যেই ইহার জন্য পরিবর্তনের ফল আরোপ করা সুবিধাজনক হয়।

সময় নির্ধারক যন্ত্র, অর্থাৎ ঘড়ি

সাধারণভাবে সময়নির্ধারক যন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি যন্ত্র, যাহা দ্বারা গড় সৌরকালের একটি মোটামুটি পরিমাপ সম্ভব হয়; অর্থাৎ এই যন্ত্রটি পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমার সহিত সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের জন্য এই যন্ত্র উপযুক্ত নহে। পৃথিবীর পরিক্রমণ-বেগ অনির্দিষ্ট-ভাবে পরিবর্তনশীল বলিয়া এইরূপ সূত্র অনুযায়ী নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে সঠিক কাল নিরূপণ করা যাইবে না। সেইজন্য ঘড়ির বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক উক্তি হিসাবে বলা যায় যে, ঘড়ি এমনই একটি যন্ত্র,

যাহা নিরন্তর ঐক্যবদ্ধ কালের সহিত মিলাইয়া লওয়া হয় বলিয়া ইহার সাহায্যে যে কোনও সময়ে সঠিক কাল পরিমাপ করা যায়। এই সূত্রের মধ্যে এমন এক পর্যবেক্ষকের অস্তিত্ব নিহিত আছে, যাহার কাজই হইতেছে পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সকল সময় ঐক্যবদ্ধ কাল নিরূপণ করিয়া তাহার সহিত ঘড়িটি মিলাইয়া দেওয়া। ঘড়িটি কোন নির্দিষ্ট স্থানে রাখিবার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর উপর অথবা তাহার বাহিরে যে কোন স্থানেই ঘড়িটি রাখা যাক না কেন, সেখানেই ঘড়িটি সময় নির্দেশ করিবে; কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ কালের সহিত ঘড়িটির সময় মিলাইয়া সেই অনুসারে আলোক-সঙ্কেত অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট উপায়ে পৃথিবী হইতে তাহা প্রেরণ করা। হয়তো ঐক্যবদ্ধ কালের সংজ্ঞা এরূপভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব, যাহাতে পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের পক্ষেও ইহা নিরূপণ করিবার কোন অন্তরায় থাকে না। কিন্তু সেই ঐক্যবদ্ধ কাল নিরূপণ প্রথা সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া বহুল পরিমাণে কল্পনামূলক হইয়া পড়ে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ভাবটি অন্তর্হিত হয়।

সঠিক অবকাশ নিরূপণ

পর পর সংঘটিত দুইটি ঘটনার মধ্যস্থিত অবকাশটি নির্দিষ্টভাবে সঠিক ভাগ করাই হইল ঘড়ির কাজ। ঘড়ির সাহায্যে যথার্থভাবে কাল নিরূপণ করা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। যে জ্যোতিষিক ঘটনার মধ্যস্থিত অবকাশ পরিমাপ করা হয়, সেই ঘটনাগুলি নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারাই হইতেছে প্রধান উপায়। এতদ্ব্যতীত আকস্মিক কারণসঞ্জাত ত্রুটি যাহাতে কোনরূপে পর্যবেক্ষণ-ফলে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাও লক্ষ্য করা দরকার। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই নির্ভুলভাবে কালনির্দেশের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। সচরাচর সাধারণ কাজে যে নির্ভুলতার প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্মভাবে সময় নিরূপণের প্রয়োজন অনেক সময়েই দেখা দেয় এবং তাহার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া সময় নির্দেশের ব্যাপারে দেখা যায় যে, বিশেষ ত্রুটিহীন ভাবে কোন কালাবকাশ পরিমাপ করিতে হইলে তাহার পর কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হওয়া দরকার। কারণ, অনাগত কাল সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্টভাবে কোন মাত্রা স্থির করা অপেক্ষা বিগত কালকে সঠিকভাবে ভাগ করা অনেক অধিক পরিমাণে যথার্থ ও নির্ভুল। সেইজন্য যে সমস্ত মানমন্দির হইতে কাল-সঙ্কেত প্রচার করা হয়, তাহাদের সময়-নির্দেশক বিজ্ঞপ্তিগুলি সময়-সঙ্কেতের বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে বেতার-সঙ্কেতের কাল পুনর্বিচার করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করা হয়। Bureau International de L'Heure হইতে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল হিসাব বাহির হয় প্রায় এক বৎসর পরে। পূর্বে আলোচিত কারণসমূহের জন্য সময় অথবা সময়ের পরিমাপ সম্বন্ধে কোন নির্ভুল অথচ সহজ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ সেইরূপভাবে কাল সম্বন্ধে কোন ত্রুটিমুক্ত ধারণা হয় না। অবশ্য সাধারণভাবে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়—এমন আলোচনা এখানে অবান্তর হইবে না।

কালনির্ধারণের অন্তর্বর্তীকালীন বিরাম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়। অবকাশের আয়তনের উপর নির্ভর করে সূক্ষ্মতার মাত্রা। অতিশয় ক্ষুদ্র ($১০^{-৯}$ সেকেণ্ড) হইতে সাধারণ মাপের ($১০^{৩}$ সেকেণ্ড) বিরতি এরূপভাবে অনায়াসে নির্ণয় করা যায়, যাহাতে তাহাদের মানে ত্রুটির পরিমাণ $১০^{৮}$ ভাগের এক ভাগ দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বিরামের ($১০^{৭}$ সেকেণ্ড) মাপে ত্রুটির পরিমাণ $১০^{৯}$ ভাগে এক ভাগ এবং ইহা অপেক্ষা বড় অবকাশের ($১০^{৮}$ সেকেণ্ড ও তদপেক্ষা

বড়) পরিমাপ এতদূর সূক্ষ্মভাবে করা সম্ভব যে, ক্রটির পরিমাণ ১০^{১০} ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া থাকে। বহু প্রাচীনকালের একটি সূর্যগ্রহণ হইতে আজ পর্যন্ত যে সময়ের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নির্ণীত কালাবকাশ। এই অবকাশটির বিস্তার ১০^{১১} সেকেণ্ড এবং ইহার পরিমাপে ক্রটির পরিমাপ সম্ভবতঃ ১০^৮ ভাগে এক ভাগ।

কাল-পরিমাপক যন্ত্রাদির আলোচনাকালে পারমাণবিক ঘড়ি সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পরমাণুর মৌলিক ধর্ম অত্যন্ত স্থিরতাসম্পন্ন এবং চৌম্বকশক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রভাবে ইহা অপরিবর্তনীয়। সেইজন্য পরমাণুর মধ্যগত পর্যাবৃত্ত ইলেক্‌ট্রনের আচরণের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সময়ের পরিমাপ করা যায় এবং এইরূপ পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে এমনই নির্ভুল পরিমাপ হয় যে, তিনশত বৎসরের মাপে ক্রটির পরিমাণ মাত্র এক সেকেণ্ড। এইরূপ একটি ঘড়ি তিনশত বৎসরে মাত্র এক সেকেণ্ড 'স্লো' বা 'ফাষ্ট' হইতে পারে। পারমাণবিক ঘড়ি উদ্ভাবনের পর বেতারযন্ত্রাদির পরীক্ষা ও পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমার গতিবেগে পরিবর্তন লক্ষ্য করা খুবই সহজসাধ্য হইয়াছে। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা চলিয়াছে, প্রচলিত পারমাণবিক ঘড়ি অপেক্ষা দশগুণ বেশী নির্ভুল পারমাণবিক ঘড়ি প্রস্তুত করিবার দিকে—যাহাতে এমনভাবে কাল পরিমাপ করা সম্ভব হয় যে, তিন হাজার বৎসরের মাপে ক্রটির মাত্রা থাকে মাত্র এক সেকেণ্ড।
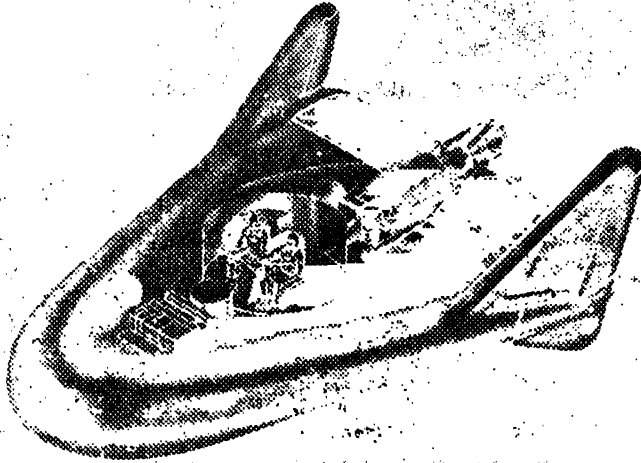
ইউ. এস-এর ভবিষ্যৎ আকাশ-যানের নমুনা। পাইলট তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এই মহাকাশ-যানের পরিচালক রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

রক্ততঞ্চন

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে আপনা থেকে রক্তপাত বন্ধ না হলে মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব হতো না। প্রকৃতি নিজে থেকেই এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কর্তিত অংশের মুখে রক্ত জমাট বাঁধে, ফলে আর রক্ত ঝরে না। রক্তের এরূপ জমাট-বাঁধাকে বলা হয় রক্ততঞ্চন বা ব্লাড-কোয়াগুলেশন। রক্ততঞ্চনের নানাবিধ জটিল তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিবার আগে রক্ত কি, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

রক্তকে কেবলমাত্র লাল রঙের তরল পদার্থ মনে করা ভুল হবে। গৈরিক মাটির উপর দিয়ে যখন জলস্রোত বয়ে যায় তখন তার রং হয় গৈরিক। জল রঙীন নয়, মাটির দরুণ রঙীন দেখায়। রক্তও ঠিক তেমনি নিজে রঙীন নয়। রক্তের এক প্রধান উপাদান হলো লোহিত কণিকার লাল রঞ্জক পদার্থ, যাকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন বয়ে নিয়ে যায় অক্সিজেন—মুহূর্তে ছড়িয়ে দেয় প্রতি কোষে কোষে, যা ছাড়া মৃত্যু অনিবার্য। লোহিত কণিকা ছাড়া আরও অনেক পদার্থ আছে রক্তের মধ্যে; যেমন—শ্বেতকণিকা, প্লেটলেট্‌স্‌, প্লাজমা, সিরাম বা রক্তমস্তু। তাছাড়া অ্যামিনো অ্যাসিড, ইউরিয়া রূপে প্রোটিন, গ্লুকোজ রূপে কার্বোহাইড্রেট, চর্বিজাতীয় পদার্থ, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

এদের মধ্যে প্লেটলেট্‌স্‌ ও ক্যালসিয়াম রক্ত-তঞ্চন প্রক্রিয়ার অন্যতম সহায়ক। রক্তক্ষরণের কিছু পরেই অর্ধ-কঠিন জেলীজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। জেলীজাতীয় পদার্থটিকে আরও কিছুক্ষণ কাচের পাত্রে রেখে দিলে দেখা যাবে যে, জমাট-বাঁধা পদার্থটি আয়তনে আরও কমে গেছে এবং ভিতর থেকে ঈষৎ হলদে রঙের জলীয় পদার্থ বেরিয়ে এসেছে। এই জলীয় পদার্থটি হচ্ছে সিরাম। রক্তের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এই সব উপাদানের মধ্যে প্লাজমা একটি। প্লাজমার মধ্যে জলের ভাগ থাকে শতকরা ৯১—৯২%; বাকী ৮—৯ ভাগ কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী। জৈব পদার্থের মধ্যে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, নানাবিধ এনজাইম, বহুবিধ রঞ্জক পদার্থ; আর অজৈব পদার্থের মধ্যে আছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি। জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের কথা বলা হয়েছে। প্লাজমা প্রোটিনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সিরাম অ্যালবুমিন, (২) সিরাম গ্লোবিউলিন, (৩) ফাইব্রিনোজেন, (৪) প্রোথ্রম্বিন।

রক্তের উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি এই ধারণা নিয়ে আবার রক্ততঞ্চনের অধ্যায়ে প্রবেশ করা যাক। প্রথমেই প্রশ্ন আসে, রক্ত জমাট বাঁধে কেন? নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। আলট্রা-মাইক্রস্কোপ নামে এক বিশেষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের জমাট-বাঁধবার পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, ক্ষতের মুখে প্রথমে ফাইব্রিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু এসে উপস্থিত হয়। এই রেণুগুলি পরস্পর সংযোজিত হয়ে সূচ্যাকৃতি কণার সৃষ্টি করে। সূচ্যাকৃতির কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সূতা তৈরী করে। এই সূতাগুলি রক্তের উপর ভেসে থাকে। ক্রমে ক্রমে বহু সূতা আড়াআড়িভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে

জালের সৃষ্টি করে। জালের খোপের মধ্যে লোহিত ও শ্বেত-কণিকা আট্‌কা পড়ে যায়। কাজেই জেলী-সদৃশ পদার্থের আয়তন সঙ্কুচিত হবার ফলে সিরাম বেরিয়ে আসে। আর এজন্তেই সিরামের রং লাল নয়।

রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াতে শ্বেত বা লোহিত কণিকার কোন অংশ নেই। প্রধান অংশ নেয় প্লেটলেট্‌স্‌। রক্ততঞ্চনে প্লেটলেট্‌স্‌-এর গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্বে প্রচলিত ছিল যে, রক্ত-রক্ষণের পর প্লেটলেট্‌স্‌ জমাট বাঁধে। এই জমাট-বাঁধা প্লেটলেট্‌স্‌ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় শ্রেণীর বিক্ষত রক্ত ধমনীর মুখে গিয়ে জমায়েত হয়ে ছিপির কাজ করে। এই শ্রেণীর রক্ততঞ্চন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর শরীরেও হয়ে থাকে। উচ্চতর প্রাণীদের দেহে 'ফাইব্রিন-ক্লট' হয়। মানুষের দেহে দুটি পদ্ধতি কার্যকরী হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক পর্যায়ে রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী উপাদানগুলি হলো এই—(১) প্রোথ্রম্বিন, (২) ফাইব্রিনোজেন, (৩) ক্যালসিয়াম আয়ন, (৪) থ্রম্বোপ্লাষ্টিন বা থ্রম্বোকাইনেজ।

এদের মধ্যে প্রথম তিনটি রক্তে বর্তমান থাকে। প্রথম দুটি সিরাম প্রোটিনের বিশেষ অংশ মাত্র।

চতুর্থ উপাদানটি রক্তে নেই বললেই চলে। ক্ষরিত রক্তের মধ্যেকার ভাঙা প্লেটলেট্‌স্‌ ও ক্ষতি-গ্রস্ত তন্তু থেকে থ্রম্বোপ্লাষ্টিন নিঃসৃত হয়।

এই সঙ্গে আরও দুটি উপাদানের কথা মনে রাখতে হবে যারা স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত-ধমনীর মধ্যে থেকে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না, তরল অবস্থায় রাখে। এই দুটি উপাদান হচ্ছে হেপারিন ও অ্যান্টিথ্রম্বিন।

এবারে রক্ততঞ্চক পদার্থগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই প্রোথ্রম্বিনের কথা আসে। প্রোথ্রম্বিন জিনিষটা কি? এটি এক জাতীয় প্রোটিন। সোডিয়াম অক্সেলেট মিশ্রিত প্লাজমাতে দু-রকমের প্রোথ্রম্বিন পাওয়া যায়। একটি প্রোথ্রম্বিন-এ, অপরটি প্রোথ্রম্বিন-বি। প্রোথ্রম্বিন-এ অক্সিজেন গ্যাসের সংস্পর্শে এলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রোথ্রম্বিন-বি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড লবণের সাহায্যে পৃথক করে নেওয়া যায়। স্বাভাবিক প্লাজমাতে এই উভয় শ্রেণীর প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম ধাতুর কোন লবণরূপে বর্তমান থাকে। অক্সেলেট মেশাবার পর ক্যালসিয়াম আলাদা হয়ে যায় এবং দুটি শ্রেণী পৃথক হয়ে পড়ে। প্রোথ্রম্বিনকে অন্যভাবে পৃথক করতে হলে প্লাজমার pH-এর মান ৫.৩-এ নিয়ে গেলে প্রোথ্রম্বিন থিতিয়ে পড়ে। প্রতি ১০০ সি. সি. প্লাজমাতে ৪০ মিলিগ্র্যাম প্রোথ্রম্বিন আছে। প্রোথ্রম্বিন তৈরীর কারখানা হচ্ছে যকৃৎ। কিন্তু ভাইটামিন-কে না হলে প্রোথ্রম্বিন তৈরী হয় না; কারণ, প্রোথ্রম্বিন-বি প্রস্তুতকার্যে ভাইটানিম-কে-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রক্ততঞ্চনের সময়ে প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিনে রূপান্তরিত হয়।

থ্রম্বিনকে অনেকে থ্রম্বেজ বলে থাকেন। কারণ, থ্রম্বিনের কাজ অনেকটা এন্‌জাইমের মত। থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে। জলীয় দ্রবণে ৬০° সেঃ উত্তাপে থ্রম্বিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ৫০° সেঃ পর্যন্ত থ্রম্বিনের ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রোথ্রম্বিনকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আলাদাভাবে রাখলে থ্রম্বিনে পরিণত হয়।

ফাইব্রিনোজেন রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়ার আর একটি প্রধান উপাদান। এটি সিরাম-গ্লোবিউলিন শ্রেণীর প্রোটিন। এর আণবিক ওজন ৪০০,০০০। আলট্রা-মাইক্রস্কোপে একে লম্বা সূতার মত দেখায়। টাট্‌কা রক্ত কাচের দণ্ড দিয়ে নাড়লে ফাই-ব্রিনোজেন দণ্ডটির সঙ্গে চলে আসে। ৫৬° সেঃ উত্তাপে ফাইব্রিনোজেন তঞ্চিত হয়ে যায়। প্রোথ্রম্বিনের মত ফাইব্রিনোজেনও যকৃৎ থেকে উৎপন্ন হয়।

রক্ততঞ্চনের কার্যে ক্যালসিয়াম আয়ন গুরুত্বপূর্ণ

অংশ গ্রহণ করে। প্রতি ১০০ সি. সি. রক্তে অন্ততঃ ৫ মিলিগ্র্যাম ক্যালসিয়াম থাকা একান্ত প্রয়োজন। সোডিয়াম অক্সেলেট বা সাইট্রেট লবণ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ক্যালসিয়ামের কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। কিন্তু যদি পুনরায় অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়ামের লবণ মেশানো যায় তাহলে ক্যালসিয়াম আয়নিত অবস্থায় থাকতে পারে এবং কর্মক্ষমতা ফিরে পেয়ে রক্তভঞ্চনে সাহায্য করতে পারে। ক্যালসিয়াম আয়ন রক্তভঞ্চনের অন্যতম সহায়ক থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের ক্রিয়ায় সহায়তা করে। থ্রম্বোপ্লাষ্টিন প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। এই কাজে তাকে সাহায্য করে ক্যালসিয়াম আয়ন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা দরকার যে, জমাট-বাঁধা পদার্থটি, অর্থাৎ ফাইব্রিন ক্যালসিয়াম বিমুক্ত পদার্থ।

রক্তপ্রবাহের মধ্যে থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের অবস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ রক্তের মধ্যে এটি থাকে না। কেবলমাত্র রক্তক্ষরণের সময় চূর্ণীভূত প্লেটলেট্স্ থেকে এটি নিঃসৃত হয়। তাছাড়া দেহের প্রায় সব রকম তন্তুর মধ্যে এটি সুপ্তভাবে অবস্থান করে। কোন আঘাতে তন্তু ক্ষতবিক্ষত হলে এই রস নিঃসৃত হয়। থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের কাজ এন্জাইমের মত। ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে এটি প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। বিজ্ঞানী হাওয়েল দুই শ্রেণীর থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের কথা বলেছেন। একশ্রেণী জলে দ্রাব্য এবং তার মধ্যে প্রোটিনের অংশ বিদ্যমান এবং অন্যটি ফস্ফেটিড শ্রেণীভুক্ত। শেষোক্ত শ্রেণীটি ইথার ও অ্যালকোহলে দ্রাব্য। এই দুটি একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্লেটলেট্স্ ও তন্তুর মধ্যে অবস্থান করে।

এতক্ষণ রক্তভঞ্চনকারী উপাদান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। দেহের অভ্যন্তরে রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে তার জন্যে দেহের মধ্যে কতকগুলি উপাদানের সৃষ্টি হয়। এরা রক্তভঞ্চনে বাধা দেয়। দেহের মধ্যে যদি রক্ত জমাট-বেঁধে থাকতো তাহলে মানুষ মুহূর্তকাল বাঁচতে পারতো না। কাজেই প্রকৃতিদত্ত দুটি অমোঘ উপাদান হেপারিন ও অ্যান্টিথ্রম্বিন যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তা সহজেই বুঝা যায়।

বিজ্ঞানী হাওয়েল সর্বপ্রথম যকৃৎ (ইংরেজীতে যাকে বলে Hepar) থেকে হেপারিন তৈরী করেছিলেন বলেই ঐ বস্তুটির ঐরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। পরে দেখা গেছে, শুধু যকৃৎ কেন, দেহের বহু জায়গা থেকে হেপারিন তৈরী করা যায়। তন্তুর মধ্যে হেপারিনের অবস্থিতির কথা জানা গেছে। তাছাড়া শ্বেত কণিকার এক বিশেষ উপাদান বেসোফিল কোষ থেকেও হেপারিন নিঃসৃত হয়। তবে রক্তে এদের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ মাত্র।

বেসোফিল কোষের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু আছে। এই রেণু থেকে হেপারিন নির্গত হয়। এক ইউনিট হেপারিন ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা এক সি. সি. বিড়ালের রক্তকে ২৪ ঘণ্টাকাল তঞ্চিত হতে বাধা দেয়। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, হেপারিন বস্তুটি কি? রাসায়নিক সংজ্ঞা অনুসারে এটি মিউকোইটিন-পলিসালফিউরিক এষ্টার। হেপারিন ত্রিবিধ উপায়ে কাজ করে; যেমন—(১) প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত হতে বাধা দেয়, (২) থ্রম্বিন ও ফাইব্রিনোজেনের মিলিত প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে এবং (৩) প্লেট্লেট্স্কে বিক্ষত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেয় না।

কাচের পাত্রে বিশুদ্ধ প্রোথ্রম্বিন, থ্রম্বিন ইত্যাদি রেখে তার মধ্যে হেপারিন যোগ করলে কোন রিয়্যাকশন হয় না। সেজন্যে মনে হয় যে, হেপারিন একা রক্তভঞ্চন কার্যে বাধা দিতে পারে না; তার সঙ্গে আর একটি সহচরের প্রয়োজন। সেটিকে ইংরেজীতে কো-ফ্যাক্টর বলা হয়। বিজ্ঞানী কুইক বলেন যে, প্লাজমার অন্তর্গত সিরাম অ্যালবুমিন থেকে এই কো-ফ্যাক্টরটি নির্গত হয়ে রক্তপ্রবাহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। হেপারিন স্বয়ং কোন কাজ করতে পারে না, কেবলমাত্র কো-ফ্যাক্টর বা অ্যান্টিথ্রম্বিনের কর্মধারাকে ত্বরান্বিত করে দেয়

দেহের রক্তপ্রবাহে যদি সামান্য পরিমাণ থ্রম্বিন জন্মায় তাহলে অ্যান্টিথ্রম্বিন তৎক্ষণাৎ সেই থ্রম্বিনকে নষ্ট করে দেয়।

রক্ততঞ্চন সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানীর বহু মতামত প্রকাশিত হয়েছে। তাহলেও এখন পর্যন্ত কুজ্ঝটিকার অবসান হয় নি। রক্ততঞ্চন সম্পর্কে কোন মতবাদ তৈরী করতে হলে দুটি বিষয় পর্যালোচনা করা দরকার।

প্রথমটি হচ্ছে, রক্ততঞ্চনকারী উপাদানগুলির কর্মপ্রণালী এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যখন রক্তক্ষরণ হয় তখন কেবলমাত্র রক্ততঞ্চিত হয়, অন্য সময়ে অর্থাৎ রক্তপ্রবাহের মধ্যে হয় না—এ সম্পর্কে আলোকপাত করা।

রক্ততঞ্চন সম্পর্কে মতবাদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বিজ্ঞানী মোরাউইট্জ-এর কথা আসে।

মোরাউইট্জ-এর মতবাদ—রক্তের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ফাইব্রিনোজেন বর্তমান থাকলেও তারা থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের সহায়তা ভিন্ন আর কোন কাজ করতে পারে না। যখন রক্ত ক্ষরিত হয় তখন বাইরের কোন আর্দ্র পদার্থের সংস্পর্শে এসে প্লেটলেট্স্‌গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং থ্রম্বোপ্লাষ্টিন নামে এক ধরণের এন্‌জাইম নির্গত হয়। অবশ্য কিছু পরিমাণ থ্রম্বোপ্লাষ্টিন ক্ষতস্থানের পাশে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ থেকেও নিঃসৃত হয়। থ্রম্বোপ্লাষ্টিন ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে। ফাইব্রিনই হচ্ছে 'ক্লট'।

মোরাউইট্জ-এর মতবাদকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যেতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তপ্রবাহে কোন প্রকার তঞ্চন কার্য হয় না।

প্রোথ্রম্বিন+ক্যালসিয়াম আয়ন+ফাইব্রিনোজেন →তঞ্চনবিমুক্ত রক্ত। রক্তক্ষরণের পরে—

(১) থ্রম্বোপ্লাষ্টিন+প্রোথ্রম্বিন+ক্যালসিয়াম আয়ন=থ্রম্বিন

(২) থ্রম্বিন+ফাইব্রিনোজেন—ফাইব্রিন (তঞ্চন)

রক্ত-ধমনীর মধ্যে কেন তঞ্চন-কার্য হয় না, সে সম্বন্ধে মোরাউইট্জ্ বলেছেন যে, রক্তপ্রবাহের মধ্যে তঞ্চন প্রক্রিয়ার উপযোগী প্লেটলেট্স্ চূর্ণীকৃত হয় না; ফলে উপযুক্ত পরিমাণ থ্রম্বোপ্লাষ্টিন পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানকালের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের মধ্যে প্রোথ্রম্বিনের দুটি অংশ থাকে।

আধুনিক গবেষণালব্ধ ফল দিয়ে মোরাউইট্জ-এর মতবাদকে সংশোধিত করা হয়েছে।

প্লাজমা থেকে → প্রোথ্রম্বিন-এ+প্রোথ্রম্বিন বি

↓

প্রোথ্রম্বিন

চূর্ণীকৃত প্লেটলেট্স্ ও তন্তুরস থেকে নির্গত থ্রম্বোপ্লাষ্টিন →

↓

থ্রম্বিন

↓
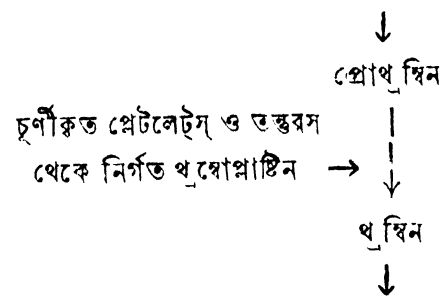
প্লাজমা থেকে→ ফাইব্রিনোজেন→ফাইব্রিন (তঞ্চন)

হাওয়েলের মতবাদ—বিজ্ঞানী হাওয়েল মনে করতেন যে, কেবলমাত্র ক্যালসিয়াম আয়নের সাহায্যে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করা চলে, থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের কোন আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ রক্তপ্রবাহে সাধারণ অবস্থায় হেপারিন নির্গত হয়। হেপারিন রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না; অর্থাৎ হেপারিন প্রোথ্রম্বিনের উপর ক্যালসিয়াম আয়নের প্রভাব বিলুপ্ত করে। বিচূর্ণ প্লেটলেট্স্ অথবা ক্ষতবিক্ষত তন্তু থেকে যখন থ্রম্বোপ্লাষ্টিন নির্গত হয় তখন এটি হেপারিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে এবং রক্তপ্রবাহে প্রোথ্রম্বিনের আগমন ত্বরান্বিত করে দেয়। হেপারিন বিমুক্ত প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম আয়নের প্রভাবে থ্রম্বিনে পরিণত

হয়। থ্রম্বিন প্লাজমার মধ্যে দ্রবীভূত ফাইব্রিনোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত হয়। এই ফাইব্রিন বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে এসে সূতার মত লম্বা লম্বা কঠিন দ্রব্যে পরিণত হয় এবং জাল সৃষ্টি করে। জালের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলি আট্‌কা পড়ে; ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

হাওয়েলের মতবাদ সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় রক্ত-প্রবাহে হেপারিন, প্রোথ্রম্বিন+ক্যালসিয়াম আয়নের সঙ্গে মিলিত হয়ে রক্ততঞ্চনে বাধা দেয়।

রক্তপাতের পর—

(১) থ্রম্বোপ্লাষ্টিন+হেপারিন → হেপারিনের কর্মক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং প্রোথ্রম্বিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে।

(২) হেপারিনবিমুক্ত প্রোথ্রম্বিন+ক্যালসিয়াম আয়ন→ থ্রম্বিন।

(৩) থ্রম্বিন + ফাইব্রিনোজেন → ফাইব্রিন (তঞ্চন)।

ম্যাক্‌ফারলেন, ওরেন-এর আধুনিক মতবাদ—এই মতবাদ উপরিউক্ত দুটি মতবাদের সঙ্গে মূলতঃ এক; তাহলেও এঁদের মূল সিদ্ধান্তে আসবার পথ কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এঁরা বলেন যে, প্লাজমার মধ্যে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় পদার্থ আছে, যার নাম থ্রম্বোপ্লাষ্টিনোজেন। চূর্ণীভূত প্লেটলেট্‌স্ থেকে একটি পদার্থ নির্গত হয়, যার এঁরা নাম দিয়েছেন লিপয়েড ফ্যাক্টর। এই লিপয়েড ফ্যাক্টর ঐ নিষ্ক্রিয় থ্রম্বোপ্লাষ্টিনোজেনকে সক্রিয় করে তোলে। ক্যালসিয়াম আয়নকে সক্রিয় করে তুলতে আর একটি সহায়কের প্রয়োজন। এটিকে বলা হয় ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর। আবার ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বোপ্লাষ্টিনের সাহায্যে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করবার কাজে একটি চালকের প্রয়োজন। এই চালক, উপাদানগুলির পরস্পর মিলনের কাজ ত্বরান্বিত করে দেয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই চালক পদার্থটির নাম বিভিন্ন রকম দিয়েছেন। বিজ্ঞানী ওয়েয়ার এর নাম দিয়েছেন অ্যাক্সিলারেটর ফ্যাক্টর। ওরেন একে বলেন ফ্যাক্টর-৫ আর কুইক এটিকে ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমান মতবাদ অনুসারে মোট ছয়টি উপাদান তঞ্চন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এরা যথাক্রমে—(১) থ্রম্বোপ্লাষ্টিন, (২) মিশ্র প্রোথ্রম্বিন, (৩) ফাইব্রিনোজেন, (৪) ক্যালসিয়াম আয়ন, (৫) ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর, (৬) অ্যাক্সিলারেটর ফ্যাক্টর। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত জমাট বাঁধে না।

ফাইব্রিনোজেন + প্রোথ্রম্বিন + ক্যালসিয়াম আয়ন+ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর+অ্যাক্সিলারেটর ফ্যাক্টর → তঞ্চনবিমুক্ত রক্ত।

রক্তক্ষরণের পর—

(১) ভাঙা প্লেটলেট্‌স্ থেকে নির্গত লিপয়েড ফ্যাক্টর+প্লাজমার মধ্যেকার নিষ্ক্রিয় থ্রম্বোপ্লাষ্টিনোজেন → সক্রিয় থ্রম্বোপ্লাষ্টিন

(২) সক্রিয় থ্রম্বোপ্লাষ্টিন + প্রোথ্রম্বিন+ ক্যালসিয়াম আয়ন+ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর অ্যাক্সিলারেটর ফ্যাক্টর → থ্রম্বিন

(৩) থ্রম্বিন+ফাইব্রিনোজেন→ফাইব্রিন (তঞ্চন)

পিকারিং-এর মতবাদ—প্লাজমার প্রোটিনের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন একত্র বাঁধা অবস্থায় থাকে। এরা একটি মিশ্র দ্রব্যে পরিণত হয়। এই কারণে রক্তের ক্যালসিয়াম আয়ন প্রোথ্রম্বিনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; ফলে ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না। কিন্তু থ্রম্বোপ্লাষ্টিন ঐ মিশ্র দ্রব্যটিকে ভেঙে দেয় এবং প্রোথ্রম্বিন ও ফাইব্রিনোজেন ছাড়া পেয়ে যায়। তখন ক্যালসিয়াম আয়ন প্রোথ্রম্বিনের উপর ক্রিয়া করে তাকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে।

নোল্‌ফের মতবাদ—নোল্‌ফের মতবাদে রক্ততঞ্চনের উপাদান হিসাবে তিনটি পদার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরা যথাক্রমে—ফাইব্রিনোজেন, থ্রম্বোজেন, থ্রম্বোজাইম। প্রথম দুটি পদার্থ যকৃৎ থেকে তৈরী হয় এবং শেষেরটি শ্বেত কণিকা থেকে পাওয়া যায়। আরও দুটি উপাদানের প্রয়োজন হয়—সেগুলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন ও থ্রম্বোপ্লাষ্টিক।

প্রথমে উল্লিখিত তিনটি উপাদানের পারস্পরিক মিলনে থ্রম্বিন বা ফাইব্রিন প্রস্তুত হয়। নোল্‌ফ বলেন যে, থ্রম্বিন এবং ফাইব্রিন এক জাতীয় পদার্থ। দুটির মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, ফাইব্রিনে ফাইব্রিনোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে এবং থ্রম্বিনে কম থাকে।

কোন্ কোন্ পারিপার্শ্বিকে বা কোন্ কোন্ ভেষজ বাইরে থেকে প্রয়োগ করলে রক্ততঞ্চনে সহায়তা হয়, তার একটা তালিকা দেওয়া হলো।

(১) উষ্ণতা, (২) আর্দ্র পদার্থের সংস্পর্শ, (৩) খুব পাত্‌লা গাছের শাখা বা কাচের দণ্ড বা কাচের বল দিয়ে রক্ত নেড়ে দেওয়া, (৪) থ্রম্বিন প্রবেশ করানো, (৫) থ্রম্বোপ্লাষ্টিক দ্রুত রক্ত-শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হলে, (৬) অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন দিলে, (৭) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহারে, (৮) ভাইটামিন-কে ইনজেকশন দিলে অথবা অধিক মাত্রায় খেলে।

যদি অধিক পরিমাণে তন্তুরস শিরার মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় তাহলে শিরার মধ্যে রক্ত তঞ্চিত হয়। কিন্তু যদি অনেকখানি তন্তুরস আস্তে আস্তে প্রবেশ করানো হয় তাহলে রক্ত তঞ্চিত হয় না। এর কারণ মোটামুটি দু-ভাবে দেখানো যেতে পারে। ধীরে ধীরে ইনজেকশন করলে হেপারিন তৈরীর উৎস উত্তেজিত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে হেপারিন রক্তের মধ্যে উপস্থিত হয়ে রক্ততঞ্চন প্রতিরোধ করে।

বিজ্ঞানী মেলান্‌বি বলেন যে, রক্তের মধ্যে তঞ্চন কার্য হয়। কিন্তু যে ফাইব্রিন তৈরী হয়, সেগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। রক্তের কণিকাগুলি অনেক সময় এই ফাইব্রিনের কণাগুলিকে নিজেদের দেহে শোষণ করে নেয়।

আবার অনেক সময় ফাইব্রিনের কণাগুলি রক্ত-ধমনীর গায়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই সঞ্চিত বস্তুর আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, রক্তপ্রবাহে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। রক্তক্ষরণজনিত নানাপ্রকার রোগের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে হিমোফিলিয়া পারপিউরা ও স্কার্ভি প্রধান।

হিমোফিলিয়া—এই রোগে ক্ষতস্থানে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। সাধারণ অবস্থায় রক্ত জমাট বাঁধতে ২ থেকে ৮ মিনিটের বেশী সময় লাগে না; কিন্তু হিমোফিলিয়ার রোগীদের রক্ত জমাট বাঁধতে আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা সময় লাগে।

এই রোগের আক্রমণ খুবই অদ্ভুত। কেবল মাত্র পুরুষদের এই রোগ হয়ে থাকে, স্ত্রীলোকদের হয় না। আর এই রোগ বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকদের এই রোগ থাকলেও তার প্রকাশ হয় না; কিন্তু তার পুত্রের দেহে ঐ রোগ বর্তাতে পারে। অথচ কন্যার দেহে প্রায় কখনই ঐ রোগ সংক্রামিত হয় না। এই রোগ হয় কেন? রক্তে খুব অল্প পরিমাণ থ্রম্বোপ্লাষ্টিন নিঃসৃত হলে এবং প্লেটলেট্‌স্ সহজে না ভাঙলে এই রোগের আক্রমণ হয়। সামান্যতম ক্ষত হলেও বহুক্ষণ ধরে রক্তপাত হয়। অনেকে টুথ-ব্রাশ দিয়েও দাঁত মাজতে পারে না। শুধু বহির্ভাগেই নয়, দেহের ভিতরেও, বিশেষ করে অস্থি-সন্ধিস্থলে প্রায় সর্বদাই রক্ত ক্ষরিত হতে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীরা ক্রমাগত রক্তক্ষরণের জন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে।

পারপিউরা—দেহের অভ্যন্তরে মিউকাস মেম্‌ব্রেনের নীচে প্রায় সর্বত্রই ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এই রোগে প্লেটলেট্‌স্-এর সংখ্যা খুব কমে যায়; আবার মাঝে মাঝে বিরাট আকারের

প্লেটলেট্স্ দেখা যায়। রক্ত জমাট বাঁধবার সময় খুব দীর্ঘ হয়ে যায়।

স্কার্ভি—খাদ্যে ভাইটামিন-সি-এর অভাব ঘটলে শরীরের অনেক জায়গা থেকে, বিশেষভাবে মাড়ি থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। রক্তক্ষরণ হবার ফলে রোগীর রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। রক্তে ফাইব্রিনোজেনের অল্পতা হলে ফাইব্রিনো-পেনিয়া নামে একপ্রকার কঠিন রোগের আক্রমণ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি উপাদান আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কোন একটির অভাবে রক্তে নানা রোগ আসতে পারে। কখনও বা রক্ত কোন সময়েই জমে না, কখনও বা ধমনীর মধ্যেই জমাট বাঁধে। দুটি অবস্থাই জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।
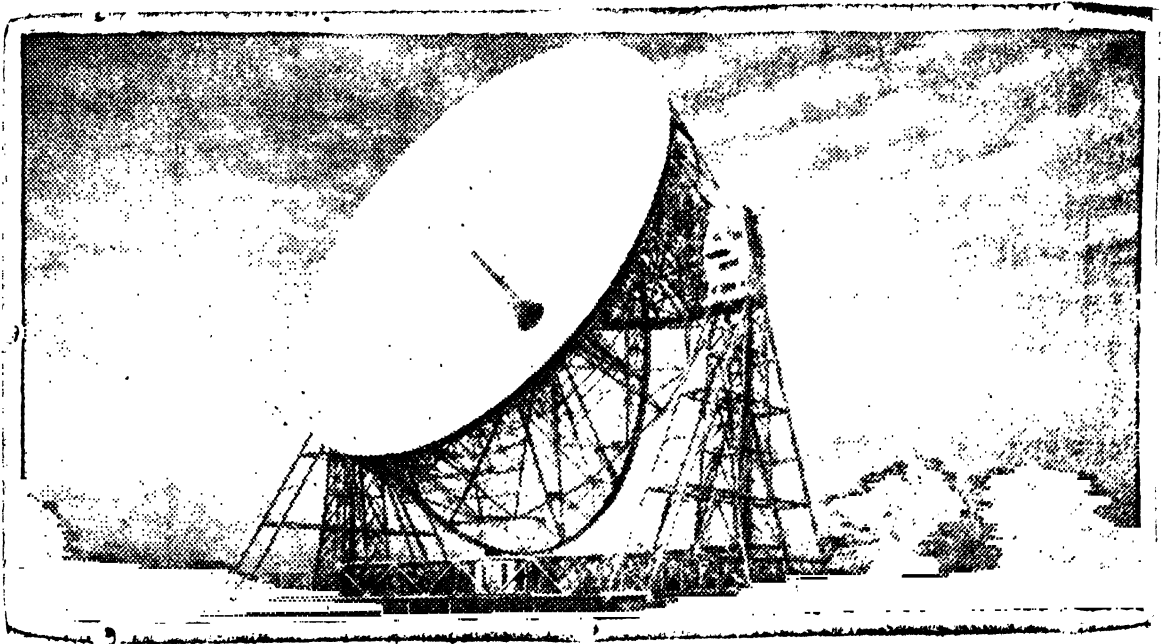
জড্রেল ব্যাঙ্কের (ইংল্যাণ্ড) বিশালকায় রেডিও, টেলিস্কোপ

মরুভূমির গাছপালা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চির-সবুজ বাংলাদেশের লোকের সঙ্গে মরুভূমির পরিচয় নিবিড় নয়। এজন্যে মরুভূমি বলতে আমাদের মনে হয়, শুধু দিক-দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি—দিনে রৌদ্রদহনে সেই বালুকারাশি উত্তপ্ত, পিপাসার্ত। বহু দূরে দূরে এক একটি মরূদ্যান—সুমিষ্ট খেজুর সেখান থেকে দেশ-দেশান্তরে রপ্তানী হয়। মরূদ্যান বাদ দিলে মরুভূমিতে বৃক্ষলতার লেশ মাত্র নেই।

আমাদের ধারণা পুরাপুরি সত্য নয়। আমাদের দেশের মরুভূমিতেও বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য উষ্ণ মরুভূমির কোথাও কোথাও বালিঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণে গাছপালা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চির-তুষারাবৃত পর্বত এবং কোন কোন পাহাড়ের শক্ত পাথরে উদ্ভিদাদি দৃষ্ট হয় না—নতুবা অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কোন না কোনরূপে উদ্ভিদ আত্মরক্ষা করে বংশ-বিস্তার অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাপদগ্ধ মরুভূমির সর্বত্র জলের হাহাকার। সেখানে তৃণ, গুল্ম বা বৃক্ষলতা অত ঘন সন্নিবিষ্ট নয়, বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত। স্বল্প জলে প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী হতে হয়েছে মরুভূমির উদ্ভিদগুলিকে। তাদের পাতা আকারে হয় ছোট, কিন্তু মোটা—অনেকটা চামড়ার মত এবং মোম লাগানো। তাদের দেহ কণ্টকিত এবং এই কণ্টক শুধু জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই নয়, অসহ্য তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও বটে। তাদের কাণ্ডও সবুজ; কারণ অজস্র পাতায় শোভিত হয়ে উবিয়ে দেবার মত প্রচুর জল তার নেই, সবুজ কাণ্ডই সূর্যের আলোক সংগ্রহ করে তাদের পাতার কাজ করে থাকে। তাদের শিকড় বালির ভিতর তিরিশ-চল্লিশ ফুট গিয়ে জল সংগ্রহ করে। তাছাড়া চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, যাতে অতি সামান্য বৃষ্টির সবটুকু জল সংগ্রহ করতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদের বীজ বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে মাসের পর মাস—এমন কি, দু-চার বছর পর্যন্ত—বৃষ্টি পেলেই অঙ্কুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বৃষ্টি হলেই শুধু মরুভূমির উদ্ভিদ পত্র-পুষ্পে সজ্জিত হয়ে ওঠে। মরুভূমির জলাশয়ে লবণের আধিক্য, বালিতে ক্ষার—লবণ ও ক্ষারের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকতে হয় উদ্ভিদকে। নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমিতে বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদকে তীব্র শীত সহ্য করতে হয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মরুভূমির উদ্ভিদকে জেরোফাইট বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মরুভূমিকে তরুশোভিত অঞ্চলে পরিণত করবার বিপুল চেষ্টা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মরুভূমির গাছপালা সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। পৃথিবীর সব মরুভূমিই উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চলের অন্তর্গত। মার্কিন দেশের মরুভূমি উষ্ণ শ্রেণীভুক্ত। ভারতের থর মরুভূমি, আরবের মরুভূমি, আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি, অষ্ট্রেলিয়ায় মরুভূমি এবং দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমিও একই রকমের উষ্ণ মরুভূমি। উষ্ণ মরুভূমির গাছপালা সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব গবেষণা-লব্ধ তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তা স্থানীয় অঞ্চল অনুযায়ী সামান্য পরিবর্তিত করে পৃথিবীর সব মরু অঞ্চলেই প্রয়োগ করা চলে। মার্কিন মরুভূমির লতাগুল্ম পৃথিবীর অন্যত্র রোপণ করা হচ্ছে। আজ ভারতবর্ষও থর মরুভূমিকে পরাস্ত করবার মহান ব্রতে কৃত-

সম্বল। এজন্যে মার্কিনবাসীর মরু-গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলব্যাপী মরুভূমি বিরাজ করছে। এই মরুভূমি একেবারে বৃক্ষহীন নয়। নেভাদার অববাহিকায় এখানে-ওখানে উদ্ভিদের ঝোপ ছড়িয়ে আছে। আরও দক্ষিণে ক্রিয়োজোটের ঝোপ। মৃত্যু-উপত্যকা নামক মরুভূমি ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ সিয়েরা নেভাদা পর্বত। ফলে, প্রশান্ত মহাসাগরের জলীয় বাষ্প মৃত্যু-উপত্যকায় বারিধারায় বর্ষিত হয় না। এই উপত্যকার গড়পড়তা বারিপাত হচ্ছে মাত্র ১·৩৫ ইঞ্চি। পৃথিবীতে উচ্চতম তাপমাত্রার রেকর্ড হচ্ছে ১৩৪° ফারেনহাইট। মৃত্যু-উপত্যকা এই রেকর্ডের অধিকারী। মৃত্যু-উপত্যকা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে নীচু। পাহাড়-ধোয়া জল এখানে এসে জমা হয়। এই জল বহন করে আনে অনেক লবণ। মৃত্যু-উপত্যকার জল তাই লবণাক্ত।

লবণাক্ত জলে সাধারণতঃ কোন উদ্ভিদ জন্মে না। কিন্তু অদূরেই সবুজ গুল্ম দেখতে পাওয়া যায়। এই গুল্মের নাম মেস্‌কুইট। মেস্‌কুইটের শাখা কাঁটায় ভরা; পাতাগুলি ধূসর রঙের। মেস্‌কুইটের শিকড় তিরিশ থেকে একশ' ফুট লম্বা হয়। দীর্ঘ শিকড়ের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ মিষ্ট জল আহরণ করা মেস্‌কুইটের পক্ষে সম্ভব। দীর্ঘ শিকড় মেস্‌কুইটকে বৃষ্টির জন্যে উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়েছে। মরুভূমিতে মেস্‌কুইটের অবস্থিতি মাটির নীচে জলের অবস্থিতির নিশ্চিত নিশানা। অঙ্কুর বের হবার সময় মেস্‌কুইটের ছোট্ট চারা কি করে তিরিশ ফুটের চেয়েও বেশী নীচ থেকে জল সংগ্রহ করে, তা আজও জানা যায় নি। মৃত্যু-উপত্যকার মেস্‌কুইট গুল্ম সম্ভবতঃ অনেক কালের পুরনো। কিছু মেস্‌কুইট বালির নীচেই পড়ে আছে বছরের পর বছর—তারপর একদিন আকাশ কালো করে মরু-ঝড় এলো—দুরন্ত বায়ুর বেগে বালির পর্দা গেল সরে—অন্ধকার থেকে আলোকে এলো মেস্‌কুইট গুল্ম। একদা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা খাদ্য হিসাবে মেস্‌কুইট ব্যবহার করতো। আজকের দিনে সেগুলি গবাদি পশুর খাদ্য।

মৃত্যু-উপত্যকায় চিরসবুজ ক্রিয়োজোট ঝোপ দেখা যায়। ক্রিয়োজোট নামে একপ্রকার পদার্থের সাহায্যে কাঠকে উইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এই ক্রিয়োজোট আলকাতরা থেকে প্রস্তুত হয়। ক্রিয়োজোট উদ্ভিদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ক্রিয়োজোটের শিকড় অনেকটা স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয়ে জল সংগ্রহ করে। বিমান থেকে দেখা যায়, ক্রিয়োজোট ঝোপের বিস্তার এক বিশেষ শৃঙ্খলায় রচিত। এর কারণ, ক্রিয়োজোটের শিকড় থেকে একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হয়ে নিকটবর্তী বীজ বা চারাকে ধ্বংস করে ফেলে। বৃষ্টির জলে ক্রিয়োজোটের শিকড় থেকে নিঃসৃত বিষ ধুয়ে যায়। এজন্যে অনাবৃষ্টি হলে ক্রিয়োজোট ঝোপ দূরে দূরে দেখা যায়। আর যথেষ্ট বারিপাত হলে ক্রিয়োজোট ঝোপ কাছাকাছি হয়।

দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টিতে ক্রিয়োজোট ঝোপের গাঢ় সবুজ পাতা ঝরে যায়, শুধু ছোট ছোট কাল্‌চে সবুজ পাতাগুলি থাকে। অনাবৃষ্টির অবস্থা বেশীদিন থাকতে কাল্‌চে পাতাগুলিও ক্রিয়োজোট গুল্ম থেকে খসে পড়ে। তবু যদি বৃষ্টি না হয় তবে ধীরে ধীরে গাছগুলি শুকিয়ে মারা যায়। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি কোন এলাকার সব ক্রিয়োজোটেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। আবার বারিবর্ষণের পর সেই এলাকায় নতুন ক্রিয়োজোট দেখা যায়। অতএব কোন মরু এলাকার সব ক্রিয়োজোটই সমবয়সী।

ক্রিয়োজোটের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে' জল ও খাদ্য সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞদের মতে, মরুভূমিতে ৬ ফুটের নীচে ঋতু-পরিবর্তনের কোন প্রভাব নেই—সেখানে জলের পরিমাণ সারা বছর প্রায় একই রকম। বৃষ্টি হলো, কি না হলো,

তার উপর ক্রিয়োজোটের অস্তিত্ব বিশেষ নির্ভরশীল নয়।

সময় মত বারিপাত হলে ক্রিয়োজোট ঝোপ ফুলে-ফলে এক বিচিত্র শোভা ধারণ করে।

মেস্‌কুইট ও ক্রিয়োজোট ব্যতীত অন্য প্রকার গুল্মও মার্কিন মরুভূমিতে দেখা যায়। যেমন—সবুজ পিউসোফিলাম। পিউসোফিলাম বাহ্যতঃ জল ব্যতীতই বাঁচতে পারে। একপ্রকার শ্বেতপত্র গুল্ম আছে, যা লবণাক্ত মৃত্তিকায়ও টিকে থাকতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ জাতীয় গুল্ম দেখা যায় না। লবণাক্ত জলাভূমিকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করবার কাজে এ-জাতীয় গুল্মের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

মরুভূমিতে ক্যাক্‌টাসের (সিজ গাছ) সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আমাদের পরিচিত ফণীমনসা একপ্রকার ক্যাক্‌টাস জাতীয় গাছ। অনেক রকমের ক্যাক্‌টাস দেখা যায়। কোনটার দৈর্ঘ্য মাত্র দু'-ইঞ্চির মত; আবার সাওয়ারোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭৫ ফুট, ওজন প্রায় ছয়-সাত টন।

ক্যাক্‌টাসের কাণ্ডে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে। কখনও কখনও এই জল মরুভূমিতে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে। ক্যাক্‌টাসে কখনও পাতা হয়, কখনও হয় না। এ-জাতীয় গাছের কাণ্ড সবুজ বলে পাতার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। কাণ্ডের উপরে কোন কোন ক্ষেত্রে মোম দেখা যায়। কাণ্ড থেকে জল যাতে উবে না যায়, এই মোম তাতে গাছকে সাহায্য করে। ক্যাক্‌টাসের গায়ে অনেক কাঁটা জন্মে। এই কাঁটা গাছকে জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করে।

প্রবহমান বায়ু এবং প্রবহমান জলস্রোতের আক্রমণ থেকে মরুভূমির মৃত্তিকা রক্ষা করবার কাজে ক্যাক্‌টাসের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। ক্যাক্‌টাসে বাধা পেয়ে বায়ুর তীব্র গতি মন্দীভূত হয়। এ ভাবে মরুঝঞ্ঝায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা হ্রাস করা চলে। ক্যাক্‌টাসের বিস্তৃত শিকড় জল আট্‌কে রাখতে পারে। জল গড়িয়ে বাইরে যাবার পথ না পেয়ে মাটির নীচে জমা হয়। এ ভাবে পশু-খাদ্যের উপযোগী তৃণ উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে ক্যাক্‌টাস। ক্যাক্‌টাসের সাধারণতঃ দু-রকমের শিকড় হয়। এক প্রকারের শিকড় সংখ্যায় খুব কম, মাটির ভিতর দু-তিন ফুট চলে যায়। আর এক রকমের শিকড় মাটির উপরে চারদিকে চার-পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের এক গোলাকার ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত হয়। এরা সংখ্যায় অনেক বেশী। ক্যাক্‌টাসের বীজ চারদিকে অনেক দূর অবধি চলে যায়, বিশেষ করে খরগোসের সাহায্যে। ক্যাক্‌টাসের কাণ্ড থেকে শিকড় বের হয়ে নতুন গাছ জন্মাতে পারে। অনাবৃষ্টির সময় ক্যাক্‌টাস বাড়তে পারে এবং সুস্থ থাকে; কারণ এদের পক্ষে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ অনাবৃষ্টির সময় পঙ্গু হয়ে পড়ে। বারিপাতের ফলে কীট-পতঙ্গ বৃদ্ধি পায় এবং ক্যাক্‌টাসের ভিতরে প্রবেশ করে একে শেষ করে দিতে পারে।

সাওয়ারো আপন দৈর্ঘ্যের মহিমায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। উত্তর মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই গাছ দেখা যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। আল্‌গা পাহাড়ী মাটি, সামান্য বারিপাত এবং অধিক তাপমাত্রা এই গাছ বাড়বার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এর মোম লাগানো সবুজ ত্বক বেশ কোমল। গাছের ভিতরে জল আছে, কিন্তু খুব কটু বলে পানের অযোগ্য। বসন্ত সমাগমে সাওয়ারো সাদা ফুল ও লাল ফলে সজ্জিত হয়। সাওয়ারো গাছের বীজ খুবই ছোট। এই ক্ষুদ্র বীজ থেকে এত বড় দীর্ঘ উদ্ভিদের উৎপত্তি খুবই বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হয়। অতি ধীরে ধীরে গাছটি বাড়তে থাকে। প্রথম দু-তিন বছরে উচ্চতা এক ইঞ্চির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। দশ বছর পরেও এর উচ্চতা এক ইঞ্চির কম থাকে। তারপর বৃদ্ধির হার একটু বেশী। তাহলেও তিন ফুটের একটি চারার বয়স হবে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ

বছরের মধ্যে। একশ' বছরে এই গাছ পূর্ণ দৈর্ঘ্য লাভ করে।

মরুভূমির ছয়-সাত ফুট উঁচু একটা গাছের শিকড় ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অতএব মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সাওয়ারোর শিকড় খুবই দীর্ঘ হয়। কিন্তু সাওয়ারো এত লম্বা হলে কি হবে, এর শিকড় মাত্র তিন ফুটের মত দীর্ঘ হয়। সাওয়ারোর সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, তার এই ক্ষুদ্র শিকড়। ঝড়ে অতি সহজেই একটি সাওয়ারোকে উপ্‌ড়ে ফেলতে পারে। শিকড় দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে প্রচুর জল সংগ্রহ করতে পারে। এক পশলা বৃষ্টির পর একটি সাওয়ারো প্রায় এক টন জল আহরণ করে থাকে। একটি সাওয়ারো গাছে জলের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ। ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে মরুভূমির বৃক্ষরাজ সাওয়ারো আজ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

যশুয়া গাছ—এ গাছটিও ক্যাক্‌টাস শ্রেণীর অন্তর্গত এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুটের মত হয়ে থাকে। এর শাখার অগ্রভাগে গোলাকার বলের মত প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা পাতার গুচ্ছ দেখা যায়। পাতায় গাছের কাণ্ডটি ঢাকা পড়ে যায়। অতি ধীরে ধীরে অনেক বছর ধরে এই গাছ বাড়তে থাকে। যশুয়া গাছের সংখ্যা কমে আসছে; তবুও দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া এবং অ্যারিজোনায় অনেক যশুয়া বন আছে।

ব্লু পেলো ভার্দে—পেলো ভার্দে শব্দের অর্থ হচ্ছে সবুজ লাঠি। এর পাতাগুলি নীলাভ সবুজ বলে 'ব্লু' শব্দটি এর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই গাছ ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে দক্ষিণ অ্যারিজোনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ গাছের বহু শাখা বের হয়। মার্চ মাসের শেষের দিকে প্রচুর হলদে ফুলের সোনালী হাসি অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ক্ষণস্থায়ী বর্ষাকালে এই গাছে অসংখ্য পাতা হয়, কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনে সব পাতা ঝরে পড়ে যায়। তখন এর সবুজ শাখা ও কাণ্ড পাতার কাজ করে।

পিনিয়ন—এই গাছ রকি পর্বতের শুষ্ক পশ্চিমাংশে বনের সৃষ্টি করেছে। এর বীজগুলি আকারে বড় এবং খাদ্য হিসেবে উপাদেয় ও জনপ্রিয়। এর কাঠের গন্ধ মোমের মত। পিনিয়নের অপর নাম হচ্ছে বাদামে পাইন। এই গাছের সগোত্র হচ্ছে একপত্রী পিনিয়ন। এর বাদামের জনপ্রিয়তা খুব বেশী। নেভাদার মরু-ভূমিতে একপত্রী পিনিয়নের সর্বাধিক প্রাচুর্য দেখা যায়। এ গাছের শক্ত কাঠে বাড়ী তৈরী হয়।

ক্রুশিফিক্সন থর্ণ—এই গাছের পাতা নেই। এর কাণ্ড ও শাখা সবুজ রঙের। শাখার মুখ কাঁটার মত সূচালো। ফিকে সবুজ ফুল দেখা যায়। এই গাছ জীবজন্তুর অখাদ্য। মৃত্তিকাকে মরুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার কাজে এর উপযোগিতা যথেষ্ট।

মরুর লোহাকাঠ—এই গাছের ফুল সুগন্ধ, পাতা নীলাভ সবুজ। এর কাঠ পাথরের মত শক্ত, করাত দিয়েও কাটা চলে না।

বর্ষজীবী তরুগুল্ম—এরা সাধারণ গাছপালা। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি সইবার ক্ষমতা এদের নেই। সাধারণতঃ মরুভূমির বাইরে এদের দেখা যায় না। কারণ এদের বীজে থাকে অতিমাত্রায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা—বীজের সংখ্যার উপর নির্ভর করে মরুভূমির বার্ষিক বৃক্ষরাজির প্রাচুর্য। অনাবৃষ্টির দিনে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গত হয় না। আধ ইঞ্চি, কখনও বা দু'এক ইঞ্চি জল না হলে বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয় না। কেন যে এতটা বৃষ্টি দরকার তা এখনও জানা যায় নি। তারপর জল উপর থেকে পড়া চাই; অথচ নীচ থেকে শিকড় বেয়ে গাছের ভিতর দিয়ে জল ওঠে গাছের মাথায়। এর একটা কারণ এই যে, বীজের সঙ্গে এমন পদার্থ থাকে যা জলে দ্রাব্য এবং অঙ্কুর উদ্গত হতে বাধা দেয়। মেঘ থেকে পতিত জলে

সেই পদার্থ গলে মাটির আরও নীচে চলে গেলে অঙ্কুর উদ্গমের বাধা অপসারিত হয়। কোন কোন বীজ লবণাক্ত জলে চুপ করে বসে থাকে—এক পশলা জোর বৃষ্টি হলে সেই লবণাক্ততা অনেকটা দূর হয়ে যায় এবং বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। কোন কোন বীজ আবার জোর বৃষ্টি হলেই খুশী নয়, মাটি কেমন ভিজলো তা দেখে হবে তার অঙ্কুরোদ্গম। কোন কোন বীজের আবার ব্যাক্টেরিয়ার সহযোগিতা চাই—তখন অনেক দিনের ভিজা মাটি দরকার। বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি না হলে অনেক বীজ আবার চুপ করে বসে থাকে।

কোন কোন বছর মৃত্যু-উপত্যকার মরুভূমি বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৭ সালে বসন্তকালে মরুভূমির লবণহীন অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ সোণালী সূর্যমুখী ফুল ফুটেছিল। সন্ধ্যাকালীন সাদা প্রিমরোজ এবং গোলাপী পাঁচকলকী ফুলও প্রচুর দেখা গিয়েছিল। মৃত্যু-উপত্যকায় ফুলের সংখ্যা বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, বারিপাতের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি হলে পরবর্তী বসন্ত-কালে ফুল ফুটবে প্রচুর। কিন্তু অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, বা জাহুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে বৃষ্টি হলে কোন লাভ হবে না।

ছ'দিনের মধ্যে যদি ছ'বার বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি প্রতিবার অন্ততঃ এক ইঞ্চির তিন-দশমিকাংশের মত হয় তবেই সাধারণতঃ বীজ মুকুলিত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের উপর রাত্রি এবং দিনের বৃষ্টির পৃথক প্রভাব লক্ষিত হয়। তাপমাত্রার ব্যাপারে বীজের আশ্চর্য অনুভূতি-শীলতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উষ্ণ স্থানে রেখে অঙ্কুর উন্মেষের ব্যবস্থা করলে শুধু গ্রীষ্মকালীন গুল্মগুলিই অঙ্কুরিত হয় এবং শীতল তাপমাত্রায় কেবল শীতঋতুর গুল্মগুলি অঙ্কুরিত হয়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, জীবন-ধারণের পক্ষে প্রচুর বৃষ্টি হলে এবং সঠিক তাপমাত্রায় মরুভূমির বর্ষজীবী তরু বীজ থেকে বেরিয়ে আসে।

মরুভূমির গাছপালায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। নানা রঙে, নানা শোভায় তারা মরুভূমিকে সুন্দর করে তোলে। ছোট-বড় অনেক রকমের গাছ বেড়ে ওঠে ঠিক জায়গাটি বেছে। বিশেষ শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকে বীজগুলি। মরুভূমির শুষ্ক নদীগর্ভে যে সব গুল্ম জন্মে তাদের বীজে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বীজগুলি কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত থাকে এবং জলে এক বছর রেখে দিলেও সেগুলি অঙ্কুরিত হয় না; অথচ আবরণটি সরিয়ে ফেললে একদিনেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। বালি ও নুড়িপাথরের সংঘর্ষে এই আবরণ বীজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মরুভূমিতে প্রাণ-ধারণের উপযোগী খাদ্য ও জলের অভাব লেগেই থাকে; কাজেই গাছকে বেঁচে থাকবার জন্যে সতর্ক থাকতে হয়। অনেক সময় মরুভূমির এক বর্গগজ জায়গায় কয়েক হাজার চারা গাছ জন্মাতে দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে, চারাগাছগুলি একে অন্যের মৃত্যুর কারণ হয় না। তারা সবাই আকারে ক্ষুদ্র হয় বটে, কিন্তু অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হয় না।

মরুভূমিতে উদ্ভিদের অস্তিত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ আবাসভূমিরই সঙ্কেত। দ্রুত বর্ধমান জনস্রোতের নতুন আবাসস্থল স্থাপনের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়েছে মরুভূমির দিকে—মরুতে উদ্ভিদের অবস্থান সেই সম্ভাবনাকে অনেকটা নিশ্চিতরূপ দিয়েছে। উদ্ভিদের প্রসারে মরুভূমির পিপাসার্ত বালুকারাশি প্রাণময় সবুজে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বিপর্যয়

বর্তমান উন্নততর বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান হলো মানুষের জীবনকাল বৃদ্ধি। কিন্তু এটাই এখন মানব-সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলেই মানুষের জীবনকাল বেড়েছে। নতুন নতুন শক্তিশালী ওষুধ উদ্ভাবন এবং উন্নত চিকিৎসার প্রভাবে কোটি কোটি মানুষকে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে মৃত্যুর হার কমে গিয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে সেই অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণামে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরতে পারে বা স্বল্পাহারের ফলে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, অথবা পরস্পর যুদ্ধ করেও মরতে পারে।

মানুষের এই ভবিষ্যৎ বিপত্তির জন্যে আংশিকভাবে দায়ী হচ্ছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি। এর ফলে মারাত্মক রোগসমূহ নিরাময়ের ব্যবস্থা বা সব রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা উৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। শল্য-চিকিৎসার এত উন্নতি হয়েছে যে, তার ফলে হতাশ রোগীও নতুন জীবন লাভ করছে। দেহ-পুষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং লবণজাতীয় পদার্থ ট্যাবলেটের আকারে সহজলভ্য হওয়ায় জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা কমে গেছে।

এসব কারণে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পরমায়ুও বেড়েছে। আগামী কয়েক বছরে বিজ্ঞানীরা এ-সম্বন্ধে আরও উন্নতির আশা করেন। পৃথিবীর লোকসংখ্যা পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ইউনাইটেড নেশন্স-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে সারা পৃথিবীতে গড়পড়তায় ১০০০-এ ৩৪টি জন্ম এবং ১৮টি মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যু অপেক্ষা এত অধিক জন্মের হার খুবই অস্বাভাবিক এবং ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের পক্ষে অশুভ সূচক।

১৬৫০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির গতি ছিল বেশ মন্থর। মড়ক, দুর্ভিক্ষ, জলাভাব, যুদ্ধ এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের ফলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫০০,০০০,০০০। এর পর তিন শতাব্দীতে এই লোক সংখ্যা ৫ গুণের চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৮০০,০০০,০০০। ইউ. এন-এর বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০০ সালে, অর্থাৎ এখন থেকে ৪১ বছর পরে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে ৬,২৫০,০০০,০০০।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের চাহিদা বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিক কাঁচামালের জন্যে বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। জীবনযাপনের জটিলতাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। সহরগুলির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পিচ, কংক্রিট ও লোহার প্রাচুর্যে চাষের জমি, অরণ্য—এমন কি, মরুভূমি পর্যন্ত ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে।

লেমিংস-এর মত আমরা যেন সংঘবদ্ধভাবে আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, লেমিংস নামক ইঁদুরের মত একরকম প্রাণী এত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে যে, কিছুকালের মধ্যেই তাদের খাদ্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে সংঘবদ্ধভাবে তারা খাদ্যের অন্বেষণে অগ্রসর হতে থাকে এবং সর্বশেষে সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করতে বাধ্য হয়।

ভবিষ্যতের বর্ধিত মানবগোষ্ঠীকে কি উপায়ে খাদ্য-বস্ত্র যোগানো হবে, সেই হলো সমস্যা। ওয়াশিংটনের পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো থেকে হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে, আগামী দশ বছরে ৫০০,০০০,০০০ একর বেশী জমি চাষের জন্যে দরকার হবে; অর্থাৎ আলাস্কা, কলোরেডো ও অ্যারিজোনা একত্র করলে যতটা জমি হয় ততটা বাড়তি চাষের জমি দরকার হবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে দু দিক থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। একটি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতিসাধন করে দরকারী জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা কম কর্মীর সাহায্যে ১৯৫৮ সালে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়েছে। সঙ্কর ভূট্টা উদ্ভাবন করে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ ৫০০,০০০,০০০ বুশেল বেশী ভূট্টা বর্তমানে আমেরিকায় উৎপন্ন হচ্ছে। এতে আগের চেয়ে বেশী জমি ব্যবহার করবার দরকার হয় নি।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির দ্বারা সমস্যাটির আরও কিছু সমাধান হতে পারে বটে, কিন্তু এই পৃথিবীর মাটি থেকে খাদ্যোৎপাদনেরও একটা সীমা আছে।

অপর উপায়টি হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণ করে সাম্য রক্ষা করা। লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। কারণ, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে মানুষ মৃত্যুর হার কমিয়েছে, কিন্তু নিজের প্রবৃত্তির উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করে নি।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির প্রোফেসর ডাঃ ব্রাউন বলেন যে, সমাজগত কৃষ্টি নৈতিক বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেও এই বিষয় সমাধানের জন্যে বিশদভাবে আলোচনা এবং জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র বর্ধিত করা প্রয়োজন।

কয়েকটি জাতি জন্মনিয়ন্ত্রণে কিছু সাফল্য লাভও করেছে। তার মধ্যে জাপানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এশিয়ায় জনবহুল দেশের মধ্যে জাপান অন্যতম। ১৯৪৭ সালে সেখানে জন্মের হার ছিল হাজারে ৩৪'৩; কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে ১৯৫৬ সালে জন্মের হার দেখা যায় হাজারে ১৮'৫। ঐ অল্পায়তন দেশের মধ্যে নয় কোটি অধিবাসী থাকায় লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির পরিণাম সম্বন্ধে জাপানীরা খুবই সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকেই সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি বহুলভাবে প্রচলিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে গর্ভপাতের ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বন্ধ্যাত্ব আনয়ন আইনসঙ্গত করা হয়েছে। এর ফলেই জন্মের হার এত কমানো সম্ভব হয়েছে।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁরাও বলেন যে, অনির্দিষ্ট-ভাবে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলে এমন এক সময় আসবে, যখন সবাইর পক্ষে পৃথিবীর গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। প্রকৃতি যে কি ভাবে এর সমতা বিধান করবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তাঁরা আরও বলেন যে, ভবিষ্যতের একটা অজানা বিপর্যয় থেকে নিস্তার পাবার জন্যে এখন থেকে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অযৌক্তিক। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং এটা প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসের পরিচায়ক।

তবে পৃথিবীতে যত লোক বাস করতে পারে, তার একটা সীমা আছে—এ বিষয়ে তাঁরা এক মত। এই কথাটাই এখন থেকে সবাইর জানা থাকা চাই। তবেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত ভবিষ্যৎ বিপর্যয় থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে।

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধায়ক আলোক-রশ্মি

ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের এক

খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি এমন এক আলোক-রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে, যার দ্বারা হাঁপানি, হে-ফিভার, সর্দি এবং সাধারণ মানসিক অবসাদ দূর করা যাবে।

উক্ত সংস্থার কারখানায় এক বিশেষ ধরণের অতিবেগুনী বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ বাতির আলোকে আশেপাশের বাতাসের কতকগুলি কণিকা নেগেটিভ তড়িতাবিষ্ট হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোগীর ফুসফুসের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, নেগেটিভ তড়িৎ-বিভবযুক্ত বাতাসের কণিকা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী এবং সেগুলি মনের প্রফুল্লতাও বৃদ্ধি করে।

অপর পক্ষে বাতাসের কণিকাগুলি পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট হলে সেটা আমাদের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, হাঁপানি, সর্দি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাত, আর্থ্রাইটিস, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পায় বলে জানা গেছে।

স্ট্যাবিল্যাম্প আলট্রাভায়োলেট বাতির দ্বারা আয়ন উৎপন্ন হয়, একথা অনেক দিন থেকেই জানা আছে। হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং হাঁস-মুরগীর ঘরে এই বাতি ব্যবহার করা হয়। কোন কোন বাতির আলোকে হাঁপানি প্রশমিত হয়, এমন খবরও মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা হতো যে, ঐ বাতি থেকে যে সামান্য পরিমাণ ওজোন নির্গত হয়, তার দ্বারা অ্যালার্জি উৎপাদক রাসায়নিকটি অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে হাঁপানির উপশম ঘটে।

সম্প্রতি জানা গেছে যে, বাতি থেকে উৎপন্ন নেগেটিভ আয়নের প্রভাবেই রোগের উপশম ঘটে।

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উত্তাপ নিবারণে উদ্ভিদের শক্তি

যন্ত্রশিল্পের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি পুরু স্তরে পৃথিবীর চারদিক বেষ্টন করে আছে। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে, এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তরটি সূর্যের উত্তাপ ধরে রাখে এবং স্তরটি ক্রমাগত বাড়তে থাকবার ফলেই পৃথিবীর তাপ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ওহিয়ো স্টেট্ ইউনিভারসিটির প্রোফেসর ডাঃ লিক সভায় বলেন যে, এই ভাবে ক্রমাগত উত্তাপ বাড়তে থাকলে মেরু প্রদেশের বরফ ক্রমশঃ দ্রবীভূত হতে সুরু করবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হতে থাকবে এবং দেশের তটভূমি ক্রমশঃ কমে যাবে।

তিনি বলেন যে, এই বিপদ নিবারণ করতে হলে বহুসংখ্যক বৃক্ষ রোপণ করা দরকার। প্রত্যেক মোটর গাড়ী পিছু ১০টি এবং প্রত্যেক লরী পিছু ১০০টি বৃক্ষ রোপণ করা দরকার। ফটোসিন্থেসিসের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আত্মসাৎ করে অক্সিজেন বের করে দেয়।

জীবাণুর দ্বারা শস্যের ক্ষতিকারক কীট বিনাশ

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক খবরে প্রকাশ, শস্যের ক্ষতিকারক কীটের বিরুদ্ধে জীবাণু-যুদ্ধ করে সাফল্য লাভ হয়েছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা আল্‌ফা-আল্‌ফা শূককীট অধ্যুষিত ইম্পিরিয়্যাল ভ্যালির এক শস্যক্ষেত্রে ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েন্সিস নামক একপ্রকার জীবাণু প্রয়োগ করে দেখেছেন, এতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৯৭টি কীট বিনষ্ট হয়।

আল্‌ফা-আল্‌ফা শূককীট শস্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর উৎপাতে প্রতি বছর প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের পশু-খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। এর পূর্বে ফুল ও বাঁধাকপির ক্ষতিকারক কীটের

বিরুদ্ধেও এই জীবাণু প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো এই যে, এই জীবাণু ব্যবহারে মানুষ বা গৃহপালিত পশুর পক্ষে বিপজ্জনক ফল হয় কি না। এ-সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার জন্যে কয়েকজন লোক এই জীবাণু খেয়ে এবং ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছেন যে, এতে তাঁদের শরীরে কোন অবাঞ্ছিত ফল প্রকাশ পায় না।

ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েন্সিস জীবাণু এই সর্বপ্রথম কীট ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা হলো। জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে সরবরাহের জন্যে এখনও বহুল পরিমাণে এর উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় নি। স্প্রে এবং গুঁড়ার মাধ্যমে এটাকে এক বছর বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর কীটনাশক কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এই জীবাণুগুলি কীটের পাকস্থলীতে বিষ হিসাবে কাজ করে বলে জানা গেছে। এটা খাবার পর কীটগুলি অসুস্থ হয়ে মারা পড়ে। অনুমিত হয়েছে যে, এই জীবাণুর স্পোর উৎপাদনের সময় যে বিষাক্ত কেলাস উৎপন্ন হয়, তাই কীটগুলির মৃত্যুর কারণ।

ঐ বিষের রাসায়নিক গঠন নিরূপণ করা সম্ভব হলে সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাই কাজ করা যাবে এবং এ থেকে একটি অমোঘ কীটঘ্ন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, কীটগুলি এই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। কতকগুলি প্রচলিত উগ্র রাসায়নিক কীটঘ্ন শস্যের উপকারী কীটের পক্ষেও মারাত্মক। কিন্তু এই জীবাণু ব্যবহারে সে ভয় নেই; কারণ, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কীটের উপরই এটা কার্যকরী।

এর দ্বারা আরও কতকগুলি ক্ষতিকারক কীট ধ্বংস করা যেতে পারে, যেমন—সাধারণ মাছি, কটন লিফ পার্ফোরেটর, অ্যাভোক্যাডো লিফ রোলার, ইজিপ্‌সিয়ান উইভিল, সল্ট-মার্স ক্যাটারপিলার এবং কটন রোল ওয়ার্ম।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
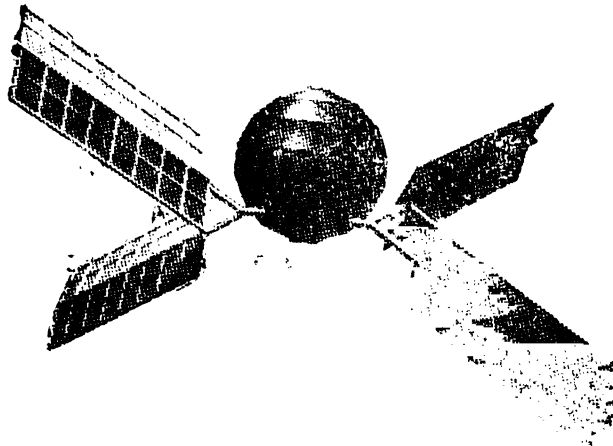
প্যাডেল হুইল-চালিত কৃত্রিম উপগ্রহ

বর্ধিত রক্তচাপ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

অ্যাপোপ্লেক্সি, করোনারি থ্রম্বোসিস, সেরিব্র্যাল হিমারেজ প্রভৃতি যে সব মারাত্মক ব্যাধির কথা আমরা সচরাচর শুনতে পাই, তাদের প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপের প্রকাশ পেয়ে থাকে। বর্তমানে সব দেশেই এ সব রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। আমাদের দেশেও এ সব রোগে অনেক লোক প্রাণ হারায়। তবে কত লোকের মৃত্যু ঘটে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৬ সালে মৃত্যুর যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, উচ্চ রক্তচাপ সে দেশে শতকরা ১৪টি মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সে দেশে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। এই ব্যাধিটি কিরূপ ব্যাপক এ-থেকেই তার আভাস পাওয়া যাবে।

অনেকে একে বড় লোকের ব্যাধি বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। ধনী-দরিদ্র, জাতি-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এ ব্যাধি সবারই হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে ভোজনলিপ্সু ব্যক্তিদের এ রোগের কবলে পড়বার সম্ভাবনা অধিক থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে এ রোগের আক্রমণ বেশী দেখা যায়। তবে স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই ব্যাধি অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক। মৃত্যুসংখ্যা পুরুষের মধ্যেই অধিক বলে জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৪০-৫০-এর মধ্যে এই রোগের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ৩০-এর কোঠায় বা তার নীচেও এই রোগ প্রকাশ পেতে পারে। এই রোগে পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা সর্বাধিক হতে দেখা যায়। যে সব ক্ষেত্রে রোগের সূচনা থেকেই রক্তের চাপ খুব দ্রুত বৃদ্ধির দিকে যেতে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে ২।১ বছরের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় সূক্ষ্ম রক্তনালিকাগুলির মুখ খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে রক্ত সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। হোস পাইপের মুখটি কোন কারণে ছোট হয়ে গেলে যেমন পাইপের মধ্যে চাপ বৃদ্ধি পায়, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ হয়। এভাবে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করলে ধমনীর কাঠিন্যও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে রক্তের চাপ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পাওয়ার ফলেই প্রধানতঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্ত-সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডকেও তখন অধিক শক্তিতে পাম্প করে যেতে হয়। কিন্তু অধিক শক্তি প্রয়োগ করেও হৃৎপিণ্ড তার ভিতর থেকে সব রক্ত বের করে দিতে সক্ষম হয় না, কিছু রক্ত তার ভিতরে থেকে যায়। এই রক্তের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে চরম অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয় অথবা অনুরূপ হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হয়।

বাল্যাবস্থায় ধমনী থাকে খুব স্থিতিস্থাপক, তখন রক্তের চাপও কম থাকে। পরিণত বয়সে ক্রমশঃ ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়সানুপাতিক এই বৃদ্ধি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই ব্যাধি বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ক্ষেত্রবিশেষে অনুরূপ ব্যাধির জন্যেও রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃক্কের ব্যাধি বা অ্যাড্রিন্যালিন গ্রন্থিতে টিউমার সৃষ্টির ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। আবার কোন স্থানের ধমনী

বিশেষ কারণে সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেও রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। এরূপ কোন ব্যাধি উচ্চ রক্তচাপের কারণ বলে জানা গেলে সেই ব্যাধি চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় হলেই রক্তের চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপের দরুণ এরূপ কোন ব্যাধি হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ কোন বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব ব্যাধিসংশ্লিষ্ট বর্ধিত রক্তচাপ চিকিৎসার দ্বারা স্থায়ীভাবে নিরাময় হতে পারে।

রক্তের চাপ পরীক্ষার জন্যে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ—এই উভয় অবস্থাতেই চাপের পরিমাপ করা হয়। ডাক্তারেরা সঙ্কোচনের চাপ অপেক্ষা প্রসারণের চাপের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রসারণ চাপের পরিমাপ থেকে অধিকতর স্পষ্টভাবে হৃৎপিণ্ডের অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দেহযন্ত্রের কিরূপ পরিবর্তনের ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় তা স্পষ্টভাবে জানা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষে কেন যান্ত্রিক বিকলতা ঘটে' এভাবে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, তার মূল কারণ এখনও অজানা রয়ে গেছে। খাদ্যের সঙ্গে এই রোগের সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। ব্লাড প্রেসারের রোগীর খাদ্য তালিকা থেকে প্রোটিন, ফ্যাট বাদ দেওয়া হয় এবং সে অবস্থায় তার রোগ কিছু প্রশমিত থাকে। ফ্যাটের পচনক্রিয়ার ফলে কোলেষ্টেরল নামে একটি পদার্থ ধমনী প্রাচীরে সঞ্চিত হয়েই তার কাঠিন্য আনয়ন করে। কিন্তু একই রকমের খাদ্য গ্রহণ করে পরিবারের ব্যক্তিবিশেষই এই রোগে আক্রান্ত হয়, সকলে হয় না। কাজেই খাদ্যের সঙ্গে এই রোগের সম্বন্ধ থাকলেও দেহের অনুরূপ কোন ত্রুটির ফলেই এ রোগের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এই দৈহিক ত্রুটি বংশানুক্রমিকভাবে লব্ধ বলেও অনেকে মনে করেন। দেহে এনজাইমবিশেষের অভাব এই রোগোৎপত্তির মূলে থাকতে পারে—এইরূপ একটি বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

যে সব দেশের লোক অধিক পরিমাণে লবণ খায়, তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে। জাপানীরা খাদ্যের সঙ্গে অতিমাত্রায় লবণ খায়, তাদের দেশে এই রোগের প্রাবল্যের কথা জানা গেছে। যে ভাবেই হোক, দেহের মেদ বৃদ্ধি ও অতিমাত্রায় লবণ গ্রহণ, এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করে।

কোন কোন পরিবারে এই রোগের বিস্তার খুব বেশী দেখা যায়। বাপ, মা উভয়ের এই রোগ থাকলে তাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যেও এই রোগ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। তবে পিতামাতা থেকে কোন বিশেষ 'জিনের' মাধ্যমে পুত্র-কন্যায় এ রোগ বর্তায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারেন নি। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে পারিবারিক বিশেষত্ব এর জন্যে কতক পরিমাণে দায়ী হতে পারে, এরূপ সম্ভাবনাও তারা বাতিল করে দেন নি।

বর্ধিত রক্তচাপ সম্বন্ধে অনুরূপ অস্পষ্টতাও রয়েছে। স্বাভাবিক চাপের ব্যাপারটিও বেশ গোলমেলে। স্বাভাবিক চাপ বলতে এমন কিছু নির্দিষ্ট নেই, যেটা সব লোকের পক্ষে একই ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। বয়স, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণের উপরই রক্তের চাপের পরিবর্তন নির্ভর করে। এক জনের ক্ষেত্রে যে চাপ ভয়াবহ, অপরের ক্ষেত্রে তাই হয়তো স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়তে পারে। যেমন—তিন জন লোকের রক্তের চাপ একইরূপ—সঙ্কোচন চাপ—১৮০, প্রসারণ চাপ—১১০। তাদের মধ্যে এক জনের বয়স ৭০। বয়সের দরুণ তার ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা স্বাভাবিকভাবেই কিছু হ্রাস পাবে। কাজেই ঐ চাপ তার পক্ষে তেমন গুরুতর কিছু নয়। আর একজন ৪৫ বছর

বয়সের এক স্থূলকায়া মহিলা। একটু সতর্ক থাকতে হলেও ঐ চাপ তার পক্ষেও এমন ভয়াবহ কিছু নয়; কারণ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের উচ্চ চাপ সহ্য করবার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। তৃতীয় ব্যক্তি ৩০ বছর বয়সের এক যুবক। তার পক্ষে ঐ চাপ খুবই ভয়াবহ। বিশেষ করে ঐ বয়সে যদি প্রসারণ চাপ ১০০-এর উপর উঠে গিয়ে আর না নামে তবে তার যে কোন মুহূর্তেই গুরুতর বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

সঙ্কোচন চাপ ব্যক্তিবিশেষের বয়স ১০০-এর মধ্যে থাকলে মোটামুটিভাবে তাকে স্বাভাবিক চাপ বলেই ধরা হয়ে থাকে। তবে পঞ্চাশোত্তর লোকেরও সঙ্কোচন-চাপ ১৪০—১৫০-এর মধ্যে এবং প্রসারণ-চাপ—১০০-এর নীচে থাকাই ভাল। রক্তের চাপ একটু নীচের দিকে থাকলে দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে।

বর্ধিত চাপের ফলে সবক্ষেত্রে যে একইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এমন নয়। রক্তের চাপ সহ্য করবার শক্তি সবার সমান নয়। কারো হয়তো রক্তের চাপ অনেক অধিক থাকা সত্ত্বেও কোনরূপ অস্বস্তিকর উপসর্গ প্রকাশ পায় না। সে ঐ চাপ নিয়েই তার স্বাভাবিক কাজকর্ম স্বচ্ছন্দে করে যায়। আর এক জনের হয়তো ঐ চাপেই শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা প্রভৃতি অস্বস্তিকর অবস্থা প্রকাশ পায়; এমন কি, তার ক্ষেত্রে ঐ চাপেই হঠাৎ ষ্ট্রোক, চোখে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

অনেক সময় ব্লাড প্রেসারের রোগীর ব্যবহারে কতকগুলি বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। সে স্বভাবতঃ একটু খিটখিটে হয়ে পড়ে। তাকে অল্প কারণেই অতি উল্লসিত বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। তবে স্বভাবের এই পরিবর্তন সাধারণতঃ বাড়ীতে আপন জনের কাছেই প্রকাশ পায়। বাইরে বন্ধুবান্ধবের কাছে আত্মসম্বরণ করে সে হয়তো বেশ প্রীতিকর ব্যবহারই করে। তবে ব্লাড প্রেসারের রোগীমাত্রেরই যে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের সঙ্গে তার কোন তারতম্যই ধরা পড়ে না।

এক যুগ আগেও এই রোগের সঙ্গে যোঝবার মত আয়ুধ চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিল না বললেই চলে। এই রোগ প্রকাশ পেলে সাধারণ অবস্থায় তখন ডাক্তারেরা রোগীর খাদ্য-তালিকার রদবদল করেই প্রায় ক্ষান্ত থাকতেন। প্রেসার অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে রক্তমোক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা হতো, কিন্তু কোনটাই তেমন কার্যকরী হতো না। এখন এ রোগের সঙ্গে যোঝবার মত বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকলে ব্লাড প্রেসারকে প্রশমিত রেখে এখন দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়।

ভারতীয় উদ্ভিদ রাউলফিয়া ব্লাড প্রেসার প্রশমনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এ থেকে নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত হয়ে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এইরূপ আমেরিকার ভেট্রেটাম নামক উদ্ভিদ থেকেও ব্লাড প্রেসারের ঔষধ প্রস্তুত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নবাবিষ্কৃত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ রক্তের চাপ প্রশমনে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হলো হাইড্রালেজাইন। রকেটের জ্বালানী থেকে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। হেক্সা-মেথোনিয়াম নামে অপর একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্লাড প্রেসারের একটি অমোঘ ঔষধরূপে খ্যাতিলাভ করেছে। এই ঔষধটি স্নায়ুর অসাড়তা সম্পাদন দ্বারা ধমনী সম্প্রসারিত করে' রক্তের চাপের হ্রাস ঘটায়। সম্প্রতি ক্লোরোথিয়েজাইড নামে একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। রক্তের চাপ প্রশমনে এই ঔষধটি এককভাবে বা অন্য ঔষধের সহযোগে অতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ঔষধটি অন্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করলে অপর ঔষধের কার্যকরী শক্তিকেও বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে।

এসব ঔষধের সাহায্যেই এই রোগকে এখন বিশেষভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন

রোগীর ক্ষেত্রে একই ঔষধ যে সমভাবে কার্যকরী হয়, এমন নয়। অবস্থাবিশেষে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেভাবেই এসব বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধ-বিশেষের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে রোগীর দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রকাশ পেতেও দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে ঔষধ পরিবর্তন করে ফল পাওয়া যায়।

এসব ঔষধ শুধু সাময়িকভাবে রক্তচাপ প্রশমিত রাখতে পারে। এই ব্যাধি নিরাময় করতে পারে, এরূপ ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই কারো এই রোগ প্রকাশ পেলে বহুমূত্র রোগীর মতই তার সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন হবে। একবারের চিকিৎসা ব্যবস্থায় রক্তের চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় এলেই তার নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে অন্ততঃ বছরে একবার করে রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে এবং বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তাকে পুনরায় চিকিৎসা ব্যবস্থার অধীন থাকতে হবে। কোন অস্বস্তিকর উপসর্গ প্রকাশ পেলেই তবে ডাক্তার দেখানো যাবে—ব্লাড প্রেসারের রোগীর সেরূপ না করাই সঙ্গত। তাতে হঠাৎ কোন গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু প্রথম দিকে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে চিকিৎসকের পক্ষে ব্লাড প্রেসারকে সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব।

ব্লাড প্রেসারের রোগীর আরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। দেহের ওজন যাতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায়, সে দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। দেহের ওজন হ্রাস পেলে রক্তের চাপ আপনা থেকেই অনেক পরিমাণে কমে যায়। মেদবহুল দেহ শুধু ব্লাড প্রেসারই নয়, অন্যান্য গুরুতর ব্যাধিরও আক্রমণ ক্ষেত্র। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুমূত্র ও করোনারি হৃদরোগে ক্ষীণকায় অপেক্ষা স্থূলকায় ব্যক্তিরাই অধিক তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার পরিমাণ কমালে মেদ-বাহুল্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। শ্রম-সাধ্য কাজ করতে হলেই অধিক ক্যালোরি বা খাদ্য-শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। যৌবনের খেলাধূলা ও কর্মচঞ্চল জীবনেই খাওয়ার প্রয়োজন অধিক থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যখন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় তখন খাওয়ার পরিমাণ না কমালেই অনিবার্যরূপে মেদবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

আহার সম্বন্ধে সতর্কতা ও নিয়মিত কায়িক শ্রমের প্রতি যত্ন নিলে অনেক পরিমাণে এ রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বর্তমান যুগে ব্লাড প্রেসারের যে সব ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, একটু সতর্ক থাকলে তাদের দৌলতে রোগ নিরাময় না হলেও পূর্ণজীবন লাভের পথ প্রশস্ততর হতে পারে।

সঞ্চয়ন

শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়ক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

বৃস্টলের নিকটে অবস্থিত পিল-এর হ্যাম গ্রীন হাসপাতালের চিকিৎসকগণ পোলিও রোগীর 'ব্রিদিং এইড' হিসাবে একটি হাল্কা বৃটিশ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছেন। এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহারের ফলে রোগীর পক্ষে আজ চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে খুশীমত ঘুরে বেড়ানো, হাসপাতালের কাছাকাছি কোথাও যাওয়া এবং ট্রেনে কিংবা অন্য কোন যানে দূরের পথে যাত্রা করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে কিন্তু রোগীকে তার ওয়ার্ডে শয্যার কাছাকাছি একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আটক থাকতে হতো।

চিকিৎসকেরা এই ক্লিনারের সাহায্যে প্লাষ্টিকের টিউবের মধ্য দিয়ে রোগীর মুখে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে দেন। এই সময় রোগী দাঁত দিয়ে একটা ছোট প্লাষ্টিক মাউথ-পিস কামড়ে ধরে থাকে। জিনিষটিকে রোগী ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে হাওয়ার পরিমাণও সে ইচ্ছামত কমবেশী করতে পারে।

পোলিওমায়েলাইটিসে যারা ভুগছে, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্যে একটা কৃত্রিম ব্যবস্থার দরকার। এ সম্পর্কে আজকাল যে 'লৌহ ফুস্‌ফুস' ব্যবহৃত হচ্ছে, তার কথা সকলেই জানেন। তাছাড়া আছে 'কুইরাস' বা চেস্ট প্লেট্ রেস্-পিরেটরের মত সহজবহনযোগ্য ব্যবস্থা। রোগী যখন নিদ্রা যায় তখনই এই ধরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে কাজে আসে; কিন্তু ওজনে ভারী হওয়ায় সেগুলিকে টেনে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয় না। সেজন্যে রোগীকে দিনের বেলায় চলাফেরা অনেকটা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। চিকিৎসকেরা সেজন্যে একটা সহজ বহনযোগ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম জটিল যন্ত্রের সন্ধান করতে থাকেন এবং ক্ষুদ্রাকারের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহারের সুবিধার কথা তাঁদের মনে উদিত হয়।

গৃহিণীরা যে ধরণের ক্ষুদ্র ক্লিনার নিজেদের ঘরে ব্যবহার করেন, এই জিনিষটিও সেই রকমের; কিন্তু চিকিৎসকেরা এই ক্লিনারকে যেভাবে কার্যোপ-যোগী করেছেন, তার ওজন ৫ পাউণ্ড মাত্র। সহজ বহনযোগ্য 'ব্রিদিং এইড' হিসাবে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁরা এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

যন্ত্রটিকে ব্লোয়ার হিসাবে ব্যবহার করবার জন্যে তাঁরা এর কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এর ধাতব প্লেটের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ½ ইঞ্চি ব্যাসের প্লাষ্টিক টিউব, যার শেষের দিকটা যোগ করা হয় ৪ ইঞ্চি লম্বা একটি ধাতব টিউবের সঙ্গে। এই ধাতব টিউবের শেষ প্রান্তে থাকে ৩ ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাষ্টিক টিউব।

মাউথ-পিস থাকে রোগীর দাঁতের মধ্যে আট্‌কানো। যন্ত্রটি চালিত হলে ফুস্‌ফুস প্রয়োজন-মত বাতাস গ্রহণ করতে পারে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলতে থাকে। রোগী তার ইচ্ছামত বাতাস গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনমত জিনিষটিকে ব্যবহার করতে পারে।

যন্ত্রটিকে বহন করবার জন্যে আছে একটা চাকাযুক্ত চেয়ার—প্রয়োজন হলে সেটাকে হাতে করেও নিয়ে যাওয়া চলে। এর ফলে রোগীদের পক্ষে দূরের পথে কোথাও যাওয়া আজ সম্ভব হয়েছে যা আগে কখনও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এর ফলে রোগীদের মনের বলও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবুজ পাতা থেকে প্রোটিন সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি

সবুজ পাতা থেকে প্রোটিন সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে শীলা ও'কালাঘান লিখেছেন—আজকাল খাদ্য সম্বন্ধে সবাই সচেতন। সবাই জানে যে, শরীর গঠনের জন্যে প্রোটিনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তারা এও জানে যে—মাংস, দুধ, মাছ এবং বাদাম থেকে এই প্রোটিন গ্রহণ ব্যয়সাপেক্ষ।

এর কারণ হলো, সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা বৃদ্ধি। গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলিতে এবং অন্যান্য অনুন্নত জনবহুল এলাকায় পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এই সব দেশে জনসাধারণের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব আজ সবচেয়ে বেশী।

অতএব কি করা উচিত? বৃটেনে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন যাবৎ এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। এখন তাঁরা এর প্রতীকারের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী বি. আর. সেন সম্প্রতি বৃটেনে এসে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ঘানার গভর্ণমেণ্টও এ-সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। অন্যান্য দেশেও এ-সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সবুজ পাতা থেকে সরাসরি প্রোটিন নিষ্কাশন করে প্রোটিন সংক্রান্ত এই সমস্যা দূর করবার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রোটিন আবার অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৃটেনের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত রথামস্টেড পরীক্ষা কেন্দ্রে মিঃ পিরির অধীনে এ-সম্পর্কে পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কেন্দ্রটি ১৮৪৩ সালে যখন বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আর কোথাও এই ধরণের পরীক্ষাগার ছিল না। মিঃ পিরি নিজেও একজন বিশিষ্ট প্ল্যাণ্ট বায়োকেমিষ্ট।

মিঃ পিরি সবুজ গাছপালা থেকে প্রোটিন সংগ্রহের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে কাজ আরম্ভ করেন। তার ফলে তৈরী হয় প্রোটিন যন্ত্র। তিনি নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরা ক্রমান্বয়ে নানারকম ডিজাইনের মধ্য দিয়ে এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন।

কারও কারও হয়তো মনে হবে, আমরা যথেষ্ট সবুজ সব্জি খেয়ে থাকি; অতএব নূতন করে প্রোটিন গ্রহণের প্রয়োজন কি? কিন্তু কথা হলো, যেটুকু সব্জি আমরা পেতে পারি তা কখনই যথেষ্ট নয়। প্রোটিনের জন্যে আরও অনেক বেশী সব্জি খাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু অতিমাত্রায় সব্জী খাওয়া একমাত্র রোমন্থনকারী জন্তুদের পক্ষেই সম্ভব; কারণ তাদের পরিপাক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

প্রোটিন যন্ত্র এখন মানুষের জন্যে এই কাজ করবে। তবে কথা হলো এই যে, এই যন্ত্রের জন্যে একেবারে তাজা সবুজ উদ্ভিদের প্রয়োজন। শুকনো পাতা বা গাছ থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিনের পরিমাণ অনেক কম হয়।

এই কারণেই রথামস্টেডে এমন সব যন্ত্র নিয়ে কাজ হচ্ছে, যা যে-কোন স্থানে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। এই যন্ত্র চালাবার জন্যে যা প্রয়োজন হবে, তা হলো একমাত্র বিদ্যুৎ-শক্তি। এই যন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে এখন সাহায্য করছেন রকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং কৃষি গবেষণা পরিষদ।

এই যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বুঝতে হলে একটা কথা জানা দরকার এই যে, সবুজ পাতা তাজা হোক, কি শুকনো হোক, যা গবাদি পশু উদরসাৎ করে তার 'এণ্ড প্রোডাক্ট' বা চরম পরিণতি হলো মাংস। এদের প্রোটিনের পরিমাণ হলো শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ মাত্র। সেজন্যে একটা ১৫০ পাউণ্ড ওজনের পশুর প্রোটিনের পরিমাণ হলো প্রায় ১৫ থেকে ৩০ পাউণ্ডের মধ্যে। এই প্রোটিন

আবার কিছুটা নষ্ট হয়ে যায় রান্নার জন্যে। পশু-খাদ্য উৎপাদনের সময় এবং পশুর এই খাদ্যকে ১৫ থেকে ৩০ পাউণ্ড প্রোটিনে রূপান্তরিত করবার সময়ের কথাও এই সঙ্গে বিচার করে দেখা দরকার।

একটা ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ২০ টন সবুজ শস্য নিয়ে (রাই, গম, জই কিংবা যব) কাজ করলে 'এণ্ড প্রোডাক্ট' উৎপাদন করতে পারবে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড; যার প্রোটিনের পরিমাণ হবে শতকরা ১০০ ভাগ। এ ছাড়া ছাটাই হিসাবে যা বাদ যাবে তার পরিমাণ হবে ১০০ পাউণ্ড এবং তা পশু-খাদ্য হিসাবে আবার ব্যবহৃত হতে পারবে।

এই সবুজ পাতা বা শস্য নিষ্পেষণ করে বের করা হয় গাঢ় সবুজ রস। অপক্ব শস্যের ক্ষেত্রে এই রসের পরিমাণ হয় গাছের প্রোটিনের পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ। ছেঁকে পরিষ্কার করবার পর এই রস ৮০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। এতে প্রোটিন জমাট বেঁধে যায়। জমাট বাঁধবার পর, দই বা ঘোল থেকে যেমন করে মাখন বের করে নেওয়া হয়, সেভাবেই তা বের করা হয়। এই জমাট পদার্থটিকে তারপর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়।

এই প্রোটিনকে এখন গুঁড়া করে ব্যবহার করবার চিন্তা করা হচ্ছে, যাতে মশলার মত করে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। রোথামস্টেডের লেবরেটরীতে এই প্রোটিন চূর্ণ নিয়ে কাজ হচ্ছে। খাদ্যের সঙ্গে সেগুলি কি পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে, তাই নিয়ে সেখানে এখন ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চলেছে। খাদ্য-বিজ্ঞানী মিঃ মরিসন এই পরীক্ষা-কার্য পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষ পালন উপলক্ষে বিজ্ঞানীরা যে সব বিষয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিষয় পর্যালোচনাতেই সর্বাধিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমেরিকার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর মহাকাশ-বিজ্ঞান বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ লয়েড বি. বার্কনার এই অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমানে উর্ধ্বলোকের বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য, বায়ুপ্রবাহ এবং বায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে ঋতু ও আবহাওয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

সমগ্র পৃথিবীকে একই সময়ে দেখা অথবা সে সম্পর্কে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এজন্যে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ-পালন উপলক্ষে অন্তরীক্ষমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই সব ঘাঁটির মধ্যে ছিল যথেষ্ট ব্যবধান। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যসমূহ একই সময়ে সংগৃহীত হয়েছে। এই সব তথ্য একত্র করেই সমগ্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা হয়েছে। পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বায়ুমণ্ডল ২৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এভাবে পর্যালোচনার ফলে জানা গেছে যে, বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উর্ধে ৩০ হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, ২৮০ মাইল পর্যন্ত নয়।

এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। আর একটি আবিষ্কার হলো—পৃথিবী যে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই স্থানটি একেবারে শূন্য নয়। ঐ সব স্থান একরকম পাত্‌লা গ্যাসে পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, এটি হলো সৌরমণ্ডলের বহির্দেশেরই একটি অংশ।

অন্তরীক্ষমণ্ডল সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য

সংগ্রহের ব্যাপারে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ সর্বাধিক সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বছরে এ-সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায় চারশো রকেট ছাড়া হয়েছিল—অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এজন্যে প্রায় দু-শো রকেট ক্যানাডার ফোর্ট চার্চিল, নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্, ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানিকোলাস দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগর এবং কুমেরু মহা-সাগরস্থিত জাহাজ থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এসব রকেটে রাখা হয়েছিল ফটো কাউণ্টার, গাইগার কাউণ্টার, আয়োনিজেশন চেম্বার, মাস্-স্পেক্‌ট্রোমিটার, সোলার স্পেক্‌ট্রোগ্র্যাফ, ম্যাগ-নেটোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র। এসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে উর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

তবে তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করবার কাজ সবে মাত্র সুরু হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সংবাদ ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে পরিবেশন করা হয়েছে। ঐ সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে উর্ধ্বলোকের বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপ, ঘনত্ব এবং বাতাসের গতির পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কেও এই প্রথম রকেটের সাহায্যে তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। সূর্যের চারদিকের বিচিত্র বর্ণের বলয় থেকেই যে সোলার এক্স-রে বা অজ্ঞাত সৌররশ্মি উদ্ভূত হয়ে থাকে, তার নিশ্চিত প্রমাণ এই গবেষণার ফলে পাওয়া গেছে। সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ ব্যতীত এই সৌর-বলয় সম্পর্কে কোন রকম তথ্যানুসন্ধান সম্ভব নয়।

এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভূ-চৌম্বক অক্ষাংশে অবস্থিত বিভিন্ন উচ্চ স্থান থেকে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ নির্ণয়েরও চেষ্টা হয়েছে। সোলার এক্স-রেই এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। এই অজ্ঞাত রশ্মিই হলো মহাশূন্যের বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। আর সৌরকলঙ্ক ও সৌরঝটিকা যখন প্রচণ্ডরূপে দেখা দেয় তখন এই বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাণে বেড়ে যায় এবং বেতার-তরঙ্গ তা অতিক্রম করে আসতে পারে না।

মহাশূন্যের ভ্যান অ্যালেন তেজস্ক্রিয় বলয়ও এই সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। আইওয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ জেম্‌স্ এ ভ্যান অ্যালেনের নামেই এই দুটি বলয়ের নামকরণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আজ পর্যন্ত যে সব রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে, সে সব রকেট ও উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান নেবার ভার তাঁরই উপর অর্পিত হয়েছিল।

এই বলয়ের মধ্যে একটি পৃথিবীর উর্ধ্বে ১৪০০ মাইল থেকে ৩৪০০ মাইলের মধ্যে এবং আর একটি ৮০০০ থেকে ১২০০০ মাইলের মধ্যে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় পায়োনিয়ার রকেটের সাহায্যেই এই তেজস্ক্রিয় বলয় সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সূর্য থেকে যে হাইড্রোজেন গ্যাস বের হয়ে থাকে, তার বিদ্যুতান্বিত কণাসমূহই এই তেজস্ক্রিয়তার কারণ। সূর্য থেকে বের হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে-পড়া এই সব কণা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে এই ভাবে দেখা দেয়।

অন্তরীক্ষমণ্ডলের ঘনত্ব সম্পর্কেও কৃত্রিম উপ-গ্রহের সাহায্যে বহু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। উর্ধ্বাকাশের অন্তরীক্ষমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে উপগ্রহসমূহ ঘনত্বের যে বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, উর্ধ্বাকাশের ঘনত্ব সম্পর্কে পূর্বে যে ধারণা ছিল তার তুলনায় অন্তরীক্ষমণ্ডলের ঘনত্ব দশগুণ বেশী। সুতরাং ঐ স্থানের তাপ সম্পর্কে

পূর্বে যে ধারণা ছিল, তার তুলনায় তাপও যে অনেক বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর ম্যাগ্‌নেটিক ইকোয়েটর বা ভূ-চৌম্বক নিরক্ষবৃত্তের উপরস্থিত মহাশূন্যে পৃথিবীকে ঘিরে এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ রয়েছে, তাকে বলা হয় ইলেকট্রোজেট। এই ইলেকট্রোজেট সম্পর্কেও বহু নতুন তথ্য এ-সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ঐ ধরণের যে বিদ্যুৎপ্রবাহ রয়েছে, এই নিরক্ষীয় ইলেকট্রোজেট তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কেন যে ঘটে, তার নিশ্চিত কারণ পূর্বে জানা ছিল না।

তেজস্ক্রিয় বলয় সম্পর্কে নূতন তথ্য

সম্প্রতি মহাশূন্যে যে দুইটি তেজস্ক্রিয় বলয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবার ফলে বহু নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভ্যান অ্যালেন তেজস্ক্রিয় বলয় নামে খ্যাত এই দুইটির মধ্যে ঊর্ধ্বস্তরের বলয়টির উৎস সম্পর্কে মার্কিন বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—ইহার মূলে আছে সূর্য। সূর্যের উত্তপ্ত গ্যাস পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়। ফলে বহির্বলয়ে তীব্র তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়।

নিম্নস্তরের বা অন্তর্বলয়ের উৎস যে কোথায়, তাহা আজও নির্ধারিত হয় নাই। কোন কোন বিজ্ঞানী ইহার মূলে শক্তিশালী সৌর গ্যাস আছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, মহাজাগতিক রশ্মিই ইহার কারণ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিকোলাস সি. ক্রস্টোফাইল্‌স্‌ মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত মতবাদ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহার অভিমত অনুসারেই গত গ্রীষ্মকালে মহাশূন্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত "আরগান পরিকল্পনা" গ্রহণ করা হইয়াছিল।

তাঁহার ধারণা, শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মিকণা বা কস্‌মিক-রে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে আসিয়া আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে নিউট্রন কণা উৎপন্ন হয়। ইহা পরে পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রন ও প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানীরা ইহাকে "বিটা ডিকে" প্রক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন পরমাণুর বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট অংশের কতক কতক পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া আট্‌কা পড়িয়া যায়। এই মতানুসারে পরমাণুর এই সকল অংশ, অর্থাৎ ইলেকট্রন, প্রোটনই অন্তর্বলয় সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মহাশূন্যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন যে দুইটি বলয় রহিয়াছে, তাহাদের উপাদান, গঠন ও উৎস নিরূপণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার উদ্যোগে ওয়াশিংটনে দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে বিশিষ্ট মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ সূর্য এবং কেহ কেহ মহাজাগতিক-রশ্মিই এই বলয়ের মূলে রহিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সংস্থার তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান ডাঃ রবার্ট জ্যাস্ট্রো বলেন যে, বহির্বলয়ের উৎস যে সূর্য, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত হইয়াছেন।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ চতুর্থ পায়োনিয়ার ও এক্সপ্লোরারের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব এবং ইহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাশূন্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই সকল কৃত্রিম উপগ্রহ ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেম্‌স্‌ এ ভ্যান অ্যালেন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেরিত যন্ত্র-

পাত্তির সাহায্যে এই দুইটি বলয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করায় তাঁহারই নামে ইহাদের নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্তর্বলয়টি পৃথিবীর উর্ধ্বে ১৪০০ মাইল হইতে ৩৪০০ মাইলের মধ্যে এবং বহির্বলয়টি ৮০০০ মাইল হইতে ১২০০০ মাইলের মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বিগত ৩রা মার্চ কৃত্রিম উপগ্রহ চতুর্থ পায়োনিয়ার মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। ডাঃ জ্যাস্ট্রো বলেন যে, এই উপগ্রহের সাহায্যে, সূর্যই যে বহির্বলয়ের উৎস, তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পায়োনিয়ার পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র ছাড়াইয়া সূর্যের কক্ষপথে গিয়া পৌঁছায় এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করিবার জন্য যে সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয়ে পৃথিবীতে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়।

ডাঃ জ্যাস্ট্রো বলেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি অন্তর্বলয়ের উৎস কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত নহেন। তবে মিঃ নিকোলাস সি. ক্রস্টোফাইল্‌স্ বলেন যে, মহাজাগতিক রশ্মিই ইহার কারণ। এই গ্রীক বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতেছেন। মহাশূন্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে সম্পর্কে ১৯৫৭ সালে তিনি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উর্ধ্বাকাশে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী ইলেক্ট্রনের সাময়িক অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দেন।

তাঁহার এই অভিমত সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে "আরগান পরিকল্পনা" নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে মহাশূন্যে তিনবার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই গবেষণায় ক্রস্টোফাইল্‌সের মতই সমর্থিত হয়। তিনি ভ্যান অ্যালেন বলয় দুইটির মাঝখানে বৈদ্যুতিক শক্তিকণার আর একটি কৃত্রিম বলয় সৃষ্টি করিতেও সক্ষম হন।

ভ্যান অ্যালেন বলয় সম্পর্কে ডাঃ জ্যাস্ট্রো বলেন যে, চতুর্থ পায়োনিয়ারের সাহায্যে অন্তর্বলয়ে শক্তিশালী কঠিন বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা যে প্রোটন কণা তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বলয়ে ইলেকট্রনও রহিয়াছে, তবে প্রোটনের তুলনায় ইহারা পরিমাণে অনেক কম।

বহির্বলয় সম্পর্কে ডাঃ জ্যাস্ট্রো বলেন যে, ইহা যে নরম ধরণের কোন উপাদান দ্বারা গঠিত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, ইহা সম্ভবতঃ ৫০,০০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন কণা দ্বারা গঠিত। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন শক্ত ধরণের উপাদানও ঐ বলয়ে আছে। তবে তাহা ৬ লক্ষ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন অথবা ১০ কোটি ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটন কিনা—তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৫৯

১২শ বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা

হাঁস-মুরগী প্রভৃতি কক্সিডিওসিস্ নামে একপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। এই রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা উৎপাদনের জন্যে সম্প্রতি মিনিপোলিজের (মিনেসোটা) নিউট্রেনা মিল্‌স্-এর গবেষকগণ নতুন এক রকম ভ্যাক্‌সিন তৈরী করেছেন। এই ভ্যাক্‌সিন পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো হয়। এই ভ্যাক্‌সিন ব্যবহারের ফলে ঐ রোগে হাঁস-মুরগীর মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে। ছবিতে এই ভ্যাক্‌সিন প্রয়োগের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

অক্টোপাস

একটু কল্পনা করা যাক—সমুদ্রের গভীরে এক নির্ভীক ডুবুরী আবিষ্কারের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—আশেপাশে বিচিত্র জলজ প্রাণীর দল ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। অবশ্য যারা ভয় পাবার নয় তারা আক্রমণ করছে ডুবুরীকে, আর সে লোকটিকে লড়তে হচ্ছে তাদের সঙ্গে। এমন সময় হঠাৎ ডুবুরী শুনতে পায়—জলের মধ্যে একটা শোঁ শোঁ শব্দ। বিচক্ষণ ডুবুরীর সন্দেহ হয়—চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে—আর যখনই চোখে পড়ে, আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে! দুটা জ্বলন্ত চোখ আর আটটা পাওয়ালা কি একটা

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় চুপ করে আছে।

তীরের মত ছুটে আসছে! সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলের মধ্য দিয়ে ডুবুরী পরিষ্কার দেখতে পায়, সে জীবের মুখ থেকে তীব্রবেগে বেরুচ্ছে সমুদ্রেরই জল, আর তার গতিপথের পিছনে পড়ে থাকছে সাদা ফেনায় ভরা একটা সরল সামুদ্রিক রেখা। দুটা জ্বলন্ত চোখ আর আটটা পা—এই নিয়ে অক্টোপাস, সমুদ্রের আতঙ্ক। এই অদ্ভুত জীবের নামটা তার ঐ আটটা পায়ের জন্মেই।

ঐ যে পায়ের কথা বললাম, সেটা কিন্তু সাধারণ পা নয়। মুখের চারদিকে বৃত্তাকারে সাজানো থাকে সে পা-গুলি, আর তাদের গায়ে থাকে ছোট ছোট অজস্র গর্ত। পায়ের এই গর্তগুলি কি করে অক্টোপাসকে শিকার ধরতে সাহায্য করে, তা

পরে বলছি। পা-গুলি দৈর্ঘ্যে তিন ফুট থেকে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। তাদের স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত প্রখর।

অক্টোপাস কিন্তু মাছের মত সাঁতার কাটে না। যদিও আটটা পায়ে সাঁতার কাটতে তাদের খুব সুবিধাই হতো, কিন্তু তাতে সে তীরের মত প্রচণ্ড গতিটি পেত না। তাদের সমুদ্রে বিচরণের পদ্ধতিটা একটু বিচিত্র। মুখের কাছে ছোট একটা নলের মত আছে। যখন ছুটে যাবার দরকার হয় তখন সেই নল দিয়ে সমুদ্রের জল শরীরের ভিতরে টেনে নেয়। তার পরক্ষণেই সে জল বিপুল বেগে আবার সেই পথেই বের করে দিয়ে একটা প্রচণ্ড গতি সে পেয়ে যায়। অক্টোপাস সমুদ্রের তলদেশে তার চারদিকে তীক্ষ্ণ

জলের তলায় অক্টোপাস একটা কাঁকড়াকে আক্রমণ করেছে।

দিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। দূর থেকে যখন শিকারের সন্ধান সে পায়, ধীরে ধীরে তখন সে পূর্বোক্ত নল দিয়ে শরীরের ভিতরে জল নেওয়া-দেওয়া করতে থাকে। প্রথমে ধীর গতিতে, পরে বুলেটের মত তীব্রগতিতে শিকারের দিকে এগুতে থাকে। ততক্ষণে নিরীহ শিকার বুঝতে পারে, সে যমের কবলে পড়ে গেছে। তবুও প্রাণের মায়ায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে অক্টোপাসের চোখে ধুলা দিতে চায়। কিন্তু অক্টোপাস ছাড়বে কেন? একটা লক্ষ্যে সরল রেখায় সে যেমন ছুটে যেতে পারে, আঁকাবাঁকা গতিপথে ছুটতেও তেমনি ওস্তাদ্। তার আটটা পা দিয়ে সে হালের কাজ

সারে—পা-গুলিকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বাঁকা পথে সে সহজেই ছুটতে পারে। তাই সে কখনো শিকারের পিছু ছাড়ে না। শেষে ক্লান্ত, মৃতপ্রায় শিকারকে শুঁড়ের মত পা দিয়ে মুখের কাছে টেনে নেয়। শিকার যদি শক্তিশালী হয়, অক্টোপাসের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করবেই। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যায়

অক্টোপাসের পিঠের দিকের দৃশ্য।

যখন সে দেখে অক্টোপাসের পা-গুলি শরীরের উপর আঠার মত এঁটে গেছে। আগেই বলেছি যে, পা-গুলিতে ছোট ছোট গর্ত থাকে। পা দিয়ে যখন শিকারকে জড়িয়ে ধরে, তখন সেই গর্তগুলি শক্ত হয়ে সেখানে এঁটে যায়। এই বজ্র আঁটুনি আর মরণ বাঁধন থেকে নিজেকে বাঁচাতে সমুদ্রের অনেক জীবই পারে না।

অক্টোপাস কিন্তু সমুদ্রের জলে নির্বিবাদে বিচরণ করবার সুযোগ পায় না। কারণ তার চেয়েও শক্তিশালী এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী জীবের অস্তিত্ব সমুদ্রে বিরল নয়। এসব

জীবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে অক্টোপাসের কতকগুলি অদ্ভুত পন্থা আছে। গিরগিটির মত অক্টোপাসও শরীরের রং বদ্‌লাতে পারে। যখন শত্রুরা আক্রমণ করে তখন আশেপাশের গাছপালা ও মাটির রঙের সঙ্গে সে নিজের রং মিলিয়ে দেয়। শত্রু কিছুটা বোকা বনে যায়, হয়তো সে যাত্রা অক্টোপাস বেঁচেও যায়। অক্টোপাসের শরীরের মধ্যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের মত একটা থলিতে কালো কালির মত পদার্থ ভরা থাকে। যখনই শত্রু তার পেছনে তাড়া করে, তখনই সে হঠাৎ সেই কালি সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দেয়—স্বচ্ছ নীল জল কালো হয়ে যায়—যেন রাত নেমে আসে সেখানে। আর সেই অন্ধকারে শত্রুর চোখে ধুলা দিয়ে অক্টোপাস পালিয়ে যায়।

অক্টোপাসের বুকের দিক দেখানো হয়েছে। মধ্যস্থলে পাখীর ঠোঁটের মত ঠোঁটটি দেখা যাচ্ছে।

এই বিচিত্র সামুদ্রিক জীব অক্টোপাস কতকাল ধরে পৃথিবীতে আছে, সেটা গবেষণার বিষয়। সবচেয়ে পুরনো অক্টোপাসের সন্ধান মিলেছে প্যালেষ্টাইনে। সেখান-

কার লেবানন পাহাড়ে একশ' বিশ কোটি বছরের পুরনো একটি অক্টোপাসের জীবাশ্ম* পাওয়া গেছে। সুতরাং অক্টোপাসের ইতিহাস খুব অল্পদিনের নয়। তারা আজও বেঁচে আছে—এদের বেঁচে থাকবার মূলে রয়েছে এদের অভিনব বুদ্ধি ও অপরিমেয় শক্তি। আর এরই জোরে তারা বেঁচে থাকবে সে দিনটি পর্যন্ত, যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মে আর সব লুপ্ত প্রাণীর মত তারাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

সুবিমল সিংহরায়

হাইড্রোজেন

যাবতীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেনই হলো সবচেয়ে সরল এবং লঘু। বিশ্বের সর্বত্র এই পদার্থই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য পৃথিবীতে এর ব্যতিক্রম আছে; সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। নক্ষত্রসমূহে যে সব পদার্থ আছে, তাদের শতাংশের নব্বই ভাগই হাইড্রোজেন। নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী অঞ্চলেও হাইড্রোজেনের পরিমাণ একই রকম হবে। আমাদের সূর্যের ভিতরেও অধিকাংশ পদার্থই হাইড্রোজেন।

কিন্তু পৃথিবীতে হাইড্রোজেন অতটা সহজপ্রাপ্য নয়। পৃথিবীর একেবারে বাইরের স্তরে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হবে শতাংশের তিন ভাগ মাত্র। পৃথিবীর ভিতরে এর পরিমাণ হবে আরও কম। কিন্তু উৎপত্তির সময় পৃথিবীর ভিতরের বস্তু বিশ্বের অন্যান্য অংশের বস্তুর অনুরূপই ছিল। কাজেই কালক্রমে পৃথিবীতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিচার করা দরকার। হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষুদ্রতাই এর কারণ। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হলে একটি হাইড্রোজেন অণু হয়। একটি হাইড্রোজেন অণু অন্য যে কোন পদার্থের অণুর চেয়ে ছোট—এমন কি, অন্য যে কোন পদার্থের একটি পরমাণুর চেয়েও ছোট।

যাবতীয় পদার্থের অণুই অবিরাম গতিশীল। কঠিন পদার্থে অণুগুলি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকলেও নিরন্তর কম্পিত হয়। তরল পদার্থে অণুগুলি আরও সহজভাবে চলাফেরা করে। বায়বীয় পদার্থে অণুর গতি আরও অবাধ। তাপমাত্রা যত বেশী হবে, অণুর গতিবেগও তত দ্রুত হবে। বড়র চেয়ে ছোট অণুই অধিকতর বেগে চলে। সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন-অণু প্রতি মিনিটে প্রায় সাত মাইল বেগে চলে।

কোন বস্তুর গতিবেগ যথেষ্ট দ্রুত হলে, সেটি পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে মহা-

* জীবাশ্ম জিনিষটা কি? বহুকালের পুরনো জীবজন্তুরা শিলাস্তরের ভাঁজে ভাঁজে চাপা পড়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেখানে তাদের দেহের ছাপ অথবা দেহের কোন কঠিন অংশ রেখে যায়, সেগুলিকেই বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম বলেন।

শূন্যে চলে যেতে পারে। যদি শূন্যে ঢিল ছোঁড়া যায়, তাহলে সেটি খানিকটা উঁচুতে উঠে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার নীচে এসে পড়বে। যদি ঢিলটি আরও জোরে ছোঁড়া যায় তাহলে সেটি আরও উঁচুতে উঠে তারপর নীচে পড়বে। যদি কামান থেকে গোলা ছোঁড়া যায়, তাহলে গোলাটি নীচে নেমে আসবার আগে কয়েক মাইল উপরে উঠে যাবে। এভাবে যদি কোন বস্তুর গতিবেগ খুব বেশী করা যায় তাহলে সেটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে একেবারে মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

হাইড্রোজেন-অণু এত দ্রুত চলাফেরা করে যে, তার পক্ষে পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করা খুবই সম্ভব। এই কারণেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পূর্বে যে সব হাইড্রোজেন-অণু ছিল তারা মহাশূন্যে চলে গেছে। পূর্বে পৃথিবী আরও উত্তপ্ত ছিল এবং হাইড্রোজেন-অণু তখন আরও ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরা করতো। কাজেই ঐ সময়ে হাইড্রোজেন-অণুর পক্ষে পৃথিবীর সীমা পার হয়ে যাওয়া আরও সহজ ছিল। সেজন্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এখন আর বেশী হাইড্রোজেন নেই। পৃথিবীতে এখনও যা সামান্য হাইড্রোজেন আছে, তা রয়েছে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে, অণুর আকারে।

হাইড্রোজেন-অণুর চেয়ে অক্সিজেন-অণু ষোল গুণ ভারী। অক্সিজেন-অণু আরও মন্থর গতিতে চলে—প্রতি মিনিটে প্রায় চার মাইল বেগে। কাজেই অক্সিজেন পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে না পেরে বায়ুমণ্ডলেই রয়ে গেছে। পৃথিবী যে সব পরমাণু দিয়ে গঠিত তাদের অর্ধেকই অক্সিজেন।

কয়েকটি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা বড় ও ভারী। কাজেই তাদের মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর চেয়ে আরও বেশী। এই সব গ্রহের সীমা লঙ্ঘন করতে হলে অণুর গতি আরও দ্রুততর হওয়া দরকার। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। এই গ্রহের হাইড্রোজেন-অণু পৃথিবীর হাইড্রোজেন-অণুর চেয়ে মন্থর গতিতে চলে। কারণ বৃহস্পতির উত্তাপ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং হাইড্রোজেন অণু এই গ্রহের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না। কাজেই বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে অনেক হাইড্রোজেন আছে। এসব কারণে শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে অনেক বেশী হাইড্রোজেন আছে।

যে সব গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা ছোট, তাদের অবস্থা এ-বিষয়ে আরও খারাপ। মঙ্গলগ্রহে মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর তুলনায় পাঁচ ভাগের দু'ভাগ মাত্র। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুবই পাত্‌লা, অধিকাংশই মহাশূন্যে বেরিয়ে গেছে। আমাদের চন্দ্র আরও ছোট। এখানে মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র। এখানে কোন বায়ুমণ্ডল নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাবতীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেনই সবচেয়ে হাল্‌কা। একটি সাধারণ ঘরে যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তার ওজন যদি হয় ১৫০ পাউণ্ড তবে বায়ুর পরিবর্তে সেই ঘরটি হাইড্রোজেনে পূর্ণ করলে সেই হাইড্রোজেনের ওজন হবে মাত্র দেড় পাউণ্ড। একটি হাল্‌কা থলি হাইড্রোজেনে পূর্ণ করে ছেড়ে দিলে সেটি বায়ুর উপরে উঠে যাবে। থলির তলায় পরিমিত ভার ঝুলিয়ে দিলে সেটি ভার সমেতই উঠে যাবে। থলিটি বড় হলে একটি মানুষই বহন করতে পারবে। যত উপরে ওঠা যায়, বায়ু ততই পাত্‌লা ও হাল্‌কা হয়। কাজেই থলিটি যতই উপরে উঠতে থাকবে, তার গতিও ততই মন্থর হবে। পরিশেষে থলিটি একেবারে থেমে যাবে এবং শূন্যে ভাসতে থাকবে। যদি থলি থেকে খানিকটা ভার ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা আবার উঠতে থাকবে। যদি খানিকটা হাইড্রোজেন ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা নামতে থাকবে। এই ভাবে বেলুন পরিচালনা করবার পরিকল্পনা হয়েছে। মোটর গাড়ী ও মোটর বোটের ন্যায় বেলুনও যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালনা করা যায়। ১৭৮৩ সাল থেকেই এরূপ বেলুনের প্রচলন হয়। ১৯০০ সালে জার্মেনীতে কাউণ্ট জেপ্‌লিনই সবচেয়ে কার্যকরী বেলুন-জাতীয় ব্যোমযান জেপ্‌লিন তৈরী করেন। এর আকৃতি ছিল সিগারের মত—৬।৭ শ' ফুট লম্বা এবং ৫০।৬০ ফুট ব্যাস। সিগারের আকারের অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামোর ভিতরে হাইড্রোজেনপূর্ণ কয়েকটি কুঠুরী রাখা হতো। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এরূপ ব্যোমযানের কদর ছিল। কিন্তু হাইড্রোজেনে আগুন লেগে বিস্ফোরণের ভয় ছিল। প্রকৃত পক্ষে, ১৯৩৭ সালের ৬ই মে সর্ববৃহৎ ব্যোমযান, হিণ্ডেনবার্গ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর এরোপ্লেনের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় বেলুন-জাতীয় ব্যোমযান বিশেষ কাজ ব্যতীত আর ব্যবহৃত হয় না।

অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হলে খানিকটা শক্তি (তাপ ও আলো রূপে) নির্গত হয়; অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সিজেন কিম্বা বায়ুতে প্রজ্জ্বলিত হলে অনুজ্জ্বল উত্তপ্ত নীল শিখা দেখতে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের শিখা শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি সিলিণ্ডার থেকে হাইড্রোজেন ও আরেকটি থেকে অক্সিজেন এক সঙ্গে মিলিত করে প্রজ্জ্বলিত করলে প্রচণ্ড উত্তপ্ত শিখা পাওয়া যায়। এই শিখাকে অক্সিহাইড্রোজেন টর্চ বলে। ছুরি দিয়ে যেরূপ মাখন কাটা যায়, এই শিখা দিয়ে ইস্পাতও সেরূপ সহজেই কাটা যায়।

তুলার বিচির তেল সস্তায় পাওয়া যায়; কিন্তু এই তেল রান্নার কাজে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু এই তেলের ভিতর বিশেষ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন খাওয়ানো হলে এটি একটি সাদা, স্বাদহীন, গন্ধহীন চর্বির ন্যায় কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। তখন তাকে ঘি-এর ন্যায় রান্নার কাজে ব্যবহার করা চলে। এই প্রক্রিয়াকে বলে হাইড্রোজেনেসন। এই প্রক্রিয়াতেই সস্তা তেল থেকে ভেজিটেবল বা বনস্পতি ঘি তৈরী হয়।

দুটি তার জলে নিমজ্জিত করে জল ও তার দুটির ভিতর দিয়ে বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে একটি তারের নিকট হাইড্রোজেন এবং আর একটি তারের নিকট অক্সিজেন জমা হবে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস। এই উপায়ে শিল্পে হাইড্রোজেন সরবরাহ করা হয়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কথা আমরা ভূগোলে পড়েছি। সেখানকার অনুচ্চ পাহাড়গুলিই এই মালভূমি সৃষ্টি করেছে। সত্যিই দাক্ষিণাত্যে গেলে যেটা সকলের চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে সমতল মাথার দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। পাহাড়গুলি প্রায় সবই একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ শিলার দ্বারা গঠিত। ভূবিদেরা এই শিলার নাম দিয়েছেন ব্যাসাল্ট। দাক্ষিণাত্যের প্রায় ২,০০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে এই শিলা বিস্তৃত। এর বিশাল বিস্তার ও সৃষ্টি অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বিষয়। স্বভাবতঃই এই পাহাড়গুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগে। কেমন করে এবং কখন এই পাহাড়গুলির সৃষ্টি হয়েছে? মানুষের এই জিজ্ঞাসার কাছে পৃথিবী তার সব রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়েছে। রহস্যোদ্ঘাটন করে ভূবিদেরা যা জানিয়েছে, সেও এক বিস্ময়কর কাহিনী।

সে আজ প্রায় ৬ কোটি বছর আগের কথা—পৃথিবীতে তখন এক প্রবল আলোড়ন চলছিল। পৃথিবীতে পূর্বেও এ-রকম আলোড়ন এসেছে। তবে প্রাবল্যের কথা বিচার করতে গেলে হয়তো ৬ কোটি বছর আগের আলোড়ন অনেক উঁচুতে স্থান পাবে। এই আলোড়নের ঢেউই বিশাল হিমালয় ও অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার সৃষ্টি করেছিল—নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল টেথিস মহাসাগর। প্রকৃতির এই ভাঙ্গাগড়ার খেলায় পৃথিবী এক নতুন রূপ নিল। ভীষণ আকৃতির ডাইনোসোরেরা এই আলোড়নের ঢেউ সইতে পারলো না। ফলে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। অমেরুদণ্ডী অ্যামেনাইটেরাও রেহাই পেল না। ক্রিটেসাস যুগের (অর্থাৎ ১১ কোটি বছর ও ৬ কোটি বছর পূর্বের মধ্যকালীন যুগ) পাললিক শিলায় রেখে গেল তাদের শেষ চিহ্ন। বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি ফুসিয়ে উঠলো পৃথিবী জুড়ে। ভূত্বকে সৃষ্টি হলো অজস্র বিরাট ফাটলের। আর সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে ব্যাসাল্টের উদ্গীরণ পৃথিবীর ত্বক ঝল্‌সে দিল। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এর স্বাক্ষর রয়েছে।

অনেকেই অনুমান করেন যে, দক্ষিণ ভারত এক সময়ে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ক্রিটেসাস যুগের পূর্বোল্লিখিত আলোড়নে গণ্ডোয়ানা মহাদেশেও ভাঙ্গন ধরেছিল। এই কথা কি এখন কেউ কল্পনা করতে পারে যে—অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-ভারত, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা একদা একত্র থেকে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল? এই আলোড়ন শুধু মহাদেশগুলিকেই বিচ্ছিন্ন করে নি ডুবিয়ে দিয়েছে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অনেক অংশ মহাসাগরের মহাগহ্বরে।

ভূবিদেরা অনুমান করেন যে, গণ্ডোয়ানা মহাদেশের এই ভাঙ্গন দক্ষিণ ভারতে অনেক দীর্ঘ ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। ফাটল দিয়ে নির্গত ব্যাসাল্ট শিলার লেলিহান শিখার সাক্ষী ছিল ডাইনোসোরেরা। ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির এটাও একটা কারণ হতে পারে। ব্যাসাল্টের সবিরাম উদ্গীরণ চলেছিল প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে। বিরামের সময় এখনকার মত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল। উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবাশ্ম এটা প্রমাণ করেছে।

দীর্ঘকালব্যাপী এই ব্যাসাল্ট-প্রবাহ দক্ষিণ ভারতের অনেকটাই অধিকার করেছিল, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক ক্ষয়সাধনে এর অনেকটা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আর ব্যাসাল্ট শিলার পাহাড়গুলিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কেউ কি বলতে পারে যে, এই শিলাস্তর গণ্ডোয়ানা যুগের অনেক কয়লাস্তর ও আর্কিয়ান যুগের প্রচুর খনিজ সম্পদ নিজের গহ্বরে লুকিয়ে রাখে নি?

আজ দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্ন সমতল মাথার পাহারগুলিকে দেখলে সাধারণ লোকের মনে হয়তো কবিত্ব জাগতে পারে, কিন্তু ভূবিদের চোখে পাহাড়গুলি অতীত যুগের প্রকৃতির এক রুদ্র রূপের আগ্নেয় স্বাক্ষর।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুহুরী

জানবার কথা

১। আমাদের বাড়ীঘরের দেয়ালে যে সব টিক্‌টিকি দেখা যায়, সেগুলি আকৃতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় বৃহদাকৃতির টিক্‌টিকি দেখা যায়—তাদের বলা হয় কমোডো মনিটর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকৃতির টিক্‌টিকি। টিক্‌টিকি বলা হলেও আসলে কিন্তু এরা গোধিকা বা গোসাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এরা সাধারণতঃ দশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। কোন কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতে, প্রাচীন প্রাচ্য চিত্রশিল্পে

যেসব ড্রাগনের ছবি দেখা যায়—কমোডো মনিটর হয়তো অনেকটা তাদেরই অনুরূপ

১নং চিত্র

মনে হয়।

২। অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত গ্রেট-বেরিয়ার রীফের কথা হয়তো অনেকেই শুনেছ। গ্রেট বেরিয়ার রীফ-ই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবাল বেষ্টনী—দৈর্ঘ্য ১২৫০ মাইল। অসংখ্য কোটি সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক প্রাণী কর্তৃক তিলে তিলে সঞ্চিত চূণাপাথর

২নং চিত্র

স্তরীভূত হয়ে গ্রেট বেরিয়ায় রীফ গঠিত হয়েছে। এই প্রবাল বেষ্টনীর অনেক অংশে আজও মানুষ যেতে পারে নি।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সম্প্রতি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড আবহাওয়া-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেঘ এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর সূর্যালোকের প্রতিফলন

লিপিবদ্ধ করে বিশেষ ব্যবস্থায় সেগুলি পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
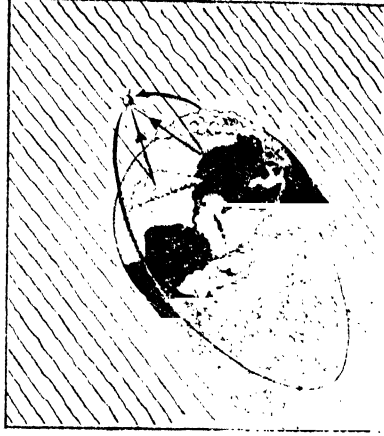
৩নং চিত্র

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সূর্যালোকিত পৃষ্ঠের উপরিভাগে মেঘের শতকরা ২৫ ভাগ সম্বন্ধে ৩০০ মাইল দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ চিত্রের সাহায্য জানা যাবে।

৪। সি-অ্যানিমোন নামে এক জাতীয় সামুদ্রিক জীব সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। এদের দেহ খুব অপল্‌কা, অর্থাৎ চলাফেরা করবার সময় এদের দেহ থেকে

৪নং চিত্র

টুক্‌রা টুক্‌রা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছনে পড়ে থাকে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, ঐ টুক্‌রাগুলি আবার পূর্ণাঙ্গ সি-অ্যানিমোনে পরিণত হয়।

৫। অষ্ট্রেলিয়াতে র‍্যাঞ্চিং পরিবারের এক এক দল তাদের নিকটতম প্রতিবেশী পরিবার থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দূরে বাস করে থাকে। এদের ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শিখবার পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। বেতার এবং ডাক-এর সাহায্যে এরা স্কুলের লেখা-পড়া শিখে থাকে। এদের কারো কঠিন অসুখ হলে চিকিৎসক

বিমানে করে রোগী দেখতে আসেন। সাধারণ ব্যাধিতে কেউ আক্রান্ত হলে চিকিৎসকগণ বেতারের মাধ্যমে ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র দেন। আবার কোন কোন পরিবারের লোকেরা
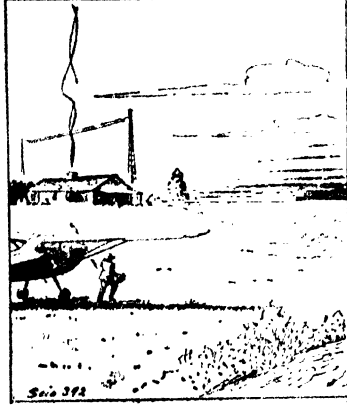
৫নং চিত্র

অসুখের সময় রোগের লক্ষণসমূহ তাদের পারিবারিক চিকিৎসার নিয়মাবলীর স মিলিয়ে রোগীর ওষুধ নির্ধারণ করে।

৬। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উর্ধ্বাকা কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন—কৃত্রিম উপ ভ্যানগার্ডের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা কয়েক বছরের মধ্যে আবহাওয়া সম্প
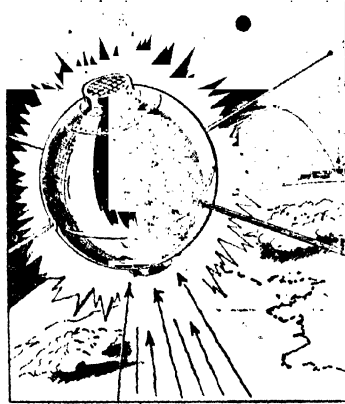
৬নং চিত্র

পূর্বাপেক্ষা উন্নততর ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এমন দিন হয়তো আসবে—যখন বিজ্ঞানীরা আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে পারবেন। আবহাওয়া সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়ে থাকে তার শতকরা দশ ভাগেরও যদি উন্নতি সাধিত হয়—তাহলে পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হবে।

৭। বিজ্ঞানীদের মতে, যে সব প্রাণী উড়তে পারে—তাদের মধ্যে কীট-পতঙ্গই উড্ডয়ন ক্ষমতায় সুদক্ষ। ২০০ মিলিয়ন বছর ধরে কীট-পতঙ্গ বাতাসের উপর ওড়বার ক্ষমতা অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, উড্ডয়নক্ষম জীবদের মধ্যে কীট-পতঙ্গই প্রথম ওড়বার কৌশল আয়ত্ত করেছে। বাহুড়, পাখী প্রভৃতি উড্ডয়নক্ষম প্রাণীরা

৭নং চিত্র

এদের কাছে ওড়বার পাল্লায় হেরে যায়। কোন কোন বিষয়ে এদের ওড়বার কৌশল উড়ো-জাহাজ অপেক্ষা অনেক উন্নত। একটা এরোপ্লেন দ্রুতবেগে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে বটে, কিন্তু মজার কথা হলো—সাধারণ একটা ঘরো মাছি উড্ডয়ন কৌশল একটা জেট-বিমানকে হারিয়ে দিতে পারে।

৮। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের সর্বাধুনিক মডেলের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবো-
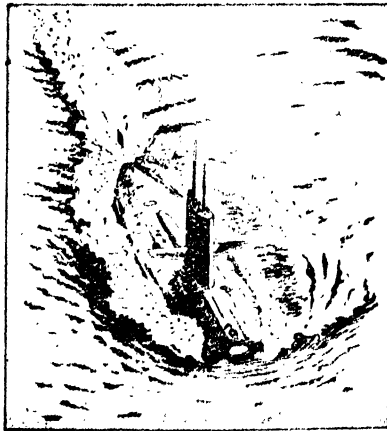
৮নং চিত্র

জাহাজ 'স্কিপজ্যাক' ঘণ্টায় ৪৬ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে একটি নতুন রেকর্ড

স্থাপন করেছে। ১ ঘণ্টায় এত মাইল এর আগে আর কোন ডুবো-জাহাজ বা সাবমেরিন অতিক্রম করতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্রের আরও দুটি পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবো-জাহাজ 'নটিলাস' এবং 'স্কেট' উত্তর মহাসাগরের ভাসমান তুষার শৈলের তলা দিয়ে সর্বপ্রথম উত্তর মেরুতে পৌঁচেছিল।

৯। বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূত্বকের নীচের উত্তাপ এত বেশী যে, লোহা পর্যন্ত গলে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। এ-থেকেই ভূত্বকের নীচেকার উত্তাপের তীব্রতা অনুমান করা যায়। আবার ভূত্বকের অভ্যন্তরে চাপও তেমনি প্রচণ্ড। এই চাপের মাত্রা এতই
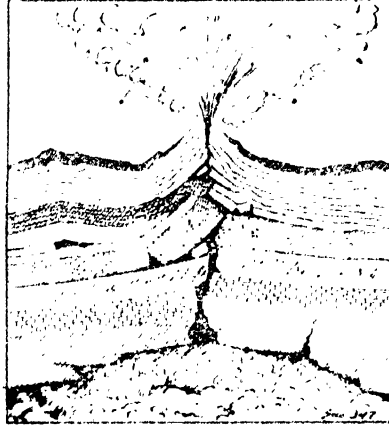
৯নং চিত্র

প্রচণ্ড যে, শিলাস্তরের তাপ গলনাঙ্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে সেগুলিকে কাচের মত ঘনত্বে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে এই প্রচণ্ড চাপের ফলেই ভূত্বকের কোন কোন অংশ বিদীর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

১০নং চিত্র

১০। পৃথিবীতে অজস্র স্ফটিক বা কোয়ার্টজ্ আছে। আর এই স্ফটিকই হচ্ছে

পদ্মরাগমণি, বৈদূর্যমণি, অনিক্স প্রভৃতি মূল্যবান মণির উৎস। কোয়ার্টজ্ ব্যবহার করে নানারকম কৃত্রিম মূল্যবান মণি প্রস্তুত করা যায়। চার ভাগ স্ফটিক, পাঁচ ভাগ রেড লেড, এক ভাগ পটাসিয়াম কার্বনেট মিশ্রণকে উত্তাপে গলিয়ে তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করলে ঐ গলিত পদার্থ জমাট বেঁধে হীরকে পরিণত হয়। আবার চুণী বা নীলা পাথর প্রস্তুত করতে হলে পূর্বোক্ত মশলার সঙ্গে উপযুক্ত রঞ্জক দ্রব্য যোগ করতে হয়।

১১। ক্রাকাতোয়া দ্বীপের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। দ্বীপটি জাভার নিকটে অবস্থিত। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎপন্ন হয়েছে বলে একে আগ্নেয় দ্বীপ বলা হয়। ১৮৮৩ সালে এই দ্বীপে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আন্দোলিত সমুদ্রের ঢেউ মাঝে মাঝে ৮০ ফুট উঁচু হয়ে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল। এই

১১নং চিত্র

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হয়েছিল তা ২০০০ মাইল দূরে অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়া থেকেও শোনা গিয়েছিল। এই শব্দই নাকি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভীষণ শব্দ হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে এত ধূলাবালি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, সেগুলি ভূপৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়তে প্রায় দু'বছরের মত সময় লেগেছিল।

১২। মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা—সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। এই গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা বলেছেন যে, পৃথিবীতে বাস করে এমন কোন কোন জীবের মঙ্গলগ্রহে অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। মঙ্গলগ্রহের বাতাস নাইট্রোজেন-পূর্ণ। বিজ্ঞানীরা নাইট্রোজেন-পূর্ণ কাচের জারের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক রেখে সেখানকার তাপমাত্রা হঠাৎ ৭৭° ডিগ্রি থেকে ১৩° ডিগ্রি ফারেনহাইটে নামিয়ে দেখলেন—যে সব জীবের বাঁচবার জন্যে অক্সিজেন প্রয়োজন, সেগুলি মরে গেছে—আর

যাদের খুব কম বা আদৌ অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না তারা বেঁচে আছে। তার

১২নং চিত্র

শুধু বাঁচেই না, রীতিমত দৈহিক পুষ্টিলাভ করে বৃদ্ধি পায়।

১৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় জন্তু দেখা যায়—যাদের আকৃতি খুবই অদ্ভুত। এই জন্তুকে বলা হয় ন্যু (Gnu)। এদের শরীর এবং পা-গুলি ঠিক

১৩নং চিত্র

হরিণের পায়ের মত দেখায়। মাথাটা দেখতে ঠিক ষাঁড়ের মাথার মত এবং লেজটা ঘোড়ার মত। এদের সমগ্র দেহটি কিন্তু দেখায় মেষের মত। আসলে কিন্তু এরা হরিণ জাতীয় প্রাণী। ন্যু আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে।

১৪। বাঁশের সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত। বাঁশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। এই বাঁশ আমাদের যে কত উপকারে লাগে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই বাঁশ বর্ষাতি, বিয়ার, মাছ ধরবার ছিপ, মোমবাতির পল্‌তে, চামচ, ছাতা, জলের নল,

পাখীর খাঁচা, তীর-ধনুক, দড়ি, বাঁশি, ঘুড়ি, বাড়ী, বিদা (Rake), গ্রামোফোনের পিন,

১১নং চিত্র

পাখা, খাদ্য, নানাবিধ যন্ত্রপাতি—প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুতের কাজে লাগে।

বিবিধ

কলিকাতা বন্দরের জন্য নূতন ড্রেজার

বৃটেনের একটি ফার্ম কলিকাতার পোর্ট কমিশনারের নিকট হইতে ৬৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একটি বাষ্প-চালিত বহু বাকেট সমন্বিত ড্রেজার সরবরাহের অর্ডার পাইয়াছেন।

ফার্মটি হইল স্কটল্যাণ্ডের ফ্লেমিং অ্যাণ্ড ফার্গুসন কোম্পানী। কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহিত ইহাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৮৯৪ সালে এই ফার্মটিই কলিকাতা বন্দরের জন্য প্রথম ড্রেজার নির্মাণ করিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসর পূর্বে সেই ড্রেজারটিকে চালু অবস্থাতেই কাজ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়।

ফ্লেমিং অ্যাণ্ড ফার্গুসন ১৯২১ সালে কলিকাতা বন্দরের জন্য যে আর একটি ড্রেজার সরবরাহ করেন, সেটি এখনও চালু আছে। নূতন ড্রেজারটি আসিলে উহাকে সরাইয়া লওয়া হইবে। নূতন ড্রেজারটির ডিজাইন প্রস্তুতের সময় হুগলী নদীর বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা হইয়াছে।

ড্রেজারটির দৈর্ঘ্য হইবে ১৮৪½ ফুট এবং প্রস্থ ৪৬ ফুট। ৫০ ফুট জলের তলা হইতে ইহা ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ টন মাটি কাটিয়া তুলিতে পারিবে। ইহার গতিবেগ হইবে ঘণ্টায় ১০ নট।

বর্তমানে কলিকাতা বন্দরে যে দুইটি ড্রেজার ব্যবহার করা হয়, তাহাদের মধ্যে একটি ঘণ্টায় ১৭০০ টন এবং অপরটি ঘণ্টায় ১২০০ টন মাটি কাটিয়া তুলিতে পারে।

বিহারে সোপস্টোনের সন্ধান

বিহারের সিংভূম জেলায় পাথর পাহাড়ে ৫০

ফুট গভীর সোপষ্টোনের একটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে মোট ৬০ লক্ষ টন সোপষ্টোন পাওয়া যাইতে পারে। গুণের দিক দিয়া উহা সুদানের সোপষ্টোনের সমান। ইহার দ্বারা অগ্নি-নিরোধক ইট তৈয়ার করা চলিবে।

বিহারের এই অঞ্চলে খৃষ্টের জন্মের ২ হাজার বৎসর পূর্ব হইতে তামা গলান হইত। বস্তুতঃ প্রায় ৩।৪ শত বৎসর ঐ শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভও করিয়াছিল। তখন তামা গলাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রুসিবল্ পাথর পাহাড়ের সোপষ্টোনের সাহায্যে তৈয়ার করা হইত। প্রাচীনকালে সেখানে যে সকল খনি খনন করা হইয়াছিল, তাহাদের নিদর্শন এখনও লুপ্ত হয় নাই।

বর্তমানেও সেখান হইতে অতি অল্প পরিমাণে সোপষ্টোন সংগ্রহ করিয়া উহার দ্বারা বিভিন্ন রকম পাত্র ও রান্নার বাসনপত্র নির্মাণ করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ঐ সকল দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

আকাশে-বাতাসে মরণভস্ম

পারমাণবিক শক্তি কমিশন, কংগ্রেসের পারমাণবিক বিকিরণ সাব-কমিটিকে জানাইয়াছে—বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এই পর্যন্ত যে সকল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, তাহার ফলে ৯ কোটি টন পারমাণবিক ভস্ম ভূপৃষ্ঠ ও আকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধেই ভস্মরাশি বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যে ভস্ম রহিয়াছে তাহা ১৯৬৫ সালের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসিবে।

কৃষিকার্যে পরমাণু

ইউরোপীয় প্রোডাক্টিভিটি এজেন্সির আনুকূল্যে ইউরোপীয় ১২টি দেশের কতিপয় বিজ্ঞানী বৃটেনে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় এবং বণ্টন ব্যবস্থায় পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

কৃষিকার্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে বৃটিশ গবেষণা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণু শক্তির এই উপজাত পদার্থ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং সেই সঙ্গে গমের চারাগুলিকে খর্ব করিবার কাজে ইহার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গমের চারাগুলিকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্য হইল, ঝড়-ঝাপ্টার হাত হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করা।

সারের সহিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করিয়া চারাগাছ কিভাবে সার গ্রহণ করে, কি ভাবে বড় হয় এবং কি ভাবে দেহের পুষ্টিসাধন করে, তাহা বোঝা সম্ভব হইয়াছে।

গামারশ্মির বিকিরণ কীট-পতঙ্গের উপদ্রব দূর করিয়া মজুত খাদ্যের ক্ষতি হ্রাস করিতে পারে, মজুত আলুর অঙ্কুরোদ্গম বিলম্বিত করিতে পারে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মাংস সংরক্ষণ করিতে পারে।

পারমাণবিক ঘড়ি

২৪-ঘণ্টার দিন ক্রমশঃ বড় হইতেছে। প্রতি শতকে তাহা এক শতাংশ করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। লণ্ডনের পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বৃটেনের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী—বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত গবেষণা-কেন্দ্র—সম্প্রতি এই তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠানটি এই সঙ্গে তাঁহাদের পারমাণবিক ঘড়ির সঠিক সময় দানের ক্ষমতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঘড়িটির উদ্ভাবক ডাঃ এল. এসেন (একজন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার)

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পোপভ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

পারমাণবিক ঘড়িটি বিশ্বের প্রথম সময় নির্দেশক যন্ত্র, যাহা পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহা পরমাণুর পৌনঃপুনিক স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা তিন শতকে এক সেকেণ্ড পর্যন্ত সঠিক সময় দানের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ডাঃ এসেন এবং তাঁহার সহকর্মীগণ যে আর একটি বৃহত্তর ঘড়ি নির্মাণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাহা ১,০০০ বৎসরে এক সেকেণ্ডের বেশী স্লো বা ফাস্ট হইবে না—অবশ্য যদি তাহার ততদিন পর্যন্ত কাজ করিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকে।

পারমাণবিক ইন্ধন প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে গবেষণা

প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে আরগন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীতে ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি গবেষণাগার নির্মিত হইয়াছে। মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পক্ষ হইতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই গবেষণাগারের কাজকর্ম পরিচালিত হইবে।

প্লুটোনিয়াম খুবই তেজস্ক্রিয়তা। ইহা এক-প্রকার বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের সাহায্যে ইউরেনিয়াম হইতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আরগন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর ধাতুবিদ্যা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ফ্রাঙ্ক জি. ফুটে এ-সম্পর্কে বলিয়াছেন—ব্রীডার রিয়্যাক্টরের সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের জন্য ইহাকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়। ঐ ধরণের রিয়্যাক্টরেই ইহা সর্বাধিক কাজে লাগে। রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়ামের মধ্যে পুরিয়া প্লুটোনিয়াম স্থাপন করা হয়। ইউরেনিয়ামের মধ্যেই প্লুটোনিয়াম তৈরী হইয়া থাকে। প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের ব্যাপারে এই প্রক্রিয়া কেবলমাত্র স্বয়ং-সংরক্ষণশীলই নয়, স্বয়ং-সম্প্রসারণশীলও বটে। ইউরেনিয়ামের মধ্যে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম তৈয়ার হইবে, তাহার তুলনায় তাপ উৎপাদনে খরচ হইবে কম।

তিনি বলেন, পারমাণবিক ইন্ধন ইউরেনিয়ামের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া রিয়্যাক্টরের ইন্ধন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা চালানো যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

আরগন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর ডিরেক্টর নরম্যান হিলবেরী এই নূতন গবেষণাগার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পরমাণু-শক্তিকে জনকল্যাণে প্রয়োগের ব্যাপারে প্লুটোনিয়াম ব্যবহারের ক্ষেত্র এই গবেষণার ফলে আরও প্রসারিত হইবে।

ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে তৈল সন্ধানের চেষ্টা

ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া পেট্রো-লিয়াম ও শক্তির নূতন উৎসের সন্ধান করা যাইতে পারে—নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসের নবম অধিবেশনে বিজ্ঞানীরা এই অভিমত প্রকাশ করেন। ভারত প্রভৃতি ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রায় পাঁচ হাজার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কি উপায়ে আরও অল্প সময়ের মধ্যে নূতন নূতন তৈল ক্ষেত্রের সন্ধান এবং আরও সুষ্ঠুভাবে তৈল উৎপাদন করা যাইতে পারে—সেই সম্পর্কে কংগ্রেসের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে আলোচনা হয়।

কংগ্রেসের সভাপতি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ই. ভি. মারফ্রি ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পর্কে বলেন যে, ইহার মধ্যে বহু চমকপ্রদ সম্ভাবনার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বুরো অব মাইনস্ ১৯৬০ অথবা ১৯৬১ সালে কলোরেডোতে মৃত্তিকা ও বালির স্তর হইতে তৈল

উদ্ধারের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইবার বিষয় স্থির করিয়াছে। ভূগর্ভের যে স্তরে তৈল সঞ্চিত রহিয়াছে, সেখানে বিস্ফোরণ ঘটাইলে যে গর্ত হইবে তাহা তৈল দ্বারা পূর্ণ হওয়ার ফলে তৈল সংগ্রহ করা সহজ হইবে।

কম খরচে পরমাণু-শক্তি হইতে উচ্চ তাপ উৎপাদন

পরমাণু-শক্তি হইতে তাপ-শক্তি উৎপাদনে প্রচুর ব্যয়ভারই বর্তমানে জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক-শক্তি কমিশনের রিয়্যাক্টর নির্মাণ ও উন্নয়ন বিভাগের ইউলিসিস এম. স্টেইব্লার জানাইয়াছেন যে, আমেরিকার দুইটি প্রধান পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে বিজ্ঞানীরা ইহা দূর করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পেনসিলভ্যানিয়ার শিপিং পোর্ট-এর কারখানায় এবং ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মরগ্যান টাউনের কারখানায় পরমাণু হইতে উচ্চ তাপবিশিষ্ট বাষ্প উৎপাদনের যে চেষ্টা হইতেছে, স্টেইব্লার এই প্রসঙ্গে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, পরমাণু-শক্তি হইতে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সুস্বাদু পানীয় জলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কারখানা নির্মাণের কথা বিজ্ঞানীরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। এই ধরণের কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত শীঘ্রই গৃহীত হইতে পারে।

তবে এই উদ্দেশ্যে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরটি যে কোথায় বসানো হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। স্টেইব্লার এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, যে সকল রিয়্যাক্টরে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কম খরচে ও কারিগরি দিক হইতে তাহাকে কিভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ক্যান্সার গবেষণায় অগ্রগতি

মস্কোর প্রাণী-বিদ্যা ভবনের পরিচালক অধ্যাপক ইভান মাইস্কি দীর্ঘকাল যাবৎ ক্যান্সার-কোষের উৎপত্তি ও গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্যান্সার-কোষের উৎপত্তি ও বিকাশের সহিত প্রাণীদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তনগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। তাঁহার গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টিউমারগুলিতে ক্যান্সার-অ্যান্টিজেন (অ্যান্টিবডি বা রক্তের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক উপাদান) সৃষ্টি হয়। এই অ্যান্টিজেন হইতে ক্যান্সার-প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন।

ইতিমধ্যেই প্রাণী-বিদ্যা ভবনের গবেষক-কর্মীরা অ্যান্টিটিউমার ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করিয়াছেন। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টিউমারে আক্রান্ত বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের দেহে এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা চালানো হইতেছে।

ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগার জৈব-রাসায়নিক গবেষণা ভবনের কয়েকজন বিজ্ঞানীর যুক্ত-গবেষণার ফলে থিও-তেফ নামে একটি নূতন ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। স্তন্যসংশ্লিষ্ট গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ফুস্ফুসের কয়েক ধরণের ক্যান্সার নিরাময়ে এই ঔষধটি বিশেষ কার্যকরী বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই থিও-তেফ ১০ হইতে ১২ মিলিগ্রাম মাত্রায় ইনজেকশন করিয়া পেশীর ভিতরে প্রয়োগ করা হয়। ইন্‌জেকশন দিবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উহা টিউমারের উপরে আক্রমণ চালায় এবং রোগাক্রান্ত স্থানটির সম্প্রসারণ (মেটাস্টেসিস্) বন্ধ করিয়া দেয়।

দীর্ঘকালব্যাপী রক্ত সংরক্ষণ

সম্প্রতি মস্কোয় সোভিয়েট রক্ত-বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাণীদেহের রক্ত সম্পর্কে নানা বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সূচী হইতে জানা যায় যে, মস্কোর রক্ত-বিজ্ঞান ভবনের (ইনষ্টিটুট অব হিম্যাটোলজি) গবেষকগণ ১০০ দিন পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন।

রোগীর দেহে বাহিরের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য সব হাসপাতালেই সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এই রক্ত সংরক্ষিত থাকে—তাহার পরে ক্রমশঃ তার গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেক দিন যাবৎ ৩৫ হইতে ৫০ দিন পর্যন্ত রক্ত-সংরক্ষণের নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বর্তমানে তাঁহারা অতি নিম্ন তাপমাত্রায়—অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের ১৯০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে—শৈত্যাধারে রক্তের বোতলগুলি রাখিয়া দিয়া ১০০ দিন পর্যন্ত রক্ত-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রক্তপাত শূন্য ও যন্ত্রণাহীন অস্ত্রোপচার

অস্ত্রোপচারের কালে যাহাতে রক্তপাত না হয় এবং রোগী যন্ত্রণাবোধ না করে, তাহার জন্য ইউক্রাইনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী সেমিয়ন শাম্রাইয়েভ্স্কি "বাইঅ্যাক্টিভ ইলেক্ট্রোড" সংযুক্ত অস্ত্রোপচারের ছুরি, কাঁচি, চিম্টা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াছেন। এই ইলেক্ট্রোডের সাহায্যে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদির মধ্য দিয়া মৃদু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ক্ষতস্থানের রক্তকে তৎক্ষণাৎ জমাট বাঁধিতে সাহায্য করে—যাহার ফলে আর রক্তক্ষরণ হইতে পারে না। সেই সঙ্গে স্নায়ুমুখগুলি মৃদু বিদ্যুৎ-স্পর্শে আচ্ছন্ন থাকিবার ফলে রোগীর যন্ত্রণাবোধও হয় না।

টন্সিল অপারেশনের সময়ে অধিকাংশ শিশুর প্রচুর রক্তপাত হয় দেখিয়াই ডাক্তার শাম্রাইয়েভ্স্কি এইরূপ একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করেন। পরে দেখা যায়, এই "বাইঅ্যাকটিভ্ ইলেক্ট্রোড" সর্ববিধ অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী।

খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনর্বৃদ্ধি

মস্কোর ইন্‌ষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল বায়োলজির গবেষকেরা বানর, কুকুর ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাণীর উপরে পরীক্ষা চালাইয়া এই সকল প্রাণীদেহের কয়েকটি প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বাদ দিয়া বা ছোট করিয়া দিবার পর সে সকল প্রত্যঙ্গের পুনর্বৃদ্ধি ঘটাইবার কাজে সফল হইয়াছেন। তাঁহারা কয়েকটি প্রাণীর স্বাভাবিক প্লীহাকে কাটিয়া দশ ভাগের নয় ভাগ বাদ দিয়া শুধু এক দশমাংশ রাখিয়া দেন। এক বিশেষ ধরণের চিকিৎসাধীনে রাখিবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ খণ্ডিত প্লীহার পুনর্বৃদ্ধি ঘটে এবং উহা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। যকৃতের বেলায়ও অনুরূপ প্রক্রিয়া সফল হইয়াছে।

মানব-দেহের রোগদুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বাদ দিবার পর সেই প্রত্যঙ্গের পুনর্বৃদ্ধি ঘটাইবার ব্যাপারে এই পরীক্ষার সাফল্যের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

প্রাণীদেহের দ্রুত পুষ্টিসাধনের ঔষধ

লাটভিয়ার রাজধানী রিগার প্রাণী-বিজ্ঞান গবেষণা-ভবনের একদল বিজ্ঞানী ফুরাজোলিডন নামে নূতন একটি রোগ-সংক্রমণ-নিরোধক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধ গরু, মহিষ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর রোগ-সংক্রমণ নিরোধের

ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহেরও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

এক কিলোগ্র্যাম খাদ্যের সঙ্গে ৩০ হইতে ৫০ মিলিগ্র্যাম ফুরাজোলিডন মিশাইয়া শূকরছানাদের খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে তাহাদের দেহের ওজন শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়া যায়। তাছাড়া বাছুরের এক রকম দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে এই ঔষধটি অত্যন্ত কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

যক্ষ্মারোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি

অতীতে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগীদিগকে লোবেকটোমি অথবা আরটিফিসিয়েল নিউমো-থোরাক্স দ্বারা নিরাময় করা যাইত। সম্প্রতি চীনা চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ফুয়েই হাসপাতাল (পিকিঙ) একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার দ্বারা নলের সাহায্যে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও রিমিফন জাতীয় ঔষধ সরাসরি ফুস্‌ফুসের গহ্বরে সঞ্চালিত করা যায়। এই নূতন পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালাইয়া বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।

ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ সংক্রান্ত গবেষণায় সুফল

বিখ্যাত বৃটিশ চক্ষু শল্য-চিকিৎসক সার ষ্টুয়ার্ট ডিউক এল্ডার সম্প্রতি এক বিবরণী মারফৎ জানাইয়াছেন যে, ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ সম্পর্কে যে গবেষণা-কার্য চলিয়াছে, তাহা আশাতিরিক্তভাবে সুফল প্রদর্শন করিয়াছে।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, গাম্বিয়ায় বৃটিশ গবেষণা কর্মীদল কাজ করিতেছেন। যে ভাইরাস ট্র্যাকোমার উৎপত্তির কারণ, তাঁহারা সেই ভাইরাস স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করিবার উপায় বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সার ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, বহু বৎসর ধরিয়া দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই বারই ইহা প্রথম সম্ভব হইয়াছে। লণ্ডন ও লিভারপুলের দুইটি স্বতন্ত্র পরীক্ষাগারে ইহার ফলাফল পরীক্ষা করা হইয়াছে।

বিশ্বের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ট্র্যাকোমা রোগাক্রান্ত এবং এই ট্র্যাকোমা রোগ অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। ভাইরাসকে পৃথক করিয়া মানুষের দেহে স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হওয়ায় আজ অন্ধত্ব নিবারণ সম্পর্কে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। বানরের দেহে এই ভাইরাস সেরূপ কার্যকরী হয় না; কাজেই স্বেচ্ছাকর্মী মানুষ লইয়া এই বিষয়ে কাজ হইতেছে।

নূতন নেত্র

মার্কিন স্থলবাহিনী ইনফ্রা-রেড বা অবলোহিত রশ্মির নেত্রের সাহায্যে অন্ধকারেও বহু মাইল দূরে অবস্থিত গরম চায়ের কাপ অথবা লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্র দেখিয়া লইতে সক্ষম হইবে।

স্থলবাহিনীর জনৈক বিজ্ঞানী বলেন, ইস্পাত কারখানাই হউক, বিমান বা রকেটই হউক—যাহা হইতে তাপ নির্গত হয়, এমন সকল বস্তুই আমরা বহু দূর হইতে দেখিতে পাইব। চলমান যে কোন বস্তুই ইনফ্রা-রেড "চোখের" সামনে ধরা পড়িবে। টেলিভিসন যন্ত্রের ন্যায় যে কোন বস্তুরই প্রতিচ্ছবি আমরা এখন তুলিয়া নিতে পারিব।

রোগ-চিকিৎসায় প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর

যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিকদের চিকিৎসা কেন্দ্র ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে এই প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের সাহায্যে জীবতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সলিউশন টাইপ রিয়্যাক্টরটি এখানে এই গ্রীষ্মকালেই স্থাপিত হইবে। ইহাতে ৫০০০০ ওয়াট তাপ উৎপন্ন হইবার কথা। প্রধানতঃ জীবন্ত প্রাণীর উপর পারমাণবিক

তেজস্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যেই এই ৪৫০ টনের যন্ত্রটি এখানে স্থাপন করা হইতেছে। এই যন্ত্রে গামারশ্মি, নিউট্রন এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হইবে। জীব-বিজ্ঞানের বহু ব্যাপক ক্ষেত্রে আইসোটোপ প্রয়োগ করিয়া জীবন-ক্রিয়া সম্পর্কে বহু তথ্যানুসন্ধান করা যাইবে।

এই রিয়্যাক্টরের ইন্ধন হইবে ইউরেনিয়াম সালফেট সলিউশন। এই সলিউশনে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আছে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের ফলে উৎপন্ন নিউট্রন ও গামারশ্মিকে জীবতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা ও রোগ চিকিৎসায় লাগানো হইবে। জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে এই রিয়্যাক্টরে তেজস্ক্রিয় আলোক নিক্ষেপের দুই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে। রিয়্যাক্টরের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত নিউট্রন কণার সম্মুখে বড় বড় জিনিষ রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি নলে কোন জিনিষ রাখিয়া তেজস্ক্রিয় করা যাইবে। এই রিয়্যাক্টর স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষতিকর কোন কিছুই ইহাতে থাকিবে না।

মূকের বাকশক্তি লাভ

মিঃ আর ভি. টেইট নামক বৃটেনের জনৈক দন্ত-চিকিৎসক এরূপ একটি যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে ল্যারিংস্ গ্রন্থি কাটিয়া বাদ দেওয়ার ফলে বাকশক্তিহীন লোকেরা আবার পরিষ্কারভাবে কথা বলিতে ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মিঃ টেইট বলেন যে, কথাগুলির মধ্যে একটু যান্ত্রিক ধ্বনি থাকিবে সত্য, কিন্তু তাহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবে না।

বৃটিশ ডেণ্টাল জার্নালে যন্ত্রটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম ওয়্যাল ভাইব্রেটর। ইহার দুইটি প্রধান অংশ আছে। এক অংশ একটি কৃত্রিম প্লেটের সহিত আট্‌কাইয়া মুখের মধ্যে রাখিতে হয় এবং অপর অংশটি থাকে পকেটে। দ্বিতীয় অংশটি একটি সাধারণ শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের অ্যামপ্লিফায়ার অপেক্ষা বড় নয়। এই অংশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাটারী থাকে এবং দুইটি সরু তারের সাহায্যে মুখের মধ্যস্থিত কৃত্রিম প্লেটটির সহিত পকেটের ব্যাটারিগুলির যোগসাধন করিয়া তার দুইটি ঠোঁটের কোণ দিয়া বাহির করা হয়। মূক ব্যক্তি পকেটের মধ্যে একটি বোতাম টিপিলেই মুখের মধ্যস্থিত একটি পাত্‌লা ধাতব পর্দা কাঁপিতে থাকে এবং তাহা হইতে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহার পর স্বাভাবিকভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করিলেই পর্দার কম্পন বোধগম্য শব্দে রূপান্তরিত হয়।

যন্ত্রটি প্রথমে ব্যবহার করিবার সময় মূক ব্যক্তি যদি কোন শব্দ-বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবেন। একটু ধৈর্য সহকারে চেষ্টা চালাইয়া গেলে এই যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে মূক ব্যক্তিরা অনর্গল কথা বলিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বার্তা প্রেরণের পরিকল্পনা

আমেরিকার জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ-সংস্থা একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্তমান বৎসরের শেষে কিংবা ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে একটি উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১০০ ফুট ব্যাসের গোলাকৃতি উপগ্রহের গায়ে বেতার-তরঙ্গসমূহ ধাক্কা খাইয়া অন্য প্রান্তে গিয়া পৌছিবে। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে

১০০০ মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত, যেমন—পূর্বোপকূলস্থিত নিউজার্সির কোন কেন্দ্র হইতে যে বেতার-বার্তা উপগ্রহের দিকে প্রেরণ করা হইবে তাহা উহার গায়ে লাগিয়া ঠিকরাইয়া পড়িবে এবং পশ্চিমোপকূলস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়ার গোল্ডষ্টোন বেতার কেন্দ্র তাহা ধরিতে পারিবে। প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার দশ মিনিটের জন্য এইভাবে বেতার-বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব হইবে।

ইহাতে একটি মাত্র ক্ষুদ্র আকারের বেতার-বার্তা প্রেরক যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রপাতি থাকিবে না। মহাশূন্যে ইহার অবস্থিতি এই যন্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বার্তা প্রতিফলিত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ বা তথ্য সংগ্রহ হইবে না। থর-ডেল্টা জাতীয় রকেটের সাহায্যে ইহা মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে। থর-ডেল্টা অনেকটা থর-এবল জাতীয় তিন-পর্যায়ী রকেট। থর-ডেল্টার তিনটি পর্যায়ে আগুন ধরিবার ব্যাপারে থর-এবলের তুলনায় সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই উপগ্রহের বহিরাবরণ বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের উপযোগী হইবে।

থর-ডেল্টার তিনটি পর্যায়ের প্রথম পর্যায়ে থাকিবে থরজাতীয় মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে ভ্যানগার্ড জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা রকেট। ইহাই রকেটকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবে। তৃতীয় পর্যায়ে থাকিবে নূতন উদ্ভাবিত থর-ডেল্টা নামে ক্ষেপণাস্ত্র বা রকেট।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে

মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্মিক-রে মহাশূন্যের যে শক্তিকেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময় হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা তাহার উৎস সন্ধানের চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা বেলুনের সাহায্যে এই বিষয়ে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল রিসার্চ অ্যাণ্ড দি ন্যাশান্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন নামে একটি সংস্থা এই রশ্মি সম্পর্কে আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েক শত পাউণ্ড ওজনের ফটোগ্রাফিক উপকরণসহ দুইটি বৃহত্তম বেলুন মহাশূন্যে প্রেরণ করিবার বিষয় স্থির করিয়াছেন।

উল্লিখিত সংস্থার জনৈক কর্মচারী এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, বেলুনের মধ্যে যে সকল প্লেট রাখা হইবে, মহাজাগতিক রশ্মি তাহা ভেদ করিয়া যাইবে এবং সেখানে যে বিশেষ ধরণের ফিল্ম রাখা হইবে তাহাতে রশ্মিকণাসমূহের ছাপ পড়িবে। এই সকল আলোকচিত্র পর্যালোচনা করিয়া রশ্মিকণা যে শক্তিকেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার উৎস এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বেলুন দুইটি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন স্থান হইতে ছাড়া হইবে। ইহারা মহাশূন্যের ১২০০০০ ফুট উচ্চে ২৪ ঘণ্টা অথবা তাহার অধিক কাল অবস্থান করিবে।

মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা

সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রহান্তর-ভ্রমণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এল. আই. সিদোভ বলেন, নিকটতম ভবিষ্যতেই চন্দ্রলোকে পৌঁছান সম্ভব হইবে। তত্ত্বগতভাবে সমস্যাটির সমাধান হইয়া গেলেও কার্যক্ষেত্রে এখনও অগ্রসর হয় নাই। তবে এটুকু নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই মানুষের প্রথম গ্রহান্তরে যাত্রা দেখিতে পাইবেন।

তিনি আরও বলেন যে, সোভিয়েটের কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যলোক সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কেও আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। রকেট-বিজ্ঞান আজ এমন উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, রকেটকে ইচ্ছামত অন্য গ্রহে পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভব।

মঙ্গলগ্রহে মানুষের অভিযান

ডাঃ বার্ণার ফন ব্রাউন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগের ক্ষেপণাস্ত্র সংস্থার বর্তমান অধ্যক্ষ। তিনি জার্মেনীর প্রাক্তন রকেট-বিশেষজ্ঞ। তিনি প্রতিনিধি পরিষদের মহাকাশ কমিটির নিকট মানুষের মঙ্গলগ্রহে যাত্রার ব্যবস্থার বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, তিনটি পর্যায়ে মানুষ মঙ্গলগ্রহে অভিযান করিবে। প্রথমে তাহারা পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী একটি অন্তরীক্ষ ঘাঁটিতে রকেটযোগে গমন করিবে। তাহার পর অন্তরীক্ষ ঘাঁটি হইতে যাত্রীরা মহাকাশ যানে আরোহণ করিবে এবং উহা তাহাদিগকে মঙ্গলগ্রহের চতুর্দিকে কক্ষপথে লইয়া যাইবে। তাহাদের পরিক্রমা ২৬০ দিন স্থায়ী হইবে। অতঃপর যাত্রীরা একটি বিমানে চড়িয়া ধীরে ধীরে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করিবে। বিমানটিতে রাস্তাঘাট নির্মাণের যন্ত্রপাতি থাকিবে।

ডাঃ ব্রাউন বলেন যে, বিপরীতভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি মঙ্গলগ্রহে ফেলিয়া দিয়া ওজন হ্রাস করা হইবে। শুধু আকাশযান চালকদিগকে জীবিতাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার উপযোগী সর্বাপেক্ষা কম ওজন উহাতে থাকিবে। উহার খাদ্য, বায়ু এবং জ্বালানী নিঃশেষিত হইয়া শুধু যাত্রী ও খালি কেবিন পড়িয়া থাকিবে।

এই রকমের মঙ্গলগ্রহ অভিযান কবে পর্যন্ত সম্ভব হইবে, ডাঃ ব্রাউন সে বিষয়ে কোন আভাস দেন নাই।

পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্য সন্ধানে

পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ রচনার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার ডলার দিয়াছেন। এই ধরণের বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কখনও গৃহীত হয় নাই। ইহাকে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্যালিসেড্স্-এর (নিউইয়র্ক) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত লেমণ্ট ভূ-বিদ্যা বিষয়ক মানমন্দিরের বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ডাঃ জন এফ. নাফের তত্ত্বাবধানে স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালিত হইবে।

ডাঃ নাফে এই সম্পর্কে বলেন যে, সমুদ্রের তলদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বহু মাইল নিম্নে এই গর্ত খনন করা হইবে। সমুদ্রের তলদেশের মৃত্তিকার স্তর অগভীর বলিয়াই এখানে গর্ত খননের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ইহার ফলে, পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। যুগোশ্লাভিয়ার বিজ্ঞানী মোহোরোভিসিকের মতে, পৃথিবীর স্তরের কয়েকটির পর আর ক্রমের নির্দেশ পাওয়া যায় না, ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে। এই সূত্রের সন্ধানও এ চেষ্টার ফলে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতেছেন।

গর্তখননের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য চারিটি জাহাজ সমুদ্রের নানা স্থানে অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা

রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণে প্রকাশ, পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২৬০ কোটি। তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী চারটি দেশে রহিয়াছে—প্রজাতন্ত্রী চীন ৬৪ কোটি, ভারতবর্ষ ৪০ কোটি, সোভিয়েট ইউনিয়ন ২০ কোটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭ কোটি।

এই বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের পর রহিয়াছে জাপান,

ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, ব্রেজিল, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মেনী—প্রত্যেকের জনসংখ্যা ৫ কোটির বেশী।

২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ সম্ভবতঃ এশিয়াতেই থাকিবে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪॥ কোটি হারে বাড়িয়া যাইতেছে—প্রতি মিনিটে ৮৫টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিবরণে আরও প্রকাশ, অবিবাহিতের তুলনায় বিবাহিতেরাই দীর্ঘায়ু হয়। নরওয়েতে মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল সর্বাপেক্ষা বেশী—নারীদের ৭৫ বৎসর এবং পুরুষের ৭১ বৎসর। ভারতে গড়পড়তা আয়ু সর্বাপেক্ষা কম—পুরুষ ও নারী উভয়েরই ৩২ বৎসর মাত্র।

ক্যাঙ্গারু ইঁদুর

পূর্ব-কাজাকস্তানের জাইসান মরুভূমি অঞ্চলে এক সময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি এক ধরণের ইঁদুর দেখিতে পাওয়া যাইত। জারবোয়া নামে এই ইঁদুরগুলি অসাধারণ লম্ফনপটু—৮ হইতে ১০ গজ দূরত্ব ইহারা এক এক লাফে পার হইতে পারে। সেই জন্য চলিত কথায় ইহাদের বলা হয় ক্যাঙ্গারু ইঁদুর। গত ৪০-৫০ বৎসরের মধ্যে এই জারবোয়ার সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে ইহারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

সম্প্রতি এই অঞ্চলে একটি জীবন্ত ক্যাঙ্গারু ইঁদুরকে ধরা সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েট প্রাণী-বিজ্ঞানীরা ইহাকে একটি অতি মূল্যবান সংগ্রহ বলিয়া মনে করিতেছেন।

গোবি মরুভূমির পশ্চিমাংশ হইতে সিন্‌কিয়াং-শারাসুম হইয়া পূর্ব-কাজাকস্তানের ইর্‌তিশ নদীর কাছাকাছি পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া এই জারবোয়ার বসবাস ছিল। এখন শুধু ইহাদের জাইসান অঞ্চলে কদাচিৎ কখনও দেখা যায়। ইহাদের পিছনের দুই পা ও লেজ খুব বড় ও শক্তিশালী। উহারই সাহায্যে ইহারা লম্বা লাফ দিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের প্রাণী। সমস্ত দিন আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং শুধু রাত্রিকালে আহারের সন্ধানে বাহির হয়। কয়েক প্রকার মরু-উদ্ভিদের শিকড় ও পোকামাকড় খাইয়া ইহারা প্রাণধারণ করে।

দশ হাজার বৎসরের পুরাতন মমি

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমান্তে এক পর্বতগুহায় কয়েকটি মমি পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি ১০ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া দাবী করা হইতেছে। মেক্সিকোর জাতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ ইউসেকিও ডাকানম হুর্টাডো মমিগুলি সত্যই অতদিনের পুরাতন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সোনোরা ষ্টেট মিউজিয়ামের ডিরেক্টর যে আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের জন্য মেক্সিকোর জাতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থা উত্তর মেক্সিকোয় একটি অভিযাত্রীদল প্রেরণ করিবেন।

সোনোরা ষ্টেট মিউজিয়ামের ডিরেক্টর—সেনর ফেডেরিকো পেস্‌কুয়েরিয়া বলিয়াছেন—যে মমিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ পিমা ইণ্ডিয়ান উপজাতির পুরোহিত অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কেহ হইতে পারে—কারণ উহাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব ভাল। জনৈক ইঞ্জিনীয়ার অকস্মাৎ জাকোয়া পর্বতের একটি গুহার মধ্যে মমিগুলি দেখিতে পান। অশ্বের সাহায্য ব্যতীত আর কোন যানে ঐ স্থলে যাওয়া যায় না।

ডাঃ ডাকানম হুর্টাডো বলেন, দশ হাজার বৎসর তো অনেক দিন। পিমা ইণ্ডিয়ানদের উৎপত্তিই অতদিনের নহে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৫৯ | অষ্টম সংখ্যা

বেতার ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড*

শ্রীশান্তিময় বসু

রাত্রির আকাশের দিকে তাকালে মনে স্বতঃই বিস্ময় জাগে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর শোভা নিরীক্ষণ করেছে এবং তার কল্পনাপ্রবণ মন এই আলোক-বিন্দুকে ঘিরে কতই না কাহিনী রচনা করেছে! নিখিল চরাচরের এই অপূর্ব দৃশ্য নিরীক্ষণের ফলেই মানুষ ক্রমশঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিওই জ্যোতি-বিজ্ঞানের প্রথম সোপান রচনা করেন। ১½ ইঞ্চি একটি কাচের লেন্সের সাহায্যে তিনি মানুষের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করতে সক্ষম হন। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই বৃহস্পতির চাঁদ ও শনির বলয় মানুষের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। কিন্তু সেকালে জ্ঞানের প্রসার হতো খুবই মন্থর গতিতে। সে জন্যে জ্যোতি-বিজ্ঞানের মূলসূত্র রচনায় আরও প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কালক্রমে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলো এবং বর্তমানে প্যালোমার মানমন্দিরের ২০০" ইঞ্চি প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং উন্নততর বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে বিশ্বের খুঁটিনাটি কত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষের দৃষ্টি বুঝি পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে!

আলোক-তরঙ্গের সাহায্যে যে কোনও বস্তু আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। দূরের কোন বস্তু থেকে আলোক-তরঙ্গ উদ্ভূত বা প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন—তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি একই তড়িৎ-চুম্বক বর্ণালীর গোষ্ঠীভুক্ত। এই বর্ণালীর এক দিকে গামা রশ্মি ও অপর দিকে আছে বেতার-তরঙ্গ এবং প্রত্যেকটি বিভিন্ন রশ্মির বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন—সূর্য বা তারকা থেকে সব রকমের তরঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে। বিশ্বের সঠিক রূপ উদ্‌ঘাটনের জন্যে সব রকম তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু এই তরঙ্গের আগমনে প্রধান বাধা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও আয়ন-বলয়। বায়ুমণ্ডলের অণু ও পরমাণু কর্তৃক শোষণের ফলে কেবলমাত্র ৪×১০^{-৫} সে. মি. থেকে ৭.২×১০^{-৫} সে. মি. দৈর্ঘ্যের দৃশ্য তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে সক্ষম

হয়। আবার '২৫ সে. মি. থেকে ২০,০০০ মিটারের বেতার-তরঙ্গ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যায়, কিন্তু ২০ মিটার উপরের বেতার-তরঙ্গ আয়ন-বলয় থেকে প্রতিফলিত হয়। এত দিন দৃশ্য তরঙ্গের সাহায্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে হয়তো বিশ্বের এক নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ বেতার-তরঙ্গ বহুলাংশেই মেঘ ও বৃষ্টির বাধা অতিক্রম করে যায়। সে জন্যে আকাশের প্রায় সব অবস্থাতেই বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ সম্ভব।

১৯৩২ সালে বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করবার সময় কার্ল ইয়ানস্কি এক অভিনব ঘটনার সম্মুখীন

বিশ্বমহাযুদ্ধ বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম অন্তরায় হয়েছিল, সে কথা সত্য। কিন্তু একটু চিন্তা করলে, বিশ্বযুদ্ধ আশীর্বাদ, না অভিশাপ—এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনে বেতার পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তার ফলেই যুদ্ধের অবসানে বিজ্ঞানীরা উন্নততর বেতার পদ্ধতির সাহায্যে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অনুসন্ধান-কার্য চালাতে সক্ষম হন।

বিশ্বের নতুন রূপ উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে, বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেন বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের পরিবর্তে এতে আছে এরিয়াল ও গ্রাহকযন্ত্র এবং চোখ বা ফটোগ্রাফিক
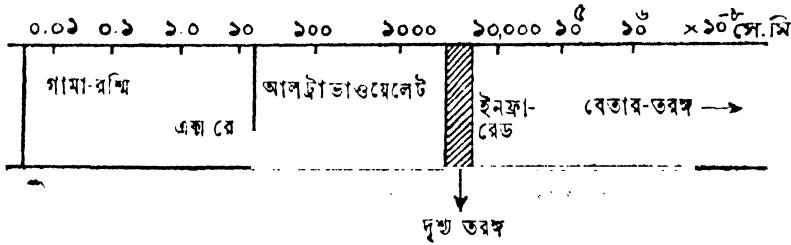
তড়িৎ-চুম্বক বর্ণালী

হন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বেতার গ্রাহক যন্ত্রের 'এরিয়াল' যখন ছায়াপথের সম্মুখীন হয় তখন লাউড স্পীকারে আওয়াজ বর্ধিত হয়। এই আওয়াজ শুনলে মনে হয়, সেই সুদূরের ছায়াপথ যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। ইয়ানস্কির এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ধারাবাহিকভাবে কোনও কাজ সুরু হয় নি। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর সাময়িকভাবে এক যবনিকা টেনে দেয়।

কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে শত্রু বেতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রেডার যন্ত্রের সাহায্যে বিমানের এক বেতার-সঙ্কেত গৃহীত হয়। বিজ্ঞানীরা এই সঙ্কেতের সঙ্গে সূর্যকলঙ্কের যোগসূত্র প্রতিপাদন করেন।

প্লেটের পরিবর্তে লেখনযন্ত্র বা লাউড স্পীকার। এই বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের এক নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত হলো।

বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম সূর্য থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ গ্রহণে সক্ষম হন। সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যর বেতার-তরঙ্গে সূর্যের রূপ দৃশ্য তরঙ্গে গৃহীত প্রতিচ্ছবিরই অনুরূপ। ২০ সে. মি. দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গে সূর্য সমান ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে এবং বলয়ের আকার ধারণ করে। মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ সূর্য সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করলো। দেখা গেল, পূর্ণগ্রাসের সময় মিটার তরঙ্গের সঙ্কেতমান সমান থাকে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মিটার তরঙ্গ সূর্যের ছটামণ্ডল বা করোনা থেকে উদ্ভূত

হয়। তাছাড়া সূর্যকলঙ্ক এবং সূর্যপ্রভা বা 'ফ্লেয়ার' উদ্ভবকালে মিটার তরঙ্গ-সঙ্কেত ১০^{৩} থেকে ১০^{৬} গুণ বর্ধিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে—আমাদের বরাত ভাল যে, আলো কখনও এই পরিমাণে বর্ধিত হয় না; তাহলে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। এই সময়েই সূর্য থেকে তড়িৎকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অরোরা বর্ণবিন্যাসের সৃষ্টি করে।

এরপর বিজ্ঞানীরা নিকটবর্তী তারকা এবং সূর্য থেকে অন্যান্য উজ্জ্বল তারকার দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই সব তারকা থেকে তাঁরা কোনও বেতার-সঙ্কেত গ্রহণে সক্ষম হন নি; অথচ আকাশের কয়েকটি অনুজ্জ্বল স্থান থেকে বেতার-সঙ্কেত গৃহীত হলো। এই স্থানগুলিই বেতার-তারকা নামে পরিচিত। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার না হলে এই বেতার-তারকাগুলি চিরকাল আমাদের অগোচরেই থেকে যেত। ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলের বেতার-তারকাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানীরা এক উপবৃত্তাকার স্থানের মধ্যে এই বেতার-তারকার অবস্থান নির্ধারণ করেন। এই স্থান নির্ধারণ এত নিখুঁত হলো যে, পরে প্যালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টার পর এই অবস্থানেই এক নীহারিকার আবিষ্কার সম্ভব হয়। বর্ণালী-বিশ্লেষণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই নীহারিকার গ্যাসীয় কণিকাগুলি উচ্চ গতিবেগে বিচরণ করে এবং এই গতিশক্তিরই কিয়দংশ বেতার তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃশ্য-তরঙ্গে ক্যাসিওপিয়ার নীহারিকা আবিষ্কার হয়তো সম্ভব হতো না। ক্যাসিওপিয়া ব্যতীত সিগ্‌নাস, ক্র্যাব, পাপ্পাস প্রভৃতি অসংখ্য বেতার-তারকার সন্ধানও পাওয়া গেল। প্যালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরীর পর মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, আকাশের তারকার গণনা সঠিক মানে পৌঁচেছে। কিন্তু এই অসংখ্য বেতার-তারকা এতদিন প্যালোমারের সন্ধানী চোখ এড়িয়ে থাকবার পর সম্প্রতি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা দিল।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুরু হয়েছিল ইয়ানস্কির আবিষ্কারে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, দৃশ্য-তরঙ্গে ছায়াপথের অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন্দ্র থেকেই সবচেয়ে বেশী বেতার-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। ছায়াপথের অসংখ্য তারকা থেকে এই বেতার তরঙ্গ উদ্ভূত হয় কিনা, তা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানী ভ্যান ডি হাল্‌স্ট লিডেন মানমন্দিরে বক্তৃতায় বলেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন ঘূর্ণন বিপরীতমুখী হয়ে ২১ সে. মি. তরঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে। ছায়াপথের গলিতে অনেক হাইড্রোজেন পরমাণু কোটি কোটি বছর ধরে অবস্থান করছে এবং ঐ অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর এক একটির ঘূর্ণন বিপরীতমুখী হয়ে ২১ সে. মি. বেতার-তরঙ্গের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ১৯৫১ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিডেন মানমন্দিরে ছায়াপথ থেকে ২১ সে. মি. বেতার-তরঙ্গ গৃহীত হলো। ২১ সে. মি. তরঙ্গের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ছায়াপথের বিভিন্ন স্থানের গতিবেগ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছায়াপথের আকারের একটা ধারণাও প্রদান

বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র

করেন। আমাদের ছায়াপথ ব্যতীত নিকটবর্তী অন্যান্য নীহারিকা থেকেও বেতার-সঙ্কেত গৃহীত হয়েছে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার আকার এবং আবর্তন নির্ধারণ এই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন নক্ষত্র ব্যতীত বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহ থেকে বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করাও সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতি থেকে গৃহীত বেতার-তরঙ্গের উত্থান-পতন এর আবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে এক লোহিতাংশ বহুকাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বেতার তরঙ্গের সঙ্কেত-মান লোহিতাংশের পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। এ-ছাড়া বৃহস্পতি থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে তিন ধাপে এসে পৌছায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রথম ধাপটি সোজা পৃথিবীতে আসে, দ্বিতীয়টি বৃহস্পতির উপরিভাগ থেকে ও তৃতীয়টি বৃহস্পতির তড়িৎ-বলয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে।

বিভিন্ন তারকা থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করা ছাড়া পৃথিবী থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করে উল্কা এবং বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ থেকে তা প্রতি-ফলিত করে অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করা হয়েছে। উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় এবং গতিপথে এক আয়ন-স্তম্ভ সৃষ্টি করে। এই আয়ন-স্তম্ভ থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করা সম্ভব। উল্কাপাত রাত্রেই হয় বলে এতদিন লোকের ধারণা ছিল। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রমাণ করলো, উল্কাপাত রাত্রি ছাড়া দিনেও হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বড় বড় উল্কাপাতের বেতার-প্রতিচ্ছবি দিনের বেলাতেই গৃহীত হয়েছে। আবার উল্কাগুলি আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কি না—সে বিষয়ে অনেক মতভেদ ছিল। কিন্তু বেতার-জ্যোতি-বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে সক্ষম হয়। প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে উল্কার গতিবেগ, দিক ও উৎপত্তি-স্থল নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং সে সূত্রে বর্তমান বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো এই যে, উল্কাপিণ্ডগুলি ধূমকেতু থেকেই উদ্ভূত। চন্দ্র থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে চন্দ্রের উপরিভাগ এবং পৃথিবীর আয়ন-বলয় সম্বন্ধেও অনেক অজ্ঞাত তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে।
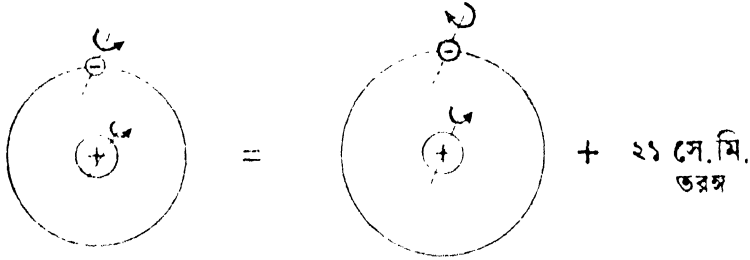
ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বিপরীতমুখী হয়ে ২১ সে. মি. তরঙ্গের উদ্ভব

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানীরা উন্নততর প্রণালীতে অদম্য উৎসাহে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করে চলেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম সোপান রচিত হয়েছিল গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারে। আজ বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই প্রচেষ্টারই পরিণতি ঘটলো।

কোকো ও চকোলেট

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চকোলেটের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে ছেলেদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কারণ, চকোলেটের স্বাদ অপূর্ব। বয়স বাড়লে চকোলেট খেতে অনেকেরই লজ্জা হয় বটে ; কিন্তু লজ্জা যতটা লৌকিক ততটা আন্তরিক নয়। কারণ কোকো পান করতে কারও বাধে না। তাছাড়া চকোলেটের নানারকম মিষ্টি দ্রব্য, যেমন—আইসক্রীম, সিরাপ, কেক প্রভৃতির আকর্ষণ তো আছেই ; অধিকন্তু বিস্বাদ ওষুধকে সুস্বাদু করবার জন্যে প্রয়োজন হয় চকোলেটের সুগন্ধ।

একপ্রকার গাছের বীজকে পোড়াবার পর গাঁজিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর শুকিয়ে নিয়ে কোকো ও চকোলেট প্রস্তুত করা হয়। এই গাছের নাম হচ্ছে থিওব্রোমা ক্যাকাও।

ক্যাকাও গাছের আদি উৎপত্তি স্থল হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন এবং অরনিকো নদীর তীরবর্তী বনাঞ্চল। রেড্ ইণ্ডিয়ানেরা ক্যাকাও বীজ গুঁড়া করে জল মিশিয়ে নিত। তারপর ঐ ভিজা গুঁড়া শুকিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে তারা একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করতো। এই পানীয় তাদের বড় প্রিয় ছিল। চকোলেট শব্দটি দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী অ্যাজটেক সম্প্রদায়ের চকোলেট্ল্ শব্দ থেকে উদ্ভুত।

প্রায় সাড়ে চার শ' বছর পূর্বে কলম্বাস তাঁর চতুর্থবার সমুদ্রযাত্রার শেষে ক্যাকাও বীজ ইউরোপে নিয়ে আসেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা সুইডিস্ বিজ্ঞানী কার্ল ফন লিন্নে লিনিয়াস এই গাছের নাম দেন থিওব্রোমা ক্যাকাও—এর অর্থ হচ্ছে দেবতাদের খাদ্য। নাম থেকে বুঝা যায়, বিজ্ঞানীর মন এই গাছকে কিরূপ প্রীতির চোখে দেখতো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোকো পান করা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোকো বীজ গুঁড়া করবার পদ্ধতি কিছুটা উন্নত হয়েছিল বটে, তবে কোকো পানের নিয়মটা কিন্তু রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মতই ছিল, অবশ্য কোকোতে পরে চিনি যোগ করবার রীতি প্রচলিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডবাসী পিটার্স দুধ মিশিয়ে চকোলেট প্রস্তুত-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

উদ্ভিদবিদ্দের মতে, থিওব্রোমা ক্যাকাও জাতীয় গাছ প্রায় বিশ রকমের হয়। তার মধ্যে থিওব্রোমা ক্যাকাওই সর্বপ্রধান। তিন শ্রেণীর থিওব্রোমা ক্যাকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। ক্রিয়োলা—ক্রিয়োলা বীজের ভিতরটা প্রথমে সাদা বা ফিকে গোলাপী থাকে ; গাঁজিয়ে শুকিয়ে নেবার পর কালো হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলায় অরনিকো নদীর তীরে এবং এশিয়ার সিংহলে এ-জাতীয় গাছ উৎপন্ন হয়।

২। ফরেষ্টারো—এর বীজের ভিতরটা প্রথমে গাঢ় গোলাপী রঙের হয় এবং গাঁজিয়ে নেবার পর মিশমিশে কালো দেখায়। এই গাছের চাষ খুব সহজ বলে দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। ব্রেজিল, ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় এর বিস্তর চাষ হয়।

৩। ট্রিনিটারিও—ক্রিয়োলা এবং ফরেষ্টারো—এই উভয়ের মিলিত রূপ হচ্ছে ট্রিনিটারিও। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য আমেরিকায় এর বিশেষ চাষ হয়। গত অর্ধ শতাব্দীতে ক্যাকাও গাছের চাষ বর্ধিত হয়েছে প্রায় দশ গুণ।

দশ বছরে একটি ক্যাকাও গাছ প্রায় বিশ থেকে তিরিশ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। কিন্তু ফল পাড়বার সুবিধার জন্যে গাছগুলিকে সাধারণতঃ ছাটাই করে ছোট করে রাখা হয়। ক্যাকাও গাছের পাতা বেশ বড় এবং পাতার উপরটা গাঢ় সবুজ ও তলাটা লাল। গাছের মূল কাণ্ডে এবং পুরনো শাখায় গোছায় গোছায় ফুল ও ফল হয়—সাধারণতঃ গাছে নতুন ডালে কচি পাতার কাছে ফুল ও ফল ধরতে দেখা যায়। ক্যাকাও গাছে ফলগুলি কাণ্ডে ও শাখায় এমনভাবে লেগে থাকে, মনে হয় যেন বাইরে থেকে কেউ ওগুলি গাছের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। একটি ক্যাকাও গাছে কয়েক হাজার ফুল ফুটলেও পরিণত ফলের সংখ্যা খুবই কম। ফল পাকতে সাড়ে চার মাস সময় লাগে। একটি ফলের ওজন আধ সেরের মত এবং লম্বায় সাত থেকে দশ ইঞ্চি। একটি ফলে তিরিশ-চল্লিশটির মত বীজ পাওয়া যায়। তিন বছর পরেই ক্যাকাও গাছে ফল ধরতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বছর ধরে ফল ধরা অক্ষুন্ন থাকে। ক্যাকাও গাছে বছরে দুবার করে ফল হয়।

ক্যাকাও গাছ উষ্ণ জলীয় অঞ্চলে জন্মায়। এজন্যে পৃথিবীতে এর বিস্তার বিষুব রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২০° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বার্ষিক বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বা ঋতুর সামান্য পরিবর্তনে এর উৎপাদনের কোন তারতম্য দেখা যায় না।

কোন কোন গাছের, বিশেষ করে কলা গাছের ছায়া ক্যাকাও গাছের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে ছায়া খুব ঘন না হলেই ভাল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবনে ক্যাকাও গাছের চাষ সম্ভব বলে মনে হয়। আন্দামান দীপপুঞ্জেও ক্যাকাও গাছ উৎপাদনের জন্যে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে।

ক্যাকাও গাছে ও ফলে অনেক রকম রোগ ধরে। পশ্চিম আফ্রিকায় বছরে প্রায় দেড় কোটি গাছ ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়। রুগ্ন গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলে আবার নতুন করে আবাদ করা হয়। পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় একপ্রকার ছত্রাক রোগের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণে ক্যাকাও ফলেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ডি.ডি.টি জাতীয় কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগে এই ধরণের রোগ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

ক্যাকাও ফল কেটে বীজ বের করে নেওয়া হয়। তখন কিন্তু বীজগুলি খুবই তিক্ত থাকে। দু'-এক দিনের মধ্যেই বীজগুলি গেঁজে যায়। কোকো এবং চকোলেট তৈরীর পক্ষে গেঁজে-যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গাঁজানো যেতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়, গাঁজানোর সময় বীজগুলির তাপমাত্রা যেন ৪৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে।

গেঁজে-যাওয়া বীজ তারপর শুষ্ক করা হয়। কয়েক দিন রৌদ্রে রেখেও বীজ শুকানো যায়। বৃষ্টি থেকে বীজ সরিয়ে রাখা দরকার। বৃষ্টিতে ভিজলে বীজে ছাতা পড়ে এবং দুর্গন্ধ হয়। দুর্গন্ধযুক্ত বীজ কোকো অথবা চকোলেটের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অতএব কৃত্রিম উপায়ে সঞ্চিত বীজ শুষ্ক করা অনেক কাল ধরেই বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে।

তারপর ক্যাকাও বীজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, ভারত প্রভৃতি দেশে জাহাজে করে পাঠানো হয়। ক্যাকাও বীজগুলিকে পরিষ্কার করে পুড়িয়ে নেবার জন্যে বড় বড় রোষ্টিং মিল ব্যবহৃত হয়। রোলারের মাঝে বীজগুলিকে যখন পিষ্ট করা হয় তখন শুকনো খোসাগুলি সহজেই আল্‌গা হয়ে বীজ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং খোসায় ঢাকা ক্যাকাও-বীজপত্র তখন বেরিয়ে আসে। ক্যাকাও-বীজপত্রকে বলা হয় নিব।

বীজপত্রকে এখন বিভিন্ন গ্র্যানিট পাথর বা ইস্পাতের রোলারের মধ্যে চূর্ণ করা হয়। বীজে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে তা চূর্ণ করবার সময় ঘর্ষণে

গলে গিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বাকী অংশ কোকো পাউডারে পরিণত হয়। গলিত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও পাউডার ঘন কালো তরল পদার্থের আকারে থাকে। গলিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে বলা হয় ক্যাকাও মাখন।

কালো চকোলেট তৈরী করতে হলে উপরিউক্ত তরল পদার্থকে আরও ভালভাবে চার দিন চার রাত ধরে পিষে নেওয়া হয়। তারপর চিনি মিশিয়ে ঐ তরল চকোলেট ছাঁচে ঢেলে ধীরে ধীরে গরম করে রকমারি কালো চকোলেট তৈরী হয়।

দুধ-মিশ্রিত চকোলেট তৈরীর কায়দা একটু আলাদা। দুধ ও চিনি মিশিয়ে গরম করে অনেকটা ক্ষীরের মত ঘন করে নেওয়া হয়। তরল চকোলেট ঐ দুধ চিনির সঙ্গে মিশানো হয়। তারপর এই তরল চকোলেট ছাঁচে ঢেলে গরম করে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী করা হয় বিভিন্ন আকারের দুধ-মিশ্রিত চকোলেট। দুধ-মিশ্রিত চকোলেট তৈরীতে সামান্য স্পিরিটও ব্যবহৃত হয়।

এক সের চকোলেটে প্রায় ৪৪৮০ ক্যালোরি খাদ্যপ্রাণ থাকে—দু-ডজন ডিমে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, প্রায় তার সমান। দুধ-মিশ্রিত চকোলেটের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে শর্করা, এক তৃতীয়াংশ স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং অল্প পরিমাণে থিওব্রোমিন রয়েছে। ফলে চা পানে যেমন শরীরের অবসাদ দূর হয়, তেমনি চকোলেট সেবনে ক্লান্ত দেহমন আবার কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরক্ষেত্রে সৈনিকদের পকেটে প্রায়ই চকোলেট থাকতো; কারণ আকারের তুলনায় পুষ্টি এতে অনেক বেশী। যাঁরা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করতে যান, দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর এবং দুস্তর মেরুঅঞ্চল যাঁদের আহ্বান জানায়, তাঁদের স্বল্প লটবহরেও কিন্তু চকোলেটের স্থান কায়েম থাকে।

ক্যাকাও বীজ থেকে কেবল যে কোকো ও চকোলেটই তৈরী হয়, তা নয়। ক্যাকাও বীজে ক্যাকাও মাখন, শর্করা, পলিফিনল, প্রোটিন, থিওব্রোমিন এবং কেফিন থাকে।

ক্যাকাও মাখন সাধারণতঃ যদিও শক্ত থাকে, তবু আমাদের রক্তের তাপমাত্রায় তা গলে যায়। এজন্যে ডাক্তারদের কাছে ক্যাকাও মাখনের আদর আছে। তাছাড়া মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাকাও মাখন গলে গিয়ে এক বিশেষ সুখানুভূতির সৃষ্টি করে। ক্যাকাও মাখনে অল্প পরিমাণ স্নেহজাতীয় অ্যাসিড এবং আয়োডিন আছে। কোন কোন চর্মরোগে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন—তখন চিকিৎসকেরা ক্যাকাও মাখনের বিধান দিয়ে থাকেন। প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতেও ক্যাকাও মাখনের প্রয়োগ আছে।

শর্করার অংশ হচ্ছে ক্যাকাও বীজপত্রের শতকরা ১৫ ভাগ। এতে সেলুলোজ, পেক্টিন, পেণ্টোজ, মেথিল পেণ্টোজ প্রভৃতি শর্করার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বীজপত্রে শতকরা ৮ ভাগ হচ্ছে পলিফিনল এবং প্রোটিন। গাঁজাবার সময় এদের মধ্যে বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। গাঁজাবার পূর্বে সাতটি অ্যামিনো অ্যাসিড দেখা যায়, গেঁজে যাবার পর এই সংখ্যা বেড়ে আঠারোটিতে দাঁড়ায়।

ক্যাকাও বীজপত্রের প্রধান অ্যালকালয়েড হচ্ছে থিওব্রোমিন। ক্যাকাও বীজপত্রে থিও-ব্রোমিনের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১.৫ ভাগ। থিওব্রোমিন ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাকাও বীজপত্রে কেফিনের অংশ হচ্ছে থিওব্রোমিনের এক দশমাংশ। ওষুধ হিসেবে কেফিনের বিস্তর প্রয়োগ আছে। শরীরের অবসাদ দূর করতে এর ক্ষমতা আশ্চর্য।

কোকো ও চকোলেট তৈরীর কারখানাগুলি কিন্তু ক্যাকাও উৎপাদনকারী দেশগুলিতে অবস্থিত নয়। ক্যাকাও বীজ পাওয়া যায় আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূল, ত্রিনিদাদ; দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, ইকুয়েডোর, ভেনিজুয়েলা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া

এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। আর সে বীজ থেকে কোকো ও চকোলেট তৈরী হয় ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষে।

কোকো ও চকোলেট উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ কোকো ও চকোলেট উৎপন্ন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কোকো ও চকোলেট তৈরীর জন্যে ওলন্দাজ ও সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের খ্যাতি আছে। এককালে ওলন্দাজদের কবলে ছিল ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ। আজ পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের যোগসূত্র অটুট রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাহাজে করে ক্যাকাও বীজ আসে রটারডামে। ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীতে সে বীজ রূপান্তরিত হয় কোকো ও চকোলেটে।

ঘানা রাজ্য সম্প্রতি ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে—ক্যাডবারীর বিখ্যাত চকোলেটের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ক্যাকাও বীজ আজও যোগান দিচ্ছে ঘানা রাজ্য।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাবে যে, কোকো ও চকোলেট উৎপাদনে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে। তাছাড়া কোকো বা চকোলেট শুধু শিশুদের মুখরোচকই নয়, এর খাদ্যমূল্যও যথেষ্ট। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন, অনেক দেশে জনসাধারণের কাছে চকোলেটের নাম আজও কানে পৌঁছায় নি, পৌঁছুলেও চকোলেট তাদের কাছে রাজার খাদ্য হিসেবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তবে আশা করা যায়—সে দিনের দেরী নেই যখন চকোলেটের আস্বাদন কোন সংকীর্ণ জনসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।
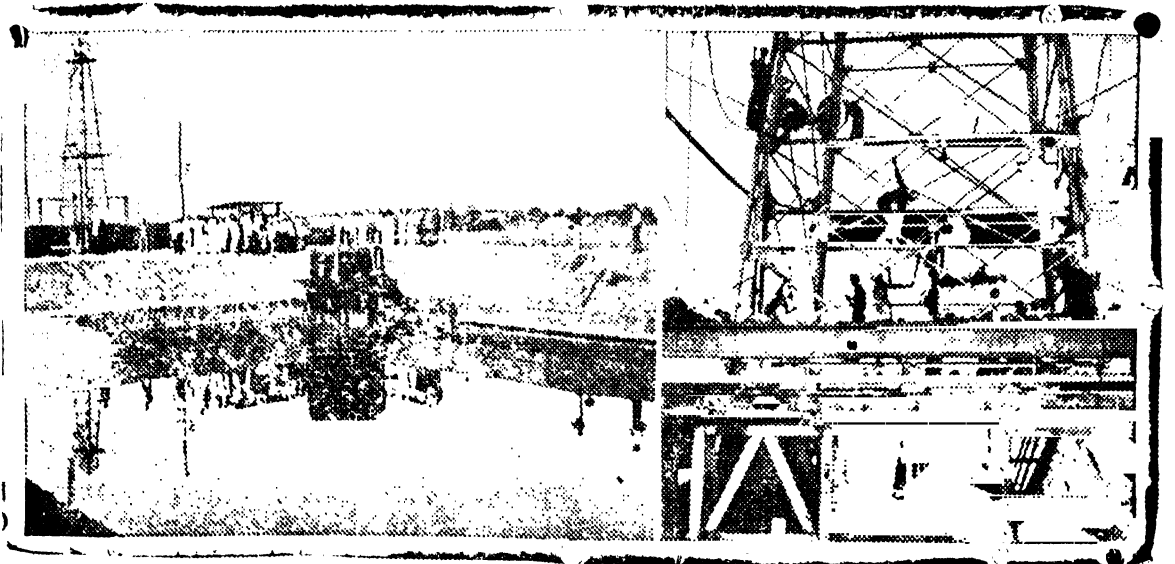
তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস কমিশনের তরুণ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারগণ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে কাম্বেতে তৈল সন্ধানের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। কাম্বেতে তৈল লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। ১নং কূপে ১৬০০ মিটার ড্রিল করিবার পর তৈল-স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরে আরও ড্রিল করিবার পরে ১৬৭২ মিটারে উচ্চ চাপে তৈল-স্তর ও স্বাভাবিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই স্তর মোটামুটি ব্যাপক বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঁ-দিকে ও ডান-দিকের ছবিতে যথাক্রমে কাম্বে তৈল পুষ্করিণী ও কাম্বেতে দ্বিতীয় কূপ খননের দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

একটা জাতির জীবন-ইতিহাস—তাহার উত্থান-পতন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত জীবনীর সমষ্টি মাত্র। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহাদের জীবনীর অনেকখানি অধিকার করিয়া আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। রাজা রামমোহন আমাদের জাতীয় জীবন বিকাশের প্রথম সাড়া আনিয়াছিলেন। তাহাতে কতক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের মধ্যে স্বাদেশিকতা উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনি শিক্ষিতের মধ্যে কথা কহিবার জন্য বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং বাংলায় সাময়িক পত্র প্রচার করেন। তাঁহার পরবর্তীকালে বঙ্গবাসী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া এতদূর মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি যে সম্ভব, তাহা কল্পনাও করেন নাই। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণসম্মত বাংলা ভাষার প্রচলন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন না, তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সাহিত্য-রস তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইল। তাঁহার ভাষার বাক্য-সমন্বয়, শব্দ-বিন্যাস এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশী ভাষা প্রীতি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, 'লেখা পড়ার কথা দূরে থাক এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাংলায় হয় না।……যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীতেই হয়, কখনও ষোল আনা, কখনও বার আনা ইংরাজী। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনও বাংলায় হয় না। আমরা কখনও দেখি নাই, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাংলায় পত্র লেখা হইয়াছে।'

শিক্ষিতের এইরূপ প্রতিকূল মানসিক অবস্থা-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের একাগ্র সাহিত্য তপস্যা সফল হইল। তাঁহার রচনায় লোকশিক্ষার প্রচেষ্টা অন্যতম লক্ষ্য ছিল। 'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন,…তবে অবশ্য লিখিবেন।'

টিণ্ডাল, হাক্স্‌লি প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের রচনার অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বিজ্ঞান রহস্যে' নয়টি প্রবন্ধ আছে,—আশ্চর্য সৌরোৎপাত, আকাশে কত তারা আছে? ধূলা, গগন পর্যটন, চঞ্চল জগৎ, কতকাল মনুষ্য? জৈবনিক, পরিমাণ-রহস্য ও চন্দ্রলোক। বলা বাহুল্য ভাষার লালিত্যে, ভাবের বিকাশে, পরিভাষা গঠনে প্রবন্ধগুলি অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা

অঙ্গারজান—Carbon
অচেতন—Inanimate
অম্লজান—Oxygen
আঙ্গরিক অম্ল - Carbonic acid
আন্দোলন—Motion
আমনিয়া—Ammonia
উদ্গাত—Erupted
এক ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্থ—One square inch
কিরীটমণ্ডল—Corona
কীটাণু—Bacterium
কুঞ্চনক্রিয়া—Contraction
ক্ষীণ—Rare
গণনা দ্বারা সিদ্ধ—Proved by calculation

গাগনিক—Celestial
গাঢ়—Dense
গোলাকার—Spherical
চক্রাণু—Corpuscles
জনকতা শক্তি—Power of multiplication
জলজান বায়ু—Hydrogen gas
জীবজনক—Multiplication of germs
জৈবনিক—Protoplasm
তাপক্ষয়—Loss of heat
তাপমান যন্ত্র—Thermometer
তাপরোধক—Heat resistant
দাহ—Combustion
দূরবীক্ষণ সমীপাগত—Within the telescopic range
পরীক্ষাধীন—Proved by experiment
পীড়াবীজ—Germ
পোতাস—Potash
প্রক্ষিপ্ত—Vibrated
প্রতিবন্ধকতা—Resistance
প্রতিহত—Refracted

'ধূলা' সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন—'আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত বাবুগিরি করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিস্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়া মধ্যে কোন রন্ধ্র নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে-বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিকচিক করিতেছে।'

'গগন পর্য্যটনে' আকাশের গাঢ় নীলিমার প্রসঙ্গে বলিলেন—'আমরা যে আকাশকে উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক করা যায়। সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ। কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধবর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক রেখা আমদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি।'

'চঞ্চল জগতে' তিনি আলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন। 'ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভব করি। এই সকল আন্দোলন ক্রিয়া মনুষ্যের অগোচর—উহা তাপরূপেই এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্তৃক গ্রহণ করিতে পারি।'...'প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক পৃথক। তরঙ্গেরই বা বর্ণ বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গ বেগের তারতম্য।'

বায়ু সম্বন্ধে লিখিলেন—'ইহাতে অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও আছে, তাহার নাম যবক্ষারজান। অম্ল ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে, মিশ্রিত মাত্র।'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রোটোপ্লাজম্‌কে জৈবনিক বলিলেন। জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফলে জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই।

জৈবনিক আদিম প্রাণবস্তু। তাহা বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোক মোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই। যে হংসপুচ্ছ লেখনীতে আমি লিখিতেছি সেও যাহা আমিও তাই। সকলই জৈবনিক।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আমাদের এই চঞ্চল সুখ-দুঃখবহুল, বহু স্নেহ'পদ জীবন কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগ সমবেত জড়পদার্থের ফল। জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্তা।

বঙ্কিমচন্দ্র জড় পদার্থ উদ্ভূত জৈবনিক আদিম মৌলিক পদার্থ মনে করিয়া যাহা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে তাহা শুনিতেছি। পরমাণুর ভিতর জ্যোতিঃকণার সন্নিবেশ। পরমাণুর সৌরজগতে কয়েকটি প্রোটন সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া সমসংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহ কক্ষপথে আবর্তিত। যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই প্রকার—বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। অক্সিজেনের সব পরমাণুই এক প্রকার, হাইড্রোজেনের পরমাণু এক প্রকার, কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণু হইতে ভিন্ন। তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা পৃথক পৃথক। কিন্তু সব পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রনের সন্নিবেশ মাত্র—সুতরাং মূলে সব পদার্থে একই জ্যোতিঃকণার সমাবেশ মাত্র—একই প্রাণসত্বা সর্বভূতে বিরাজ করিতেছে।

চন্দ্রলোক সম্বন্ধে বলিলেন—'চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগবগ করিয়া ফুটিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন সহস্র সহস্র বিবর বিশিষ্ট, কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ পাষাণময়।

বহুস্থলে দেখি, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গী রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। সাধারণের ধারণায় শুষ্ক বিজ্ঞানকে যদি সরস করিয়া প্রকাশ করা হয়, পাঠকের তাহা মনোগ্রাহী হইবেই। প্রবন্ধের প্রারম্ভ রসপিচ্ছিল পথে পাঠককে অজ্ঞাতসারে উপসংহারে পৌছাইয়া দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, 'সমুদ্র তীরে যেমন বালি, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য ও ঘন বিন্যস্ত।'

'অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই।'

'উদ্ভিদেরা এ জগতে চাষা তাহারা উৎপাদন করে, অপরেরা (প্রাণীরা) জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জ্জন কাড়িয়া যায়, আপনারা কিছু করে না'।

[শব্দের গতি প্রসঙ্গে রমণীর মৃদুস্বরের কথায় বলিতেছেন] 'কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে ইচ্ছা করে যে নাকের চশমা খুলিয়া কানে পরি।'

এমনি প্রকাশ-চাতুর্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন রচনায় ছড়াইয়া আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেন—"জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি তাহা একস্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যের উদার ব্যাপক মূর্তি প্রকটিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্রোতস্বতীর মত বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য রচনা সকলই অনন্ত অভিসারী হইয়াছে। বিজ্ঞান নিজ উদ্ভাবনী শক্তি দিয়া বিশ্বের আদি সত্বার পরিচয় পাইয়াছে। দর্শন ও সাহিত্য সর্বস্থানে প্রাণশক্তির ওতপ্রোত প্রকাশ দেখিয়াছে।

বিজ্ঞান বলে কোন জিনিষের গতিবেগ নির্ভর করে তাহার গুরুত্ব ও বিবর্ধনের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি জিনিষ জোর করিয়া চালাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা আজও বাংলা দেশে চলিতেছে। বেগের পরিচায়ক যখন পদার্থের গুরুত্ব, তখন তাঁহার কীর্তির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা অনুভব করি। তাঁহার কীর্তি বাঙ্গালীকে সর্বদিকে যে রেনেশাঁসের পথে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছে তাহার গতি ক্রমবিবর্ধন সহকারে বেগবতী হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পপভের জন্ম-শতবার্ষিকী

(১৮৫৯ ১৯৫৯)

পৃথিবীতে যে বার্তাটি প্রথম (সঙ্কেত নয়—একটি স্পষ্ট বার্তা) বেতারে পাঠানো হয়েছিল সেটি হলো—"হাইন্‌রিশ হার্ৎসেন।" বেতারের উদ্ভাবনকারী রুশ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পপভ

আলেকজাণ্ডার পপভ্

এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞানীর প্রতি। এ হলো ১৮৯৬ সালের ২৪শে মার্চের ঘটনা।

তারও এক বছর আগে রুশ রাসায়নিক পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতির এক বৈঠকে পপভ্ তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি প্রদর্শন করেছিলেন। বেতার-তরঙ্গ নিঃসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিটার দূরে স্থাপিত যন্ত্রে সাড়া জাগলো—অদৃশ্য বেতার সঙ্কেতের প্রভাবে যন্ত্রে ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগলো। বিনাতারে সঙ্কেত পাঠান হলো—পৃথিবীতে সেই প্রথম। যুগান্তকারী

আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের বিবরণীতে যেসব তারিখ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তারই একটি হলো—সেই তারিখটি—১৮৯৫ সালের ৭ই মে।

'হাইন্‌রিশ হার্ৎস'—বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল মাত্র ২৫০ মিটার দূরে; ১৮৯৫ সালের ৭ই মে তারিখের সঙ্কেত দিয়েছিল মাত্র কয়েক মিটার দূরে। কিন্তু ১৮৯৫ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রথম প্রদর্শনেই বক্তৃতার উপসংহারে পপভ্ ঘোষণা করেছিলেন—আমার যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করে তুলে দূরে সঙ্কেত পাঠাবার জন্যে ব্যবহার করা যাবে বলে আমি আশা রাখি। এক বছরের মধ্যে 'হাইনরিশ হার্ৎস' বার্তা ২৫০ মিটার অতিক্রম

পপভ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত ঝড় নির্দেশক যন্ত্র

করেছিল। ১৯০০ সালে অ্যাডমিরাল আপ্রাক্সিন নামে রুশ যুদ্ধজাহাজ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে ডাঙ্গায় আটকে যাবার পর পপভ্ গগ্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ আর কোৎকা শহরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন—এদের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০ কিলোমিটারের।

১৯০৬ সালে পপভ্ অকালে পরলোক গমন করেন। তার পর থেকে বেতার আর বেতার-ইলেকট্রনিকস্-এর যেরূপ দ্রুত প্রসার ঘটেছে, পপভ্ তা দেখে যেতে পারেন নি। পপভের সময়ে তার অনেক কিছুই ছিল কল্পনারও অতীত।

বেতার আর বেতার-ইলেকট্রনিকস্-এর বিকাশকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

বেতার উদ্ভাবন থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে কার্যক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগ ছিল বেতার-টেলিগ্রাফ যোগাযোগের ব্যাপারে। পাল্লা অনেক কিলোমিটারে উঠলো; কিন্তু ইলেকট্রনিক্স্ বিবর্ধক ভাল্‌ভ্ না থাকায় তখনও রিসিভারের সুগ্রাহিতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

১৯১৮ থেকে ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইলেকট্রন নল তৈরী হলো। দেখা দিল বেতার টেলিফোন আর বেতার-প্রচার ব্যবস্থা। দূর পাল্লায় হ্রস্ব তরঙ্গ সঞ্চারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। পৃথিবীর যে কোন দুটি কেন্দ্রের মধ্যে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠলো। বেতার আর বেতার-ইলেকট্রনিকস্ এর নতুন নতুন প্রয়োগের ক্ষেত্র খুলে গেল। শব্দ-চিত্রের উদ্ভবও এই পর্যায়েরই ঘটনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বলা যায় তৃতীয় পর্যায়। অতি হ্রস্ব তরঙ্গ, নিখুঁত টেলিভিশন, স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র (অটোমেটন) আর গণনাকারী ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রবর্তন হলো এ পর্যায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণ বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, সংস্কৃতি আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেতার-ইলেকট্রনিকস্ বিদ্যার প্রচারের ফলে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা—বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা, বেতার-বর্ণালীবিশ্লেষণ বিদ্যা, বেতার-জিওডেসি, বেতার-উল্কাবিদ্যা ইত্যাদি।

পপভের স্বদেশবাসীরা সোভিয়েট আমলে বেতার-ইলেকট্রনিকস্-এর ভাণ্ডারে বহু অমূল্য সম্পদ সংযোজন করেছেন। ১০,০০০,০০০,০০০ ইলেকট্রন-ভোল্টের প্রোটন সিনক্রোটন, বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র

এবং পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণের মত অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সোভিয়েট বেতার-ইলেকট্র-নিক্‌স্-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ২রা জানুয়ারী প্রথম মহাজাগতিক রকেট ক্ষেপণে এই সাফল্য একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ ঘটনাও পপভের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঘটনা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আলেকজাণ্ডার পপভ্ যখন কাজ করেছিলেন তখনও তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে বলা হতো তড়িৎ-রশ্মি। পপভের বন্ধুবর্গ বলে গেছেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নিয়মগুলিকে সঠিক গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। তারপর হার্ৎস্ পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ফ্যারাডে আর ম্যাক্সওয়েল যে সূত্রগুলি স্থির করেছিলেন, তার যাথার্থ্য এই ভাবে প্রমাণিত হয়।

একা পপভ্ নন, আরও কয়েকটি দেশের আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীও ঐ তড়িৎ-রশ্মি নিয়ে কাজ করেছিলেন; যেমন—ফ্রান্সে ই. ব্র্যান্‌লি, ইংল্যাণ্ডে
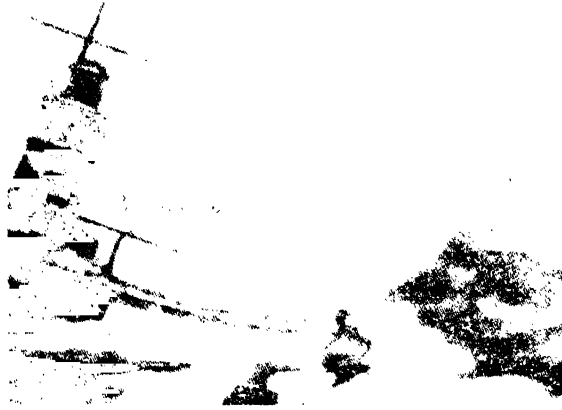
গগল্যাণ্ড দ্বীপে স্থাপিত বেতার-কেন্দ্রের দৃশ্য। এই কেন্দ্র থেকে পপভ্ তাঁর পরীক্ষা করেছিলেন।

—১৮৮৫ সালের পর থেকেই পপভ্ সেই তড়িৎ-রশ্মির সাহায্যে বিনাতারে সঙ্কেত পাঠাবার সম্ভাবনা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করছিলেন। এই ভাবে পপভ কাজ করেছিলেন, পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ভিত্তিতে। সেগুলি হলো—ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আর জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এবং জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী হাইন্‌রিশ হার্ৎস্-এর আবিষ্কার। ফ্যারাডে তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের (ইন্‌ডাকশন) নিয়ম অলিভার লজ, যুগোস্লোভিয়ায় উদ্ভাবনকারী ইলেকট্রিশিয়ান নিকোলা টেস্‌লা, ইটালীর গুগ্‌লিএল্‌মো মার্কোনি এবং ভারতের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁরাও তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রেরণ এবং গ্রহণের উপযোগী সরঞ্জাম তৈরী করেছিলেন; কিন্তু প্রধানতঃ সামাজিক সীমাবদ্ধতার দরুণ আর সরকারী সমর্থনের অভাবে তাঁদের কারও পক্ষে লেবরেটরির চৌহদ্দী পার হওয়া সম্ভব হয় নি। পপভের উদ্ভাবনের এক

বছর পরে শুধু ইংল্যাণ্ড থেকে মার্কোনির বেতার-টেলিগ্রাফি ব্যবস্থার খবর আসে।

বেতার-উদ্ভাবনকারী পপভের জন্ম হয় একজন পাদ্রীর ঘরে—উরালের তুরিয়িন্স্কিয়ে-রুদ্নিকি নামক গ্রামে। সেণ্টপীটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবার গোড়াতেই পপভ্ গাণিতিক পদার্থ-বিদ্যা এবং তড়িৎ-চৌম্বকত্বের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন। অনার্স সহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ক্রনস্তাদ্ নৌ বিদ্যায়তনে শিক্ষকতার কাজ সুরু করেন। সেখানে তিনি তড়িৎ এবং চুম্বক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাও করেছিলেন। ১৮৯৫ সালের ৭ই মে বেতার-প্রদর্শনীর সময়ে তিনি ক্রনস্তাদ্ টর্পেডো বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৪-১৯০৫ সালে রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ার আসে। তখন পপভ্ ছিলেন সেণ্টপীটার্সবার্গ তড়িৎ-কারিগরী বিদ্যায়তনের পরিচালক। কিন্তু জারের পুলিশের অত্যুগ্র দমনীতির ফলে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রেরাও নির্যাতিত হতে লাগলো। ফলে পপভ্কেও পুলিশের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বিজ্ঞানী পপভ্ খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে যায়। এই ভাবে ১৯০৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী মাত্র ৪৬ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার পপভের অকালমৃত্যু ঘটে।

প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় এবং বিদেশেও অনেকে তখনই পপভের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের আগে—আজকের টেলিভিশন আর ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্-এর যুগের আগে এই রুশ বিজ্ঞানীর কাজের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় নি। আজ এতটুকু অতিশয়োক্তি না করেই বলা যায় যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেতারের যা প্রভাব তার সঙ্গে একমাত্র পারমাণবিক শক্তির তুলনা করা চলে।
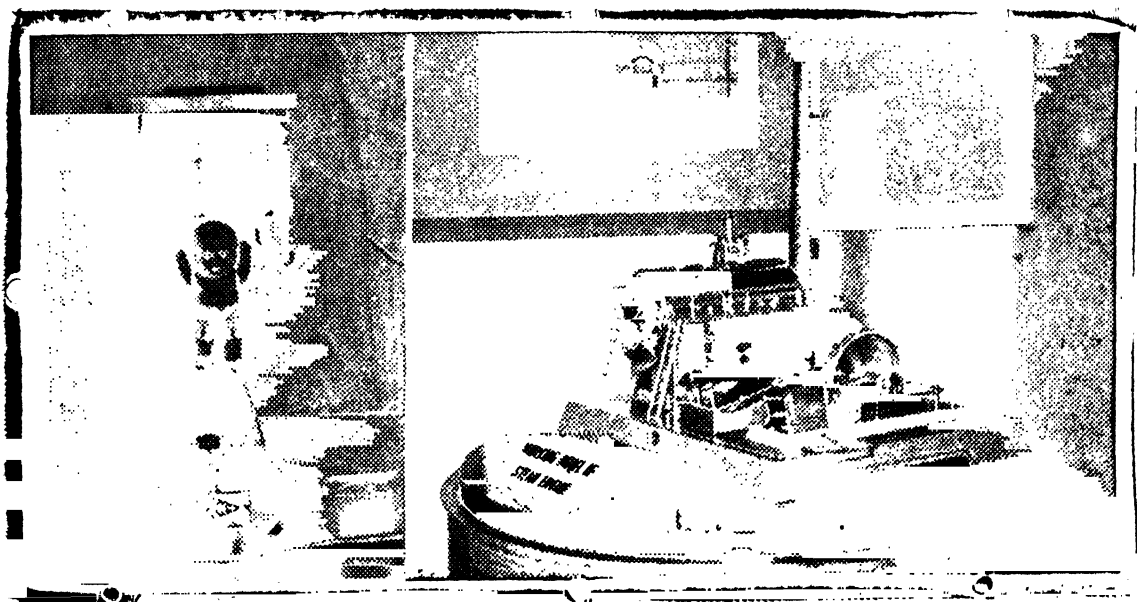
বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতায় বিড়লা শিল্প ও কারিগরি যাদুঘর বর্তমান বৎসরের ২রা মে স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতে এই ধরণের যাদুঘর এই প্রথম। বাঁ-দিকে ও ডানদিকের ছবিতে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক চুম্বক ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মডেল দেখা যাইতেছে।

গণিতে শূন্যের আবিষ্কার ও তার পটভূমিকা

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

ক্যাবলা এবার গণিতে নাকি ১০০ থেকে ১ বাদ দিলে যত থাকে তত পেয়েছে—তার ছোট ভাই হাবলা একথাটা প্রচার করছে। কথাটা শুনে আমি বিশ্বাস করি নি; কারণ গণিতে শূন্য পাওয়াই ক্যাবলার বরাবরের অভ্যাস, একেবারে ৯৯ পাওয়ার মত গতিশক্তি সে পেল কি করে? কিন্তু হাবলা যখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল তখন সব কিছু পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিটা কেমন জানি গুলিয়ে গেল। হাবলার প্রতিপাদ্য এই যে, ১০০ থেকে ১ নিয়ে নিলে দুটা শূন্য থাকে—আর একটা শূন্যও যা, দুটা শূন্যও তা। সুতরাং ক্যাবলা যে গণিতে শূন্য পেয়ে তার একাধিপত্য বজায় রেখেছে—এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্দেহ আমারও নেই, তবে হাবলা যেভাবে ১০০ থেকে ১ কেটে দিয়েছে, ওই ভাবে কেটে দেওয়া যায় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ রয়ে গেছে। আপনাদেরও নিশ্চয়ই সন্দেহ থাকবার কথা; কারণ হাবলার মত উর্বর মস্তিষ্ক আপনাদের নিশ্চয়ই নয়!

হাবলা এখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। চার অঙ্কের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব কিছুই সে করতে পারে (অবশ্য সংখ্যাগুলি পড়তে বললে কাবু হয়ে পড়ে)। এদিক দিয়ে তার কৃতিত্ব মোটেই কম নয়। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, চার অঙ্কের একটা গুণ করতে বিখ্যাত গ্রীক গণিতবিদ্ আর্কিমিডিস বা অ্যাপোলোনিয়াসকে অন্ততঃ এক ঘণ্টা মাথা খাটাতে হতো, হাবলা করে মাত্র এক মিনিটে। হাবলা প্রথমে অঙ্কগুলি শ্লেটে বা কাগজে বসিয়ে নেয়, তারপর চট্‌পট করে অঙ্কের পর অঙ্ক বসিয়ে যায়। আর্কিমিডিস কিন্তু এমনটা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাঁকে নিতে হতো একটা গণক যন্ত্র (abacus), যার লেবেল মারা চারটা স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভে ১০টা করে ঘুঁটি। প্রত্যেক স্তম্ভের ঘুঁটি সরিয়ে হিসাব করে অনেক পরিশ্রমের পর উত্তরটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে মাটি বা চামড়ার উপর সেটা লিখে ফেলতেন। গুণটা কোন রকমে হতো, কিন্তু ভাগ করতে বললে প্রাচীন গ্রীকরা রীতিমত কাবু হয়ে পড়তো। ভাগের ব্যাপারটাকে তাঁরা সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখতো। কথাটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—আর্কিমিডিস, পিথাগোরাস, অ্যাপোলোনিয়াস, ইউক্লিড, প্যাপাস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক ধুরন্ধররা, যাঁরা জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, যাঁদের জ্যামিতির এক একটা উপপাদ্য বুঝে উঠতে হাবলাকে কয়েক বছর পরে ধরাশায়ী হতে হবে, সামান্য একটা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে সেই মহারথীদের রীতিমত মাথা চুল্‌কাতে হতো!

কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে বুঝিয়ে বলি। আমরা এখন যেভাবে সংখ্যার ব্যবহার করি (সারা পৃথিবীর লোকেরাও তাই করে), প্রাচীন গ্রীকরা তা করতে পারতো না। এটা তাঁদের কল্পনায়ও আসতো না। শুধু গ্রীকরা কেন, খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে পৃথিবীর কোন সভ্যজাতিই এটা জানতো না। তবে প্রথমে জানলো কারা? খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুরাই আধুনিক পদ্ধতিতে সংখ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছিল। আধুনিক সংখ্যা লিখন পদ্ধতির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি? আছে নিশ্চয়ই। সেটাই এখানে আলোচনা করবো। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০—এই দশটা অঙ্ক নিয়েই

সমগ্র গণিত শাস্ত্রটা গড়ে উঠেছে। এগুলিকে অবলম্বন করে পরে যত কিছু কারিকুরি হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলিকে গণিতের মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। এই মেরুদণ্ডটা গড়েছেন ভারতীয়েরাই। মেরুদণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হলো সুষুম্না কাণ্ড। উপরের দশটা অঙ্কের মধ্যে ০-অঙ্কটাই হচ্ছে ওই সুষুম্না কাণ্ড। ওটা না থাকলে গণিতের সুদৃঢ় প্রাসাদটা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তো। এই শূন্যের আবিষ্কারটাই হিন্দুদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। হিন্দুরা কি পৃথিবীকে ১, ২, ৩,···ইত্যাদি গুণতে শিখিয়েছেন নাকি? না তা শেখান নি, গোণবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবে সংখ্যা গোণবার ক্ষমতা জাতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক কিনা, বলা যায় না। কারণ যে হিন্দুরা দু' হাজার বছরেরও আগে সংখ্যা-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে এসেও তাদের বহু বংশধর এখনও গণ্ডা বা কুড়ি দিয়ে সংখ্যা গণনা করে। উচ্চ সংখ্যার কল্পনা ও ব্যবহার জাতীয় সংস্কৃতি অপেক্ষা শিক্ষার উপর বেশী নির্ভরশীল বলে মনে হয়।

প্রাচীন জাতিরা সংখ্যা লিখতো কি ভাবে? কয়েকটা প্রাচীন সংখ্যা লিপির নিদর্শন এখানে দেখানো হলো।

প্রাচীন সংখ্যা লিপির কয়েকটি নমুনা।

তবে এদের তাঁরা চিত্রলিপির গোলক ধাঁধা থেকে উদ্ধার করে মুক্ত আলোকে নিজস্ব সবল ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন।

গোণবার অভ্যাস মানুষের অতি প্রাচীন। আদিম মানুষ যখন পশুপালন করতে শিখেছিল বা তারও আগে যখন খাদ্যশস্যের জন্যে বীজ বুনতে শিখেছিল, তখনই সে গোণবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। গোণবার ক্ষমতা অবশ্য সব আদিম জাতি সমানভাবে লাভ করে নি। আফ্রিকার হটেনটট্‌রা নাকি এখনও তিনের বেশী গুণতে হলে বলে—অনেক। আমাদের প্রতিবেশী সাঁওতালদের

উপরের লিপিগুলিকে সংখ্যার চিত্র-লিপি বলা যেতে পারে। ভাষার ইতিহাসেও দেখা যায়, মানুষ প্রথমে চিত্রলিপি ব্যবহার করতো। পরে নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক বর্ণমালা-গুলির সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক সংখ্যালিখন পদ্ধতিকে যদি সংখ্যার বর্ণমালা বলা যায়, তবে এই প্রাচীন লিপিগুলিকে সংখ্যার চিত্রলিপি নাম দেওয়া যেতে পারে। ভাষার চিত্রলিপির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর জন্যে ও পরে বিভিন্ন শব্দের জন্যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হতো। সংখ্যার চিত্রলিপিতেও দেখা যায় যে,

বিভিন্ন সংখ্যার জন্যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হতো। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা সংখ্যার বর্ণমালা (১, ২, ৩,...৯, ০) আবিষ্কার ও তাদের অবস্থানগত মর্যাদা দিয়ে গণিতের একটা বৈজ্ঞানিক ভাষা আবিষ্কার করেন নি, ততদিন মানুষ অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছিল। অবস্থানগত মর্যাদা জিনিষটা কি? হিন্দুরা বললো যে, গণিতের অঙ্কগুলিকেও পদমর্যাদা দিতে হবে। পদগুলি হলো দশ দশ গুণ করে ভারী। প্রথম পদটার নাম—একক, দ্বিতীয় পদটার নাম—দশক, তার পরেরটা শতক... ইত্যাদি। তাঁরা আরও বললো, "অঙ্কস্য বামাগতি", অর্থাৎ পদগুলিকে সাজাতে হবে ডান থেকে বাঁ-দিকে। ধরুন,—একটা সংখ্যা ১১১১—সবচেয়ে ডান দিকের ১টা খাঁটি এক, তার বাঁয়েরটা কিন্তু দশ, তার বাঁয়েরটা একশ', তার বাঁয়েরটা এক হাজার। একুনে সংখ্যাটা দাঁড়ালো (১০০০+১০০+১০+১) এক হাজার একশত এগারো। ১-ই অবস্থানভেদে দশ গুণ করে ভারী বা হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। এ তো গেল একটা দিক, কিন্তু আর একটা গুরুতর কথা আছে। আপনি একটা সংখ্যা লিখতে চান, একশ' এক—এককের ঘরে পাচ্ছেন ১, শতকের ঘরে পাচ্ছেন ১, দশকের ঘরে কি? কিছু না। তার মানে কি? শূন্য—হিন্দুরা লিখলো ০। ধরুন, আপনার অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ খালি হয়েছে, তাঁর চেয়ারটা সরিয়ে না নিয়ে, খালি চেয়ারটা তাঁর বসবার জায়গায় রেখে দিন। ওটাই হলো খালি পদের প্রতীক। এখন বোঝা যাচ্ছে—হিন্দুদের সংখ্যা লিখন পদ্ধতির কৌশলটা কি। তাহলেই বুঝতে পারছেন, ১০০ থেকে ১ বাদ দিলে ক্যাবলা কেন শূন্য পেতে পারে না, ১০০ থেকে ১০০ বাদ দিলেই শূন্য পাবে।

এভাবে অঙ্কগুলিকে একটা প্রকৃত মান ও একটা স্থানীয় মান দিয়ে এবং শূন্য স্থানে ০ বসিয়ে হিন্দুরা গণিত-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করেন।

হিন্দুদের এই চমৎকার পদ্ধতি বাণিজ্যের পথ ধরে ফিনীসীয় ও আরবদের কাছে পৌঁছায়। আরবীয়েরা তখন সভ্যতার উন্নত শিখরে উপনীত হয়েছে। তারা এই পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তার ফলে তারা বীজগণিতের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আল খারিস্মি যে বীজগণিতের গ্রন্থটি লিখলেন, তাই হয়েছিল পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বীজগণিতের প্রধান অবলম্বন। আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতি ইউরোপে পৌঁছলো এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আজ সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিই চলছে এবং এরচেয়ে কোন উন্নততর পদ্ধতির কথা কেউ চিন্তাও করে নি।

গ্রীক ও রোমানদের গণিতের জ্ঞান গণন-যন্ত্রের ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়েছিল। রোমান লিপিতে গণন-যন্ত্রের প্রত্যেক স্তম্ভের জন্যে এক একটা প্রতীক ব্যবহৃত হতো; যেমন—এককের প্রতীক I, দশক X, শতক C, সহস্রক M। প্রত্যেক স্তম্ভে থাকতো দশটা করে ঘুঁটি। একটা স্তম্ভের সব কয়টি ঘুঁটি ফুরিয়ে গেলে সেগুলি সরিয়ে দিয়ে পরের স্তম্ভের একটা ঘুঁটি বের করা হতো। কোন একটা স্তম্ভের একটা ঘুঁটিও ব্যবহার করতে না হলে, সেটাকে বাদ দিয়ে তার পরের স্তম্ভটা ধরা হতো। এমনিভাবে সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে উঠতে রীতিমত লড়াই করতে হতো। তবে লড়াইটা যত জমে উঠতো ততই মনে করা হতো যে, বুদ্ধিতে শান পড়ছে। এর ফলে কি হয়েছিল? আর্কিমিডিসের আগে গ্রীকরা ১০ হাজারের বড় সংখ্যা কল্পনা করতে পারতো না। গুণ করতে তারা কুন্তি করতো, ভাগ করতে ভয় পেতো। গুণটা করতো—যোগের হিসাবে; ২৫×২৭-এর অর্থ তাদের কাছে ছিল—২৫ বার ২৭ অথবা ২৭ বার ২৫। ভাগ করতো তারা বিয়োগের নিয়মে; ১২১÷১০—এর অর্থ ১২১-এর মধ্যে ১০ কতবার আছে; অর্থাৎ ১২১ থেকে ১০ কতবার বিয়োগ করা যায়। ১২ বার করা যায়; বাকী থেকে

গেল ১। তা তো হলো—কিন্তু ঠিক উত্তরটা হলো কি? এখন একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র এটা বলতে পারে। কিন্তু গ্রীকরা তা পারতো না; কারণ ভগ্নাংশের ধারণা তাদের হয় নি। এই যে কিছু বাকী থেকে গেল, তা নিয়ে কি করা যাবে, তা তারা ভেবে ভয় পেতো। ভাবতো, ভাগ ব্যাপারটা অমঙ্গলসূচক, তাই পারতপক্ষে তারা ভাগ করতে চাইতো না। সবচেয়ে মজার কথা—গ্রীকরা আমাদের মত কাগজকলম নিয়ে অঙ্ক করতে পারতো না। গণন-যন্ত্রটাই তাঁদের প্রতিভাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। নিজেদের দুর্বলতা দূর করবার জন্যে তারা গণন-যন্ত্রটার উন্নতির কথা চিন্তা করতো; কিন্তু সর্ষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে বসে আছে, সেটা তারা বুঝতে পারতো না। যন্ত্র মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু যন্ত্রটা ভুল হলে সেটা শুধু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু গণন-যন্ত্র নয়, গ্রীকরা আরও একটা মুস্কিলে পড়েছিল। তারা বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সংখ্যার প্রতীক সৃষ্টি করতে গিয়ে বর্ণমালাকে শেষ করে এনেছিল; তারপরে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। রোমান লিপি এর চেয়ে কিছুটা ভাল ছিল (গ্রীক ও রোমান লিপির তুলনা করলে এটা বোঝা যাবে)। কিন্তু এরও একটা সীমা ছিল এবং এটাও গণিতকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

এখন অন্যান্য চিত্রলিপিগুলির দোষ-গুণ বিচার করা যাক। মিশরীয়, সুমেরীয় ও মায়া লিপি, গ্রীক ও রোমান লিপির চেয়ে অনেকটা আদিম এবং অসংস্কৃত হলেও এদের দু-একটা গুণও ছিল। এগুলি ছিল অনেকটা বাস্তবানুগ এবং বর্ণমালার সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলবার চেষ্টা করা হয় নি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী চীনা লিপির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। চীনা লিপি ছিল আবার বেশী বাস্তবানুগ; কারণ এতে অন্যান্য লিপির মত বিভিন্ন সংখ্যার জন্যে প্রতীক কল্পনা করা হয় নি। সংখ্যার মধ্যে যতগুলি একক ততগুলি দাগ (—)। এতে অসুবিধা অবশ্যই ছিল—দাগের পর দাগ দিতে দিতে দাগের পাহাড় হয়ে যেত। তার জন্যে বড় বড় সংখ্যা লিখতে রীতিমত অসুবিধা হতো এবং ভুলের সৃষ্টি করতো। কিন্তু এর একটা সম্ভাবনাও ছিল; কারণ এটা ছিল প্রতীকের সংস্কারমুক্ত। প্রতীক জিনিষটা একটা নেশার মত প্রাচীন জাতিদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। বড় বড় সংখ্যার প্রতীক সৃষ্টি করতে গিয়ে তারা সহজ সম্ভাবনার পথটা দেখতে পায় নি। ধরুন, মিশরীয় লিপিতে লিখতে চাই ৩২, লিখলাম একটা চিত্র লিপি। এখন লিখতে চাই ৩০২ বা ৩২০ বা ৩২০০। কি করে লিখবো বা এই লেখাটার দ্বারা যে ওই সংখ্যাগুলিকে বোঝাচ্ছে না, তা কি করে বুঝবো? এ সমস্যার সমাধান করতে হলে দুটা উপায় আছে। প্রথমতঃ ১০০, ১০০০ প্রভৃতি সংখ্যার জন্যে এবং দরকার হলে মধ্যবর্তী সংখ্যার জন্যে প্রতীক সৃষ্টি করতে হবে। প্রাচীন জাতিরা তাই করতো। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে! রোমান লিপির শেষ প্রতীক ছিল M (১০০০)। আরও উচ্চতর প্রতীক সৃষ্টি করতে বোধ হয় তারা ভয় পেয়েছিল। আর একটা উপায় হলো শূন্য স্থানের জন্যে একটা কিছু চিহ্ন দেওয়া। যেমন, চীনা লিপিতে ৩০২ বলতে ☰∘═। মধ্যের বিন্দুটা দশক স্থানের শূন্যতার প্রতীক। জিনিষটা প্রায় আধুনিক হয়ে পড়েছে; কেবল ওই দাগগুলি বদলে ফেলতে পারলেই চুকে যায়। এ-থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, চীনা লিপির সম্ভাবনা কতখানি ছিল, যা অন্য লিপির ছিল না; কেবল ওই মধ্যের বিন্দুটার অভাবে কিছু হয় নি। প্রাচীন লিপিগুলির মধ্যে একমাত্র মধ্য আমেরিকার অধুনালুপ্ত মায়া জাতির পঞ্জিকা লিপিতে এমনভাবে বিন্দু ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু তারাও ঠিক পথটা ধরে উঠতে পারে নি। হিন্দুরাও বোধ হয় গোড়াতে শূন্য স্থানে একটা বিন্দু বসাতো,

পরে 0 বসানো হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, 0-এর গুরুত্বটা প্রথমেই হিন্দুদের মাথায় ঢোকে নি, অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছু দিন কেটেছিল; কিন্তু তারা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক পথটা ধরতে পেরেছিল।

মানুষের হাতের দশটা আঙ্গুল থেকেই দশ সংখ্যাটাকে দশের একক করবার কল্পনা হিন্দুদের মত বহু প্রাচীন জাতিই করেছিল। কিন্তু হিন্দুদের কৃতিত্ব এই যে, তারা দশটা সংখ্যার জন্যে দশটা প্রতীক সৃষ্টি না করে, ন'টার জন্যে করলো এবং বাকী একটার জন্যে 0 রাখলো। এখন স্থানের মর্যাদার কথা চিন্তা করে এবং শূন্যস্থানে 0 বসিয়ে অতি সহজে যতবড় খুশী সংখ্যা লিখবার ব্যবস্থা করে। এর পর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে একের চেয়ে ছোট সংখ্যার কল্পনাও স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাথায় এলো এবং সেটা যে দশের ভাগে ভাগে পর পর নেমে যাবে, সেটা চিন্তা করতেও তাদের মোটেই কষ্ট হলো না। এই ভাবে দশমিক ভগ্নাংশের সৃষ্টি হলো। দশমিকের প্রয়োগ যে হিন্দুদেরই দান, একথাও এখন আর কেউ অস্বীকার করে না। দশমিক ভগ্নাংশ ছাড়া সাধারণ ভগ্নাংশকে সাধারণ অখণ্ড সংখ্যার মত প্রয়োগও যে হিন্দুরাই প্রথম করতে শিখেছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

হিন্দুদের গণিতবিদ্যার প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়—বৈদিক শুল্ব সূত্র এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মধ্যে (খৃঃ পূঃ ১০০০?), সেখানে হিন্দুরা জ্যামিতি, পরিমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বেশ উন্নতি করেছে। পরিমিতির প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যাজ্ঞান বেশ উন্নত হয়েছে। হিন্দু-গণিতের এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হচ্ছে আর্যভট্টের লীলাবতী গ্রন্থে (খৃঃ ৪৭০)। এতে গ্রন্থকার পাটীগণিতের নিয়মগুলি এবং শূন্যের ব্যবহারের নিয়ম ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন, বীজগণিতের চিহ্নের নিয়ম দিয়েছেন এবং ত্রিকোণমিতির অনুপাতগুলির সারণী প্রস্তুত করেছেন। π (পাই)-এর মান নির্ণয় করেছেন ৩.১৪১৬। এর কিছু পরে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যামিতির বহু দুরূহ সমাধান করেছেন, বহু প্রকার শ্রেণী এবং সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরা শূন্যের ব্যবহারের নিয়ম পরিষ্কার ভাষায় লিখে গেছেন এবং ভগ্নাংশের ব্যবহার স্বচ্ছন্দে করে গেছেন। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য হিন্দু-গণিতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন।

হিন্দু গণিতবিদ্‌দের সম্বন্ধে সব চেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, তাঁরা যখন আরম্ভ করেছেন, একেবারে পরিপূর্ণ সংখ্যা-বিজ্ঞান নিয়ে আরম্ভ করেছেন। অক্ষমতা, অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তার চিহ্ন একেবারেই নেই। তাই দেখে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাপ্‌লাস বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ্ ডানজিগ তাঁর "Number" গ্রন্থে লিখেছেন—আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য মনে হয় যে, গ্রীসের বিখ্যাত গণিতবিদ্‌রা এর ধার দিয়েও যান নি। এর কারণ কি এই যে—গ্রীকদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ঘৃণার ভাব ছিল এবং তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষার ভার ক্রীতদাসদের উপর ছেড়ে দিয়েছিল? কিন্তু তাই যদি হয় তবে এটা কেমন করে হলো যে, যে জাতি আমাদের জ্যামিতি শাস্ত্র দান করে গেছে এবং তার এত উন্নতি সাধন করেছে, তারা বীজগণিতের অঙ্কুরও সৃষ্টি করতে পারে নি? এটা কি একই রকম আশ্চর্যের কথা নয় যে, আধুনিক গণিত শাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি বীজগণিতও অবস্থানগত সংখ্যা-লিখন পদ্ধতির সঙ্গে একই সময়ে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছিল?

এর কারণ কি? হিন্দুরা কোথা থেকেও ধার না করে এমন চমৎকার সংখ্যা লিখন পদ্ধতি যে কি করে আবিষ্কার করলো, তার ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। তবে এটা বোধ হয় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হিন্দুদের সভ্যতা ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয়

সভ্যতার পরবর্তী। অনেকে হয়তো এই নিয়ে মারামারি করতে আসবেন, কিন্তু তাঁদের কাছে একটা কথা বলতে চাই যে, সভ্যতার ইতিহাস কিছু পিছিয়ে গেলেই যে ছোট হয়ে যেতে হয়, কখনও তা সত্যি নয়। প্রকৃতির একটা নিয়ম এই যে, কোন জাতিকে সে চিরকালের জন্যে বড় করে রাখে নি, কোন দুর্বলতাকেও ক্ষমা করে নি। মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস আগে আরম্ভ করলেও নিজেদের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে নিজেদের সমাধি রচনা করে গেছে। পরবর্তীকালে এলো ভারত তার সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। তাই আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতবিদেরা যেখানে এসে আর পথ খুঁজে পেল না, সেখান থেকেই ভারত তার নতুন যাত্রা আরম্ভ করলো এবং সভ্যতার নতুন সৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করলো। ইতিহাসে এরূপ নজীর যথেষ্ট আছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে চীনাদের কয়েকটি দান সকলের আগে। কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ প্রভৃতি তারাই প্রথম আবিষ্কার করে; কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসে তারা কোথায় তলিয়ে গেল! অথচ তাদের জ্ঞানের সূত্র নিয়ে আরব ও ইউরোপ এগিয়ে চলে গেল! প্রকৃতি ভারতকেও যে মাথায় করে রাখে নি, তার প্রমাণ দেখা যায় মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির কুসংস্কারের পঙ্ক-সমাধির মধ্যে।

এখন আমরা দেখবো—প্রাচীন ভারতে গণিতের অগ্রগতির পথে এমন কি কি জিনিষ কাজ করেছিল, গ্রীকদের মধ্যে যার অভাব হয়েছিল? ভারতবর্ষে কোন কালেই গণন-যন্ত্রটি ছিল না। শিশুদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিতে এই যন্ত্রটি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই (এখনও কিণ্ডারগার্টেনে এর ব্যবহার হয়)। কিন্তু শিশুদের যন্ত্র নিয়ে যদি বৃদ্ধকেও বসে থাকতে হয়, তাহলে সেটা সব চেয়ে শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীদের আর একটি জিনিষেরও অভাব ছিল, সেটি হচ্ছে সংখ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার। গ্রীকদের সেটি পুরাদস্তুর ছিল। প্লেটো ও ইউক্লিড জ্যামিতির উন্নতি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এঁদের ধারণা হয়েছিল যে, জ্যামিতি একটা আধ্যাত্মিক চর্চাবিশেষ। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে জ্যামিতিকে গুলিয়ে ফেলে তারা একে জনসাধারণের নাগালের বাইরে টেনে নিয়ে গেছিল। গণনার কাজটাকে গ্রীকরা চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে এবং ঠিক একই কারণে জ্যামিতি থেকে সংখ্যাকে বিসর্জন দিয়েছিল। তাঁদের সংখ্যা-বিজ্ঞানের দুর্বলতাও এর একটা কারণ ছিল। এই কারণে গ্রীকরা পরিমিতিতে একেবারে কাঁচা ছিল। ক্রীতদাস প্রথাও ছিল বড় একটা অন্তরায়। তারা নিজেদের জ্ঞান ক্রীতদাসদের দেওয়া বারণ করে দিয়েছিল এবং ব্যবহারিক শিক্ষাটাকে ঘৃণ্য কাজ জ্ঞান করে ক্রীতদাসদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। এর শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের আমলে। তাঁরা জ্যামিতিকে রহস্য ও গোপনীয়তার আড়ালে লুকিয়ে ফেলে গণিতের সমাধি রচনা করেছিল।

অন্যদিকে ভারতে সমকালে দেখা যায়—এক মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার যুগ; ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পে এক মহাব্যস্ততা। লীলাবতীর বহু উদাহরণের মধ্যে দেখা যায়, ভারতীয় বণিকেরা কত রকমের শুল্ক দিচ্ছে, অর্থের হিসাব করছে, দ্রব্য বিনিময় করছে। গণনার প্রয়োজনীয়তা তখন একেবারে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের প্রধান ধারক। আর একটা কথা—ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগে পুরোহিত সম্প্রদায় গণিত শাস্ত্রটাকে একচেটিয়া করে তার মধ্যে ধর্ম ও রহস্য ঢুকিয়ে দেয় নি। তাছাড়া অন্যদিকে আবার ব্যবহারিক শিক্ষাকে শূদ্র ও দাসদের হাতে ছেড়ে দেয় নি। তাঁরা যে একটা সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তা ঠিক না হতে পারে, কিন্তু তাঁরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল।

হিন্দুদের সংখ্যা-লিখন পদ্ধতিতে না হলেও পঠন পদ্ধতিতে একটা ত্রুটি থেকে গেছে; কুড়ির

(বিশ <বিংশতি) আগের সংখ্যাটা হলো উনিশ (<উনবিংশতি); ত্রিশের আগের সংখ্যাটা উনত্রিশ। এমনিভাবে প্রত্যেক দশকের আগের সংখ্যাটা দশক থেকে উন, অর্থাৎ এক কম করে বলা হয়। রোমানরা তাদের লিখন পদ্ধতিতে এমনি একটা ব্যবস্থা করেছিল। চার সংখ্যাটা পাঁচ থেকে এক কম (IV, V), নয় দশ থেকে এক কম (IX, X), চল্লিশ পঞ্চাশ থেকে দশ কম (XL, L), চারশ' পাঁচশ' থেকে একশ কম (CD, D) ইত্যাদি। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে রোমানরা উন্নতির নামে সভ্যতার চাকা পিছন দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছিল। হিন্দুরা এতটা বাড়াবাড়ি করে নি, তবুও তাদের সংখ্যা পঠন পদ্ধতিতে যে সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে তাও প্রগতির পরিপন্থী। ভারতীয় শিশুদের শতকিয়া অভ্যাসের সময় প্রত্যেক দশকের আগের সংখ্যাটায় এসে হোঁচট খেতে হয়। এ ত্রুটিটা সহজে দূর হতে পারে, যদি উনিশ, উনত্রিশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলির জন্যে এক একটা নতুন নামকরণ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিণ নটিলাস।

সঞ্চয়ন

শিশুর তোৎলামি রোগ
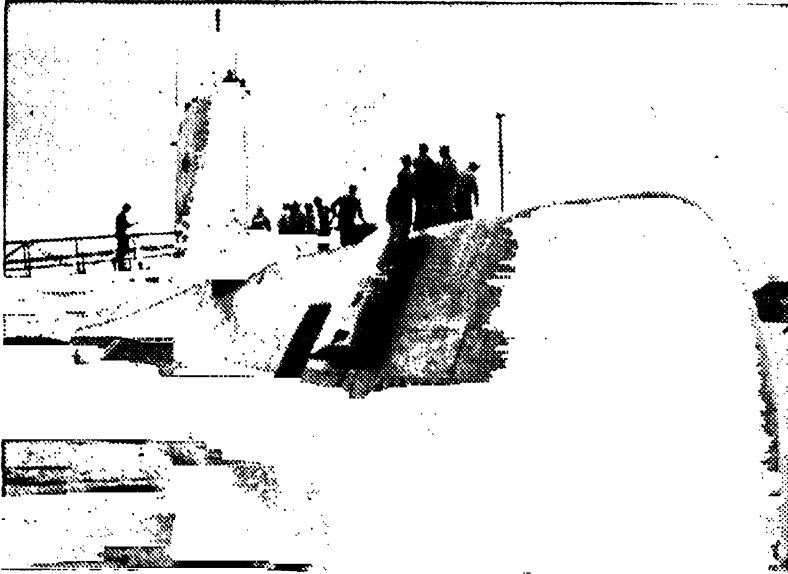
তোৎলামির প্রথম লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা দেয় আড়াই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোগও বাড়তে থাকে এবং কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করে।

তোৎলামি শিশুর অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় অসুবিধা দেখা দেয় এবং শিশুর সাধারণ আচরণও স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। শিশুর পক্ষে যেমন সবাইর সঙ্গে মেলামেশা কঠিন হয়ে পড়ে, অন্যেরাও তেমনি তার সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করতে পারে না। এ সবই যেন পিতামাতার বিবেকের প্রতি তিরস্কারস্বরূপ; কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তোৎলামির উৎস হলো পারিবারিক জীবনের পরিবেশ।

কোন পরিবারে যদি সব সময় ঝগড়াঝাটি, হট্টগোল লেগেই থাকে, বিশেষ করে রাতের বেলায়, আর শিশুকে যদি অযথা মারধোর, গালিগালাজ করা হয়, তাহলে শিশুর তোৎলামি রোগ দেখা দিতে পারে। অথচ বাপ-মায়েরা এই কথাটা একবারও ভেবে দেখেন না।

অনেক সময় অতি-আদুরে শিশুদেরও তোৎলামি রোগ দেখা দেয়। কারণ এই সব শিশুর আত্মসংযম ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব ঘটে এবং ধীরে-সুস্থে ও ভালভাবে কথা বলা শিখবার মত ধৈর্যও থাকে না।

কথা ফোটবার সময় থেকেই শিশুর কথা বলার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। শিশুকে সব দিক থেকে সাহায্য করতে হবে। শিশু যেন সর্বদাই জড়তাহীন ও সুউচ্চারিত কথা শুনতে পায়।

শিশুর কথা ধীরে ধীরে ভাল হতে থাকে। তাই শিশুকে তাড়াহুড়া করে কথা শেখানো উচিত নয় কিংবা কথার জন্যে ধমকানো বা জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়। এসব করতে গেলে শিশু ব্যস্ত হয়ে কথা বলতে চাইবে, গলায় কথা আটকে যাবে, থতমত খেয়ে বার বার ঢোক গিলবে। সে যে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না, সে কথা বুঝতে পেরে আরও ভড়কে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তোৎলামি দেখা দেবে। অথবা বেশী কথা বলবার জন্যে শিশুকে আবার প্রশংসা করাও ভাল নয়। এতে শিশু তাড়াতাড়ি কথা বলবার চেষ্টা করে এবং আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকে। শিশু কথা বলবার সময় ঠিক শব্দ খুঁজে পায় না কিংবা চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেলে। এতে দ্বিধা দেখা দেয়, একই শব্দ ও বাক্য বার বার বলতে থাকে, অধৈর্যের ভাবভঙ্গী প্রকাশ পায়। তখন বুঝতে হবে, শিশু তোৎলার পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে।

আগে লোকে ভাবতো, তোৎলামি রোগ বংশগত—কোন কোন লোকের স্বভাবগত; সুতরাং এ রোগ হবেই এবং এর কোন প্রতিকার নেই। আসলে কিন্তু তা নয়। তোৎলামি রোগ নিশ্চয়ই সারানো যায়। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা সুরু হবে, ততই সুফল পাওয়া যাবে। একেবারে গোড়াতেই রোগের প্রতিকার করা উচিত, বিশেষজ্ঞদের দেখানো প্রয়োজন। অবহেলা করা উচিত নয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়

সোভিয়েট চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য এ. এফ. তুরের ক্লিনিকে অন্তঃসত্ত্বা নারীর ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করবার গবেষণা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, গর্ভবতী নারীর রক্ত পরীক্ষার দ্বারা সন্তান পুত্র হইবে না কন্যা হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সম্পর্কে এ. লিবফ লিখিয়াছেন—
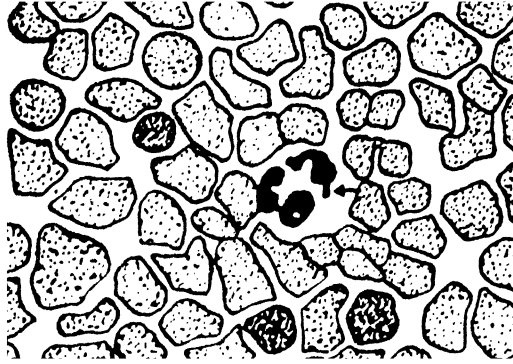
বৈজ্ঞানিক ওয়াই. এ. ভেরেশ্চাগিন ৬০ জন স্বাস্থ্যবতী নারীর রক্তের শ্বেত-কণিকার যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেন। সেই পরীক্ষাধীন নারীরা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন না। তারপর তিনি ১২০ জন আসন্নপ্রসবা নারীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া নিউ-ক্লিয়াসের রক্তের যৌন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শ্বেত-কণিকাগুলির সংখ্যা পরিবর্তনের হিসাব করেন।
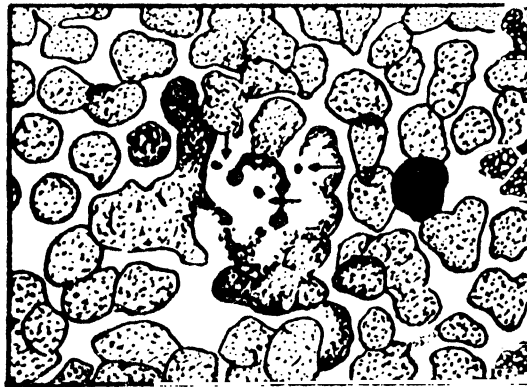
কাচের স্লাইডে রক্তের পোঁচ দিয়া, প্যাপেন-হাইম সলিউশনের সাহায্যে সেই রক্ত রঞ্জিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিউট্রোফিল কোষগুলির নিউ-ক্লিয়াসের চারিদিকে এমন কতকগুলি জিনিষ রহিয়াছে, যেগুলিকে বলা হয় সেক্স ক্রোম্যাটিন, সমোত্তল বস্তু, নিউক্লিয়াসের উপগ্রহ ইত্যাদি। আকারের ভিত্তিতে নিউক্লিয়াসের সেই উপাঙ্গ-গুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে:—

১নং চিত্র

২নং চিত্র

(ক) বুড়া আঙ্গুলের মত (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(খ) বিন্দুর মত (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(গ) সরল রেখার মত, সুতার মত বা বঁড়শীর মত (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) টেনিস র‍্যাকেটের মত শূন্যগর্ভ বৃত্ত (এগুলি ১ হইতে ১·৫ মাইক্রন দীর্ঘ সূক্ষ্ম তন্তুর দ্বারা নিউক্লিয়াস হইতে ঝুলিতে থাকে) (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৩নং চিত্র

রক্তের যৌন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য ৫০০ নিউট্রোফিল লইয়া প্রতিটি শ্রেণীর যৌন-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোষের কেবল সংখ্যা, ক ও খ শ্রেণীর কোষের যোগফল এবং সেই যোগফলকে গ শ্রেণীর কোষের সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল দাঁড়ায় তাহা হিসাব করা হয়।

গর্ভবতী নহেন, এইরূপ ৬০ জন মহিলার রক্ত পরীক্ষার দ্বারা নিম্নলিখিত রূপ ফল পাওয়া গিয়াছে:—

ক – ৬.৪ ; খ – ৪৭.১ ; গ – ৬ ; ঘ – ০

$$ক+খ=৫৩.৫ ; \frac{ক+খ}{গ}=৮.৯১$$

যে ১২০ জন আসন্নপ্রসবা মহিলাকে পরীক্ষা করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে ৬৯ জন পুত্র ও ৫১ জন কন্যা প্রসব করেন।

৪নং চিত্র

যে ৫১ জন নারী কন্যা প্রসব করেন, তাঁহাদের রক্ত পরীক্ষার ফল:—

ক – ৪·৪ ; খ – ৫৮ ; গ – ৭·১ ; ঘ – ০·৩

$ক+খ = ৬২'৪ ; \frac{ক+খ}{গ} = ৮'৭৯$

ফলাফল হইতে বুঝা যাইবে যে, গর্ভে কন্যা থাকিলে খ শ্রেণীর কোষের সংখ্যা ২১টি বাড়ে, অর্থাৎ গর্ভবতীর রক্তের স্ত্রী-চরিত্র আরও প্রকট হইয়া ওঠে।

গর্ভে যাহাদের পুত্র থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল দাঁড়াইয়াছে—

ক — ৫'২ ; খ — ৮'১ ; গ — ১১'২ ; ঘ — ০'৭

$ক+খ = ১৩'৩ ; \frac{ক+খ}{গ} = ১'১৮$

দেখা যাইতেছে যে, উপরের ৬০ জন গর্ভবতী নহেন, এইরূপ নারীর রক্তে খ শ্রেণীর কোষের তুলনায় এই ক্ষেত্রে খ শ্রেণীর কোষের সংখ্যা ৬ ভাগ হইয়া গিয়াছে, গ শ্রেণীর কোষের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ভাগ ফল ১'১৮-এ নামিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ গর্ভধারিণীর রক্তের পুরুষ-চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পরীক্ষিত ১২০টি ক্ষেত্রের মধ্যে ১১৯টিতে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল হইয়াছে।

—("সোভিয়েট মেডিসিন"—৫ম সংখ্যা, ১৯৫৯ হইতে)

ক্যান্সার রোগের সমস্যা

ক্যান্সার রোগের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে উইলিয়াম টমসন লিখেছেন—ক্যান্সার কোন নতুন রোগ নয়। মানুষের জীবন যত পুরনো তত পুরনো এই রোগ। এই রোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে ডাইনোসরদের শিলীভূত দেহাবশেষের মধ্যে। বিশ শতকেও এই রোগ নতুন কিছু নয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে বর্তমান কালে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে কেন? এর অনেক কারণ রয়েছে। এ-সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় আমরা এখন দীর্ঘতর জীবন লাভ করেছি এবং যদিও ক্যান্সার যে-কোন বয়সেই দেখা দিতে পারে—তবু একথা বলব যে, তা মোটামুটিভাবে বৃদ্ধ বয়সেরই রোগ। অতীতে বহু শিশু পূর্ণ বয়স লাভ করতে পারতো না, যারা পারতো তারাও আবার দীর্ঘায়ু হতে পারতো না। তার ফলে যে বয়সে সাধারণতঃ ক্যান্সার হয়, সেই বয়সে পৌঁছাবার সুযোগ তাদের কমই হতো। এক কথায় বলা যেতে পারে, পেনিসিলিন প্রভৃতি জীবনরক্ষী ভেষজ আবিষ্কারের ফলে যে দীর্ঘ জীবন আমরা লাভ করেছি, তারই মূল্য দিচ্ছি ক্যান্সার রোগ ভোগের মধ্য দিয়ে।

আর একটি কথা—এমন অনেক রকমের ক্যান্সার আছে যা প্রতিকারযোগ্য। একশ' বছর পূর্বে ক্যান্সারমাত্রেই ছিল মারাত্মক। আজ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে—প্রতি বছর রোগমুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ অনেক। একটা কারণ হলো, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি। অবশ্য এর সব চেয়ে বড় কারণ হলো, আমরা প্রথম অবস্থাতেই রোগকে চিনতে শিখেছি। এইটেই হলো এ-সম্পর্কে আসল কথা; কারণ ক্যান্সার রোগ যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, তত তাড়াতাড়ি তাকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

মুখের ক্যান্সার প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে শতকরা ৮৫ জনের ক্ষেত্রে রোগমুক্তি সম্ভব; কিন্তু প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা সম্ভব না হলে শতকরা মাত্র ১৩ জনকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। জরায়ুর ক্যান্সারের ক্ষেত্রে (মেয়েদের সাধারণতঃ জরায়ুতেই ক্যান্সার হয়) শতকরা ৭৮ জনকে সুস্থ করে তোলা যায়, যদি প্রথম দিকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

যায়। চিকিৎসা বিলম্বিত হলে শতকরা ১৪টির বেশী রোগমুক্তির আশা করা যায় না। এ-সম্পর্কে দৃষ্টান্ত হিসাবে ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিষ্টি হাসপাতালের চিকিৎসার ফলাফলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি বৃটেনের একটি নামকরা হাসপাতাল। জরায়ুর ক্যান্সার নিয়ে প্রায় ২,০০০ রোগী এখানে চিকিৎসার জন্যে আসে; তাদের মধ্যে ৮৬০ জন রোগ নিরাময়ের পর ফিরে যায়। আরও ১,৫৬০ জন রোগী হয়তো রোগমুক্তির আশা করতে পারতো, যদি তারা কিছু আগে চিকিৎসার জন্যে আসতো; অর্থাৎ ৭০০ জন মেয়ের মৃত্যু হতো না, যদি তারা রোগের সুরুতে এসে চিকিৎসার সুযোগ নিত।

এই কারণেই এখন ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণকে শিক্ষিত করবার দিকে বেশী করে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের যা প্রথম জানতে হবে তা হলো এই যে, ক্যান্সার অন্য দশটা রোগের মতই ভয়াবহ, তার বেশী কিছু নয়। কয়েক রকমের ক্যান্সার আছে যার চিকিৎসা অন্যান্য অনেক রোগের চেয়ে সহজ; আমাদের পক্ষে এ-ক্ষেত্রে যা করণীয় তা হলো, সন্দেহ হওয়া মাত্র চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। সত্য কথা বলতে কি, রোগের ভয় মন থেকে একেবারে দূর করে দিতে হবে। অনেকে বলেন, এই ভয় অনেক সময় ক্যান্সার রোগের উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। প্রখ্যাত বৃটিশ সার্জন সার হেনিজ অগিল্‌ভি বলেন—সুখী লোকের কখনও ক্যান্সার হয় না।

বৃটিশ জনসাধারণ আজ বুঝতে পেরেছে, ক্যান্সার এমন কিছু ভয়াবহ রোগ নয়। তার জন্যে যা প্রয়োজন তা হলো, ঠিক সময়ে রোগ চিনতে পারা এবং রোগ চেনবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সেজন্যে আজ বৃটেনের স্কুলগুলিতে জীববিদ্যা সংক্রান্ত কোর্সগুলিতে ক্যান্সার সম্পর্কে তালিম দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষকেরা এ-বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ছাত্রদের বোঝানো হচ্ছে, ক্যান্সার রোগটা কি এবং তা কি পর্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। তাদের এভাবে তালিম দেবার কারণ হলো, তারা যেন বড় হয়ে ক্যান্সার সম্পর্কে অকারণ ভীতি পোষণ না করে। তারা যেন বুঝতে পারে, সময়মত চিকিৎসার সুযোগ নিলে অন্য সব রোগের মত ক্যান্সারও দূর করা সম্ভব।

ক্যান্সারের চিকিৎসা-পদ্ধতি—তিন রকমের সার্জারি, রেডিও-থেরাপি এবং কেমিও-থেরাপি। সময় মত রোগের প্রসার বন্ধ করতে সার্জারি এবং রোগের মূল অপসারণের জন্যে অপারেশন সবচেয়ে ফলপ্রদ ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—জরায়ুর ক্যান্সার প্রসার লাভ করবার পূর্বে যদি তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, তাহলে শল্য-চিকিৎসকের কাজ হবে জরায়ু অপসারণ করা।

কেমিও-থেরাপি—ক্যান্সার কোষ ধ্বংসের জন্যে ভেষজের ব্যবহার—এটি এখনও তার শৈশব অবস্থায় রয়েছে। এখনও এমন কোন ভেষজ পাওয়া যায় নি, যার সাহায্যে স্বাভাবিক কোষের ক্ষতি না করে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করতে পারা যায়। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন ভেষজ যে আবিষ্কৃত হবে না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা এরূপ কোন ভেষজ আবিষ্কারের জন্যে এখনও সমানে চেষ্টা করে চলেছেন।

রেডিও-থেরাপি অবশ্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্লাষ্টিক সার্জারির লক্ষণীয় উন্নতি

প্লাষ্টিক সার্জারির লক্ষণীয় উন্নতি সম্পর্কে ডেনিস বার্ডেন্‌স্ লিখেছেন—১৩ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জন্‌স্-এ প্লাষ্টিক সার্জারি সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

হয় তাতে জাপান, সৌদি আরব, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা এবং ভেনেজুয়েলা সহ ৪৫টি দেশের প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ভারত থেকে এসেছেন কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্লাষ্টিক সার্জারি বিভাগের ডাঃ অঞ্জলি মুখার্জি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারির অধ্যাপক মিঃ এস. সি. মিশ্র, পুনার জেহাঙ্গীর নার্সিং হোমের সার্জন মিঃ এন. এইচ. আণ্টিয়া এবং বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক সহকারী সার্জন ও টিউটর মিঃ আর. জে. মানেকষা।

সার্জারির এই বিশেষ দিক সম্পর্কে সহযোগিতা আরও কি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো হাজার হাজার বিকৃত বা বিকলাঙ্গ লোকের জীবনে নূতন করে আশা ও আনন্দের বার্তা বহন করে আনা।

প্লাষ্টিক সার্জারি এক হিসাবে অঙ্গবিশেষের পুনর্গঠনের কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও কোন বিকৃতি দেখা দিলে তার সংস্কার সাধনই প্লাষ্টিক সার্জারির প্রধান কাজ। এই চিকিৎসা তিন রকমের—রিপেয়ারেটিভ,পেডিয়াট্রিক ও কস্‌মেটিক।

রিপেয়ারেটিভ প্লাষ্টিক সার্জারি সব রকম দুর্ঘটনায়, যেমন—রাস্তায়, বাড়িতে বা আগুনে যে সব দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে ক্ষতি পূরণের কাজ করে। কুষ্ঠরোগের ফলে কিংবা ক্যান্সারের চিকিৎসায় যে বিকৃতি দেখা দেয়, সেই বিকৃতি দূর করবার কাজেও তা সাহায্য করে থাকে। পেডিয়াট্রিক সার্জারির কাজ হলো শিশুদের জন্মগত বিকৃতি দূর করা। পূর্বে এই ধরণের বিকৃতি নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করতো (৯৫০ জনে এক জন) তারা এই বিকৃত অঙ্গের দুঃখ সারা জীবন বহন করতে বাধ্য হতো। এতে যে কেবল তাদের জীবিকার্জনের পথে অসুবিধা দেখা দিত তা নয়, তাদের মানসিক সুখও নষ্ট হতো। কিন্তু এখন তারা স্বাভাবিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছে।

কস্‌মেটিক সার্জারি বা কান্তিবর্ধক সার্জারির প্রয়োজন হয়, শতকরা পাঁচজনের বা তারও কম ক্ষেত্রে। এর উদ্দেশ্য হলো, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। মেয়েদের কাছে, বিশেষভাবে মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোবলের জন্যে দেহসৌষ্ঠবের একটা গুরুত্ব আছে। একজন অভিনেত্রীর যদি নাক অস্বাভাবিক লম্বা হয়, তাহলে তার পক্ষে বিশেষভাবে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না; সে জন্যে তাকে প্লাষ্টিক সার্জনের শরণাপন্ন হতে হয়। প্লাষ্টিক সার্জন যদি মনে করেন তাতে তার দেহসৌষ্ঠবের উন্নতি হবে, তা হলে তিনি তার উপর ছুরি চালাতে ত্রুটি করেন না। নাকও তার স্বাভাবিক হয়। বহু অভিনেত্রী এভাবে তাদের দেহের নানা ধরণের খুঁত দূর করবার জন্যে প্লাষ্টিক সার্জনের শরণাপন্ন হয়েছেন।

গত ৩০ বছরে বৃটেনে প্লাষ্টিক সার্জারির লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। এ-সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য কথা হলো এই যে, ইউরোপের প্লাষ্টিক সার্জনদের দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যে শিক্ষা লাভ করেছে। অবশ্য এই প্লাষ্টিক সার্জারি বৃটেনের আবিষ্কার মনে করা ভুল হবে।

মুখের উপর এই ভাবে ছুরি চালিয়ে চিকিৎসার কাজ হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয়দেরও জানা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রে নাক এবং কানের সংস্কার সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। বিকৃত ওষ্ঠ সংস্কারের কথাও চীনের প্রাচীন পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে রয়েল কলেজ অব সার্জনস্‌-এর একজন বৃটিশ সদস্য কনষ্ট্যান্টাইন কারপ্যু ইউরোপে প্রথম প্লাষ্টিক সার্জারির অপারেশন করেন। ১৮১৬ সালে তাঁর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে আছে।

তাঁর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বৃটেনে

এ-সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয় এবং প্লাষ্টিক সার্জারিরও অনেক উন্নতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সার হ্যারল্ড গিলিস, যিনি এ-সম্পর্কে বহু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং অন্যদের এই নতুন পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন—হাজার হাজার জীবন এই প্লাষ্টিক সার্জারির সাহায্যে রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁর এই কাজের উপর ভিত্তি করে সার আর্চিবল্ড ম্যাকিনডো এবং আরও অনেকে যুদ্ধে আহত বৃটেনের সৈনিকদের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্কারের কাজ করেন। সাসেক্সের অন্তর্গত ইষ্ট্ গ্রীনষ্টেডের রাণী ভিক্টোরিয়া হাস-পাতালের একদল প্লাষ্টিক সার্জন এই ভাবে ৬০০-এর বেশী অগ্নিদগ্ধ বৈমানিকের (যাদের মধ্যে ১৬০ জনই হলেন ক্যানাডীয়) চিকিৎসা করেন।

বৃটিশ প্লাষ্টিক সার্জারির ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—অধ্যাপক টি. পি. কিলনার, রেইনফোর্ড মোলেম এবং ডেভিড ম্যাথুজ্। বহু তরুণ সার্জনও এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ সুনাম অর্জন করেছেন।

প্লাষ্টিক সার্জারির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু এ-সম্পর্কে গবেষণার কাজ এখনও বন্ধ হয় নি; এখনও সমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে—আরও কি ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের উন্নতি সাধন সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—চামড়া গ্র্যাফ্টিং সম্পর্কে, অর্থাৎ রুগ্ন চামড়ার স্থলে সুস্থ চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে আটটি পর্যন্ত অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অন্যের চামড়া নিয়েও এ কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা হতে পারে অস্থায়ী ভাবে; কারণ যমজ আর এক জনের চামড়া না হলে এই চামড়া শরীর গ্রহণ করতে পারে না।

কেন এই ভাবে অন্যের দেহ থেকে এনে আর এক জনের দেহে চামড়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, তার রহস্য হয়তো একদিন উদ্ঘাটিত হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেণ্ট মেরিজ হস্পিট্যাল মেডিকেল স্কুলের সার্জারির অধ্যাপক মিঃ চার্লস রব বলেছেন—তন্তুর স্থানান্তর সংক্রান্ত সার্জারির এই অমীমাংসিত রহস্য আজ একটা বড় সমস্যা। এই স্থানান্তরণের সমস্যার যদি কোন দিন সমাধান করা যায়, তাহলে সার্জারি নাটকীয়ভাবে রাতা-রাতি রূপ পরিবর্তন করবে—যেমন তা একদিন করেছিল অ্যান্টিসেপ্সিস ও অ্যানেস্থেটিক্স্ আবিষ্কৃত হবার পর।

প্লাষ্টিক সার্জারির জন্যে যে সব জিনিষ প্রয়োজন, তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক কাজ হয়েছে। বহু ইউনিটের নিজের ব্যাঙ্ক রয়েছে, যেখানে চামড়া সংরক্ষিত আছে এবং কোন কোন ইউনিটের (যেমন—সেণ্ট মেরিজ হস্পিটাল মেডিকেল স্কুল) আছে এই সঙ্গে রক্ত নালী, অস্থি, উপাস্থি, গ্রন্থি প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

প্লাষ্টিক সার্জারি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি অতি জটিল দিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিকিৎসকেরা যে ভাবে এই দিকের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন তাতে হাজার হাজার বিকৃত বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যে আশান্বিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান

১৯৫৭-'৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বর্ষে মহাজাগতিক রশ্মিসংক্রান্ত তথ্যানু-সন্ধানের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ফলে বিশ্বের যাবতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

মহাজাগতিক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে রশ্মি নহে। ইহারা অতিশক্তিশালী বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকার সমষ্টি মাত্র। এই সকল কণিকার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে, মনুষ্য-নির্মিত কোনও যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরণের কণিকা উৎপাদনের কথা কল্পনাও করা যায় না।

হয় তাতে জাপান, সৌদি আরব, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা এবং ভেনেজুয়েলা সহ ৪৫টি দেশের প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ভারত থেকে এসেছেন কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্লাষ্টিক সার্জারি বিভাগের ডাঃ অঞ্জলি মুখার্জি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারির অধ্যাপক মিঃ এস. সি. মিশ্র, পুনার জেহাঙ্গীর নার্সিং হোমের সার্জন মিঃ এন. এইচ. আন্টিয়া এবং বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক সহকারী সার্জন ও টিউটর মিঃ আর. জে. মানেকশা।

সার্জারির এই বিশেষ দিক সম্পর্কে সহযোগিতা আরও কি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো হাজার হাজার বিকৃত বা বিকলাঙ্গ লোকের জীবনে নূতন করে আশা ও আনন্দের বার্তা বহন করে আনা।

প্লাষ্টিক সার্জারি এক হিসাবে অঙ্গবিশেষের পুনর্গঠনের কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও কোন বিকৃতি দেখা দিলে তার সংস্কার সাধনই প্লাষ্টিক সার্জারির প্রধান কাজ। এই চিকিৎসা তিন রকমের—রিপেয়ারেটিভ,পেডিয়াট্রিক ও কস্‌মেটিক।

রিপেয়ারেটিভ প্লাষ্টিক সার্জারি সব রকম দুর্ঘটনায়, যেমন—রাস্তায়, বাড়িতে বা আগুনে যে সব দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে ক্ষতি পূরণের কাজ করে। কুষ্ঠরোগের ফলে কিংবা ক্যান্সারের চিকিৎসায় যে বিকৃতি দেখা দেয়, সেই বিকৃতি দূর করবার কাজেও তা সাহায্য করে থাকে। পেডিয়াট্রিক সার্জারির কাজ হলো শিশুদের জন্মগত বিকৃতি দূর করা। পূর্বে এই ধরণের বিকৃতি নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করতো (৯৫০ জনে এক জন) তারা এই বিকৃত অঙ্গের দুঃখ সারা জীবন বহন করতে বাধ্য হতো। এতে যে কেবল তাদের জীবিকার্জনের পথে অসুবিধা দেখা দিত তা নয়, তাদের মানসিক সুখও নষ্ট হতো। কিন্তু এখন তারা স্বাভাবিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছে।

কস্‌মেটিক সার্জারি বা কান্তিবর্ধক সার্জারির প্রয়োজন হয়, শতকরা পাঁচজনের বা তারও কম ক্ষেত্রে। এর উদ্দেশ্য হলো, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। মেয়েদের কাছে, বিশেষভাবে মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোবলের জন্যে দেহসৌষ্ঠবের একটা গুরুত্ব আছে। একজন অভিনেত্রীর যদি নাক অস্বাভাবিক লম্বা হয়, তাহলে তার পক্ষে বিশেষ-ভাবে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না; সে জন্যে তাকে প্লাষ্টিক সার্জনের শরণাপন্ন হতে হয়। প্লাষ্টিক সার্জন যদি মনে করেন তাতে তার দেহসৌষ্ঠবের উন্নতি হবে, তা হলে তিনি তার উপর ছুরি চালাতে ত্রুটি করেন না। নাকও তার স্বাভাবিক হয়। বহু অভিনেত্রী এভাবে তাদের দেহের নানা ধরণের খুঁত দূর করবার জন্যে প্লাষ্টিক সার্জনের শরণাপন্ন হয়েছেন।

গত ৩০ বছরে বৃটেনে প্লাষ্টিক সার্জারির লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। এ-সম্পর্কে একটা উল্লেখ-যোগ্য কথা হলো এই যে, ইউরোপের প্লাষ্টিক সার্জনদের দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যে শিক্ষা লাভ করেছে। অবশ্য এই প্লাষ্টিক সার্জারি বৃটেনের আবিষ্কার মনে করা ভুল হবে।

মুখের উপর এই ভাবে ছুরি চালিয়ে চিকিৎসার কাজ হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয়দেরও জানা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রে নাক এবং কানের সংস্কার সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। বিকৃত ওষ্ঠ সংস্কারের কথাও চীনের প্রাচীন পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে রয়েল কলেজ অব সার্জনস্-এর একজন বৃটিশ সদস্য কনষ্ট্যান্টাইন কারপ্যু ইউরোপে প্রথম প্লাষ্টিক সার্জারির অপারেশন করেন। ১৮১৬ সালে তাঁর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে আছে।

তাঁর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বৃটেনে

এ-সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয় এবং প্লাষ্টিক সার্জারিরও অনেক উন্নতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সার হ্যারল্ড গিলিস, যিনি এ-সম্পর্কে বহু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং অন্যদের এই নতুন পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন—হাজার হাজার জীবন এই প্লাষ্টিক সার্জারির সাহায্যে রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁর এই কাজের উপর ভিত্তি করে সার আর্চিবল্ড ম্যাকিনডো এবং আরও অনেকে যুদ্ধে আহত বৃটেনের সৈনিকদের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্কারের কাজ করেন। সাসেক্সের অন্তর্গত ইষ্ট্ গ্রীনষ্টেডের রাণী ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের একদল প্লাষ্টিক সার্জন এই ভাবে ৬০০-এর বেশী অগ্নিদগ্ধ বৈমানিকের (যাদের মধ্যে ১৬০ জনই হলেন ক্যানাডীয়) চিকিৎসা করেন।

বৃটিশ প্লাষ্টিক সার্জারির ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—অধ্যাপক টি. পি. কিলনার, রেইনফোর্ড মোলেম এবং ডেভিড ম্যাথুজ। বহু তরুণ সার্জনও এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ সুনাম অর্জন করেছেন।

প্লাষ্টিক সার্জারির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু এ-সম্পর্কে গবেষণার কাজ এখনও বন্ধ হয় নি; এখনও সমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে—আরও কি ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের উন্নতি সাধন সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—চামড়া গ্র্যাফ্‌টিং সম্পর্কে, অর্থাৎ রুগ্ন চামড়ার স্থলে সুস্থ চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে আটটি পর্যন্ত অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অন্যের চামড়া নিয়েও এ কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা হতে পারে অস্থায়ী ভাবে; কারণ যমজ আর এক জনের চামড়া না হলে এই চামড়া শরীর গ্রহণ করতে পারে না।

কেন এই ভাবে অন্যের দেহ থেকে এনে আর এক জনের দেহে চামড়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, তার রহস্য হয়তো একদিন উদ্ঘাটিত হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেণ্ট মেরিজ হস্পিট্যাল মেডিকেল স্কুলের সার্জারির অধ্যাপক মিঃ চার্লস রব বলেছেন—তন্তুর স্থানান্তর সংক্রান্ত সার্জারির এই অমীমাংসিত রহস্য আজ একটা বড় সমস্যা। এই স্থানান্তরণের সমস্যার যদি কোন দিন সমাধান করা যায়, তাহলে সার্জারি নাটকীয়ভাবে রাতারাতি রূপ পরিবর্তন করবে—যেমন তা একদিন করেছিল অ্যাণ্টিসেপ্‌সিস ও অ্যানেস্থেটিক্স্ আবিষ্কৃত হবার পর।

প্লাষ্টিক সার্জারির জন্যে যে সব জিনিষ প্রয়োজন, তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক কাজ হয়েছে। বহু ইউনিটের নিজের ব্যাঙ্ক রয়েছে, যেখানে চামড়া সংরক্ষিত আছে এবং কোন কোন ইউনিটের (যেমন—সেণ্ট মেরিজ হস্পিটাল মেডিকেল স্কুল) আছে এই সঙ্গে রক্ত নালী, অস্থি, উপাস্থি, গ্রন্থি প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

প্লাষ্টিক সার্জারি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি অতি জটিল দিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিকিৎসকেরা যে ভাবে এই দিকের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন তাতে হাজার হাজার বিকৃত বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যে আশান্বিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান

১৯৫৭-'৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বর্ষে মহাজাগতিক রশ্মিসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ফলে বিশ্বের যাবতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

মহাজাগতিক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে রশ্মি নহে। ইহারা অতিশক্তিশালী বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকার সমষ্টি মাত্র। এই সকল কণিকার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে, মনুষ্য-নির্মিত কোনও যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরণের কণিকা উৎপাদনের কথা কল্পনাও করা যায় না।

ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় সূর্যের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়। এই সময়ে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যে রকম বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে রকম আর কোনও সময়ে হয় নাই।

বিজ্ঞানীরা এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, এই মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক পর্যায়ের শতকরা ৯০ ভাগ কণিকা মহাশূন্য হইতে আসিয়া পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে অবিরত প্রচণ্ড বেগে পতিত হইতেছে। ইহারা হইল হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন, অর্থাৎ প্রোটন। এইগুলি খুবই শক্তিশালী। বাকী দশভাগ হিলিয়াম অথবা তাহার তুলনায় আরও ভারী কোন পরমাণুর কেন্দ্রীন। ইহারা হইল আল্‌ফা কণিকা।

সাধারণভাবে মৌলিক মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকা যাহাকে প্রাথমিক বা প্রাইমারিজ বলা হয়, তাহারা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় না। কিন্তু ইহারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত আসিয়া সেখানকার কণিকাগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। তখন ঐ মহাজাগতিক রশ্মিকে বলা হয়, সেকেণ্ডারিজ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের রশ্মি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার যে পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বর্ষে মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক বা তড়িৎ-চৌম্বক সংক্রান্ত নানারকম ক্রিয়াই যে ইহার মূলে রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। সূর্যই হইল এই সকল ক্রিয়ার উৎস। মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে যে তড়িৎ-চৌম্বক প্রভাব

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে উর্ধ্বাকাশে বিকিরণ পরিমাপ করবার জন্যে একজন গবেষক-কর্মী ইউ. এস. এ-র প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করছেন।

রহিয়াছে, তাহার উপর ইহাদের নানা প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

সৌরদেহে যে ভাঙ্গাগড়া চলিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ অন্যান্য সময়ের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম পরিলক্ষিত হয় ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ভাঙ্গাগড়া সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়কার পর্যালোচনায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্যদেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে।

সমগ্র বিশ্বেই সৌরকলঙ্কের পরিমাণ প্রতি ১১ বৎসর পর পর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিও এই কাল-চক্রের আবর্তন আনুসারেই হইয়া থাকে।

১০ হইতে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করিয়া এই সকল রশ্মি-কণিকা কতখানি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ফোটন, ইলেকট্রন এবং পজিট্রন পড়ে প্রথম শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মেসন। প্রথম শ্রেণীর কণিকাকে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির সফ্‌ট্ কম্পোনেণ্ট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রশ্মিকে বলা হয় হার্ড কম্পোনেণ্ট।

সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যখন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়, সেই সময়ের তীব্রতার তুলনায় যখন কলঙ্কের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে তখন এই হার্ড কম্পোনেণ্টের তীব্রতা শতকরা ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মেসন কণিকা বহু জিনিষ ভেদ করিয়া যাইতে সক্ষম। ইহারা ১ হাজার কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টেরও অধিক শক্তিসম্পন্ন।

মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিতে গিয়া ইহার নিরক্ষবৃত্তও ভূ-চৌম্বক নিরক্ষবৃত্ত যে একই স্থানে নয়, তাহা জানা গিয়াছে। এই জন্যই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মহাশূন্যে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাদের উৎসও মহাশূন্যেরই কোন স্থানে—পৃথিবীতে নয়।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই রশ্মি সম্পর্কে আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আবিষ্কার হইতে জানা যায়, সৌরকলঙ্কের সর্বাধিক বৃদ্ধির সময় যত অগ্রসর হইতে থাকে, মহাশূন্য হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া বহু শক্তিশালী রশ্মি ততই পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই বাধাপ্রাপ্ত হয়—পৃথিবী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে না।

কোন কোন দিক হইতে সৌরকলঙ্কের দরুণ মহাজাগতিক রশ্মির পথ পরিবর্তন হইয়া থাকে। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য হইতে বিপুল পরিমাণে যে বাষ্প উৎসারিত হইতেছে, তাহাও ইহার কারণ হইতে পারে।

বহুকাল হইতেই মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল; তবে ইহাদের উৎস যে কোথায় এবং প্রকৃতি কিরূপ তাহা জানা ছিল না। ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বর্ষে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীদের পর্যালোচনার ফলে বহু নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কেও তাঁহারা সঠিক ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সকল নূতন নূতন আবিষ্কার মহাবিশ্ব সম্পর্কে তথ্যানুস্থানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।

করোনারি থ্রম্বোসিস

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

করোনারি থ্রম্বোসিস কথাটা আজকাল আমাদের অতি পরিচিত। এর নাম শুনলেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যাটাও যেন বেড়ে গেছে! তাই এর সম্পর্কে অনেকেরই জানবার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

করোনারি থ্রম্বোসিস কথাটার সঠিক অর্থ হয়তো অনেকেরই জানা নেই। তবে এটা যে হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ তা সবাই জানেন। করোনারি শব্দটা এসেছে করোনারি আর্টারী থেকে, আর থ্রম্বোসিস মানে রক্ত জমাট বাঁধা। তাহলে করোনারি থ্রম্বোসিসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীকে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে করোনারি ধমনী। এই ধমনী মাংসপেশীর প্রত্যেকটি স্থানে নিয়মিত ভাবে দিবারাত্র রক্ত সরবরাহ করে। করোনারি ধমনীর আয়তন কোথাও বড়, কোথাও বা ছোট। ছোট বা বড় যে কোন করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে গেলেই রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে ঐ ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ডের যে সব এলাকায় রক্ত সঞ্চালিত হয়—সে সব স্থান রক্তশূন্য হবার ফলে মুহূর্তের মধ্যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে।

করোনারি থ্রম্বোসিস সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার আগে আমাদের হৃৎপিণ্ড ও তার রক্ত সঞ্চালনের কথায় ফিরে যেতে হবে।

দিবারাত্র ধুকধুক্ করছে যে হৃৎপিণ্ড—সেটি কি? এটি মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত একটি পাম্প বিশেষ। হৃৎপিণ্ড ভিতরের দিকে একটা লম্বা পার্টিশন দিয়ে দুভাগে বিভক্ত—একটা বাম আর একটা দক্ষিণ। আবার এই দুটি ভাগের প্রত্যেকটি একটি আড়াআড়ি পার্টিশন দিয়ে দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তাহলে বাঁ-দিকে দুটি কুঠরি—একটি উপরে ও একটি নীচে। ডান দিকেও ঠিক তেমনি। উপরেরটিকে অলিন্দ (Auricle) এবং নীচেরটিকে নিলয় (Ventricle) বলা হয়। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর নাম মায়োকার্ডিয়াম। মাংসপেশীর প্রত্যেকটি সূত্র পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই একটি সূত্রে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সব মাংসপেশীতে একই সঙ্গে সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এটি হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর বিশেষত্ব। হৃৎপিণ্ড নিজে থেকেই তার কাজ করবার উত্তেজনা যোগায়, অর্থাৎ বাইরের কোন উত্তেজনা না পেয়েও হৃৎপিণ্ড নিজ থেকেই কাজ করে চলে। হৃৎপিণ্ড একবার সঙ্কুচিত হয় এবং পরমুহূর্তেই আবার প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ার নাম যথাক্রমে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল। বাম নিলয়ে থাকে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত এবং দক্ষিণ নিলয়ে থাকে অবিশুদ্ধ রক্ত। অক্সিজেন বিমুক্ত অবিশুদ্ধ রক্ত দেহের সব জায়গা থেকে শিরা এবং পরিশেষে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ে আসে। ঊর্ধ্ব মহাশিরা দিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে এসে পড়ে। সেখান থেকে দক্ষিণ নিলয়ে আসে। নিম্ন মহাশিরা দিয়ে রক্ত দক্ষিণে অলিন্দের পিছনে এসে পড়ে এবং পরে দক্ষিণ নিলয়ে যায়। এখান থেকে পরিশোধিত হবার জন্যে এই রক্ত ফুস্ফুসে যায়। পরিশোধিত রক্ত ফুস্ফুস থেকে বাম অলিন্দে এবং পরে বাম নিলয়ে আসে। বাম নিলয় থেকে উদ্ভূত

হয়েছে মহাধমনী। বাম নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত ভর্তি হলে সেটি আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হয়। বাম নিলয় সঙ্কুচিত হবার ফলে এই মহাধমনী দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

মহাধমনীর উৎপত্তি স্থলে তিন জায়গায় তিনটি স্ফীত অংশ আছে। এগুলিকে বলা হয় মহাধমনীর সাইনাস। এই সাইনাস থেকে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীকে সরবরাহকারী ধমনীর উৎপত্তি হয়।

দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মত হৃৎপিণ্ডের মাংস-

গাছের কাণ্ড থেকে যেমন শাখা, শাখা থেকে প্রশাখা, আবার তার প্রশাখা ইত্যাদি বেরয়, ঠিক তেমনি করোনারি ধমনীর কাণ্ড থেকে ছোট শাখা ঐ শাখা থেকে আরও বহু প্রশাখা বেরিয়ে হৃৎপিণ্ডের সর্বাংশে রক্ত যোগান দেয়। ঐ প্রশাখা এবং অতি ক্ষুদ্র বহু ধমনী হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে প্রায় লেপ্টে থাকে। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে বলা হয় জালক বা ক্যাপিলারি। ক্যাপিলারিগুলি

১নং চিত্র
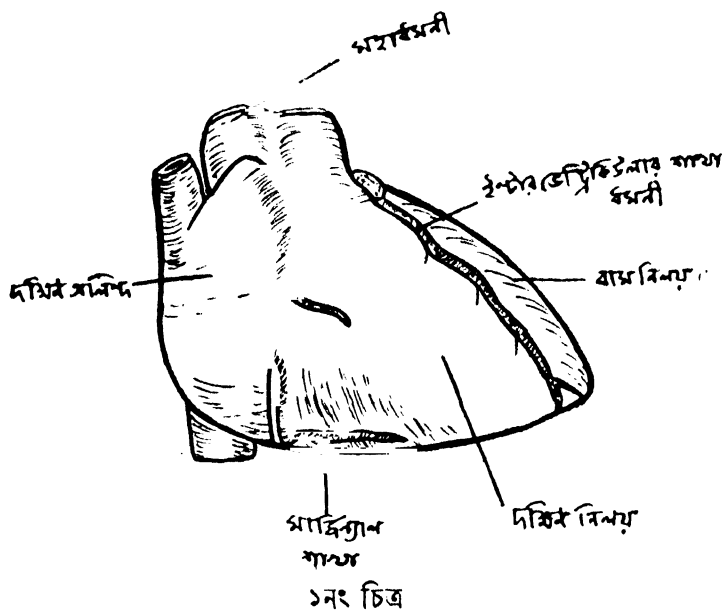
পেশীও রক্ত ছাড়া বাঁচতে পারে না। রক্ত বয়ে নিয়ে যায় অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য। হৃৎপিণ্ডের কুঠুরি থেকে যে মহাধমনী বেরয় তা থেকে যে হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী ধমনীর উৎপত্তি হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। দুটি সাইনাস থেকে দুটি করোনারি ধমনীর উৎপত্তি হয়। সেগুলি যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ করোনারি ধমনী। বাম করোনারি ধমনীটি হৃৎপিণ্ডের সামনের এবং বাঁ-দিকের অংশকে, অর্থাৎ বাঁ-দিকের নিলয়কে আর দক্ষিণ করোনারি ধমনী হৃৎপিণ্ডের পিছনের ডান দিকের (কিছু পরিমাণ বাঁ-দিকের অংশকেও) অংশে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে।

অতি ক্ষুদ্র আর পাত্‌লা। কিন্তু এরাই হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে অক্সিজেন ও খাদ্য বয়ে নিয়ে যায়। আবার হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী থেকে নিষ্কাশিত আবর্জনা ক্যাপিলারির মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্যাপিলারিগুলি খুব ছোট ছোট শিরার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কতকগুলি শিরা একসঙ্গে মিলে বড় শিরা এবং কয়েকটি বড় শিরা মিলিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী প্রধান শিরা তৈরী করে। শিরার ভিতর দিয়ে যে রক্ত আসে তার মধ্যে অক্সিজেন থাকে না, কোন খাদ্যদ্রব্য থাকে না, থাকে কেবল অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা। শিরা এই আবর্জনা নিয়ে ফেলে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে।

দেহের মধ্যে অনেক ধমনী আছে, যারা জোড়ায় জোড়ায়—একটি বাঁ-দিকে আর একটি ডান দিকে থাকে। এই সব ধমনীগুলি পরস্পরের বিপরীত দিকে রক্ত সরবরাহ করবার পর এমন এক স্থানে আসে, যেখানে তারা উভয়ে সংযোজিত হয়। এ-ধরণের সংযোজনের একটা সুবিধা এই যে, কোন দিকের ধমনী রোগাক্রান্ত হলে অন্য দিকের ধমনী থেকে রক্ত এসে রোগাক্রান্ত ধমনী দ্বারা পরিবাহিত স্থানে রক্ত সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বেলায় ঠিক এই রকম সুবিধা নেই বললেই চলে।

দক্ষিণ করোনারি ধমনীর দুটি প্রধান শাখা হচ্ছে—

১। মার্জিন্যাল—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ধার দিয়ে যায় বলে এর নাম এ-রকম হয়েছে, অনেকে এরূপ মনে করেন।

২। ইণ্টারভেণ্ট্রিকিউলার — ভেণ্ট্রিকল্ বা নিলয়ের মধ্যেকার মাংসপেশীকে রক্ত সরবরাহ করে বলে এদের এ-রকম নাম হয়েছে।

বাম করোনারি ধমনীর একটি মাত্র প্রধান শাখা আছে—সেটি বেশ চওড়া। তার নাম ইণ্টারভেণ্ট্রিকিউলার।

২নং চিত্র
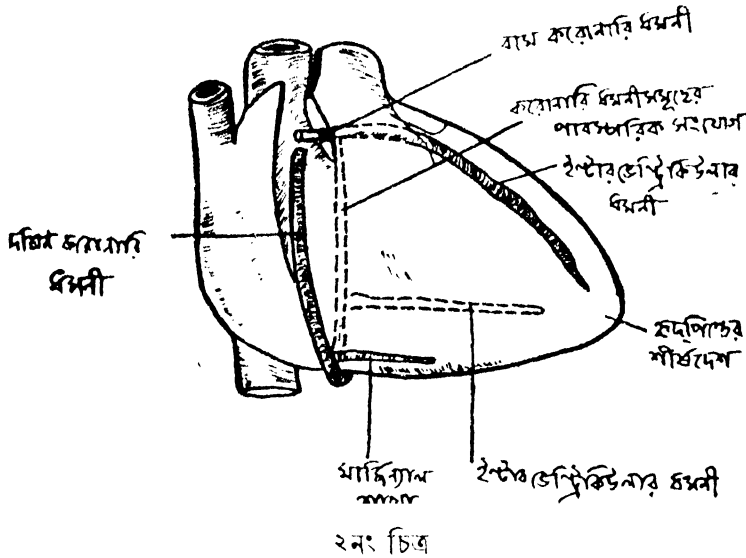
স্বাস্থ্যবান যুবক বা শিশু কোন দুর্ঘটনার ফলে মৃত এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ ছাড়া অন্য রোগে মৃত ব্যক্তিদের শব ব্যবচ্ছেদের পর হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সংবহনকারী ধমনীগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে—শিশু, যুবক বা ত্রিশ বছরের কাছাকাছি কোন লোকের হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহনকারী ধমনীর প্রধান প্রধান শাখাগুলি তাদের পথ পরিক্রমার কোন স্থানেই পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত হয় না। তবে মধ্যবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ডে করোনারি ধমনীর দুটি শাখাকে তাদের পথ-পরিক্রমণের শেষে সংযোজিত অবস্থায় দেখা গেছে।

দু-দিকের দুই ইণ্টারভেণ্ট্রিকিউলার ধমনী হৃৎপিণ্ডের শীর্ষদেশের কাছে এসে সংযোজিত হয়। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এ-রকম হবার কারণ আছে। করোনারি ধমনীর কোন শাখা সামান্যতম রোগাক্রান্ত হলেই স্থানীয় এলাকা রক্ত পায় না। তখন একে সাহায্য করবার জন্যে পাশের কোন ধমনী ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে আক্রান্ত অংশটির উপরিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন রক্তচলাচল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। দুই ধমনীর এই সংযোজনের ফলে যে নতুন রক্ত চলাচল প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাকে ইংরেজীতে বলা হয় কোল্যাটার‍্যাল সার্কুলেশন। হৃৎপিণ্ড রক্ত

চলাচলের এই পশ্চাৎ-দ্বার পদ্ধতি গ্রহণ করে বিপদ উপস্থিত হলে। করোনারি ধমনীর কোন দিকের শাখা যদি রোগগ্রস্ত হয়ে রক্ত-সরবরাহ বন্ধ করে, তখন সেই সঙ্কট-মুহূর্তে এই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যা অবলম্বন করে হৃৎপিণ্ড বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে। (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এবার করোনারি থ্রম্বোসিসের অধ্যায়ে ফিরে আসা যাক। করোনারি থ্রম্বোসিস সম্বন্ধে আমাদের যে এত আতঙ্ক, তার কারণ হচ্ছে—এই রোগ আসে হঠাৎ, কোন এত্তালা না দিয়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, গভীর রক্তবাহী ধমনীও জরাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশঃই শুকিয়ে যেতে থাকে এবং সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পেতে থাকে। সে জন্যেই আমরা দেখি যে, মানুষের জীবনের মধ্য পথে করোনারি থ্রম্বোসিস হয়। শুধু এ কারণেই নয়, কোন কারণে করোনারি ধমনীর কোন শাখা ছিঁড়ে গেলে, সেই ছিন্ন অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে।

ধমনীগুলি যখন শুকিয়ে যায় (Degenerated) তখন রক্ত-চাপ বাড়ে। তাহলে বুঝা গেল যে, উচ্চ রক্ত-চাপের রোগীদের ধমনীগুলি স্বভাবতঃই শীর্ণকায়। কাজেই রক্তের চাপ খুব বেশী
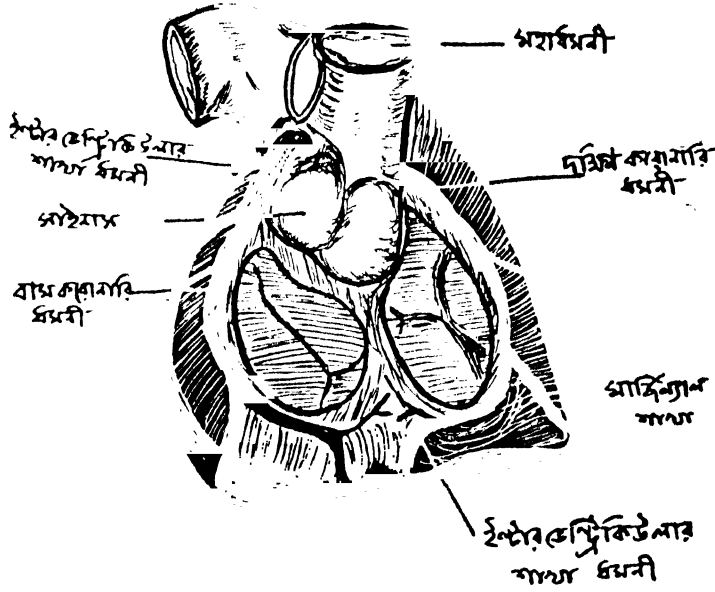
৩নং চিত্র

রাতে এই রোগের প্রথম আক্রমণ হয়। একে আকস্মিক আক্রমণ, তার উপর আবার রাত্রিবেলা—এই দুয়ে মিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তোলে।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—এ রোগের কারণ কি? অ্যাথেরোমা, অর্থাৎ ধমনীর মাংসপেশীর একটি স্তর (Arterial intima) শুকিয়ে গেলে রক্তচলাচলের পথ সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। করোনারি ধমনীতে অ্যাথেরোমা হলে রক্ত চলাচলে ব্যাহত হয়। কেন এ-রকম হয়? মানুষের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হলে করোনারি ধমনীর কোন শাখা রক্তের চাপে ছিঁড়ে যেতে পারে। ঐ ছিন্ন অংশ ক্রমশঃই শুকিয়ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে।

এছাড়া আরও কারণ আছে। অনভ্যস্ত লোক যদি হঠাৎ ক্রমাগত অস্বাভাবিক শারীরিক পরিশ্রম করতে আরম্ভ করে, তাহলে তার হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সহজেই দুর্বল হয়ে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের ধমনীগুলি ক্রমশঃই অকর্মণ্য হয়ে পড়তে থাকে। করোনারি ধমনী নিস্তেজ হয়ে পড়লে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত না পেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

আধুনিক কালের বিবিধ গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং নানা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাদের দিন কাটে, তাদের হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনী অতি সহজেই জীর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়। এছাড়া সিফিলিস, বাতরোগ এবং অন্যান্য মারাত্মক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হলে করোনারি ধমনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় করোনারি ধমনীর মধ্যেকার আয়তন (Lumen) ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মুখ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। উল্লিখিত কোন কারণে যদি কোন বড় শাখা ধমনীর মধ্যেকার ফাঁকা পথ ক্রমশঃ বা হঠাৎ আয়তন এবং দৈর্ঘ্য জোর করে বেড়ে যায়। তখন কোন শারীরিক পরিশ্রম বা কোন উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করলে হঠাৎ করোনারি ধমনীর কোন শাখা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। যে কারণেই হোক, করোনারি ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল হয় না। প্রথমে অল্প, পরে বাধার পরিমাণ বাড়তে থাকলে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ব্রাউন এবং পিয়ারসন, তাঁদের দীর্ঘ অভি-
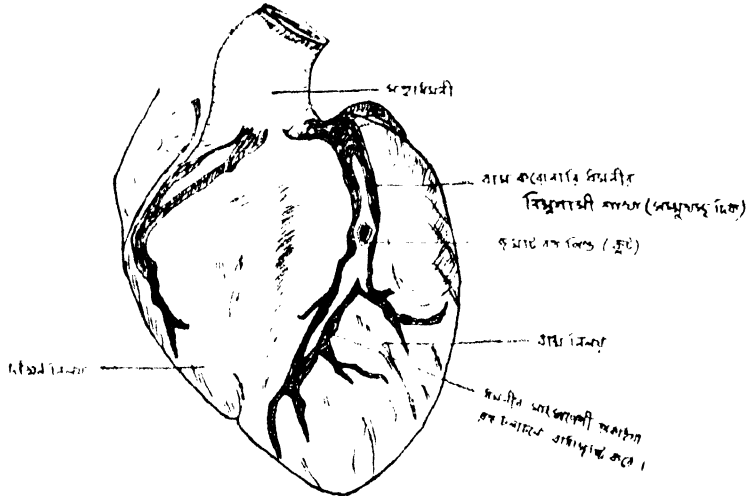
৪নং চিত্র

বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে আর স্থানীয় মাংসপেশী রক্তহীন হয়ে পড়ে। রক্তহীন মাংসপেশীতে তখন রোগের সৃষ্টি হয়। রক্তশূন্য মাংসপেশী ক্রমশঃ অসাড় হয়ে একেবারে মরে যায়।

করোনারি থ্রম্বোসিসের আরও কারণ আছে। অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা হলে, দীর্ঘদিন মস্তিষ্কের কাজ করলে, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে, খুব বেশী খেলে বা অজীর্ণতায় করোনারি ধমনী রোগাক্রান্ত হতে পারে। খুব বেশী খেলে পাকস্থলী এবং বৃহদন্ত্রের এক অংশ, যার নাম কোলন, তার

জ্ঞতার ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, করোনারি থ্রম্বোসিস সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে বেশী হয়। আবার তেভ এবং হায়ার বলেন যে, কোন মাসে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে এ রোগ হতে পারে। গরম ঘর থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বেরুলে সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

করোনারি ধমনীর মধ্যে কখনো বা একটা জমাট পিণ্ড (ক্লট্) থাকে, কখনো আবার ছোট ছোট জমাট পিণ্ড বিভিন্ন শাখার মধ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থেকে মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালনে

বাধা দেয়। ফলে ঐ স্থানের মাংসপেশী অক্সিজেন বা খাদ্য কিছুই পায় না; কাজেই সেখানে নানারূপ বিকৃতাবস্থা ঘটে।

বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, শতকরা ৬৬-৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে বাম করোনারি ধমনীর নিম্নগামী সম্মুখস্থ শাখার (Anterior descending branch of left coronary artery) মধ্যে এবং শতকরা ২১-৪৭ ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষিণ করোনারি ধমনীতে থ্রম্বোসিস হয়। শতকরা ৫-৩৩ ভাগ ক্ষেত্রে বাম সারকমফ্লেক্স (Left circunflex) ধমনীতে থ্রম্বোসিস হয়।

বাম করোনারি ধমনীতে ক্লটের সৃষ্টি হলে হৃৎপিণ্ডের শীর্ষদেশের নিকটস্থ বাম নিলয়ের দেয়ালের সামনের দিকের এবং দুইটি নিলয়ের মধ্যেকার দেয়ালের (Inter-ventricular septum) আক্রান্ত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, রক্ত না পেয়ে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর তন্তুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। সাধারণতঃ রোগের আক্রমণের পরে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা না কাটলে রক্তশূন্য পেশীতন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় না। তবে দেখা যায় যে, তন্তুগুলি স্ফীত হয়েছে এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। রোগ আক্রমণের কয়েকদিন পরে আক্রান্ত মাংসপেশী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেই অংশটি বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তার চারপাশে পূর্বেকার রক্তজনিত লাল রেখা থাকে। ক্রমশঃই ঐ অংশটি শক্ত এবং মৃত অংশে পরিণত হয়।

করোনারি ধমনীর মধ্যে ছোট ক্লট সৃষ্টি হলে রক্ত-চলাচলে খুব বেশী অসুবিধা হয় না, কিন্তু ঐ ক্লট বা জমাট পিণ্ডটি ক্রমশঃ আয়তনে বড় হতে থাকে এবং পরে রক্ত-চলাচলের পথ একেবারে রুদ্ধ করে দেয়। সে জন্যে এই রোগের প্রথম আক্রমণের কয়েকদিন পরেই আবার দ্বিতীয় আক্রমণ হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ আকস্মিকভাবে হয়ে থাকে এবং দুই-একদিনের মধ্যেই চরম অবস্থার সৃষ্টি করে।

রোগী এবং তার আত্মীয়-পরিজনেরা মনে করে থাকেন যে, করোনারি ধমনীর মধ্যে যে জমাট পিণ্ড রক্ত-চলাচলে বাধা দিচ্ছে, সেটি নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে এসে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন উপসর্গ সৃষ্টি করবে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

করোনারি থ্রম্বোসিসের আক্রমণ হঠাৎ হয় বলে আমরা মনে করি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, আকস্মিকভাবে হয় না। রোগের প্রথম আক্রমণের আগের সপ্তাহ থেকেই রোগীর হৃৎপিণ্ডে চন্‌চনে ব্যথা হতে থাকে। এই ব্যথার স্থিতিকাল অত্যন্ত কম বলে রোগী তেমন গ্রাহ্য করে না। তারপরে হঠাৎ একদিন যখন করোনারি থ্রম্বোসিস আক্রমণ করে, তখন সে স্বভাবতঃই ঘাবড়ে যায়।

করোনারি ধমনীর কয়েকটি রোগ বেশ পাশাপাশি। করোনারি থ্রম্বোসিস, করোনারি অক্লুসন,—মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সন। করোনারি ধমনীতে অল্প ক্লট জমা হলে রক্ত-চলাচলে অসুবিধা হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় না—এই অবস্থা হচ্ছে করোনারি থ্রম্বোসিসের স্তর। যদি সম্পূর্ণরূপে ধমনীর মুখ বন্ধ হয়ে যায় তবে সেই অবস্থাকে বলা হয়, করোনারি অক্লুসন এবং কোন ধমনীতে রক্ত-চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হলে ঐ স্থানের মাংসপেশী রক্তহীন হয়ে ধীরে ধীরে মরে যায়—এই অবস্থাকে বলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সন। রোগের সুরু হয় করোনারি থ্রম্বোসিস নিয়ে, আর শেষ হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফারক্সনে। আবার প্রথম আক্রমণেই অনেক সময় রোগের শেষ স্তর আসতে পারে।

করোনারি থ্রম্বোসিসে প্রথম থেকেই সুরু হয় নানা উপসর্গ। ঘুমের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ হলে রোগী ব্যথার তাড়নায় চেঁচিয়ে ওঠে ঘুম থেকে। অসহ্য ব্যথা ক্রমশঃই বুকের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ-রকম অসহ্য যন্ত্রণা অন্য কোন

রোগে অনুভূত হয় না। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে থাকে। অনেকের আবার অজীর্ণ রোগ থাকার ফলে ঐ সময় আরো অস্বস্তি অনুভব করে। কদাচিৎ এমন ক্ষেত্র দেখা গেছে যে, একেবারেই যন্ত্রণা হয় নি। তবে শেষের ক্ষেত্রে রোগী প্রথম থেকেই শ্বাসকষ্ট অনুভব করে।

যন্ত্রণা সর্বপ্রথম বুকের উপর দিকে অনুভূত হয়, তারপর ক্রমশঃই হাত এবং বুকের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী বুকের ভিতরে একটা চাপ অনুভব করে। এই যন্ত্রণা কয়েক ঘণ্টা শুধু নয়, দিনের পর দিন একই অবস্থায় থাকতে পারে। ধীরে ধীরে আরো উপসর্গ রোগীকে ঘিরে ধরে। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, অজ্ঞানও হয়ে যায়। তাছাড়া অত্যধিক ঘর্মনিঃসরণ, অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট এবং বমির উপসর্গ দেখা দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না; কারণ রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী চেতনাশূন্য হয়ে পড়ে। রোগের প্রথম অবস্থায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘাম হতে থাকে, তীব্র যন্ত্রণা, এবং শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় এবং হাত পায়ের আঙ্গুলের ডগা নীলাভ হয়ে যায়। নাড়ীর গতি বেশ দ্রুত থাকে। রোগের প্রথম বারো ঘণ্টায় রক্তের চাপ বাড়লেও তারপরেই হ্রাস পেতে থাকে। রোগের চতুর্থ দিনে রক্তের সর্বোচ্চ চাপ (সিষ্টোলিক) থাকে ৮০-৯০ মি. মি. এইচ-জি (80-90 mm Hg) এবং সর্বনিম্ন চাপ (ডায়াষ্টোলিক) থাকে ৩০-৩৫ মি. মি. এইচ-জি (30-35 mm. Hg.)। এই সব লক্ষণগুলিকে এক সঙ্গে বলা হয় 'শক'। এই সময় বহু লোক মারা যায়। অল্প অল্প জ্বরও চলতে থাকে। রোগের সঙ্কটজনক অবস্থা প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। তবে প্রথম দিকেই বেশী উপসর্গ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের মাংসপেশী ক্রমশঃ রক্তহীন হয়ে পড়ে; ফলে সঙ্কোচন প্রসারণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে এক সময়ে হৃদ্স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

থ্রোম্বোসিসের ফলে করোনারি ধমনীর মধ্যে জমাট পিণ্ডটি আকারে বড় হতে থাকে। রোগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন থেকে ক্রমশঃই রক্ত জমাট বাঁধবার সময় (Clotting time) কমতে থাকে, অর্থাৎ সে সময় থেকে আরো তাড়াতাড়ি রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে। সে জন্যে রোগের পঞ্চম বা ষষ্ঠদিন থেকে তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সময়টি খুবই সঙ্কটজনক এবং এ সময় মৃত্যু ঘটে থাকে। প্রথম অবস্থায় অনেক সময় দুটি নিলয়ের মধ্যেকার দেয়ালে ছিদ্র হয়ে যায়; ফলে মৃত্যু আরও তাড়াতাড়ি আসে।

আমরা জানি যে, একটি পাতলা পর্দা হৃৎপিণ্ডকে ঢেকে রাখে—এর নাম পেরিকার্ডিয়াম। এই রোগে পেরিকার্ডিয়াম আক্রান্ত হয়ে আরও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

এতক্ষণ রোগের কারণ, উপসর্গ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবার এই রোগের চিকিৎসার কথা কিছু বলা যাক। চিকিৎসার প্রথম কথাই হচ্ছে, পরিপূর্ণ বিশ্রাম—অন্ততঃ মাস তিনেকের জন্যে নিতে হবে।

দিবারাত্র শুশ্রূষাকারী রাখা উচিত। খুব অল্প পরিমাণে তরল খাদ্য রোগীকে দেওয়া হয়। মলত্যাগের সময় রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, কারণ সে সময়ে বহু রোগী মারা যায়।

রোগের প্রথম দু-দিনের মধ্যে রোগীকে মুহূর্তের জন্যেও নড়তে দেওয়া উচিত নয়। শ্বাসকার্যের সুবিধার জন্যে অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া ভাল। যন্ত্রণার অনুভূতি কমাবার জন্যে মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়। রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত পরীক্ষা করা ও হৃৎপিণ্ডের ছবি (Electro-cardiogram) নেওয়া প্রয়োজন।

পূর্বে আলোচিত 'শক্'-এর জন্যে রোগীর দেহে রক্ত দান করা হয়। তাছাড়া নর-অ্যাড্রিনালিন, মেফেনটেরিমিন, কুইনিডিন, ডিজিট্যালিস, অ্যামাইনোফাইলিন ইত্যাদি ওষুধ বিভিন্ন উপসর্গ নিবারণ করবার জন্যে চিকিৎসকেরা ব্যবহার করে থাকেন। রক্তের জমাট-বাঁধা বন্ধ করবার জন্যে

রক্ততঞ্চন-প্রতিষেধক ওষুধ হেপারিন, ডাইকুমারিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

রোগী উন্নতির দিকে গেলে দু-মাস পরে বেশী বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে শোয়ানো হয়। এমনিভাবে ধীরে ধীরে হাঁটা বা সামান্য পেটের ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকবার দরুণ পায়ের বড় বড় শিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। সে জন্যে শোয়া অবস্থাতেই পায়ের ব্যায়াম করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় এক নতুন পদ্ধতিতে এই রোগের চিকিৎসা চালাবার পরীক্ষা চলছে। কৃত্রিম উপায়ে রোগীর দেহ ও মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চালন বজায় রেখে চিকিৎসকেরা হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করে রোগাক্রান্ত স্থানের চিকিৎসা করেন। এই পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হলে এই দুর্দান্ত রোগ বিজ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে।

অনেকের ধারণা, করোনারি থ্রম্বোসিস আক্রান্ত রোগী ভাল হলেও বেশী দিন বাঁচে না; কিন্তু একথা ঠিক নয়। তবে যাদের ছোট বেলা থেকে বা বংশগত হৃদ্‌রোগ আছে, তারা যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভাল হয়ে ওঠে, তাহলে তারাও দীর্ঘজীবন লাভ করবে কিনা, তা সঠিকভাবে বলা চলে না। কিন্তু যাদের সে-রকম কোন ইতিহাস নেই, সে সব রোগীকে এই রোগমুক্তির পর কুড়ি বছরেরও বেশী সুস্থভাবে বাঁচতে দেখা গেছে।

এই রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হতে গেলে প্রয়োজন—রোগীর সাহস এবং বাঁচবার জন্যে দৃঢ় সঙ্কল্প, মানসিক স্থৈর্য এবং শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন। একবার এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে আর কোনদিন যে তার এই রোগ হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই জীবনের বাকী দিনগুলিতে কোন দিনই দৌড়'নো, ভারী জিনিষ তোলা, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, হাতুড়ী পেটানো ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। সকালে বিকালে বেড়ানো, বাগান করা, খুব হাল্কা ব্যায়াম ইত্যাদি অনুশীলন করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্ত-সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন।

করোনারি থ্রম্বোসিস খুব কঠিন রোগ—একথা সত্যি, কিন্তু তা বলে এ রোগ যে সম্পূর্ণ দুরারোগ্য, সে ধারণা মন থেকে মুছে ফেলা উচিত।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক (১৯৫৯) প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি তারকা চিহ্নিত করিয়া যথাসময়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হইবে।

১। পদার্থ-বিদ্যা—বলবিদ্যার ক্রমবিকাশ—শ্রীননীগোপাল কর্মকার, জলপাইগুড়ি।

২। রসায়ন-বিদ্যা—পারমাণবিক শক্তি—শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক। মেদিনীপুর।

৩। চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা—মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা—শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কলিকাতা-২৮

৪। প্রাণী-বিদ্যা—সুদূর পিয়াসীর এক অজানা অধ্যায়—শ্রীআশীষকুমার মাইতি। কলিকাতা-১৯

৫। উদ্ভিদ-বিদ্যা—নিমেষে কি ফুটবে না ফুল চকিতে ফল ফলবে না?—শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা-২৬

৬। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা—বেতার ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—শ্রীশান্তিময় বসু। কলিকাতা-৯

পুস্তক পরিচয়

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—দিলীপ বসু। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—বারো আনা।

আকাশ-বিহারে সাফল্য লাভের পর মানুষ অনেকদিন থেকেই মহাশূন্যে যাত্রার স্বপ্ন দেখে আসছিল। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ-যাত্রার পথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ সুরু হয়। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে আরও যে সব বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে—তাতে নিঃসন্দেহে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ গ্রহান্তর যাত্রায় সাফল্য লাভ করবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মহাকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অগ্রগতিও অতি বিস্ময়কর। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক সুন্দরভাবে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিষয়ে আগ্রহশীল পাঠকের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হবে বলেই আশা করি। **দ. চ.**

যুব কল্যাণ—বিনয় ঘোষ—শিশু সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ৬টি অধ্যায়ে যুব কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখকের অসুবিধার কথা তিনি নিজেই বলেছেন। অসুবিধা সত্ত্বেও বইখানি যে তিনি সম্পাদন করতে পেরেছেন, সে জন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ। তবে উন্নয়ন পরিকল্পনার কোথাও কোথাও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্মত বলে মনে হয় না। জাতিভেদ প্রথার একটু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এর সঙ্গে শিশুমনে যাতে ভালভাবে দাগ কাটতে পারে, এমন প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে। বেকার জীবন ও আত্মহত্যার যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে, শিশুমনের দিক থেকে চিন্তা করলে সেটা এই বইতে স্থান না পেলেই ভাল হতো।

সমাজ-উন্নয়নের কথা শিশুদের কাছে পরিবেশন করা দুরূহ সমস্যা। আশা করি লেখক পরবর্তী সময়ে এই সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে অগ্রণী হয় দেশের কল্যাণ সাধন করবেন।

আমরা ফসল ফলাই—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; শিশু সাহিত্য সংসদ; কলিকাতা-৯।

লেখকের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। বাঙলার বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ যে ক্ষেত্রে সাহিত্যের সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে, সে ক্ষেত্রে লেখকের উপর গুরু দায়িত্ব পড়ে। বর্তমান গ্রন্থে শিশুদের জন্যে লিখিত বিষয়গুলি সহজবোধ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় অনেক জায়গায় তথ্যগত নির্ভুলতা রক্ষা পায় নি। এ ছাড়া বহু প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করবার ফলে রচনার অর্থ কোথাও কোথাও বিজ্ঞানসম্মত হয় নি।

দ. চ.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ভূ পদার্থতাত্ত্বিক বছরে ইউ. এস-এর একদল বৈজ্ঞানিক এই বেলুনটিকে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করবার জন্যে গ্যাস ভর্তি করছেন। অ্যানটার্কটিকা এলাকায় ইউ. এস-এর গ্ল্যাসিয়ার নামক জাহাজে এই ফটো তোলা হয়েছিল। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা পরিমাপের জন্যে যন্ত্রপাতি সমেত একটি রকেট এই বেলুন থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ডপ্‌লার-এফেক্ট

সময়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; স্থান—সাবমেরিনের একটি কামরা।

লোকটি ব্যস্তভাবে কেবল বলে যাচ্ছে—'না—না, এখনও না—হুঁসিয়ার—ডপ্‌লার, উঁচু ডপ্‌লার—এবার, এবার।'

প্রচণ্ড একটা শব্দ। সমুদ্রের জলে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হলো। শত্রুপক্ষের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু ডপ্‌লার কি?

ডপ্‌লার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। একদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা ট্রেন বাঁশী দিতে দিতে ছুটে গেল। ডপ্‌লার লক্ষ্য করলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজটা যেন অনেক জোরে শোনালো। বিজ্ঞানী আরও অনেকবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। অবশেষে ভাবতে সুরু করলেন—কারণ কি?

জলের ঢেউয়ের মত শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—একথা আমরা জানি। তার মানে, সেকেণ্ডে পাঁচ শ' কি হাজার বার বাতাসের কম্পন আমাদের কানে এসে পড়ছে, তাই আমরা শব্দ শুনছি। কিন্তু যা থেকে এই শব্দ বেরোচ্ছে তা যদি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তবে পাঁচ শ' বা হাজারের চেয়ে বেশী বার শব্দের ঢেউ কানে এসে পড়বে। ফলে শব্দটা আমরা জোরে শুনবো। পূবদিক থেকে বাতাস বইছে। পূবের দিকে মুখ করে যদি তুমি হাঁটতে থাক, তোমার গায়ে বেশ জোরে বাতাস লাগবে। কিন্তু উল্টো দিকে গেলে বাতাসের বেগ তুমি সহজে বুঝতে পারবে না। শব্দের বেলায়ও তাই হচ্ছে। শব্দের কোন উৎস তোমার দিকে ছুটে এলে আওয়াজ তুমি জোরে শুনবে; আবার উৎসটি ও তোমার মধ্যে দূরত্ব যদি বেড়ে যায়, শব্দ তোমার কাছে কম মনে হবে। শব্দের তীব্রতার এই যে রকমফের, বিজ্ঞানের ভাষায় তা হলো 'ডপ্‌লার এফেক্ট'।

ডপ্‌লার এফেক্টকে বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। এখানে সে বিষয় বুঝিয়ে বলছি। শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, সে কথা আমরা জানি। না শুনতে পাওয়া শব্দ থেকেও এই প্রতিধ্বনি আসতে পারে*, যন্ত্রের সাহায্যে তা ধরাও যায়। ধর, কোন জাহাজ থেকে দূরে শত্রুপক্ষের সাবমেরিন রয়েছে। না শুনতে পাওয়া শব্দ সাবমেরিনের দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসবে। যন্ত্রে যদি

---

* এমন শব্দও আছে যা আমরা শুনতে পাই না। শব্দের ঢেউ সেকেণ্ডে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বারের বেশী হলে তা আমরা শুনতে পাই না।

বোঝা যায়—এই শব্দ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হবে সাবমেরিনটি এগোচ্ছে। এ হলো উঁচু 'ডপ্লার'। আর শব্দের জোর যদি কমতে থাকে তখন বুঝতে হবে, ডুবোজাহাজ পিছিয়ে যাচ্ছে—তখন হবে 'নীচু ডপ্লার'। দূরত্ব যদি সমান থাকে, তখন কোন ডপ্লার নেই।

রামায়ণে আছে, হরিণ ভেবে রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ মেরে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু-কে বধ করেছিলেন। বিজ্ঞানের যুগে ডপ্লারের এই তত্ত্ব শব্দভেদী বাণের কাজ করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মেনীর ইউবোট যখন সমুদ্রে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, বিজ্ঞানের এই তত্ত্বই তখন তাকে দমন করতে সাহায্য করে। না শুনতে পাওয়া শব্দ কিন্তু বাতাসের ভিতর দিয়ে এগুতে পারে না, একমাত্র জলের তলায় অদৃশ্য জিনিষ এর সাহায্যে ধরা পড়ে। মেঘের আড়ালে শত্রু বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে রেডার যন্ত্র চাই—অশ্রুত শব্দের বদলে রেডার অদৃশ্য আলোর সাহায্যে কাজ করে। অদৃশ্য আলো হলো, যে আলো আমরা দেখতে পাই না।

ডপ্লার এফেক্ট সাধারণ আলোর বেলায়ও আছে। আলোর ঢেউ শব্দের ঢেউয়ের মত চারদিকে ছড়িয়ে যায়। লাল মানে—আমরা জানি সেকেণ্ডে চার লক্ষ কোটি বার ঢেউ জেগে ওঠা, সবুজ রঙে এ ঢেউ আরও বেশী। মনে কর, মনুমেণ্টের মাথায় একটা লাল টুপি পরানো রয়েছে। তার মানে, তোমার চোখে চার লক্ষ কোটি ঢেউ প্রতি সেকেণ্ডে এসে পড়ছে। এবার মনুমেণ্টের দিকে ছুটে যাও—অত জোর ছুটতে পারবে কি? সেকেণ্ডে ৪৪,০০০ মাইল জোরে যদি ছুটতে পার, তাহলে লাল রং-কে তুমি সবুজ দেখবে। সেই ডপ্লার এফেক্টের দরুণই এরূপ হবে।

একটা গল্প শুনেছিলাম। বিজ্ঞানী উড্‌কে নাকি একবার পুলিশে ধরেছিল। লাল বাতির নির্দেশ অমান্য করে তিনি গাড়ী চালিয়েছিলেন। উড্ বললেন, ডপ্লার এফেক্টের জন্যে তিনি নাকি সবুজ দেখেছেন। এমন কথা হাকিম কখনো শোনেন নি। ভদ্রলোক বোধ হয় একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন! ভাবলেন, ডপ্লার এফেক্ট—বৈজ্ঞানিক যখন বলছেন—হবেও বা। আলেকজাণ্ডার উড্ বেকসুর খালাস পেলেন।

হাকিম হলে তোমরাও তাই করতে নাকি?

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

মাছের বিষ

মাছের বিষ—শুনতে অদ্ভুত হলেও—কথাটা সত্য। অবশ্য আমরা সাধারণতঃ যে সব মাছ দেখে থাকি, তাদের অধিকাংশই আমাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে আবার শিঙ্গী, মাগুর, ট্যাংরা প্রভৃতি মাছের কণ্টকাঘাত খুবই যন্ত্রণাদায়ক। এছাড়া বিভিন্ন জাতের আরও অনেক মাছ আছে—যাদের বিষ সবার পক্ষেই মারাত্মক।

এযাবৎ প্রায় তিন শ'-এরও বেশী জাতের বিষাক্ত মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অধিকাংশই সমুদ্রের মাছ। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, এ সব বিষাক্ত মাছ থেকে মানুষের রোগ উপশমকারী ওষুধ প্রস্তুতের সম্ভাবনা আছে। হয়তো একদিন বিষাক্ত মাছ মানুষের পরম বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে। আগেকার কতকগুলি ব্যাপার থেকেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; যেমন—কিউরেরা নামক একরকম মারাত্মক বিষ রেড ইণ্ডিয়ানেরা তীরের ফলায় মাখিয়ে শত্রু বা শিকারকে ঘায়েল করতো। পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেল যে, এই মারাত্মক বিষ মানুষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ পোলিও, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে এবং অস্ত্রোপচারের সময় মাংসপেশী শিথিলীকরণে এই বিষ খুবই কার্যকরী। এ-রকম আরও উদাহরণ আছে।

উইভার ফিস নামক একজাতের মারাত্মক বিষাক্ত মাছ আছে। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে একবার যদি বিষ ঢোকাতে পারে—তাহলে তার বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম। এরা শত্রু বা শিকারকে আক্রমণ করে ক্ষিপ্রগতিতে। এই সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা জানা গেছে। একবার নেপলস্-এর কাছে সেণ্ট অ্যাঞ্জেলো বন্দর থেকে প্রায় দু-শ' গজ দূরে একজন ডুবুরী সমুদ্রের তলায় নামে। প্রায় ১৮ ফুট জলের তলায় যাবার পর সে দেখে—সমুদ্রের তলদেশে একটা উইভার ফিস অর্ধেক শরীরে কাদা মেখে পরম সুখে বিশ্রাম করছে। ডুবুরীটি মাছটাকে খোঁচা মারে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো—মাছটা যেন এই খোঁচা মারাটাকে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত বলেই গণ্য করে নি। তারপর মাছটা হঠাৎ দ্রুতবেগে সর্পিল গতিতে ডুবুরীর দিকে মুখ করে তার সূচ্যাকৃতি ধারালো পাখ্‌নাগুলিকে ভীষণভাবে কাঁপাতে থাকে। তারপর তীব্রবেগে ডুবুরীর মুখোসের উপর আক্রমণ করে এবং পরে তার চোয়ালে আঘাত করে। ডুবুরীটি পালাবার বা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করবার অবকাশ পায় নি। ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে ডুবুরীটি কোনক্রমে তীরে এসে পৌঁছায়। যন্ত্রণা এতই ভীষণ হচ্ছিল যে, সে বার বার মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তাকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়েও কোন ফল

পাওয়া গেল না। তার শরীরের উর্ধ্বাংশ ফুলে ওঠে এবং শ্বাস নেবার ও ঢোক গেলবার সময় খুব যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে। সে হাসপাতাল থেকে দিন দশেক পরে সুস্থ হয়ে আসে। চিকিৎসকেরা বললেন—তার শরীরে খুব বেশী পরিমাণে বিষ ঢুকতে পারে নি—সে জন্যে সে সুস্থ হতে পেরেছে—নচেৎ তার বাঁচা খুবই কঠিন হতো। উইভার ফিসের বিষ থেকে মানুষের রোগ-উপশমকারী কোন ওষুধ প্রস্তুতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন।

পট্‌কা মাছের মত একজাতের বিষাক্ত মাছ দেখা যায়। ডাঙ্গায় তোলবার পর বাতাস নিয়ে এরা নিজের পেটটাকে ইচ্ছামত ফুলিয়ে তুলতে পারে। ফোলানো

পটকা জাতীয় এক রকমের বিষাক্ত মাছ।

অবস্থায় এদের খুব অদ্ভুত দেখায়। এদের বিষও খুব উগ্র। এরা বিষাক্ত মাছ হলেও জাপানীদের খুব উপাদেয় খাদ্য। জাপানে এই মাছের দামও খুব বেশী। জাপানের বিশেষ কতকগুলি রেস্তোরাঁয় এই মাছ রান্না করা হয় এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত পাচকেরাই কেবল এই মাছ রান্না করবার অধিকারী। কেন না, বিশেষ পদ্ধতিতে এই মাছ রান্না করতে হয়, নচেৎ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের কড়া দ্রবণে মাছটাকে সিদ্ধ করতে হয়, তারপর বিষাক্ত অংশগুলি ফেলে দেওয়া হয়। এই মাছের বিষ থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা, মাংসপেশীর খেঁচুনী, ক্যান্সার, হৃৎস্পন্দন, রক্ত জমাটবাঁধা প্রভৃতি ব্যাপারের উপকারী ওষুধ প্রস্তুতের সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীদের অনেকে আশা করছেন। অবশ্য এসব বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

টোড ফিস এবং ষ্টিং-রে নামক মাছের বিষ থেকে প্রস্তুত ঔষুধ যথাক্রমে ডায়াবেটিস ও হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ষ্টোন-ফিসের বিষও রক্তের কতকগুলি উপাদান নষ্ট করবার ব্যাপারে কার্যকরী বলে জানা গেছে। এছাড়াও অনেক বিষাক্ত মাছের বিষ থেকে মানুষের রোগ উপশমের কোন ঔষুধ তৈরী করা যায় কিনা—তা নিয়ে গবেষণা চলছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিষাক্ত মাছ খাদ্য হিসাবে পরিত্যক্ত হলেও সব বিষাক্ত মাছই যে অখাদ্য, তা নয়। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ জাতের বিষাক্ত মাছ সুখাদ্য হিসাবে প্রচলিত। বিষাক্ত মাছ বহুবার খাওয়া সত্ত্বেও কিছুই হয় নি, এও দেখা গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শরীরে বিষক্রিয়া দেখা যায়। জাপানের মিনামাটা উপসাগরের কাছে ছোট একটি সহরের লোকদের কাছে কোন এক বিশেষ জাতের মাছ খুব উপাদেয় বলে গণ্য হতো এবং অনেকে এই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল—এই মাছ খেয়ে লোক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এর কারণ সম্পর্কে গবেষণায় বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের গল্প

জোৎস্না-রাতে চাঁদের দিকে ভাল করে তাকালে দেখবে, চাঁদের গায়ে কিসের যেন কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। ঐগুলি হলো চাঁদের কলঙ্ক। কিন্তু এত সুন্দর চাঁদের গায়ে কিসের জন্যে এই কালো চিহ্ন? আসামের খাসিয়া পাহাড়ের আদিবাসীরা বলে, এককালে চাঁদ ছিল বড্ড দুষ্টু। কি এক শয়তানী মতলবে সে একবার সূর্যের কাছে গিয়েছিল। তাতে সূর্য রেগে গিয়ে একরাশ ধূলা ছুঁড়ে মেরেছিল চাঁদকে। সেই ধূলার দাগ আর মুছলো না, চাঁদের কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে রইলো।

ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, চাঁদের ঐ বড় কালো দাগটি হলো একটি গাছের ছায়া। এক ডাইনী বুড়ী সেই গাছতলায় বসে চরকায় সুতা কাটছে রাতদিন। বুঝতেই পার, এসব গল্প একেবারে আজগুবি—সত্যের নামগন্ধও নেই। বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদকে লক্ষ্য করে আসছেন বহুদিন ধরে। তাঁরা বলেন, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে চাঁদের অবস্থা ছিল ঠিক আমাদের পৃথিবীর মত—জল, মাটি, বাতাস সবই ছিল। আর ছিল বহু ছোট-বড় পাহাড়-পর্বত এবং অনেক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির ভিতরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতো গলিত লাভা ও নানারকম বিষাক্ত গ্যাস। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, চাঁদ

ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে লাগলো। চন্দ্রগর্ভ এক সময় হয়ে এলো বরফের মত শীতল। এভাবে চাঁদের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। আগ্নেয়গিরিগুলিও আর লাভা উদ্গীরণ করলো না।

চাঁদের মৃত্যু হলো। মৃত আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়-পর্বতগুলি সাক্ষী হয়ে রইলো সেই মৃত্যুর। সূর্যের আলো এসব আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়-পর্বতের ছায়া ফেলে চাঁদের বুকে। পৃথিবী থেকে সেই ছায়াকে মনে হয় যেন কালো দাগ; কারণ চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। ব্যবধান প্রায় দু'লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইলের মত।

আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে কোনটিই সজীব রইলো না। তাদের বিরাট মুখবিবর 'হাঁ' করে রইলো। সৃষ্টি হলো বহু গর্ত ও গহ্বরের। চাঁদে এ-রকম গর্তের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার—ছোট-বড় সব রকমেরই আছে। কয়েকটি গহ্বর যেমন বিশাল, তেমনই গভীর। গভীরতা চার মাইলের কম নয়! সূর্যকিরণ কখনো এদের তলদেশ পর্যন্ত যেতে পারে না—অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে ভিতরে। কোন কোন গহ্বরের আয়তনও অবিশ্বাস্য রকমের—আমাদের পশ্চিম বাংলার আধখানা তো অনায়াসে পুরে রাখা যায়। এদের নামকরণও করা হয়েছে। বিখ্যাত 'টাইকো' গহ্বরটি বহন করছে বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহীর স্মৃতি।

চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। ব্যাস মাত্র দু' হাজার একশ' ষাট মাইল, যেখানে পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইলের কাছাকাছি। ওজনও কম। পৃথিবী চাঁদের তুলনায় আশী গুণ ভারী। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবী থেকেই তার জন্ম হয়েছিল। বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর কিছু অংশ কোন কারণে ছিট্‌কে গিয়ে এই উপগ্রহটির সৃষ্টি হয়। পৃথিবীচ্যুত হলে কি হবে, পৃথিবীর মায়া সে সম্পূর্ণ কাটাতে পারে নি। জন্মাবধি এই গ্রহের চারদিকে সে ঘুরে মরছে। একবার পরিক্রমণ সেরে আসতে তার সাতাশ দিনের কিছু বেশী সময় লাগে।

শুক্লপক্ষের রাতগুলিতে চাঁদ পৃথিবীকে আলো দিয়ে থাকে; অথচ এই আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্য থেকে ধার করা। চাঁদ শুধু আয়নার মত সূর্যর কাছ থেকে পাওয়া আলো প্রতিফলিত করেই খালাস। সেই প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি হলো চন্দ্রকিরণ। অবশ্য প্রতিফলক হিসেবেও চাঁদ উন্নত ধরণের নয়। প্রাপ্ত সূর্যালোকের ছয় লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সে প্রতিফলিত করে। চাঁদের কিরণ শীতল; কারণ সূর্যরশ্মির অধিকাংশ উত্তাপ শোষণ করে সে আলো প্রতিফলিত করে।

চাঁদের নিজের আলো নেই বলে আবার ভেবো না যেন আমাদের পৃথিবীরই কিছু আলো আছে! সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহকে আলো যোগাবার ভার সূর্যের উপর।

চাঁদকে সম্পূর্ণ দেখবার সৌভাগ্য মানুষের আজও হয় নি। চাঁদের এক অর্ধাংশ

আমরা দেখতে পাই। সামান্য একটু অংশ বাদে বাকী আধখানা সব সময় আমাদের চোখের আড়ালে থাকে। যতখানি আমরা দেখতে পাই, তার আয়তনও একেবারে কম নয়—সত্তর লক্ষ বর্গমাইল তো হবেই!

চাঁদ জল এবং বায়ু বর্জিত। জলের অভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠ শুষ্ক মরুভূমির মত হয়ে আছে। তাছাড়া চাঁদের উপরে বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকায় সূর্যের প্রখর কিরণ বিনাবাধায় তার পৃষ্ঠদেশে সরাসরি এসে পড়ে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, সূর্যের প্রচণ্ড তেজে চন্দ্রপৃষ্ঠ জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন। দিনের বেলায় উত্তাপ ২১৪ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) পর্যন্ত উঠে যায়। আবার চাঁদের রাত্রি ভয়াবহ শীতল। তখন থার্মোমিটারের পারা হয়তো শূন্য থেকে ২৪৩ ডিগ্রিরও নীচে নেমে যাবে। চাঁদে কখনো বৃষ্টি হয় না। আকাশে একটুক্‌রা মেঘও জমে না কোনদিন। জল নেই তো মেঘ আসবে কোথা থেকে?

কিন্তু মানুষের উচ্চাকাঙ্খার শেষ নেই। এমন মৃত্যুপুরীতেও তার যাওয়ার বাসনা! খবরের কাগজ থেকে তোমরা নিশ্চয় জেনেছ, বিজ্ঞানীরা সেখানে যাওয়ার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সফলতা যে নিকট ভবিষ্যতেই আসবে তা নিশ্চিত। কিন্তু সেই শুভ দিনটি যে ঠিক কবে আসবে, বলা শক্ত। সেখানে যাবার ঝামেলা অনেক! বাতাস যখন নেই, অভিযাত্রীকে পৃথিবী থেকে অক্সিজেন-সিলিণ্ডার তো সঙ্গে নিতেই হবে! ওখানে কেউ কারো কথাবার্তা শুনতে পাবে না। চাঁদে কখনও কোন শব্দ হয় না। কারণ, যে বাতাস শব্দ বয়ে নিয়ে যায়, তার নামগন্ধও নেই সেখানে। অভিযাত্রীকে এমন পোষাক পরে যেতে হবে, যা প্রখর সূর্যকিরণ ও বিপজ্জনক মহাজাগতিক রশ্মিকে প্রতিরোধ করতে পারে।

চাঁদে মজাও আছে। পৃথিবীতে যার ওজন ষাট সের, চাঁদে তার ওজন হবে মাত্র দশ সের। ছয় মণ জিনিষের ওজন হয়ে দাঁড়াবে মাত্র একমণ। ফলে ওখানে শরীরটা বেজায় হাল্‌কা বোধ হবে। এই পৃথিবীতে দু-তিন হাত লাফাতে কত কষ্ট হয়! সামান্য চেষ্টায় সেখানে দশ-বারো হাত উপরে উঠে যেতে পারবে অক্লেশে।

চাঁদে আরও কত কি বিস্ময় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছে, কে জানে! এখন মানুষের রকেট একবার চাঁদে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে মানুষের বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক হয়।

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী

জানবার কথা

১। টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করেছিলেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর পর থেকে টেলিস্কোপের আরও বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সব উন্নত ধরণের টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজ্ঞাত রহস্য জানতে পেরেছেন। ক্যালি-

১নং চিত্র

ফোর্ণিয়ার প্যালোমার পর্বতে একটা খুব বড় টেলিস্কোপ স্থাপন করা হয়েছে। এটার নাম হচ্ছে, হেলে প্রতিফলক এবং এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ। এর প্রধান দর্পণটা চওড়ায় ২০০ ইঞ্চি এবং ওজনে ১৪½ টন। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদকে দেখায় যেন—সে মাত্র আট মাইল দূরে রয়েছে।
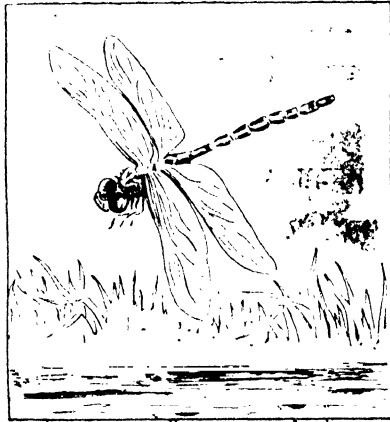
২নং চিত্র

২। এমন কোন কোন কীট-পতঙ্গ আছে—যাদের ভোজন-ক্ষমতার কথা শুনলে

বিস্মিত হতে হয়। ফড়িং যে পরিমাণে খায়, সেটা তাদের দৈহিক ওজনের তুলনায় অনেক বেশী। তারা হর্স ফ্লাই বা ঘোড়ামাছি নামে এক জাতের পতঙ্গ শিকার করে উদরসাৎ করে। তারা যে পরিমাণে হর্স ফ্লাই উদরসাৎ করে—তা তাদের দৈহিক ওজনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। অনেকে মনে করেন যে, ফড়িং মানুষের ক্ষতি করে; আসলে কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্যের ব্যাপারে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশের লোকেরা কোন একটি বিশেষ খাদ্য খুব বেশী পছন্দ করে। তাই বলে তারা ঐ বিশেষ খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য যে খায় না—তা নয়।

৩নং চিত্র

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী রবিশস্য আহার করে। কলম্বোর অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী চিনি খায়। আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী দুধ খায় এবং উরুগয়ের লোকেরা মাংস খায় সবচেয়ে বেশী।

৪। কীট-পতঙ্গেরা যে হারে বংশবৃদ্ধি করে—তা শুনলে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না। এদের বংশবৃদ্ধির হার কিন্তু আজগুবি নয়। কীট-বিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কে গবেষণা করে বিস্ময়কর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁরা বলেন—প্রজনন ঋতুতে একটি স্ত্রী-মাছি মোটামুটি ৫০০ ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিম ফেটাবার পর মাছি এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রূপধারণ করে। অবশ্য এর মধ্যে কিছু ডিম কোন কারণে নষ্ট হয়েও যায়। ঐ সব পূর্ণাঙ্গ মাছির মধ্যে স্ত্রী-মাছিগুলি আবার মোটামুটি ৫০০ বা তারও বেশী ডিম পাড়ে। এইভাবে তাদের ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। যদি সব ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়—তাহলে একটি ঋতুতে একটি স্ত্রী-মাছি থেকে

২০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক বংশধর জন্মায়। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে—

৪নং চিত্র

কিরূপ দ্রুতগতিতে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে!

৫। সূর্য সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই এবং ধারণাও বিচিত্র। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে সূর্য সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেছে এবং আরও অজ্ঞাত তথ্য জানবার জন্যে এখনও গবেষণা চলছে। কিন্তু বহুকাল আগেও সূর্য সম্পর্কে মানুষ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। বহু শতাব্দী আগে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বছরের সব চেয়ে বড় দিনটিতে সূর্য যেখানে উদিত হতো—সেই স্থানটিকে খুব বড় পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতো। ইংল্যাণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জ নামক গ্রামের কাছে খুব বড় একটা

৫নং চিত্র

পাথরের গেট আছে। সেখানের কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে গ্রীষ্মকালের প্রথম দিনটিতে লক্ষ্য করলে ঐ গেটটির জন্যে সূর্যকে ঊষাকালীন নবোদিত সূর্যের মত দেখা যায়। অবশ্য অন্যান্য দিনে ঐরূপ দৃশ্য দেখা যায় না।

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় ভালুক দেখা যায়। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতের ভালুক আছে, সেগুলি ছাড়া অন্য কোন জাতের ভালুক সেখানে দেখা যায় না। অর্থাৎ বিষুবরেখার দক্ষিণাঞ্চলই হচ্ছে এদের একমাত্র বাসভূমি। আবার মজার কথা হলো—এরা হচ্ছে নিরামিষাশী। এদের চোখ দুটির

৬নং চিত্র

চতুর্দিকে গোলাকার সাদা চক্রের মত দাগ থাকে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, পৃথিবীতে আর কোন জাতের ভালুকের চোখে এরূপ চক্রের মত দাগ দেখা যায় না। সে জন্যে এদের চলিত নাম হলো চশমাধারী ভালুক (Spectacle bear)। এদের দৈহিক ওজনও কম নয়, প্রায় ২০০ পাউণ্ডের মত।

৭নং চিত্র

৭। চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারু অনেকেই দেখে থাকবে। লম্ফ প্রদানে এদের

অসাধারণ দক্ষতা। এদের পিছনের পা-দুটি অসাধারণ শক্তিশালী। স্ত্রী-ক্যাঙ্গারুর পেটে একটি থলি আছে। থলির মধ্যে বাচ্চাদের নিয়ে এরা চলাফেরা করে। বিভিন্ন জাতের ক্যাঙ্গারু দেখা যায় এবং তাদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। বিভিন্ন জাতের ক্যাঙ্গারু ১ ফুট থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু জন্মগ্রহণের সময় এদের বাচ্চা একটা ভ্রমরের চেয়ে বড় হয় না।

৮। দেহ রোগাক্রান্ত হলে অনেক সময় দৈহিক যন্ত্রণা হয়। সময় সময় যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে, সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে না। Tic douloureux নামক স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হলে অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণা হয়। চিকিৎসক ও রোগীদের মতে—এই

৮নং চিত্র

রোগের যন্ত্রণা এই তীব্র হয় যে, অন্য কোন যন্ত্রণা, যেমন—দাঁতের ব্যথা, মাথাধরা, কাটা বা আঘাতজনিত ব্যথা প্রভৃতির এর সঙ্গে তুলনাই চলে না। এই রোগকে তীব্রতম যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করা হয়। এই যন্ত্রণা কিন্তু সর্বশরীরে হয় না, কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে।

৯। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে—তার ফলে হয়তো একদিন পৃথিবীতে খাদ্যাভাব হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞেরা নানারকম পন্থা অবলম্বন করবার জন্যে মত প্রকাশ করেছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এমন কোন বস্তুকে খাদ্য হিসাবে চালু করা যায় কিনা, যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং পুষ্টিকর—এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। এ-বিষয়ে গবেষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এক জাতের সামুদ্রিক শ্যাওলাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেবল পৃথিবীর মানুষেরাই নয়, ভবিষ্যতে যারা মহাশূন্যে যাত্রা করবে তারাও এই শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। তাঁদের মতে—এই নতুন খাদ্য

পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। তাছাড়া এগুলিকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও সম্ভব ; কারণ দিনে

৯নং চিত্র

হাজার গুণ পরিমাণে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১০। ভারতবর্ষ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চিতাবাঘ দেখা যায়। এদের স্বভাব খুব হিংস্র। এরা ছুটতেও খুব ওস্তাদ। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ এই হিংস্র পশুকে পোষ মানিয়ে শিকারের কাজে লাগিয়েছে। অনেক সময় এদের ঘণ্টায় ৭৫ মাইল
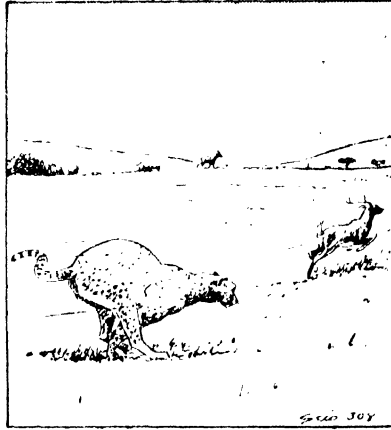
১০নং চিত্র

বেগে শিকারের পিছনে ছুটতে দেখা গেছে। এদের সাহায্যেই মানুষ সাধারণতঃ হরিণ শিকার করতো। পূর্ণবয়স্ক বুনো চিতাবাঘ ধরে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে পোষ মানিয়ে মানুষ তাকে শিকারের কাজে লাগাতো।

১১। পরমাণু-শক্তিকে নানারূপ গঠনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্যে গবেষণা

চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরমাণু-শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করলে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু-শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ নির্মাণ করেছে;
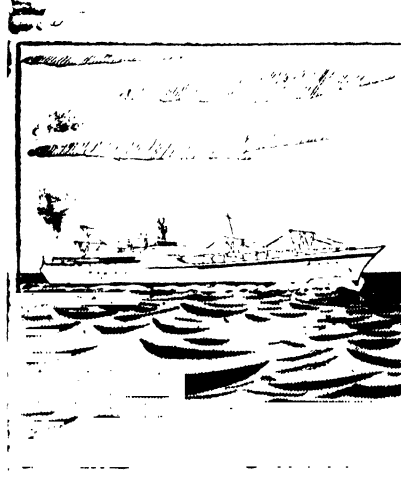
১১নং চিত্র

যুক্তরাষ্ট্র সাভানা নামক আর একটি পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজ নির্মাণ করছে। এটাই হবে পৃথিবীর প্রথম পরমাণু-শক্তি চালিত বাণিজ্যপোত। ১৯৬০ সালে সাভানার সমুদ্র যাত্রার কথা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর গতিবেগ ৩৫ নট হবার সম্ভাবনা। প্রথম বারের ইন্ধনের সাহায্যে এই জাহাজ ৩২ বছর সমুদ্রে যাতায়াত করবে। এর পরে আবার নতুন ইন্ধন যোগান দেবার প্রয়োজন হবে।

১২। জীবন ধারণের জন্যে আমাদের শরীরে তাপের প্রয়োজন হয় এবং এই তাপ আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন—দৈহিক তাপের প্রয়োজনীয়

১২নং চিত্র

উৎস হচ্ছে শরীরের মাংসপেশী। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের মাংসপেশীগুলি প্রচুর

তাপ উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপাদিত তাপের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় এক কোয়ার্ট পরিমাণ হিম-শীতল জলকে ফোটানো যায়।

১৩। ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেণ্ট জন দ্বীপের আবহাওয়াকে প্রায় নিখুঁত বলা চলে।

১০নং চিত্র

এখানকার গড় বার্ষিক তাপমাত্রা হচ্ছে ৭৮° ডিগ্রি ফারেনহাইট। গ্রীষ্ম ও শীতকালে কেবলমাত্র ছয় ডিগ্রির তারতম্য হয়ে থাকে।

১৪। ট্রেনিং-প্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তিরা রাস্তায় চলাফেরা করে থাকে

১১নং চিত্র

—একথা বোধহয় তোমরা অনেকেই জান। কুকুরের সাহায্যে রাস্তায় চলাফেরা অনেকটা নিরাপদ বলে বহু অন্ধ ব্যক্তি কুকুর রাখে। কিন্তু একটা কুকুর মারা গেলে

আবার নতুন কুকুর রাখা অনেকের পক্ষে নানাকারণে সম্ভব হয় না। সে জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাঃ মার্ক এল. মরিস গবেষণা করে একটি বিশেষ খাদ্য আবিষ্কার করেছেন, যা কুকুরকে খাওয়ালে তার জীবনকাল শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ বেশী হবার সম্ভাবনা। এই খাদ্য আবিষ্কারের ফলে একটা কুকুরের সাহায্যে অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধদের চলাফেরা করা সম্ভব হবে।

১৫। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর ফলে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেখানকার বরফের ভাঁজ এবং

১৫নং চিত্র

ছোট ছোট পাহাড় সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। এর ফলে তাঁরা আশা করেন—যে উপায়ে আল্পস্, হিমালয়, রকি এবং অন্যান্য পর্বতশ্রেণী গঠিত হয়েছে, সে সম্পর্কে নতুন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বিবিধ

ভারতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা

১৩ই জুলাই লণ্ডনে যে যুব বিজ্ঞান পক্ষের উদ্বোধন করা হয়, তাহাতে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং বৃটিশ বিজ্ঞান প্রসার সমিতির ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেক ভারত ও পাকিস্তানের বিজ্ঞান-চর্চা এবং ভৗষ্যতের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বৎসরের প্রথম ভাগে সার আলেকজাণ্ডার ডিউক অব এডিনবরার সহিত ভারত ও পাকিস্তান সফর করিয়া আসেন।

বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের পাঁচ শতাধিক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সার আলেকজাণ্ডার বলেন যে, এশিয়ার দেশগুলির জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাইতে হইলে প্রভূত পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে ভারতে বিপুল পরিমাণ মোনাজাইট বালুকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এত অধিক পরিমাণ মোনাজাইট বালুকা বিশ্বের অন্য কোন দেশে নাই। এই বালুকা হইতে পারমাণবিক জ্বালানী প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং ভারতে অন্যান্য শক্তি উৎপাদনের উপকরণ না থাকিলেও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উপকরণ যথেষ্টই আছে।

ভারতের শ্রমশিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বৃটিশ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সার আলেকজাণ্ডার বলেন যে, ১৯৪৮ সালের তুলনায় বর্তমানে ভারতে বৃটিশদের সংখ্যা অনেক বেশী। ভারতের শ্রমশিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বৃটেন কিরূপ সাহায্য করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে সার আলেকজাণ্ডার দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, সিন্দ্রির সার প্রস্তুতের কারখানা ও কলিকাতার নিকটবর্তী ভারতের প্রথম পলিথিন কারখানার কথা উল্লেখ করেন।

ভারত ও পাকিস্তানে বিজ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সার আলেকজাণ্ডার বলেন—ভারত ও পাকিস্তানে সর্বত্র শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহুসংখ্যক নূতন নূতন স্কুল স্থাপন করা হইতেছে। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

সার আলেকজাণ্ডার বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বাহির হইয়াছেন। ইহা কেবল বর্তমান যুগেরই ঘটনা নহে, ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বহুকাল পূর্বেই আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার কতকগুলি মূল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিশ্বে রেকর্ড পরিমাণ চাউল উৎপাদনের সম্ভাবনা

কমনওয়েলথ অর্থনীতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'চাউল ইস্তাহার' হইতে জানা যায়—১৯৫৮-'৫৯ সালে বিশ্বের (চীন বাদে) উৎপাদিত ধানের পরিমাণ আনুমানিক ১৩১,০০০,০০০ টন। কতিপয় দেশের অবস্থা অনুকূল না হইলেও এই রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয়।

আলোচ্য বৎসরে ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ৪০,৭০৭,০০০ টন—১৯৫৭-'৫৮ সালের ৩৬,৫০১,০০০ টন অপেক্ষা অনেক বেশী।

১৯৫৮-'৫৯ সালে সিংহলের উৎপাদনের পরিমাণ ৭৩৪,০০০ টন, পূর্ব বৎসরে ছিল ৬৭৬,০০০ টন।

কমনওয়েলথ অর্থনীতিক কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৫৯ সালের প্রথম তিন মাসে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ মোট প্রায় ১,০০০,০০০

টন—গত বৎসরের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম।

১৯৫৯-'৬০ সালে চীনে অতিরিক্ত ফসলের যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা ব্যাপক বন্যার ফলে নষ্ট হইয়া যায়। বর্মায় কাবো বাঁধের সংস্কার হওয়ায় আশা করা যায়, আরও প্রায় ৫০০,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার উৎপাদনের অবস্থাও আশানুরূপ।

ভারতে জিপ্‌সাম শিল্প

যুদ্ধের পূর্বে ভারতে জিপ্‌সাম সাধারণতঃ সিমেণ্ট ও প্লাষ্টার অব প্যারিস উৎপাদনেই ব্যবহৃত হইত বর্তমানে উহা অতি প্রয়োজনীয় কৃত্রিম সার অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের জন্য দরকার হয়। রাজস্থান ও মাদ্রাজেই নাকি সবচেয়ে বেশী জিপ্‌সাম সঞ্চিত আছে—তবে হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, কাশ্মীর ও রেওয়া প্রদেশেও কিছু কিছু জিপসাম পাওয়া যায়। ভারতে সব সমেত ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টন জিপ্‌সাম ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে বলিয়া সরকারী মহলের ধারণা।

ভারতে পঙ্গপালের উপদ্রবের আশঙ্কা

লণ্ডনের পঙ্গপাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত মরুপঙ্গপাল তথ্য সরবরাহ দপ্তরের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অগাষ্ট মাসে উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের মরু অঞ্চলে পঙ্গপালের ঝাঁক জন্মাইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, অগাষ্ট মাসে আলজিরিয়া ও মরক্কোতেও পঙ্গপালের ঝাঁক জন্মাইবার এবং সাহারার দক্ষিণাঞ্চলে পঙ্গপালের আক্রমণ ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরাঞ্চল হইতে নূতন নূতন ঝাঁক বাহির হইয়া সুদান, উত্তর ইথিওপিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আরব এবং সোমালি উপদ্বীপের উত্তরাংশে উপদ্রব চালাইতে পারে। ভারত এবং পাকিস্তানেও নূতন নূতন ঝাঁক আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গত মাসে কয়েকটি ঝাঁক পাকিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতে আসে এবং একটি ঝাঁক বিহারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুদান ও উত্তর ইথিওপিয়াতে কিছু পঙ্গপাল জন্মাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং ইয়েমেন ও এডেনে কিছু কিছু জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতেও কিছু কিছু পঙ্গপাল জন্মাইয়াছে।

ভারতে নাইলনের সূতা তৈয়ার

নিউইয়র্কস্থিত ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নাইলনের সূতা তৈয়ার করিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে নাইলনের কারখানা স্থাপিত হইবে, তাহাতে একটি মার্কিন সিণ্ডিকেট ১০ লক্ষাধিক ডলার লগ্নী করিবে।

কারখানাটি বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হইবে।

৩৬ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এই কারখানা নির্মিত হইবে।

চায়ের ভেষজ গুণ

জাপানী বিজ্ঞানী দাবী করিয়াছেন যে, চায়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান ট্যানিন—ষ্ট্রনসিয়ামের তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত বিজ্ঞানী দুইজন সিজুওকা ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ তেইজী উকাই এবং অধ্যাপক আইচি ওবায়াসি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কিছুদিনের মধ্যেই ওহিওর সিনসিনাটিতে মার্কিন ভেষজ সমিতির বার্ষিক সভায় তাঁহাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

তেজস্ক্রিয় বীজ দ্বারা মস্তিষ্কের টিউমার বিনাশ

লণ্ডনের একজন শল্য চিকিৎসক পাঁচটি তেজস্ক্রিয় ইট্রিয়াম বীজ (Yitrium Seeds) ৫০ বৎসরের এক মহিলার মস্তিষ্কের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। মহিলাটি মস্তিষ্কের টিউমারে ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার বাঁচিবার আশাও ছিল না। তিনি প্রায় অন্ধ অবস্থায় লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে অপারেশনের জন্য আসেন।

৫২ বৎসর বয়স্ক শল্য-চিকিৎসক জিওফ্রে বেটম্যান তাঁহার এই চিকিৎসা সম্পর্কে বলেন—আর কোন রোগী এই বিশেষ রোগের জন্য এই ভাবে চিকিৎসিত হইয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। তিনি বলেন, বীজগুলির তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসিয়া টিউমারের তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

এই ভাবে যাঁহার চিকিৎসা হয় তিনি হইলেন এসেক্সের অন্তর্গত ব্রেণ্টউডের মিসেস জেলি ডেগাইন। কি ভাবে তিনি ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া যাইতেছিলেন তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—চোখে দারুণ যন্ত্রণা হওয়ায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলিয়া যাইতে থাকায় আমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। চিকিৎসক আমাকে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেন। আমাকে অপারেশনের কথা বলা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া যাই; কারণ আমাকে বলা হয়, অপারেশন না করা হইলে আমি এই ভাবে আর মাত্র কয়েক মাস বাঁচিয়া থাকিতে পারি। চিকিৎসকেরা আমার নাসিকা-পথে একটি টিউব মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং পাঁচটি ইট্রিয়াম বীজ সেখানে স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে আমাকে এক মুহূর্তের জন্য আর চোখের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ সম্পর্কে গবেষণা

লণ্ডনে সদ্য প্রকাশিত মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ, যাহা অন্ধত্বের একটি কারণ—নিরাময় করা এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার উপায় সন্ধান করিতে সক্ষম হইবেন।

ডাঃ লেস্‌লি কোলিয়ার-এর অধীনে লণ্ডনের লিষ্টার ইনষ্টিটুটের এক দল ট্র্যাকোমা গবেষণা-কর্মী এই রোগের ভাইরাস পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার মেডিক্যাল সংবাদদাতা বলেন—এই গবেষণার ফলে ট্র্যাকোমা রোগ জয়ের সম্ভাবনা নিকটতর হইবে।

পৃথক ভাবে এই ভাইরাস সম্বন্ধে অনুশীলনের চেষ্টা ইতিপূর্বে বহু দেশে হইয়াছে; কিন্তু তাহা কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; এখন ডাঃ কোলিয়ার ও তাঁহার সহকর্মীগণের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিশেষভাবে অনুন্নত দেশগুলির ৪০০,০০০,০০০ লোক, যাহাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ সর্বাধিক, তাহারা যে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে লেবরেটরীসমূহে অ্যান্টিবায়োটিক্স ও অন্যান্য ভেষজের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এবং টীকা প্রস্তুত করিয়া রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইবে।

হৃদ্‌রোগীদের বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস

বৃটেনে হৃদ্‌রোগীদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য হাতঘড়ির আকারের একটি নূতন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রটিকে সেল্‌ফ ষ্টার্টার বলা হয়। এডিনবরায় বৃটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে তাহা সম্প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা নাইলন ও তারের একটি কয়েল বা কুণ্ডলী। চামড়ার মধ্যে এটিকে রাখা হয় এবং বুকের বাহিরে অবস্থিত আর একটি কুণ্ডলী হইতে বৈদ্যুতিক স্পন্দন উৎপাদন করা হয়। কুণ্ডলীতে

বৈদ্যুতিক শক্তি যোগায় একটি টর্চের ধরণের ব্যাটারী এবং যন্ত্রটি কাজ করে অনেকটা মোটর গাড়ীর ইণ্ডাকশন কয়েল বা তড়িৎ-প্রবর্তক কুণ্ডলীর মত।

হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে মৃদু বৈদ্যুতিক শক্ সঞ্চারিত করিয়া রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়। এই শক্ রোগী ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ইহার মূল্য কয়েক পাউণ্ড মাত্র।

যন্ত্রটির উদ্ভাবক হইলেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-চিকিৎসা বিভাগের ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ মিঃ রেনল্ড লাইটউড। মিঃ লাইটউড একটি ইলেকট্রনিক পেস-মেকারও উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ করিয়া অপারেশনের কাজ সহজ করিয়াছে।

মিঃ লাইটউড আশা করেন, সেল্‌ফ ষ্টার্টার লইয়া মানুষের শরীরে কাজ আরম্ভ করা শীঘ্রই সম্ভব হইবে। পশুদের দেহে ইহা সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে।

সৌর-চিকিৎসা

আল্‌মা-আতা—সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও জীব-বিজ্ঞানীরা কিছুকাল থেকে সূর্য-কিরণ রোগ-চিকিৎসার কাজে লাগাবার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। সূর্যকিরণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জানে। প্রাচীন ভারত, মিশর ও গ্রীসে সৌর-চিকিৎসা বা হিলিওথেরাপির বিশেষ চর্চা হয়েছিল। প্রাচীন কালের সেই সৌর-চিকিৎসা-পদ্ধতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কৌশলের দ্বারা বিশেষভাবে কার্যকরী করে তোলা যায় বলে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকেরা মনে করেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গবেষণার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন কার্যকরী সাফল্য অর্জন করবার উদ্দেশ্যে।

সম্প্রতি কাজাকস্তানের রাজধানী আল্‌মা-আতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির বুহমান এমন এক ধরণের সৌর-প্রতিফলক তৈরী করেছেন, যার দ্বারা সূর্যালোককে তার মূল বর্ণে বিশ্লিষ্ট করে যে কোন এক বা একাধিক বর্ণ-তরঙ্গ দেহের রোগাক্রান্ত স্থানের উপরে প্রয়োগ করে রোগ সারিয়ে তোলা যাবে।

যেমন—বাত, পেশীর বেদনা এবং হাঁপানি রোগে সূর্যের আলো যে খুব উপকার দেয়, সে কথা অনেকেই জানে। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, সূর্যালোকের অবলোহিত (ইন্‌ফ্রা-রেড) আর লাল বর্ণ-তরঙ্গ থেকেই এই উপকার পাওয়া যায়। আবার সূর্যালোকের অতিবেগুনী তরঙ্গ এই রোগের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং সূর্যালোকের অতিবেগুনী ও অন্যান্য বর্ণ-তরঙ্গকে বাদ দিয়ে শুধু লাল আর অবলোহিত তরঙ্গকে যদি বাতে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় হবে। ঠিক তেমনি, কয়েক ধরণের চর্মরোগ, আন্ত্রিক রোগ, গলনালীর রোগ এবং গর্ভবতী নারীদের কয়েক ধরণের রোগও সূর্যালোকের বিশেষ বিশেষ বর্ণ-তরঙ্গ ব্যবহার করে সারিয়ে তোলা যাবে এই 'বুহমান রিফ্লেক্টর'-এর সাহায্যে।

পরীক্ষামূলকভাবে এই 'বুহমান সৌর-প্রতিফলকের' কার্যকারিতা বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাপক হারে এই যন্ত্রটি উৎপাদন করবার এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি

রিগায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিকোলাই পারিইস্কি ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর দিনের গড়পড়তা সময়কাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির এই হার হলো—

প্রতি একশ' বছরে এক সেকেণ্ডর দু-হাজার ভাগের এক ভাগ।

এ-পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করে আসছিলেন যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের এই গতি কমে আসবার কারণ হলো সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পারিইস্কির গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ভূগর্ভের কঠিন পদার্থের স্থান পরিবর্তন আর ভারকেন্দ্রচ্যুতির ফলেই তার ঘূর্ণন-গতি অতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। ফলে, দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন গৃহে আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক রশ্মি সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, জাপান, ভারত, চীন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি সহ মোট ২৬টি দেশের মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। নিখিল-সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের কস্‌মিক-রে গবেষণা বিভাগের সভাপতি বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক দমিত্রি স্কোবেল্‌ৎসিন সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ বিজ্ঞানী সিসিল পাওয়েল এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্রুনো রোসি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া ভাষণ দেন।

অধ্যাপক স্কোবেল্‌ৎসিন বলেন—কস্‌মিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম গ্রহ ও উপগ্রহগুলি। মনুষ্য-নির্মিত এই গ্রহ-উপগ্রহগুলির অভ্যন্তরে রক্ষিত যন্ত্রপাতির মারফৎ কস্‌মিক-রে সম্পর্কে এমন বহু তথ্য জানা গিয়াছে, যেগুলি এ-পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। স্কোবেল্‌ৎসিন এইরূপ কতকগুলি মূল্যবান তথ্য উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, লেবরেটরিতে বসিয়া কস্‌মিক রশ্মি সম্পর্কে এবং অতি উচ্চ শক্তি সৃষ্টি করা সম্পর্কে তত্ত্বগত গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ও জাপানী বিজ্ঞানীরা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। পরমাণু-বিভাজনের ফলে অতি উচ্চ শক্তি সৃষ্টি হইবার সময়ে নিউ-ক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঠিক কি ভাবে চলে, তাহা জানিলে কস্‌মিক-রে উৎপত্তির কারণ আরও সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে প্রথম দিনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সভায় সোভিয়েট, মার্কিন, বৃটিশ, হাঙ্গেরীয় ও জাপানী প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে পরমাণু-বিভাজন ও অত্যুচ্চ শক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। এগুলির মধ্যে সোভিয়েট ও মার্কিন রিপোর্ট দুইটি সমবেত বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। সোভিয়েট রিপোর্টটিতে নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অত্যুচ্চ শক্তি মাপিবার গ্রিগারফ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয় এবং মার্কিন রিপোর্টটিতে শতকোটি ইলেকট্রনভোল্ট-এরও বেশী শক্তিতে নিউক্লিয়াস ও কস্‌মিক-রে'র পারস্পরিক ক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হয়।

মার্কিন, সোভিয়েট ও জাপানী বিজ্ঞানীদের তিনটি রিপোর্ট হইতেই দেখা যায় যে, এই তিনটি দেশের বিজ্ঞানীরা আলাদা আলাদা ভাবে গবেষণা চালাইয়া প্রোটনের জটিল গঠনের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

মাটির চুম্বক

মোটর-গাড়ী, মোটর-সাইকেল ইত্যাদির জেনা-রেটরের জন্যে প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ স্থায়ী চুম্বক

(পার্মানেন্ট ম্যাগ্নেট) দরকার হয়। পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণতঃ এই চুম্বক তৈরী করা হয় নিকেল আর কোবাল্টের সঙ্কর ধাতু থেকে।

সম্প্রতি মস্কোর ইনস্টিটিউট অব অটোমোবাইল ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট-এর কর্মীবৃন্দ নতুন এক ধরণের মাটির চুম্বক তৈরী করেছেন এবং এই চুম্বক মোটর-গাড়ী ইত্যাদির জেনারেটরের পক্ষে যেমন কার্যকরী হয়েছে তেমনি এর উৎপাদনের খরচও প্রায় দশ ভাগের চার ভাগ কমে গেছে।

এই মাটির চুম্বকের উপাদান আর চীনামাটির উপাদান অনেকাংশে এক। প্রয়োজনীয় অনুপাতে আয়রন-অক্সাইড আর বেরিয়াম-অক্সাইড মিশিয়ে সেই কাদার মত মিশ্রণকে ছাঁচে ঢালা হয়। তারপর বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পোড় খাইয়ে সেই ছাঁচকে খুব শক্ত করে তোলা হয় পোড়া-মাটির মতই। তৃতীয় পর্যায়ে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরে এগুলিকে খুব শক্তিশালী এক চুম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে রেখে দেওয়া হয়। এইভাবে সেগুলি হয়ে ওঠে নিখুঁত চুম্বক।

এই মাটির চুম্বক প্রচলিত নিকেল কোবাল্ট চুম্বকের চেয়ে ঢের বেশী দীর্ঘস্থায়ী ; কারণ এর ক্ষয়ের হার খুব কম। প্রধানতঃ সে জন্যেই মোটর-গাড়ী ইত্যাদির জেনারেটরের খরচ কমে গেছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

প্রথম কিস্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে এক লক্ষ মাটির চুম্বক উৎপাদন করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত

সম্প্রতি তাজিকিস্তানের বিজ্ঞান পরিষদের প্রত্নজীব-বিদ্যা ও প্রত্নভূ-বিদ্যা বিভাগের এক অভিযাত্রী দল তাজিকিস্তানের জেরাভশান নদী আর তার উপনদী ইয়াগ্নোব-এর সঙ্গম স্থলের কাছাকাছি এক ব-দ্বীপে চূর্ণশিলাবহুল জুরাসিক স্তরে কতকগুলি লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর শিলীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। এই প্রাণীগুলি ডাইনোসোর জাতীয়। এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অতিকায় ডানাওয়ালা পেঙ্গোলিন-এর একটি পায়ের নিম্নাংশের শিলীভূত কঙ্কাল। প্রত্নজীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—কারণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম এবং বিশ্বে মোট তৃতীয় বার এ ধরণের আবিষ্কার হলো। পেঙ্গোলিনের দেহাংশের শিলীভূত কঙ্কাল ইতিপূর্বে প্রায় একশ' বছর আগে প্রথম আবিষ্কৃত হয় দক্ষিণ আমেরিকায়। দ্বিতীয় বার অনুরূপ আবিষ্কার হয় ফ্রান্স-সুইজার-ল্যাণ্ডের সীমান্তে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার অল্প কিছুকাল আগে।

মহাব্যোমযানের প্রত্যাবর্তনের সমস্যা

মহাব্যোমযান বা স্পেস-শিপকে পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা বা রেসিস্ট্যান্স। প্রচণ্ড বেগে এই মহাব্যোমযান যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে, তখন এই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে এত বেশী তাপ সৃষ্টি হবে—যার ফলে মহাব্যোমযানটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই আমরা জ্বলন্ত উল্কাপাত হতে দেখি এবং কৃত্রিম উপগ্রহেরও জ্বলেপুড়ে যাবার কারণও একই।

মহাব্যোমযানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার পথে এই বাধাটিকে অতিক্রম করবার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁরা দ্রুত সাফল্যের পথেও অগ্রসর হচ্ছেন। সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে তাঁরা একটি নতুন সিদ্ধান্তে পৌছাবার পর সে সম্পর্কে লেবরেটরিতে পরীক্ষামূলক কাজে সাফল্য লাভ করেছেন।

মহাব্যোমযানটি যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন তার আকার আর গতি অনুযায়ী চারপাশের বাতাস সেই সংঘর্ষের দরুণ সাড়ে ছয়

হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। বাতাস সাধারণতঃ তড়িৎ-অপরিবাহী (নন-কণ্ডাকটর) হলেও এই অতি উচ্চ তাপে বেশ ভাল রকম তড়িৎ-পরিবাহী হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে যদি মহাব্যোমযানের সম্পূর্ণ খোলটিতে চুম্বকের গুণ আরোপ করা যায়—অর্থাৎ ম্যাগনেটাইজ করা যায়—তাহলে আপনা থেকেই মহাব্যোমযানটির গতি খুব তাড়াতাড়ি কমে আসবে। তাছাড়া মহাব্যোমযানটির চারদিক ঘিরে যে চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, তার ফলে সেই অংশটুকুর মধ্যে বায়ুপ্রবাহের হার মন্থর হয়ে আসবে এবং মহাব্যোমযানটিকে বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেবে না।

কাগজের হিসাবে এই সিদ্ধান্তে আসবার পর এটিকে লেবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহে টেলিভিশন ব্যবস্থা

প্রখ্যাত সোভিয়েট বিজ্ঞানী নিকোলাই ভার্ভারফ বিশ্ব-জোড়া এক টেলিভিশন পরিবেশন ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। তিনি যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক হিসাবের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে তিন কিলোমিটারের কিঞ্চিদধিক বেগসম্পন্ন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ৩৫ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছিলে উহা পৃথিবীর একই স্থানের উপর দিয়া ঘোরাফেরা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই রকম তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে মেরু অঞ্চলদ্বয় ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে নিয়মিতভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সূচী পরিবেশন করা যাইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের একই স্থান হইতে আট ঘণ্টা পর পর এই কৃত্রিম উপগ্রহ তিনটিকে মহাশূন্যে পাঠানো হইবে। এই মহাজাগতিক ষ্টেশনগুলি পৃথিবীর চতুর্দিকে চিরকাল ঘুরিতে থাকিবে। উহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে টেলিভিশন সূচীগুলি যথাযথ গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে রিলে বা পুনঃ-পরিবেশন করিবে। এই ব্যবস্থায় উহারা পৃথিবী হইতে পরিচালিত সিগ্ন্যাল পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিবে।

নিকোলাই ভার্ভারফ বলেন, এই রকম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা খুব কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহা যে সম্ভব, তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তৃতীয় সোভিয়েট স্পুটনিকের মহাকাশে উৎক্ষেপণ। এই তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে অনায়াসেই প্রয়োজনীয় টেলিভিশন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত।

হৃদ্‌রোগ নিরাময়ে জৈব-বিদ্যুৎ

প্রাণীদেহের জৈব ক্রিয়াকলাপ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির উদ্ভব হয়। ইহাকে বলা হয় জৈব-বিদ্যুৎ বা বায়োইলেকট্রিসিটি। মানুষের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও শিশ্নগ্রন্থিগুলিতে এই জৈব-বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জৈব-বৈদ্যুতিক তরঙ্গের তীব্রতা সাধারণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতই মাপা যায় এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-লেখযন্ত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির নানা রকমের ব্যাধির বিষয় জানা যায়।

সম্প্রতি মস্কোর শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত গবেষণা ভবনের একদল কর্মী এই জৈব বিদ্যুৎকে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগাইবার জন্য বায়োষ্টিম্যুলেটর নামক একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। জৈব-বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যাপৃত বিশিষ্ট সোভিয়েট শারীরতত্ত্ববিদ্ নিকোলাই জাবাদিয়ানের পরিচালনায় এই যন্ত্রটি নির্মিত হইয়াছে।

দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চালাইবার জন্য এই বায়োষ্টিম্যুলেটর ব্যবহৃত হইবে। এই যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি তারের প্রান্ত লাগানো থাকে দুর্বল হৃৎপিণ্ড রোগীর দেহে এবং অন্য একটি তারের প্রান্ত লাগানো থাকে একজন সুস্থ মানুষের দেহের সঙ্গে। সুস্থ ও সবল হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত জৈব-বিদ্যুতের ক্রিয়ায় রোগীর দুর্বল হৃৎপিণ্ডের কাজ ক্রমশঃ

নিয়মিত ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এজন্য সুস্থ মানুষটির শরীর কিছুমাত্র খারাপ হয় না। বায়ো-ষ্টিমুলেটর যন্ত্রটি সুস্থ দেহ হইতে রোগীর দেহে শুধু জৈব-বিদ্যুৎ চালনার কাজ করিয়া থাকে।

কোয়ান্টাম রশ্মির দ্বারা পরিচালিত ভবিষ্যতের মহাব্যোমযান

মহাব্যোমযানের পক্ষে সৌরমণ্ডলের বাহিরে চলিয়া যাওয়া শুধু তখনই সম্ভব হইবে যখন উহা আলোর গতি—অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইলের মত গতি অর্জন করিবে।

২৭শে জুন তারিখের "কমসোমোলস্কাইয়া প্রাভদা" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক গ্যাগি বাবাত লিখিয়াছেন—এই গতি মহাব্যোমযানটি অর্জন করিতে পারিবে যদি উহার "জেট" গ্যাস নিঃসরণ করিবার বদলে "কোয়ান্টাম" রশ্মি নিঃসরণ করে। এই কোয়ান্টাম রশ্মি হইল বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের মূল পদার্থকণিকা। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, এই ধরণের মহাব্যোমযানে ফটোন, অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোকের কোয়ান্টা বা ইলেকট্রন-শক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ—ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু তত্ত্বগত হিসাব হইতে দেখা গিয়াছে যে, বেতার-তরঙ্গের কোয়ান্টা ব্যবহার করাটাই অধিকতর উপযোগী হইবে।

অধ্যাপক বাবাত উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—সোভিয়েট বিজ্ঞানী কুরশাতফ ও তাঁহার অন্যান্য কয়েকজন সহযোগী দেখাইয়াছেন যে, তাপ-পারমাণবিক প্রতিক্রিয়াজনিত শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া যদি মহাব্যোমযান পরিচালনার কাজে লাগানো যায়, তাহা হইলে ঢের বেশী সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন কোয়ান্টাম মহাব্যোমযানের উপযোগী এক বিশেষ ধরণের রিয়্যাক্টর।

অধ্যাপক বাবাত তাঁহার এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ এই "কোয়ান্টাম স্পেস-শিপ রিয়্যাক্টর" সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভবিষ্যতে হাল্কা ওজনের এমন এক ক্ষুদ্রাকৃতি রিয়্যাক্টর তৈয়ার করা সম্ভব হইবে, যাহার দ্বারা এই মহা-ব্যোমযানকে চালাইবার মত উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটিবে। এই যন্ত্রটিকে হাল্কা ও ক্ষুদ্রাকৃতি করা একান্ত দরকার—বর্তমানে মৌলিক পদার্থকণিকার অ্যাক্সিলারেটর-গুলির ইলেকট্রোম্যাগ্নেটের ওজন ত্রিশ-চল্লিশ টন হইয়া থাকে। মহাশূন্যযানের পক্ষে ইহা নিতান্তই অনুপযোগী।

সেই সঙ্গে লেখক ইহাও দেখাইয়াছেন যে, এই ধরণের স্পেস-শিপ বা মহাব্যোমযানের যন্ত্রাংশগুলিকে পৃথিবীর উপরে বা উহার কাছাকাছি স্থানে জুড়িয়া দেওয়া চলিবে না এবং উহার ইঞ্জিনও চালান যাইবে না—কারণ, ইঞ্জিন-নিঃসৃত ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক তরঙ্গ-রশ্মির প্রচণ্ড শক্তি পুরা একটি মহাদেশের ভূখণ্ডকে ভস্মসাৎ করিয়া দিবে, সমুদ্রগুলি টগ্‌বগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে, আবহমণ্ডলের এক বিরাট অংশের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। সেই জন্য এই মহাব্যোমযানকে নির্মাণ ও চালু করিতে হইবে পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে—মহাকাশে স্থাপিত কোন অন্তর্বর্তী ষ্টেশনে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ | নবম সংখ্যা

পারমাণবিক শক্তি*

শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক

জড়জগৎ যে সব মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত তাদের মধ্যে প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো পরমাণু। পরমাণু এত ছোট যে, একটি জলের ফোঁটার আয়তনের $\frac{১}{১০^{১৮}}$ গুণ। পরমাণুর গঠন ক্ষুদ্রাকারে সৌরজগতেরই অনুরূপ। কেন্দ্রস্থলে একটি ভারী বস্তু রয়েছে, যার চারদিকে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রের বস্তু দু-রকমের কণিকার সাহায্যে গঠিত, তাদের বলা হয়—প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন একটি ধনাত্মক কণিকা, আর নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। কেন্দ্রের চারদিকে যে সব ক্ষুদ্র পদার্থ ঘুরে বেড়ায়, তাদের বলা হয় ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক কণিকা। কেন্দ্রে যতগুলি ধনাত্মক প্রোটন থাকে, কেন্দ্রের বহির্কক্ষে ততগুলি ঋণাত্মক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। কাজেই পরমাণুর বৈদ্যুতিক সমতা রক্ষিত হয়। কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যাই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, কিন্তু ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের চেয়ে প্রায় দু-হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রোটন ও নিউট্রনের গুরুত্বের অনুপাতে ইলেকট্রনের গুরুত্ব এত কম যে, কেন্দ্রস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের যোগফলই পরমাণুর মোট গুরুত্ব ধরা হয়। বিশ্বজগতের মূল উপাদান এই তিনটি অদৃশ্য কণিকা।

অবস্থা বিশেষে প্রোটন নিউট্রনে এবং নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হয়। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় প্রোটন, ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণিকা পজিট্রন মুক্ত করে নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। নিউট্রনও যথেষ্ট উত্তেজিত হলে একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণিকা মুক্ত করে প্রোটনে পরিবর্তিত হয়। রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম এবং থোরিয়াম থেকে ২৩৩ ভরের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ তৈরী হয়। এভাবে প্রোটন এবং নিউট্রনের এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে হলে প্রোটন ও নিউট্রনের আরও কতকগুলি গুণাবলী জানা দরকার। যদি দুটি হাল্কা পরমাণু একত্রিত করে অন্য এমন একটি পরমাণু তৈরী করা

হয়, যার ওজন পর্যায়সারণীর মধ্যস্থিত রূপার পরমাণুর চেয়ে ভারী নয়, তাহলে উৎপাদনকারী দুটি পরমাণুর মোট ওজনের চেয়ে সংযোজিত পরমাণুর ওজন খানিকটা কম হবে। যদিও সংযোজিত পরমাণুর মোট প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা, উৎপাদনকারী দুটি পরমাণুর মোট প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সমানই থাকবে, তথাপি কিন্তু পর্যায়-সারণীর দ্বিতীয়ার্ধের বেলায় রূপার চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু ভেঙে দিলে যে সব ক্ষুদ্রতর অংশ পাওয়া যাবে, তাদের মোট ওজন অবিভক্ত পরমাণুর চেয়ে কম হবে। ভর কম হওয়া মানেই বস্তু ক্ষয় হয়ে শক্তিরূপে প্রকাশ পাওয়া। কাজেই পারমাণবিক শক্তি পেতে হলে প্রথম ক্ষেত্রে মৌলিক পদার্থের সংযোজন বা ফিউসন দ্বারা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর বিভাজন বা ফিসন দ্বারাই সম্ভব হবে। উভয় ক্ষেত্রেই খানিকটা বস্তু পরিবর্তিত হয়ে শক্তিরূপে মুক্ত হবে।

পরমাণুর ভিতরের অধিকাংশ স্থানই শূন্য; কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজগতের অধিকাংশ বস্তুই পরমাণুর কেন্দ্রে ঘনীভূত হয়ে আছে। প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রে ঘনীভূত অবস্থায় আছে, পারমাণবিক শক্তিই প্রোটন ও নিউট্রনকে পরমাণুর কেন্দ্রে আবদ্ধ করে রাখে। কেন্দ্রের প্রত্যেকটি প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে; কাজেই প্রত্যেকটিই পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু এই বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে পারমাণবিক শক্তি কোটি কোটি গুণ বলশালী। এই শক্তিই বস্তুজগৎকে একত্রিত করে রাখে। পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু এত ঘনীভূত হওয়ার জন্যে এই শক্তিই দায়ী।

এই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। কারণ, যে সব দেশ এই শক্তির স্বরূপ আবিষ্কার করেছে, তারা এ-সম্পর্কে সব তথ্য গোপন রেখেছে, কিন্তু ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন পদার্থ ও শক্তির সম্বন্ধযুক্ত যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করেন, সে সূত্র অনুসারে এই শক্তির পরিমাণ হিসাব করে ঠিক করা যায়। এই বিধান অনুসারে শক্তি ও পদার্থ দুটি বিভিন্ন সত্তা নয়, পরন্তু একই মহাজাগতিক সত্তা—দুটি ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয় মাত্র। এই বিপ্লবাত্মক মতবাদ অনুসারে প্রমাণিত হলো যে, পদার্থ অপরিবর্তনীয় নয়, পরন্তু ঘনীভূত শক্তি। অপর পক্ষে, শক্তি হলো প্রবহমান পদার্থ। এ নিয়ম দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে কোন পদার্থের সম্পূর্ণ এক গ্র্যাম বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আড়াই কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তির সমান হবে। আইনষ্টাইনের মতবাদ অনুসারে শক্তি রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক কিংবা পারমাণবিক—যে কোন রূপেই প্রকাশিত হোক না কেন, অনুরূপ বস্তু ক্ষয় হবে। পারমাণবিক শক্তি মুক্ত হলে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করবে এবং তার হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে আট ভাগ ক্ষয় হবে। কাজেই পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু রূপান্তরিত হয়ে যে পারমাণবিক শক্তি নির্গত হয়, তা কয়লার রাসায়নিক শক্তির অনুপাতে ত্রিশ লক্ষ থেকে দু-কোটি চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশী।

নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। কাজেই ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রবেশ করে আঘাত করতে সে কোন বাধা পায় না। নিউট্রন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না, সকল বস্তুর পরমাণুর কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে; কাজেই বিভাজন-ক্রিয়া আরম্ভ করতে হলে পূর্বে আহরিত একটি নিউট্রনকে বিভাজনক্ষম মৌলিক পদার্থের মধ্যে চালিত করলে প্রথমতঃ একটি পরমাণু খণ্ডিত হয়ে দুটি নিউট্রনের উদ্ভব হবে। ঐ দুটি নিউট্রন আরও দুটি পরমাণুকে আঘাত করলে চারটি নিউট্রন উৎপন্ন হবে, যারা আরও চারটি পরমাণুকে আঘাত করলে আটটি নিউট্রন মুক্ত হবে। এই ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া শৃঙ্খলার সঙ্গে বেড়ে গিয়ে এত দ্রুত বহুগুণ তীব্র হয়ে যাবে যে, মুহূর্তের মধ্যেই কোটি কোটি নিউট্রন মুক্ত হয়ে কোটি কোটি পরমাণুকে

বিভক্ত করবে। এ সব পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু ক্ষয় হয়ে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হবে। নিয়ন্ত্রিত প্রথায় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ইউ-রেনিয়ামে শতকরা ৯৯.৩ ভাগ ইউ-২৩৮ এবং .৭ ভাগ ইউ-২৩৫ থাকে। ইউ-২৩৫ থেকে উদ্ভূত নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রে চালিত করে বিভাজন-ক্ষম মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। বিভাজন-ক্রিয়াকে অনিয়ন্ত্রিত রাখলে কয়েক মুহূর্তেই প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। পারমাণবিক বোমায় বিশুদ্ধ ইউ-২৩৫ কিংবা প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। বিভাজন ক্রিয়া চালাতে হলে মৌলিক পদার্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের কম হলে চলে না। প্রক্রিয়া স্বরু করবার আগে পদার্থের এরূপ দুটি টুক্‌রা নিতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পরিমাণের কম হয়, কিন্তু একত্রে পরিমাণের সমান বা বেশী হয়। যখন বিস্ফোরণ ঘটানো দরকার তখন এরূপ দুটি টুক্‌রাকে অতিবেগে একত্রিত করলেই বিভাজন-ক্রিয়া স্বরু হবে এবং চলতে থাকবে। এখন লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রক্রিয়া স্বরু হওয়ার আগে টুক্‌রা দুটির পরিমাণ পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম রাখতে হবে; কাজেই পারমাণবিক বোমার আয়তন ইচ্ছানুরূপ বড় করা চলবে না। পৃথিবীতে হাল্‌কা হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্তু একত্রিত করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ, ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রবস্তু—যথাক্রমে ডয়টেরন ও ট্রাইটনকে একত্রিত করে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ১৯৩২ সালে হাই-ড্রোজেনের দুই ভরের আইসোটোপ, ডয়টেরিয়াম আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারেন যে, এর পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু ডয়টেরনে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। একে পাঁচ কোটি সেন্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করতে পারলে এর বিস্ফোরণ হবে ও প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবে। তরলীকৃত ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়ামকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করলে (পারস্পরিক অনুপাত এখনও অপ্রকাশিত) মিশ্রণটি সবচেয়ে বেশী বিস্ফোরক হবে; অর্থাৎ ঐ মিশ্রণটি ডয়টেরিয়াম কিংবা ট্রাইটিয়ামের চেয়েও দ্রুততর প্রজ্জ্বলিত হবে এবং এই মিশ্রণ থেকে কেবল মাত্র ডয়টেরিয়াম কিংবা ট্রাইটিয়ামের চেয়ে যথাক্রমে সাড়ে তিন কিংবা দ্বিগুণ বেশী শক্তি উদ্ভূত হবে। ডয়-টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়ামের অনেকটা অংশ যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে কোন জায়গায় সংযোজন স্বরু হলে ডয়টেরন কিংবা ট্রাইটন থেকে শক্তি মুক্ত হয়ে অবশিষ্ট অংশে বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করবে। ডয়টেরন কিংবা ট্রাইটনের সংযোজন করে প্রোটনের চেয়ে বেশী শক্তি নির্গত হয়। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হলে যে উচ্চ তাপ নির্গত হয়, তাতেই হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু এই তাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; কাজেই এই ক্ষণস্থায়ী অত্যুগ্র তাপে প্রজ্জ্বলিত হয় এরূপ দ্রব্যই ব্যবহার করতে হবে। ডয়টেরিয়াম এত অল্প সময়ে প্রজ্জ্বলিত হবে না। ট্রাইটিয়াম প্রস্তুত করতে প্রচুর অর্থব্যয়ের দরকার; কাজেই এরূপ দ্রব্য ব্যবহারেরও সীমা আছে। তাছাড়া পূর্বোক্ত ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাই-টিয়ামের মিশ্রণটি এদের প্রত্যেকের চেয়ে অধিকতর দহনশীল ও শক্তিশালী। কাজেই পারমাণবিক বোমার তাপে এরূপ পরিমিত আকারের একটি মিশ্র পদার্থকে বিস্ফোরিত করলে সবচেয়ে কম সময়ে পারমাণবিক বোমার চেয়েও অধিকতর শক্তি নির্গত হবে; তৎপর এই শক্তি দ্বারা হাইড্রোজেন বোমার মূল উপাদান ডয়টেরিয়ামের বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হবে। হাইড্রোজেন বোমাকে ইচ্ছানুরূপ বড় করবার কোন বাধা নেই, যদি আবশ্যকীয় উপাদান যোগাড় করা যায়। কিন্তু যথেষ্ট উপাদান থাকলেও পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রে এরূপ করা সম্ভব নয়।

অর্ধ শতাব্দী আগেও কেউ ভাবে নি যে,

পরমাণুর কেন্দ্রে এত শক্তি নিহিত রয়েছে। যাবতীয় পরমাণুর কেন্দ্রই এক একটি বিপুল শক্তির ভাণ্ডার। আমরা দেখেছি যে, সংযোজন এবং বিভাজন প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত খুব কম অংশই শক্তিরূপে ব্যয়িত হয়—শতকরা ৯৯·৩ ভাগ থেকে ৯৯·৯ ভাগ বস্তুই অবিকৃত থাকে। এখনও এমন কোন প্রক্রিয়া জানা নেই, যাতে সবটা বস্তুই পরিবর্তিত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এরূপ সম্ভব হলে মানুষ বিপুল শক্তির অধিকারী হবে। তারপর এ-সম্বন্ধে জ্ঞান হলেও ১৯৩৯ সালের পূর্বে কেউ অনুমান করে নি যে, এই শক্তিকে কাজে লাগানো যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই শক্তিকে দু-রকম কাজে লাগিয়েছেন। একদিকে তাঁরা যেমন এই শক্তির সাহায্যে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার মত মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন, অপরদিকে তেমনি আবার তাকে মানব-কল্যাণেও লাগিয়েছেন।

আজকাল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে চিকিৎসামূলক গবেষণা ও এ. ই. সি.-র কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে রোগ-নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের কতকগুলি কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ও আয়োডিনের ব্যবহার সুরু হয়। আজকাল তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহের সক্রিয়তা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, ফস্‌ফরাস জীব-দেহের এক অপরিহার্য উপাদান, জীবদেহের অভ্যন্তরে, এমন কি—দাঁত, হাড় ইত্যাদি কতকগুলি কঠিন জিনিষের মধ্যেও প্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় ফস্‌-ফরাসের সঙ্গে সাধারণ ফস্‌ফরাসের বিনিময় এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই উপায়ে সাফল্যের সঙ্গে লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসা চলছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনসমন্বিত জৈব যৌগিক পদার্থ, যেমন—ডাই-আয়োডো-ফ্লুরেসিন এবং তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস, মস্তিষ্কের টিউমার নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এতে অস্ত্র-চিকিৎসা অনেক উঁচু পর্যায়ে উঠে গেছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অতিরিক্ত সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ ও থাইরয়েড ক্যান্সার নিবারণের কাজে লাগছে। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে পারমাণবিক শক্তিকে ক্যান্সার রোগ নির্ধারণ ও তার প্রতিবিধানের কাজে লাগানো হচ্ছে। ক্যান্সার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকারীদের তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্যে এবং রেডিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকার অনুকরণে একটা 'হট্ লেবরেটরী' নির্মিত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় ফস্‌-ফরাসের অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে পলিসাইথেমিয়া ভেরা নামক রোগে এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট শক্তিশালী গামা-রশ্মি বিকিরণ করে বলে ক্যান্সারের চিকিৎসায় এর উপকারিতা অতুলনীয়। এই গামা-রশ্মির উৎসটি মস্তিষ্কের টিউমার এবং ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার এবং আরও অনেক দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগেও ব্যবহৃত হচ্ছে। কোবাল্ট সুচগুলি রেডিয়াম সুচের চেয়ে কম দামী বলে ক্যান্সার রোগ স্থিরীকরণে অস্ত্র-চিকিৎসকদের বিশেষ সাহায্য করছে। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে তেজস্ক্রিয় গোল্ডেরও ব্যবহার চলছে এবং দেখা গেছে যে, ওভারীর পুরাতন ক্যান্সারে এটা বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসায় সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়াম, গেলিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। ডিজিটেলিস নামক ওষুধে তেজস্ক্রিয় কার্বন প্রয়োগ করা হয়। এই ওষুধটি হৃদ্‌রোগ উপশমে ও বিভিন্ন রোগ নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে নানা-রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গূঢ় তথ্যও উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। হয়তো ভবিষ্যতে একদিন এর সাহায্যে গাছের ক্লোরোফিল তৈরীর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে

একটি বৃহত্তর সমস্যার সমাধানও হতে পারে! গাছ কিভাবে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়, এ-থেকে তাও জানা সম্ভব হতে পারে। ব্রুকহাভেন জাতীয় পরীক্ষাগারে নিউ-ক্লিয়ার রিয়্যাক্টর এখন চিকিৎসা-যন্ত্রের কাজ করছে। এই যন্ত্রে নিউট্রন উৎপাদিত হয় এবং এর সাহায্যে ইচ্ছামত ক্যান্সার রোগ-বিরোধী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করা যায়। এই রকমের চিকিৎসা পদ্ধতিকে 'নিউট্রন ক্যাপচার থিরাপী' নাম দেওয়া হয়েছে। এই নামকরণের কারণ এই যে, রোগীকে যে প্রাথমিক পদার্থ ওষুধরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়, সেটা নিউট্রন রিয়্যাক্টর থেকে মন্দগতি নিউট্রন ধরে নিতে পারে। সাধারণতঃ বোরন প্রাথমিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেটা নিউট্রন আঁকড়ে ধরে তেজস্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ আল্‌ফা-রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। এই বিকিরিত আল্‌ফা-রশ্মি লোহিত কণিকার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত যেতে পারে বলে রোগীর টিউমারের জায়গায় যদি প্রাথমিক পদার্থকে প্রবেশ করানো হয় তাহলে নিউট্রনের সংস্পর্শে এসে সেটা দ্রুতগতিতে তেজো-রশ্মি বিকিরণ করবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক শক্তিই দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার একমাত্র প্রতিরোধক। তেজস্ক্রিয় স্ট্রন্‌সিয়াম কয়েক রকমের জয়েণ্ট কারসিনোমায় ব্যবহৃত হচ্ছে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে উদ্ভূত পদার্থগুলি আমাদের নানারকম রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে 'খাদ্য-সংরক্ষণ' অন্যতম। জানা গেছে, যে সব জীবাণু ফলমূল নষ্ট করে, সেগুলি পার-মাণবিক রশ্মির সংস্পর্শে এলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমেরিকায় গবেষণা চলছে যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত গামা-রশ্মি দিয়ে খাদ্যসামগ্রীকে গরম অবস্থায় বেশ কিছুদিন রাখা যায় কিনা। ব্রুক-হাভেন জাতীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, শীতলীকরণ ছাড়াই আলু ইত্যাদি মৃদ্বাসী খাদ্যসামগ্রীকে গামা-রশ্মি বিকিরণ-কারী পদার্থের সামনে কিছুকাল রেখে দেবার পর প্রায় দু-বছর টাট্‌কা অবস্থায় রাখা যায়। সেখানে বিকিরিত এই রশ্মি প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই গামা-রশ্মি বিকিরণকারী তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এ. ই. সি.-র দ্বারা প্রেরিত হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকায় এ, ই. সি. র আরগোন জাতীয় পরীক্ষাগারে থুলিয়ামের সাহায্যে কার্যকরী একটি ভ্রাম্যমান এক্স-রে ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎশক্তির কোন উৎস না রেখেই ১০০,০০০ ভোল্ট এক্স রে'র সমতুল্য রশ্মি উৎপাদন করা যায়। বিশেষতঃ পল্লীঅঞ্চলে অথবা যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, যন্ত্রটি সেখানে রোগীর ফটো নেবার কাজে সাহায্য করছে। বিভিন্ন রোগ নির্ধারণের কাজেও যন্ত্রটি বেশ কার্যকরী।

শ্রম-শিল্পেও পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু কোন ধাতু অথবা যৌগিক পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত ভগ্নস্থানের নির্দেশ দেয়। পরমাণুগুলি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে আলোক-রশ্মির পরিবর্তে পরমাণু থেকে উদ্ভূত তেজোরশ্মি প্রয়োগে ফিল্মের উপর ছবি তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে রেডিওগ্রাফি। পরমাণু থেকে বিকিরিত তেজোরশ্মি ধাতু ভেদ করে ফিল্মের উপর ছবি ফেলে এবং এক্স-রে ফটোতে যেভাবে স্থানচ্যুত অথবা ভগ্ন অস্থি নির্ধারিত হয়, ঠিক সেভাবেই ধাতু অথবা যৌগিক পদার্থের ভগ্ন স্থান এই ছবিতে প্রকাশ পায়। নিউইয়র্কে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নিকটস্থ কার্বোরানডাম তৈরীর কারখানায় অ্যাটমিক থিক্‌নেস গজ নামক যন্ত্রটি বিভিন্ন ঘাতসহ (অ্যাব্রে-সিভ) পদার্থের ঘনত্ব ও ভগ্নস্থান নির্ধারণ করে। এই গজের মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রন্‌সিয়াম থেকে বিটা-রশ্মি নির্গত হয়। পরীক্ষাকালীন ঘাতসহ পদার্থটি গজের উপর এমনভাবে রাখা হয়, যাতে

গজে সংরক্ষিত ষ্ট্রন্সিয়াম পদার্থটার ঠিক নীচে থাকে। উপরে তেজোরশ্মি নির্ধারণসূচক একটা যন্ত্র রাখা হয়। বিকিরিত রশ্মির তারতম্য অনুসারে উপরিউক্ত পদার্থের ভর বা ঘনত্ব নির্ধারিত হয়। এরূপ পারমাণবিক গজের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার আগে কারখানায় ঘাতসহ পদার্থগুলি তৈরী বন্ধ করা হতো এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রব্যগুলির ওজন নিয়ে দেখা হতো যে, ঈপ্সিত ঘনত্বপূর্ণ হয়েছে কিনা। আজকাল তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে তৈরী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বিভিন্ন শিল্প-উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা চলছে। তৈল-শিল্পে পারমাণবিক দ্রব্য ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে এবং ইঞ্জিনের কার্যকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। এই উপায়ে পেট্রোলিয়াম জাতীয় তরল পদার্থে শতকরা কত ভাগ হাইড্রোজেন হচ্ছে তা খুব কম সময়েই নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া কয়লা ও তেল থেকে কি উপায়ে সহজে গ্যাসোলিন তৈরী করা যায় তাও দেখবার চেষ্টা চলছে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে টায়ারের কার্যকাল এবং টায়ার তৈরীর নতুন কৌশল জানবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া নলের মধ্যস্থিত তরল পদার্থের গতি, রাসায়নিক অনুঘটকগুলির পুনঃপ্রাপ্তির বিধান এবং খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের কাজে পারমাণবিক তেজোরশ্মির কার্যকারিতা শিল্পজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক-শক্তি-চালিত একপ্রকার বিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে বাসগৃহের তাপমাত্রা বজায় রাখা ও কলকারখানা চালু রাখবার জন্যে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তা তেল বা গ্যাসের সাহায্যে যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায় তার ২৫ গুণ বেশী। মেরুপ্রদেশে বা মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে কয়লা ও তেলের অভাব, সেখানে এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি পারমাণবিক শক্তি-চালিত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানায় যে পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে, তার সাহায্যে ৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। রাশিয়ায় পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে নদীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মরুভূমিকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া পারমাণবিক শক্তি-চালিত একটি ১০,০০০ টনের জাহাজ তৈরী করেছে। আমেরিকা পারমাণবিক শক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ নটিলাসের সাহায্যে দুর্ভেদ্য মেরু-প্রদেশ ঘুরে এসেছে। পারমাণবিক শক্তি-চালিত সোভিয়েট রাশিয়ার স্পুট্‌নিক চন্দ্রলোক পার হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দশ বছরের মধ্যে চন্দ্রলোক বিজয় করা সম্ভব হবে। পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করবার পর পরিত্যক্ত ষ্ট্রন্সিয়াম ৯০-এর সাহায্যে পারমাণবিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিবর্তিত করে এক নতুন পারমাণবিক ব্যাটারী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ষ্ট্রন্সিয়াম ৯০-থেকে বিটা-রশ্মি নির্গত হয় বলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, এই ধরণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্রে ব্যবহার করবার পক্ষে বেশ উপযোগী হবে।

আমাদের দেশে এখনও পারমাণবিক শক্তির বহুল প্রচলন সুরু হয় নি। ভারতে ত্রিবাঙ্কুরের সন্নিকটস্থ সমুদ্রসৈকত মোনাজাইট, থোরিয়ামের একটি উৎস। ভারত সরকার থোরিয়াম জাতীয় বিরল ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে রেয়ার আর্থ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছেন। সেখানে ব্যাপকভাবে থোরিয়াম নিষ্কাশিত হচ্ছে। ঐ ধাতব থোরিয়ামকে তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামে পরিণত করবার জন্যে ভারত সরকার ট্রম্বে নামক স্থানে পারমাণবিক শক্তি গবেষণাগার স্থাপন করেছে। আশা করা যায় যে, ভারতও একদিন এই পারমাণবিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

উত্তাপে প্রাণক্রিয়া

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট বেলা থেকেই আমরা জানি, আগুনের তাপ লাগলে গায়ে ফোস্‌কা হয়। আবার বড় হয়ে জানতে পারি, শুধু আগুনেই নয় ঠাণ্ডাতেও ফোস্‌কা পড়ে। বরফের মত জমানো এক টুক্‌রা কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড—যাকে শুক্‌নো বরফ বলা হয়—যদি কয়েক সেকেণ্ড জোরে চেপে ধরা যায়, তাহলে হাতে আগুনে পোড়ার মত ফোস্‌কা হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যায়, মানুষের উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবনধারণের জন্যে উত্তাপ প্রয়োজন এবং তার গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮° (ফা)। তাহলেও তার হাতকে যদি ১৪০° (ফা) উত্তাপ-বিশিষ্ট জলে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী ডুবিয়ে রাখা যায়, তাহলে সহ্য হবে না। গরম জল বা গরম পানীয় খেলেও ঐ একই অবস্থা। পানীয়ের উত্তাপ যদি ১৩৬° (ফা)-এর বেশী হয়, তাহলে অনেকেরই তা সহ্য হবে না, হেঁচ্‌কি উঠতে থাকবে। এ-থেকে মনে হয়, মানুষের দেহ একটা থার্মোমিটার বিশেষ, যার স্পর্শ-সহিষ্ণুতা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠা-নামা করে এবং তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে দুর্গতি ও ক্লেশের আর অন্ত থাকে না।

এ কথা ঠিক, অধিকাংশ প্রাণী এবং উদ্ভিদকে যদি ১০৬° জলের সংস্পর্শে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখা যায় তাহলে মৃত্যু ঘটে। রক্তের উত্তাপ যদি ঠিক ঐ পরিমাপে বেড়ে উঠতে থাকে, তাহলে মানুষও মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। সেই জন্যে জ্বরের উত্তাপ খুব বেড়ে উঠলে চিকিৎসকেরা রোগীকে স্নান করানো ও তার মাথায় বরফ চাপানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। নিম্নস্তরের অনেক প্রাণী আছে, যারা কিন্তু এ-রকম বিপজ্জনক উত্তাপেও বেঁচে থাকে।

সহনশীলতার তারতম্য

প্রকৃতির রাজ্যে ঠাণ্ডা বা উষ্ণতার দিক দিয়ে অদ্ভুত সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মেরু অঞ্চলের কড্‌ মাছ ০° ডিগ্রির নীচেও বেশ সক্রিয় থাকে। কয়েক প্রকার জীবাণু ০° ডিগ্রির (ফা) ৩০০° ডিগ্রি নীচেও মাসের পর মাস বেঁচে থাকে। স্তন্যপায়ী জীবের কতকগুলিকে (যেমন সাদা ইঁদুর) যদি ৩৭° (ফা) ঠাণ্ডার মধ্যে রাখা হয়, তাহলে তাদের হৃদ্‌স্পন্দন এবং রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তাহলেও আবার তাকে বাঁচানো যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্বন্ধে বলেন, ঠাণ্ডার চেতনা-নাশক একটা ক্ষমতা আছে। সে জন্যে এই ঠাণ্ডার প্রভাবে ইঁদুরের সর্বাঙ্গীন চেতনা সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে যায়। ঠাণ্ডার এই চেতনা-নাশক ক্ষমতার কথা বহু কাল ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় এই অসাড়কারী গুণের ব্যবহার চলে আসছে। শোনা যায়, নেপোলিয়নের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক লারে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বরফ জমানো ঠাণ্ডার সাহায্যে এক দিনে দু'শো লোকের অস্ত্রোপচার করেছিলেন।

আবার উত্তাপ যখন বেড়ে যায়, জীব-জগতের প্রাণক্রিয়া স্বভাবতঃই তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রাণীমাত্রেই উত্তাপের অসহনীয় প্রভাবে কাতর হয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা সাংঘাতিক পর্যায়ে এলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সবচেয়ে বেশী উত্তাপ সহন-শীলতাও কোন কোন প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; সেগুলিকে অবশ্য ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে;

যেমন—সিংহলের বার্বাস থার্মেলিস নামে এক প্রকারের মাছ। তারা সেখানকার উষ্ণ কুণ্ডের (১২২° ফা) উত্তাপেও বেঁচে থাকে। কয়েক জাতীয় জীবাণুকে ১৫৮° বা তারও উর্ধ্বে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। অবশ্য এ সব সত্য হলেও একে প্রকৃতির খেয়াল বলা চলে।

উত্তাপ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা

অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদকে ঝলসানো উত্তাপেও বেঁচে থাকতে দেখা যায়। যেমন—উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশের মরুভূমির ভয়ঙ্কর উত্তাপে একপ্রকার ব্যাং (Horned toad) বেঁচে থাকে। সূর্য অস্ত গেলেও সেখানকার উত্তাপ ১০০°-র নীচে নামে না। এই ব্যাং উত্তাপ ভালবাসে এবং ১০২° উত্তাপেও বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। ৮০° উত্তাপে মানুষ যখন কপালের ঘাম মুছতে থাকে, এই ব্যাঙের কাছে তখন সেই উত্তাপ ঠাণ্ডা, তার ক্রিয়াশীলতা তখন কমে যায়। তথাপি ১০৬°, কি ১০৭° উত্তাপ তাদের কাছেও মারাত্মক। দিনের ঝলসানো উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বালির নীচে গর্ত খুঁড়ে আশ্রয় নেয়। সূর্য অস্ত গেলে বালির উত্তাপ যখন খানিকটা কমে আসে তখন আবার তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে পোকা-মাকড় ধরে খেতে থাকে। মরুভূমির দেশের প্রাণীরা এই রকম গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে।

পাখী ও স্তন্যপায়ীদেরও উত্তাপ সহ্য করবার কৌশল নজরে পড়ে। উত্তাপের আধিক্যে দেহের রক্তকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্র থেকে যখন নির্দেশ আসে, তখন সেই অনুসারে ভিতরকার পেশীসমূহকে তারা কিছুটা সঙ্কুচিত করে ফেলে। পাখীরা তাদের পালক ফেলে দেয় এবং স্তন্যপায়ীরা তাদের গায়ের লোম একটু খাড়া করে তোলে, যাতে আরও খানিকটা বাতাস চামড়ার সংস্পর্শে আট্‌কে থেকে উত্তাপ প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদও উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকে। উত্তাপে গাছপালার পাতা ঝরে পড়ে এবং উপরের কাণ্ডের অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে। মাটির নীচে শিকড়ের মধ্যে যেখানে রোদের দুঃসহ জ্বালা প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে সে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করে। গাছপালার এরূপে আত্মরক্ষা, প্রাণীদের মাটির নীচে গর্তের ভিতরে ঢুকে প্রাণরক্ষা করারই সামিল। দিনের দুঃসহ উত্তাপকে রাতের অপেক্ষা-কৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিকিরিত করে দিয়ে আবার তারা নিজেকে সহ্যের সীমার মধ্যে নিয়ে আসে। উত্তাপে ক্যাক্‌টাস জাতীয় উদ্ভিদের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায় এবং সমস্ত রস গাছের গুঁড়ির ভিতরে জল-নিরোধক ছালের নীচে সংহত হয়।

শরীরকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে স্তন্যপায়ী জীবকে জলীয় অংশের খানিকটা বাষ্পীভূত করবার ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হয়। জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-কোষ থেকে এত উত্তাপ বেরিয়ে যায়, যাতে দেহের উষ্ণতা প্রায় ১০° কমে যায়। আমাদের দেহও উত্তপ্ত হলে ঘামের সাহায্যে জলীয় বাষ্প বের করে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়। আমাদের ও অন্যান্য প্রাণীদের দেহ-চর্মে প্রচুর ঘর্ম-গ্রন্থি আছে, যার ভিতর দিয়ে রক্তের জলীয় অংশ নির্গত হতে পারে। কোন কোন প্রাণী, যেমন—কুকুর, দেহের তাপ কমাবার জন্যে লালাসিক্ত জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। অনেক প্রাণী ঘামের ভিতর দিয়ে উত্তাপ বের করে দেয়। বিড়ালের ঘর্ম-গ্রন্থি আছে তার পায়ের থাবায়। ঘোড়ার ঘর্ম-গ্রন্থি তার সর্বশরীরে দেখা যায়। মরুভূমির উট তীব্র উত্তাপকে তার দেহের পাত্‌লা চামড়ার ভিতর দিয়ে বিকিরণ করে দেয়। তার শরীরের চর্বি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে না থেকে পিঠের উপরকার কুঁজের ভিতরেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাই উত্তাপকে প্রতিরোধ করে।

ঘাম বের করে দিয়ে উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা আবার সব প্রাণীর এক রকম নয়। মানুষ

গ্রীষ্মের ১২০° (ফা) উত্তাপে বেঁচে থাকবে, কিন্তু একটা ইঁদুর বত্রিশ মিনিটের মধ্যে এবং একটা গিনিপিগ এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই উত্তাপে মারা যাবে।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষের উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা বোধ হয় অনেক বেশী। মানুষের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হলো মস্তিষ্কে। সেটিকে হাইপোথ্যালেমাস বলা হয় এবং তা কানের সীমানায় অবস্থিত। যখনই উত্তাপের মাত্রা বেড়ে গিয়ে শরীরে অস্বস্তি বোধ হয়, তখনই হাইপো-থ্যালেমাস থেকে স্নায়ু-যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেহের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ভিতরকার রক্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে গিয়ে তখনই তা বহিরঙ্গে চামড়ার ভিতরকার ধমনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং প্রসারিত ধমনীর গাত্র থেকে রক্তের উত্তাপ বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে রক্তের প্রবাহকে ঠাণ্ডা করে। গরম যদি আরও বেশী হয় এবং এই ব্যবস্থায় না কুলায় তখন হাইপোথ্যালেমাস দেহের ঘর্ম-গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় হবার জন্যে আহ্বান জানায়। গ্রন্থিগুলি রক্তের প্রবাহ থেকে জলীয় অংশ আকর্ষণ করে নিয়ে ঘর্মের আকারে চামড়ার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বের করে দেয়। ঘর্মের সঙ্গে প্রচুর লবণ ও দেহের অবাঞ্ছিত অনেক জিনিষও বেরিয়ে যায়। ঘর্ম বাইরের আবহাওয়ায় বাষ্পীভূত হতে থাকলে রক্তের উত্তাপ তাড়াতাড়ি নেমে যেতে থাকে।

আর্দ্র উষ্ণতা

দেহের ঘর্ম নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত চমৎকার যে, ঝল্‌সানো উত্তাপ সহ্য করতেও মানুষের তত ক্লেশ বোধ হয় না। অবশ্য এরূপ সম্ভব হয়, যদি বাইরের আবহাওয়া শুষ্ক অবস্থায় থাকে। কিন্তু অসুবিধা হয় সেখানে, যেখানে বাইরের আবহাওয়া থাকে আর্দ্র। আমাদের বাংলা দেশ এই রকম আবহাওয়ার সঙ্গেই বেশী পরিচিত। এই রকম আর্দ্র আবহাওয়াকেই আমরা ভাপ্‌সা গরম বলি। এই অবস্থায় বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে না। সে জন্যে গায়ের চামড়া ও রক্ত ঠাণ্ডা হতে পারে না; ফলে দেহে উত্তাপ বেড়ে যায়। সে জন্যে চড়া উত্তাপ না থাকলেও উত্তাপের আক্রমণ বা হিট-স্ট্রোক লাগবার সম্ভাবনা এই আর্দ্র আবহাওয়াতেই থাকে খুব বেশী। অবশ্য যাকে আমরা চলতি কথায় সর্দিগর্মি বা সানস্ট্রোক বলি তা থেকে এ স্বতন্ত্র। তার সম্ভাবনা বেশী থাকে প্রখর রোদে ঘুরে বেড়ালে।

এই সম্বন্ধে কৌতূহলজনক কয়েকটি ঘটনা বৈজ্ঞানিকেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিগত যুদ্ধের সময় একদল সৈন্য যখন কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলাভূমি অতিক্রম করছিল, তখন উত্তাপে অভিভূত হয়ে তারা একের পর এক মূর্ছিত হয়ে পড়লো। যদিও আবহাওয়ার উত্তাপ এমন বেশী কিছু ছিল না, তথাপি এই অবসন্নতা ঘটবার কারণ হয়েছিল অগভীর উষ্ণ জলের ভিতর দিয়ে চলবার জন্যে। এই সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিকেরা আরও পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি ইঁদুরের দেহকে আরামপ্রদ উত্তাপ, অর্থাৎ ৬৮°-৭০° ডিগ্রিতে রেখে শুধু তার হাঁটু পর্যন্ত পাগুলিকে ১১৩° ডিগ্রি উত্তাপবিশিষ্ট জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। তার ফলে দেখা গেল, ইঁদুরটি তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। গিনিপিগের বেলায় এরূপ পরীক্ষায় দেখা গেছে, তার দেহ ও পায়ের সন্ধিস্থল (মানুষের কটিদেশের সমতুল্য) পর্যন্ত ডুবিয়ে না রাখলে মৃত্যু ঘটে না। এই মৃত্যু হলো উত্তাপের দরুণ দেহের ভিতরে কোন বিষাক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার ফলে, গায়ের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার দরুণ নয়। যে জলের মধ্যে তাদের নিম্নাঙ্গ ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল, তার উষ্ণতা এমন কিছু বেশী ছিল না যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। হামেশাই লোকে ১০৭°

ডিগ্রী কিংবা তারও বেশী উত্তাপে অবগাহন করে থাকে ; কিন্তু তাতে কেউ মরে না।

বস্তুতঃ কোন প্রাণীর জীবন্ত দেহ-কোষ আঘাতের ফলে, অক্সিজেনের অভাবে কিংবা অত্যধিক উষ্ণতার দরুণ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা থেকে এমন একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ (টক্সিন) সৃষ্টি হতে পারে যা রক্ত-চলাচলের সঙ্গে দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। এই বিষাক্ত পদার্থের স্বরূপ এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি বটে, তবে এরূপ অনুমান করা হয়েছে যে, বিষক্রিয়ার উৎপত্তি স্থল হলো পেশী-কোষ। দেহ থেকে অত্যধিক ঘর্ম নির্গমনের সঙ্গে শরীরের লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে অবসাদ-জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, উপরের বর্ণিত অবস্থা কিন্তু তা থেকে পৃথক। অত্যধিক গ্রীষ্মে দেহের লবণের অভাবে যে অবসন্নতা ঘটে তা সামান্য লবণ মিশ্রিত জল পান করলেই কেটে যেতে পারে। সে জন্যে গ্রীষ্মের সময়ে অতিরিক্ত ঘর্মে লবণ-জল পান করা বিধি। কিন্তু উত্তাপজনিত উক্ত প্রকার অবসাদ-জনিত মৃত্যুর প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি।

জীবাণুসমূহ সাধারণ উচ্চস্তরের প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী উত্তাপ-সহনশীল। বায়ুর চাপ বেশী না দিলে সাধারণ ফুটন্ত জলে তাদের মৃত্যু ঘটানো যায় না। বাষ্প চালনা করে পাত্র থেকে বাতাস সরিয়ে দিয়ে যদি চাপ দ্বিগুণিত, অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৩০ পাউণ্ড করা যায়, তা হলে উত্তাপ ২৫০° ডিগ্রিতে উঠে পড়ে। এই অবস্থায় জীবাণু বা কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না, ১৫ মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। উত্তাপ ২৫০° ডিগ্রিতে উঠেছে বলে যে তারা মারা যায়, তা নয়; কারণ বাতাস যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তাহলে জীবাণু ৩২০° ডিগ্রিতেও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় ২৫০° ডিগ্রিতেই তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কারণ আবহাওয়া বাষ্পকণা-সিক্ত থাকে বলে জীবাণুগুলি তাদের কোষের জলীয় অংশ বের করে দিতে পারে না।

দেহের চর্বির গলনাঙ্ক ও উত্তাপ সহনশীলতা

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, যখন জ্বরের উত্তাপ ১০২° হয়, তখন আমাদের দেহের উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তনের গতি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যায়। আবার যখন উত্তাপ স্বাভাবিকের নীচে ৯৬° ডিগ্রিতে নেমে যায়, তখন সেই ক্রিয়া ২০ ভাগ কমে যায়। আমাদের এই গরম দেশে দেহ-কোষের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে কিরূপ ভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার জন্যে প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্‌গণ চেষ্টা করছেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্যের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

তাঁরা দেখিয়েছেন—যে উত্তাপে প্রাণী মৃত্যু বরণ করে, তার সঙ্গে দেহের চর্বির গলনাঙ্কের একটা সম্বন্ধ আছে। শীতপ্রধান দেশের প্রাণীদের চর্বির গলনাঙ্ক উষ্ণ প্রধান দেশের প্রাণীদের চর্বির গলনাঙ্কের চেয়ে কম। ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী, যেমন—মাছ ৭০°-৮০° ডিগ্রী উত্তাপেই মরে যায়; কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবেরা ১০০° ডিগ্রির বেশী উত্তাপেও বেঁচে থাকে। কড্‌লিভার অয়েল যে উত্তাপে তরল থাকে, সেই উত্তাপে স্তন্যপায়ী জীবদের চর্বি শক্ত অবস্থায় থাকে। আবার যে প্রাণী যে দেশে যখন বাস করে, সেই দেশের উত্তাপের অনুপাতে তার চর্বির গলনাঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ডেনমার্কের দু-জন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কতকগুলি শূকর-ছানা নিয়ে এ-বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা কয়েকটি শূকরছানাকে গরম কাপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখেন, আর কতকগুলি অনাবৃত দেহে থাকে। কিছু দিন পরে গরম কাপড়ে ঢাকা শূকরছানার চর্বি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তার গলনাঙ্ক নগ্ন শূকরছানার চর্বির তুলনায় বেশী হয়েছে। এ ব্যাপার শুধু যে প্রাণী

জগতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, উদ্ভিদ-জগতেও তা দেখা যায়। যে সব গাছপালা উত্তর অক্ষরেখার সীমানায় জন্মে, তাদের চর্বির গলনাঙ্ক দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত গাছপালার চর্বির গলনাঙ্কের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিসির তেল যে সাধারণ উত্তাপে তরল থাকে, নারিকেল তেল সেই উত্তাপে জমাট বেঁধে যায়।

উপরের তথ্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, দেহের চর্বির গলনাঙ্কের উপর উত্তাপ সহ্য করবার শক্তি নির্ভরশীল এবং কোন দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাণীদেহের চর্বির গলনাঙ্কের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং দেহের চর্বির গলনাঙ্ককে যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তবে উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতাও তদনুপাতে বেড়ে যাবে। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করে চর্বির গলনাঙ্ক বাড়ানো যায় কিনা, সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করে দেখেছেন। শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহাভ্যন্তরে অধিকতর গলনাঙ্কবিশিষ্ট চর্বিতে পরিণত হয়ে থাকে—এটা তাঁদের পরীক্ষিত সত্য। ক্যানাডার দু-জন বৈজ্ঞানিক—লুই পল ডুগাল এবং মার্সিডিস থেরিয়েন দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরকে শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশী করে খাওয়ানোর ফলে তাদের উত্তাপ-সহনশীলতা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর উত্তাপের সময়ে মিছরি বা চিনির সরবৎ, আখের রস প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করবার বিধি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। এই বিধির মূলে যে বৈজ্ঞানিক সমর্থন রয়েছে, উল্লিখিত তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যাপারটি অতি জটিল। দেহের ভিতরে বিভিন্ন জাতীয় কোষ আছে এবং তাদের উত্তাপ সহনশীলতারও তারতম্য আছে। তাছাড়া প্রাণক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় কোষের পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান। সে জন্যে দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা সূত্র উদ্ভাবন করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। তথাপি আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা একদিন বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষকে আরামে ও স্বচ্ছন্দে বাঁচবার ও চলবার পথ দেখাতে পারবেন এবং সেদিন মনুষ্য-সমাজের একটা প্রকৃত কল্যাণের পথ আবিষ্কৃত হবে।
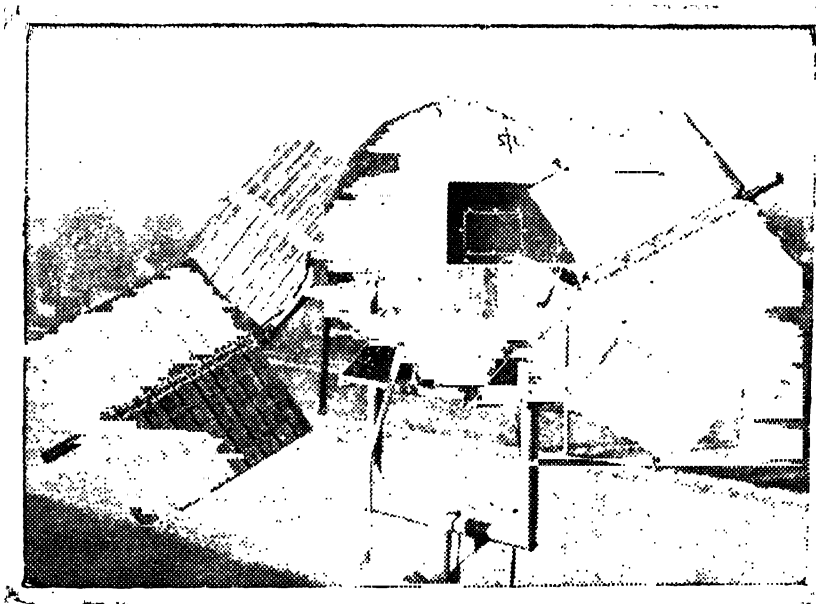
প্যাডেল হুইল নামক এক্সপ্লোরার-৬ কৃত্রিম উপগ্রহ।

ডিম্বাকৃতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে সৌরশক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৮০০০ সৌর-কোষ সমন্বিত পতাকার মত ৪টি প্যাডেল দেখা যাচ্ছে।

ক্যালকুলাসের গল্প

শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জি

ক্যালকুলাসের গল্প বলতে হলে আগে গোটা কয়েক কথা বলে নিতে হবে। প্রথম হলো—কোন চিহ্নকে চলরাশি বা variable বলা হয় যখন সেই চিহ্নটি একাধিক মান (numerical value) প্রকাশ করে। যেমন মনে করুন, আপনার বয়স। এখন বয়স কত? আপনি বলবেন ২৫ বছর। কিন্তু আপনার উত্তর কি ঠিক? প্রকৃত পক্ষে আপনার বয়স তো প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং বয়সকে চলরাশি বা variable বলতে পারি। গণিতে এরূপ রাশিকে সাধারণতঃ বর্ণমালার শেষের দিকের অক্ষরগুলি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তাহলে আপনার বয়স বলতে পারি x বছর; x কিন্তু প্রত্যেক সেকেণ্ডে বাড়ছে।

কতকগুলি রাশি বাড়ে-কমে না। তাদের বলা হয় অচল-রাশি বা স্থির-রাশি (constants) এবং বর্ণমালার প্রথম দিকের অক্ষরগুলি দিয়ে এগুলিকে প্রকাশ করা হয়। যেমন কোন পদার্থের ভার (mass) বা আপনার টেবিলের আয়তন—এরা সব স্থির-রাশি এবং এদের a, b ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—কান টানলেই মাথা আসে। ক্যালকুলাসে ঐ রকম ব্যাপার হামেশাই ঘটে। ব্যাপারটা তাহলে শুনুন।

মনে করুন, x একটা চলরাশি (অর্থাৎ যেন কান) আর y আর একটা চলরাশি (ঠিক যেন মাথা)। এখন এমন কোন উপায় যদি থাকে, যাতে x-এর মান (numerical value) জানা থাকলেই y-এর মান বের করতে পারেন; অর্থাৎ কানটা পেলেই মাথাটা টেনে আনতে পারেন। তাহলে x আর y এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সম্বন্ধ আছে—যেমন কান আর মাথার মধ্যে থাকে। তখন y-কে বলা হবে x-এর ফাংশন।

আজকালকার গণিতজ্ঞেরা ফাংশনের পরিভাষা এমন ভাবে দেন না; তাঁরা আরও অনেক মার্জিত ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা যা বলেন, সেটা শোনাতে হলে আগে সেট্ (set) আর সমরূপ সেটের (similar sets) কথা বলা দরকার।

একই রকম গুণবিশিষ্ট বস্তু সমষ্টিকে সেট্ বলে। যেমন, একটা ক্লাশের ছাত্রেরা সেট্ তৈরী করতে পারে, আবার কোন লাইব্রেরীর বইগুলিও একটা সেট্ তৈরী করতে পারে। সেটের বস্তুগুলিকে সেটের element বা মূল বলা হয়।

এখন মনে করুন, A আর B দুটা সেট্। A-এর প্রত্যেকটি মূলের জন্যে B-তে যদি একটি জুড়ী মূল পাওয়া যায় এবং B-এর প্রত্যেকটি মূলের জন্যে যদি A-তে একটি জুড়ী মূল থাকে, তবে A আর B-কে বলা হবে সমরূপ সেট্।

একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন একটি সিনেমা হলে শো হচ্ছে। এখন দর্শকেরা একটা সেট্ তৈরী করেছেন এবং তাঁরা যে টিকিট কিনেছেন, সেগুলিও একটা সেট্ তৈরী করেছে। এই দুটি সেট্ সমরূপ। কেন না প্রত্যেকটি দর্শকেরই একটি জুড়ী টিকিট, টিকিটের সেটে পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেকটি টিকিটেরই একজন জুড়ী দর্শক মিলবে। ইংরেজীতে একে বলা হয় One to one correspondence

আধুনিক গণিতে এই correspondence দিয়েই ফাংশনের পরিভাষা দেওয়া হয়। মনে করুন—x একটি চলরাশি। x-এর বিভিন্ন মানগুলিও একটি সেট্ তৈরী করবে। y যদি অন্য একটি

চলরাশি হয়, y-এর বিভিন্ন মানসমূহ আরও একটি সেট্ তৈরী করবে। যদি এই দুই সেটের মূলের মধ্যে one to one correspondence থাকে, অর্থাৎ ঐ দুটি সেট্ যদি সমরূপ হয়, তখন y-কে বলা হবে x-এর ফাংশন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করুন, x ১, ২, ৩,……ইত্যাদি মান গ্রহণ করছে। আর y ১², ২², ৩²……ইত্যাদি মান গ্রহণ করছে। তখন x-সেট্ আর y-সেট্ সমরূপ হবে। কেন না x-এর যে কোন মানের জুড়ী একটি মান (x-এর মানের বর্গ) y-সেটে পাওয়া যাবেই। সুতরাং y, x-এর ফাংশন। x আর y-এর সম্বন্ধ—

$$y = x^2$$

এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। x-এর মান জানতে পারলেই y-এর মান চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারেন; অর্থাৎ কানটাকে চিনতে পারলেই মাথাটাকে টেনে আনতে পারেন।

আরও একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন, এক বিরাট কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের একটি করে নম্বর আছে। থাকবার জন্যে প্রত্যেককে একটি করে বাড়ী দেওয়া হয়েছে। কারখানার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়ীর নম্বর তার নিজের নম্বরের সঙ্গে সাত যোগ করলেই পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা আবার দুই সেট্ নম্বর পাব। একটা শ্রমিকদের নম্বরের সেট্, আর একটা বাড়ীর নম্বরের সেট্—এই দুই সেট্। এই দুই সেট্ হবে সমরূপ। শ্রমিকদের নম্বরের সেট্কে মনে করুন x-সেট্ আর বাড়ীর নম্বরের সেট্কে মনে করুন y-সেট্। তখন x আর y-এর সম্বন্ধ

$$y = x + 7 \qquad (১)$$

এর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখন যে শ্রমিকের নম্বর ৫২, তার বাড়ীর নম্বর নিশ্চয়ই ৫২ + ৭ = ৫৯।

এবার (১) নম্বর সমীকরণটাকে ভাল করে দেখুন। আচ্ছা বলুন তো, কোন্ চলরাশি এখানে স্বাধীন? x, না y? কোন শ্রমিক তো প্রমোশনও পেতে পারে, তখন তার নম্বর বদ্‌লে যাবে অর্থাৎ x বদ্‌লাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ী বদ্‌লে অন্য বাড়ীতে যেতে হবে। কিন্তু কারখানায় তার উল্টোটা হবার সম্ভাবনা নেই। কেন না কেউ ইচ্ছামত বাড়ী বদ্‌লে নিজের নম্বর বদ্‌লে নিতে পারবে না। কারখানার নিয়ম অনুসারে নম্বর আগে না বদ্‌লালে কেউ বাড়ী বদ্‌লাতে পারবে না। কাজেই x স্বাধীন চলরাশি (independent variable) এবং y পরাধীন চলরাশি (dependent variable)।

যে কোন ফাংশনের বেলায়ই এ নিয়ম খাটবে। ফাংশনের দুটা চলরাশির মধ্যে একটা স্বাধীন, আর অন্যটা পরাধীন হয়।

বেশ, এবারে আমি একটা প্রশ্ন করি; উত্তর ঠিক করুন দেখি! ট্রেনের ভাড়া কি আপনার বয়সের একটা ফাংশন?

এখানেও দেখুন দুটা সেট্। একটা বয়সের সেট্ আর অন্যটা ভাড়ার সেট্। ১০০ জন সাবালক যদি একই স্থানের টিকেট কেনেন, ভাড়া সকলেই সমান দেবেন। ভাড়ার সেটে ঐ ১০০ জনের প্রত্যেকেরই একটা করে জুড়ী থাকবেই। ভাড়ার সেট্ আর যাত্রীদের বয়সের সেটের element-গুলির মধ্যে একটা One to one correspondence আছে। সুতরাং আপনার ট্রেনের ভাড়া আপনার বয়সের একটা ফাংশন।

এবার অন্য একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করা যাক—

মনে করুন, এক নগরে নিয়ম আছে যে, স্বামী ও স্ত্রী একই বাড়ীতে বাস করতে পারবেন না। দুজনে দুটি পৃথক বাড়ীতে থাকেন। স্বামীর বাড়ীর নম্বর যদি x হয়, আর স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর যদি y হয়, তাহলে মনে করুন x আর y-এর সম্বন্ধ—

$$y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \qquad (২)$$

এর দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব।

এও একটা ফাংশন। স্বামীর বাড়ীর নম্বর জানলেই স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর বের করতে পারবেন। মনে করুন, স্বামীর বাড়ীর নম্বর ৫, কাজেই স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর হবে—

$$y = \frac{৫^2 - ১}{৫ - ১} = \frac{২৫ - ১}{৫ - ১} = \frac{২৪}{৪} = ৬$$

আপনি হিসেব করে দেখতে পারেন যে, স্বামী যদি ৩২ নম্বর বাড়ীতে থাকেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী থাকেন ৩৩ নম্বর বাড়ীতে।

কিন্তু (২) নম্বর সমীকরণের আসল মজাটা কোথায় জানেন? আসল মজাটা হচ্ছে ১ নম্বরের স্বামীর বেলায়। সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর বাড়ীর ঠিকানা (বা নম্বর) কি?

$$y = \frac{১^2 - ১}{১ - ১} = \frac{১ - ১}{১ - ১} = \frac{০}{০}$$

শূন্য দিয়ে কোন সংখ্যাকে ভাগ দেওয়া যায় না। সেজন্যে $\frac{০}{০}$-এর কোন অর্থ নেই।

আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, বাঃ এক নম্বরের স্বামী তো খুব চতুর লোক (সত্যি সত্যিই এক নম্বরের লোক?)। নিজের স্ত্রীর ঠিকানা লুকিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু পার পাওয়া কি এতই সোজা? ভদ্রলোকের প্রতিবেশীদের সাহায্যে খুঁজে বের করতে হবে তাঁর স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর।

কি বললেন? পাশের বাড়ীতে দু নম্বরের স্বামী থাকেন? কিন্তু একথা তো আপনাকে কেউ বলে নি যে, একের পরে দুই হবে। এক আর দুই এর মধ্যে অনন্ত সংখ্যা আছে। বাড়ীর নম্বর তো সেই সব সংখ্যাও হতে পারে! সুতরাং মনে করুন, এক নম্বরের স্বামীর পাশের বাড়ীতে যিনি থাকেন তাঁর বাড়ীর নম্বর ১+h। h কিন্তু খুবই ছোট সংখ্যা।

আমরা আগে ১+h-এর স্ত্রীর নম্বরটা বের করবো। তার পরে h-টাকে তাড়াতে পারলেই এক নম্বরের স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর পাব। এখন ১+h-এর স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর—

$$y = 2 + h^*$$

এবারে h-টার হাত থেকে কোন প্রকারে মুক্তি পেতে হবে। তার সহজ উপায় হলো (যা গণিতে করা হয়) h-কে শূন্য মনে করা। তখন

$$y = 2 \text{ এবং } x = 1$$

সুতরাং ১ নম্বরের স্বামীর স্ত্রী থাকেন ২ নম্বরের বাড়ীতে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের সাহায্যে কারুর সম্বন্ধে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করি, সে সব সম্পূর্ণ সত্য না-ও হতে পারে। সুতরাং আমরা এক নম্বরের প্রতিবেশী ১+h-এর সাহায্য নিয়ে যে এক নম্বরের স্ত্রীর ঠিকানা সংগ্রহ করলাম, সেটা হয়তো প্রায় ঠিক। কিন্তু সেটা প্রকৃত নয়। সে জন্যে এ রকম অবস্থায় ক্যালকুলাসে y-এর মান ২, যখন x=1 না বলে, বলা হয় যখন x−1-এর চরম মান (absolute value) অত্যন্ত কম (শূন্যের কাছাকাছি) তখন y-এর Limiting value (সীমান্ত মান) দুই।

---

* $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, যখন $x = 1 + h$, তখন

$$y = \frac{(1+h)^2 - 1}{1 + h - 1} = \frac{\cancel{1} + 2h + h^2 - \cancel{1}}{\cancel{1} + h - \cancel{1}} = \frac{\cancel{h}(2+h)}{\cancel{h}}$$

$= 2 + h$; অর্থাৎ $y = 2 + h$, যখন $x = 1 + h$.

তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসী

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

পৃথিবীতে কত বিচিত্র দেশ, কত বিচিত্র তার অধিবাসী, আর কত বিচিত্র তাদের জীবনধারা! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্যে বহু ভূ-পর্যটক ও বিজ্ঞানী দুরারোহ পর্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর মরুভূমি, চিরতুষারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে মরণ পণ করেছেন। তাঁদের ব্যর্থ ও সফল সাধনা তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে আজ মানুষকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী করেছে। হয়তো এখনও আরও অনেক কিছু জানবার বাকী আছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত যা কিছু আমরা জেনেছি, তার গুরুত্বও কম নয়। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর অতি দুর্গম চির-তুষারাবৃত মেরু সন্নিহিত তুন্দ্রা অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

প্রাকৃতিক বিভাগে পৃথিবীর মেরু অঞ্চল দু-ভাগে বিভক্ত—(১) তুষারাবৃত অঞ্চল এবং (২) তুন্দ্রা অঞ্চল।

তুষারাবৃত অঞ্চল চিরকাল তুষারমণ্ডিত থাকে। এর মধ্যে পড়ছে আমেরিকার উত্তরে ক্যানাডার উত্তর দিকের অধিকাংশ দ্বীপ, গ্রীনল্যাণ্ড এবং দক্ষিণে সমগ্র কুমেরু মহাদেশ। এই অঞ্চলে পুঞ্জীভূত তুষারের চাপে নীচের তুষার ঘনীভূত হয়ে কঠিন বরফে পরিণত হয়। প্রবল চাপের ফলে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ প্রধান ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর দিয়ে শীতোষ্ণ মণ্ডলের দিকে ভেসে আসে। এদের বলা হয় হিমশৈল। এই অঞ্চলে শীত হচ্ছে, একটানা ছয়মাস স্থায়ী দীর্ঘ রাত্রি এবং তথাকথিত গ্রীষ্ম হচ্ছে, এই রকম ছয় মাস দীর্ঘ একটা দিন। কিন্তু তখন সূর্য থেকে এত কম উত্তাপ পাওয়া যায় যে, শীত-গ্রীষ্মের বাস্তব ভেদটা প্রায়ই অনুভূত হয় না।

এখানকার জীবজন্তুর মধ্যে প্রধান হলো শ্বেত মেরু-ভল্লুক, পেঙ্গুইন, স্কুয়াগাল, পেট্রেল প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখী এবং জলচর তিমি, সীল এবং কয়েক রকমের মাছ ও কাঁকড়া। মানুষের পক্ষে এখানে অত্যল্প কালও বেঁচে থাকা একরকম অসম্ভব। সমগ্র কুমেরু মহাদেশে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সুমেরু অঞ্চলের সর্বদক্ষিণ সীমার গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে কিছু এস্কিমো বাস করে। তারা ভল্লুক, সীল এবং মাছ শিকার করে অতিকষ্টে কোন রকমে বেঁচে থাকে। গ্রীষ্মে যখন জমাট উত্তর মহাসাগরের জল গলতে আরম্ভ করে, তখন ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে তিমি শিকারীদের বহু জাহাজ গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে আসে।

উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলের এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর। এস্কিমোরাই পৃথিবীর সর্বোত্তর অঞ্চলের অধিবাসী। প্রচণ্ড শীত সহ্য করবার ক্ষমতা নিয়ে এরা জন্মায়, এই ক্ষমতা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নেই। এরা সুনিপুণ শিকারী। এদের নৌকার নাম কায়াক। মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু শিকারের জন্যে এরা হারপুন নামক ক্ষেপণাস্ত্র ও তীরধনুক ব্যবহার করে। এসব তৈরী হয় জন্তুর হাড় দিয়ে। হারপুনের সঙ্গে শক্ত চামড়ার দড়ি বাঁধা থাকে এবং দড়িটা থাকে নৌকায় শিকারীর হাতে। এস্কিমোদের হারপুন কচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অব্যর্থ লক্ষ্যে এরা তিমি বা সীলের দেহে হারপুন গেঁথে দেয়। তারপর নৌকা নিয়ে জন্তুটাকে খেলিয়ে

খেলিয়ে বহু পরিশ্রমের পর ডাঙ্গায় টেনে নিয়ে আসে। তখন এদের মধ্যে পড়ে যায় মহোৎসব। সবাই মিলে জন্তুটার মাংস কেটে ঘরে নিয়ে যায়।

এদের পোষাক তৈরী হয় পাখীর চামড়া, পালক এবং ফার, অর্থাৎ ঘন লোমওয়ালা পশুর চামড়ায়। তিমি, সীল প্রভৃতির চর্বি এরা খাদ্য এবং জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে, তাছাড়া আলোও জ্বালায়। গ্রীষ্মে এস্কিমোরা যাযাবর জীবন যাপন করে এবং চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। শীতকালে এরা বরফ দিয়ে একরকম গম্বুজাকৃতির ছোট ছোট ঘর তৈরী করে—যাকে বলা হয় ইগ্‌লু। এ-রকম ঘরই তখন তাদের তুষার-পাত ও তুষার-ঝটিকা থেকে রক্ষা করে। শীতের পূর্বেই এস্কিমোরা শীতের জন্যে খাবার ও জ্বালানী সংগ্রহ করে রাখে। এ-দেশে প্রথমে বল্‌গা হরিণ ছিল না, কিন্তু বর্তমানে বল্‌গা হরিণ যথেষ্ট দেখা যায়। বল্‌গা হরিণ আনা হয়েছে দক্ষিণের তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে। বল্‌গা হরিণ এস্কিমোদের জীবনযাত্রার মান খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

তুন্দ্রা অঞ্চল—তুন্দ্রা শব্দের অর্থ অনুর্বর স্থান। ৬৫° উঃ অক্ষাংশ থেকে আরম্ভ করে উত্তরে উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্গত। এর অধিকাংশ স্থান সুমেরু বৃত্তের অন্তর্গত। আমেরিকা মহাদেশে ক্যানাডার উত্তর ভাগের কিয়দংশ, আলাস্কার উত্তর ও পশ্চিমাংশ এবং ইউরেশিয়ার উত্তরে আইসল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের উত্তরভাগ নিয়ে গঠিত ল্যাপল্যাণ্ড প্রদেশ এবং সাইবেরিয়ার অধিকাংশ নিয়ে তুন্দ্রা অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলটি বাস্তবিকই একটা বিস্তৃত শীতল মরুভূমি। এটা আবার নিম্ন সমভূমি অঞ্চল। এখানে শীতকালে প্রায় আট মাস ধরে তুষার জমতে থাকে এবং বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় না। নীচের জমি কঠিন জমাট বরফ, যা কোন কালেই গলে না। তবে এর উপরিভাগের বরফ স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মে সামান্য গলে যায় এবং তাতে একটা জলাভূমির সৃষ্টি করে। তারই মধ্যে অল্প কিছু দিনের জন্যে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য বিকশিত করে তোলে। তখন মস, লাইকেন, ছোট ছোট লতাগুল্ম ও একরকম বেরীফলের ঝোপ গজিয়ে ওঠে। স্থানে স্থানে নানা জাতের বিচিত্র রঙীন ফুলের সমারোহ লেগে যায় এবং শীতের সেই অনুর্বর পরিত্যক্ত মরুভূমি প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করতে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য খুব বেশী, কোন কোন স্থানে ২২/২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সূর্য উদিত থাকে। এজন্যে এই স্থানকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলে। নরওয়ের সর্বোত্তর সীমায় অবস্থিত হ্যামার-ফেষ্ট সহর থেকে এই নিশীথ সূর্যের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে প্রতি বছর দলে দলে নরনারী সেখানে উপস্থিত হয়। শুধু মানুষই নয়, এই সময়ে এই অঞ্চলে দলে দলে পশুও উপস্থিত হয় শ্যাওলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদের লোভে। এদের মধ্যে বহু পশুর গায়ে থাকে দামী ফার। তাদের চামড়ার লোভে দলে দলে যাযাবর শিকারী বেরিয়ে পড়ে; ফার সংগ্রহই তাদের প্রধান উপ-জীবিকা।

বিখ্যাত আমেরিকান ভূ-পর্যটক এবং আবিষ্কারক ষ্টিফেনসন লিখেছেন, উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চল গ্রীষ্মকালে তৃণাচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং দলে দলে ক্যারিবু (আমেরিকান বল্‌গা হরিণ) ও কস্তুরী বৃষ (musk ox) খাদ্যের লোভে সেখানে আসে। এক একটা দলে হাজার হাজার ক্যারিবু থাকে। আবার এদের শিকার করে বেঁচে থাকে যে নেকড়েরা, তারাও আসে দলে দলে। নেকড়েগুলি একাকী—না হয়, ছোট ছোট দল বেঁধে থাকে। তাছাড়া আসে বহু সাদা ও নীল রঙের মেরু-খেঁকশিয়াল এবং হাজার হাজার পেঁচা, বাজ ও গাল। এদের আহার হলো লক্ষ লক্ষ লেমিং-এর ঝাঁক। লেমিং একরকম ইঁদুরজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী। আরও আসে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতির হাঁস ও সারস।

এর সঙ্গে থাকে কোটি কোটি পোকামাকড়, মাছি এবং মশার ঝাঁক।

এই অঞ্চলের চরম আবহাওয়া সত্ত্বেও বহু জাতি ও উপজাতির লোক বাস করে। এদের মধ্যে ক্যানাডা ও আলাস্কার এস্কিমো, ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপ ও ফিন এবং সাইবেরিয়ার স্যাময়েড, টুঙ্গুন, অষ্টিয়াক, ইয়াকুট, চুক্চি এবং যুরাকরা প্রধান। এদের মধ্যে ল্যাপরা সবচেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু জাতি। তারা বল্গা হরিণ পালন করে। তুন্দ্রা অঞ্চলই বল্গা হরিণের আসল দেশ। এরা ল্যাপ ও অন্যান্য তুন্দ্রা জাতীয় অধিবাসীদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেয়। এরা গাড়ী টানে—স্লেজ নামে একরকম চাকাহীন গাড়ী। বল্গা হরিণ দুধ দেয়, এদের মাংসই ল্যাপদের প্রধান আহার; চামড়ায় হয় পোষাক, তাঁবু; হাড়ে আর শিঙে হয় অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র। বাস্তবিক এসব জাতির ধনসম্পদ বলতে বল্গা হরিণই বুঝায়। পালিত বল্গা হরিণের সংখ্যাই এদের সম্পদের মাপকাঠি। এছাড়া এসব জাতির লোকেরা অন্যান্য পশু শিকার এবং বড় বড় নদীতে মৎস্য শিকারও করে। ক্যানাডার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ম্যাকেঞ্জি নদী এবং সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ওবি, ওয়েনিসি নদী। এই সব নদীতে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। শীতে প্রায় সাত মাস ধরে নদীগুলিতে বরফ জমে থাকে। শীতের শেষে আসে বরফ-গলা জলের বন্যা এবং তখনই নদীগুলি মৎস্য-শিকারের উপযোগী হয়ে ওঠে।

তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর। নিদারুণ পরিশ্রম করে এদের বাঁচতে হয়, সম্ভবতঃ এই কারণে এদের দেহ বেশ বলিষ্ঠ হলেও এরা খর্বকায় জাতি। স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মের মধ্যেই এদের শীতের জন্যে যথেষ্ট খাদ্য, জ্বালানী প্রভৃতি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এদের পুরুষেরা সাধারণতঃ শিকারী; স্ত্রীলোকদের কাজ হলো মাছ ও মাংস শুকিয়ে শীতের জন্যে মজুত করে রাখা, বল্গা হরিণের পাল চরানো এবং তাদের দুধ দোওয়া। দুধ দোওয়ার কাজে অবশ্য শিশুরাও সাহায্য করে। এদের যে যাযাবরের জীবন হবে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ বলগা হরিণেরা খাদ্যের সন্ধানে নতুন নতুন স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের সঙ্গে এদেরও চলতে হয়—দলবল, ঘরবাড়ী, খাদ্যসামগ্রী সব কিছু নিয়ে। আবার পশু ও মৎস্য শিকারও এদের জীবিকার একটা অঙ্গ বলে, কোন স্থানে পশু বা মৎস্য কমে গেলে এরা নতুন স্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এরা গ্রীষ্মকালে তাঁবুতেই বাস করে। তাঁবুগুলি ছোট ছোট এবং হাল্কা, যাতে তাড়াতাড়ি খাটানো বা গুটিয়ে ফেলা যেতে পারে। এরা তাঁবুকে বলে চুম। তাঁবু তৈরী হয় চামড়া ও গাছের ছাল দিয়ে, কাঠামো হয় কয়েকটা খুঁটি দিয়ে। তাঁবুর মাথার দিকে একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার বন্দোবস্ত থাকে। এরা সাধারণতঃ কোন হ্রদ বা নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে থাকে। তাঁবুর মেঝেটা শুক্নো মস্ দিয়ে ঢেকে দেয়। বিছানা ও বসবার আসন হয় বল্গা হরিণের শুক্নো চামড়া। তাঁবুর মাঝখানে রান্নার হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে তার নীচে একটা চওড়া মসৃণ পাথরের উপর আগুন জ্বালিয়ে রান্না হয়।

নতুন তৃণভূমি বা শিকারের স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে স্ত্রীলোকেরা তাঁবু গুটিয়ে আসবাবপত্র প্যাক করে ফেলে এবং পুরুষেরা তাদের আগে আগে বল্গা হরিণের পাল অনুসরণ করে চলতে থাকে। বল্গা হরিণের ইচ্ছানুসারেই এরা চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা নতুন তৃণভূমি না পাওয়া যায়। নতুন স্থানে এসে স্ত্রীলোকেরাই আবার তাঁবু খাটিয়ে ঘরকন্না সাজিয়ে বসে। শীতের প্রারম্ভেই এরা উত্তর দেশ ছেড়ে দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে সরে আসে। শীতটা এরা কখনও তাঁবুর মধ্যে কাটায়, কখনও বা মাটি ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে অপেক্ষাকৃত মজবুত ঘর তৈরী করে। মেঝেটা গরম রাখবার জন্যে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়।

তখন কেবল অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা বা কাছাকাছি বনের প্রান্তে ফারযুক্ত পশু শিকার ছাড়া পুরুষদের কাজ প্রায় থাকে না। এই সময় স্ত্রীলোকদের কিন্তু যথেষ্ট খাটতে হয়। তারা পোষাক ও নতুন তাঁবু তৈরী করে, পুরনো তাঁবুগুলি সারিয়ে ফেলে, ফারগুলি পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখে এবং বল্‌গা হরিণের দিকে নজর রাখে। শীতকালে জন্মায় ঘন মস্—বল্‌গা হরিণ এই খেয়ে বাঁচে। শীতকালটা এরা সাধারণতঃ যাযাবর থাকে না, তবে বল্‌গা হরিণের জন্যে ঘাসের অভাব হলে বাধ্য হয়ে নতুন স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হয়।

এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা এই সব আদিম জাতির নিকট কল্পনাতীত। তারা কেবল দিন আনে দিন খায় এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে কোন রকমে বেঁচে থাকে। সুতরাং পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিদের মত এদের মনে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি বিকাশ লাভ করে নি। আনুষ্ঠানিক বিবাহ ব্যাপারটাও একরূপ অজ্ঞাত, সুযোগ ও সুবিধা মত কোন স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে জন্মের হার কম, শিশুর মৃত্যুও বেশী। রুগ্ন ও দুর্বলদের প্রায়ই যত্ন ও সেবা করা হয় না। আবার যখন এরা নতুন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন যারা অসুস্থতা ও দুর্বলতার জন্যে সঙ্গে যেতে পারে না, তাদের অসহায়ভাবে মরবার জন্যে ফেলে যাওয়া হয়।

এসব আদিম জাতির পোষাক তৈরী হয় বল্‌গা হরিণ ও অন্যান্য ফারযুক্ত পশুর চামড়ায়। এসব জন্তুর স্নায়ু দিয়ে চামড়াগুলিকে সেলাই করে ফেলা হয়। পোষাকের মধ্যে আছে এক রকম লম্বা আল্‌গা জামা গলা থেকে পা পর্যন্ত, মাথা ও কান ঢাকবার জন্যে হুড, ফারের দস্তানা ও বুট। যাতায়াতের জন্যে এরা ব্যবহার করে স্লেজ ও স্কি। তীরধনুকই এদের প্রধান শিকারের অস্ত্র। বর্তমানে অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে। কিন্তু মূল্যবান ফারযুক্ত পশু শিকার করতে এরা তীরধনুকের উপরই বেশী আস্থা রাখে, কারণ বন্দুকের গুলিতে ফারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে ল্যাসো, কুড়াল ও ছুরি প্রধান। ল্যাসো একরকম ফাঁসযুক্ত দড়ির মত জিনিষ; তৈরী হয় বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে। এটা দূর থেকে এমনভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, যাতে পশুর শিঙে বা পায়ে জড়িয়ে যায়। কুড়াল তৈরী হয় পাথর দিয়ে এবং তীর-ধনুক হয় হাড় দিয়ে।

ষ্টিফানের মতে—ক্যানাডার তুন্দ্রা অঞ্চল ভবিষ্যতের মাংস সরবরাহের কেন্দ্র হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এ অঞ্চলের অর্থনীতিক গুরুত্ব খুবই কম। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবশ্য খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের ফলে অর্থনীতিক গুরুত্ব বেড়েছে, যেমন ক্যানাডার ইউকন অঞ্চলে স্বর্ণখনি, স্পিট্‌স্‌বার্জেন দ্বীপে কয়লা খনি এবং মেকেঞ্জি উপত্যকায় তৈল খনি। এই অঞ্চলে বরফ কখনো এক ফুটের নীচে গলে না, সুতরাং এই স্থানের কৃষির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু এবং এদেশের অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্যে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে, 'কষ্টের দেশ' (Regions of Privation)। কিন্তু এই কষ্টের দেশেও কষ্ট করেই মানুষ বেঁচে আছে; তারা ভালবাসে তাদের দেশকে এবং কোন কারণে দেশ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু দক্ষিণাঞ্চলে এসে বাস করতে চায় না।

হিম-শৈত্যের সন্ধানে

সলিল বসু

গরমের সময় আমরা যখন দার্জিলিং যাই, তখন সেখানটা আমাদের বেশ ঠাণ্ডাই লাগে। কিন্তু সেই সময়ে যদি কেউ সুইডেন বা সাইবেরিয়া থেকে সেখানে আসেন, তাহলে কিন্তু তাঁর কাছে জায়গাটা ঠাণ্ডা তো লাগবেই না, উপরন্তু বেশ গরম বলেই মনে হবে। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অনেক কিছুরই মত উষ্ণতাও একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তাথেকেই তৈরী হয়েছে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার। বহুল প্রচলিত হলো দুটা পরিমাপ মান—সেন্টিগ্রেড আর ফারেনহাইট। এ-ছাড়া ইউরোপের কোন কোন দেশে রোমার পদ্ধতি নামে আর একটা মাপেরও চলন আছে। এই তিনটি পরিমাপেরই ভিত্তি হলো, জলের হিমাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক। সেন্টিগ্রেড মাপে জলের হিমাঙ্ক হলো 0° (শূন্য ডিগ্রী), ফারেনহাইটে ৩২° ডিগ্রী আর রোমারে 0° ডিগ্রী এবং জলের স্ফুটনাঙ্ক, যথাক্রমে ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং ৮০° ডিগ্রী রোমার। পৃথিবীর আবহাওয়া বৈচিত্র্যময় হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা কিন্তু একটা বিশেষ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। উষ্ণতার একটা বিশেষ সীমার মধ্যেই শুধু প্রাণের প্রকাশ সম্ভব; তার চাইতে কম উষ্ণতায় জীবের সন্ধান মিলে না, বেশী উষ্ণতায়ও প্রাণ শুকিয়ে যায়। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং সাম্প্রতিক পরমাণু-গবেষণায় কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড মাত্রার তাপ সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে। উচ্চ তাপ সৃষ্টির নাকি কোন বিশেষ সীমা নেই, অর্থাৎ কোটি কোটি ডিগ্রী তাপও নাকি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ তো গেল উঁচু দিকের ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সব চেয়ে কম উষ্ণতা কোন্‌টা? পৃথিবীতে সবচেয়ে কম উষ্ণতাসম্পন্ন স্থান হলো অ্যাণ্টার্কটিকার ভস্টক অঞ্চল। সেখানে উষ্ণতা নাকি -৮৭.৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা -১২৬° ডিগ্রী ফারেনহাইট। সেখানে চায়ের জল গরম করতে নাকি ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। এর চেয়ে কম উষ্ণতা বিজ্ঞান গবেষণাগারে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু নিম্নতম উষ্ণতার একটা বিশেষ সীমা আছে—যার চেয়ে কম উষ্ণতা নাকি সম্ভবই নয়, আর সেটাই হলো আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে প্রথম বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেক দূর পর্যন্ত চলতে পারলেও নিম্নতম উষ্ণতার একটা শেষ সীমা আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্লস, বয়েল, ময়রেত প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গ্যাসের গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, গ্যাসের চাপ যদি সমান থাকে তা হলে প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে গ্যাসের ত্রিমাত্রিক আয়তন (Volume) ০.০০৩৬৭ বা $\frac{১}{২৭৩}$ ভাগ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ −২৭৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গ্যাসের কোন আয়তনই থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড কেলভিন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জটিল গাণিতিক উপায়ে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে, −২৭৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডই নিম্নতম তাপমাত্রা, অর্থাৎ উষ্ণতার শেষ সীমা। একে বলা হয় Absolute Zero বা পরম শূন্য। এখন −২০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বোঝাতে হলে বলা হয় ৭৩° ডিগ্রী কেলভিন, আর এই

পরিমাপেই জলের হিমাঙ্ক হলো ২৭৩° ডিগ্রী কেলভিন।

তারপর বিজ্ঞানের সব অধ্যায়ের কর্মতৎপরতার পুনরাবৃত্তি এখানেও হলো। তাপমাত্রার নিম্নতম কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে সেই উষ্ণতা সৃষ্টির চেষ্টা চলতে লাগলো। প্রথম দিকে এই সব গবেষণায় খুব বিশেষ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। উষ্ণতা কমানোর চেয়ে বাড়ানোটা অনেক বেশী সহজ, যদিও এর মূলীভূত কারণটা অনেক দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অজানাই ছিল। তারপর এলো ১৮৭৭ সালের ২রা ডিসেম্বর, নিম্ন তাপমাত্রা বিষয়ক গবেষণার এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ফ্রান্সের সেইন নদীর তীরবর্তী শ্যাতিলঁ-এর বিজ্ঞানী Louis Cailletet অক্সিজেনের তরলীকরণ সম্ভব করেন। এর মাত্র কুড়ি দিন পরে ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ সালে জেনেভায় বিজ্ঞানী Raoul Picdet আর একটা সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে অক্সিজেনকে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করতে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে তাপমাত্রা হয়েছিল –১৮৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ ৯০° ডিগ্রী কেলভিন। এই আবিষ্কার সে দিনের বৈজ্ঞানিক মহলে একটা বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং বিজ্ঞানীরা নতুন উৎসাহে মেতে ওঠেন আরও বেশী এগিয়ে যাবার জন্যে।

এভাবে পাওয়া নিম্ন তাপমাত্রার ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আকস্মিক। উভয় বিজ্ঞানীরই উদ্দেশ্য ছিল অক্সিজেনের তরলীকরণ, নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি নয়। এই সময়ে বিভিন্ন পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ বা হিমায়নের ফলে অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ জলের কথাই বলা যেতে পারে। জল ঠাণ্ডা করলে জমাট বেঁধে বরফ হয়; এই বরফ আবার তাপ প্রয়োগে জলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরও বেশী তাপ প্রয়োগে তরল জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। জলের এই তিন অবস্থায় অবস্থানের ব্যাপারটা থেকে অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থকেই উপযুক্ত তাপ প্রয়োগে এবং হিমায়নের সাহায্যে এই তিন অবস্থার যে কোন অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কতকগুলি পদার্থের এই রকম রূপান্তর ঘটেছিল। কিন্তু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় নি। এই জাতীয় গ্যাসগুলিকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল বিশুদ্ধ গ্যাস। Cailletet ও Pictet-এর অক্সিজেন তরলীকরণে সাফল্য যে শুধু নিম্ন তাপমাত্রাই দেখিয়েছিল তা নয়, তাৎকালীন প্রচলিত ধারণারও অবসান ঘটিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, উপযুক্ত শীতলতার প্রভাবে যে কোন গ্যাসকেই তরল করা সম্ভব, আর তারই উপর ভিত্তি করে সুরু হলো, সে দিনের নিম্ন তাপমাত্রা বিষয়ক গবেষণা।

এই সময়ে পদার্থের অবস্থান্তরের একটা আণবিক ও পারমাণবিক তথ্য প্রকাশিত হলো। কোন কঠিন পদার্থে অণুগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত থাকে এবং ঠিক এই কারণেই কঠিন পদার্থের নিজস্ব একটা বিশেষ রূপ ও আকার আছে। তাপ প্রয়োগে অথবা হিমায়নের ফলে পদার্থের আণবিক সজ্জার পরিবর্তনের ফলেই পদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে। একটা সাধারণ অবস্থা পরিবর্তনের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। কঠিন তুষার-কণা হাতে তুলে নেবার কিছুক্ষণ পরেই সেটা গলে জল হয়ে যায়। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, হাতের উত্তাপের তুষার-কণার মধ্যে স্থানান্তরণের প্রভাব। এই উত্তাপের ফলে কঠিন তুষার-কণার অণুগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এই চাঞ্চল্য ক্রমশঃই বাড়তে থাকে; শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে এসে পৌছায় যে, অণুগুলির সংশক্তি হার মেনে যায় তাদের চাঞ্চল্যের কাছে। এর ফলে অণুগুলি আর নিজেদের আগেকার স্থানে ফিরে আসতে পারে

না, ফলে তুষার-কণাটি গলে যায়। তরল অবস্থায় কোন পদার্থের অণুগুলি নিজেদের বিশেষ কোন অবস্থায় স্থির রাখতে পারে না বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কিছুটা সংশক্তি বজায় রেখে চলতে পারে। এখন এই অবস্থায় যদি আরও তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে চাঞ্চল্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে যাবে, আর শেষকালে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছাবে, যখন অণুগুলি পারস্পরিক আকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন করে দূরতর ব্যবধানে সরে পড়বে। এই অবস্থায় যদি একটা অণুর চলার পথে আর একটা অণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে তাহলে পারস্পরিক আকর্ষণ তো ঘটবেই না, উপরন্তু দুটিই ছিট্‌কে পড়বে দু-দিকে। আর এই অবস্থাতেই তরল পদার্থটা বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা গেল, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের অণুর মধ্যে আসে চাঞ্চল্য। তারা দুর্দাম হয়ে ওঠে; আর তাপমাত্রা যতই কমতে থাকে ততই তারা শান্ত হয়ে আসে, মিলেমিশে বাঁধতে চায় সাজানো ঘর। এই অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারটা কতকগুলি পদার্থে এত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয় যে, হয়তো কোন একটা অবস্থা আমাদের চোখে ধরাই পড়ে না। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করে তাপমাত্রা কতটা বাড়লো, তার হিসেব থেকেই কোন পদার্থের আণবিক সংগঠনের পরিবর্তনের বিষয় জানা যেতে পারে। এসব তাপ সঞ্চালনের গবেষণা থেকেই অণুর চাঞ্চল্য পরিমাপের একটা উপায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এটার নাম দিয়েছেন এন্‌ট্রপি। এটা আসলে তাপ ও উষ্ণতারই একটা অনুপাত। কোন পদ্ধতির পরম এন্‌ট্রপি কিন্তু পরিমাপ করা যায় নি, পরিমাপ হয় শুধু এন্‌ট্রপি পরিবর্তন। তাপ-চলন বিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্র অনুসারে জানা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই Absolute Zero-তে, অর্থাৎ পরম শূন্যে একেবারে শান্তভাব ধারণ করে এবং তার ফলে এন্‌ট্রপিও একেবারে শূন্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখতে পাই যে, শান্ত হয়ে থাকার চাইতে চঞ্চল হয়ে ওঠা অনেক বেশী সহজ। আর বস্তু-জগতের অণু-পরমাণু মহলেও ঠিক সেই একই ব্যাপার। এই কারণেই কোন পদার্থকে খুব বেশী ঠাণ্ডা করবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা অনেক দিন সম্ভব হয় নি, যদিও উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি অনেকটা সহজ ব্যাপার। হিমায়নের অনেক রকম উপায় এখন আবিষ্কৃত হয়েছে; তবে সব রকম পদ্ধতির মূল কথা হলো একই, অর্থাৎ যে কোন উপায়ে পদ্ধতিটির এন্‌ট্রপি কমানো।

অক্সিজেনের তরলীকরণের পর ১৮৯৮ সালে হাইড্রোজেন ও ১৯০৮ সালে হিলিয়ামের তরলীকরণ সম্ভব হয়। Sir James Dewar হাইড্রোজেনের তরলীকরণ করেন এবং নিম্ন তাপমাত্রার গবেষণার জন্যে বিশেষ একরকম বায়ু-নিষ্কাশিত পাত্র তৈরী করেন। বর্তমানে সেটি ডেওয়ার্স ফ্লাস্ক নামে পরিচিত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী Kamerlingh Onnes নিম্ন তাপমাত্রা বিষয়ক একটা সুবৃহৎ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল হিলিয়াম। তাপমাত্রা কমিয়ে যেতে যেতে সব শেষে যে গ্যাসটা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেটা হলো হিলিয়াম। এই তরল হিলিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক হলো ৪.২° ডিগ্রী কেলভিন। এখন এই উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হিলিয়ামকে তরল হিলিয়াম থেকে পাম্প করে সরিয়ে নিলে বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপকে (Latent heat of vaporisation) পদ্ধতিটা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। এই তাপ দূরীকরণের ফলে বেশী নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিজ্ঞানী Onnes এভাবেই প্রায় ১° ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত নিম্ন তাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধুমাত্র গ্যাস তরলীকরণের সাহায্যে হিমায়নের চেষ্টার এটাই হলো নিম্ন তাপমাত্রার শেষ সীমা।

এর পর বেশ কিছুদিনের জন্যে এই জাতীয়

গবেষণা মন্দীভূত হয়ে পড়ে। কোন পদার্থের তরলীকরণের পক্ষে শুধু নিম্ন তাপমাত্রা নয়, চাপেরও যে একটা বেশ সম্বন্ধ আছে—এই সত্যটা আবিষ্কার হয়েছিল অনেকদিন আগেই। এর সাহায্যে প্রায় সব গ্যাসকেই তরল করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে হিমায়নের গবেষণা খুব বিশেষ লাভবান হয় নি। অনেক দিন নিস্তব্ধতার পর বিজ্ঞানীরা যখন Absolute Zero-তে পৌছানো সম্বন্ধে প্রায় নিরাশ হয়ে এসেছেন, তখন ১৯২৬ সালে Debye ও Gianque নামে দুজন বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চৌম্বক শক্তির সাহায্যে ঠাণ্ডা করবার প্রক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেন। আধুনিক পরমাণুবাদ অনুসারে বলা হয় যে, কোন পদার্থের পরমাণুর প্রাণকেন্দ্র হলো ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস, আর সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহাদি ঘোরাফেরা করে, ঠিক তেমনি এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রনের দল। কোন বিশেষ পরমাণুর চৌম্বক প্রকৃতির কারণ হলো নিজ নিজ অক্ষরেখায় ইলেকট্রনের ঘূর্ণন, যেটাকে সাধারণতঃ ‘ইলেক্‌ট্রন-স্পিন’ বলে। বেশীর-ভাগ পদার্থের মধ্যে এই মৌলিক চুম্বকগুলি বেশ সংযতভাবেই থাকে, আর একই পরমাণুর মধ্যের বিপরীতমুখী স্পিন সমান সংখ্যক থাকবার ফলে আসল পদার্থটির চৌম্বক প্রকৃতি লক্ষিত হয় না। কিন্তু এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাদের মধ্যে অসম্পৃক্ত ইলেক্‌ট্রন-স্পিন রয়েছে, অর্থাৎ সব কটার চৌম্বক প্রভাব প্রশমিত হয় নি। এখন এসব পদার্থগুলির খুব নিম্ন তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুর বেশ একটা শান্ত ভাব আসে। কিন্তু যদি এই উষ্ণতা ১° ডিগ্রী কেলভিন হয় তা হলে সেগুলি আবার বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখন এই অবস্থায় যদি একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা হয় তা হলে আবার শান্তভাব লক্ষ্য করা যাবে। চুম্বক ব্যবহারে শান্তভাব ধারণের ফলে নিম্ন তাপমাত্রারও সৃষ্টি হয়। এই তথ্যটা জানবার প্রায় সাত বছর পরে এই চুম্বক-শক্তির সাহায্যে হিমায়ন সম্ভব হলো, বার্কলি, লেডন ও অক্সফোর্ডে। এই প্রক্রিয়াটা খুবই শক্ত, কারণ খুব বেশী শক্তিসম্পন্ন চুম্বকের প্রয়োজন হয়, আর সেই সঙ্গে কোন উৎস থেকে যাতে বিন্দুমাত্র তাপ আসতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে ০'০১° ডিগ্রী, অর্থাৎ ১ × ১০^{-৩} ডিগ্রী কেলভিন নিম্নতাপ-মাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই ইলেকট্রন-স্পিনের সাহায্যে হিমায়ন কিন্তু ০'০০১° ডিগ্রী, অর্থাৎ ১ × ১০^{-৪} ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা চলে, তার চেয়ে কম তাপমাত্রা সম্ভব নয়। কারণ এই তাপমাত্রার নীচে পরমাণু কণিকাগুলির সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণের জন্যে স্পিনের চুম্বক প্রভাব আর লক্ষ্য করা যায় না। এখন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কতকগুলি মৌলিক চুম্বক-কণিকা রয়েছে, সেগুলি কিন্তু এই তাপমাত্রাতেও চঞ্চল অবস্থায় থাকে। একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক চৌম্বক আকর্ষণটা খুবই কম। এই চৌম্বক পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় পরিণত হয় ০'০০০০০০১° ডিগ্রী, অর্থাৎ ১ × ১০^{-৭} ডিগ্রী কেলভিন তাপাঙ্কে। বাস্তবিক পক্ষে এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করবার যন্ত্রপাতি তৈরী খুবই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজও আশা ছাড়েন নি, অক্লান্ত পরিশ্রমে গবেষণা চলেছে। কবে, কখন এবং কোথায় নতুন যুগের বিজ্ঞান সম্ভব করবে বিজ্ঞানের বহু যুগের সাধনা, আজকের বিজ্ঞান তারই পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে আছে।

মুক্তা

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র

মূল্যবান ভূষণে যে সব জৈব পদার্থের ব্যাপক ব্যবহার হয়, মুক্তা তাদের মধ্যে সবচেয়ে দামী। কয়েক জাতের শুক্তির নরম দেহের মধ্যে কোন কঠিন উত্তেজক জিনিষ ঢুকে গেলে জীবটি তার চারদিকে একরকম কঠিন জিনিষের প্রলেপ দিয়ে উত্তেজনা কমাবার চেষ্টা করে। এই প্রলেপের রাসায়নিক গঠন শুক্তির দেহাবরণ, অর্থাৎ ঝিনুকের মতই। এর মধ্যে চিটিন জাতীয় একটা জিনিষের কয়েকটি খুব পাতলা এককেন্দ্রীক স্তর থাকে, আর এই স্তরগুলির মধ্যের অংশে অ্যারাগোনাইটের (ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিষমমিতি প্রকার) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেলাসগুলি এমনভাবে সজ্জিত হয় যে, এদের দীর্ঘ অক্ষস্তরগুলির সঙ্গে লম্বভাবে থাকে; ফলে এর ভিতরের গঠন ছটার আকৃতি ধারণ করে। একেই বলা হয় মুক্তা। কোন কোন মুক্তার মধ্যে অণুবীক্ষণের সাহায্যেও কোন কঠিন উত্তেজক পদার্থ দেখা যায় না বলে মনে হয় যে, কর্কট জাতীয় কোন রোগই বোধ হয় মুক্তা সৃষ্টির কারণ।

মুক্তা সাধারণতঃ ছোট ছোট গুলির মত পদার্থ। তবে অন্যান্য আকারের মুক্তাও প্রায়ই দেখা যায়। মুক্তার রং সাদা, কিন্তু সাদার মধ্যে ফিকে সবুজ, বাদামী, লাল ও ধূসর আভা থাকতে পারে। স্বাভাবিক ও স্নিগ্ধ দ্যুতিই মুক্তার সৌন্দর্যের প্রধান কারণ। ঘোর লাল বা বাদামী রঙের মুক্তা কখনও কখনও দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের দাম খুবই কম।

মিঠা জল থেকে কিছু কিছু মুক্তা পাওয়া গেলেও যে সব শুক্তি থেকে মুক্তা পাওয়া যায়, তারা সাধারণতঃ অগভীর সমুদ্রে বাস করে। পৃথিবীর বহু জায়গায় স্থানীয় ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে এই ঝিনুকগুলিকে তুলে আনে। ছোটগুলিকে জলে ছেড়ে দিয়ে বড়গুলিকে ভেঙ্গে তাদের মধ্যে মুক্তা পেলে বের করে নেয়। বলা বাহুল্য, অসংখ্য ঝিনুক ভেঙ্গে মাত্র দু-একটাতে মুক্তা পাওয়া যায়, আর সেই জন্যেই এর এত দাম। ভারতে করমণ্ডল উপকূল ও কুমারিকা অন্তরীপের কাছে এভাবে মুক্তা সংগৃহীত হয়।

কৃত্রিম বা চাষ-করা মুক্তাও শুক্তি থেকেই পাওয়া যায়। উষ্ণমণ্ডলের স্থলভাগের কাছে অগভীর সমুদ্রের যে অংশে জল খুব পরিষ্কার এবং শুক্তির খাদ্যের অভাব নেই, সেখানে অপ্রয়োজনীয় সব শুক্তি, সমুদ্রতলবাসী জীব ও শিকারী জীবদের মেরে ফেলা হয়। তারপর মুক্তা-উৎপাদক অল্পবয়স্ক শুক্তির খোলা দুটার ভিতর দিয়ে দেহের নরম অংশের গায়ে কোন কঠিন বস্তু বা মুক্তার বীজ প্রবেশ করিয়ে দেবার পর শুক্তিগুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সমুদ্রতলে রেখে আসা হয়। এই সময়ে শুক্তির বয়স থাকে মাত্র ৬ মাসের মত। এদের মোট জীবনকাল ৯ বা ১০ বছর হলেও ৫ বছর পরে শুক্তিগুলিকে জলের উপরে তুলে এনে তাদের দেহের ভিতর থেকে মুক্তা বের করে নেওয়া হয়। কারণ এই বয়সের পরে মুক্তার আকার আর বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। মিঠা জলের নানা জাতীয় ঝিনুকের ভিতরের মৌক্তিক আবরণের অংশ সাধারণতঃ বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর বিভিন্ন স্তরগুলি মুক্তার মত এককেন্দ্রীক নয়—এরা উপসমান্তরাল এবং একতলীয়। কখন কখন কাচের টুক্‌রা বা ছোট মুক্তাও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জাপানী বিজ্ঞানী মিকিমোটোর পদ্ধতিতে বড়

একটা বীজ ম্যাণ্টলের (শুক্তির নরম দেহে দুদিকে ঝিনুকের সঙ্গে আংশিকভাবে সংলগ্ন পেশীবহুল দুটা আলাদা অঙ্গকে ম্যাণ্টল বলা হয়) একটা ভাঁজের মধ্যে সেলাই করে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে মৃত্যুর হার বেড়ে যায় বলে এর ব্যবহার কমে গেছে। জাপানী বিজ্ঞানী নিশিকাওয়ার পদ্ধতিতে শুক্তির দেহপ্রান্তে একটা সরু ও লম্বা গর্ত কেটে তার মধ্যে বীজটাকে রাখা হয়; তার পর ম্যাণ্টল থেকে দুই বা তিন বর্গ মিলিমিটার জায়গা কেটে নিয়ে গর্তের মধ্যে রেখে সেটাকে বন্ধ করা হয়। বীজ ব্যবহার না করে এই ধরণের কলমের সাহায্যে আর এক প্রক্রিয়ায় অসমান কিন্তু সুন্দর মুক্তা তৈরী করা যায়। জাপানের বিভিন্ন জায়গায়—পালাউ ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে এভাবে মুক্তার চাষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও আজকাল মুক্তার চাষ করা হয়। চাষ-করা মুক্তায় সাধারণতঃ এক মিলিমিটারের বেশী মুক্তা স্তর থাকে না।

স্বাভাবিক ও চাষ-করা মুক্তার মধ্যে পার্থক্য এত কম যে, খালি চোখে তাদের একই রকম মনে হয়। চাষ-করা মুক্তা সাধারণতঃ সবুজ বা ধূসর আভাযুক্ত হয় এবং স্বাভাবিক মুক্তার চেয়ে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব সামান্য বেশী। অন্ধকার ঘরের মধ্যে চাষ-করা মুক্তার উপর প্রখর আলোকরশ্মি ফেললে এর মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি লম্বা দাগ দেখতে পাওয়া যায়; স্বাভাবিক মুক্তায় ঐ রকম দাগ দেখা যায় না। স্বাভাবিক ও চাষ-করা মুক্তার বাইরের অংশ একই রকমের; কিন্তু চাষ-করা মুক্তার কেন্দ্রে বীজ থাকবার ফলে মুক্তাবীক্ষণ ও রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে এদের পার্থক্য বুঝা সম্ভব।

মুক্তাবীক্ষণ একটি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই, তবে এর মঞ্চে আলোক প্রবেশের জন্যে একটা ছোট ছিদ্রের উপর ছোট ফাঁপা ধাতব সূচ, এবং তার নীচে একটা শক্তিশালী ছোট আলোক-উৎস থাকে। সূচের মধ্যে ছোট একটা ধাতব আয়না তার সঙ্গে ৪৫° কোণ করে থাকে। এই আয়না উঁচু বা নীচু দিকে মুখ করে থাকতে পারে; কখনও বা দুটা আয়নাই এক সঙ্গে থাকে। আয়নার ঠিক পাশে সূচের গায়ে ছিদ্র থাকে। মুক্তার ছিদ্রের মধ্যে এই সূচ ঢুকিয়ে মুক্তার গায়ে প্রখর আলো ফেলা হয়। তখন সূচের সাহায্যে ছিদ্রের দেয়াল পরীক্ষা করলে স্বাভাবিক মুক্তায় অনেকগুলি এককেন্দ্রীক স্তর দেখা যায়; কিন্তু চাষ-করা মুক্তার কেন্দ্রের দিকে এর বদলে অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ এবং একতলীয় স্তর থাকে। আবার সূচের সাহায্যে ছিদ্রপথের দেয়াল আলোকিত করে মুক্তার উপরিভাগ দেখলে চাষ-করা মুক্তায় বিড়ালের চোখের মত জলজলে আভা দেখা যায়। স্বাভাবিক মুক্তাও এ অবস্থায় সমানভাবে আলোকিত হয়। দুই আয়নাবিশিষ্ট মুক্তাবীক্ষণ যন্ত্রের নীচের আয়না দিয়ে মুক্তার ছিদ্রপথের দেয়ালে আলো ফেলা হয়। মুক্তা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে এর কেন্দ্র পর্যন্ত এককেন্দ্রীক স্তর থাকবে। আয়না থেকে যে স্তরের উপর আলো পড়ে তার চিটিনীয় দুই দেয়াল আলোক-রশ্মিকে বার বার প্রতিফলিত করে বক্রপথে নিয়ে যায় এবং শেষে আলোক-রশ্মি আবার মুক্তার ছিদ্রপথে এসে পড়ে। কিন্তু এবার দ্বিতীয় আয়না একে প্রতিফলিত করে সোজা অণুবীক্ষণের দিকে পাঠায় এবং তার ফলে আলোর একটা ঝিলিক ফুটে বেরোয়। চাষ-করা মুক্তার কেন্দ্রের দিকে ঐ ধরণের স্তর থাকে না বলে অনুরূপ ক্ষেত্রে মুক্তাবীক্ষণ যন্ত্রে কোন আলোই দেখা যায় না।

মুক্তার ভিতর দিয়ে কোন সরু রঞ্জেন-রশ্মি প্রতিসরিত হলে রশ্মিটির অপবর্তন ঘটে এবং এ অপবর্তনের আলোকচিত্র তোলা যায়। সত্যিকার মুক্তায় এই চিত্র ষড়মিতি হয়, কিন্তু চাষ-করা মুক্তার ভিতরে ঝিনুকের টুক্রা থাকে বলে একটা বিশেষ দিক ছাড়া অন্যান্য দিকে চতুর্মিতি অপবর্তন-চিত্র পাওয়া যায়। যে কোন মুক্তায় দুটা বিভিন্ন

দিক থেকে যদি শুধু ষড়মিতি চিত্র পাওয়া যায় তবে মুক্তাটিকে সত্যিকার বা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়।

কোন আলোকগ্রাহী প্লেটের উপর একটি মুক্তা বা মুক্তার হার রেখে তার উপর রঞ্জেন-রশ্মি ফেলা হলে রেডিওগ্রাফ পাওয়া যাবে। চাষ-করা মুক্তার রেডিওগ্রাফে একটা বড় সাদা বৃত্তের চারদিকে ঈষদালোকিত একটা চওড়া বেড় থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক মুক্তার ক্ষেত্রে কয়েকটি এককেন্দ্রীক সাদা-কালো বেড় দেখা যায়। রেডিওগ্রাফ থেকে মুক্তাটি চাষ-করা কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায় না।

অষ্ট্রেলিয়াজাত এবং মিঠা জলের মুক্তা ছাড়া অন্যান্য স্বাভাবিক মুক্তা ক্ষুদ্র তরঙ্গের রঞ্জেন-রশ্মির প্রভাবে প্রতিপ্রভ দেখায় না। যে সব চাষ-করা মুক্তায় মিঠা জলের ঝিনুকের টুকরা বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলি প্রতিপ্রভ দেখায়।

গোলাকার সাদা মুক্তার দাম খুব বেশী বলে বাজারে সেগুলির বহু নকল বেরিয়েছে। সেগুলি সাধারণতঃ কাচ দিয়ে দু-ভাবে তৈরী করা হয়—মোম-ভর্তি ফাঁপা কিম্বা নীরেট কাচের গোলক। বর্ণহীন বা সাদা কাচ দিয়ে তৈরী এই গোলকগুলিকে প্রায় ৪০ বার প্রাচ্য-নির্যাসে এবং কয়েকবার সেলুলোজ অ্যাসিটেটে ডুবানো হয়। মাছের আঁশ থেকে জলের সাহায্যে গুয়ানিনের ছোট কেলাসগুলিকে বের করে নিয়ে সেলুলোজ নাইট্রেটে মিশিয়ে একটা কলয়েড দ্রব তৈরী করা হয়—একেই প্রাচ্য-নির্যাস বলে। এর সাহায্যে নকল মুক্তায় ঔজ্জ্বল্য আনা সম্ভব হয়। নকল মুক্তা দাঁতে দিলে মসৃণ বোধ হয়, কিন্তু স্বাভাবিক বা চাষ করা মুক্তা খরখরে মনে হয়। সম্প্রতি অবশ্য প্রাচ্য-নির্যাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম বালির মত কিছু মিশিয়ে নকল মুক্তায় খরখরে ভাব আনা হচ্ছে। এ ধরণের মুক্তা অণুবীক্ষণের নীচে দেখলে স্বাভাবিক বা চাষ-করা মুক্তার দেহপ্রান্তের শল্কভাব দেখা যাবে না।

নকল মুক্তা কাচ দিয়ে তৈরী বলে রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে অতি সহজেই চেনা যায়। নকল মুক্তার গর্তের দু-ধারে কাচের মত দ্যুতি চেনা খুব সহজ। ছোট একবিন্দু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মুক্তার উপর দিলে বুদ্বুদ দেখা যায়, কিন্তু নকল মুক্তায় এমন কোন আবরণ দেখা যায় না। প্রখর আলোর সামনে ধরলে মুক্তায় ঈষদচ্ছ আবরণ দেখতে পাওয়া যায়, মোমভরা নকল মুক্তার গর্ত দিয়ে একটা পিন ঢুকিয়ে মোমের অস্তিত্ব বোঝাও খুব সহজ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মণিমুক্তার যে সব গুণ থাকা দরকার তার অনেকগুলিই মুক্তায় নেই। মুক্তা ভঙ্গুর, এর কাঠিন্য কম, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহজেই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং কার্যক্ষেত্রে কৃত্রিম মুক্তার সৌন্দর্য আসল মুক্তার মত হওয়ায় এর সত্যিকার বিরলতাও আর নেই। কিন্তু এর সৌন্দর্য এতই বেশী যে, মুক্তা আমাদের কাছে চিরদিন মূল্যবান থাকবে।

উচ্চ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়া

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রায় পদার্থের পরীক্ষণ, রসায়নবিদের নিকট অভিনব অভিজ্ঞতা। সাধারণ তাপমাত্রার তুলনায় এত উচ্চ তাপমাত্রায় পরীক্ষার উপকরণ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া, উভয়ই হবে ভিন্ন রকমের।

১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রসায়নবিদ্ উত্তাপের জন্যে একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক চুল্লী, রাসায়নিক পদার্থ রাখবার জন্যে স্ফটিকের পাত্র এবং উত্তাপ নির্ণয়ের জন্যে সাধারণ থার্মোকাপ্‌ল্‌ ব্যবহার করতে পারেন। ১৫০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে চুল্লীতে নি-ক্রোমের পরিবর্তে সিলিকন কার্বাইড কিংবা প্ল্যাটিনামের তার ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাপমান হিসাবে বিশেষ থার্মোকাপ্‌ল্‌ দরকার হবে। কিন্তু ২০০০° ডিগ্রীর অধিক তাপমাত্রায় অবস্থার হবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন। এত উচ্চ তাপ উৎপাদন করা যেতে পারে—বৈদ্যুতিক আর্ক, সৌর-চুল্লী, বিশেষ চুল্লী প্রভৃতির সাহায্যে। অপ্‌টিক্যাল পাইরোমিটারের ন্যায় বিশেষ যন্ত্রে উষ্ণতা নির্ণয় করতে হবে। উত্তপ্ত পদার্থসমূহকে বিশ্লেষণ করতে হবে স্পেক্ট্রোগ্রাফ, এক্স-রে কিংবা স্পেক্ট্রোমিটারে। কিন্তু অস্বাভাবিক বিক্রিয়াশীল পদার্থগুলিকে রাখবার পাত্র যোগাড় করাই হবে সর্বাধিক সমস্যা।

২০০০° ডিগ্রীর উর্ধ্বে কঠিন পদার্থ কিংবা জৈব বা জটিল অণু বর্তমান থাকবে খুব কমই। রসায়নবিদের প্রধানতঃ বায়বীয় পদার্থের দুই কিংবা তিন পরমাণুবিশিষ্ট সরল অণুরই সম্মুখীন হতে হবে। পরমাণুসমূহের পরস্পর যুক্ত হওয়ার সাধারণ নিয়মও খাটবে না। অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিজেন কিংবা অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সাধারণ তিন বন্ধনী ছাড়াও এক, দুই কিংবা চার বন্ধনীও কার্যকরী হতে পারে। অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্র্যাফাইটের বায়বীয় পদার্থে কার্বনের পরমাণু ছাড়াও দুই, তিন ও পাঁচ পরমাণুসমন্বিত কার্বন-অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড যথেষ্ট উত্তপ্ত করে বায়বীয় অংশে (একটি সোডিয়াম ও একটি ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে গঠিত) সাধারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু ছাড়া মৌলিক পদার্থ দুটির বিভিন্ন সংখ্যার পরমাণু দিয়ে গঠিত বিভিন্ন অণু পাওয়া গেছে; যেমন—দুটি সোডিয়াম ও দুটি ক্লোরিন, তিনটি সোডিয়াম ও একটি ক্লোরিন এবং একটি সোডিয়াম ও দুটি ক্লোরিনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণু। ৪০০০ ডিগ্রীর উর্ধ্বে নাইট্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইডের ন্যায় যথেষ্ট স্থায়ী বায়বীয় পদার্থের অণুই অধি পরিমাণে দেখা যাবে। এ অবস্থায় কার্বন মনক্সাই অক্সিজেনের সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হবে না। ১০০০০ ডিগ্রীর উর্ধ্বে কোন অণু থাকবে না এবং সাধার রাসায়নিক বিক্রিয়াও হবে না; থাকবে কেবলমা পরমাণু ও আয়ন।

যদিও উচ্চ তাপে রসায়নবিদেরা সরল ত নিয়েই গবেষণা করবেন, তাহলেও এ অবস্থায় তাঁ অণুসমূহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ নি অনুসারে বিচার করতে পারবেন না। সাধা উষ্ণতায় যে বিক্রিয়া হয় খুব ধীরে, ২০০ ডিগ্রীতে সেটিই হবে মুহূর্তের মধ্যে। সাধা তাপে যে বিক্রিয়া (খুব আস্তে হওয়ার দরুণ) ল করা যাবে না, উচ্চ তাপে সেটিই হবে প্রত্যক্ষীভূত উচ্চ তাপে অনুঘটকের বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না।

উচ্চ তাপে অনেক মূল্যবান রাসায়নিক পদ

উৎপাদন করা যেতে পারে, যাদের সাধারণ উষ্ণতায় সহজে প্রস্তুত করা যায় না। কাজেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক থেকে উচ্চতাপ রসায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের অনেক সার ও বিস্ফোরক বায়ুর নাইট্রোজেন থেকেই প্রস্তুত করা হয়। হেবার-প্রক্রিয়ায় বায়ুর নাইট্রোজেন, অনুঘটকের বর্তমানে ও উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত করে অ্যামোনিয়া তৈরী করা হয়। প্রক্রিয়াটি জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চ তাপে অনেক সহজ উপায়েই নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হতে পারে। ২১০০° ডিগ্রীতে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পর মিলিত হয়ে অতি দ্রুত নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করে। প্রায় শতাংশের দুই ভাগ নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায়। দ্রব্যটি আস্তে আস্তে সাধারণ উষ্ণতায় ঠাণ্ডা করলে সবটা নাইট্রিক অক্সাইড-ই পুনরায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ২১০০° ডিগ্রী থেকে খুব তাড়াতাড়ি ১৫০০° ডিগ্রীতে ঠাণ্ডা করা যায়, তাহলে পরে সাধারণ তাপমাত্রা পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলেও নাইট্রিক অক্সাইড আর বিচ্ছিন্ন হবে না।

তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করবার জন্যে দুই প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট বিশেষ চুল্লীর পরিকল্পনা হয়েছে। এইরূপ চুল্লীর দেয়াল গাঁথা হয় বিশুদ্ধ ম্যাগ্‌নেসিয়ার ইট দিয়ে, যা যথেষ্ট উত্তাপেও বিকৃত হয় না। প্রকোষ্ঠ দুটি পূর্ণ করা হয় ম্যাগ্‌নেসিয়ার গোল নুড়ি দিয়ে। এরূপ প্রকোষ্ঠের বিশেষত্ব এই যে, এটি উত্তপ্ত গ্যাস থেকে অতি দ্রুত তাপ শোষণ করে নিতে পারে। আবার প্রকোষ্ঠটি যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে তেমনি সহজেই শীতল গ্যাসে তাপ মুক্ত করে দিতে পারে। প্রথমে ঠাণ্ডা বায়ু একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে পরিচালনা করে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাবার পথে জ্বালানী গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত ও উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তাপ মুক্ত করে অনেকটা ঠাণ্ডা হয় এবং তৎপর অন্যত্র নীত হয় নাইট্রিক অক্সাইড সংগ্রহ করবার জন্যে। এভাবে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি ক্রমেই যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে গেলে বায়ুর গতির পরিবর্তন করা হয়; অর্থাৎ ঠাণ্ডা বায়ু উত্তপ্ত দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং তৎপর প্রথম প্রকোষ্ঠে তাপ মুক্ত করে বেরিয়ে যায়। এভাবে ক্রমে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ আবার ঠাণ্ডা এবং প্রথম প্রকোষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে যায়। তখন বায়ুর গতির আবার পরিবর্তন করা হয়; অর্থাৎ ঠাণ্ডা বায়ু পুনরায় প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় জ্বালানী গ্যাসের খরচা কম হয়। এভাবে বার বার বায়ুর গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। অবশেষে দুটি প্রকোষ্ঠের সংযোগ স্থলে, অর্থাৎ চুল্লীর উপরিভাগে বায়বীয় পদার্থের তাপমাত্রা হয় ২১০০° ডিগ্রীর উর্ধ্বে এবং নির্গত বায়ুর তাপমাত্রা থাকে ৩০০° ডিগ্রীতে।

ওজোন হলো আর একটি দৃষ্টান্ত। এই মূল্যবান দ্রব্যটি অক্সিজেন থেকেই সোজা উৎপাদন করা যেতে পারে। অক্সিজেন উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে, তৎপর সাধারণ উষ্ণতা পর্যন্ত অতি দ্রুত ঠাণ্ডা করে। এ উপায়ে নাইট্রোজেন ও কার্বন থেকে সাইয়েনোজেন সংশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে অ্যাসিটিলিন তৈরী হতে পারে।

জৈব পদার্থ যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে অনেক সময় মুক্ত মৌল, মিথাইল র‍্যাডিক্যালে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই মৌল অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল। এটি বৃহদাকার অণু তৈরী করতে পারে। হয়তো অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে এসব মৌল থেকে ইচ্ছানুরূপ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা যেতে পারে।

উচ্চ তাপমাত্রায় (২০০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি) জটিল অণুসমন্বিত জৈব পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই জৈবের চেয়ে অজৈব পদার্থ সম্বন্ধেই উচ্চতাপ রসায়নের গবেষণা সম্ভব এবং ক্লোরিন ও ফ্লোরিন

সংক্রান্ত কয়েকটি বিক্রিয়াই যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হবে। হলো, এরূপ পাত্র তৈরী করা যাবে কিনা, যা এত কিন্তু সমস্যা উচ্চ তাপে এসব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বিকৃত হবে না।

প্রকৃতি আমাদের জন্যে উচ্চতাপ গবেষণাগারের ব্যবস্থা করেছে—সে হলো আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরি থেকে যে সব বায়বীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে, তারা হলো—জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া এবং উদ্বায়ী বোরিক অ্যাসিডসমূহ। এদের মধ্যে কয়েকটি পদার্থের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এখনও সম্যক জ্ঞানলাভ হয় নি। কিন্তু এরা যেন উচ্চ তাপ রসায়নের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায়ই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

অর্শ

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

অর্শ রোগ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন। বহু লোকেই এই রোগে কষ্ট পেয়ে থাকেন। অর্শ রোগের ইংরেজী নমে পাইল্‌স্ (Piles) বা হেমোরয়েড্‌স্। পাইল্‌স্ কথাটা এসেছে ল্যাটিন পাইলা (Pila) শব্দ থেকে। পাইলা শব্দের মানে হচ্ছে স্তূপ বা পিণ্ড।

১নং চিত্র

অর্শ রোগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে মলনালী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। রেক্টাম বা মলভাণ্ডের নীচের অংশ মলনালী। পিউবোরেক্ট্যালিস নামে একটি মাংসপেশী যে স্থানে রেক্টামকে জড়িয়ে আছে, রেক্টামের সেই স্থান থেকে মলনালী সুরু হয়। এটি দেখতে দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা গোলাকার নলের মত। চারদিকে ইণ্টারন্যাল এবং এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশী বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে। ইণ্টারন্যাল স্ফিংক্টার মলনালীর উপরের দুই-

তৃতীয়াংশ এবং এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মলনালীর নীচের দুই-তৃতীয়াংশ ঘিরে থাকে। কাজেই মাঝখানের এক তৃতীয়াংশ স্থানে উভয়ে উভয়ের উপর লেপ্টে থাকে। এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশী আবার তিনভাগে বিভক্ত। তিনটি আংটির মত তিন সেট্ গোলাকার মাংসপেশী। একটি উপরে—তার নাম সাবকিউটেনাস এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার। মাঝেরটির নাম সুপারফিসিয়াল এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার এবং ভিতরেরটির নাম সেই সংযোগ-স্থলে মিউকাস মেমব্রেন মলনালীর মাংসপেশীর সঙ্গে জুড়ে থেকে দড়ির মত একটা জিনিষ তৈরী করে। এটিকে বলা হয় মিউকোসাল লিগামেণ্ট। মিউকোসাল লিগামেণ্ট অনেকটা সীমানার কাজ করে। এর উপরের দিকে মিউকাস মেমব্রেনের নীচে উর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা এবং নীচের দিকে নিম্ন হেমোরয়েড শিরা কুণ্ডলী তৈরী করে। এই দুটি শিরা মলনালী থেকে দূষিত রক্ত নিয়ে যায়।
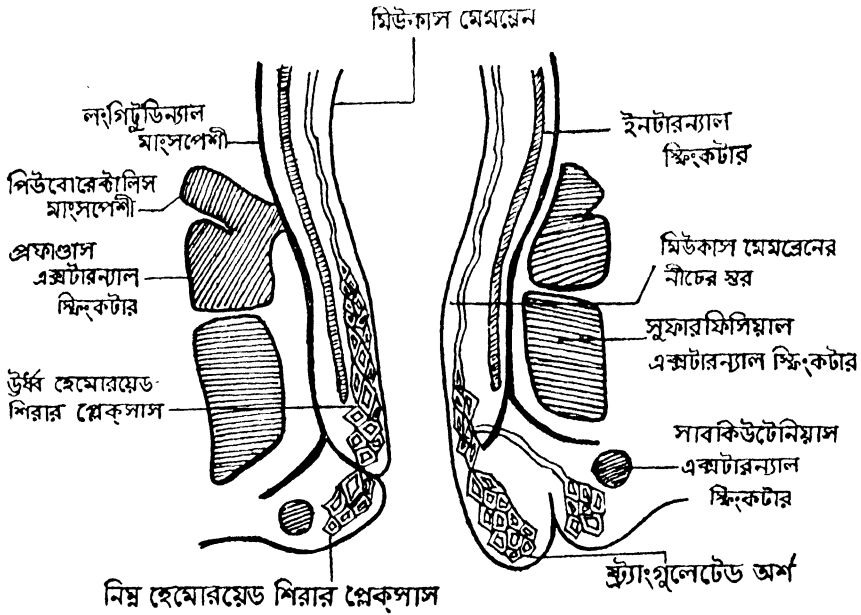
২নং চিত্র

প্রফাণ্ডাস এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার। এছাড়া নীচের দিকে আর একটি মাংসপেশী থাকে, তার নাম করুগেটর কিউটিস এনাই। রেক্টামের লঞ্জিচুডিন্যাল মাংসপেশী স্ফিংটার মাংসপেশীর সঙ্গে খুব শক্তভাবে আট্কে থাকে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মলনালীর অভ্যন্তরভাগের দেয়ালের সর্বোচ্চ স্থান থেকে মাঝখান পর্যন্ত কলাম্নার এপিথেলিয়াম এবং পরে, অর্থাৎ মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত ষ্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম তন্তুর দিকে ঢাকা থাকে। ঠিক যে জায়গা থেকে ষ্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম সুরু হয়েছে,

আগেই বলা হয়েছে যে. মিউকোসাল লিগামেণ্টের উপরের দিকে মিউকাস মেমব্রেনের নীচে উর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা থাকে। এখানে এই শিরার নানা শাখা-প্রশাখাও থাকে। কোন কারণে যদি এই শিরার শাখা-প্রশাখা কুঁচ্কে যায় তাহলে একটি জালক কুণ্ডলী বা প্লেক্সাস সৃষ্টি করে। এটিকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ জালক কুণ্ডলী বা ইনটারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাস। আর মলনালীর নীচের দিকে চামড়ার নীচে নিম্ন হেমোরয়েড শিরাও একই কারণে একটি প্লেক্সাস তৈরী করে। এটিকে বলা হয় এক্সটারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাস (২নং চিত্র

দ্রষ্টব্য)। মিউকাস মেমব্রেনের নীচ দিয়ে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে চলতে থাকে এবং নিম্ন মেসেনটেরিক নামে এক শিরায় সংযুক্ত হয়। এই মেসেনটেরিক শিরা আবার স্প্লেনিক শিরা নামে একটি শিরাতে গিয়ে যুক্ত হয়। পরিশেষে স্প্লেনিক শিরা যকৃতের পোর্ট্যাল শিরাতে গিয়ে মিলিত হয়। এক শিরা থেকে অন্য শিরাতে রক্ত চলাচলের পথে কোন কপাট (Valve) না থাকাতে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা কুণ্ডলীর সঙ্গে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড ধমনীর একটি শাখা গিয়ে মিলিত হয়। এই স্ফীত অংশটিকে ঘিরে থাকে সংযোজক তন্তু, আর সবটাকে রেক্টামের মিউকাস মেমব্রেন ঢেকে থাকে। এর ফলে সবগুলি মিলে একটা পিণ্ড সৃষ্টি করে। এই পিণ্ডটি-ই হচ্ছে অর্শ। ভেনাস প্লেক্সাস অনুসারে অর্শকে সাধারণভাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(১) বহির্বলি বা এক্সটারন্যাল পাইল্‌স্ এবং
(২) অন্তর্বলি বা ইনটারন্যাল পাইল্‌স্।
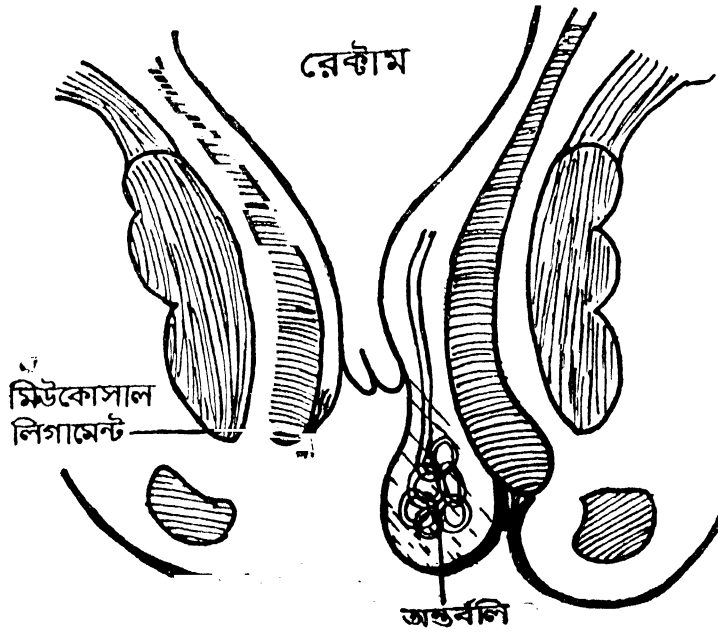
৩নং চিত্র

শিরার সঙ্গে পোর্ট্যাল শিরার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, অর্থাৎ রক্ত সোজাসুজি পোর্ট্যাল শিরাতে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু নিম্ন হেমোরয়েড শিরার রক্ত নানাবিধ শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে (Right atrium) নীত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পোর্ট্যাল শিরা-গোষ্ঠীর যে কোন একটির মধ্যে কোন রকমে কোন বাধা বা চাপের সৃষ্টি হলে, সেই চাপের ধাক্কা সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়ে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাসের উপর। এই চাপের ফলে শিরাগুলি ফুলে উঠে' মলদ্বার দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। এই

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, অর্শ যখন মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে 'বলি' বলা হয়। এর রং ঈষৎ বেগুনী। আর একটু চাপ পেলে শিরার গা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। পোর্ট্যাল শিরার মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি হলে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস ফুলে ওঠে এবং অন্তর্বলির সৃষ্টি করে। (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

নিম্ন হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস ফুলে উঠে' কোন চাপের ফলে ফেটে গেলে, রক্ত শিরার বাইরে এসে জমাট বাঁধে এবং ঈষৎ নীল রঙের রক্ত পিণ্ড তৈরী করে। এই গোলাকার পিণ্ডটিকে বলা হয়

হেমাটোমা। আগেই বলা হয়েছে যে, নিম্ন হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস মলনালীর চামড়ার নীচে থাকে। কাজেই এই শ্রেণীর অর্শকে বলা হয় বহির্বলি। (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

তাহলে অর্শ রোগটি কি, তা বুঝা গেল। একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসা স্বাভাবিক যে, বয়সের সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? সাধারণতঃ মানুষের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে। পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর কারণ সঠিক জানা যায় নি।

অর্শকে অনেকে বংশগত রোগ বলে থাকেন। একথা সর্বাংশে সত্য নয়। মলত্যাগের সময় মলনালীর দু-দিকের দুই কিনারা উল্টে যায়। তার ফলে হেমোরয়েড শিরাতে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক লোকের মলত্যাগের পরে মলনালীর তন্তুর স্থিতিস্থাপকতার দরুণ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু কোন প্রকারে হেমোরয়েড শিরায় রক্ত চলাচল যদি দীর্ঘ সময়ের জন্যে ব্যাহত হয় তাহলে মলনালী এবং রেক্টামের শিরাসমূহ ফুলে ওঠে, আর দড়ির পাকের মত এঁকেবেঁকে যায়। (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

শুধু তাই নয়, স্থিতিস্থাপক তন্তুর নিজস্ব স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। এই অসাড় তন্তু চামড়া এবং মিউকাস মেমব্রেনের রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়াতে রক্তহীন স্থানসমূহ অতি সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রেক্টামের নীচের দিকের মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে উর্ধ্ব হেমোরয়েড ধমনীর শেষ শাখা থাকে, আর এই ধমনীর চারপাশে থাকে পাত্‌লা দেয়ালবিশিষ্ট কপাটহীন উর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস। রক্ত চলাচল বন্ধ হলে এগুলি ফুলে ওঠে এবং মুখ্য অর্শ (Primary Piles) সৃষ্টি করে। উর্ধ্ব হেমোরয়েড ধমনী দক্ষিণ এবং বাম—এই দুই অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ শাখাটি আবার দুটি উপশাখায় বিভক্ত। হেমোরয়েড ধমনীর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হবার জন্যে মুখ্য অর্শ তিনটি পৃথক পিণ্ডে (বলি) বিভক্ত হয়ে পড়ে। রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করে তখন তিনটি পিণ্ড এক হয়ে যায়। একে বলে গৌণ অর্শ বা সেকেণ্ডারী পাইল্‌স্‌।

উর্ধ্বে হেমোরয়েড শিরার রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হলে অর্শ রোগ হয়, তা জানা গেল। এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, কোন্ কোন্ অবস্থায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে? বহু গবেষণার

৪নং চিত্র

পর কোন্ অবস্থায় কাদের অর্শ রোগ হয় তা জানা গেছে।

(১) পুরনো কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ (Chronic Constipation) থাকলে আবদ্ধ কঠিন মল রেক্টামের দেয়ালে চাপ দেয়।

(২) কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়াও যাদের খুব চাপ দিয়ে মলত্যাগ করা অভ্যাস।

(৩) প্রায়ই লবণ-জলের রেচক (Purgative) দিয়ে মলত্যাগ করলে।

(৪) শীতপ্রধান দেশে যাদের খুব শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়, সহজেই তাদের

(৯) প্রষ্টেট গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি পেলে (পুরুষদের ক্ষেত্রে), কোলাইটিস (বৃহদন্ত্রের একটি অংশের রোগ) অথবা রেক্টামে কর্কট রোগ হলে।

(১০) পেটে টিউমার হলে অথবা যকৃৎ-এর কোন রোগে পোর্ট্যাল শিরাতে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে।

(১১) হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী, অর্থাৎ মায়োকার্ডিয়াম-এর কোন রোগ থাকলে।

এই সব কারণে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরাতে রক্ত-চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়।
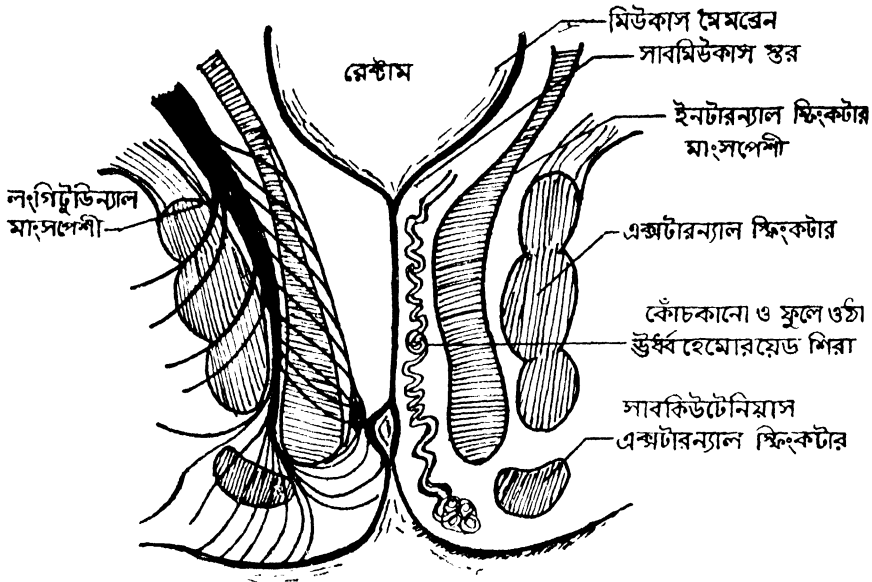
৫নং চিত্র

পিপাসা পায়, আর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে যারা বেশী মদ খায়।

(৫) প্রত্যহ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করা যাদের অভ্যাস।

(৬) যারা অধিক পরিমাণে মদ খায়।

(৭) অত্যধিক মেদ বৃদ্ধি হলে যকৃৎ-এর পোর্ট্যাল শিরায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়।

(৮) পুরনো ব্রঙ্কাইটিস রোগ থাকলে কাশির সময় তলপেটে বারে বারে চাপ পড়ে।

আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে অর্শের 'বলি' বেশ নরম লাগে। মলত্যাগের সময় মলের চাপে প্রথমে শ্লেষ্মার মত চট্‌চটে পদার্থ নির্গত হয়; তারপরে রক্ত পড়া সুরু হয়। মলত্যাগের সময় কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে তলপেটে স্বভাবতঃই বেশী চাপ দিতে হয়। ক্রমাগত চাপের ফলে মিউকাস মেমব্রেন সমেত অর্শ নীচের দিকে ঠেলে আসে। এই সময় মলনালীর স্ফিংক্টার এনাই মাংসপেশী ঐ পিণ্ডটিকে (অর্শ) নিজের দেহের মধ্যে আটকে রাখে। আমরা

হাতের চেটো দিয়ে যেমন ভাবে বল আঁকড়ে ধরি—এটিও অনেকাংশে সেইরূপ। এর ফলে ঐ স্থানে রক্ত-সঞ্চালন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ রক্ত জমাট বাঁধে। এইরূপ অর্শকে বলা হয় রুদ্ধ অর্শ বা ষ্ট্র্যাংগুলেটেড পাইল্‌স্। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
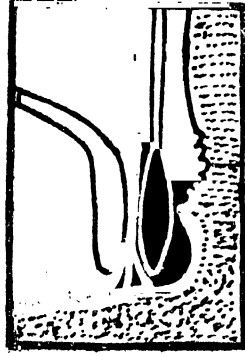
দীর্ঘ দিনের কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে মলত্যাগের সময় ক্রমাগত তলপেটে চাপ দেবার দরুণ মলনালীর মিউকাস মেমব্রেনের নীচেকার তন্তু স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। তার জন্যে মলত্যাগের পর 'বলি' ভিতরের দিকে যায় না। মিউকোসাল লিগামেণ্ট দুর্বল হতে থাকে; তাছাড়া মলনালীর মাংসপেশীর

৬নং চিত্র

রোগের প্রথম অবস্থায় অন্তর্বলি আয়তনে বেড়ে গিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে আসে না। তখন তাদের বলা হয় প্রথম স্তরের অর্শ।

যে মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে 'বলি' ঢাকা থাকে, সেটি খুব পাত্‌লা এবং সহজেই ছিন্ন হয়ে যায়।

মধ্যে কোন কারণে আপনা থেকেই খেঁচুনী সুরু হতে থাকে। এই খেঁচুনির জন্যেও অন্তর্বলি ভিতরের দিকে না গিয়ে মলদ্বার দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। তবে যতদিন পর্যন্ত মিউকাস মেমব্রেনের নীচেকার তন্তু, বিশেষভাবে
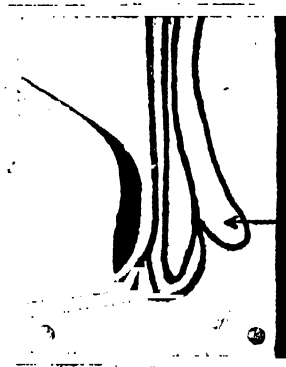
৭নং চিত্র

মলত্যাগের সময় এই পাত্‌লা এবং ভঙ্গুর মিউকাস মেমব্রেন কুঁচকে গিয়ে ছিঁড়ে যায়; ফলে রক্তপাত হয়। প্রথম স্তরে মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হওয়াটাই রোগের একমাত্র উপসর্গ। (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মিউকোসাল লিগামেণ্ট, কর্মক্ষম থাকে ততদিন পর্যন্ত মলত্যাগের পর 'বলি' ভিতরের দিকে নিজ থেকেই চলে যায়। এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'বলি' ভিতরে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে

ফেলে। এটি হচ্ছে অন্তর্বলির দ্বিতীয় স্তর। (৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

'বলি' ক্রমাগত বাইরের দিকে ঠেলে আসবার জন্যে চাপ দিতে থাকায় মিউকোসাল লিগামেণ্ট ধীরে ধীরে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন মলত্যাগের পর 'বলি' নিজ থেকে ভিতরে যায় না এবং আঙ্গুল দিয়ে জোর করে ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। মিউকোসাল লিগামেণ্ট অসাড় হলে মিউকাস মেমব্রেন ও চামড়ার নীচের স্তর, উর্ধ্ব এবং নিম্ন হেমোরয়েড শিরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রোগী এই সময় সর্বদাই মলদ্বারের কাছে তাছাড়া মনে হয়, যন্ত্রণার উৎসটি কাঁপছে। যখন 'বলির' মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে তখনই এ-রকমের অনুভূতি হয়। মলদ্বার দিয়ে গাঢ় রক্তবর্ণ এক থেকে তিনটি পিণ্ড বেরিয়ে আসে।

বহির্বলির উপসর্গও মোটামুটি একই রকমের। তবে এ-ক্ষেত্রে মলদ্বারের চামড়ার নীচে একটু শক্ত পিণ্ড অনুভব করা যায়। এই পিণ্ডকে আবার হাত দিয়ে এদিক-ওদিক সরানো যেতে পারে। 'বলির' মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধলেই এ-রকম হয়। তাছাড়া হঠাৎ মলনালীতে যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে এবং মলত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়। একে হেমাটোমা বলা হয়ে থাকে। (৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
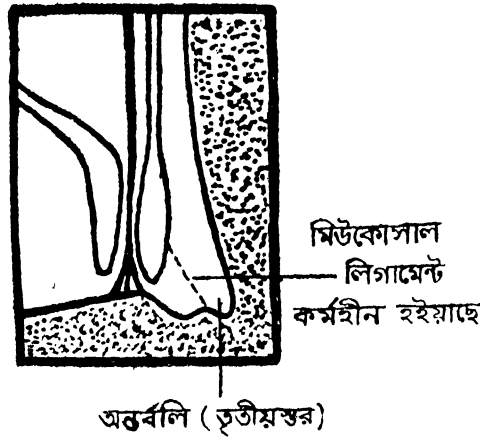
৮নং চিত্র

একটা পিণ্ডাকৃতি বস্তুর উপস্থিতি অনুভব করে। বিশ্রী রকমের যন্ত্রণা তো থাকেই, তাছাড়া ফুলে-ওঠা জায়গা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকায় আরও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি হলো রোগের তৃতীয় স্তর। (৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই 'বলিকে' অনেকে ইনটারো-এক্সটারন্যাল পাইল্‌স্ বলে থাকেন।

প্রতিদিন রক্ত ক্ষরণের ফলে রোগী রক্তহীন হয়ে পড়ে। মলদ্বারের কাছে সব সময় যন্ত্রণাবোধ হয় এবং শ্লেষ্মা নির্গত হতে থাকে। যন্ত্রণা এক সঙ্গে চারদিন একটানাও চলতে পারে।

ষ্ট্র্যাংগুলেটেড পাইল্‌স্ বা রুদ্ধ অর্শ রোগে মলদ্বারে কালো, ক্ষতবিক্ষত দুর্গন্ধযুক্ত বড় বড় পিণ্ড অনুভব করা যায় এবং অস্বাভাবিক যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে।

এতক্ষণ নানা ধরণের অর্শ রোগ, তার 'বলি' ও উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। এবার চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু বলা যাক। ত্রিবিধ উপায়ে এর চিকিৎসা করা চলে। রোগের অবস্থা অনুসারে চিকিৎসার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(১) যন্ত্রণা-নিরোধক ব্যবস্থা—অর্শের প্রথম অবস্থায় অথবা ষ্ট্র্যাংগুলেটেড অর্শ রোগে এই

চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মুখ্য অর্শ রোগে লবণ-জলের রেচক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নিয়মিত মল নির্গমনের জন্যে রোগীকে লিকুইড প্যারাফিন দিতে হয়। তাছাড়া রোগীকে হাল্‌কা খাবার এবং বেশী করে তরল পানীয় (দুধ, ডাবের জল, বার্লির জল ইত্যাদি) এবং ফলের রস দেওয়া দরকার। অ্যাড্রিনালিন, হ্যামামেলিস এবং জলপাই-এর তেল দিয়ে ক্রীম তৈরী করে আঙ্গুল দিয়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ক্রীম রাত্রে এবং মলত্যাগের আগে রেক্টামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে ষ্ট্র্যাংগুলেটেড অর্শের 'বলি' ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে বিশেষ ধরণের সিরিঞ্জের সাহায্যে মলনালীর মিউ-কাস মেমব্রেনের নীচে ইনজেকৃশন করা হয়।

মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ ইনজেকৃশন করা হলে রোগীর মাথাঘোরা, অস্বস্তিবোধ ইত্যাদি উপসর্গ আসতে পারে। তবে সেটা অবশ্য সাময়িক। যদি শিরার মধ্যে ইনজেকৃশন দেওয়া হয়, তাহলে রোগীর উপর-পেটে ব্যথা হয়, যকৃৎ-এর আয়তন বাড়ে এবং পাণ্ডু রোগও দেখা দিতে পারে।

(৩) অস্ত্র চিকিৎসা—অর্শ রোগ জটিল আকার নিলে অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন উপায় নেই। অস্ত্রোপচারের পরে প্রথম কয়েক দিন বেশ যন্ত্রণা হতে পারে। বয়স্ক লোকদের ঐ সময়ে সাময়িক-
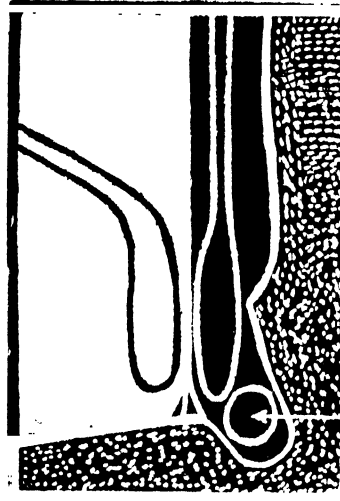
৯নং চিত্র

সফল না হলে মলদ্বারের চারপাশে ওষুধ দিয়ে অবশ করে যন্ত্রের সাহায্যে মলনালীর স্ফিংক্টার মাংস-পেশীকে একটু টেনে বলিটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

(২) ইনজেকৃশন প্রয়োগ—অন্তর্বলির প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে রোগ যখন সম্পূর্ণ জটিল হয়ে পড়ে নি, তখন এই চিকিৎসার ফলে রোগ উপশমের সম্ভাবনা থাকে। অন্তর্বলির প্রথম স্তরে, অর্থাৎ যখন রক্তক্ষরণ একমাত্র উপসর্গ, তখন ইনজেকৃশন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। তবে তৃতীয় স্তরেও যে উপকার পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আরোগ্য ক্ষণস্থায়ী। কয়েক রকমের তরল ওষুধ

ভাবে প্রস্রাব বন্ধ হতে পারে।

অর্শ রোগ যে বিশ্রী এবং যন্ত্রণাদায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রোগীর অজ্ঞাতসারে রক্তপড়া সুরু হয়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দেয় এবং মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে। মলত্যাগের সময় গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তাই মলত্যাগের কথা ভাবতেই অর্শ-রোগী কেঁপে ওঠে।

কাজেই কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত লোকের মলত্যাগের সময় রক্ত পড়লে তখনই সতর্ক হওয়া উচিত এবং উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য।

সূর্য যদি আর না থাকে

শ্রীশুকদেব দত্ত

প্রায় দু-শ' কোটি বছর ধরে আমাদের এই পৃথিবী অবিরাম গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সূর্যের চার দিকে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এভাবেই কখন যে অজ্ঞাতসারে সূর্য আমাদের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে পরিচিত হয়ে গেছে, তা আমরা খেয়ালই করি নি। সে এখন আমাদের নিকট আত্মীয়। তাই তার দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেও আমাদের কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কিন্তু তা সত্বেও যদি আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সূর্যকে একবার দৃষ্টিপথে আনি, তাহলে ব্যাপারটা খুব মন্দ হয় না।

পৃথিবীর প্রতিটি জীবই তার প্রাণস্পন্দনের জন্যে সূর্যের কাছে ঋণী। কল্পনা করুন, এই মুহূর্তে কোন এক মায়াবী—সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে গড়ে তুললো এক আবরণ। সেই আবরণ সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত শক্তির যে অংশ পৃথিবীর দিকে আসছে তাকে ফিরিয়ে দিল। তখন পৃথিবী হয়ে দাঁড়াবে কোন কোন প্রতিবেশী গ্রহের মতই হিমশীতল একটা জড়বস্তু।

সূর্য থেকে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার পরিমাণ হলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮×১০^{৩৩} আর্গ—আর এই শক্তির দু-শ' কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র এসে পড়ে পৃথিবীর উপর। পৃথিবী এই অফুরন্ত শক্তিকে দু-ভাবে সঞ্চয় করছে।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত দেখাতে গেলে, সর্বপ্রথম মনে আসে কয়লার কথা। সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে বড় হয় উদ্ভিদ। কাল-ক্রমে তার মৃত্যু হয়, আর কোটি কোটি বছর ধরে তা রূপান্তরিত হয় খনিজ তেল আর কয়লায়।

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হলো নদীর জলপ্রবাহে সঞ্চিত শক্তি, যার জন্যে সূর্যই পরোক্ষভাবে দায়ী।

কিন্তু সূর্যের এই অকৃপণ দান তো চিরকালের নয়! এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন এই শক্তির উৎস ফুরিয়ে যাবে। সূর্য তার শক্তির সর্বশেষ বিন্দুটি বিতরণ করে দিয়ে মহাজগতের অসংখ্য মৃত তারকার সংখ্যা আর একটি বাড়াবে মাত্র। তার বিশ্বস্ত গ্রহগুলি ঘুরবে আগের মতই। অন্য গ্রহের কথা জানি না, তবে এই পৃথিবী তো তখন মানুষের বাসের অযোগ্য! অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ তার অনেক আগেই নিশ্চয় মহাজগতের অন্য কোন গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করেছে! সেখানে হয়তো নতুন কোন সূর্য অপেক্ষা করছে তার প্রাণভরা শক্তি নিয়ে।

সে দিন সেই অজানা গ্রহ থেকে তখনকার মানুষ নিশ্চয় তাকাবে, তার ফেলে-আসা সৌর-জগতের দিকে। মৃত সূর্য আর সেই সৌরজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা তাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না। তখনকার বৈজ্ঞানিকের কাছে হয়তো এ-যুগের আধুনিকতম যন্ত্রপাতিও শিশুর ক্রীড়াসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। কিন্তু আমাদের মনে যদি এই কৌতূহল জাগে, তবে তা কি মেটানো অসম্ভব?

মৃত সূর্য সম্বন্ধে ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের এই পৃথিবীর কথা। সচরাচর আমরা ভেবে নিই যে, সূর্যের অবস্থা তখন হবে পৃথিবীর মতই। ভিতরে থাকবে গলিত লাভা, আর বাইরে একটা গ্র্যানিট বা ব্যাসল্টের আবরণ এবং আয়তনে হবে অনেক বড়। কিন্তু আধুনিক

বৈজ্ঞানিকেরা যা বলেন, তা এর চেয়ে একটু অন্য রকমের।

কিন্তু কেন? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে হবে। মনে করা যাক, একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে ইটের পর ইট সাজিয়ে। একতলা, দোতলা, তিনতলা – শেষ নেই আর। নীচের ইটের উপর চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—সর্বশেষে চাপের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে, সেগুলি ভেঙ্গে এপাশে-ওপাশে সরে যাবে। সাধারণ জ্ঞান থেকেই এর কারণ বলা যায়। প্রত্যেক পদার্থেরই চাপ সহ্য করবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতির ক্ষেত্রেও এর অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান।

মধ্যযুগের নাবিকদের মধ্যে মৎস্য-কন্যা বা মারমেডের কাহিনী ছিল খুবই প্রচলিত। এমন কি অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়, এই মৎস্য-কন্যাদের সম্বন্ধে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান অবশ্য এ-রকম কোন জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মৎস্য-কন্যাদের কল্পনার পিছনে যে রহস্য রয়েছে, তা অবশ্য উন্মোচিত হয়েছে। ম্যানাটি এবং ডুগং শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণীরা যখন সন্তানকে স্তন্যপান করায় তখন কারো দৃষ্টিগোচর হলে নারী বলে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রাণীদের বাস সচরাচর গভীর জলেই। তারা গভীর জলের তলায় জলের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জলের বাইরে এসে পড়লে নিজেদের দেহের চাপে তাদের আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যায় এবং তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আর এই রকমের ব্যাপারই দেখা করা যায়, বড় নক্ষত্র বা গ্রহের বেলায়; তবে চাপটা সেক্ষেত্রে আসে সবদিক থেকে সমানভাবে। সেই প্রচণ্ড চাপে কেন্দ্রস্থিত পরমাণুর ইলেকট্রনের আবরণ ভেঙ্গে যায় সহজ-ভঙ্গুর জিনিষের মতই। একটার ইলেকট্রন প্রবেশ করে অন্য আর একটার মধ্যে। কোন কেন্দ্রেরই নিজস্ব ইলেকট্রন বলে কিছু থাকে না। আভ্যন্তরীণ শূন্য স্থান এসে পূর্ণ করে অন্য পরমাণুর ইলেকট্রন। একটা পরমাণুর মধ্যে যে পরিমাণ শূন্য স্থান থাকে তা কল্পনা করা হয়তো বেশ একটু কঠিন। এই পৃথিবীর মোট পরমাণুর সংখ্যা হলো কল্পনাতীত। এদের আভ্যন্তরীণ শূন্য স্থান (Intra-Atomic Space) না থাকলে গোটা পৃথিবীটাকে একটা ছোট বস্তায় ভরে ফেলা যেত। অবশ্য পৃথিবীর ভরের কোন তারতম্যই এতে হতো না।

ঠিক এই কারণেই নক্ষত্রের কেন্দ্রের চাপ সহনশীলতার বেশী হলেই নক্ষত্রটি ছোট হয়ে যায়, কেন্দ্রকের পরমাণু চূর্ণনের ফলে। অবশ্য এই পরীক্ষার বা প্রক্রিয়ারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। পরমাণু চূর্ণনের ফলে নক্ষত্রের আয়তন কতটা হ্রাস পাবে, তা সম্পূর্ণভাবে নক্ষত্রের ব্যাসের উপর নির্ভর করে।

এখন দেখা যাক, পরমাণু চূর্ণনের সর্বনিম্নচাপের পরিমাণ কত? ভারতীয় বিজ্ঞানী কোঠারী গাণিতিক করে দেখালেন যে, এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় দেড় হাজার লক্ষ পাউণ্ড। পরমাণুর সহনশীলতার পরিসমাপ্তি এখানেই। পৃথিবীর কেন্দ্র-চাপের পরিমাণ মাত্র দু-শ' লক্ষ পাউণ্ড। নিকটবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে গেলে একমাত্র বৃহস্পতির কেন্দ্রে এই চাপ বর্তমান। এই গ্রহের কেন্দ্রের পরমাণু যদি ইতিমধ্যেই চূর্ণীভূত হয়ে থাকতো, তবে একে অনায়াসে বলা যেতে পারতো—মহাজগতের সর্ববৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। কারণ যে কোন নক্ষত্রের ব্যাস এর চেয়ে অনেক বেশী হলেও তেজস্ক্রিয়তা বিচ্ছুরণের পরিসমাপ্তিতে তার আয়তন হবে বৃহস্পতির চেয়ে ছোট। ক্রমশঃ শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের চাপও বৃদ্ধি পাবে। আর চাপের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করলেই

কেন্দ্রের পরমাণুর যে অবস্থা হবে তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত সূর্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

মৃত তারকার ব্যাস ও ভরের সম্বন্ধ দেখে কাগজেকলমে এক লেখ- চিত্র (Graph) অঙ্কন করলেন আর এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর। এ থেকে প্রতীয়মান হবে—কেন্দ্রের পরমাণুর চূর্ণন সমাপ্ত হওয়ার পরে সূর্যের ব্যাস হবে বৃহস্পতির ব্যাসের এক দশমাংশ মাত্র। কিন্তু এখনকার সূর্যের সঙ্গে তখনকার সূর্যের ভরের তারতম্য প্রায় হবেই না। ফলে গুরুত্বের গড় জলের প্রায় ত্রিশ লক্ষ গুণে দাঁড়াবে; অর্থাৎ কেন্দ্রবস্তুর মাত্র এক ঘনসেন্টিমিটারের ওজন হবে প্রায় ত্রিশ টন। আপাতদৃষ্টিতে এসব অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা এসব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন আরও অনেক ক্ষেত্রের উপর তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর। মৃত নক্ষত্র বিকিরণ-শক্তিশূন্য। অতএব তাদের নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের প্রাণশক্তি প্রায় সমাপ্তির পথে। এরাই হলো বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল মেটাবার সহায়। একটু অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যই এদের বৈশিষ্ট্য। এর দৃষ্টান্তের জন্যে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকের দিকে। প্রায় এক-শ' বছর আগে ক্লার্ক নামে জনৈক জ্যোতির্বিদ আবিষ্কার করেন, এই নক্ষত্রের একটা গ্রহকে। অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর শুভ্রতার জন্যে গ্রহটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁরা বুঝলেন, এই গ্রহের বিকিরণ-শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে তাঁরা সকলেই তাকালেন এই গ্রহের দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই গ্রহের সঙ্গে সূর্যের মিল অপ্রচুর ছিল না। দিনের পর দিন নিরীক্ষণের পর তাঁরা যা দেখলেন, তাথেকে চন্দ্রশেখরের মতামতের কোন পার্থক্যই ছিল না। তাই তাঁরা একবাক্যে মেনে নিলেন সূর্যের কল্পিত ভবিষ্যৎকে।

সঞ্চয়ন

সর্প-দংশনের চিকিৎসা

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, যেখানেই বিষধর সাপের প্রাদুর্ভাব, সেখানেই সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে নানারকম স্থানীয় ও দেশজ চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। তবে সব দেশেই সাপে কামড়ালে প্রথমে যে ব্যবস্থা—করা হয়, সেটা হলো যেখানে কামড়েছে, সেই জায়গার মাংসটুকু তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে ক্ষতের কিছুটা উপরের দিকে খুব কষে একটি দড়ি বেঁধে দেওয়া—বিষদুষ্ট রক্ত যাতে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এটা হলো—সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এর ফলে যাকে সাপে কামড়েছে, তার প্রাণ রক্ষা পেলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাকে বিকলাঙ্গ হয়ে সারাটা জীবন কাটাতে হয়। সব সময়ে যে প্রাণ রক্ষা পাবেই, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সাপে কামড়ালে বেশীর ভাগ লোকই এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, বিমূঢ় অবস্থায় ঠিকমত ব্যবস্থা করতে দেরী করে ফেলে; কাজেই সুফল পাওয়া যায় না।

সাপে-কাটা রোগীর ক্লিনিক্যাল বা ভৈষজ্যসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে আজকাল নানা দেশেই

রীতিমত গবেষণা চলছে। এই গবেষণার প্রধান দিকগুলি হলো—বিভিন্ন জাতের বিষধর সাপের জীবন বৃত্তান্ত অনুশীলন করা, বিভিন্ন জাতের সাপের বিষ নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা, সেই বিষ থেকেই তার প্রতিবিষ বা অ্যান্টিভেনম আবিষ্কারের চেষ্টা করা এবং সেই প্রতিবিষকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা নিখুঁত করে তোলা।

সাপের বিষ সম্পর্কে এ-সব গবেষণা আর সর্প-দংশনের চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দানও রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আজেরবাইজান আর উজবেকিস্তান—এই অঙ্গরাজ্য দুটিতে এবং ককেশাস অঞ্চলে বেশ কয়েক জাতের বিষধর সাপ দেখা যায়। আজেরবাইজানের 'মৃত্যু-উপত্যকা' নামে পরিচিত জায়গাটিতে একরকম সাংঘাতিক বিষধর সাপের বসবাস। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সাপের নাম ভাইপেরা লিবেটিনা। এরা ভারতীয় গোখরা সাপের একই পরিবারভুক্ত। বছর দশেক আগে পর্যন্তও মৃত্যু-উপত্যকায় এই সাপের কামড়ে প্রতি বছর গড়পড়তা ২৫ জন মানুষ আর শতাধিক ঘোড়া-গরু-ভেড়া মারা পড়তো। ককেশাসেও সর্প-দংশনে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় অনুরূপ। কিন্তু সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় যে নতুন প্রতিবিষ বা অ্যান্টি-স্নেকভেনম সিরাম আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কল্যাণে এই মৃত্যুর হার ইদানীং প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে।

গত বছরে পৃথিবীর নানা দেশের মোট ৭১টি সর্পবিষ-গবেষণাগারে এই সোভিয়েট সিরামের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ৭০টি গবেষণাগার থেকেই যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে যে, এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্পবিষের ক্রিয়া-প্রতিরোধী সিরামগুলির মধ্যে এই সোভিয়েট সিরামই সবচেয়ে কার্যকরী। এর জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া সবচেয়ে নিখুঁত এবং রোগীর দেহে এর রোগোত্তর প্রতিক্রিয়া (আফ্‌টার এফেক্টস্‌) হয় সবচেয়ে কম।

এই সিরামটি প্রাথমিকভাবে আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৭ সালে। বাকুর জীবাণু-বিজ্ঞান (মাইক্রো-বায়োলজি) সংক্রান্ত গবেষণা-সংস্থার গবেষক ডাক্তার এম. এলিমুইস্কি এবং প্রায় একই সময়ে—কিন্তু আলাদাভাবে গবেষণার ফলে—তাশখেন্দের জীবাণু-বিজ্ঞান গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের গবেষক এম. ম্যাক্‌সিমোভিচ এই সিরামটি প্রাথমিক অবস্থায় পেতে সমর্থ হন। তারপর থেকে দীর্ঘ কুড়ি বছর এঁরা দুজনে এবং এঁদের ছাত্রছাত্রী সমেত বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানীর গবেষণা আর ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এই সিরামটি তার বর্তমান উন্নত ও নিখুঁত পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। ১৯৫৭ সাল থেকে গোটা সোভিয়েট দেশ জুড়ে সব হাসপাতালে—বিশেষ করে সর্পবহুল অঞ্চল-গুলির হাসপাতালে আর চিকিৎসালয়ে--ব্যাপকভাবে এই সিরাম ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা, মানুষ আর জন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্য সব রোগের সিরাম যেভাবে তৈরী করা হয়, এই সর্পবিষ-প্রতিষেধক সিরামও তৈরী করা হয় সেভাবেই। সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল একটি ঘোড়ার দেহে অতি সামান্য মাত্রায় (৩ থেকে ৫ মিনিম) সাপের বিষ প্রয়োজনীয় পরিমাণে ফর্ম্যালিনের সঙ্গে মিশিয়ে পেশীর মধ্যে ইনজেক্‌শন করে দেওয়া হয়। এই অতি সামান্য মাত্রার বিষে ঘোড়াটা মরে না, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার দেহে এই বিষের প্রতিরোধ-শক্তিবৃদ্ধিকারী অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। তারপর বারকতক কিছুদিন পর পর বিষের মাত্রা বাড়িয়ে ইনজেক্‌শন দেওয়া হয় এবং ঘোড়াটির প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তে ওই অ্যান্টিবডির পরিমাণও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটির রক্তে এত বেশী

অ্যাণ্টিবডি সৃষ্টি হয় যে, মারাত্মক মাত্রায় (লিথেল ডোজ) বিষ প্রয়োগ করবার পরেও ঘোড়াটির কোন ক্ষতি হয় না। এই অবস্থায় ঘোড়াটির দেহ থেকে কিছু রক্ত বের করে নিয়ে তাথেকেই এই সিরাম বা রক্তরস তৈরী করা হয়।

সাপে-কাটা রোগীকে—বিষক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে—দশ থেকে চল্লিশ ঘনসেণ্টিমিটার পর্যন্ত সিরাম ইনজেক্শন দেওয়া হয় সাধারণ সিরিঞ্জের সাহায্যে। গ্রীষ্মের শেষ দিকে যখন সাপের দাঁতে বিষের মাত্রা কমে যায়, তখন কাউকে সাপে কামড়ালে তাকে সুস্থ করে তোলবার পক্ষে একটা ইনজেক্শনই যথেষ্ট। গুরুতর বিষক্রিয়ার বেলায় প্রথম দু-তিন দিনে রোজ একাধিক ইনজেক্শন দেবার দরকার হতে পারে। এ-পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রোগীকে সর্বোচ্চ কুড়ি দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

জোনাকীর আলো

গ্রীষ্মের দিবাবসানে অন্ধকারে যখন জোনাকীর আলো জ্বলে, তখন তাদের ধরবার জন্যে ধাওয়া করে নি, এ-রকম শিশু খুব কমই আছে। এই আলোর পিছনে ছুটে-চলা বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। গ্রীস ও রোমের অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে দাস-বালকেরা জোনাকী ধরবার কাজে বেরিয়েছে, এদের আলোয় তৈরী হবে সাম্রাজ্ঞীদের হাতের কাঁকন, আলোর চুম্কীতে রচিত হবে তাদের কবরী। তারপরে দেখা যায়, রেড-ইণ্ডিয়ানরা জোনাকীকে উর্বরতার দেবতা বলে পূজা করছে। ওদিকে জাপানী শিশুদের দেখা যায়, তারা রাজপ্রাসাদের সামনে হাজার হাজার জোনাকী উড়িয়ে দিচ্ছে। জাপানী রীতি অনুসারে এ হচ্ছে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকার বালটিমোর নামে একটি স্থানের স্কুলের ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে জ্যান্ত জোনাকী কুড়িয়ে আনে। ১৯৪৮ সাল থেকেই এই অভিযান চলছে। তবে তা কোন সাম্রাজ্ঞীর মনোরঞ্জন বা সম্রাটের তুষ্টিবিধানের জন্যে নয়। ছেলেমেয়েরা এ-সব জ্যান্ত জোনাকী ম্যাক-কলম-প্র্যাট ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম ডি ম্যাকেলরয়ের জন্যে কুড়িয়ে আনে। তারা ডাঃ ম্যাকেলরয়ের কাছে সেগুলিকে বিক্রী করে। যে সব পোকামাকড় সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়ে গবেষণা হয়। গত দশ বছরের মধ্যে তিনি লক্ষ লক্ষ জোনাকী ক্রয় করেছেন।

একমাত্র গত বছরেই এই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চার লক্ষেরও বেশী জোনাকী সরবরাহ করেছে। এই বছরে তাঁর আরও অনেক বেশী প্রয়োজন। আপনি হয়তো ভাবছেন, জোনাকী সওদা করে যদি দু-পয়সা পাওয়া যায় তবে আমিই বা কেন এই কাজে লেগে যাই না! খবরদার, এমন কাজে কখনও হাত দিতে যাবেন না, কারণ তাঁর প্রয়োজন, তাজা জ্যান্ত জোনাকীর।

জোনাকীর পিছনের ছোট্ট জায়গাটুকু কেন বা জ্বলে, কিভাবে জ্বলে—এই প্রশ্ন অনেকের মত বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। ডাঃ ম্যাকেলরয় বেশ কয়েক বছর ধরেই জোনাকীর আলো নিয়ে গবেষণা করছেন।

প্রথমেই তিনি ঐ লক্ষ লক্ষ জোনাকীর দেহের ঐ জ্বলজ্বলে অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করে শুকিয়ে নেন এবং মস্ত একটি হামানদিস্তায় বেশ করে গুঁড়া করেন। তারপর অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণা চলে। এর ফলেই জানা গেছে, জোনাকীর দেহে রয়েছে লুসিফেরিন ও লুসিফেরাস নামে দুটি রাসায়নিক পদার্থ।

প্রথমতঃ এ দুটিকে বিশুদ্ধ আকারে পৃথক করা হলো। তারপর দেখা গেল, ঐ দুটিকে একত্র করা মাত্র আলো জ্বলে ওঠে।

ডাঃ ম্যাকেলরয় এতে এই দুটি ছাড়া আরও কোন রাসায়নিক দ্রব্য আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট বা এ-টি পি নামে আর একটি রাসায়নিক পদার্থ এবং অক্সিজেন ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামও যে এতে রয়েছে তাও আবিষ্কৃত হলো। তারপর এদের নানা পরিমাণে ও নানাভাবে মিশ্রিত করে দেখা গেছে যে, এ-টি-পি'ই এই আলোক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

জোনাকীর আলো একবার জ্বলে আবার নেবে। এই জ্বলা আর নেবার পিছনে রয়েছে জোনাকীর স্নায়ুমণ্ডলী। স্নায়ুমণ্ডলীতে বেগ সঞ্চারিত হলেই ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের হয় ও পৃথক হয়ে পড়ে এবং তাতেই আলো জ্বলে। দ্বিতীয় বারের বেগে ঐ সব দ্রব্য আবার একত্রিত হয়ে যায়; ফলে সেই আলোকও নিবে যায়।

বিজ্ঞানীদের কাছে কেবল জ্ঞানলাভের এই আনন্দটুকুই যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানকে তাঁরা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। ডাঃ ম্যাকেলরয় এরই সন্ধানে বেরিয়েছেন। জোনাকী নিয়ে তাঁর নিরন্তর গবেষণার ফলে তিনি আমাদের দেহে সঞ্চিত শক্তি আমাদের ইচ্ছামাত্র কি করে পাই, সে সম্পর্কেও খানিকটা সন্ধান করতে পেরেছেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, মানুষ অথবা পশুর দৈহিক ক্রিয়া যে শক্তিতে চালিত হয়, জোনাকীর আলোর পিছনেও সেই শক্তিই রয়েছে।

এ-টি-পি জোনাকীর আলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু এই এ-টি-পি'র রাসায়নিক শক্তি মানবদেহে অন্য শক্তিতে কিভাবে রূপান্তরিত হয় এবং কি প্রক্রিয়ায় মানবদেহে এই শক্তি প্রকাশ পায়—সেই কথাই বিজ্ঞানীরা জানতে চাইছেন।

এই প্রশ্নের উত্তর দানের যে চেষ্টা হচ্ছে, তাতে বালটিমোরের বালক-বালিকাদেরও একটি অংশ আছে—তারা এখনও জোনাকী কুড়িয়ে আনছে।

সস্তায় ইট তৈরীর সরল যন্ত্র

বিশ্বের উন্নতিশীল দেশসমূহের পল্লী অঞ্চল-গুলিতে মনোরম বাসগৃহ, স্কুল ভবন ও অন্যান্য জনসেবা বা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহের যে নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে, তা পূরণের জন্যে সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আগ্রহের আদৌ অভাব নেই। কিন্তু গৃহ নির্মাণের প্রধান উপকরণ ইট প্রভৃতি তৈরীর ব্যাপারে যে বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, তা তাদের নেই। তাই সারা বিশ্বব্যাপী একটা সুসংবদ্ধ চেষ্টা চলছে, যাতে এমন একটা কোন সরল যন্ত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, যা দিয়ে তারা নিজেরাই ইট প্রভৃতি গৃহ নির্মাণোপকরণ সহজেই তৈরী করতে পারে।

সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার রাজধানী রিচমণ্ডের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় এইরূপ একটি ক্ষুদ্র হস্তচালিত যন্ত্র নির্মিত হচ্ছে। এই যন্ত্রটির নাম সিনভা-র‍্যাম ব্লক প্রেস। দু-জন লোক একযোগে কাজ করলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনটি কামরা-বিশিষ্ট একটি বাড়ী তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় ইট ও টালি পাঁচ থেকে আট দিনের মধ্যেই তৈরী করতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইট ও টালি তৈরীর কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো মাটি, জল আর অল্প পরিমাণ চুন অথবা সিমেণ্ট। স্থানীয় অবস্থা-ভেদে চুন বা সিমেণ্টের পরিমাণ কম বা বেশী হবে।

এটি কোন বৃহদাকার যন্ত্র নয়—একটি ক্ষুদ্র হস্ত-চালিত যন্ত্র মাত্র। স্বল্প সংস্থান ও স্বল্প আয়বিশিষ্ট

পরিবারের লোকেরা নিজেরাই এই যন্ত্রের সাহায্যে তাদের বাসগৃহের মেঝে ও দেয়ালের জন্যে প্রয়োজনীয় ইট, টালি প্রভৃতি তৈরী করে নিতে পারে। ইতিমধ্যেই বহু দেশে এর উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। স্কুল ভবন এবং জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রয়োজনীয় বাড়ীগুলি নির্মাণের জন্যে পল্লী সমবায়গুলিও এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারে।

সিংহল ও পানামার স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই তাদের ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছে, আর তাদের সংসারের পুরুষেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে অথবা

পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনায় যাতে এই যন্ত্রটির সাহায্য নেওয়া যায়, সেই জন্যে মার্কিন সমবায় সাহায্য প্রতিষ্ঠান (CARE) যন্ত্রটি চালিয়ে হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন। লায়ন্স্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্লাব ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানাদির অর্থানুকূল্যে ও আমেরিকানদের ব্যক্তিগত দানের সাহায্যে মার্কিন সমবায় সাহায্য প্রতিষ্ঠান কয়েক শত সিনভা-র‍্যাম প্রেস যন্ত্র এই সব দেশে বিতরণ করেছেন।

সিনভা-র‍্যাম ব্লক যন্ত্রের সাহায্যে গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে।

অর্থকরী কোন কাজে নিযুক্ত থাকে। মেক্সিকোর অন্তর্গত হোচিমিলকোর স্যান গ্রেগরিও পল্লী যুব সংঘের কিশোর সদস্যেরা একটি সিনভা-র‍্যাম প্রেসের সাহায্যে তাদের ক্লাব-গৃহটি নির্মাণ করেছে।

ওয়াশিংটন ডি-সি-তে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ইকোনমিক ওয়ার্ল্ড নামক মাসিক পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, এই যন্ত্রটি সম্পর্কে বিশ্বের সর্বত্র যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় গৃহ-নির্মাণ ও গৃহ-নির্মাণের কাজে অর্থদানকারী সংস্থার আন্তর্জাতিক বিভাগ, এই দুটি সরকারী সংস্থা এবং জাতীয় খুচরা কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী সমিতি বিদেশে সিনভা-র‍্যাম প্রেস বিক্রয় ও ব্যবহারের কাজে পরামর্শ দিচ্ছেন ও সহায়তা করছেন।

সারা বিশ্বে সিনভা-র‍্যাম প্রেস বণ্টন ও এই যন্ত্রের ব্যবসায় সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নিউইয়র্কের আই-বি-ই-সি (ইণ্টার-

ন্যাশন্যাল বেসিক ইকোনমি কর্পোরেশন) হাউসিং কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটি ইণ্টারন্যাশন্যাল বেসিক ইকোনমি কর্পোরেশনের একটি সহায়ক সংস্থা। রকফেলার ভ্রাতৃবৃন্দ উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থ-নীতিক সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী এই ব্যবসায় চালাবার জন্যে রয়্যালটি স্বরূপ অর্থ দেওয়া হবে প্যানআমেরিকান ইউনিয়নকে। এটি দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র সংস্থার সাধারণ দপ্তর।

রিচমণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর সঙ্গে প্রথম যে চুক্তি হয়েছে তদনুসারে মাসে প্রায় ৩০০টি যন্ত্র নির্মিত হচ্ছে। এই ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীটি ভার্জিনিয়ার রাজধানী রিচমণ্ডে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন ব্যবসায়ী পরিষদের যে সহযোগী সংস্থাটি মেক্সিকোয় রয়েছে, তাকেও লাইসেন্স মঞ্জুর করা রয়েছে। এই সংস্থাটি শীঘ্রই মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর জন্যে এই যন্ত্রটি নির্মাণ করতে আরম্ভ করবে। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আই-বি-ই-সি হাউসিং কর্পোরেশন বিশ্বের সমস্ত দেশে লাইসেন্স প্রদানের পরিকল্পনা করছেন।

সিনভা-র‍্যাম ব্লক প্রেস যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা বড় আকৃতির বিস্কুট কাটবার যন্ত্রের মত। যন্ত্রটির ওজন ১৪০ পাউণ্ড। যন্ত্রটিতে ধাতু-নির্মিত একটি ছাঁচ আছে। সাধারণ মাটি এবং এর শতকরা ৮ ভাগ বা তার চেয়েও কম পরিমাণ সিমেণ্ট বা চুন একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প ভিজা অবস্থায় বেল্চা দিয়ে ঐ মিশ্রণটি ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। এ কাজে ব্যবহৃত মাটিতে বালি ও মাটির অংশের আনুপাতিক হার ৬০-৪০ থেকে ৭৫-২৫-এর মধ্যে হলে ভাল হয়। যন্ত্র-সংলগ্ন একটি লিভার বা দণ্ড হাত দিয়ে নামিয়ে আনলেই একটি পিষ্টন বা চাপদণ্ডের সাহায্যে ঐ মিশ্রণটির উপর চাপ দেওয়া হয়। ৭০ পাউণ্ড শক্তি দিয়ে লিভারটিকে নামালেই ঐ মিশ্রণটির উপর ৪০,০০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ সৃষ্টি হয়। যন্ত্রটির খুচরা মূল্য বর্তমানে ১৫০ ডলার।

সিনভা-র‍্যাম ইটের নির্মিত একটি গৃহ।

সিনভা-র‍্যাম যন্ত্রে যে ইট প্রভৃতি নির্মিত হয়, তা প্রচলিত সিমেণ্ট ব্লক অপেক্ষা অধিক শক্ত বলে মার্কিন সরকারের ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডস-এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মেঝে তৈরীর শক্ত টালিও এই যন্ত্রে প্রস্তুত হয় এবং ছাদের টালি নির্মাণের পরীক্ষাও চলছে।

ব্যবহারকারী স্বয়ং যদি তৈরী করে তাহলে সিনভা-র‍্যাম যন্ত্রে প্রস্তুত প্রত্যেকটি ইটের দাম

পড়ে মাত্র ৬/১০ সেণ্ট বা '০০৬ ডলার। বাড়ী নির্মাণের জন্যে সাধারণতঃ যে ইট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় তার যে দাম, সিনভা-র‍্যাম দ্বারা প্রস্তুত ইটের দাম তার বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি সিনভা-র‍্যাম দ্বারা প্রস্তুত ইটের সাহায্যে ভেনেজুয়েলায় একটি তিন কামরার বাড়ী নির্মিত হয়েছে। ঘরের ভিতরের পার্টিশন দেয়াল সমেত এই বাড়ীটি নির্মাণ করতে যত ইট প্রয়োজন হয়েছে, তার মোট দাম লেগেছে মাত্র ৩০ ডলার। বাজারে যে ইট বিক্রয় হয় তা ব্যবহার করলে এই বাড়ীটির জন্যে ৩০০ ডলারের ইট প্রয়োজন হয়।

মেক্সিকোর একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীরা তাদের যৎসামান্য আয় থেকে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করে পয়সা (১৫ নয়া পয়সার সমান) জমাতে থাকে। এই ভাবে মাত্র চার মাসে তারা যে অর্থ সঞ্চয় করে তা দিয়েই তারা একটি সমাজ কল্যাণ গৃহ ও একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়।

যন্ত্রটি চালাতে সাধারণতঃ দু-জন লোকের প্রয়োজন হয়। একজন লিভারটি চালায়, অপর জন মাটির মিশ্রিত তাল যন্ত্রের মধ্যে ভরে দেয় এবং ইট তৈরী হলে যন্ত্র থেকে তুলে নিয়ে তা একধারে সাজিয়ে রাখে। দু-জন লোক এই যন্ত্রের সাহায্যে একদিনে ৩০০ থেকে ৬০০টি ইট তৈরী করতে পারে। এই ইট পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। রোদ বা বৃষ্টি যাতে না লাগে, সেই ভাবে ১৫ দিন রেখে শুকিয়ে নেবার পর এই ইট ব্যবহারোপযোগী হয়।

১৮ মাস ধরিয়া দুধ টাট্‌কা রাখিবার ব্যবস্থা

দীর্ঘ সময় দুধ টাট্‌কা রাখিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে এলান মারে লিখিয়াছেন—আপনার পাড়ার দোকানদার যদি আপনাকে এক বোতল টাট্‌কা দুধ দিয়া বলে যে, এই দুধ বৃটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় অবাক হইবেন। আপনি হয়তো ভাবিবেন, অসম্ভব। আমিও হয়তো সেই কথাই ভাবিতাম, কিন্তু আজ সত্যসত্যই টাট্‌কা দুধ দূরাঞ্চলে সরবরাহ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহা অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জমাট দুধ যাহা তরল হইবার পর সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত টাট্‌কা দুধেরই রূপ গ্রহণ করে, তাহা আজ মধ্যপ্রাচ্যে সরবরাহ করা হইতেছে। এই দুধ টিনজাত জীবাণুমুক্ত দুধের মতই সুলভ হইবে।

এক নূতন পদ্ধতির সাহায্যে দুধকে এই ভাবে জমাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই পদ্ধতি যিনি উদ্ভাবন করেন, তিনি হইলেন বার্কশায়ারের অন্তর্গত রেডিং-এর ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন ডেয়ারিং-এর ডাঃ ডবলিউ জি. উইয়ারমাউথ। স্বাভাবিক ভাবে পাস্তরাইজ করিবার পর টাট্‌কা দুধ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া বিশেষ প্রক্রিয়াধীনে (Ultrasonic vibrations) রাখা হয়। ইহার পর দুধ বোতলজাত করা হয় এবং বোতলের মুখ যথারীতি আট্‌কাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া এই দুধকে জমাইবার চেষ্টা করা হয়।

দুধ জমাইবার এই পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাহার ফলে জমাট দুধ ১৮ মাস পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত তরল দুধের সমস্ত গুণ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। যে কোন জলবায়ুতে ইহা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে, অবশ্য ইহাকে সকল সময় ১০° বা তারও কম ফারেনহাইটে রাখিতে হইবে।

বাজারে অবশ্য জমাট দুধ ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে, কিন্তু ইহা অনুগুণ সম্পন্ন (homogenized), অর্থাৎ ইহা তরল হইয়া গেলে ইহার হলুদে রঙের স্নেহ পদার্থ স্বতন্ত্র হইয়া যায় এবং তাহা চা কিংবা কফির কাপে ভাসিতে থাকে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে দুধ তাহার স্বাভাবিক তরল অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

টাট্‌কা তরল দুধ যে পর্যন্ত অবিকৃত থাকে, তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় এই দুধ অবিকৃত থাকিবে। ইহার গুণের এবং স্বাদের কোন পরিবর্তন হইবে না। ঢালিবার পর পাত্রের কোথাও দুধের ননী আলাদা হইয়া লাগিয়া থাকে না।

এই ভাবে দুধ জমাইবার চেষ্টা বহু দেশে হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বৃটেনেই প্রথম এই চেষ্টা ফলবতী হয়। নমুনা হিসাবে সাত শত বোতল দুধ মধ্য প্রাচ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলের সরকারী মেডিক্যাল অফিসারগণ বলিয়াছেন যে, টাট্‌কা দুধের সহিত এই বোতলজাত জমাট দুধের কোনই পার্থক্য নাই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৫৯

১২শ বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা
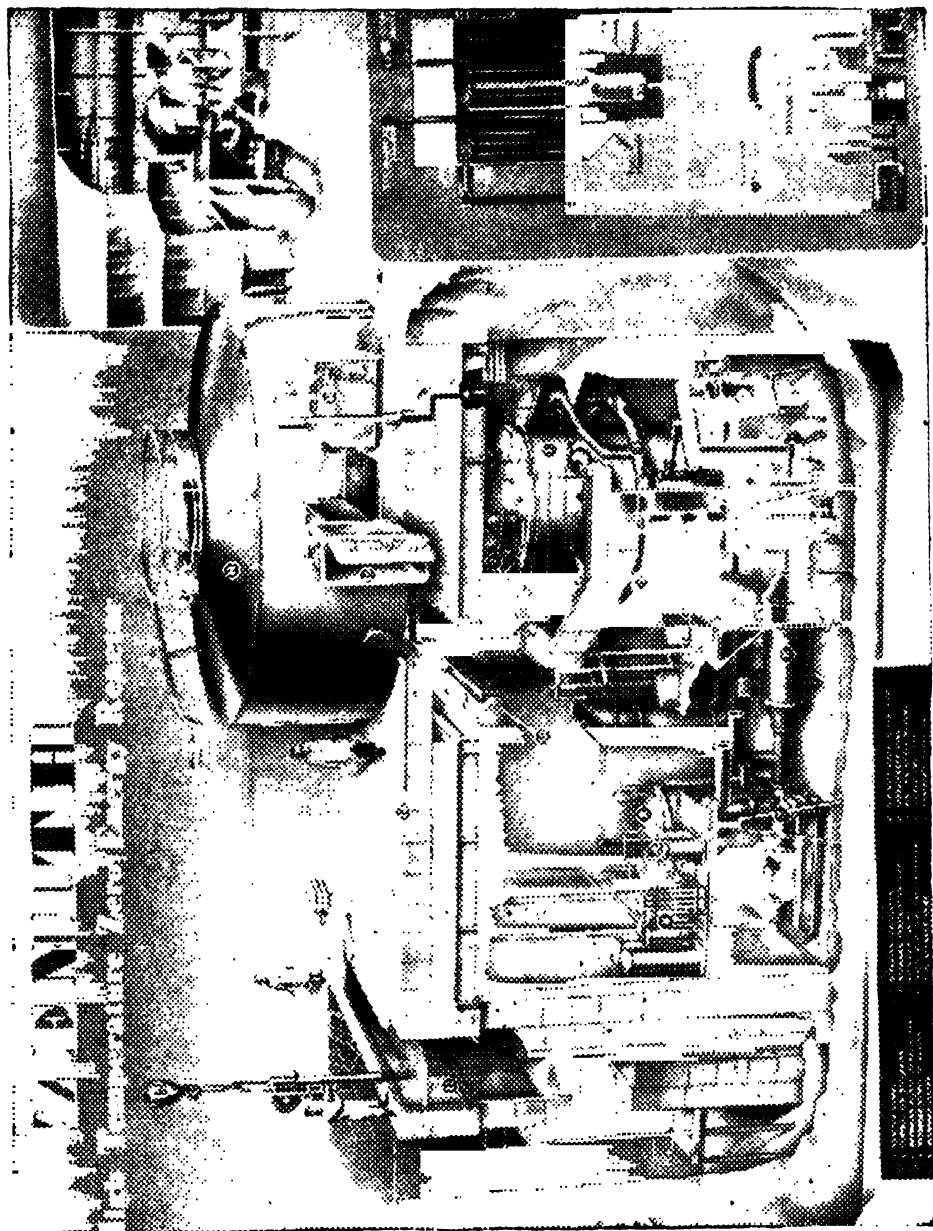
জেনিথ রিয়্যাক্টর

অতি উচ্চ-তাপমাত্রায় গ্র্যাফাইট নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্যে নির্মিত ইউনাইটেড কিংডমের অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাবলিসমেণ্টের (ডরসেট) রিয়্যাক্টর "জেনিথ"।

আরশোলা

আমাদের অতি পরিচিত কীট পতঙ্গের মধ্যে আরশোলা বা তেলাপোকা অন্যতম। এমন বাড়ী খুব কমই আছে, যেখানে আরশোলার উপদ্রব নেই। বাড়ীঘরের আর্বজনা-পূর্ণ স্থানে, বিশেষতঃ রান্নাঘরে এদের অবাধ আধিপত্য।

বহু যুগ পূর্ব থেকেই এরা পৃথিবীতে বিচরণ করছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ২০০,০০,০০,০০ কোটি বছর পূর্বে, অর্থাৎ কার্বনিফেরাস যুগেও পৃথিবীতে এদের অস্তিত্ব ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অঙ্গারীভূত বিভিন্ন জাতের প্রায় ৫০০ আরশোলার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পৃথিবীর আদি কীট-পতঙ্গদের মধ্যে এদের স্থান উল্লেখযোগ্য এবং ডানাবিশিষ্ট কীট-পতঙ্গদের মধ্যে এরাই হচ্ছে প্রাচীনতম। কার্বনিফেরাস যুগে পৃথিবীতে এদের এতই আধিপত্য ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই স্যাঁৎসেতে যুগকে আরশোলার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে এরা বংশধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরশোলা দেখা যায়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহেই এদের সংখ্যা সর্বাধিক এবং বিভিন্ন দেশে ২৫০০ বিভিন্ন জাতের আরশোলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের গায়ের রংও বিচিত্র। অনেকের গায়ে উজ্জ্বল সবুজ, কমলা, হল্‌দে ও লাল দাগ এবং ডোরা দেখা যায়। এসব আরশোলা দেখলে সহজে বোঝাই যাবে না যে, এরা আমাদের অতি পরিচিত আরশোলারই নিকটতম জ্ঞাতি।

আরশোলা সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেকের মধ্যে অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে। ফ্রান্স ও রাশিয়ায় অনেক বাড়ীতে আরশোলার অবস্থিতি সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। বাড়ী আরশোলা-শূন্য হলে অমঙ্গল দেখা দেবে বলে তাদের বিশ্বাস। জার্মেনীতে এদের বলা হয় 'রান্নাঘরের উকুন'। ফ্লোরিডায় এদের এক জাতের ছারপোকা বলে অভিহিত করা হয়। সেখানকার অনেকের বিশ্বাস যে, কারো বাড়ী আরশোলার দ্বারা উপদ্রুত—এ কথা বললে অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। অবশ্য এই সব অদ্ভুত বিশ্বাসের মূলে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এ-রকমের কোন অদ্ভুত ধারণার কথা শোনা যায় না।

এরা সাধারণতঃ বাড়ীঘরের আবর্জনার মধ্যে, দরজা-জানলার ফাটলে অথবা গর্তের মধ্যে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য হলো উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ। এরা একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। এক জাতের আরশোলাকে ভীমরুলের বাসার তলায় পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে বাস করতে দেখা যায়। আর এক জাতের আরশোলা আবার সৈনিক পিঁপড়ের পিঠে চড়ে বেড়ায়। সৈনিক পিঁপড়ের দেহ থেকে একপ্রকার

রস নিঃসৃত হয়—এরা ঐ রস চেটে খায়। নদী বা পুকুরের পাড়ে এক জাতের আরশোলা দেখা যায়, ভয় পেলে তারা ব্যাঙের মত লাফিয়ে লতাপাতার নীচে আত্মগোপন করে। কয়েক জাতের আরশোলার দেহাকৃতি এতই বড় যে, সেগুলিকে এক একটা ইঁদুরের মত মনে হয়।

শত্রু যখন তাড়া করে তখন এরা খুব দ্রুত পালাবার চেষ্টা করে। পালাবার সময় পেটের প্রান্তভাগ কিছুটা কুঁচকে উঁচু করে রাখে। দেখলে মনে হয়, যেন হুল ফোটাবার ভঙ্গীতে আছে। এর ফলে শত্রু অনেক সময় এদের পশ্চাৎ অণুসরণে বিরত হয়। এদের দেহের বাইরে একটা নমনীয়, মসৃণ ও উজ্জ্বল প্লাষ্টিকের মত আবরণ থাকে। আবার কারো কারো দেহে ঘন ছোট লোমবিশিষ্ট পশমের মত একটা আবরণ আছে।

যেসব আরশোলা আমাদের অতি পরিচিত তারা সাধারণতঃ গরম, আর্দ্রতা ও নোংরা পরিবেশে দ্রুত বংশবিস্তার করে। গ্রীষ্মকালই এদের বংশবৃদ্ধির অনুকূল সময়। শীতকালে এরা সুখনিদ্রায় সময় কাটায়। সে সময় এরা বাড়ীঘর, মুদীখানা, হোটেল প্রভৃতি স্থানে লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন করে থাকে।

অসম্ভব রকম এরা আমাদের ক্ষতি করে থাকে। অনেক সময় এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে এই সম্বন্ধে একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। একটা বাড়ীর চারটি ঘরকে একেবারে ধূমাকীর্ণ করবার ফলে প্রায় ১২৫,০০০ আরশোলা বেরিয়ে আসে। যদি কোন জায়গায় আরশোলার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হয়—তখন সেখানে বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং এরা দলে দলে নতুন বাসস্থান ও খাদ্যের সন্ধানে অভিযান করে।

আরশোলা মারবার জন্যে নানারকম ফাঁদ পাতা হয়। ফাঁদের মধ্যে এদের আকৃষ্ট করবার জন্যে খাদ্য, বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য রাখা হয়। বোতলের মধ্যে খাবারের সন্ধান পেলে এরা বোতলের মসৃণ গা বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। স্ত্রী-আরশোলা যখন ডিম নিয়ে চলাফেরা করে, তখন তারা কাচের গা বেয়ে আড়াআড়ি বা খাড়াভাবে ওঠা-নামা করতে পারে। কিন্তু শরীর থেকে ডিম বিচ্ছিন্ন হলে তখন আর কাচের গা বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারে না।

এরা রান্নাকরা খাদ্য পছন্দ করলেও কয়েক জাতের আরশোলা আবার বই, চামড়া, কাপড় ইত্যাদি উদরসাৎ করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের ডাকঘরসমূহে ষ্টাম্প রাখবার আলমারীতে যাতে এরা ঢুকতে না পারে তার নিখুঁত ব্যবস্থা আছে। কেন না, এরা ষ্ট্যাম্পের পিছনের আঠা খেয়ে ফেলে। মানুষও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। জাহাজের নাবিকেরা শোবার সময় হাতে দস্তানা ও পায়ে মোজা পরে—যাতে এরা তাদের হাত-পায়ের নখ খুঁটে খেতে না পারে।

এদের দেহ থেকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এই গন্ধ এদের আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক। উত্তেজিত বা আতঙ্কিত হলে এরা দেহ থেকে এই দুর্গন্ধ বের করে। একজাতীয় পরজীবী বোল্‌তা এদের খুবই ক্ষতি করে। তারা এদের ডিমের খোলে ডিম পাড়ে। সুরিনাম টোড নামক একজাতীয় ব্যাং এদের মারাত্মক শত্রু। আরশোলা তাদের খুব উপাদেয় খাদ্য। কেন্নো, বিছা প্রভৃতি আরশোলার ডিম পেলেই খেয়ে ফেলে। আরশোলারাও তাদের রেহাই দেয় না। তারা আবার এই সব প্রাণীদের বাগে পেলেই উদরসাৎ করে। এরা ছারপোকার মারাত্মক শত্রু। পৃথিবীর কয়েকটি দেশের লোকদের নিকট আরশোলা অতি উপাদেয় খাদ্য। প্রশান্ত মহাসাগরে কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীরা পরম তৃপ্তি সহকারে আরশোলা ভক্ষণ করে থাকে।

এরা যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড, কুষ্ঠ ও আন্ত্রিক রোগের জীবাণুর বাহক। হাঁস-মুরগী প্রভৃতি প্রাণীদের যে সব কীট-পতঙ্গ আক্রমণ করে তাদের অন্ধ করে দেয়—তারা আরশোলার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেই পুষ্টিলাভ করে বলে জানা গেছে।

এদের দেহাকৃতি চওড়া এবং চ্যাপ্টা এবং মাথা ও চোয়াল নীচের দিকে থাকে। মনে হয় যেন—কোন কিছু খাওয়ার ভঙ্গীতে অবস্থান করছে।

ডিম পাড়বার সময় পুরুষ আরশোলা স্ত্রী-আরশোলার সম্মুখে সগর্বে জাঁকজমকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ সময়ে পুরুষেরা তাদের ডানা উঁচু করে পেটটাকে স্ফীত করে রাখে। প্রথম দিকে স্ত্রীরা নির্লিপ্ত ভাব দেখায়; অর্থাৎ পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় না বরং তাকে বাধা দেয়। তারপর স্ত্রী-আরশোলার এই নির্লিপ্ত ভাব কেটে যায় এবং তাদের মধ্যে মিলন ঘটে। এই সময় স্ত্রীরা দৌড়াদৌড়ি করে, তবে খুব বেশী জোরে নয়।

ডিম পাড়বার সময় স্ত্রী-আরশোলা অর্ধ নির্গত ডিমেরথলিকে তার শরীরের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে। তাদের শরীরের প্রান্তভাগে সংলগ্ন একটা চামড়ার মত শক্ত খোলের মধ্যে ডিমগুলি থাকে। ডিম থেকে বাচ্চা বেরোবার পর তারা জীবিকার সন্ধানে বেরোয়। আরশোলার ডিমের খোলার উপর একপ্রকার আঠালো পদার্থ থাকে। ঐ আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিম না ফোটা পর্যন্ত কোন কিছুর গায়ে লেগে থাকে। এদের বংশ-বৃদ্ধিও ব্যাপক হারে হয়। কোন কোন জাতের একটি স্ত্রী-আরশোলা এক বছরে প্রায় ৪০০,০০০ বংশধর উৎপাদন করতে পারে।

এরা সাধারণতঃ অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করে। এদের গোষ্ঠীগত বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Blattidae। ল্যাটিন ভাষায় Blatta-র অর্থ হচ্ছে—যে পতঙ্গ আলো পরিহার করে। এরা যখন সূর্যালোকে আত্মপ্রকাশ করে—তখন এদের নরম শরীরের আর্দ্রতা তাড়াতাড়ি কমে যায়। এ জন্যে এরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় বেরোয় না। অন্ধকারে এদের ধরাও খুব কঠিন, এরা হাঁটেও খুব দ্রুতগতিতে।

আরশোলা বিনাশ করবার জন্যে বিভিন্ন কীটঘ্ন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এদের আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। অনেক কীটঘ্ন ওষুধের, যেমন—ডি. ডি. টি. ক্লরডেন, লিনডেন প্রভৃতির বিষ-ক্রিয়াকে এরা প্রতিরোধ করতে পারে—এটা পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে। সে জন্যে এসব কীটঘ্ন ওষুধ এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আরও শক্তিশালী কীটঘ্ন ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা আরশোলার বংশ সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের দেশে রকেট-অভিযান

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে উড়ন্ত কল প্রেরণের প্রশ্ন রাশিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কে. ই. ৎসিওখকোভ্স্কি পঞ্চাশ বছর পূর্বে গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন। কার্যতঃ এরূপ উড্ডয়ন সম্ভব হলো আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক রকেট তৈরী হবার পর। এই সব রকেট পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রকেটগুলি যথাসম্ভব উন্নত ধরণের এবং ভিতরকার ইঞ্জিনসমূহ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাকারীগণ লঘু ও শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং সংবাদ প্রেরণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি নির্মাণ করেছেন। এখন সত্য সত্যই চাঁদে পৌঁছানো সম্ভব।

চাঁদে যাত্রা করবার পূর্বে রকেটের গতিপথের (trajectory) নির্ভুল হিসাব প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, চাঁদ স্থির লক্ষ্যবস্তু নয়, অবিরাম গতিতে চলমান এবং এর অবস্থান অনুসারে রকেট-যাত্রার সময় নির্ধারিত হয়। কিছুকাল আগে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের অভিকর্ষের প্রভাব, গন্তব্য স্থলে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে—এ সব বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন।

রকেটের গতিপথের সঠিক হিসাব ছাড়াও চন্দ্রগামী রকেটের গতি নির্ণয় করা প্রয়োজন, যে গতি রকেটটিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে মহাশূন্যের পথে প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে। এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটারের কিছু বেশী হওয়া দরকার। প্রতি সেকেণ্ডে ১১.১ কিলোমিটার গতিতে চাঁদে যেতে প্রায় পাঁচ দিন সময় লাগবে। রকেট সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার গতিতে উন্নীত হলে চাঁদে পৌঁছুতে ৫১ ঘণ্টা সময় যাবে।

প্রথমে রকেটটি চাঁদের চারদিকে ঘুরবে এবং বিভিন্ন পরিমাপ ও ফটোগ্রাফ নেওয়া হবে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা চাঁদের আবহমণ্ডল, তার উপরিতলের গঠন,

উষ্ণতা এবং চৌম্বক-ক্ষেত্র প্রভৃতির সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। পৃথিবী থেকে আমরা কেবল চাঁদের একটা গোলার্ধই দেখতে পাই। এখন কথা হচ্ছে, অপর গোলার্ধ সম্বন্ধে অবগত হওয়া, যাকে আমরা কখনও দেখতে পাই না।

চাঁদের চারদিকে পরিভ্রমণ করবার পর মহাশূন্যচারী যানটি পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। পরবর্তী বারের উড্ডয়নের উদ্দেশ্য হলো চাঁদে নামা। এই রকেটটা হবে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত এবং সেটাকে কোন মানুষ চালিয়ে নিয়ে যাবে না। চাঁদ সম্বন্ধে সব বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হলেই তবে মানুষ চাঁদের পথে যাত্রা করবে।

পৃথিবী থেকে মানুষ প্রথম চাঁদে গিয়ে একেবারে ভিন্ন রকম অবস্থায় পড়বে। সেখানে তার ওজন, পৃথিবীতে যা ওজন ছিল তার প্রায় ⅙ হয়ে যাবে। চাঁদের অতি সামান্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সে অনুভব করতে পারবে। জল ও বায়ু-শূন্য চন্দ্র সৌররশ্মি থেকে সুরক্ষিত নয়। দিনের বেলায় চাঁদের উপরিভাগ ১৫০° সে. পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাত্রিতে এই উষ্ণতা প্রায় -১৭০° সে.-এ নেমে যায়। চাঁদের যাত্রীদের স্বতন্ত্র ধরণের পোষাক পরতে হবে। এই পোষাক স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাভাবিক চাপ, আর্দ্রতা ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করবে।

চাঁদে রকেট-যাত্রার সময় নির্ধারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদে যাত্রার সবচেয়ে অনুকূল সময় হচ্ছে—যখন চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকবে। চন্দ্রগামী মহাশূন্য-যানের গতি সৌর-অভিকর্ষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। এই সৌর-অভিকর্ষ চন্দ্রাভিমুখী রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

চাঁদের তথ্যানুসন্ধান মানুষের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে। প্রথমতঃ জানতে হবে, চাঁদে জীবের অস্তিত্ব আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর সৌরজগৎ সম্পর্কিত অনেক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে কৌতূহলান্বিত। কারণ গ্রহটি পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত এবং এর ভৌত অবস্থাদি পৃথিবীর মত; তাছাড়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সম্পর্কের চেয়ে মঙ্গল ও পৃথিবীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

মহাশূন্য-যান যদি সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার গতিতে চলে, তবে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুতে প্রায় ৫ মাস লাগবে। আধুনিক রকেটগুলি এই গতির উন্নতি করতে পারে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে যাত্রা সম্ভব করতে হলে দুটি ঘাঁটি চাই—একটি চাঁদে এবং অপরটি উপগ্রহে। ৎসিওখ্কোভ্স্কি সত্যই বলেছিলেন—মহাশূন্যের পথে পাড়ি জমাতে একদিন পৃথিবীর কৃত্রিম চাঁদ হবে পা-দানি স্বরূপ।

শ্রীবিশ্বম্ভর ঘোষ

বিঃ দ্রঃ—মস্কোর ১৪ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট রকেট (দ্বিতীয় লুনিক) চন্দ্রে পৌঁছাইয়াছে এবং জডরেল ব্যাঙ্কের (চেশায়ার) বিশাল আয়তনের রেডিও-টেলিস্কোপ দ্বিতীয় লুনিকের শেষ সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় লুনিক চন্দ্রে অবতরণ করিয়াছে। সঃ

জানবার কথা

১। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, -৪৫৯'৬ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) হচ্ছে পরম শূন্য (Absolute Zero)। বিজ্ঞানীরা এই তাপমাত্রার প্রায় কাছাকাছি কয়েকটি অদ্ভুত

১নং চিত্র

ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। -৪৫২ ডিগ্রিতে হিলিয়াম গ্যাস তরল হয়ে যায় এবং অন্যান্য বস্তুগুলি কঠিন অবস্থায় থাকে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে দেখায় সাদা বালির মত।

২। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছেন। এর নাম হলো বেক্‌ম্যান-হোয়াইট্‌লি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে—যাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৪০০,০০০ ছবি তোলা সম্ভব হয়। যে হারে সিনেমার প্রোজেক্টর
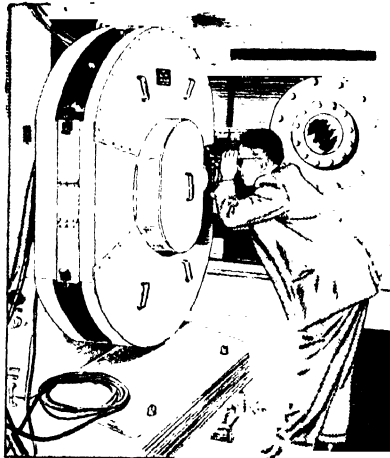
২নং চিত্র

চালিত হয়—তাতে ৩৫ মি.মি. ফিল্মের 'এক্সপোজার' এক মিনিটে হয়। সাধারণ

চলচ্চিত্র যে হারে চলে, সেই হারে এই নতুন ক্যামেরার ৩৫ মি.মি. ফিল্মের এক্সপোজারের জন্যে ৪০ দিনেরও বেশী সময় লাগবে।

৩। তোমরা হয়তো অনেকেই দেখে থাকবে—যখন খুব শীত লাগে তখন জীব-জন্তুর লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এর কারণ কি জান? জীবজন্তুর শরীরে খুব শীত লাগলে ছোট ছোট মাংস-পেশীগুলি লোমগুলিকে একেবারে খাড়া করে দেয়—যাতে আরও

৩নং চিত্র

বেশী পরিমাণ বাতাস শরীরে ঢুকে অত্যধিক ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারে। মানুষের শরীরে খুব শীত লাগলে তাদের শরীরের ছোট ছোট মাংস-পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয়ে একটা অপরিস্ফুট শব্দ হতে থাকে।

৪। ভোটের দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ৫০-তম রাষ্ট্র এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের কুড়িটি দ্বীপের
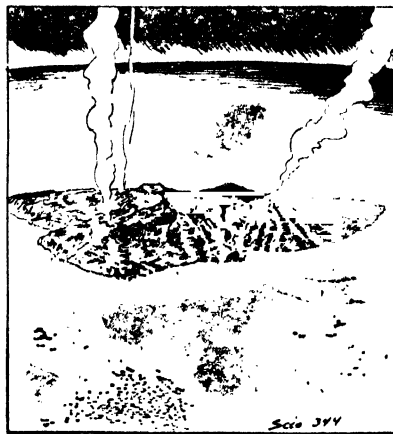
৪নং চিত্র

সমষ্টি। এই দ্বীপগুলির মধ্যে মাত্র আটটিতে লোকের বসতি আছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মৌনা লোয়া এই হাওয়াই দ্বীপেই অবস্থিত।

৫। উইলিয়াম ই. হ্যাষ্ট নামে একজন আমেরিকান সর্পবিষ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে বিষধর সাপের বিষ নিষ্কাশন করতে গিয়ে তিনি ৩২ বার সর্পদংশনে আহত হন। আশ্চর্যের বিষয়, এতবার সর্পদংশন সত্ত্বেও তিনি বেঁচে আছেন। যে সব সাপ তাঁকে দংশন করেছিল, সেগুলি ছিল সাংঘাতিক বিষধর ; যেমন—র‍্যাট্‌লার, কোর‍্যাল, কটনমাউথ, মোকাসিন এবং ভয়ঙ্কর হিংস্র নীল ক্রেট

৫নং চিত্র

প্রভৃতি। তিনি তাঁর শরীরে সামান্য পরিমাণে গোখ্‌রা সাপের বিষের ইঞ্জেকশন নিয়েছেন ; ফলে তাঁর শরীর সর্প বিষ প্রতিরোধক হয়। কেবল তাই নয়, চিকিৎসকেরা বলেছেন যে, হ্যাষ্টের শরীরের রক্ত, অন্যান্য সর্প-দষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যাপারেও ফলপ্রদ, অর্থাৎ তাঁর রক্তকে নিখুঁত সর্পবিষ-প্রতিরোধক সিরাম বলা যায়। হ্যাষ্ট অন্যান্য সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যে তাঁর দেহের রক্ত দান করে থাকেন।
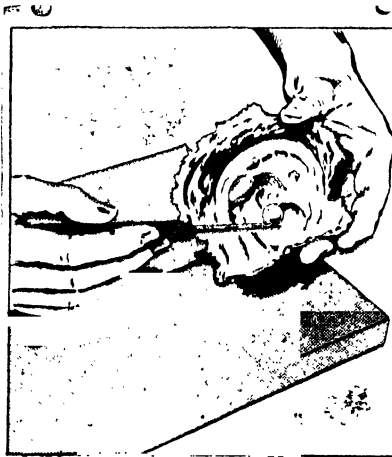
৬নং চিত্র

৬। ঝিনুক থেকে মুক্তা পাওয়া যায়—এ-কথা তোমরা বোধ হয় সবাই জান·

মুক্তার দাম খুব বেশী। স্বাভাবিকভাবে যে সব মুক্তা পাওয়া যায় তাদের রং সাদা, হাল্‌কা লাল, হলুদ, কালো ও ক্রীমের মত। কিন্তু সব ঝিনুক থেকেই মুক্তা পাওয়া যায় না। যে সব ঝিনুক (শুক্তি) খাওয়া হয়, তাদের মধ্যে মুক্তা জন্মায়। সেগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন খড়ির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ পাওয়া যায়।

৭। যুক্তরাষ্ট্রে সেঞ্চুরী প্ল্যাণ্ট (Agave Americana) নামক এক জাতের উদ্ভিদ জন্মায়। এই গাছ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এদের ১০০ বছরে একবার মাত্র ফুল ফোটে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, এই

৭নং চিত্র

বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। উষ্ণ অঞ্চলে, যেমন—মধ্য আমেরিকায়, এই গাছ প্রতি ৭।৮ বছর অন্তর একবার প্রস্ফুটিত হয়।

৮নং চিত্র

৮। পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে নানারকম

অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, বাসুকি নাগের সহস্র ফণার উপর পৃথিবী অবস্থান করছে! প্রাচীন মঙ্গোলিয়ানরা ভাবতো যে, বিরাট একটা ব্যাঙের উপর পৃথিবীটা রয়েছে। কোন কোন দেশে এই ধারণা প্রচলিত ছিল—একটা মস্তবড় কচ্ছপের উপর চারটা হাতী দাঁড়িয়ে আছে এবং পৃথিবীটা তাদের উপরে রয়েছে। গ্রীক কবি হোমার মনে করতেন—পৃথিবীটা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত একটা কুব্জপৃষ্ঠ চাক্‌তির মত। অনেক আদিম অধিবাসীর বিশ্বাস ছিল, তারা যেটুকু জায়গায় বাস করে, সেটাই হচ্ছে পৃথিবী। দার্শনিক পিথাগোরাস প্রথম প্রচার করেন, পৃথিবী বর্তুলাকার। তিনি খৃষ্টের জন্মের ছয় শতাব্দী পূর্বে জীবিত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে মহাকাশে প্রেরিত যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে বর্তমানে জানা গেছে—পৃথিবীর আকৃতি ন্যাসপাতির মত।

৯। নরওয়ে ও গ্রীনল্যাণ্ডের মাঝখানে আইস্‌ল্যাণ্ড অবস্থিত। এখানে কবে থেকে বসতি গড়ে উঠেছে—সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৮০০ বছর পূর্বে কাল্‌ডিস্‌ বা কেলটিক সন্ন্যাসীদের একটি ছোট্ট উপনিবেশ

৯নং চিত্র

প্রথম এই দ্বীপে গড়ে ওঠে। এসব সন্ন্যাসীরা স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড থেকে আসে (সম্ভবতঃ ওয়েল্‌স্‌ থেকেও)। বর্তমানে এই দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই নরওয়েজিয়ানদের বংশধর।

১০। ক্যানাডার জাতীয় গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে একটি তথ্য জানতে পেরেছেন। একই পরিমাণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে কোন্‌ অবস্থায় এবং কত তাপমাত্রায় আরামদায়ক গরম অনুভব করা যায়; অর্থাৎ ৭০ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় যে পোষাক পরে চুপচাপ বসে থাকলে দৈহিক

যে আরাম অনুভূত হয়—ঠিক সে রকম শারীরিক ভাব অনুভূত হবে ৪০° ডিগ্রী (ফাঃ)

১০নং চিত্র

তাপমাত্রায় চলন্ত অবস্থায় এবং ছুটতে থাকলে ৫° ডিগ্রি (ফাঃ) তাপমাত্রায়।

১১। অক্টোপাসের কথা তোমরা জান। এই বিকটাকৃতির জীবটি সমুদ্রের বিভীষিকা বলে পরিচিত। কিন্তু প্রাণী বিজ্ঞানীরা বলেন, এরা মোটেই হিংস্র প্রাণী নয়, বরং এদের ভীরু প্রাণীই বলা চলে। এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে বলে শোনা যায়

১১নং চিত্র

নি। বিজ্ঞানীরা এ-কথাও বলেছেন—যতটা জানা গেছে, তাতে অক্টোপাস কর্তৃক মানুষ আক্রান্ত হবার কোন ঘটনার কথা শোনা যায় নি।

১২। রেডিও-আইসোটোপের দ্বারা বর্তমানে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রেই ২০০০-এরও বেশী চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে এর দ্বারা রোগনির্ণয় এবং নিরাময় করা হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে ১,০০০,০০০-এরও বেশী রোগীকে এর দ্বারা

চিকিৎসা করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রেডিও-আইসোটোপ দ্বারা
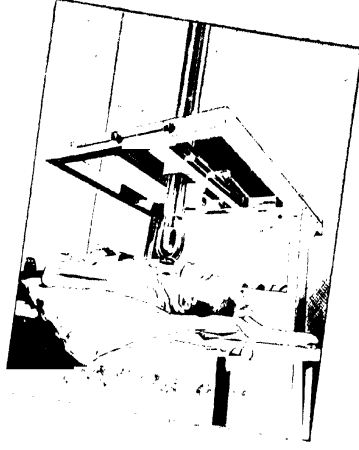
১২নং চিত্র

দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

১৩। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কঠিনতম খনিজ পদার্থ হলো হীরা। আবার পেন্সিলের মধ্যে যে গ্র্যাফাইট ব্যবহৃত হয়—তা কোমলতম খনিজ পদার্থের মধ্যে একটি। এদের
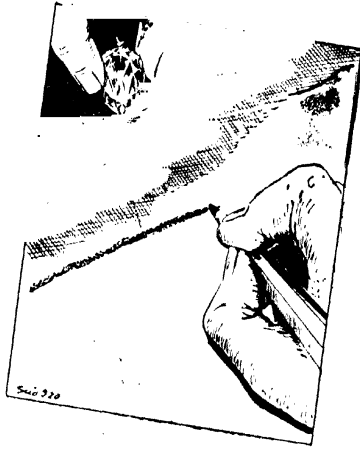
১৩নং চিত্র

গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ এরা বিশুদ্ধ অঙ্গার। বিজ্ঞানীরা বলেন—অঙ্গারের পরমাণু বিন্যাসের বিভিন্নতাই হীরা ও গ্র্যাফাইট-এর ধর্মের পার্থক্যের জন্যে দায়ী।

১৪। ১৪নং চিত্রে অক্ষর সমন্বিত যে রেখাগুলি দেখছো—সেগুলিকে বলা হয় Plimsoll's Marks। প্লিমসোল নামক ইংল্যাণ্ডের জনৈক ব্যক্তি এই চিহ্ন প্রচলন করেন এবং তাঁর নামানুসারে চিহ্নগুলির এইরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের গভীরতা-অগভীরতার উপর জাহাজ চলাচলের সুবিধা-অসুবিধা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

এছাড়া সমুদ্রের অবস্থা ও আবহাওয়ার বিষয় জানাও প্রয়োজন। চিহ্নগুলি জাহাজের খোলের গায়ে চিত্রিত থাকে। চিহ্নগুলির অর্থ হচ্ছে—FW পরিষ্কার জল, IS গ্রীষ্ম-
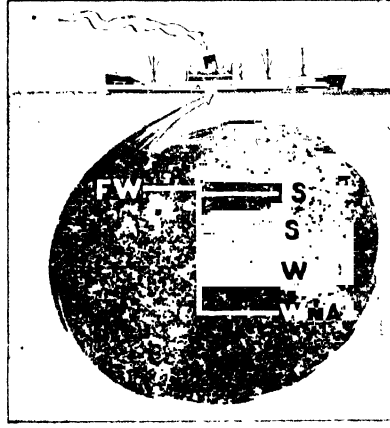
১১নং চিত্র

কালে ভারত মহাসাগর, S—গ্রীষ্মকাল, W—শীতকাল এবং WNA—উত্তর আটলান্টিক শীতকাল।

১৫। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী 'হ্যাণ্ডিম্যান' নামক একটি অদ্ভুত যন্ত্র-মানব নির্মাণ করেছেন। এটাই নাকি প্রথম চন্দ্রগামী যন্ত্র-মানব। এই প্রথম রকেট মানুষের হাতের মত কোন কিছু শক্ত করে ধরতে পারবে এবং একে
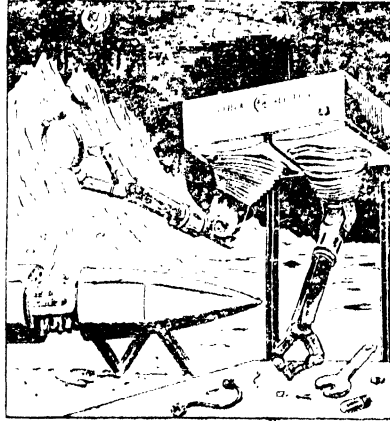
১৫নং চিত্র

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বেতারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ অভিযানে মানুষের পরিবর্তে এই রকেটকে পাঠাবার পরিকল্পনা করছেন।

বিবিধ

সোভিয়েট রকেটের চন্দ্র-পৃষ্ঠে উপস্থিতি

১৪ই সেপ্টেম্বর টাস এজেন্সির এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েটের মহাশূন্যচারী দ্বিতীয় রকেট 'লুনিক' ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টা ২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডের সময় (মস্কো সময়) চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছিয়াছে।

পৃথিবী হইতে রকেটটির চন্দ্রে পৌঁছিতে আনুমানিক ৩৩ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে।

ইতিহাসে এই প্রথম পৃথিবী হইতে সৌর-জগতের একটি উপগ্রহে রকেট পাঠানো সম্ভব হইল।

এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কুলচিহ্ন সমন্বিত বর্ম অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র পতাকা রকেটের সহিত চন্দ্র-পৃষ্ঠে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐ পতাকায় "ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাব্লিক্‌স্‌, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯"—এই কথাগুলিও লেখা আছে।

ভারতে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কারখানা

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কারখানা পঃ উপকূলে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে স্থাপন করা হইবে।

এই কারখানা হইতে প্রয়োজন হইলে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

উক্ত অঞ্চলে অধিকতর বিদ্যুতের প্রয়োজন অনুভূত হইলে ২॥০ লক্ষ কিলোওয়াটের আরও একটি ইউনিট স্থাপন করিয়া বিদ্যুতের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

থোরিয়াম হইতে তাপশক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন একটি ঘোষণায় জানাইতেছেন যে, থোরিয়ামের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাপ উৎপাদনকারী একপ্রকার ব্রিডার রিয়্যাক্টর নির্মাণের জন্য একটি নূতন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে পরমাণু হইতে শক্তি উৎপাদনের খরচও হ্রাস পাইবে।

থোরিয়াম একপ্রকার মৌলিক পদার্থ। নিউট্রন বর্ষণের দ্বারা ইহাকে বিভাজনীয় ইউরেনিয়ামে পরিণত করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে ইউ-রেনিয়ামের তুলনায় ইহা অনেক বেশী পরিমাণেই রহিয়াছে। তবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়ামের খনি সম্পর্কে আমরা যতটুকু সন্ধান পাইয়াছি, ততটুকু সন্ধান আমরা থোরিয়াম সম্পর্কে পাই নাই। বর্তমানে থোরিয়াম পৃথিবীতে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইউরেনিয়ামের তুলনায় প্রকৃতি হইতে থোরিয়ামের উদ্ধার ও শোধন-ক্রিয়ার খরচও অনেক বেশী।

তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় সর্বভারতীয় আলোচনা

বিগত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক দপ্তরের উদ্যোগে মুসৌরীতে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় একটি সর্বভারতীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), অধ্যাপক কোঠারী ও অধ্যাপক রমেশ মজুমদার (সম্পাদক) এই তিন জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির পরামর্শে সারা ভারত হইতে প্রায় ৬০ জন বিজ্ঞানীকে এই আলোচনায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

গত ২২শে মে হইতে ১৮ই জুন পর্যন্ত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারতের প্রায়

৫০ জন বিজ্ঞানী ইহাতে যোগদান করেন। বিজ্ঞানীদের এই অধিবেশনকে 'সামার স্কুল' বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং অধ্যাপক বসু ইহার অধ্যক্ষ মনোনীত হন। এই অধিবেশন তত্ত্বীয় আণবিক-বিজ্ঞান, কস্‌মিক রশ্মির বিকিরণ, বিশ্বতত্ত্ব, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, চৌম্বক ও জল-গতিবিদ্যা, সাংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার যে সকল শাখায় গবেষণা করেন, মূলতঃ সেই সকল বিষয় আলোচিত হয়।

এই অধিবেশনে সমবেত বিজ্ঞানীরা ভারতে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণার সর্বাঙ্গীন দ্রুত উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে এইরূপ সামার স্কুল আহ্বান এবং এক একটি সামার স্কুল ভারতের এক এক অংশে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পদার্থবিদ্যার একটি করিয়া ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অনুরোধও জানান হয়। এই সামার স্কুলের আলোচনার সারাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং এই জন্য ১৬ জন বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়।

পৃথিবীধ্বংসী হলাহল

বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট ওয়াটশন ওয়াট (ইনি রেডার নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন) বলিয়াছেন যে, রসায়নবিদেরা এমন এক বিষাক্ত দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার মাত্র আট আউন্সের দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যসমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। মার্কিন শিল্পপতি মিঃ সিয়াসিয়েটনের গৃহে নয়টি দেশ হইতে আগত বিজ্ঞানীদের সভায় স্যার রবার্ট বলেন—জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে উৎপন্ন ভয়াবহ দ্রব্যগুলির মধ্যে এইটিই সব নহে। এই প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের বিপদ সম্বন্ধে সমাগত বিজ্ঞানীরা সকলেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

ভারতে ২১টি কয়লা স্তর আবিষ্কৃত

দক্ষিণ কর্ণপুরায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অনুসন্ধানের ফলে ২১টি কয়লা স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে জানানো হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রায় ১৩৮ কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইবে। সমগ্র অঞ্চলটি ১.৬৭ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

ভারতে উদ্ভিদের হর্মোন-উপাদান তৈরীর পদ্ধতি

ডায়োস্কোরিয়া নামক একপ্রকার দেশীয় উদ্ভিদ হইতে কর্টিসোন ও অন্যান্য হর্মোন প্রস্তুতের প্রাথমিক উপকরণ ডায়োসেজেনিন তৈরীর পদ্ধতি জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণাগারে উদ্ভাবন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় যে পদ্ধতিতে ডায়োসেজেনিন তৈরী হয়, জম্মুর গবেষণাগারে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি তাহা হইতে অনেক সরল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

ডায়াস্কোরিয়া গাছ পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই গাছ হইতে বৎসরে ১০০ টন মূল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কাশ্মীর সরকার ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ সুরু করিয়াছেন।

১৯৫৮ সালে আমাদের দেশে ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার হর্মোন আমদানী করা হইয়াছিল।

যাঁহারা উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাণিজ্যিক হারে ডায়োসেজেনিন তৈরী করিতে চান, তাঁহারা জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর (মণ্ডি হাউস, লিটন রোড, নয়াদিল্লী-১) সঙ্গে পত্রালাপ করিতে পারেন।

তেজস্ক্রিয়ার পরিণতিতে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মৃত্যুর সম্মুখীন

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ লিনাস পলিং বলিয়াছেন যে, গত ১৪ বছরে যে সকল

পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে।

ডাঃ পলিং ক্যালিফোর্নিয়ার প্রয়োগ বিজ্ঞান পরিষদের গেটস্ অ্যাণ্ড ক্রেলিন লেবরেটরীর ডিরেক্টর। জনসভায় এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যে সকল পরমাণু বোমা ফাটানো হইবে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিবে।

ডাঃ পলিং ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনারেরী ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেড় লক্ষ লোক রক্তে লোহিত কণিকার অভাব ও অস্থি-র ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মানুষের প্রজনন-যন্ত্রের উপর তেজস্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজনিত রোগে মারা যাইবে দেড় লক্ষ; আর কার্বন-১৪ নামক তেজস্ক্রিয় উপাদানের দরুণ আগামী এক হাজার বছরে সাড়ে বার লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিবে।

তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পরিণতিতে ১৫ হইতে ৩০ হাজার লোক ক্যান্সার ও অনুরূপ পরিমাণ লোক প্রজনন-শক্তির উপর প্রতিক্রিয়াজনিত রোগে মারা যাইবে।

চোখে দেখার চশমার সঙ্গে কানে শোনবার চশমা

সেমি-কণ্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহীর সদ্ব্যবহার করিয়া সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা কানে শোনবার এক অভিনব চশমা উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ চশমার ফ্রেমেই বৈদ্যুতিক শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রাংশগুলি সংযুক্ত করা যায়। চোখের চশমার ফ্রেমের সঙ্গে একটি হাতলের মধ্যে থাকে ওষুধের বড়ির আকারের একটি ছোট ব্যাটারী। ফ্রেমের সঙ্গে আঁটা ঐ ব্যাটারীটি চোখে পড়ে না। কানে শোনবার চশমা যখন খুলিয়া লওয়া হয়, তখন ব্যাটারীর সংযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক সপ্তাহ ব্যাটারী সক্রিয় থাকে। তাহার পর রি-চার্জ করবার সহজ ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থাও শোনবার চশমার সঙ্গেই দেওয়া হয়।

চার মিনিটের মৃত্যু

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এর এক বিবরণীতে প্রকাশ, গ্লাসগোর একটি হাসপাতালে একজন ৬৬ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির চার মিনিটের জন্য "মৃত্যু" ঘটিলেও তাহার স্নায়ুমণ্ডলের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই।

জার্নালে এই সম্পর্কে দুইজন শল্য-চিকিৎসকের, মিঃ ডব্লিউ. বারনেট ও মিঃ এ. এন. স্মিথ—মন্তব্য প্রকাশিত হয়। চিকিৎসকগণ বলেন, রোগীর হার্নিয়া অপারেশনের চার ঘণ্টা পরে একজন নার্স অকস্মাৎ লক্ষ্য করেন যে, রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগীর জন্য তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। শল্য-চিকিৎসকগণের মতে, চার মিনিট পরে রোগীর দেহে পুনরায় রক্ত-সঞ্চালন সুরু হয়। পনেরো ঘণ্টা পরে লোকটি শয্যার উপর উঠিয়া বসে এবং কথাবার্তা বলিতে থাকে। তাহার কথার মধ্যে কিছুটা জড়তা থাকিলেও তাহার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে নাই এবং পর দিবস তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

শল্য-চিকিৎসকেরা বলেন, এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য কথা হইল এই যে, ইহার ফলে রোগীর স্নায়ু-মণ্ডলের কোন ক্ষতি হয় নাই।

তুষার-মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান

হিমালয়ের গিরিকন্দরে তুষার-মানবের (ইয়েতি) অস্তিত্ব নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। তুষার-মানবের খোঁজে বহু অভিযাত্রী-দল দুর্গম গিরি অতিক্রম করে নেপাল, তিব্বত, ভুটানের উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সকলেই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন।

তুষার-মানবের অনুসন্ধান এখনও থেমে যায়

নি। এবারে মিঃ ওয়াইম্যান ক্যারল একজন মার্কিন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ তুষার-মানবের খোঁজে বেরিয়েছেন। তিনি সিকিমে তাঁর অনুসন্ধান চালাবেন। এই প্রথম সিকিমে তুষার-মানবের খোঁজ করা হচ্ছে।

৬ই সেপ্টেম্বর গ্র্যাণ্ড হোটেলে মিঃ ক্যারল তাঁর অনুসন্ধান পরিকল্পনার কথা সাংবাদিকের কাছে বলেন। সিকিমের মহারাজকুমারও পাশে ছিলেন। সিকিম রাজ্য থেকে মিঃ ক্যারলকে নানাভাবে সাহায্য করা হচ্ছে।

মহারাজকুমার বলেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর মতে তুষার-মানবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। তবে বছর কুড়ি আগে সিকিমের এক জায়গায় তিনটি লোক তুষারপাতে আট্‌কা পড়ে। এক গিরিপথের কাছে তাদের রাত কাটাতে হয়। তখন নাকি ঐ তিনজনকে এক অতিকায় অদ্ভুত জন্তু আক্রমণ করে। ৫০।৬০ গজ দূর থেকে কাঠ ছুঁড়ে মারে। তারা জন্তুটিকে দেখতে পায় নি। দুজন কোনক্রমে অক্ষত দেহে গ্যাংটক ফিরে আসে। কিন্তু কিছু দিন পর তারাও হঠাৎ মারা যায়। তাছাড়া তুষার-মানব সম্পর্কে আছে নানা-রকম কাহিনী, নানারকম গুজব।

মহারাজকুমার বলেন, ছ-বছর আগে প্রায় ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে তিনি তুষারস্তূপের গায়ে এক অতিকায় পদচিহ্ন দেখতে পান। তার ছবি কোন কোন কাগজে ছাপাও হয়েছে। তবে সেটা তুষার-মানবের কিনা, বলা মুশকিল।

তিনি আরও বলেন, তিব্বতে অতিকায় এক জাতের প্রাণী আছে। তাদের নাম ট্রামো। তিনি একটি মৃত ট্রামোর ধূসর রঙের চামড়া দেখেছেন। ট্রামোকে তুষার-মানব বলে ভুল করা হয় কিনা, কে জানে।

মিঃ ক্যারল বলেন, তাঁর ইচ্ছা—তুষার-মানবকে জীবন্ত ধরে আনেন। যদি দেখা পান, তাহলে তাকে গুলী করবেন না। এয়ার রাইফেলের ভিতর একটি সিরিঞ্জে ঘুমের ওষুধ পোরা থাকবে। ট্রিগার টিপলেই সিরিঞ্জ ঢুকে পড়বে প্রাণীটার দেহে, আর সে তখনই ঘুমিয়ে পড়বে।

মিঃ ক্যারোলের ধারণা, তুষার-মানব যদি সত্যই থেকে থাকে, তবে তা হয়তো কোন অতিকায় বানর শ্রেণীর প্রাণী। তিনি দক্ষিণ সিকিমের জংরী বলে এক জায়গায় খোঁজ করবেন। সঙ্গে থাকবে অভিযানের ব্যয়বাহক মিঃ নরওয়ার্ড, দুটি শিকারী কুকুর আর গোটাকয়েক কুলি।

মহাশূন্যে যাত্রা

মার্কিন রকেট-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভন ব্রাউন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী বৎসর একজন মানুষকে মহাশূন্যে প্রেরণের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ষ্টার্টগার্ট-এ (পঃ জার্মেনী) এক ভাষণে তিনি বলেন, প্রথমে একটি রেডষ্টোন রকেটে একজন মানুষকে ১৮৫ মাইল উপরে পাঠান হইবে। ছয় মিনিট মহাশূন্যে অবস্থানের পর সে পুনরায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। ইহা হইতে কক্ষপথে ভ্রমণের ফলে একজন মানুষের দৈহিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, তাহা জানা যাইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে প্যারাসুটে করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে পারিবে।

ইহার পর অ্যাটলাস রকেটে করিয়া একজনকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হইবে। এই রকেটের পাল্লা পাঁচ হাজার মাইল।

ডঃ ব্রাউন বলেন, তাঁহার আমেরিকা প্রত্যা-বর্তনের পর মার্কিন সৈন্যবাহিনী ৪৫ কিলোগ্র্যাম ওজনের একটি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত করিবেন। উহা দ্বারা সূর্যরশ্মি সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্য আহরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন—১৯৫৯

বিজ্ঞান কলেজের
পদার্থবিদ্যা বিভাগের
বক্তৃতা কক্ষ

২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৯
শনিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

কার্য বিবরণী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৩ জন সভ্য যোগদান করেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত কার্যসূচী অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে সভার কার্য আরম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের নির্বাচিত কর্মসচিব শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত থাকায় সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে অন্যতম সহযোগী কর্মসচিব শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা পরিষদের আলোচ্য বছরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও আশা আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে এই বিবরণীতে যথোচিত আলোচনা করা হয়। এই বিবরণীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত সভ্যগণ সবিশেষ অবহিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই বার্ষিক বিবরণী গ্রহণ করেন।

উক্ত বিবরণীর প্রারম্ভেই আলোচ্য বছরে পরিষদের সভ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং উপস্থিত সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া এই বরেণ্য বিজ্ঞানীর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

পরীক্ষিত হিসাব ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের গত দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কর্তৃক ১৯৫৮-৫৯ সালের আয়-ব্যয়, উদ্বৃত্তপত্র প্রভৃতির পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক ১৯৫৯-'৬০ সালের জন্য নির্দিষ্ট আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ-পত্র মুদ্রিতাকারে পরিষদের নিয়মানুযায়ী সভ্যগণের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহযোগী কর্মসচিব শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা সভ্যগণের অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সভ্যগণের অভিমত গ্রহণের পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও বরাদ্দ-পত্র সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের নিয়মাবলী অনুসারে কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য পদের জন্য সভ্যগণের প্রেরিত মনোনয়নপত্র ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির

সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯-'৬০ সালের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় :—

কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—সভাপতি
শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র—সহঃ সভাপতি
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল— „
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়— „
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী— „
শ্রীসুবোধনাথ বাগচী— „
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র— „
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ—কর্মসচিব
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা—সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়— „
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ

কার্যকরী সমিতির সদস্য

১। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
২। শ্রীগৌরদাস মুখার্জী
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
৫। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
৬। শ্রীমুক্তিসাধন বসু
৭। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
৮। শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
৯। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১০। শ্রীঅমূল্যধন দেব
১১। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
১২। শ্রীসত্যব্রত দাশগুপ্ত
১৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৪। শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
১৫। শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত

সারস্বত সংঘ গঠন

পরিষদের সারস্বত সংঘের সংঘ-সচিব শ্রীমহাদেব দত্ত সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিভিন্ন শাখা-সংঘের সভ্যবৃন্দ দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ গতানুগতিকভাবে প্রতি বছর নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন শাখার সভ্যগণের উৎসাহ, উদ্যম ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত সংঘের নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অতএব কিছু সংখ্যক উৎসাহী ও কর্মনিষ্ঠ সভ্য নির্বাচিত করিয়া বিভিন্ন শাখা-সংঘগুলিকে পুনর্গঠিত করা আবশ্যক। বিভিন্ন শাখার এরূপ সভ্যের নাম আলাপ-আলোচনার দ্বারা সকলের সমবেত চেষ্টায় স্থির করা যাইতে পারে। অতঃপর তিনি বর্তমানে বিভিন্ন শাখার সভ্যগণকেই পুনর্নির্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। এমতাবস্থায় সভাপতি মহাশয় সারস্বত সংঘের পুনর্গঠন সাপেক্ষে বর্তমান সভ্যগণকেই নির্বাচনের প্রস্তাব করেন এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন

গত বছরের নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চাটার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট মহাশয় গত কয়েক বছর যাবৎ পরিষদের হিসাব-পত্র বিশেষ দক্ষতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তিনি পরিষদের সভ্যও বটেন। অতএব সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতাকেই ১৯৫৯-'৬০ সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়।

অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

এই বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণী ও প্রস্তাব সমূহ বিধি-সম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য

নিম্নলিখিত সভ্যগণকে অনুমোদক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়:

১। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
২। শ্রীশশীমোহন চক্রবর্তী
৩। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৪। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
৫। শ্রীঅমূল্যভূষণ গুপ্ত

অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উক্ত পাঁচ জন নির্বাচিত অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হইলে তাহা যথোচিতভাবে গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিবিধ অতিরিক্ত প্রস্তাব

ভারত সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক একটি নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত হইয়া থাকে। যদি সেই প্রতিষ্ঠান সরকারের আয়কর-বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতএব এরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, আমাদের বিজ্ঞান পরিষদ যাহাতে আয়কর মুক্তির এরূপ সরকারী অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সত্বর যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কর্মসচিব মহাশয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সভাপতির ভাষণ

অধিবেশনের কার্যসূচী অনুসারে উল্লিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হইবার পরে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ ও সরল ভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জনগণের মধ্যে পরিবেশনের উপযোগিতা বর্ণনা করেন, এবং বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক এবং তাহা মাতৃভাষায়ই সম্ভব। অতঃপর তিনি উপস্থিত সভ্যগণের নিকট পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সফল করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করেন।

তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ শ্রীসত্যেন বসু — সভাপতি
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা — কর্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর :—

১। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
২। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
৪। শ্রীঅমূল্যভূষণ গুপ্ত
৫। শ্রীশশীমোহন চক্রবর্তী

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৫৯ | দশম সংখ্যা

সুদূর পিয়াসীর এক অজানা অধ্যায়*

শ্রীআশীষকুমার মাইতি

যুগ যুগ ধরে শুধু মানুষই যে অসীম সাগরের বুকে পাল তুলে বেরিয়ে গেছে, তা-ই নয়—এই বিশাল প্রাণী-জগতে তার অনেক বন্ধুকেও যেতে হয়েছে পরিচিত সীমানার বাইরে, অনেক অনেক দূরে, কেবল মাত্র বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে—হয় নিজের, না হয় বংশধরের মধ্য দিয়ে। আবার প্রয়োজনের তাগিদ শেষ হলেই তারা অনুভব করে কিসের যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ—শান্তি, নিরাপত্তা, হয়তো বা মাটির আকর্ষণ। তাই তারা সবাই ফিরে যেতে চায় তাদের পরিচিত গণ্ডীর ভিতর—তাদের চিরমধুর নীড়ের ছায়ায়। তাই দেখি, মানুষের পথ-নির্ণয়ের পদ্ধতির ইতিহাস বহু যুগের বৈজ্ঞানিক দানে সমৃদ্ধ হলেও তা শুধু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর তাদের জটিল কর্মপদ্ধতির নিখুঁত বিবরণ। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে বৈমানিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই পাখীরা উড়ে গেছে পৃথিবীর এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে। কম্পাসের কাঁটার কথা না জেনেও ঈল্-মাছ নির্ভুলভাবে ফিরে এসেছে মহাদেশীয় নদীর মোহানায়, অ্যাটলাণ্টিকের মহাগভীর থেকে; আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে ক্ষুদে পিঁপড়েরা ফিরে গেছে তাদের বাসায়।

জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে যে পদ্ধতিতে প্রাণীরা নির্ভুলভাবে দিক-নির্ণয় করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, সে এক বিচিত্র কাহিনী। অসীম সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ঈল-মাছ যখন সাঁতার কেটে তার নির্দিষ্ট জায়গায় ডিম পাড়তে যায়, কিংবা পাখীরা শুধু ডানায় ভর করে তুষার আর বরফের দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে যায় উষ্ণমণ্ডলের সবুজ দেশের আশায়, তখন আমরা কি চিন্তা করে দেখি, এদের দিক-নির্ণয়ের পদ্ধতি কত উন্নত? কারণ এতে একটু ভুল হলেই এরা হারিয়ে যাবে—ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিল যাযাবর। তারা ঘুরে বেড়াতো আর পথ নির্ণয় করতো যে ভাবে আমরা আজও করি। সাধারণভাবে আমরা পথ নির্ণয় করি খুব সহজ উপায়ে—কতকগুলি স্থায়ী জিনিষকে চিনে রেখে সেগুলি দেখে দেখে আমরা যাতায়াত করি—যেমন পরিচিত পথের

মোড়, পরিচিত বাড়ী, মন্দির বা গীর্জা, পাহাড়, নদী, গাছ, আরও কত কি। কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র কিংবা মরুভূমির বুকে স্থায়ী কোন চিহ্ন নেই। তাই তখন মানুষের দরকার হয় কতকগুলি জটিল যন্ত্রপাতির, যেমন—কম্পাস, ক্রোনোমিটার প্রভৃতি।

এত জটিলতা মেনে নিয়েও মানুষ দূর-দূরান্তরে যেতে চায়; কারণ তার মূলে রয়েছে প্রলোভন—ধনরত্ন, নতুন দেশ, রোমাঞ্চ, আরও কত কিছুর। কিন্তু পশুপাখীর বেলায় এই প্রলোভন অন্য কিছুর, যেমন—খাদ্যের সন্ধান, ডিম পাড়া বা বাচ্চাদের বড় করে তোলবার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া প্রভৃতি। তবে এদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, মানুষ বেরিয়ে পড়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাবার ইচ্ছা নিয়ে; কিন্তু অন্য প্রাণীরা প্রায়ই তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তারা বেরিয়ে পড়ে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ঈপ্সিত জায়গায় পৌছানো যায় কি করে।

আকাশপথে দিক-নির্ণয়

সারাদিন ধরে আকাশে উড়ে বেড়াতে যাদের দেখা যায় তারা হচ্ছে পাখী। পাখীরা যে কোন নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই উড়ে বেড়ায়, তা নয়, বিশেষ বিশেষ জাতের পাখীরা প্রতি বছর প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্নের বহু উপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে দেশ-দেশান্তরে যায়, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেখান থেকে আবার তারা ফিরে আসে সেই পুরনো নীড়ে।

যেমন মেরুপ্রদেশের টার্ণ পাখী—উত্তর মেরুর ক্যানাডিয়ান আর্কটিকে এরা নীড় বাঁধে; কিন্তু সেখানে শীতকাল এলেই তারা অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের পাশ দিয়ে এসে পৌছায় দক্ষিণ মেরুতে। সেখানে কিছুকাল কাটাবার পর উত্তর মেরুতে গ্রীষ্মকাল পড়লে আবার ফিরে যায় উত্তর মেরুতে। কার্লিউ পাখী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে (পলিনেশীয়ায়) শীতকাল কাটিয়ে বাচ্চা ফোটাবার জন্যে উড়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে পশ্চিম আলাস্কাতে, যার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৬০০০ মাইল; আর এর মধ্যে প্রায় ২০০০ মাইল পথ শুধু উন্মুক্ত সাগরের উপর দিয়ে, যার কোন দিকে কোন স্থায়ী চিহ্ন নেই। অবশ্য এতটা পথ তারা অবিরাম উড়ে আসে না, মাঝে মাঝে সামুদ্রিক দ্বীপে বা অন্য কোথাও বিশ্রাম করে নেয়। এক ধরণের হাঁস সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চল ও হিমালয়ের মানস সরোবরের ধারে থাকে। শীতকালে তারা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের খোঁজে হিমালয়ের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে কলকাতায় এসে পৌছায়। এখানে তারা বিশ্রাম নেয় লবণ হ্রদের ধারে বা আলিপুর চিড়িয়াখানার মধ্যে। তারপর আবার উড়ে যায় ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূল ধরে জাভা দ্বীপ পর্যন্ত।

পর্যবেক্ষণের ফলে আজ আমরা পাখীদের বিদেশ-যাত্রার অনেক খুঁটিনাটি এবং তাদের যাত্রাপথ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কিন্তু আগে পাখীদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অন্য রকম ছিল। তখন বিশ্বাস করা হতো যে, পাখীরা শীতকালে পুকুরের কাদার মধ্যে গর্ত করে ঘুমিয়ে থাকে, কিংবা শীতকালে তারা চিলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন বোঝা গেল যে, শীতকালে পাখীরা উড়ে অন্য কোথাও চলে যায়—তখন অনেকে বিশ্বাস করতো যে, তারা উড়ে চাঁদে চলে যায়।

কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে যে ভাবে পাখীদের সম্বন্ধে এত তথ্য জানা গেছে তা সাধারণতঃ এই—একটা ধাতব চাকতিতে প্রয়োজনীয় কথা লিখে সেটা পাখীর ডানায় বা পায়ে এঁটে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে পাখীটাকে যেখানে দেখা যায়, সেখানে তার সম্বন্ধে একটা বিবরণ রেখে

আবার তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পাখীদের যাত্রাপথ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ জানা যায়। তাছাড়া গবেষণাগারে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজনমত কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করেও তাদের সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হয়।

দূরের জায়গা থেকে নীড়ে ফিরে আসবার ক্ষমতা পায়রার সবচেয়ে বেশী বলে পায়রা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

পায়রাকে যেভাবে দূর থেকে নীড়ে ফিরতে শিক্ষা দেওয়া হয় তা সাধারণতঃ এই যে, প্রথম বারে তাদের অল্প দূরত্ব থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তার পরের বারে আরও একটু বেশী দূর থেকে, তারপর আরও একটু বেশী দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে তাদের নীড়ে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। কুয়াশা বা খারাপ আবহাওয়ায় বহু পায়রা হারিয়ে যায়, তারা নীড়ে ফিরতে পারে না। তাই মনে হয়, হয়তো এরা স্থায়ী কতকগুলি চিহ্ন দেখে পথ ঠিক করতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন বা অজানা জায়গা থেকেও অনেক পায়রা ঘরে ফিরে আসতে পারে। তাহলে কি এটা সম্ভব যে, তাদের যখন নীড় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা পথের বাঁকগুলি মনে রাখে, আর সেই অনুযায়ী রাস্তা চিনে ফিরে আসে? কিন্তু অনেক পায়রাকে ঘূর্ণীয়মান বাক্সে করে নিয়ে যাবার সময় পথের বাঁক সম্বন্ধে তাদের কিছুই জানতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাতেও বাসায় ফিরে আসতে তাদের অসুবিধা হয় নি। কাজেই মনে হয়—এদের পথ নির্ণয়ের কোন স্বাভাবিক পন্থা থাকাই সম্ভব। পৃথিবীর দুটি চুম্বক-প্রান্ত আছে। তাদের মধ্যে অসংখ্য চুম্বক শক্তিরেখা চলে গেছে। কম্পাসের কাঁটার যেমন চুম্বক প্রান্ত নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে, এই সব পাখীদেরও হয়তো তেমন কোন ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু পাখীদের একদিকের ডানায় একটা শক্তিশালী চুম্বক বেঁধে তাদের উড়িয়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, এতে তাদের দিক-নির্ণয়ের কোন অসুবিধা হয় নি। সুতরাং পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি এদের সম্ভবতঃ কিছুই সাহায্য করে না। পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তনের ফলে আরও এক রকম শক্তিরেখার সৃষ্টি হয়, যাকে বলে কোরিয়োলির শক্তিরেখা (Corioli's force)। পাখীর অন্তঃ-কর্ণের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকৃতি যেসব নালী আছে, তাদের মধ্যেকার তরল পদার্থের উপর এই শক্তি হয়তো কাজ করতে পারে, যার ফলে পাখীরা দিক-নির্ণয়ে সক্ষম হয়। কিন্তু কতকগুলি পাখীর ঐ নালীগুলির ক্ষুদ্রতা দেখে মনে হয়—হয়তো এও সম্ভব নয়। আমরা এ-পর্যন্ত সব সম্ভাবনা বাতিল করে এসেছি; তার কারণ, এগুলির সত্যতা প্রমাণ করবার মত প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা আজও পাই নি। অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চা পাখীরা তাদের পিতামাতার সহায়তা ব্যতিরেকেই দেশান্তরে যাত্রা সুরু করে। যে পথে তারা জীবনে এর আগে কখনও যায় নি, সেই পথ দিয়ে তারা যে রকম নিখুঁতভাবে দিক-নির্ণয় করে, তাতে মনে হয়, তাদের এ ক্ষমতা হয়তো জন্মগত। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বাচ্চাদের এই জন্মগত ক্ষমতা তাদের শুধু একটা সাধারণ দিক-নির্ণয়ের সহায়তা করে; কিন্তু সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান তারা পায় বড়দের সঙ্গে চলাফেরার অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারণতঃ পাখীরা দিনের বেলায়, বিশেষ করে মেঘ বা কুয়াশা-শূন্য পরিষ্কার দিনে যাতায়াত করে। এ-থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃই মনে করছেন যে, পাখীরা খুব সম্ভব সূর্যের সাহায্যেই দিক-নির্ণয় করে যাতায়াত করে থাকে। জার্মেনীর ডাঃ ক্রেমার একটি পরীক্ষা করেন। একটি খাঁচার চারদিক ঢেকে দিয়ে ঢাকনার গায়ে কয়েকটি জানালা কেটে দেন। ঐ খাঁচার মধ্যে একটি পাখী ছেড়ে দিয়ে খাঁচার তলায় শুয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, যখনই আকাশে সূর্যের কোন অংশ দেখা যায়, কেবল মাত্র তখনই পাখীটি ওড়বার চেষ্টা করে।

তিনি আরও দেখেন যে, যে দিক থেকে সূর্যের আলো আসে, মোটামুটিভাবে সেই দিকে মুখ করে পাখীটি ওড়বার চেষ্টা করে। ঐ জানালাগুলিতে আয়না লাগিয়ে আলোর প্রবেশ-পথ বদ্‌লে দিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, পাখীটিও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই অনুযায়ী নিজের ওড়বার দিক পরিবর্তন করেছে। ডাঃ ম্যাথিউস একটা তাঁবুর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে একটি কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টি করে পরীক্ষা চালান। তিনি দেখেন যে, ঐ কৃত্রিম সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী পাখীটি একটি নির্দিষ্ট বাক্স থেকে খাবার খেতে শিখে; কিন্তু ঐ সূর্যের অবস্থান বদ্‌লে দিলেই সে আর একটি খালি বাক্স থেকে খাবার নেবার চেষ্টা করে, যে বাক্সটা সূর্যের নতুন অবস্থান অনুযায়ী অবশ্য সেই পুরনো বাক্সের জায়গায়ই রয়েছে।

যে সব পাখী রাত্রে দূর পাল্লার পাড়ি দেয়, তারা যে সাধারণতঃ চাঁদ বা অন্য কোন তারা লক্ষ্য করে দিক-নির্ণয় করে থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে—সূর্য, চাঁদ বা তারার সাহায্যে দিক-নির্ণয়ের এই ক্ষমতা পাখীদের জন্মগত।

কিন্তু শুধু দিক-নির্ণয় করেই নির্ভুলভাবে যাত্রা করা সম্ভব নয়। এর জন্যে আরও প্রয়োজন একটি নির্ভুল সময়-রক্ষক যন্ত্র বা ঘড়ির। তাই অনেকে মনে করেন যে, পাখীরা হয়তো তাদের শরীরের মধ্যে কোন অদৃশ্য এক সজীব ক্রোনোমিটার বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পাখীদের দিক-নির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতি জানবার এখনও অনেক বাকী। সম্ভবতঃ কোন একটি পদ্ধতি সব পাখীর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। তাই এই সত্যের সন্ধান এখনও চলছে এবং আরও চলবে।

স্থলপথে দিক-নির্ণয়

আমরা প্রতিদিন কি ভাবে দিক-নির্ণয় করে যাতায়াত করি তা আগেই বলেছি। সাধারণতঃ খুব ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (যেমন—ইঁদুর) বাসা ছেড়ে প্রায় দেড় মাইলের বেশী দূরে যায় না। ২½ মাইল বা ৪ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে এরা আর কোনদিনই বাসায় ফিরতে পারে না। গৃহপালিত জন্তুজানোয়ারের মধ্যে বিড়াল, কুকুর বা ঘোড়ার রাস্তা চিনে বাড়ী ফিরে আসবার কথা অনেক সময় মজার গল্পের খোরাক যোগায়। বিড়ালকে নতুন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিলেও সে ঠিক রাস্তা চিনে কি ভাবে বাড়ী ফিরে আসে, তা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ঘোড়া সাধারণতঃ দূরে যাবার সময় রাস্তার স্থায়ী চিহ্নগুলি চিনে রাখে এবং সেগুলি দেখে আবার ফিরে আসতে পারে। কয়েকটা ঘোড়াকে চোখ বেঁধে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, তারা আর ফিরে আসতে পারে না, শুধু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরদের উপর যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণ অজানা জায়গা থেকেও তারা নিজেদের বাসায় ফিরে আসতে পারে। তাদের ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা, আর রাস্তা চেনবার ক্ষমতার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করলে মনে হয়, এদের ঘ্রাণশক্তিও এদের রাস্তা চিনতে বা দিক-নির্ণয় করতে খুবই সাহায্য করে।

এখন দেখা যাক—ক্ষুদে পিঁপড়েরা, বিশেষতঃ যারা অন্ধ (যেমন—কয়েক জাতের পিঁপড়ে, আর উই পোকা), তারা কি ভাবে রাস্তা চিনতে পারে।

আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, একটা ছোট ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত হয়তো আমাদের কাছে কিছুই নয়, কিন্তু একটা ক্ষুদে পিঁপড়ে বা অন্ধ উইপোকার পক্ষে এই দূরত্বই একটা বিরাট অজানা দেশের মত সমস্যার কারণ হতে পারে। এসব সামাজিক কীট-পতঙ্গের সবাই যে খাবারের সন্ধানে যায় তা নয়, কতকগুলি কর্মী (যাদের সংখ্যা অতি অল্প) বেরিয়ে

যায়, আর তাদের পথ চেয়ে বাসার হাজার হাজার অন্য অধিবাসীরা বসে থাকে। যদি ঐ কর্মীরা ফিরে না আসে তবে বাসার সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাবে। কাজেই এদের পক্ষে নিখুঁত দিক-নির্ণয় কতটা প্রয়োজনীয় তা সহজেই বোঝা যায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে—চোখ থাক আর নাই থাক, এরা তাদের মাথার দু-পাশের শুঁড় দিয়ে সব কিছু অনুভব করতে পারে। কারণ আমাদের জীভে স্বাদ অনুভব করবার জন্যে যে অনুভূতিশীল কোষগুলি আছে, সেগুলি পিঁপড়েদের শুঁড়ের মধ্যেই থাকে। তাই এই বিশেষ ধরণের দিক-নির্ণয়ের পদ্ধতিকে এরা কাজে লাগায়—শুধু মাটির উপরেই নয়, অন্ধকার বাসার ভিতরে চলাফেরা করবার জন্যে বা সেখানে অন্ধকারের মধ্যে শত্রু-মিত্র চেনবার জন্যেও। পিঁপড়েরা যে লাইন বেঁধে চলে, সেই লাইন আঙ্গুল দিয়ে মুছে দিলে দেখা যায়—যেটুকু জায়গা মুছে দেওয়া হয়েছে, তার দু-ধারে পিঁপড়েরা এসে থমকে দাঁড়ায় এবং বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আস্তে আস্তে আবার তাদের পুরনো রাস্তা খুঁজে বের করে এবং আগের মতই সার দিয়ে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। কিন্তু এক টুক্‌রা তুলা ওদের লাইনের উপর বুলিয়ে দিলে তাতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। তাই মনে হয়, ওরা যে রাস্তা তৈরী করে যাতায়াত করে, সেই রাস্তায় একরকমের গন্ধ মাখিয়ে দেয় এবং সেই গন্ধ চিনে এরা রাস্তা খুঁজে নেয়। কিন্তু আঙ্গুল বুলিয়ে দিলে ঐ রাস্তায় নতুন যে অচেনা গন্ধ হয়ে যায়, তাতে এরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্ভবতঃ তুলায় নতুন কোন গন্ধ থাকে না বলে রাস্তা চিনতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

স্থলপথের প্রাণীদের দিক-নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হয়তো আকাশ পথ বা জলপথের প্রাণীদের পদ্ধতির গবেষণার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু স্থলপথে গমনাগমনের জন্যে বিভিন্ন প্রাণী যে পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না বললেই হয়।

জলপথে দিক-নির্ণয়

পাখীদের আকাশপথে গমনাগমন আমরা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকি; কিন্তু গভীর সমুদ্রে অনেক মাছও যে দল বেঁধে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয়, তা আমরা অনেকেই জানি না। যারা সমুদ্রে নিয়মিত মাছ ধরে তারা অনেক সময় বলে যে, বিশেষ একজাতীয় মাছ একটা বিশেষ সময়ে এক জায়গায় প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ মাছেরা গভীর সমুদ্রে ভ্রমণ করবার সময় যে ঐ পথ দিয়ে যায়, এ ধারণা হয়তো তাদেরও নেই; কারণ জলের উপর থেকে ভ্রাম্যমান মাছের ঝাঁকের সম্বন্ধে কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

টুনি মাছেরা বেশ কয়েক হাজার মাইল ধরে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর সমুদ্রযাত্রা করে। এরা ডিম পাড়ে ভূমধ্যসাগর এবং তার কাছাকাছি পূর্ব অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে। তারপর তারা দল বেঁধে যাত্রা সুরু করে উত্তর দিকে। প্রথমে বৃটেনের পশ্চিম উপকূল ধরে, তারপর স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত ঘুরে এরা উত্তর সাগরে এসে পড়ে। গ্রীষ্মকালটা উত্তর সাগরে কাটিয়ে তারা আবার ফিরে যায় ভূমধ্যসাগরে—ডিম পাড়বার জন্যে যে পথে এসেছিল ঠিক সেই পথে। আশ্চর্যের কথা এই যে, বড়রা উত্তর সাগরে পৌঁছাবার অনেক পরে বাচ্চারা পৌঁছায় ঠিক সেই জায়গায়—বড়দের সাহায্য ছাড়াও তারা নির্ভুলভাবে ঠিক রাস্তা খুঁজে নেয়।

ঈল্‌মাছের সমুদ্র-যাত্রা আরও আশ্চর্যজনক। সাধারণতঃ ইউরোপের নদীসমূহ এবং ভূমধ্য-সাগর থেকে ঈল্‌মাছেরা যাত্রা সুরু করে। হাজার হাজার মাইল কোন স্থায়ী চিহ্নবিহীন

অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে তারা এসে পৌঁছায় শৈবাল সাগরে (Sargasso sea)। এখানে গভীর সাগরে ডিম পাড়ে এবং তারপর সেখানেই তারা মৃত্যু বরণ করে। এদের ডিম থেকে এক অদ্ভুত চ্যাপ্টা ধরণের বাচ্চা জন্মায়, যার বৈজ্ঞানিক নাম লেপ্টোসিফেলাস। এইগুলি স্রোতে ভেসে ইউরোপের উপকূলে পৌঁছায় এবং সেখানেই বাচ্চাগুলি ধীরে ধীরে ঠিক ঈল্‌মাছের আকৃতি পরিগ্রহ করে নদীগুলির ভিতরে গিয়ে বসবাস সুরু করে। এরা বড় হলে আবার যাত্রা সুরু করে এদের পিতা-মাতার মত—আবার শৈবাল সাগরের উষ্ণ জলে ডিম পেড়ে সেখানেই মৃত্যু বরণ করে।

সমুদ্রের এই জাতীয় দূরাভিসারী মাছেরা স্রোতের প্রবাহের দিক লক্ষ্য করে নিজেদের পথ ঠিক করে কিনা, সে সম্বন্ধে যেসব পরীক্ষা হয়েছে তাতে এই উপায় এদের পক্ষে সহায়ক বলে মনে হয় না। সমুদ্রের তলার কাছাকাছি থাকলেই এদের পক্ষে স্রোত-প্রবাহের দিক বুঝতে পারা সম্ভব। কিন্তু জলের অত গভীরে সাধারণতঃ এরা যাতায়াত করে না। ষ্টিক্‌ল্‌ব্যাক মাছের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তারা স্রোতের গতি আর প্রবাহের দিক বুঝতে পারে কেবল মাত্র চোখের সাহায্যে; অর্থাৎ স্থায়ী কতকগুলি চিহ্ন লক্ষ্য করে—যেমন, জলের তলার নুড়িপাথর বা জলজ ঘাসপাতা ইত্যাদি দেখে।

একটি ষ্টিক্‌ল্‌ব্যাক মাছকে একটা কাচের পাত্রে জল দিয়ে তাতে ছেড়ে সেই পাত্রের চতুর্দিকে একটি সাদা-কালো ডোরাকাটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর যখন ঐ জলের পাত্রটিকে একটা টার্ন-টেবিলের উপর রেখে একদিকে ঘোরানো হয়, তখন মাছটি ঐ ডোরাকাটা স্থির পর্দা অনুযায়ী নিজের অবস্থান স্থির রাখবার জন্যে প্রাণপণে স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে থাকে। পরে জলপাত্রটিকে স্থির রেখে চারপাশের পর্দাটিকে ঘোরানো হলে জলের কোন স্রোত না থাকলেও মাছটি ঘূর্ণায়মান পর্দার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কিন্তু পরে ঐ ডোরাকাটা পর্দার বদলে যখন একটি সাদা পর্দা দিয়ে চারপাশ ঢেকে পাত্রটিকে ঘোরানো হলো, তখন মাছটি আর সাঁতার কাটলো না; কারণ জলের স্রোত থাকলেও মাছটি পাশের পর্দা দেখে তা বুঝতে পারে নি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, আশেপাশের জিনিষ দেখে অপ্রত্যক্ষভাবে এরা স্রোতের প্রবাহের দিক বুঝতে পারে।

পরীক্ষা করে এ-পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে মনে হয়—যে সব মাছ নদী থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করে এবং আবার সমুদ্র থেকে ফিরে এসে নদীতে বসবাস করে (যেমন, স্যামন মাছ), তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট নদী চেনবার ক্ষমতা জন্মগত নয়, তারা এটা জন্মাবার পর শিখে নেয়। কিন্তু কি করে তারা তাদের নির্দিষ্ট নদী চিনে নেয়? অনেকে মনে করেন—জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব অনুভব করে তারা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়। এ ধারণা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। এটা ঠিক যে, জলে দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষতঃ জৈব পদার্থগুলি সম্বন্ধে এরা খুবই সচেতন, আর এজন্যে এদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব উন্নত। কতকগুলি স্যামনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিপি লাগিয়ে বন্ধ করে তাদের নদী মোহানায় ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, তারা তাদের নির্দিষ্ট নদীতে ফিরে যেতে পারে না—পাশাপাশি নদী গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

ঈল্‌মাছেরা যখন নদী থেকে হাজার হাজার মাইল উন্মুক্ত সাগরের জলের মধ্য দিয়ে ডিম পাড়তে যায়, তখন তারা কিভাবে দিক-নির্ণয় করে, সেটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার। অনেকে মনে করেন যে, এরা হয়তো জলের উষ্ণতার মাত্রা বা সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা অনুভব করে তদনুযায়ী পথ নির্ণয় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গভীর সমুদ্রের

এই দুটির কোনটিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তাই যখন আমরা এদের এই নিখুঁত দিক-নির্ণয়ের পদ্ধতি কি তা কিছুতেই বুঝতে পারি না, তখন এই ক্ষমতা তাদের জন্মগত বলে মেনে নিতে বাধ্য হই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যখন নদীর ঈল্‌মাছ সমুদ্র-যাত্রার জন্যে তৈরী হয়, তখন পুকুর বা হ্রদের মধ্যে বন্দী ঈলেরাও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং যে দিকে সাঁতার কাটলে তারা সাগরে পৌঁছাতে পারে, মোটামুটি সেদিকেই মুখ করে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করে। সে জন্যে মনে হয়, হয়তো সাগর পাড়ি দেবার প্রেরণা এবং মোটামুটি দিক-নির্ণয়ের একটা সাধারণ ক্ষমতা—এ দুটাই তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। তবে এদের দেহে যে নালীশূন্য গ্রন্থি আছে, সেগুলি থেকে নিঃসৃত কোন হর্মোনও হয়তো এতে তাদের সাহায্য করে।

নীলনদ এবং পূর্ব আফ্রিকার কতকগুলি নদীতে একরকম মাছ দেখা যায় (Gymnarchus niloticus), যারা নিজে দেহের চতুর্দিকে একটা বৈদ্যুতিক এলাকা তৈরী করে। এই এলাকার মধ্যে অন্য মাছ বা আর কিছু এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তাদের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে মাছ বুঝতে পারে, তাদের শত্রু কোথায় বা সেখান থেকে পালানো উচিত কিনা। এই ধরণের ব্যবস্থায় হয়তো অল্প জায়গার মধ্যে যাতায়াতেরই সুবিধা হতে পারে, দূরতর স্থানে গমনের পক্ষে হয়তো এটা উপযোগী নয়।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও মাছের দূরতর স্থানে যাত্রাপথে হয়তো বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি দিক-নির্ণয়ে সাহায্য করে; কিন্তু প্রকৃত তথ্য আমরা আজও জানি না।

জলপথে দিক-নির্ণয়ের রহস্য এখনও মানুষের অজ্ঞাত। এ সত্য উদ্ধার করা পাখীদের দিক-নির্ণয় পদ্ধতি জানবার চেয়েও কঠিন হবে; কারণ গভীর জলের অন্ধকার রাজত্বে মানুষ এখনও হস্তক্ষেপের অবাধ অধিকার পায় নি। এ রহস্য সমাধানের ভার রয়েছে ভাবী কালের বৈজ্ঞানিকের উপর এবং তার জন্যে এখন গবেষণার কাজ সুরু হয়েছে। মাছের কান্‌কো বা লেজে ছাপ দেওয়া ছোট ধাতব চাকৃতি এঁটে তাদের সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে তাদের গমনাগমন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্যাদি জানবার জন্যে যে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, তার ফলাফল অদূর ভবিষ্যতেই জানবার আশা করা যায়।

পশু-পাখীদের দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের বিচিত্র পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করবার পর আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, সাধারণ যে কয়েকটি বাহ্যিক উত্তেজনা, যেমন—আলো, শব্দ, রাসায়নিক পদার্থ বা স্পর্শ—যেগুলি আমাদেরও দিক-নির্ণয়ের একমাত্র সম্বল, সেগুলিই বিশেষভাবে এদের সহায়তা করে। তবে পার্থক্য এই যে, এগুলির কোন কোনটার সম্বন্ধে এদের ইন্দ্রিয় বিশেষ সচেতন। আর তার জন্যে এদের এই সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির গঠনও অন্য ধরণের হয়ে থাকে। কিন্তু পশু-পক্ষীর কতকগুলি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অদ্ভুত কার্যক্ষমতা দেখে আমরা যেন এগুলিকে তাদের অত্যাশ্চর্য কোন অপার্থিব ক্ষমতা বলে ভুল না করি।

অ্যান্টিবায়োটিক্স

শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি

অ্যান্টিবায়োটিক্স আবিষ্কার জীবাণু-বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা। অ্যান্টিবায়োটিক্স কথাটা বর্তমান যুগে বহুল পরিচিত—বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিদ্‌দের নিকট; বিংশ শতাব্দীর উন্নত ও অভিনব চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের অবদান অতুলনীয়—রোগ-প্রতিষেধক হিসাবে এর ক্রিয়াকলাপ অত্যাশ্চর্য এবং আশু ফলপ্রদ।

অ্যান্টিবায়োটিক্স বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, তা হলো রোগবীজের প্রাণহানিকর কোন বস্তু বা অবস্থা। অ্যান্টিবায়োসিস সম্বন্ধে ১৮৮৯ সালে বিজ্ঞানী ভিলোমিন লিখেছেন—শিকারের উপর লম্ফ প্রদানোদ্যত সিংহ এবং ক্ষত বিষাক্তকারী সর্প পরাশ্রয়ী হিসাবে পরিগণিত নয়। এ-ক্ষেত্রে জীবন-ধারণের জন্যে একে অপরকে বিনষ্ট করে। প্রথম প্রাণী সম্পূর্ণ কর্মঠ এবং অন্যটি হীনবল। এদের সম্বন্ধকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে অ্যান্টিবায়োসিস এবং সক্রিয় অংশ-গ্রহণকারীকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োট। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ফার্মেসীতে অ্যান্টিবায়োটিক্স বলতে বোঝায়—কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের (micro organism) দেহ-নিঃসৃত বিপাকীয় পদার্থ—যা অতি অল্পমাত্রায় বর্তমান থেকেও অন্যান্য ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জীবের সজীব ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে। আরও সহজভাবে বলা যেতে পারে—অ্যান্টি-বায়োটিক্স হলো জীবাণুনাশক পদার্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জৈব-সংশ্লেষক জীবাণুর দ্বারা সঞ্চিত তরল পদার্থের অপরিস্রুত নিষ্কাশন থেকেই অ্যান্টিবায়োটিক্স তৈরী হতো, অথবা খুব কম ক্ষেত্রেই জীবাণু থেকে নিষ্কাশন করে তৈরী করা হতো। অন্ততঃ ২,৫০০ বছর আগেও চীনের লোকেরা সয়াবীন মন্থনজাত দধির রোগ উপশমের ক্ষমতার কথা অবগত ছিল এবং তা দুষ্টব্রণ, ফোঁড়া ও অন্যান্য ক্ষতে ব্যবহার করা হতো।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে অ্যান্টনী ভন্ লিউয়েনহুক কর্তৃক ব্যাক্টিরিয়া আবিষ্কৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে খুব কমই অনুসন্ধান করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই পাস্তুর, কণ এবং কক্ প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টায় জীবাণু-বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত পঠনীয় বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর ও জুবার্ট কর্তৃক থিরা-পিউটিক এজেন্ট এবং রোগ-সংক্রমণকারী হিসাবে জীবাণুর কার্যকরী শক্তি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ষ্টেরাইল ইউরিনে ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইউরিনে বাতাসে ভাসমান কোন সাধারণ ব্যাক্টিরিয়া প্রবেশ করালে ব্যাসিলাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, বরং শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৮৫ সালে কর্নিল ও বেব্‌স্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি জীবাণুর মধ্যে পরস্পর বিরোধীতার বিষয়ে বেশ কিছুটা অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে এক ব্যাক্‌টিরিয়াম-ঘটিত রোগ অন্য ব্যাক্‌টিরিয়াম দ্বারা উপশম করা সম্ভব। প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা হলো ১৮৮০ সালে Replacement Therapy প্রক্রিয়ায়—যে প্রক্রিয়ায় প্যাথোজেনিক জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত রোগীর দেহে সেই জীবাণু-প্রতিরোধকারী নন-প্যাথোজেনিক জীবাণু টীকার মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ প্রয়োগের ফলে টিউবারকিউলোসিস, ডিপথিরিয়া, অ্যান্থ্রাক্স, কলেরা, প্লেগ ও অন্যান্য রোগে উপকার পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তন হলো। এ-ক্ষেত্রে বিশেষ একপ্রকার জীবাণুর দেহ-নিষ্কাশিত পদার্থ আক্রমণকারী জীবাণুর

বিনাশসাধনে বা বৃদ্ধি-প্রতিরোধকল্পে আক্রান্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়া-নিষ্কাশিত পদার্থ সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কর্নিল ও বেব্স্-এর এরূপ স্বতঃসিদ্ধ অনুমান অনুযায়ী এক জীবাণু থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক পদার্থ মাত্রানুসারে অন্যান্য জীবাণুকে বাধা দিতে, নিস্তেজ করতে অথবা বিনাশ করতে সক্ষম কোন পদার্থ বর্তমানে অ্যাণ্টিবায়োটিক্স হিসাবে পরিচিত।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স হলো সজীব কর্মক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ— যার মধ্যে সাধারণভাবে দুটি ধর্ম বর্তমান। একটি ফিজিকো-কেমিক্যাল, অন্যটি বায়োলজিক। প্রাকৃত-রাসায়নিক ধর্ম অনুসারে পরস্পরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। আর দ্বিতীয়টি—বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ভেষজ-গুণ প্রকাশ করে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকেই অ্যাণ্টিবায়োটিক্স উৎপাদন করা হয়। এখনও উদ্ভিদই হলো বৃহত্তম উৎস—যা থেকে প্রাপ্ত ভেষজ বহুবিধ সংক্রামক রোগে কার্যকরী। কুইনাইন এবং আর কয়েকটি ছাড়া বর্তমান গবেষণার ফলে প্রাণীদেহ ও উচ্চ-স্তরের উদ্ভিদেহ থেকে এ-ধরণের এমন কোন পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নি, যা সংক্রামক-রোগ প্রতিরোধে জীবাণু উদ্ভূত অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করতে পারে। মাটিকেও পরোক্ষভাবে আর এক উৎস হিসাবে ধরা যেতে পারে; কেন না মাটিতেও অনেক জীবাণু বর্তমান—যেগুলি চিকিৎসা-ক্ষেত্রে কার্যকরী অ্যাণ্টিবায়োটিক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে প্যাথোজেনিক—এমন কোন জীবাণুর সন্ধান পাওয়ার জন্যে মাটি পরীক্ষার দ্বারা নানাভাবে গবেষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণকারী নানাপ্রকার জীবাণু বর্তমান থাকায় স্বাভাবিক মাটিতে এই ধরণের জীবাণুর পক্ষে সাধারণতঃ জীবনধারণ করা সম্ভব নয়।

কোন অ্যাণ্টিবায়োটিক পদার্থ এক জীবাণু থেকে তৈরী হতে পারে অথবা কয়েকটি বিভিন্ন প্রজাতি-ভুক্ত (Species) বা কখনও বিভিন্ন গণভুক্ত (Genus) জীবাণুর জৈব-সংশ্লেষণের ফলে সৃষ্ট হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কয়েকটি অ্যাণ্টিবায়োটিক্স নিয়ে চিকিৎসামূলক পরীক্ষা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতেই প্রায় অধিকাংশ অ্যাণ্টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত হয় এবং অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের অধিকাংশ ব্যাক্টিরিয়া, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস্ ও ছত্রাক থেকে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে এই তিনটির বিপাকীয় পদার্থ থেকে দুই শতেরও বেশী অ্যাণ্টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত হয়েছে—তবে এদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী। উচ্চ স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণী কর্তৃক জৈবসংশ্লেষণের ফলে 'Antibiotically active agents' আবিষ্কৃত হয়েছে—যা ব্যাক্টিরিয়া, ঈষ্ট, ছত্রাক প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রতিষেধক। জৈবসংশ্লেষক জীবাণুর শ্রেণীভেদে অ্যাণ্টিবায়োটিক্ পদার্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হলো।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের নাম	সংশ্লেষকের বিভাগ	জৈব উৎস		জীবাণু—যার বিরুদ্ধে কার্যকরী	আবিষ্কারের কাল।
বেসিট্রেসিন	ব্যাক্টিরিয়া	ব্যাসিলাস্	সাবটিলিস	গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়া	১৯৪৫
গ্র্যামিসিডিন	,,	,,	ব্রেভিস	,,	১৯৪১
পলিমিক্সিন-এ	,,	,,	পলিমিক্সা	গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া	১৯৪৭
প্রোটাপ্টিন	,,	,,	প্রোটিয়াস	মাইকো-ব্যাক্টিরিয়া	১৯৫১

অ্যান্টিবায়োটিক্সের নাম	সংশ্লেষকের বিভাগ	জৈব উৎস	জীবাণু—যার বিরুদ্ধে কার্যকরী	আবিষ্কারের কাল।
পায়োসায়ানেজ	,,	সিউডোমোনাস আরুগিনোসা	গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়া	১৯০১
অরিওমাইসিন	অ্যাক্টিনোমাইসেটিস	স্ট্রেপ্টোমাইসিস অরিওফ্যাসিয়েন্স	গ্র্যাম(+)(−) ব্যাক্টিরিয়া রিকেট্‌সিয়া	১৯৪৮
ক্লোরোমাইসেটিন	,,	,, ভেনিজুয়েলি	,,	১৯৪৭
ইরিথ্রোমাইসিন	,,	,, ইরিথ্রিয়াস	গ্র্যাম (+)(−) ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, রিকেট্‌সিয়া	১৯৫২
নিওমাইসিন	,,	,, ফ্রাডি	গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া	১৯৪৯
ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন	,,	,, গ্রিসিয়াস	,,	১৯৪৪
টেরামাইসিন	,,	,, স্পেসিজ (SP)	গ্র্যাম (+)(−) ব্যাক্টিরিয়া, রিকেট্‌সিয়া	১৯৫০
কর্ডিসেপিন	ছত্রাক	কর্ডিসেপ্‌স্ মিলিটারিস	মাইকো-ব্যাক্টিরিয়া	১৯৫১
জাইগ্যান্টিন	,,	এস্‌পারজিলাস জাইগ্যান্টিয়াস	গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া	১৯৫১
পেনিসিলিন	,,	পেনিসিলিয়াম নোটাটাম	গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়া, স্পাইরোকিট্‌স	১৯২৯
মাইসিলিন	,,	হাইফোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিকাস	গ্র্যাম (+)(−) ব্যাক্টিরিয়া	১৯৫০
এলিসিন	উচ্চস্তরের উদ্ভিদ	এলিয়াম সেটাইভাম	ব্যাক্টিরিয়া	
বার্বেরিন	,,	বার্বেরিস স্পেসিজ (SP)	ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক	
কুইনাইন	,,	সিঙ্কোনা লেজারিয়ানা, ,, সাক্কিরুব্রা	প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স	
ইরিথ্রিন	প্রাণী	লোহিত কণিকা	ব্যাক্টিরিয়া	
হেলিসিডিন	,,	স্থল-শামুক	হিমোফিলাস পার্টুসিস	
লাইসোজাইম	,,	ডিম্ব-শ্বেতাংশ, অশ্রু, লালা	ব্যাক্টিরিয়া	

অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বহু চেষ্টার পর খুব বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। কেবলমাত্র ক্লোরোমাইসেটিন খুব বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে—আর অন্যান্যগুলিকে জৈব-সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। সন্ধান (Fermentation) প্রক্রিয়াজাত অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্রস্তুত-প্রণালীকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) ইনোকিউলাম বা সীড প্রস্তুতি—সীড প্রস্তুতি বলতে বোঝায়—যে জীবাণু (Micro-organisms) থেকে অ্যান্টিবায়োটিক্স উৎপাদন করা হয়, উপযুক্ত খাদ্যসমন্বিত পাত্রে সেই জীবাণুর উন্নতিসাধন করা—যাতে ঐ অবস্থায় দেহবৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ঘটে। অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জীবাণুর প্রকার (appropriate strain) নির্বাচন করাই প্রথম কথা এবং উৎপাদন বেশী পাওয়া যায় ততক্ষণই—যতক্ষণ এই সীডের উচ্চ উৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকে। উৎপাদন শক্তি বজায় রাখবার জন্যে অনেক সময় বৃদ্ধি উদ্দীপক পদার্থ সংযোগ করা হয়।

(২) জৈব-সংশ্লেষণ—জীবাণুর সহযোগিতায়

সরল অজৈব পদার্থকে জটিল জৈব-পদার্থে রূপান্তরিত করা।

(৩) নিষ্কাশন—প্রথম কাজ হলো সঞ্চিত তরল-পদার্থ থেকে জীবাণু পৃথক করা।

(৪) বিশুদ্ধিকরণ—ফিজিকো-কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় পরিস্কৃত তরল পদার্থ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ উদ্ধার করা; ইলেক্‌ট্রো-ডায়ালিসিস্ প্রক্রিয়ায় পাইরোজেন দূষিত পদার্থ পৃথক করা; ব্যাক্টিরিওলজিক ফিল্টারের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে নির্বীজ করা; শেষে নির্বীজ অ্যান্টিবায়োটিক্সকে জল ও অন্যান্য দ্রাবক মুক্ত করা।

(৫) পরীক্ষাকরণ—(১) মাত্রা নিরূপণ, (২) কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা, (৩) বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে কিনা—তা Toxicity পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা, (৪) প্রাণীদেহে তাপবৃদ্ধি (জ্বরসৃষ্টি) করে কিনা—তা পাইরোজেন পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া—ইত্যাদি। এভাবে পরীক্ষার দ্বারা প্রয়োগের উপযুক্ত বিবেচিত হলেই চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

এ-পর্যন্ত অনেক অ্যান্টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে রোগ-প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা চলে। এদের মধ্যে আছে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, ইরিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি। Antibiotic Spectra অনুযায়ী বহুপ্রকার জীবাণুর উপর কার্যকরী শক্তির মান অনুসারে সাজালে প্রথমে আসে টেরামাইসিন, ক্রমে অরিওমাইসিন, ইরিথ্রোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, নিওমাইসিন ইত্যাদি। পেনিসিলিন স্বাদে অম্ল এবং জলে দ্রবণীয়। পদার্থটা অ্যাক্টিনোমাইসেটিস, স্পাইরোকিট্‌স্ গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী এবং পেরিটোনাইটিস, অ্যান্থ্রাক্স, টিটেনাস, সিফিলিস, গনোরিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি না করাই হলো পেনিসিলিনের বিশেষত্ব। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করলেও কার্যকারিতা ও উপকারিতার তুলনায় খুবই কম। এই কারণে কোন রোগে পেনিসিলিন ও অন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রযোজ্য হলে পেনিসিলিন প্রয়োগই সঙ্গত। রক্ত থেকে অস্থি, মজ্জা, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফ্লুইড প্রভৃতি ছাড়া অন্য দেহতন্তুতে পেনিসিলিন সহজেই প্রসার লাভ করে। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন একটি ক্ষারক এবং জলে দ্রবণীয় পদার্থ। পদার্থটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী এবং প্লেগ, ব্যাসিলারী আমাশয়, ভিব্রিও কলেরি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, প্রোটিয়াস ভালগারিস প্রভৃতির প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনে Toxicity বর্তমান—তবে খুব কম। টিউবারকিউলোসিস রোগে কার্যকরী শক্তিই এর বিশেষত্ব এবং পেনিসিলিনের মত অতি সহজে রক্তস্রোতে মিশে যেতে পারে। ক্লোরোমাইসেটিন—রিকেট্‌সিয়া, গ্রাম পজিটিভ ও নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতির প্রতিরোধক এবং অ্যামিবিক আমাশয়, টাইফয়েড, ট্র্যাকোমা, মাম্পস্, হুপিং কাশি, প্রাথমিক নিউমোনিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে কার্যকরী। অরিওমাইসিন—গ্রাম পজিটিভ ও নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, রিকেট্‌সিয়া প্রভৃতির কার্যকরী শক্তিকে ব্যাহত করে এবং গ্র্যানুলোমা ইঙ্গুইনেল, লিম্ফো গ্র্যানুলোমা, ভেনেরিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ভাইরাস-ঘটিত রোগে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম পজিটিভ ও নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, রিকেট্‌সিয়া প্রভৃতির প্রতিরোধক হিসাবে টেরামাইসিন এবং গ্রাম পজিটিভ ও নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, রিকেট্‌সিয়া, স্পাইরোকিট্‌স্ প্রোটোজোয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইরিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করা চলে।

অ্যান্টিবায়োটিক্‌সের ধর্মই হলো—পুঁজ, সিরাম, ব্যাক্টিরিয়ার আধিক্য অথবা সংক্রামক রোগের

অন্যান্য অবস্থা বজায় থাকা সত্বেও রোগ-প্রতিরোধক কার্যকারিতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। অ্যাণ্টি-বায়োটিক্স প্রয়োগের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো—রোগীর দেহে কম-বেশী বিষক্রিয়া সৃষ্টি করা। অ্যাণ্টিবায়োটিক্‌সের এরূপ বিষক্রিয়া দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীদের চেষ্টা ও গবেষণার বিরাম নেই। একদিন যে এই প্রচেষ্টা সফল হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে 'এন্‌জাইম পেনি-সিলিনেজ' ব্যবহারের মধ্যে।

রোগের ওষুধ হিসাবে অ্যাণ্টিবায়োটিক্স নির্বাচন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন রোগীর দেহে রোগ-সংক্রমণের জন্যে যে জীবাণু দায়ী—সেই জীবাণুর রকমফের অনুসারে অ্যাণ্টি-বায়োটিক্স নির্বাচন করা হয়। যদি গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণের কারণ হয়, তবে পেনিসিলিন; গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া হলে অরিওমাইসিন বা টেরামাইসিন; আর রিকেট্‌সিয়ার ক্ষেত্রে ক্লোরো-মাইসেটিন প্রয়োগই সঙ্গত। রোগে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রয়োগে যেমন দ্রুত ফল পাওয়া যায়, তেমনি ভুল প্রয়োগে রোগীর খুব বেশী অনিষ্টও সাধিত হয়। ভুল প্রয়োগ কেবল মাত্র অ্যান্টি-বায়োটিক্‌সের প্রতিষেধক ক্ষমতাকে নষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকে না—রোগমুক্তিও অনেক পিছিয়ে দেয়। সেই কারণে কখন কিভাবে এবং কোন্‌ রকম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে—সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের আবিষ্কার বর্তমান যুগের অন্যতম আশ্চর্য ঘটনা। দ্রুত এবং বিস্ময়কর এদের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা। তাই বিংশ শতাব্দীর বর্তমান উন্নত চিকিৎসা-শাস্ত্রে এদের গুরুত্ব অনেকখানি, দান অতুলনীয়। অ্যাণ্টিবায়োটিক্‌সের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা দিনের পর দিন যতই বাড়ছে—শক্তি-সঞ্চয়কারী জীবাণুকে নিস্তেজ ও নিঃশেষ করবার জন্যে এবং রোগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জীব-বিজ্ঞানীদের—বিশেষ করে জীবাণুবিদ্‌দের উৎসাহ, চেষ্টা ও গবেষণা ততই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, টি. বি. প্রভৃতি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা-বিদ্‌দের আয়ত্তাধীন। এমন একদিন আসবে—যেদিন যাবতীয় জীবাণুর-প্রতিরোধক অ্যান্টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত হবে এবং রোগীর দেহে কার্যকরী হবে। সেদিন 'দুরারোগ্য' কথাটা থাকবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রলোকে উৎক্ষিপ্ত রকেট হইতে প্রাপ্ত তথ্য

গত ১২ই সেপ্টেম্বর মহাকাশগামী যে সোভিয়েট রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল, তাহা তৃতীয় দিবস ১৪ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রলোকে গিয়া পৌছায়।

বহু পর্যায়বিশিষ্ট এই সোভিয়েট রকেট চন্দ্রলোকে পূর্ব-পরিকল্পিত পথ ধরিয়াই গিয়াছে। উড্ডয়নের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত রকেটের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম স্বাভাবিকভাবেই কাজ করিয়াছে।

রকেটের অভ্যন্তরে বেতার ব্যবস্থার সাহায্যে উৎক্ষেপণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের আধারটি চন্দ্রে গিয়া পৌছানো পর্যন্ত রকেটটির গতিপথ ও উড্ডয়ন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইয়াছে।

ভূ-পৃষ্ঠস্থিত স্বয়ংক্রিয় পরিমাপক যন্ত্রগুলির সুষ্ঠু ও সফল কর্ম সম্পাদনের ফলেই রকেটটির উড্ডয়নের প্রকৃত পথের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ চালাইয়া যাওয়া, পূর্ব-পরিকল্পিত পথের সহিত উহার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা এবং রকেটটির চন্দ্রে

পৌছিবার সময় ও স্থান আগে হইতে সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে।

যাবতীয় পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সোভিয়েট রকেটটির প্রকৃত গতিপথের বিশ্লেষণের ফলে এখন বলা সম্ভব হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের আধারটি ও রকেটের শেষ পর্যায়টি চন্দ্রের ঠিক কোথায় গিয়া অবতরণ করিয়াছে। লব্ধ তথ্যাদির পর্যালোচনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাশূন্য-যাত্রী সোভিয়েট রকেটের আধারটি চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়া পড়িয়াছে—আরেষ্টিলাস, আর্কিমিডিস ও অটোলিকাস গহ্বর তিনটির সন্নিকটস্থ "প্রশান্তি সায়রের" পূর্ব পার্শ্বে। আধারটি চন্দ্রের উপরে গিয়া পড়িয়াছে +৩০ ডিগ্রী চান্দ্র অক্ষাংশ ও শূন্য ডিগ্রী চান্দ্র দ্রাঘিমায়। যন্ত্রপাতি সহ আধারটি যে বিন্দুতে অবতরণ করে তাহা চাঁদের দৃশ্যমান অংশের কেন্দ্র হইতে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে।

আধারটি যখন চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরে পতিত হয়, তখন চাঁদের উপরিতলের দিক হইতে উহার গতিপথের নতি (ইন্‌ক্লিনেশন) ছিল প্রায় ৬০ ডিগ্রী। চন্দ্রের তুলনায় আধারটির আপেক্ষিক গতি ছিল সেকেণ্ডে ৩·৩ কিলোমিটার।

যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যায় যে, আধারটি ছাড়া এই মহাকাশগামী রকেটের সর্বশেষ পর্যায়টিও চাঁদে গিয়া পৌছিয়াছে।
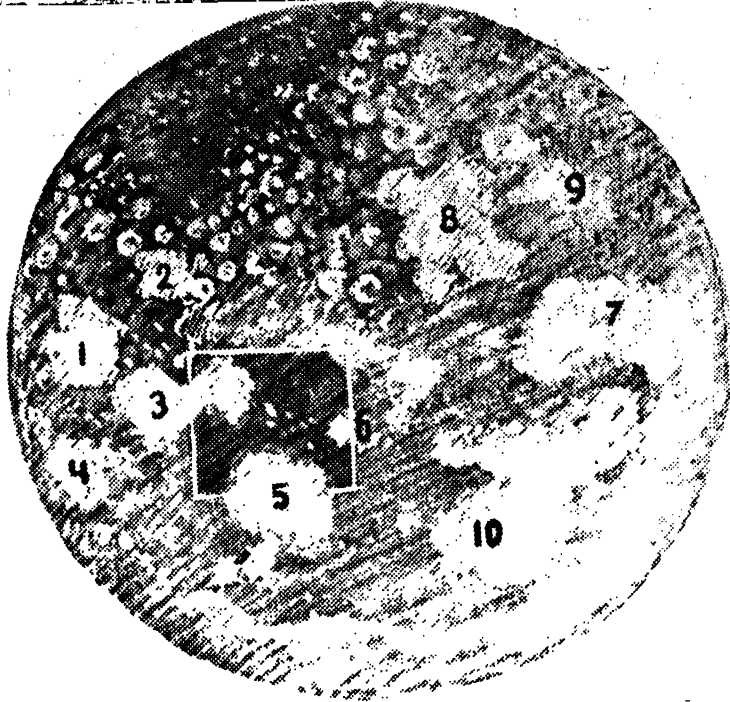
চন্দ্রের মানচিত্র : চিহ্নিত চতুষ্কোণ স্থানটির এক জায়গায় উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েট রকেটটি গিয়া পড়ে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের কলঙ্কচিহ্নিত স্থানগুলিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত সমুদ্রগুলির নাম অনুসারে নামাঙ্কিত করিয়াছেন।

১—প্রাচুর্যের সায়র (সী অফ অ্যাবাণ্ড্যান্স);

২—অমৃত সায়র (সী অফ নেকটার);
৩—শান্তির সায়র (সী অফ ট্রান্‌ক্যুইলিটি);
৪—সঙ্কট সায়র (সী অফ ক্রাইসিস);
৫—প্রশান্তি সায়র (সী অফ সেরিনিটি);
৬—বাষ্প সায়র (সী অফ ভেপার্স);
৭—ঝঞ্ঝা সায়র (সী অফ গেল্‌স্);
৮—মেঘ সায়র (সী অফ ক্লাউড্‌স্);
৯—আর্দ্রতার সায়র (সী অফ হিউমিডিটি);
১০—বৃষ্টি সায়র (সী অফ রেন্‌স্)।

পূর্বেই জানানো হইয়াছিল যে, এই দ্বিতীয় রকেটের সাহায্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্র, পৃথিবীর চারদিকের তেজস্ক্রিয় বলয়, মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের তীব্রতা, মহাজাগতিক বিকিরণের অন্তর্ভুক্ত ভারী নিউক্লিয়াস, আন্তর্গ্রহ পদার্থকণার গ্যাসীয় সংযুক্তি এবং উল্কা-কণাসমূহ।

এই সব বিষয়ে লব্ধ তথ্যাদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, আধারটির বৈজ্ঞানিক ও সঙ্কেত-প্রেরণের সাজসরঞ্জাম শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কাজ করিয়াছিল।

লব্ধ তথ্যাদির সাঙ্কেতিক ভাষার প্রাথমিক অর্থোদ্ধারের কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাথমিক তথ্যাদি হইতে এখন নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছানো যাইতে পারে—

১। ম্যাগ্নেটোমিটার কর্তৃক প্রেরিত সঙ্কেত অনুসারে চাঁদের কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই;

২। চন্দ্রের কাছাকাছি তেজস্ক্রিয়ার তীব্রতার পরিমাপ হইতে তড়িতাবিষ্ট কণাসমূহের কোন তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই;

৩। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রকেটের গতিপথ-বরাবর মহাশূন্যে মহাজাগতিক বিকিরণের সাধারণ প্রবাহ এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (আল্‌ফা কণাসমূহ), কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও মহাজাগতিক রশ্মির ভারী নিউক্লিয়াসের পরিমাপ করা হইয়াছে;

৪। এক্স-রে, গামা-রে, উচ্চ ও অল্প শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে;

৫। পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় বলয়ের অভ্যন্তরে পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে;

৬। আধারে রক্ষিত ধন-তড়িতাবিষ্ট কণার চারটি প্রকোষ্ঠে যে আয়নিত গ্যাস-কণিকা প্রবেশ করে, তাহার ফলে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। রকেটটির গতিপথে এই তড়িৎপ্রবাহের তীব্রতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত মহাশূন্যদেশ জুড়িয়া বিভিন্ন স্থানে এই আয়নিত গ্যাস-কণিকার সংখ্যা হইল প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে এক শতেরও কম। চন্দ্র হইতে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে এই তড়িৎ-প্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, হয় চন্দ্রকে ঘিরিয়া পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের অনুরূপ একটি আয়নিত গ্যাসীয় কণিকার আস্তরণ রহিয়াছে, না হয় চন্দ্রের চারদিকে কয়েক শত ইউনিট শক্তিসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণার অধিকতর সমাবেশ ঘটিয়াছে;

৭। উল্কারেণু (মাইক্রোমিটিওর) সম্পর্কে নূতন কতকগুলি তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

বর্তমানে উপরিউক্ত তথ্যগুলির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা হইতেছে এবং এই বিশ্লেষণের ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রত্যেকটি বিজ্ঞানী এবং জনসাধারণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, চন্দ্রলোকে প্রেরিত মনুষ্য-নির্মিত এই প্রথম রকেটটি মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার দিনটিকে অনেকখানি নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছে।

ক্যান্সার সম্বন্ধে দু-চার কথা

শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজ বিভিন্ন রোগের সমস্যা ভীড় জমিয়েছে। দেশে দেশে চলছে এসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। গবেষণা-পত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে, নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা। ক্যান্সার নামক রোগটির স্বরূপ জানবার জন্যে চলেছে বৈজ্ঞানিকদের বিরাট অভিযান। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশী। তবুও ঐ রোগ আক্রমণের রহস্য এখনও না-জানারই মত। চিকিৎসারও বিশেষ কোনও মূল পন্থা জানা যায় নি। এদিকে রোগটির গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিকটা বিচার করলে দেখা যায় যে, অনুন্নত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার হৃদ্‌রোগের পরেই। ১৯০০ সালে আমেরিকায় ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর হার যেখানে ছিল শতকরা পাঁচ, এখন সে সংখ্যা হয়েছে শতকরা দশ। এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বুঝি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ এ নয়। আগেকার তুলনায় এখন মৃত্যুর কারণ সঠিক নিরূপণের ব্যবস্থা হয়েছে। লোকের জীবনকালও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রধানতঃ বৃদ্ধ বয়সের রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাকস্থলী ও শ্বাসযন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রমণ ছেলেদের দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের ক্যান্সার আক্রমণের বৃদ্ধির পরিমাণের একটা আন্দাজ পাওয়া যায় সিমরসের দেওয়া হিসাবের দিকে তাকালে।

হিসাবটি হচ্ছে—

১৮৫২ খৃঃ—১৮৭৯ খৃঃ	·৬২%
১৮৮০ খৃঃ—১৯০৮ খৃঃ	·৯০%
১৯০৬ খৃঃ—১৯১২ খৃঃ	২·৫৯%
১৯২১ খৃঃ—১৯২৭ খৃঃ	৪·৪৩%
১৯২৭ খৃঃ—১৯৩১ খৃঃ	৯·৮৩%

বর্তমানে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা আঠাশে। অত্যধিক ধূমপান এর কারণ কিনা, সে সংশয় এখনও চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তোলে।

ক্যান্সার রোগটি আধুনিক নয়। ক্যান্সার কথাটি ল্যাটিন শব্দজাত। ল্যাটিন ভাষায় ক্যান্সার কথাটির অর্থ হলো কাঁকড়া। ক্যান্সার রোগের উল্লেখ প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। খৃষ্ট-জন্মের পনেরো-শো বছর আগেকার কতকগুলি মমীর অস্থিতে ক্যান্সার আক্রমণের চিহ্ন দেখা গেছে। গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ খৃষ্টপূর্ব চার-শো শতাব্দীর পণ্ডিত হিপোক্রীটাস তাঁর লেখায় ক্যান্সার রোগের উপসর্গ ও তার চিকিৎসার বিবরণ দিয়ে গেছেন। প্রাচীন গ্রীসে ক্যান্সারের শল্য-চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। তদানীন্তন (খৃষ্ট পূর্ব ১৮০) শল্য-চিকিৎসক লিওনিডাস ছুরি ও উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে অস্ত্রোপচার করতেন। ক্যান্সার আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন, রোমের বৈজ্ঞানিক গ্যালেন (২০০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর মতানুযায়ী রক্তে কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত-রসের আধিক্যের ফলেই ক্যান্সারের আক্রমণ হয়। এই মত মধ্য যুগে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রবল সমর্থন লাভ করেছিল। এখনও ক্যান্সার আক্রমণের কোনও স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া

যায় নি। এখন যে সব মত প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

বৈজ্ঞানিক অভিধানে ক্যান্সার বলতে ঠিক কোনও একটি বিশেষ রোগকে বোঝায় না, এক সাধারণ ধর্ম সমন্বিত কতকগুলি রোগকেই বোঝায়। অনেক সময় অজানা কারণে শরীরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন তন্তুর কোষগুলি আকস্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি আবের সৃষ্টি করে। এই বৃদ্ধি, শরীরের কোষ এবং তন্তুগুলির বৃদ্ধির যে সাধারণ নিয়ম আছে তা মেনে চলে না। কোষগুলির এত দ্রুত বিভক্ত হয় যে, একই কোষে অনেকগুলি কেন্দ্রীনের সমাবেশ দেখা যায়। এই বৃদ্ধি শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। কোষগুলি তাদের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকম পুষ্টি-ই দেহ থেকে নেয়, কিন্তু দেহ তার পরিবর্তে কিছুই পায় না, শুধু অপেক্ষা করে একটা মারাত্মক পরিণতির জন্যে। এদের উদ্ভবের সঠিক কোনও কারণ জানা নেই। এদের আক্রমণ শুধু এক জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে—রক্ত এবং লসিকা-বাহিত হয়ে দূরবর্তী যন্ত্রের ভিতরেও বাসা বাঁধে।

ক্যান্সার আক্রমণের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম না থাকলেও দেখা গেছে যে, প্রধানতঃ কতকগুলি যন্ত্রই আক্রান্ত হয়। নীচের সংখ্যাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে পৌষ্টিকতন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়ই প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। এর সঙ্গে কোন্ যন্ত্রের ক্যান্সার কতটা মারাত্মক তাও বোঝা যাবে।

যন্ত্রের নাম	ক্যান্সার আক্রমণের শতকরা হার	মৃত্যুর হার
মুখগহ্বর এবং		
গ্রাসনালী	৫%	৩%
পাকস্থলী	৩০%	৩৮%
ক্ষুদ্র এবং বৃহদন্ত্র	১১%	১২%
যকৃৎ পিত্তথলি এবং		
অগ্ন্যাশয়	৪%	৭%
পুরুষ জননেন্দ্রিয়	৪%	৪%
স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এবং স্তন	২৩%	১৬%
শ্বাসযন্ত্র	৮%	৭%
চর্ম	৭%	১%
বিবিধ	৮%	১২%

ছেলে এবং মেয়েদের ক্যান্সার আক্রমণের হার প্রায় সমান বললেই চলে। ছেলেদের সাধারণতঃ পাকস্থলী, ঠোঁট এবং জিভে ক্যান্সার হয়। মেয়েদের প্রধানতঃ জরায়ু এবং স্তনদেশে ক্যান্সার হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে যে, মেয়েদের যত ক্যান্সার হয় তার মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ জননেন্দ্রিয়ের, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার শতকরা ৪। ছেলেদের ক্যান্সার সাধারণতঃ বাইরের আঘাত থেকে উৎপন্ন হয়। মেয়েদের ক্যান্সার সাধারণতঃ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির গোলযোগের জন্যে হয়ে থাকে। আবার মেয়েদের মধ্যে বিবাহিতাদের জরায়ু-গ্রীবায় এবং অবিবাহিতাদের স্তনে ক্যান্সারের আক্রমণ বেশী দেখা যায়। এখানে ছেলে এবং মেয়েদের কোন্ যন্ত্রে ক্যান্সারের প্রকোপ কেমন, তার কতকগুলি তুলনামূলক সংখ্যা দেওয়া হলো।

যন্ত্রের নাম	পুরুষের রোগ আক্রমণের সংখ্যা	স্ত্রীলোকের রোগ আক্রমণের সংখ্যা
মলভাণ্ড	৬২.৯%	৩৭.১%
ঠোঁট	৬৭%	৩৩%
পাকস্থলী	৭১.৩%	২৮.৭%
মূত্রভাণ্ড	৭৬.৩%	২৩.৭%
গ্রাসনালী	৮৭.৮%	১২.২%
ফুস্ফুস	৮৯.৬%	১০.৪%
স্বরযন্ত্র	৯৫.১%	৪.৮%
পিত্তথলি	১৩.২%	৮৬.৮%

ক্যান্সার রোগের পরিসংখ্যানের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, কতকগুলি দেশে কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রের ক্যান্সার বেশী হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যকৃতের ক্যান্সারের কথা শোনা যায় না বললেই চলে, কিন্তু আফ্রিকার বান্টু-সম্প্রদায়ের ক্যান্সার আক্রান্ত লোকদের মধ্যে শতকরা ৯০.৫ জনের যকৃতে ক্যান্সার হয়। পুং জননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সার ইহুদীদের হয় না বললেই

চলে। মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম (২·৯%), কিন্তু হিন্দুদের প্রায়ই হয়—শতকরা ২৮·৭%। পাকস্থলীর ক্যান্সার ইউরোপে খুবই হয়; কিন্তু মালয় দেশে এ রোগ নেই বললেই চলে। মুখের চামড়ার ক্যান্সার পৃথিবীর দক্ষিণার্ধের লোকদের মধ্যে খুবই প্রবল। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের পেটের চামড়ায় ক্যান্সার খুব বেশী হয়। তাদের শরীর গরম রাখবার অদ্ভুত ব্যবস্থাই বোধ হয় এজন্যে দায়ী। তারা জামাকাপড়ের তলায় পেটের সংস্পর্শে মাটির পাত্রে জ্বলন্ত কাঠকয়লা রেখে শরীর গরম করে। ইহুদীদের, বিশেষ করে এদের সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের জরায়ুগ্রীবায় ক্যান্সারের আক্রমণ খুব বেশী, আবার মুসলমান স্ত্রীলোকদের এ রোগ হয় না বললেই চলে। ভারতীয়দের মুখ গহ্বরে ক্যান্সার খুব বেশী হয়। অত্যধিক পান, সুপারী বা খৈনী খাওয়া এর কারণ বলে মনে হয়। ভারতবর্ষে এ-দুটি জিনিষ চর্বণের অভ্যাস সবচেয়ে বেশী। বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসী ও পাঞ্জাবীদের এই অভ্যাস নেই বললেই চলে। পাঞ্জাবীদের মধ্যে এ রোগের হার শতকরা চার; আর ঐ দুই প্রদেশের অধিবাসীদের শতকরা ২৬·৭। ইংল্যাণ্ডে দেখা গেছে, ধনী অপেক্ষা গরীব মহিলাদের চর্ম এবং জরায়ু প্রভৃতির ক্যান্সার পাঁচ গুণ বেশী। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, জনসাধারণের নেতা এবং বক্তাগণ, পাদ্রীদের চেয়ে কুড়ি গুণ বেশী গ্রাসনালীর ক্যান্সারে এবং উনত্রিশ গুণ বেশী জিভের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—পরিবেশ, ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং পেশা ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

এখন ক্যান্সার উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে, ক্যান্সারের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তাঁদের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যেগুলি ক্যান্সার-আক্রমণে সহায়তা করে অথবা যাদের সংস্পর্শে এলে শরীরে ক্যান্সারের আক্রমণ হয়। এদের নাম হচ্ছে কার্সিনোজেন। এরা দুই প্রকারের—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক কার্সিনোজেনের মধ্যে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যই প্রধান। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে যে সব শ্রমিক চিমনী পরিষ্কার করতো, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই স্ক্রোটামে ক্যান্সার হতো। এই দৃষ্টান্ত থেকে ১৭৭৫ সালে পার্সিভ্যাল পট-ই প্রথমে প্রাণীদেহে ক্যান্সার আক্রমণের কারণ স্বরূপ কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের কথা বলেন। আলকাত্‌রা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের চর্মের ক্যান্সারের কারণ ব্যাখ্যা করেন ভন্ ভল্ক্‌ম্যান প্রথম ১৮৭৫ সালে। আলকাত্‌রার মধ্যেকার কার্সিনোজেনের অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে মনে হয়েছিল, উচ্চ তাপে আলকাত্‌রা পাতনের ফলে যা বের হয়, সেটাই বুঝি দায়ী। পরে অবশ্য জানা গেছে যে, পাতিত দ্রব্যগুলির একটি বিশেষ প্রতিপ্রভ বর্ণালী আছে; সেই বর্ণালীর উপস্থিতিই আলকাতরার সংস্পর্শে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটায়।

বাহ্যিক কার্সিনোজেনের আর একটা উদাহরণ হচ্ছে, সূর্যরশ্মির আল্‌ট্রাভায়োলেট অংশ। এই রশ্মি দেহে শোষিত হয়ে প্রোটিন এবং কোষসমূহের সঙ্গে বিপরিবর্তিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় এবং ক্যান্সারের সূচনা করে। পরীক্ষামূলকভাবে একটি কোয়ার্টজ্ বাতির রশ্মির দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা খরগোশের কানে ক্যান্সার তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। এক্স-রে এবং রেডিয়াম রশ্মিরও ক্যান্সার উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। বানরের উর্বস্থিতে রেডিয়াম শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে যে, পাঁচ থেকে সাত বছর পর ঐ জায়গার সংযোজক তন্তুর ক্যান্সার হয়।

ক্যান্সার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের দিকে তাকালে ক্যান্সার আক্রমণের সঙ্গে যৌন-উত্তেজক রসের একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষেরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সে, যখন তাঁদের যৌন-গ্রন্থির কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধা অপেক্ষা যুবতীদের স্তনে ক্যান্সারের আক্রমণ বেশী হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ক্যান্সার উৎপাদনের ব্যাপারে দেখা গেছে যে, গর্ভবতী প্রাণীদেহে ঐ ক্যান্সারের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হয়। তাছাড়া আরও দেখা গেছে যে, এই উত্তেজক রসের রাসায়নিক সঙ্কেতের সঙ্গে রাসায়নিক কার্সিনো-জেনের সাদৃশ্য রয়েছে। ইঁদুরের স্তনদেশের ক্যান্সারের হার সাধারণতঃ শতকরা ষাট থেকে সত্তর। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, যদি তিন মাস বয়সের পূর্বে ইঁদুরের ডিম্বাশয় কেটে বাদ দেওয়া যায় তবে সেই সব ইঁদুরের ভবিষ্যতে ক্যান্সার হয় না বললেই চলে। যদি তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে ডিম্বাশয় কেটে দেওয়া যায় তবে ক্যান্সার আক্রমণের হার হয় শতকরা নয় এবং সাত মাসের পর কেটে দিলে কোনও ফলই হয় না।

ক্যান্সারের কারণ স্বরূপ ভাইরাসের কথা প্রথম ভাবতে শেখান বরেন ১৯০০ সালে। তাঁর মতে, প্রত্যেক ক্যান্সারের উৎপত্তির জন্যে একটি বিশেষ ভাইরাস আছে। তবে তাঁর এই চিন্তাধারাকে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর এই মত কেবলমাত্র পাখীদের ক্যান্সারের দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিনি পরীক্ষা-মূলকভাবে তাঁর মতানুযায়ী ক্যান্সার উৎপাদন করতে পারেন নি। অনেকে আবার ক্যান্সারের জন্যে পরজীবীদের দায়ী করেন। তবে তাঁদের স্বপক্ষে খুব কমই উদাহরণ আছে। আবার অনেকে মাতৃ-জঠরে ভ্রূণের বৃদ্ধির কিছু গোলযোগকে ক্যান্সারের কারণ বলে মনে করেন। ভ্রূণের অনেক কোষ অনেক সময় কোষ সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। এই প্রাথমিক অবস্থার কোষগুলি সহজে কার্সি-নোজেন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ক্যান্সার সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যায়। তবে একমাত্র আশার কথা এই যে, রোগটি সংক্রামক নয়। একই বাসায় অনেকদিন ধরে রোগাক্রান্ত এবং সুস্থ ইঁদুর রেখে এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি এই ব্যাধি সংক্রামক হতো, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে নিশ্চয়ই ক্যান্সার মহামারীর দু-একটা উল্লেখ পাওয়া যেতো।

উদ্ভিদ ও শিশির

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

ইস্রাইলবাসীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক কাজে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে ১৯৫৬ সালে ডাঃ সামুয়েল ডুবদেবানীকে রথচাইল্ড পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তার কাজের ফলে প্রমাণিত হয় যে, শিশির উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক এবং উদ্ভিদে শিকড় থেকে পাতার ঊর্ধ্বদিকে যেমন রস চালিত হয়, তেমনি আবার পাতা থেকে শিকড়ের দিকেও চালিত হয়।

বাইবেল ও অন্যান্য হিব্রু পুস্তকের নানা আখ্যায়িকায় শিশিরের উল্লেখ দেখেই তিনি এই কাজে প্রবৃত্ত হন। তাঁর গবেষণা-কেন্দ্র ছিল প্যালেষ্টাইনে। জুনের প্রথম ভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে মোটেই বৃষ্টিপাত হয় না। তবে গ্রীষ্মের রাতে বেশ শিশিরপাত হয়; এজন্যে শিশির এবং গাছের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষার জন্যে প্যালেষ্টাইন বিশেষভাবে উপযুক্ত।

শিশির পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের শিশিরপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। শিশির পরিমাপক যন্ত্র সমভাবে শিশিরপাতের উপযোগী নির্দিষ্ট আকারের মসৃণ কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর শিশিরপাতের পরিমাণের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধের বিষয়ে নতুন আলোকপাত হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের শিশিরপাতের পরিমাণ বিভিন্ন। ভূমির উচ্চতা, জলসেচন, গাছপালার পরিমাণের উপর শিশিরপাতের পরিবর্তন দেখা যেতে পারে; তবে এতে ঐ স্থানের মাসিক শিশিরপাতের আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় না।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশিরপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর শিশির অধিক সময় স্থায়ী হয় এবং তার ফলে গাছের শিশির শোষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত শিশিরপাতে শুষ্ক শস্যের পাতা ৩২-৩৫ ঘণ্টা পর্যন্ত শিশিরসিক্ত থাকে। এজন্যে মরুভূমির দেশে সকালবেলার ৪।৫ ঘণ্টা গাছের আলোক-সংশ্লেষণের উপযুক্ত সময়।

নেতিয়ে-পড়া পাতাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে আংশিকভাবে শিশির ব্যবহার করা যায়। জলসেচের অভাবে শুষ্ক মৃতপ্রায় লেবু গাছে স্প্রে করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে। শিশিরপাতে শাকসব্জীর নতুন পাতা তাড়াতাড়ি গজানো যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, শিশিরসিক্ত শশাজাতীয় গাছ নিয়ন্ত্রিত গাছ অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী বাড়ে।

একটি পরীক্ষায় গাছ থেকে কয়েকটি পাতা তুলে নিয়ে প্রথমে তাদের বোঁটা মোম দিয়ে বন্ধ করা হয়। পরে তাদের কয়েকটিকে উন্মুক্ত স্থানে শিশিরের মধ্যে রাখা হয় এবং অপর কয়েকটিকে চাঁদোয়ার নীচে রাখা হয়। ভোরে দেখা যায়, শিশিরে-রাখা পাতা বেশ সতেজ রয়েছে; কিন্তু চাঁদোয়ার নীচে রাখা পাতা শুকিয়ে গেছে। অনেক মরুভূমির দেশে গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসেবে গম, যোয়ার প্রভৃতির চাষ জলসেচ ছাড়াই হয়ে থাকে। যে সব অঞ্চলে শিশিরপাতের পরিমাণ বেশী, সেখানে জলসেচ ব্যতীতও ফসল ভালই হয়।

শিশিরপাত ও তার সঙ্গে গাছের সম্বন্ধের বিষয় এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, কি ভাবে গাছ শিশির শোষণ করে থাকে। আমরা জানি, উদ্ভিদ নিজের প্রয়োজনীয় জল মাটি থেকে

শিকড় দিয়ে শোষণ করে। পরে জাইলেম-নালিকা দিয়ে উধ্বর্দিকে প্রবাহিত হয়ে তা পাতায় পৌছায়। কিন্তু উপরের ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবন-ধারণোপযোগী জল যেমন মাটি থেকে শিকড় দিয়ে উপর দিকে ওঠে, তেমনি পাতা থেকে নীচের দিকেও যেতে পারে। এথেকে গাছের শারীর-বিদ্যায় নতুন আলোকপাত হয় এবং গাছের জল পরিবহনে দ্বিমুখী ধারণার সৃষ্টি করে।

ভিজা পাতা কেবল জল শোষণই করে না, এই জল গাছের শরীরের মধ্যস্থিত কলাতন্ত্রের মাধ্যমে শিকড় পর্যন্ত পৌছাতে পারে; এমন কি, শিকড় থেকে বাইরেও বেরিয়ে আসতে পারে। এভাবে গাছের পাতার উপর যতটা শিশিরপাত হয়, তা শিকড়ের নিকটবর্তী মাটিতে জমা হয়—যাতে দিনের বেলা আলোক-সংশ্লেষণের জন্যে উদ্ভিদ তা সহজে ব্যবহার করতে পারে।

টবে গজানো ধান ও অন্যান্য শস্য নিয়ে এজন্যে পরীক্ষা করা হয়। কতকগুলি টব খোলা মাঠে শিশিরের মধ্যে এবং কতকগুলি ঘরের মধ্যে রাখা হয়। পরে দেখা যায়, যে সব গাছ শিশিরে রাখা হয়েছে, সে সব টবে মাটির আর্দ্রতা শতকরা একভাগ বেশী। প্রচুর শিশিরপাতের সময় বারমুডা ঘাস, মনিংগ্লোরি, তুঁত প্রভৃতি উদ্ভিদের শিকড়ে প্রায়ই জলকণা দেখতে পাওয়া যায়।

খোলা মাঠে পরীক্ষা ছাড়া গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ও এ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। সেখানে টবে গজানো নেতিয়ে-পড়া গাছের শিকড় বন্ধ করে তার কাণ্ডে জল স্প্রে করা হয়। স্প্রে করবার ফলে দেখা যায় যে, পরীক্ষাধীন সব গাছ আস্তে আস্তে সজীব হয়ে উঠছে। যে সব উদ্ভিদের একটা শাখায় স্প্রে করা হয়েছে, তার সেই বিশেষ শাখা আগে সজীব হয়, পরে অন্যান্য শাখা আস্তে আস্তে তাজা হয়ে ওঠে। এমন কি, নেতিয়ে-পড়া ফলের গাছের যে সব শিকড় শুকিয়ে গেছে, সেখানেও প্রচুর নতুন শিকড় গজাতে দেখা গেছে। এ থেকে বুঝা যায়, স্প্রে-করা জল পাতায় শোষিত হয়ে গাছের সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়েছে। সাধারণতঃ স্প্রে আরম্ভ করবার ২।৩ দিন পর থেকে শিকড়ের শেষ প্রান্তে জলকণা দেখা দেয়। গাছ প্রথমতঃ নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করবার জন্যে জল ব্যবহার করে; পরে অতিরিক্ত জল শিকড় দিয়ে বাইরে বের করে দেয়।

এভাবে স্প্রে চলতে থাকলে এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে গাছ নিজ দৈহিক ওজনের বহু গুণ জল সঞ্চয় করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সঞ্চয় কিছু দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়, আবার কোথাও চলতে থাকে; তবে দৈহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ সব সময় সমান হয় না।

স্প্রে-করা গাছে কোন পুষ্টিকারক দ্রব্য না দিয়ে দেখা গেছে, তাদের সঞ্চিত খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাণ্ডের বৃদ্ধি ঠিকই চলতে থাকে। তারপর উদ্ভিদ ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

উদ্ভিদের উপর শিশিরের প্রভাব নিয়ে বর্তমানে আরও গবেষণা চলছে। তবে এটা নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে যে, সামান্য পরিমাণ জলের উপর যখন গাছের জীবন-মরণ নির্ভর করে, তখন শিশির গাছের প্রাণ বাঁচাতে পারে।

পরবর্তী কালে গবেষণা থেকে বের হবে, গাছের প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা শিশির কতটা মিটাতে পারে, কোন্ জাতীয় গাছ শিশির অথবা স্প্রে-করা জল থেকে বেশী উপকৃত হয় এবং পাতার সাহায্যে শোষণ-কার্য চললে গাছের শারীর-তাত্ত্বিক কোন পরিবর্তন হয় কি না।

প্রাণ ও তার প্রতিষ্ঠা

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য

প্রাণ কি? কোথায় এর অবস্থিতি? জগতে এর প্রতিষ্ঠা হলো কোত্থেকে? যুগে যুগে মানুষের এই একই রকম উত্তরহীন জিজ্ঞাসা। টলেমি-অ্যারিষ্টটলের যুগের আগে থেকেই এই প্রশ্নের সূত্রপাত। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এর সমাধান করা হয়েছে, কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষকে কল্পনা করে। সে নাকি মহাবিশ্বের ছোট-বড় যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে মানুষ ও অন্যান্য জীবকে নিজের খেলার পুতুল হিসাবে তৈরী করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে গেলেই জুজুর ভয় দেখাবে পাদ্রী-পুরোহিতেরা।

গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোক্লিস, ডিমোক্রিটাস ও অ্যারিষ্টটল এই সৃষ্টিবাদের ভিৎ প্রথম ভাঙ্গতে সুরু করেন।

তারপর কেউ কেউ বিশ্বাস করতো যে, উল্কা-পিণ্ডের মারফৎ বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই কল্পনাকে স্থান দেন নি।

জীবাণু আবিষ্কারের পূর্বে অনেকে প্রাণের স্বতঃজনন মতবাদে বিশ্বাস করতো। প্রমাণ হিসাবে পচনশীল পদার্থে প্রাণের বিন্দু বিন্দু আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাতো। সাপের দেহাবশেষ পচে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপ উৎপন্ন হয়, একথা অনেকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু জীবাণু আবিষ্কারের পর ঐ সব উদ্ভট চিন্তার অবসান ঘটে।

তারপর ঘটতে লাগলো বিজ্ঞান ও চিন্তা-জগতের দ্রুত অগ্রগতি। আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, বিবিধ পরীক্ষা সত্ত্বেও তা ধরা পড়ে নি। প্রাণের অস্তিত্ব মহাবিশ্বের অন্যান্য সৌরজগতে পৃথিবীর মত আব-হাওয়া-সম্পন্ন গ্রহে সম্ভব—এ তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেও পৃথিবীতেই যে তার নিরপেক্ষ আবির্ভাব হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কোটি কোটি বছরের বৃদ্ধ পৃথিবীর জন্মটা খুব তাণ্ডবের মধ্যে হয়েছিল এবং শৈশবের তারল্যের চাঞ্চল্য থেকে বয়সের কাঠিন্যে পরিণত হতে বেশ সময় লেগেছিল। অত উত্তাপে প্রাণের কল্পনা করা না গেলেও তার মৌলিক পদার্থগুলি এলো-মেলোভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্টি হয়েছিল বাষ্প-মিশ্রিত নানারকমের গ্যাসীয় মেঘ এবং তারপর একটানা বহুদিন বৃষ্টিপাতের ফলে খানাখন্দগুলিতে জল জমে সৃষ্টি করেছিল আদিম সমুদ্র। এই সমুদ্রেই প্রাণের প্রথম উন্মেষ ঘটে। আদি প্রাণের বিভিন্ন অংশের প্রায় ৭৫ ভাগই জল। তাছাড়া কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, সালফার, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি মূল পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতির পরমাণুর সংযোগে প্রাণের সৃষ্টি হয়। এই পদার্থগুলি ঐ আদিম সমুদ্রের জলেই পাওয়া যেত।

জীবদেহের একক হচ্ছে সেল এবং সেলের মূল বস্তু হচ্ছে প্রাণপঙ্ক। প্রাণপঙ্কের মূল অংশ প্রোটিন নামক কেলাসিত কণা, যার গঠন এবং আকৃতি অনেকটা ভাইরাসের মত। প্রাণপঙ্ক প্রধানতঃ অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফার ও ফস্‌ফরাস—এই ছয়টি মূল পদার্থের সংমিশ্রণ। প্রোটিন অত্যধিক জটিল একটি কার্বন-প্রধান জৈব অণু—যা এখনও সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরী করা সম্ভব হয় নি; যদিও অনেক জৈব পদার্থ লেবরেটরিতে

তৈরী হওয়ায় জৈব ও জড় পদার্থের, তথা জীব ও জড়ের পার্থক্য যথেষ্ট লোপ পেয়েছে।

জটিল প্রোটিন অণু কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু দ্বারা গঠিত। কতকগুলি নির্দিষ্ট অণুকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট সজ্জায় বিন্যস্ত হলেই তাতে প্রাণের আবির্ভাব হয়। তখন তার মধ্যে এমন এক ঐক্য দেখা যায়, যার ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন সামঞ্জস্যকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বদা বহির্জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকে। বহির্জগতের ধাতুকে স্বধাতুতে পরিবর্তিত করে প্রয়োজন অনুসারে আপন স্বভাব পরিবর্তন করে' বহির্জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং আপনার মধ্য থেকে স্বানুরূপ নতুন নতুন সামঞ্জস্যের কেন্দ্রকে বীজে সংহত করে অনন্তকাল বহির্জগতের মধ্যে আপনার মধ্যে আপনি পর্যাপ্ত থেকে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। একেই বলে জীবন। অবশ্য কতকগুলি প্রোটিন-কণার সহযোগিতার ফলেই এই জীবন-ধর্মের অভিব্যক্তি সম্ভব।

পূর্বোক্ত আদিম সমুদ্রে প্রাণ-পদার্থের মূল উপাদানগুলি একটি বিশেষ অণুকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন জ্যামিতিক চেহারায় সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। শক্তি হিসাবে কাজ করেছে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ও তৎকালীন অত্যধিক তেজষ্ক্রিয়তা। এই সংযোগ ও বিয়োগ অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলবার ফলে অবধারিতভাবে জৈব পদার্থের আকৃতিতে উপনীত হয়ে প্রাণের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক জৈব-পদার্থের বিপাক-ক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সূর্যালোকের সাহায্যে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুতে প্রথম মুক্ত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়ে আমাদের পরিচিত আধুনিক জৈব-পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আধুনিক জৈব-পদার্থের জনয়িতা পূর্বের লুপ্ত জৈব-পদার্থের গঠন নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য এবং উপযুক্ত তাপ, চাপ, (অনুঘটক ?) ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষ আপাত জড় বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবে কি না, তা ভবিষ্যৎই জানে। আপাততঃ আমরা এই আদিম জীবনের ক্রমবিকাশের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

দেখা যাক, এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তৃতি ঘটলো কি ভাবে। আদিম সমুদ্রে ব্যাক্টিরিয়া শ্রেণীর জীব জন্মেছিল। তারপর তা থেকে সবুজ কণাবিশিষ্ট এককোষী উদ্ভিদের সৃষ্টি হলো। এককোষী উদ্ভিদ থেকে বহুকোষী উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটে। প্রথমে তারা অপুষ্পক, পরে সপুষ্পক এবং বীজধারী হয়ে উঠলো। এই উদ্ভিদ-জগৎ ফটোসিন্থেসিস বা আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ভূমি, বাতাস ও জল থেকে নিজেরাই খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। পরে এরা স্থলে উঠে আরও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বিশাল অরণ্যানীর সৃষ্টি করলো।

তথাকথিত ব্যাক্টিরিয়ার আর একটা ধারা আদি প্রাণী প্রাসমোডিয়াম সৃষ্টি করলো। এরা অনেকটা এককোষী অ্যামিবার মত—থল্‌থলে একটা পাত্‌লা পর্দায় আবদ্ধ—অতি সূক্ষ্ম। তার না আছে কোন ইন্দ্রিয়, না আছে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তবে জড় বস্তু-কণা দেয়াল ভেদ করে বাইরে থেকে ভিতরে টেনে নেয় এবং কিছু অংশ প্রাণপঙ্কে পরিণত করে' অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করে। এরা দেহের অংশ বিচ্ছিন্ন করে বংশবৃদ্ধি করে।

অনেক সময় এই আলাদা স্বাধীন অংশগুলি গায়ে গায়ে লেগে তাদের আকার বৃদ্ধি করতো। এভাবে বহুসংখ্যক প্রাণীর সৃষ্টি হলো। হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। পরস্পর স্বাধীন এই কোষগুলি শেষে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো এবং এমন বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি করলো যাদের দেহকোষগুলির মধ্যে স্থান অনুসারে শ্রম-বিভাগ হতে লাগলো। ক্রমশঃ তাদের বংশবৃদ্ধিও যৌনজ হতে সুরু করলো। এই প্রাণী-জগৎ কিন্তু নিজেরা

তাদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। উদ্ভিদ-দেহের পচন ঘটিয়ে তারা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি মিটাবার ব্যবস্থা করে নিল। এই প্রাণীগুলি কালক্রমে বেড়ে গিয়ে জেলী-ফিস, ফিতা-ক্রিমি, কণ্টকত্বক তারা মাছ প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত হলো। এই প্রাণী জগতের ধারা প্রাণরক্ষার তাগিদে নানাভাবে আকৃতি পরিবর্তন করতে লাগলো। এদেরই এক শ্রেণী দেহের উপরিভাগে কঠিন খোলস তৈরী করে কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণীর আকৃতি পরিগ্রহণ করেছিল।

প্রাণীদের অন্য একটি ধারা জলে সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্যে দেহের মধ্যে কঠিন একটা মেরুদণ্ড সৃষ্টি করলো। মৎস্য জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেই এটা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অনেক কাল ধরে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আকারের মৎস্যের উৎপত্তি ঘটে এবং হয়তো খাদ্যাভাবের দরুণ তাদের কেউ কেউ ডাঙ্গায় উঠতে চেষ্টা করে। তখন বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্যে ফুল্‌কার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসেরও সৃষ্টি হতে থাকে। ব্যাং এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাচ্চা অবস্থায় এরা ঠিক মাছের মতই সাঁতার কাটে এবং ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

তারপর দেখা যায় সরীসৃপদের। সাপ, কুমীর, টিকটিকি সরীসৃপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই পর্যন্ত প্রাণীদের শীতল শোণিত দেখা যায়। তারপরেই উষ্ণ শোণিতের উপস্থিতি। এই সরীসৃপ থেকেই অভিব্যক্ত হয়েছিল বিশাল আকৃতির ডাইনোসোর প্রভৃতির। এরা তাদের বিশাল দেহ নিয়ে উদ্ভিদ-জগৎ ধ্বংস করতে লাগলো। এদের কেউ কেউ মাংসাশী ও হিংস্র হয়ে উঠলো। সরীসৃপের আর একটি ধারা থেকে প্রথমে লাঙ্গুলবিশিষ্ট পাখী ও পরে আধুনিক পাখীর সৃষ্টি হয়। মাছ, সরীসৃপ, উভচর ও পাখী সবাই ডিম পাড়ে। ডাইনোসোর প্রভৃতি অতিকায় জানোয়ারগুলির ধ্বংসের পর স্তন্যপায়ী ও সন্তান প্রসবকারী প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে লাঙ্গুলবিশিষ্ট ও লাঙ্গুলহীন বানরে পরিণত হয়। এই লাঙ্গুলহীন বানরই মানব-জাতির পূর্বপুরুষ। অবশ্য বর্তমানের শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং-এর সঙ্গে মানুষের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিছুটা জ্ঞাতি সম্পর্ক আছে মাত্র।

এই ধারাবাহিক জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মানুষ পেয়েছে পৃথিবীর স্তরীভূত শীলার ভাঁজে ভাঁজে জীবজন্তুর শিলীভূত দেহাবশেষ থেকে। জীবন-ইতিহাসের এই অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় জীব বিভিন্ন ধারায় বংশানুক্রমিকভাবে সেই আদি প্রাণপঙ্কেরই বাহক মাত্র।

স্বভাবতঃই এখন প্রশ্ন জাগে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ এবং স্বভাবের এত জটিলতা ও বিভিন্নতা দেখা দিল কি ভাবে? তার উত্তরও মানুষ যথাসাধ্য বের করবার চেষ্টা করেছে। সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দৈহিক গঠন-বৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশ করেন প্রথমে জীব-বিজ্ঞানী ল্যামার্ক। তিনি প্রচার করেন যে, অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই যে কোন প্রাণীর আকৃতি ও অঙ্গসংস্থান পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। কোন প্রজাতি নতুন বা ধারাবাহিক অভাব বা অসুবিধা বোধ করলে শরীরের অভ্যন্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নতুন ভাবে বহিঃপ্রকাশিত হয়। যেমন—তৃণ গুল্মের আকস্মিক অভাব হেতু বড় গাছের উঁচু শাখা থেকে পত্র-পল্লবাদি খাবার ধারাবাহিক আশাতেই জিরাফের গলা অত্যধিক লম্বা হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের বিকাশ লাভ ঘটে তার ব্যবহারে। অব্যবহৃত থাকলে সে অঙ্গ লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন তিমি এককালে স্থলচর স্তন্যপায়ী ছিল। কোন কারণে জলচর হবার পর থেকে

তার চার পা লুপ্ত হয়ে সেখানে পাখ্‌নার মত চ্যাপ্টা আকৃতিবিশিষ্ট উপাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সেই উপাঙ্গে এখনও পায়ের হাড় রয়ে গেছে। ল্যামার্ক আরও বলেছিলেন যে, প্রাণী-জগতে তার কার্যকারিতা বংশানুক্রমে সংক্রামিত করে যায়।

ল্যামার্কের এই মতবাদের সাহায্যে কিন্তু সব সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদিও ল্যামার্ক এটা বিশ্বাস করতেন, তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন প্রজাতির অর্জিত লক্ষণগুলি বংশানুক্রমিক হয় না; প্রায়ই এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। কামারের ছেলে পিতার মত পেশীবহুল হাত নিয়ে জন্মায় না, অথবা চিত্রকরের ছেলেই চিত্রকর হয় না। প্রতিভাবানের ঘরেই শুধু প্রতিভাবানের জন্ম হয় না। তাছাড়া ধারাবাহিক নতুন কোন অভাব বোধেই যে আঙ্গিক পরিবর্তন আনে, তা-ও সর্বদা সত্য নয়। সাধারণতঃ অন্ধকারে বিচরণকারী প্রাণীরা অন্ধ হয়; কিন্তু ড্রসোফিলা পচাত্তর পুরুষ পর্যন্ত অন্ধকারে থেকেও অন্ধ হয়ে যায় নি।

ল্যামার্কের কিছু পরে আবির্ভূত হলেন স্বনামধন্য জীব-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নিয়ে। তিনি তুলে ধরলেন জীব-জগতের জীবন-সংগ্রামের বিচিত্র চিত্র। প্রত্যেকটি জীবকে প্রতি মিনিটে বাঁচবার জন্যে কঠোর জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের বিরোধ, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর বিরোধ; আবার উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর বিরোধ অনবরত লেগেই আছে।

কোন জঙ্গলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বড় বড় গাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বল লতাগুলি তাদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে—সেখানে কে কার আগে চারদিকে পাতা মেলে রোদ-হাওয়ায় বেশী ভাগ বসাবে। মাটির নীচেও চলেছে শিকড়ে শিকড়ে প্রতিযোগিতা—কে কার আগে রস শোষণ করবে। কেউ আবার জবরদস্তি করে অন্যের দেহের মধ্যে মূল প্রবেশ করিয়ে রস টেনে নিচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই কঠোর প্রতিযোগিতায় নীচের ছোট ছোট তৃণগুলি হেরে গিয়ে লোপ পেয়েছে বা লোপ পেতে বসেছে।

আবার প্রাণী-জগতেও খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নিয়ে প্রতিনিয়ত হানাহানি চলছে। বাঘ-সিংহ দুর্বল হরিণ-ছাগলের বংশনাশ করছে এবং মানুষ আবার এলোপাথারি গুলিগোলা চালিয়ে বাঘ-সিংহের ভবলীলা শেষ করে দিচ্ছে।

এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে তাই অনেক দুর্বল প্রজাতি লোপ পেয়েছে। অনেকে আবার আত্মরক্ষার্থে বা খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে নিজেদের চেহারা ও রং পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। টিয়াপাখীর গায়ের রং গাছের পাতার সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে যায় যে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন শিকারীও অনেক সময় তাদের সনাক্ত করতে পারে না। মেরু প্রদেশের প্রাণীদের গায়ের রং বরফের মত সাদা এবং মরুদেশের প্রাণীদের গায়ের রং বালির মতই ধূসর হয়ে থাকে। কাজেই তারা অনায়াসে শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়।

ডোরাকাটা বাঘ যখন আলোছায়ায় ঘাসের মধ্য দিয়ে চুপি চুপি শিকারের অনুসরণ করে তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা শত্রুর নজর এড়িয়ে যায়। অনেক রকমের প্রজাপতি আছে, যাদের ডানার রং সবুজ পাতা বা ফুলের পাপড়ির রঙের মত হওয়ার ফলে অনায়াসে শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কাঠিপোকা ও সুতলি পোকাগুলি এমনই অনুকরণ পটু যে, তারা যখন লতাপাতার মধ্যে বিচরণ করে তখন পাখীরা তো দূরের কথা, সন্ধানী মানুষের চোখও তাদের শুষ্ক কাঠি বলে ভুল করে।

প্রাকৃতিক বিরূপতায় কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। তবে যারা নিজেদের দৈহিক আকৃতি অথবা প্রকৃতি প্রয়োজনানুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তারাই বেঁচে যায়।

এভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আকৃতি অথবা প্রকৃতির ক্রম-পরিবর্তনে জীব-জগতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া কৃত্রিম নির্বাচনের দ্বারাও পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। যেমন—আধুনিক বুলডগ, টেরিয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কুকুরগুলি মানুষ নিজের রুচি অনুসারে বিভিন্ন জাতির কুকুরের মিলন ঘটিয়ে উৎপাদন করেছে। এদের আকৃতি ও প্রকৃতি মূল কুকুর থেকে অনেকটা তফাৎ।

ডারউইন যৌন-নির্বাচনের প্রভাবের কথাও বলেছেন। পুরুষ ময়ূরের পুচ্ছের সৌন্দর্য নাকি স্ত্রী-ময়ূরের মন ভুলাবার জন্যে।

কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনেকটা মেনে নিলেও কতকগুলি সমস্যা থেকে যায়। যেমন—কৃত্রিম নির্বাচন বেশী দূর কার্যকরী হয় না। অশ্ব-পিতা ও গর্দভ-মাতা থেকে উৎপন্ন খচ্চর হয় বন্ধ্যা। অন্য জাতও বেশী দূর বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। তাছাড়া যৌন-নির্বাচনও বোধ হয় সত্য নয়; কারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধই এক এক জনের এক এক রকম হয়ে থাকে এবং যৌন-সাথী নির্বাচনে সৌন্দর্যের সূক্ষ্মানুভূতি প্রায়ই থাকে না। আবেগটাই তখন বেশী কাজ করে। তাছাড়া মানবেতর প্রাণীদের যে কোন সৌন্দর্যবোধ আছে, তা কোন পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে নি।

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথাই ডারউইন বলেছেন এবং তারই প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য, দৈহিক যন্ত্রপাতির বিন্যাস অথবা স্নায়ুতন্ত্র ও দৈহিক সূক্ষ্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি।

পরিবর্তন ও তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও সেই পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হয়, তার গ্রহণ-যোগ্য ব্যাখ্যা ডারউইনের মতবাদে পাওয়া যায় না। এখন এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করবো।

হিউগো ডি ভ্রিজ প্রথম দেখতে পেলেন, পঞ্চাশ হাজার ইভিনিং প্রিমরোজের চারাগাছের মধ্যে প্রায় আট শত গাছের পাতা, কাণ্ড, মুকুল প্রভৃতিতে নতুন আঙ্গিক বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ এরা কিন্তু একই পরিবেশে বর্ধিত হয়েছিল। তিনি বললেন, জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ডারউইনের মতানুসারে শত শত বছরের প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধরাবাঁধা ছাকুনির মধ্য দিয়ে হয় না। জীবের পরিবর্তন হয় হঠাৎ—স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোন প্রয়োজন না থাকতেই। একেই তিনি নতুন পরিব্যক্তিবাদ, অর্থাৎ মিউটেশন আখ্যা দিয়েছেন।

তারপরে মেণ্ডেলের বংশানুক্রম তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে প্রথম যুক্তি-সঙ্গত ধারণা তিনিই দেন। বংশানুক্রম জীবের দেহ ও মনের গঠন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য বংশানুক্রমই মানুষ বা অন্যান্য জীবের একমাত্র নিয়ন্তা নয়। বংশগত গুণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। তার প্রকৃতি অনেকটাই পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণু থেকে সংক্রামিত হয়। তারপরে মানুষের চরিত্র গঠনে কাজ করে পরিবেশ ও নিজস্ব সংবেদনা।

মেণ্ডেলের বংশানুক্রম তত্ত্ব বুঝতে হলে জীবকোষ সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার। জীবকোষ চট্‌চটে প্রাণপঙ্কের দ্বারা গঠিত। তার মধ্যে থাকে অপেক্ষাকৃত ঘন ও সুস্পষ্ট কেন্দ্রীন। কেন্দ্রীনের মধ্যে ক্রোমোসোম বা প্রাণসূত্র নামে ক্রোমেটিন কণিকার দ্বারা গঠিত একপ্রকার সূত্র আছে। কোষের বিশ্রামের অবস্থায় সেগুলি অদৃশ্য থাকে; কিন্তু লোপ পায় না। কোষ-বিভাজনের সময় এগুলিকে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এই প্রাণসূত্রের সংখ্যা প্রত্যেকটি কেন্দ্রীনে প্রাণী-বিশেষে সুনির্দিষ্ট। মানুষের কোষ-কেন্দ্রীনে আছে ৪৮টি প্রাণসূত্র। আর ব্যাঙের আছে ২৪টি। এই প্রাণসূত্র প্রত্যেকটি কেন্দ্রীনে দুই প্রস্থ করে থাকে। এক প্রস্থ আসে

মায়ের কাছ থেকে এবং আর এক প্রস্থ আসে পিতার কাছ থেকে। প্রত্যেকটি প্রাণসূত্রের আবার একটি করে সঙ্গী থাকে। প্রাণসূত্রের এক ধর্মবিশিষ্ট সূত্রগুলি মাতার দেহকোষ থেকে বিভাজিত হয়ে ডিম্বাণু তৈরী করে; আবার পিতার দেহকোষ থেকে ভিন্নধর্মী প্রাণসূত্রগুলি একত্রিত হয়ে শুক্রাণু তৈরী হয়। যখন এই ডিম্বাণু শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয় তখন আবার এই বিপরীত-ধর্মী প্রাণসূত্রগুলি জোড়ায় জোড়ায় মিলে পিতা-মাতার দেহকোষের মতই নবজাতকের দেহকোষ তৈরী করে।

মেণ্ডেল খাঁটি বামন ও লম্বা জাতের মটরশুঁটির রেণুর মিলন ঘটিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেন এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি দেখতে পান, নবজাত মটরশুঁটিগুলিতে পিতা ও মাতা উভয়ের গুণ বর্তমান থাকে। কখনও কখনও পিতার প্রভাব প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু মাতা-বামন গাছের বামনতা প্রকট হয়েছে। আবার কখনও উল্টোভাবে নতুন বংশের গাছগুলি লম্বা হয়েছে। অবশ্য তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বংশানুক্রমে বৈচিত্র্যের একটা নির্দিষ্টতা রক্ষা করে। তিনি এই থেকে বংশ-বৈচিত্র্যের কতকগুলি সূত্র বের করেন। যেমন—বামন ও লম্বা খাঁটি মটরগাছের একটি শুক্রাণু ক র্ক ও একটি ডিম্বাণু ক র্ক মিলিত হয়ে র্ক ক, র্ক র্ক, ক ক ও ক র্ক—এই চার প্রকার গুণবিশিষ্ট মটরশুঁটির জন্ম দিতে পারে। অবশ্য সর্বদা এ নিয়ম খাটে না। মেণ্ডেল এই বংশধারার গুণের বাহক হিসাবে প্রাণসূত্রের মধ্যে 'জীন' নামক একটি পদার্থের কল্পনা করেছিলেন।

পরে শক্তিশালী ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ দ্বারা প্রাণসূত্রের মধ্যে এই জীনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই জীন বিন্দুর সমাবেশেই প্রাণসূত্র গঠিত। জীন নিউক্লিও-প্রোটিন ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখা গেল, এই জীনগুলি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের সময় বিশেষ ধরণের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণের সংক্রমণ ঘটায়।

তখন পরীক্ষা চলতে লাগলো যে, জীনের নিউক্লিও-প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিন, না নিউক্লিক অ্যাসিড এই কাজ নিয়ন্ত্রণ করে? কিন্তু নানারকম পরীক্ষা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে প্রোটিনের কার্যকারিতা ধরা পড়ে নি। স্বাভাবিকভাবেই তখন নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর দৃষ্টি পড়লো।

আধুনিক পরীক্ষাগারে বিবিধ গবেষণার ফলে ধরা পড়ে যে, পূর্বের ধারণা অনুযায়ী নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর গঠন সরল নয় বা নির্দিষ্ট ছকেও বাঁধা নয়। তখন ধারণা হলো যে, জীনের মধ্যে আসলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু আছে। এই বিভিন্ন নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে প্রধান হলো ডেস্অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড; সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। এই ডি. এন. এ-র অণু যাবতীয় প্রাণীতে একই রকম আণবিক গঠনে সংবদ্ধ নয়। এর অণুতে পরমাণুগুলির বিন্যাস বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষে পরমাণুতে এসে ঠেকা গেল। এখানেই বোধ হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। অনেকেরই যুক্তিসঙ্গত ধারণা এই যে, ডি. এন. এ.-র পারমাণবিক বিন্যাস যদি কোন রকমে বদ্‌লে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো এক প্রাণীর ডিম থেকে অন্য নতুন অঙ্গ-সমন্বিত বংশধারার সৃষ্টি হবে। ক্যান্সার রোগে হয়তো এই কারণেই দেহকোষের বিকৃতি হয়।

মোট কথা, বাইরের অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তা বা কোন রাসায়নিকের প্রভাবে ডি. এন. এ-র গঠন উল্টে গিয়েই এক প্রজাতি থেকে ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। একেই পরিব্যক্তি বলা হয়। এটা হয় আকস্মিকভাবে। এই পরিবর্তন জীবের পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে অথবা নতুন পরিবেশের সহায়ক হতে পারে। 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' নতুন প্রত্যঙ্গ টিকে থাকলে হয়তো অনেকটা অনুরূপ ধর্মী পিতামাতার মিলনে সেই পরিবর্তন বংশ-ধারায় বর্তায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক তাপ,

আলো, খাদ্য, আর্দ্রতা, রাসায়নিক পদার্থ এবং দেহাভ্যন্তরস্থিত গ্ল্যাণ্ডের হর্মোন নিঃস্রাবের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে অনেক সময় দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। তবে এই পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে।

মানুষও প্রাকৃতিক জীব এবং উল্লিখিত নিয়মের অধীন। সে হয়তো এখন তারই অলক্ষ্যে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিতে মানুষের পেশীবহুল দেহ হয়তো ক্ষীণ হয়ে আসবে, আর বেশী চিন্তা করবার দরুণ মস্তিষ্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। তখন সে হয়ে পড়বে মাথাসর্বস্ব। ভাবতে এখন আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতূহল জাগে। আজ যে হারে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে এবং যদি একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে অনেক বোমা ফাটে তবে অবধারিতভাবে পরিবেশের তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের বীজকোষের ডি. এন. এ-র গঠন-বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটবে এবং অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট মানুষের উদ্ভব হবে। বাড়তি অঙ্গগুলি তাদের বোঝা হয়ে বা ক্যান্সারজনিত দেহকোষের বিপাকে বিঘ্ন ঘটিয়ে তাদের অনেকাংশ হঠাৎ ধ্বংসের পথে নেমে আসবে।

সঞ্চয়ন

মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা

নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ লয়েড মত্‌স্ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

মানুষ হয়তো বা কোন দিন বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহে গিয়ে উপস্থিত হবে। সে সব গ্রহলোকে কি আছে, না আছে—তা পরীক্ষা করেও দেখে আসবে। কিন্তু সে সব গ্রহের আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে মনে হয় না যে, মানুষ সে সব স্থানে বসবাস করতে পারবে। তবে একটি গ্রহ আছে—সেটি হলো মঙ্গল। অনেকের ধারণা, সেখানকার আবহাওয়ায় কোন মানুষ বা পশুর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতে পারে।

তাঁর মতে, শুক্রগ্রহ অতি ঘন জলীয় বাষ্পে আচ্ছন্ন। এ-প্রসঙ্গে তিনি এই কথাও বলেছেন যে, কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, এই গ্রহটি ফুটন্ত জলীয় বাষ্পে আবৃত। তিনি বলেন, তাহলেও কোন জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অনুকূল আবহ-মণ্ডল সেখানে রয়েছে।

ডাঃ মত্‌স্ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কোন সময়ে বুধগ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু সূর্য ও বুধগ্রহের মধ্যে ব্যবধান পৃথিবীর তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ কম। বুধগ্রহ সূর্যের অতি নিকটে; তাছাড়া এর এক দিকে সূর্যের আলোক একেবারেই পড়ে না। ফলে ঐ গ্রহে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও শৈত্যের সমস্যা রয়েছে।

এদের মধ্যে বৃহত্তম গ্রহ হলো বৃহস্পতি। গ্রহ-যাত্রীদের কাছে বৃহস্পতিতে অভিযানই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। কারণ এর আবহাওয়া বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ। তাছাড়া সেখানকার আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় তিন গুণ বেশী। সুতরাং পৃথিবীতে যে জিনিষের ওজন দু-শ' পাউণ্ড, সে জিনিষই বৃহস্পতিতে নিয়ে গেলে তার ওজন দাঁড়াবে ছ-শ' পাউণ্ড।

পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম রেডারের সাহায্যে অন্য গ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। রেডার যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে যে সঙ্কেত প্রেরণ

করে তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই গবেষকবৃন্দ দু-প্রকার রেডার-সঙ্কেত প্রেরণ করেছিলেন।

এই সঙ্কেত প্রেরণকালে শুক্রগ্রহ ছিল পৃথিবী থেকে প্রায় ২৮০০০০০০ মাইল দূরে। প্রেরিত সঙ্কেত প্রায় ৫৬০০০০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং এতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। রেডার যন্ত্রের সাহায্যে এত দূরের সংযোগ সাধন ইতিপূর্বে আর সম্ভব হয় নি। এই কথাও জানা গেছে যে, পৃথিবী থেকে যে সব রকেট শুক্রগ্রহে প্রেরণ করা হবে, শুক্রগ্রহে না পৌঁছা পর্যন্ত সমগ্র পথের খবরাখবর বেতার যন্ত্র সমন্বিত রকেটের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

ভবিষ্যতে মহাশূন্য-যাত্রীদের খাদ্য-সমস্যা মহাশূন্যে যাত্রার পক্ষে অন্যতম কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

তিনজন লোক যদি এক বছরের জন্যে মহাশূন্যে যাত্রা করে তবে তাদের বেঁচে থাকবার জন্যে অন্ততঃ পাঁচ টন খাদ্য, জল ও অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে। সাধারণভাবে এইসব জিনিষ যে পরিমাণে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা বিচার করেই এই হিসাব করা হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে যাত্রায় তিন বছর লাগবে। সুতরাং তিনজন যাত্রীর ১৫ টন খাদ্য, জল ও অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে।

ডাঃ বার্ণার্ড ই. প্রকটার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, খাদ্যপ্রাণ সম্পূর্ণ বজায় রেখে মহাশূন্য-যাত্রীর জন্যে আকার ও ওজনে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। কিন্তু কিভাবে যে তা কার্যকরী করতে হবে, তা এখনও জানা যায় নি।

অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গ

এমন দিন আসছে যখন আপনার বাসনকোশন শব্দ-স্পন্দনের সাহায্যে ধৌত করা হবে। সেই স্পন্দন আপনার তো নয়ই, আপনার কুকুরটিরও শ্রুতিগোচর হবে না। এই অশ্রুত ধ্বনির সাহায্যে কেবল যে বাসনকোশনই ধোওয়া যাবে, তা নয়—মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম শল্য-চিকিৎসা, ভূগর্ভ থেকে তৈল উত্তোলন, কাচ গলানো, কঠিন বস্তু ছেদন, রোগের অস্তিত্ব নির্ধারণ—এমন কি, প্রাণীহত্যা পর্যন্ত এই অশ্রুত শব্দ-স্পন্দনের সাহায্যে করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আজ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন। এই হলো তাঁদের নবতম গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র।

সাধারণতঃ যে সব ধ্বনি মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না, সেগুলিই অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে পড়ে।

এ সব ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর না হলেও তরঙ্গ হিসাবে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণ করবার যে চেষ্টা হচ্ছে, তাতে এই স্পন্দনকে নানাভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

যে সব যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণতঃ শব্দ-তরঙ্গকে খুব বেশী কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তন্মধ্যে সোনার (Sonar) অন্যতম। জলের নীচে কোন বস্তু, বিশেষ করে সাবমেরিনের অস্তিত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। সোনার যন্ত্র ঠিক রেডার যন্ত্রেরই অনুরূপ। শূন্য থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে রেডার এবং জল থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে সোনার ব্যবহৃত হয়। কার্যপদ্ধতি দুয়েরই প্রায় এক রকম। জাহাজ থেকে যে সব শব্দ-তরঙ্গ ছাড়া হয়, সেগুলি কোন বস্তুতে লেগে প্রতিফলিত হয়। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা ঐ বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন।

বিভিন্ন বস্তু পরিষ্কার করবার কাজে অশ্রুত শব্দ-

তরঙ্গের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে যে বস্তুটিকে পরিষ্কার করা হবে, তা কোনও তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে ঐ তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ-কম্পন প্রেরণ করা হয়। ঐ কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার থেকে দশ লক্ষ বার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ফলে জলের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়; কাজেই সামান্য ময়লাও জিনিষটির গায়ে লেগে থাকতে পারে না। ইন্‌জেকশনের সূচ, গহনাপত্র প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়।

অতি সূক্ষ্ম সোনার পাত পরিষ্কার করবার ব্যাপারেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

ইস্পাত প্রভৃতি কঠিন বস্তুর মধ্যে গর্ত করা বা এ সব কঠিন বস্তু দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ আকারের কোন জিনিষ তৈরী করবার ব্যাপারে এই পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হয়।

দন্ত-চিকিৎসকেরা দাঁতে এবং শল্য-চিকিৎসকেরা জীবন্ত প্রাণীর হাড়ে গর্ত করবার ব্যাপারে এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এই অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে অতি উচ্চ তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ-সব তরঙ্গের দ্বারা কাচ গলাবার মত তাপও সৃষ্টি করা যেতে পারে।

অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গকে একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে একত্রিত করা যায়। এই কেন্দ্রীভূত তরঙ্গের সাহায্যে ত্বক বা দেহের কোন তন্তুর কোন রকম ক্ষতি না করে মাংসপেশীতে তাপ সঞ্চার করা যেতে পারে। ব্যায়ামবিদ্‌দের মাংসপেশীর রোগের চিকিৎসায় আজকাল এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

এখন মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম শল্য-চিকিৎসায়ও এই কেন্দ্রীভূত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের যে অংশ ঠিকমত কাজ করে না, তাকে পুড়িয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা হয়। তাতে মস্তিষ্কের ঐ অংশ-সংলগ্ন সুস্থ অংশের কোন প্রকার ক্ষতি হবারই আশঙ্কা থাকে না এবং মস্তকের খুলি বের করে অপারেশন করবার প্রয়োজন হয় না।

আজকাল তৈল নিষ্কাশনের জন্যে জটিল যন্ত্রপাতি ভূগর্ভে প্রোথিত না করে এই অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যেই পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলি তৈল উত্তোলনের চেষ্টা করছে।

পানীয় দ্রব্যের বোতলের ছিপি আঁটবার ব্যাপারে ব্যবসায়ীরাও এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তারা কেন্দ্রীভূত শব্দ-তরঙ্গ পানীয় দ্রব্যের উপর প্রয়োগ করেন। ফলে ছিপি আঁটবার সময়ে বোতলের ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায় এবং পানীয় দ্রব্য বায়ুশূন্য বোতলে থাকবার ফলে বহুদিন পর্যন্ত তার কোন বিকৃতি ঘটে না।

তবে যে সব অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তা থেকে মানুষের বিপদ আছে। তাতে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে, কোন ইঁদুরকে দু-মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে ফেলতে পারে; এমন কি, চার মিনিটের মধ্যে তাকে মেরেও ফেলতে পারে।

মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের যন্ত্র

মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের যন্ত্র সম্বন্ধে এড্‌গার ফিলিপ্‌স্ লিখিয়াছেন—উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনে পরজীবীরা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তারা বিরাট এলাকা জুড়িয়া মৃত্তিকার মধ্যে বসবাস করিয়া থাকে। এখন একটা বড় সমস্যা হইল মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের ব্যবস্থা করা। এই রোগ দমন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে মৃত্তিকার মধ্যে উদ্‌বায়ী তরল পদার্থের ব্যবহার কিছুটা সাফল্যের লক্ষণ প্রকাশ করে। কিন্তু এই পদার্থ বহু মূল্যবান হওয়ায় ইহার ব্যবহার লাভজনক বলিয়া গণ্য হয় না।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত অকিনক্রুইভ-এর উদ্ভিদ-রোগ-বিজ্ঞান বিভাগে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্কে যে সকল গবেষণার কাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে মৃত্তিকার মধ্যে সুলভ উপকরণ মিশ্রণের জন্য একটি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে।

এই যন্ত্রটি হইল 'হাওয়ার্ড-অলম্যান অকিনক্রুইভ সয়েল মিক্‌চারার'। অক্সফোর্ডে গত ৭ই জুলাই হইতে ১০ই জুলাই পর্যন্ত যে কৃষি-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে এই যন্ত্রটি প্রদর্শিত হয়। যন্ত্রটির কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে ব্যাপক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

এই মিশ্রণটি ঈল-ওয়ার্মের আক্রমণ হইতে আলুর ফসল রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য ইহা মৃত্তিকা-বাহিত অন্যান্য রোগ দমনেও বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। যন্ত্রটি লইয়া পরীক্ষার সময় কেবল পীত মার্কারি অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

এই যৌগিক পদার্থের চূর্ণ মৃত্তিকার উপরিভাগে এবং ৭ ইঞ্চি গভীরে ব্যবহৃত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, এই ভাবে একর প্রতি ৫½ পাউণ্ড পারদের যৌগিক পদার্থের ব্যবহার আলুর ঈল-ওয়ার্ম দমনে অনেক বেশী ফলপ্রদ হয়—কেবল উপরিভাগে ২০০ পাউণ্ড পরিমাণ যৌগিক পদার্থের ব্যবহার সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না। 'সয়েল মিক্‌চারে' দুই রকমের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়—হাওয়ার্ড রটোভেটর ও অলম্যান স্পীডেসি ডাস্টার।

অলম্যান ডাস্টারের কাজ হইল, স্বচ্ছ প্লাষ্টিক টিউবের মধ্য দিয়া মৃত্তিকার উপরিভাগে চূর্ণ পদার্থ ছড়াইয়া দেওয়া। রটোভেটরের কাজ হইল, ৭ ইঞ্চি গভীরে সেই চূর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়া মৃত্তিকার সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া।

এই যন্ত্রটি যে কেবল আলুর ঈল-ওয়ার্ম দমনের কাজেই সাহায্য করিবে তাহা নহে, ইহা মৃত্তিকা-বাহিত অন্যান্য জটিল রোগ-জীবাণু দমনের কাজেও সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই পীত মার্কারি অক্সাইড একবার মাত্র ব্যবহার করিয়া শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ ঈল-ওয়ার্ম ধ্বংস করা সম্ভব। ইহাতে একর প্রতি ব্যয়িত হইবে মাত্র ১০ হইতে ১২ পাউণ্ড। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই ভাবে কীট দমন সফল হওয়ায় একর প্রতি ২¼ টন আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের চিকিৎসা

এই সম্পর্কে ইয়ু তিয়েন মিন ও ওয়াল্লহসিঙ্ লিখিয়াছেন—সর্বত্রই লোকের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, শুধুমাত্র শল্য-চিকিৎসার সাহায্যেই অ্যাপেণ্ডিসাইটিস নিরাময় করা সম্ভব। বলা বাহুল্য যে, শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে বহু লোক এই বিপজ্জনক রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তবুও একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়—ইহা কি আদর্শ চিকিৎসা-প্রণালী? এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহাদিগকে শল্য-চিকিৎসার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো মনে হইয়াছে যে, অন্য কোন উপায় থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু এই ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে; কারণ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত ১৮৮৭ সালে মর্টন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে।

দুই হাজার বৎসর পূর্বেই চীনের চিরায়ত ভেষজ শাস্ত্র "হুয়াঙ তি নিয়ে চিঙ্" (চিকিৎসা বিধি) নামক পুস্তকে আন্ত্রিক প্রদাহ, অর্থাৎ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস-এর একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত চিকিৎসক চ্যাঙ্গ চুঙ্গ-চিঙ অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে শল্য-চিকিৎসায়

বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দীর্ঘ এক হাজার বৎসরের উপর চীনের মানুষ অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্য এই ধরণের চিকিৎসার উপরেই নির্ভর করিত এবং ইহার সাহায্যে অগণিত জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু চীনের উপর প্রায় ১১০ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী অনধিকার প্রবেশের ফলে পরম্পরাগত চীনা ভেষজ-বিদ্যার অনুশীলন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ইহা বিস্মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মুক্তির পর হইতে ইহা আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার একটি বিশিষ্ট অবদান এই যে, শল্য-চিকিৎসা ছাড়াও অ্যাপেণ্ডিসাইটিস নিরাময় হইতে পারে, এমন আশ্বাস ইহাতে পাওয়া গিয়াছে।

পরম্পরাগত চীনা ভেষজ-শাস্ত্রানুসারে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের চিকিৎসার জন্য দুইটি পদ্ধতি আছে —ঔষধ সেবন এবং সূচী-চিকিৎসা। প্রথম পদ্ধতিতে চ্যাম্প চুম্প-চিঙ-এর প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি সামান্য অদল-বদল করিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহাতে দুই রকমের ক্বাথ বা পাচন "রিয়ুম অফিসিনেইল-পায়েওনিয়া মৌতান" (Rheum Officinale-Paeonia Moutan) এবং 'প্যাট্রিনিয়া স্ক্যাবিওসয়েফোলিয়া লিঙ্ক" (Patrinia Scabiosaefolia Link) রোগীর অবস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে অথবা একসঙ্গে মিলাইয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় (যে সব ক্ষেত্রে জটিলতা নাই, সে সব ক্ষেত্রে কার্যকারিতার পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ)। এই ব্যবস্থায় চার হইতে পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকিতে হয় এবং দূর ভবিষ্যতের পক্ষেও ইহার ফল ভাল হইয়া থাকে।

সূচী-চিকিৎসা সর্বপ্রকার রোগের পক্ষেই একটি সুবিদিত ও অতি পুরাতন ব্যবস্থা। ইহা চীনে অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর যাবৎ প্রচলিত আছে। কিন্তু অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে ইহার প্রয়োগ মাত্র ১৯৫৮ হইতে করা হইতেছে। পরম্পরাগত তত্ত্বের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা-কর্মীরা 'চিঙ্গলু' ব্যবস্থা অনুযায়ী রোগীর পায়ে সূচীভেদ্য স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যবস্থায় বেশ কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায়ও চার হইতে পাঁচদিন হাসপাতালে থাকিতে হয়। তিন-চার মাসের ফল পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দূর ভবিষ্যতের পক্ষেও ইহার ফল ভাল, তবে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল হইল—(১) প্রদাহের আশু উপশম, যাহা সূচীভেদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হইতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যেই বমির ভাব ও খিঁচুনী দূর হইয়া যায় এবং বেদনার অনেকখানি উপশম হয়। সাধারণতঃ ১৩ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তলপেটের যন্ত্রণা ও স্ফীতি অপসৃত হয়। (২) বেদনাহীনতা। যেহেতু সূচীটি চুলের মত সূক্ষ্ম এবং ভেদ করিবার স্থানটি 'চিঙ্গলু' ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচিত হয়, সেহেতু রোগী কোন বেদনা অনুভব করে না। (৩) সাজসরঞ্জামের সরলতা। সূচী-চিকিৎসার সাজসরঞ্জামের মধ্যে থাকে মাত্র কয়েকটি ধাতু-নির্মিত সূচ এবং ভেদ করিবার স্থানটিকে জীবাণুশূন্য করিবার জন্য এক শিশি অ্যালকোহল। সেই জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে, বাড়ীতে ও যে সমস্ত জায়গায় হাসপাতালের সংখ্যা কম, সেই সব গ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে অনায়াসেই এই ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করা চলে। (৪) প্রাযুক্তিক সরলতা। একজন দক্ষ চিকিৎসককে কয়েকবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের সূচী-চিকিৎসা করিতে দেখিলেই চিকিৎসক ও সেবকেরা ইহা শিখিয়া

লইতে পারেন (সূচী-চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও অনুশীলন প্রয়োজন)।

অ্যাপেণ্ডিক্স এবং পায়ের নীচের দিকে অবস্থিত সূচীভেদ করিবার স্থানটির মধ্যেকার সংযোগ-সূত্র কোথায়? সূচী-চিকিৎসা এত ফলদায়ক কেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একমাত্র "চিঙ্গলু" তত্ত্বানুযায়ীই দেওয়া চলে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী ইহাদের ব্যাখ্যা করা চলে না।

ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদের সন্ধানে

নদী-নালার দেশ ভারতের জল-সম্পদের অভাব নাই। এখানে বৃষ্টিপাতও কম নয়। তথাপি এই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় মরুভূমির মত। আবার যে সকল অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সে সকল অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে দারুণ জলাভাব দেখা দেয়—জলের অভাবে চাষ-আবাদ শুকাইয়া যায়। এমন কি, পানীয় জলের জন্য হাহাকার ওঠে। এই অবস্থায় খামখেয়ালী প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা যায় না, বিশেষতঃ যেখানে খাদ্যাভাবের বিরাট সমস্যা বর্তমান।

এই খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াই ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদের সন্ধান করা হইতেছে। কারণ, একমাত্র এই সূত্র হইতে প্রয়োজনমত সব সময়েই জল পাওয়া সম্ভব।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদ সন্ধানের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র দেশব্যাপী অনুসন্ধান-কার্য চলিতেছে। গত জুলাই মাস পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ২৮১টি স্থানে খনন করা হয়। অনুসন্ধানের কাজ বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরালা ও বিহারে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় নর্মদা উপত্যকায় ৩০টি স্থানে কূপ খনন করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ১৬টিতে জলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যতগুলি খনন করা হয়, তাহার মধ্যে ১০০টি সফল হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশের জল-সম্পদের উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। আর সেই সঙ্গে ভূগর্ভে প্রচুর জল-সম্পদের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে নালা কাটিয়া জল আনিয়া সেচের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য বা সম্ভব নহে, সেখানে ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদকে কাজে লাগান যাইতে পারে।

কোথায় কোথায় ভূগর্ভে জল পাওয়া যাইতে পারে, প্রথমে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা তাহা জানাইয়া দেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় যে, সম্ভাব্য স্থানে অন্য স্বাভাবিক সূত্র হইতে জল পাওয়া যায় কিনা এবং সেখানে সেচের জন্য জলের চাহিদা রহিয়াছে কিনা। তাহা ছাড়া সেই স্থান উঁচু হওয়া দরকার, যাহাতে বন্যায় প্লাবিত না হইয়া যায় এবং সেখানে সাজসরঞ্জাম পরিবহনের সুবিধাও থাকা চাই।

সাধারণতঃ নির্বাচিত স্থানে এক হাজার ফুট বা নিকটতম শিলাস্তর পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত খনন করা হয়। খনন করিবার সময় প্রতি দশ ফুট অন্তর মাটির নমুনা লইয়া ভূতাত্ত্বিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

খনন সম্পূর্ণ হইলে কাদা জলের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া গর্তটিকে পরিষ্কার করা হয়। বৈদ্যুতিক লগিং-এর সাহায্যে জলের গুণাগুণ বিচার ও জলের স্তরের সন্ধান করা হয়। ইহা হইতে ভূতাত্ত্বিকগণ স্থির করেন যে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যাইবে কিনা এবং তাহা লাভজনক হইবে কিনা। লাভজনক বিবেচিত না হইলে খালটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঘণ্টায় ২০ হাজার গ্যালন জল

তুলিবার মত কূপ করিতে হইলে উহার ব্যাস বাড়াইয়া ১৬ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি করা হয়। সাধারণতঃ গর্তের মধ্যে চাপ দিয়া পরীক্ষার জন্য জল তুলিয়া লওয়া হয়। রাসায়নিকেরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রয়োজন হইলে জলের নমুনা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার দপ্তরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সময় ভারত সরকার ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধান সম্পর্কে খনন-কার্য আরম্ভ করেন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহযোগিতা মিশনের সঙ্গে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ও কারিগরি সহযোগিতার চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য গৃহীত কার্যসূচী অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৬টি অঞ্চলে খনন-কার্যের প্রস্তাব করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল কেন্দ্রে ঘণ্টায় ২০ হাজার গ্যালনের মত জল পাওয়া যায়, সেগুলিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া রাজ্য-সরকারের পরিচালনাধীনে আনা হয়। এই খনন কার্যের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা রাজ্য-সরকারকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। যে সকল কেন্দ্রে ২০ হাজার গ্যালনের কম ও ১৫ হাজার গ্যালনের অধিক জল পাওয়া যায়, সেগুলিকে নলকূপ হিসাবে ব্যবহারের জন্য রাজ্য-সরকার গ্রহণ করিতে পারেন। রাজ্য-সরকারকে এই জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় বহন করিতে হইবে।

১৯৫৩ সালে যখন উল্লিখিত চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় তখন আশা করা গিয়াছিল যে, তিন বৎসরের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এই খনন-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় নাই। এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে নর্মদা উপত্যকায় প্রথম খনন-কার্য আরম্ভ করা হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে অতিরিক্ত সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে ব্যাপক-ভাবে খনন-কার্য চালান হয়। আশা করা যায়, চলতি বৎসরেই পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইবে।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৩৫০টি পরীক্ষামূলক খনন-কার্য চালান হইবে। স্থির করা হইয়াছে যে, প্রথমে ২৮৭টি এবং পরে ২২টি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ব্যয় হইবে মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। তন্মধ্যে প্রথম পরিকল্পনাকালে ৮৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

সমুদ্র-তলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

মানব-জীবন ও সৌরজগতের উৎস ও উৎপত্তি-স্থল যে কোথায়, তাহার সন্ধান মহাশূন্যের তুলনায় পৃথিবীর অভ্যন্তরেই পাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এই জন্যই এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে 'মোহোল' (Mohole) নামে একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল গলিত পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার চতুর্দিকে যে শিলাবৎ কঠিন আবরণ রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় ম্যাণ্টল। এই পরিকল্পনা অনুসারে সমুদ্রের তলদেশে গর্ত খনন করিয়া ম্যাণ্টলের অংশবিশেষ সংগ্রহ করা হইবে। মহাশূন্য ও মোহোল সম্পর্কে একই সময়ে তথ্যানু-সন্ধানের চেষ্টা করা হইলে ইহা ভবিষ্যতে বর্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার অন্যতম বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

পৃথিবীর উপরিস্থিত কঠিন স্তর এবং ম্যাণ্টলের মধ্যে একটি রহস্যময় স্তর রহিয়াছে। ইহার নাম মোহো। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর মধ্যে এই স্তরটি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রস্তরময় আবরণ ও উপরিস্থিত

স্তরের মধ্যে ছেদ রেখা টানিয়া দিয়াছে। আবিষ্কারক যুগোশ্লাভিয়ার বিজ্ঞানীর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে Mohorovicic Discontinuity। এই স্তরটি পৃথিবীর স্থলভাগের ত্রিশ মাইল নীচ হইতে সুরু হইয়াছে। সুতরাং স্থল হইতে এই স্তর সমুদ্রের তলদেশের অপেক্ষাকৃত কাছে আছে। এই জন্যই মোহো স্তর পর্যন্ত এবং তাহার পরেও গর্ত খনন সমুদ্রের তলদেশ হইতেই সহজতর হইবে। এই রহস্যময় স্তরটি ভেদ করিয়া পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের ম্যাণ্টল এলাকা পর্যন্ত গর্ত খনন করা হইবে বলিয়া এই পরিকল্পনার নামকরণ মোহোল করা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং দিক হইতে এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপদান করা খুবই কঠিন; কারণ সমুদ্রের গভীরতা যেখানে খুবই কম, সেখানেও এই ম্যাণ্টল বা প্রস্তরময় আবরণ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ পাঁচ মাইল নীচে রহিয়াছে। সমুদ্রে ভাসমান জলযান হইতেই এই পরীক্ষা-কার্য চালাইতে হইবে; কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝাই ইহার অন্তরায়।

এই প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত যে সকল সুদীর্ঘ পাইপ বা নল সমুদ্রের তলদেশে বসানো হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তারপর সেই নলের মধ্য দিয়া সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত অদ্রবণীয় পদার্থ এবং পৃথিবীর আদি আগ্নেয় শিলাস্তরের মোহো ও ম্যাণ্টল অঞ্চলের অংশবিশেষ সংগ্রহের ব্যাপারটি অক্ষতভাবে নল বসাইবার সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতে পারে। মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ এই অঞ্চল সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় নাই বলিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বিশেষ ধরণের ড্রিলিং বা গর্ত খননের সাজসরঞ্জাম এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে হইবে।

গভীর সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড চাপে সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা ও অন্যান্য অংশ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ঐ স্থানের জলের তাপও প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি। অতল সাগরের এই সকল অদ্রবণীয় পদার্থ উদ্ধার করিতে পারিলে এই সকল পরীক্ষা করিয়া জীবাশ্ম বা ফসিল কিভাবে গঠিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে এবং ইহার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। প্রাণীদের বিবর্তনের ব্যাপারেও ইহা আলোকপাত করিতে পারে। পৃথিবীর আদি যুগে সমুদ্রের তলদেশে যে কি ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, অবশ্যই তাহা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত পদার্থসমূহ পর্যালোচনা করিয়া জানা যাইবে। এই সকল পদার্থ লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া সেখানে সঞ্চিত হইয়াছে।

সৃষ্টির পর উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হইয়াছে এবং ইহার আবহাওয়া পরিবর্তিত হইয়াছে। ঐ সকল স্তরের উপকরণসমূহ পর্যালোচনা করিয়া পৃথিবীর এই আবহাওয়া, জীবতাত্ত্বিক এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে একটি পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর আদি যুগের কঠিন স্তরটি রহিয়াছে সমুদ্রের তলদেশে; অর্থাৎ পৃথিবী যখন বর্তমান আকার ধারণ করে নাই এবং সমুদ্রের সৃষ্টি হয় নাই তখন ইহার উপরিভাগ কেমন ছিল, তাহার পরিচয় সমুদ্রের তলা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। আর একটি কথা, যখন ভূমিকম্প হয় অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাট রকমের বিস্ফোরণ ঘটে তখন পৃথিবীর এই কঠিন স্তর হইতে কেন তাহাদের প্রতিকম্পন হয় না—তাহা লইয়াও বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন। এই বিষয়ে একটি মতবাদ হইতেছে, সৌরমণ্ডলীর প্রথম সৃষ্টিকালে অন্যান্য গ্রহের যে উল্কাকণাসমূহ পৃথিবীর আদি স্তরের উপরে আসিয়া জমা হইয়াছে, সেই স্তর হইতে প্রতিকম্পন হয় না। পৃথিবী হইতেও যে সকল উল্কা ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহারও যে ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছিল, চন্দ্রের অসমান দেহের মধ্যেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

পৃথিবীর কঠিন স্তর মোহো ও ম্যাণ্টল কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে সামান্যই জানা গিয়াছে। অনেকের ধারণা, এই কঠিন স্তর এক ধরণের ব্যাসাল্ট দ্বারা গঠিত। ম্যাণ্টল হইতেছে অর্ধ-নমনীয় উচ্চচাপে সংনমিত একটি প্রস্তরময় স্তর। পৃথিবীর মোট বস্তুপরিমাণ বা ভরের শতকরা ৮০ ভাগই হইল এই ম্যাণ্টল। মোহোর কঠিন স্তরটি ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর এই সকল রহস্যপূর্ণ অঞ্চল হইতে অংশ-বিশেষ নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করিতে পারিলে পৃথিবী যে কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাইতে পারে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মোহ ও ম্যাণ্টল সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। পৃথিবীর আদি স্তর ও ইহার নিম্নবর্তী ম্যাণ্টল স্তরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কারখানায় আকরিক ধাতুর শোধনকালে গলিত অবস্থায় ইহার উপরিভাগে যে গাদ দেখা যায়, আদি স্তর ও ম্যাণ্টল কি ঠিক সেই রকম? অর্থাৎ আদি স্তর কি ম্যাণ্টলের গাদ, অথবা মোহোর নিম্নে অবস্থিত প্রস্তরময় স্তর কি পৃথিবীর আদি স্তরেরই সমগোত্রীয়? অভ্যন্তরস্থ বিরাট চাপে এই স্তরের পরমাণুতে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বলিয়াই কি পৃথিবীর আদি স্তরের পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে? পৃথিবীর কেন্দ্রীয় তাপের উৎস কি তাপপ্রবাহ, না তেজস্ক্রিয়তা? মোহোল পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে এই ধরণের অন্যান্য বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে এবং বহু নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল আবিষ্কারের ফলে আমরা পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন-প্রণালী সম্পর্কে এতকাল যাহা শিখিয়াছি, তাহারও আমুল পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনা রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কোন্ সমুদ্রের তলায় মোহোল ড্রিলিং বা সুড়ঙ্গ খনন করা সর্বাধিক সুবিধাজনক হইবে, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কয়েকটি জাহাজ নিয়োগ করিয়াছে। এই সকল জাহাজের সাহায্যে ১৯৫৯ সালে অ্যাটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি স্থান বিবেচনাধীন আছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ম্যাণ্টলের দুরত্ব গড়পড়তায় ছয় মাইলের কাছাকাছি। মোহোল পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কারিগরি দিক হইতেও ইহা কার্যকরী করা সম্ভব। ইঞ্জিনিয়ারেরা বলেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা দশ মাইল পর্যন্ত খনন করিতে পারিবেন। পরীক্ষামূলকভাবে গর্ত খননের কাজ এবং মূল মোহোল পরিকল্পনার রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

মোহোল পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হইতেছে ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স। এই জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ড্রিলিং-এর কাজ ১৯৬২ সালের মধ্যেই সমাপ্ত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থা সহযোগিতা করিবে।

বজ্রপাত

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মেঘের মধ্যে ভীষণ শব্দে বিদ্যুৎ-স্ফুরণকে বলা হয় বজ্রপাত। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে—দধীচির অস্থি দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের জন্যে এই বজ্র নির্মিত হয়েছিল। সে যা-ই হোক, বজ্র অতি প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে। বড় রকমের একটি বজ্রপাতের ধ্বংস-শক্তি হিরোসিমা বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমার এক শ' গুণেরও বেশী। স্বস্তির কথা এই যে, এই শক্তি কেবল ধ্বংস সাধনেই ব্যয়িত হয় না।

পায়ের তলার মাটি থেকে মাথার উপরের বায়ু ও আয়নমণ্ডল-ব্যাপী প্রায় দু শ' মাইল বিস্তৃত বজ্রপাতের ক্ষেত্র। বজ্রপাতের যথার্থ কারণ কি, সে বিষয় এখনও আমাদের পুরাপুরি জানা নেই; তবে এ-সম্বন্ধে জোর গবেষণা চলছে এবং শীঘ্রই এ-বিষয়ে নানারকম তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। মোটামুটি বলা যায় যে, বায়ুমণ্ডল ও আয়নমণ্ডলের বৈদ্যুতিক আধান হচ্ছে ধনাত্মক আর ভূপৃষ্ঠের আধান হচ্ছে ঋণাত্মক। এই দুটি মণ্ডল থেকে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়, তা অব্যাহত থাকলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু বৈদ্যুতিক আধানের অবসান ঘটবার কথা। প্রকৃতি কিন্তু এরূপ তড়িৎশূন্যতা বরদাস্ত করে না; তাই বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়। বজ্রপাতের কাজ হচ্ছে, পৃথিবী থেকে বিদ্যুৎ তুলে নিয়ে বায়ু ও আয়ন মণ্ডলে পৌঁছে দেওয়া, যাতে কখনও সেরূপ শূন্যতার উদ্ভব না হতে পারে।

আকাশে বায়ুপ্রবাহ অতি তীব্রগতিতে কোন কোন সময় উঠা-নামা করে থাকে। এই গতির তীব্রতা ঘণ্টায় ১৬০ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে। যে বায়ুর তাপমাত্রা যত অধিক, সে বায়ু তত উচ্চতায় ওঠে। উচ্চ আকাশের তাপমাত্রা অনেক কম বলে ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ুস্রোত দ্রুত শীতল হয়ে পড়ে। এর ফলে বৃষ্টি, তুষার ও বরফ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বায়ুপ্রবাহের প্রচণ্ড শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির উদ্ভব হয়। প্রথমে মেঘে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু-রকমের আধানই থাকে। বেগবান বায়ু সে মেঘকে প্রায় ৭ মাইল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে। সেখানে তাপমাত্রা খুবই কম। সেই উচ্চ আকাশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কি করে পৃথকীকরণ সম্ভব হয়, তা এখনও সঠিক জানা যায় নি।

বজ্রমেঘে ঋণাত্মক আধান তলার দিকে, আর ধনাত্মক আধান উপরের দিকে থাকে। ঋণাত্মক আধান খুব শক্তিশালী হলে ধনাত্মক তড়িৎ নীচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে পতিত ধনাত্মক তড়িৎ-কণা মেঘের তলার ঋণাত্মক তড়িতের নিকট যাবার জন্যে দ্রুতগতিতে পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়ে অগ্রসর হয়।

মাটিতে বাঁধা এসব কোটি কোটি তড়িৎকণা উপরের মেঘের ঋণাত্মক তড়িৎকণার আকর্ষণে মাঠ ঘাট পেরিয়ে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে, এমন কি—গরুঘোড়া, লোকজনের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যায়। তড়িৎশক্তি খুব জোরালো না হলে এই ছুটাছুটির ব্যাপারটা আমাদের অনুভবে আসে না। বাতাসের মধ্যে এক সেন্টিমিটার ব্যবধানে ২০০ ভোল্ট বা ততোধিক বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের পার্থক্য থাকলে 'করোনা' বা আলোক বিকিরণ দেখা যায়। করোনা সাধারণতঃ জাহাজের মাস্তুল,

রেডিও-র এরিয়েল, উড়োজাহাদের ডানার অগ্রভাগ অথবা অন্য কোন কিছুর সূক্ষ্মাগ্রভাগে দেখা যায়। ধনাত্মক তড়িৎকণার সঙ্গে ইলেকট্রনের (ঋণাত্মক তড়িৎকণা) মিলনে এই করোনা বা আলোক-মুকুটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বজ্রপাতের জন্যে আরও অধিক বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন।

দু-রকমের আধানের বিরোধী শক্তি যখন এক হয়ে যেতে চেষ্টা করে তখন মেঘ ও মাটির ব্যবধানে অবস্থিত বাতাস এই তড়িৎ পরিবহনে বাঁধার সৃষ্টি করে। দেখা গেছে যে, শুষ্ক বাতাসে সমুদ্রের সমতলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ-স্ফুরণের জন্যে এক সেন্টিমিটারের ব্যবধানে ৩০,০০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রয়োজন। জলীয় বাষ্প সমন্বিত বাতাসে সমুদ্র থেকে উচ্চতর ক্ষেত্রে এবং জলকণা বা তুষারকণার অবস্থিতিতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। তবু মনে হয় যে, এক সেণ্টিমিটার ব্যবধানে অন্ততঃ ১০,০০০ ভোল্টের তফাৎ না থাকলে বজ্রপাত সম্ভব নয়।

শক্তিশালী আধান বায়ুর প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে প্রথমে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হয়। তারপর এই বাঁধা আর থাকে না বললেই চলে। বাতাতে তড়িৎ-মাত্রা যখন অত্যধিক হয়ে পড়ে তখন অকস্মাৎ বজ্রপাত সংঘটিত হয়। প্রথমে ইলেক্ট্রনের এক অদৃশ্য বর্শা যেন পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই শক্তি নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই প্রায় দেড়শত ফুট স্থান জুড়ে এক তড়িৎ-সঞ্চারী পথ তৈরী হয়। এর পর আর এক বর্শার দরুণ আরও দেড়শত ফুট পথ প্রস্তুত হয়। এরূপে ইলেক্ট্রনের এক তীব্র স্রোত অবশেষে এক বিরাট ঝঞ্ঝার রূপ গ্রহণ করে।

মেঘ থেকে মাটি পর্যন্ত এই অদৃশ্য পথ প্রস্তুত হতে মাত্র এক সেকেণ্ডের এক শতাংশ সময়ের দরকার। কখনও কখনও এই ইলেক্ট্রনের স্রোত মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কখনও আবার মাটির খুব কাছাকাছি এসে থমকে যায়—তখনই হয় বজ্রপাত।

পৃথিবী থেকে লাফিয়ে ধনাত্মক কণাসমূহ ঐ তড়িৎ-সঞ্চারী পথ ধরে মেঘস্থিত ঋণাত্মক কণাগুলির সঙ্গে মিলিত হতে চায়। এরূপ লাফিয়ে যে মিলন ঘটে তাকে বলা হয় ফিরতি আঘাত, সাধারণ ভাবে বজ্রপাত। বজ্রপাত আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে—এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেখবার ভুলে। ফিরতি আঘাতের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল। যখন বিদ্যুৎ চম্‌কায় তখন তাপমাত্রা ১০,০০০° থেকে ১৮,০০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠতে পারে। এই তাপমাত্রা সূর্যের বহির্ভাগের তাপমাত্রা অপেক্ষা (প্রায় ৬,০০০° সেণ্টিগ্রেড) অনেক বেশী।

প্রথম ফিরতি আঘাতের পিছনে আসে দ্বিতীয় আঘাত, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ…প্রভৃতি আঘাতগুলি পর পর আসতে থাকে। একটি বজ্রপাতে সাধারণতঃ ৬টি বা ৭টি ফিরতি আঘাত থাকে। সবচেয়ে বেশী ফিরতি আঘাত দেখা গেছে ৪৭টি।

আরম্ভ থেকে শেষ অবধি পুরা একটা বজ্রপাত ১/৫০০ সেকেণ্ড থেকে ১·৬ সেকেণ্ডের মত স্থায়ী হয়। এই স্থায়িত্বকাল ফিরতি আঘাতের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। ফিরতি আঘাত যত বেশী হবে, বজ্রপাতের স্থায়িত্বও হবে তত বেশী।

প্রতি মুহূর্তে সারা দুনিয়ায় দুই থেকে ছয় হাজারের মত বিদ্যুৎ-ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এর দরুণ প্রতি মুহূর্তে যে বজ্রপাত হচ্ছে, তার সংখ্যা হবে এক শত থেকে তিন শতের মত। মেঘ থেকে মেঘান্তরে বজ্রপাতের সংখ্যা যত, মাটি থেকে মেঘে সে সংখ্যা তার প্রায় অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশের মত।

পূর্বে বলা হয়েছে, বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যুৎ-ঝড়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসের অপরাহ্নে বিদ্যুৎ-ঝড়ের প্রকোপ তাই চরমে ওঠে। একই কারণে পৃথিবীর বিষুব অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ঘটে থাকে।

আলোর আকারভেদে বজ্রপাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়:—

১। সাঁড়াশী বজ্রপাত—সাধারণতঃ এই প্রকারের বিদ্যুৎ-ঝলক আমরা দেখে থাকি।

২। প্রচ্ছন্ন বজ্রপাত—সময় সময় বিদ্যুৎ-ঝলক দেখা যায় না, কিন্তু সারা আকাশ যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। নানা কারণে, যেমন—মেঘ বা পাহাড়ের অন্তরালে বজ্রপাত হলে দূরবর্তী বিদ্যুতালোক আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরে আসে না। সাধারণতঃ এ ধরণের বজ্রপাতের গর্জনও আমরা শুনতে পাই না।

৩। গোলক বজ্রপাত—বিদ্যুৎ-ঝড়ের সময় কখনও কখনও জ্বলন্ত গোলার মত বস্তু বাতাসে ভাসমান দেখা যায়। আকার অনেকটা সাধারণ ফুটবলের মত। বাড়ীর ভিতরেও এরূপ জ্বলন্ত গোলক দেখা গেছে। বজ্রপাতের পূর্বে প্রতি সেন্টিমিটারে ১০,০০০ ভোল্টের উপর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এত উচ্চ বিভবের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বাতাসের এক অংশ আয়নিত হয়ে গোলক বজ্রপাতের সৃষ্টি করে। এ-রকম বিদ্যুৎ-স্ফুরণে বিপদের সম্ভাবনা খুব কম।

বিদ্যুৎ-ঝড়ের ভিতর দিয়ে উড়ো-জাহাজকে প্রায়ই যেতে হয়। তখন আশেপাশের বিদ্যুৎ উড়ো-জাহাজের ধাতব আবরণের উপর জমা হয়, আর সূচালো জায়গা থেকে করোনা বা বৈদ্যুতিক আলোক দেখা যায়। এরূপ ঘটনাকে Precipitation static বা জমায়িত বিদ্যুৎ বলা হয়। তখন উড়ো-জাহাজের ভিতর থেকে বাইরের বেতার-সংবাদ গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ-জন্যে উড়ো-জাহাজের এরিয়েলে খোলা তামার তার ব্যবহার করা উচিত নয়—ঐ তামার তারের উপর একটা ইনসুলেটারের (যা বিদ্যুৎ-পরিবাহক নয়) আবরণ দেওয়া হয় এবং সম্ভব হলে এরিয়েলের আকৃতি গোলাকার করা হয়। তাছাড়া জমায়িত বিদ্যুৎ নষ্ট করে দেবার জন্যে বিভিন্ন রকমের 'ডিস্‌চার্জার'ও থাকে। ঐ ডিস্‌চার্জার এরিয়েলের নিকটে রাখা হয় না; কারণ এতে যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তা এরিয়েলে বেতার সংবাদ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে।

বজ্রপাতে উজ্জ্বল আলোকের সঙ্গে ভয়ানক শব্দও উৎপন্ন হয়। অঙ্কের হিসাবে এই আওয়াজের পরিমাপ হচ্ছে (গড়পড়তা) ১২০ ডেসিবেল। বজ্রপাতের সময় কোটি কোটি বিপরীত-ধর্মী তড়িৎকণার মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখন প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তাপমাত্রার পরিমাণ দশ থেকে আঠারো হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্তও উঠতে পারে। অথচ চারদিকের তাপমাত্রা তখন হয়তো মাত্র ৩০° সেন্টিগ্রেড। অকস্মাৎ অত্যুগ্র তাপ উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত তাপহ্রাসের দরুণ পারিপার্শ্বিক বায়ুর আয়তনে অতিদ্রুত প্রসারণ ও সঙ্কোচন ঘটে এবং তার ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। $\frac{1}{20}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার তরঙ্গ সংখ্যা হচ্ছে, সেকেণ্ডে ২০ সাইকল্। এই তরঙ্গ-সংখ্যার শব্দ সহজেই শুনা যায়। অবশ্য কোন কোন বজ্রগর্জনে শুধু মাত্র একটি তরঙ্গ-সংখ্যা থাকে না, বিভিন্ন সংখ্যার মিশ্রিত শব্দ থাকে। বজ্রগর্জনের গুরুগুরু আওয়াজের কারণ হচ্ছে, বজ্রপাতের আঁকাবাঁকা গতি এবং বিভিন্ন ফিরতি আঘাত। তাছাড়া প্রতিধ্বনি এবং আসবার পথে শব্দশক্তি হ্রাসের প্রভাবও রয়েছে।

বিদ্যুতের ঝলক দেখবার পরে বজ্রগর্জন শুনা যায়। আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়, আর বজ্রগর্জন শব্দের গতিতে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১১৩০ ফুট বেগে অগ্রসর হয়। আলোর গতি অতি দ্রুত বলে আসবার সময় লাগে না বললেই চলে; কিন্তু শব্দের পৌঁছবার সময় আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। বিদ্যুৎ-ঝলক দেখবার ৫ সেকেণ্ড পরে যদি বজ্রগর্জন শুনা যায় তবে শব্দের ভ্রমণ-পথ হচ্ছে ৫ × ১১৩০ ফুট অর্থাৎ ৫৬৫০ ফুট,—এক

মাইলের (৫২৮০ ফুট) সামান্য বেশী। অতএব আলো ও শব্দের সময়ের ব্যবধান ৫ সেকেণ্ড হলে আমরা বলতে পারি যে, বজ্রপাতের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। দশ মাইলের অধিক দূরবর্তী বজ্রপাতের শব্দ আমরা শুনতে পাই না। বায়ু খুব ভাল শব্দ-পরিবাহী না হবার দরুণ শব্দ দশ মাইলের ভিতর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

বজ্রপাত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভে প্রচুর সহায়তা করেছে বয়েজ ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে বজ্রপাতের বিবৃতি আঘাতের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। অতি উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুতের সাহায্যে পরীক্ষাগারে বজ্রপাত উৎপন্ন করে' তার প্রকৃতি নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণাগারে এক কোটি ভোল্টের সাহায্যে ৬০ ফুট দীর্ঘ বিদ্যুৎ ঝলক তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম বাংলার যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে। বজ্রপাত সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানা গেছে উড়ো-জাহাজের সাহায্যে। বজ্রমেঘের ভিতর বিমান প্রবেশ করে অনেক খবর আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গেছে, যে বায়ুর তাপমাত্রা সর্বাধিক তা সবচেয়ে বেশী উঁচুতে ওঠে।

বজ্রপাতের প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগানো খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। বজ্রপাত হচ্ছে এক বিশৃঙ্খল শক্তি—কোথায় এবং কখন এর উৎপত্তি হবে তা আমাদের জানা নেই। গাণিতিক হিসাবে হয়তো বজ্রপাতের সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান বের করা হলো। হয়তো বা যন্ত্রপাতি বসিয়ে ঐ স্থানে কয়েক বছর অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু বজ্র-পাতের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাছাড়া যে অর্থ ও সময় ব্যয় করে চেষ্টা করা হলো, তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও হয়তো বজ্রপাত থেকে প্রাপ্ত শক্তিতে লাভ করা গেল না। অতএব বজ্রপাতের শক্তি আহরণের চেয়ে বরং তার দরুণ ক্ষতি কি ভাবে হ্রাস করা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা হয়েছে অনেক বেশী।

বিদ্যুৎ-সরবরাহের প্রাথমিক যুগে রীতি ছিল, আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। আজকাল কিন্তু বজ্র-পাত গ্রাহ্য না করেই বিদ্যুৎ-সরবরাহ চালু রাখা হয়।

বজ্র-পরিবাহকের সাহায্যে বজ্রপাতের ক্ষতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বজ্র-পরিবাহক একটি ধাতু-নির্মিত দণ্ড। এর উপরিভাগে থাকে একটি সূক্ষ্মাগ্র তাম্র-নির্মিত অংশ, আর নীচের দিকটা লোহা বা তামায় তৈরী। এই অংশটা থাকে মাটির সঙ্গে যুক্ত। বজ্র-পরিবাহকের কাজ হচ্ছে, চারদিকের সব বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে মাটিতে পৌঁছে দেওয়া এবং এভাবে বাড়ী-ঘর এবং নিকটবর্তী অন্যান্য জিনিষকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করা। জাহাজে বজ্র-পরিবাহক মাস্তুলের মাথায় লাগানো হয়। টেলিফোন থামের মাথায় সূচালো লোহার বজ্র-পরিবাহক যোগ করা থাকে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সর্বপ্রথম বজ্রপাত থেকে গৃহাদি রক্ষার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘুড়ির সাহায্যে বজ্রমেঘ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিলেন। বজ্র-পরিবাহক তৈরীর ব্যাপারে ষ্টাইনমিৎসের কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বজ্রপাতের ক্ষতির হিসাব আমরা যতটা জানি, লাভের অঙ্ক সম্বন্ধে ততটা নয়। লাভও কিছু কম হয় না।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মাটির সঙ্গে যুক্ত করে উদ্ভিদ-উৎপাদনে সহায়তা করবার কাজে বজ্রপাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বজ্রপাত সংঘটিত হবার সময় অত্যধিক তাপের উদ্ভব হয়। সেই তাপে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিত হয়ে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হয়। নাইট্রো-জেন অক্সাইড আরও অক্সিজেন এবং জল গ্রহণ করে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেটে পরিণত হয়।

বৃষ্টির সঙ্গে এসব যৌগিক পদার্থ ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে বছরে ১০ কোটি টন নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ বজ্রপাতে তৈরী হয়। সারা তুনিয়ার সার তৈরীর কারখানার সমবেত উৎপাদনের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। বজ্রপাত ব্যতীত পৃথিবীতে উদ্ভিদ-জীবন অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনেরও অবসান ঘটবে।

প্রতিনিয়ত ধূলা, ধোঁয়া এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থে বায়ুর বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রতিদিন পৃথিবীর বাইরে থেকে ৫৪,০০০ মণ মহাজাগতিক ধূলা পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে। বজ্রপাতে ধূলা মাটিতে ফিরে আসে বলে বায়ুর বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের জীবনরক্ষায়ও তাই বজ্রপাতের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; কারণ আমাদের জীবনধারণে বিশুদ্ধ বায়ু অপরিহার্য। অতি দূরপাল্লার সংবাদ প্রেরণের নতুন উপায় উদ্ভাবনে বজ্রপাত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বজ্রপাতের সময় আয়নিত কণার দ্রুত সঞ্চরণের ফলে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনাকে বলে Static। বজ্রপাতে সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গের তুটি বিভিন্ন রূপ আছে:—

১। নিম্ন তরঙ্গ-সংখ্যার নাম হুইসিল। হুইসিল সম্বন্ধে কিছুকাল আগেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। সাম্প্রতিক কালে এ-বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। মনে করা যাক, গড়ের মাঠে মনুমেন্টের মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। ফলে এক তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে এবং এই তরঙ্গ-গোষ্ঠী আকাশে উঠে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির সুনির্দিষ্ট রেখাপথে ভ্রমণ করবে। তরঙ্গ-গোষ্ঠী মাটিতে ফিরে আসবার পূর্বে দশ হাজার মাইলেরও অধিক উচ্চতায় চলে যায়। পৃথিবীর চুম্বক রেখাপথ জানা থাকায় বলা সম্ভব, কোথায় ঐ তরঙ্গ-গোষ্ঠী অবতরণ করবে। এমনি এক হুইসিল উদ্ভূত হয়েছিল ওয়াশিংটন মনুমেন্টে। ঐ তরঙ্গ-গোষ্ঠী ফিরে আসে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের তৈরী হুইসিল একদিন সংবাদ প্রেরণে ব্যবহৃত হবে।

২। উচ্চ তরঙ্গ-সংখ্যার তরঙ্গের ফলে রেডিওতে কড়্ কড়্ শব্দ শুনা যায়। উচ্চ তরঙ্গ-সংখ্যার কড়্ কড়্ শব্দের সাহায্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিল। তিনটি পৃথক বেতার কেন্দ্র থেকে দিক-সন্ধানী বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে শত্রু-অঞ্চলে কোথায় বজ্রপাত হচ্ছে, তা ঐ কড় কড় শব্দের সাহায্যে বের করা সম্ভব হতো। তারপর ঐ বজ্রপাতের কেন্দ্র কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা লক্ষ্য করে আবহাওয়ার প্রকৃতি স্থির করা খুব কঠিন ছিল না।

পৃথিবীর অনেক উপকার করেও বজ্রপাত আমাদের নিকট ভীতিপ্রদ শক্তি হয়েই আছে। এই ভয় অহেতুক নয়। প্রতি বছর অনেক লোক বজ্রপাতে নিহত হচ্ছে। বজ্রপাতের আঘাত যেমন আকস্মিক, তেমনই অদ্ভুত—নিশ্চয় করে বলা কঠিন, কি ব্যাপার ঘটবে। একবার বজ্রপাতে এক ভেড়ার পালে যত কালো ভেড়া ছিল তাদের সবগুলিই মারা গেল। সাদা ভেড়াগুলির লোমও পোড়ে নি। বজ্রপাতে সময় সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ব্রেজিলের আকাশে উড়ন্ত এক বজ্রপাতের ফলে ২৫ জনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

বজ্রপাতের আঘাত এড়াবার জন্যে নীচের কয়েকটি কথা মনে রাখলে সুবিধা হবে—

১। ফাঁকা জায়গায় কোন গর্তের ভিতর ঢুকে পড়তে হবে। গর্ত না পেলে মাটিতে শুয়ে পড়লেও চলবে।

২। সামনে যদি বাড়ী থাকে তবে দেখে নিতে হবে, বাড়ীটা যেন একেবারে কাঠের না হয়। বাড়ীতে লোহার অংশ যত বেশী থাকবে, নিরাপত্তাও তত বেশী হবে।

৩। বজ্রপাতের সময় কখনও বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে নেই। গাছ হচ্ছে বজ্রপাতের নিশানা

এবং বিদ্যুৎ চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে গাছের কাছাকাছি কোন প্রাণী বা যে কোন বস্তুর ক্ষতি করতে পারে।

৪। বাড়ী (যদি লোহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে) এবং গাড়ীর ভিতর বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম; তবে জানালার কাছে না থাকাই ভাল।

৫। বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। অনিষ্ট কিছু হবার হলে রেডিও, হিটার প্রভৃতি চালু থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে—কোন ইতর বিশেষ হবে না। কারণ বজ্রপাতের তড়িৎ-শক্তি এত বেশী যে, ২২০ ভোল্ট তাতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। রেডিও-এরিয়েল বাইরে উঁচুতে টাঙানো থাকলে রেডিও সেটটি বন্ধ করে রাখাই ভাল, নতুবা রেডিও সেটটি বিকল হতে পারে।

মহাশূন্যের অভিযাত্রী

শ্রীঅভাস্রনাথ বসু

আঁধার রাতে নির্মল আকাশের দিকে তাকাইলে দেখা যায়—তারায় তারায় সারা আকাশ ছেয়ে আছে—যেন সারা আকাশ জুড়ে ফুলের রাশি ছড়িয়ে রয়েছে। আর ওই সব ফুলের রাশির মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছোট ছোট দু-একখানা সাদা মেঘের মত কি যেন দেখতে পাওয়া যায়! অনেক সময় মেঘ বলেই ভুল হয়। ওগুলি কিন্তু আসলে মেঘ নয়। ওর কতকগুলি হলো নীহারিকা, আর কতকগুলি হলো তারকারাশি—যেন দল বেঁধে আছে। তাছাড়া আরও দেখা যায়, লম্বা একটা একটানা সাদা মেঘ। একে কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং এটি ছায়াপথ নামে পরিচিত। আমাদের সৌরমণ্ডলও অন্যান্য নক্ষত্রের মত ছায়াপথের পরিবারভুক্ত।

নীহারিকাগুলি হাল্কা মেঘের মত মহাশূন্যে চক্রের মত আবর্তন করছে। কতকাল ধরে যে এই ঘূর্ণন চলছে তা হিসেব করে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরা ঘুরছে কিন্তু বেশ তাল ঠিক রেখে—একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে। এরা শুধু যে ঘুরেই চলেছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ টানছে ওকে, আর ও টানছে একে। এই টানাটানির ফলে এদের জায়গায় জায়গায় উঠছে বাষ্প বা গ্যাস ঘন হয়ে—আর যেই ঘন হওয়া, অমনি সৃষ্টি হচ্ছে ভীষণ তাপের। তাপের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে আলোর—আর সেই আলোতে ফুটে উঠছে আকাশের বুকে তারার মালা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় সবাই আকাশে তারার জন্মকথা এই ভাবেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এই সব নীহারিকাগুলি এল কোথা থেকে? এর জবাব এখনও কেউ ঠিক মত দিতে পারেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, অনন্ত মহাশূন্যে বিরাজমান অগুণতি মৌলিক তেজ-কণিকার সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় এই সব নীহারিকার দল। কিন্তু এই সব তেজ-কণিকাগুলিই বা এলো কোথা থেকে? এই তো চিরন্তন জিজ্ঞাসা। জানি না, মানুষ কোন দিন এ জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে কি না?

এসব নীহারিকার মত যে সব তারকাপুঞ্জকে দেখা যায় ওদের পাশে পাশে, কিন্তু নীহারিকার মত বাষ্পপূর্ণ নয়, সেগুলি হলো অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি। নক্ষত্রগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে কত

দূরে আছে, সে কথা আমরা ধারণায় আনতে পারি না। সবচেয়ে কাছের তারকাপুঞ্জের দূরত্ব হলো দশ লক্ষ আলোক-বছর। আলো প্রতি সেকেণ্ডে চলে ১,৮৬,৩২৬ মাইল বেগে। সেই হিসেবে এক বছরে আলোর গতি হয় ১৮৬,৩২৬ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল, অর্থাৎ মোটামুটি হিসেবে ৬ × ১০^{১২} মাইল। এখন এর সঙ্গে দশ লক্ষ গুণ করলে নিকটতম তারকাপুঞ্জের দূরত্ব বোঝা যাবে।

আর আকাশে একটানা মেঘের মত যে সাদা পথ দেখা যায়—তাকেই বলা হয় ছায়াপথ। এগুলি পরস্পরের কাছাকাছি অসংখ্য ছোট ছোট তারা আর গ্যাসীয় পিণ্ডের সমবায়ে গঠিত। এই ছায়াপথের অসংখ্য তারকার পরে বেশ খানিকটা ব্যবধান, তারপর আর একদল তারকাপুঞ্জ; আবার বেশ কিছুদূরে আর একদল। এই ভাবে বেশ কিছুদূর অন্তর অন্তর এক এক দল। এ যেন মহা-সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ। এ যে সংখ্যায় কত তার হিসেব এখনও পর্যন্ত ঠিক করা যায় নি। আর কি করেই বা ঠিক করা যাবে? দূরবর্তী তারকাপুঞ্জ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। সেগুলি এত দূরে রয়েছে যে, ওদের আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়তে এখনও কোটি কোটি বছর দেরী। হয়তো ওদের আলো এখানে আসতে আসতে আমাদের পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যাবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেও পারে।

বর্তমানে উইলসন পর্বতের ২০০" ইঞ্চির বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় দশ লক্ষ তারকাপুঞ্জের হিসেব করতে পেরেছেন এবং আরও কিছু অনুমান করতে সক্ষম হয়েছেন। খালি চোখে অ্যাণ্ড্রোমিডা নামে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে অস্পষ্ট মেঘের ভেলা দেখতে পাওয়া যায়, সেটাও এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি দ্বীপ। সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ওই রকম অনেকগুলি দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপগুলিকে স্প্রিং-এর কুণ্ডলীর আকারে দেখা যায়। নিকটতম দ্বীপটিকে যুগ্ম কুণ্ডলীর আকারে এমন সুন্দর দেখা যায় যে, একবার দেখলে সেই অপরূপ সৌন্দর্যের কথা চিরকাল মনে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অন্য কোন তারকাপুঞ্জ থেকে লক্ষ্য করলে আমাদের এই ছায়াপথকেও ঠিক ঐ রকম যুগ্ম কুণ্ডলীর আকারে দেখা যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সব তারকাপুঞ্জের যতটুকু পরিমাপ করতে পেরেছেন তাতে তাঁরা অনুমান করেন যে, এই সব তারকাপুঞ্জের মধ্যে আমাদের এই ছায়াপথ-শৃঙ্খলই সব চেয়ে বড়। শুধু বড় বললে ঠিক অনুমান করা শক্ত; এ যেন মহাসমুদ্রের ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের পাশে সুবৃহৎ এক মহাদেশ; আর এই মহাদেশই হলো আমাদের এই ছায়াপথ-শৃঙ্খল। তবে একথা জোর করে বলা কঠিন যে, কোনদিন এর চেয়ে বড় তারকাপুঞ্জ আমাদের নজরে পড়বে কি না?

যে সব তারকাপুঞ্জ খুব অস্পষ্ট নয়, তাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই ধারণা করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এদের গতিবিধিও অনেকটা ধরতে পেরেছেন। লাওয়েল মানমন্দির থেকে অধ্যাপক স্লিফার প্রথমে এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান দেন। তিনি তারকাপুঞ্জের আলো স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে লক্ষ্য করেন। তখন ওদের বর্ণালীর ভিতর দাগগুলির পরিবর্তন লক্ষ্য করে কয়েকটি তারকাপুঞ্জের আকার, গতি এবং দূরত্বের কিছুটা হিসেব করেন। বর্তমানে আরও বিশ্বাস-যোগ্য উপায়ে ওদের আকার, গতি এবং দূরত্বের হিসেব করা হয়। আজকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাছের তারকাপুঞ্জগুলির মধ্যে কিছু পৃথক তারাও দেখতে পেয়েছেন। সেগুলি আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়। এই সব তারকার মধ্যে কয়েকটাকে মাঝে মাঝে বেশ উজ্জ্বল দেখা যায়; আবার তারা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এদের স্পন্দন বা বাহ্যিক কারণেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা

যায়। আমাদের কাছাকাছি কয়েকটা তারকা ঠিক ওই রকম দেখা যায়। এদের বলে রূপ পরিবর্তনকারী সেফেইড (Cepheid variables)। এরা বড় অদ্ভুত তারকা। আকার অনুযায়ী এদের রূপ পরিবর্তনের সময় নির্দিষ্ট। এদেরই দূরত্ব এবং আকার লক্ষ্য করে তারকাপুঞ্জের অনেক তারকার হিসেব পাওয়া যায়। আকাশে এই জাতীয় একটি তারা যদি সূর্যের চেয়ে ১০০ গুণ বড় হয়ে এক দিনে ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তন করে, তবে সে হিসেবে তারকাপুঞ্জের ভিতর এক দিনে ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনকারী তারার পরিমাপও ঠিক ওই রকম হবে। এই ভাবে কেবল দু'চারটি কাছের তারকাপুঞ্জের হিসেব করা সম্ভব হয়েছে। কারণ দূরের গুলির মধ্যে মোটে তারাই দেখা যায় না—তার আবার হিসেব!

তারকাপুঞ্জের বর্ণালীর ভিতর দাগের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সঠিক হিসেব পাওয়া মুস্কিল। কারণ বহু রকম এবং বহু রঙের তারকার সমন্বয়ে একটি তারকাপুঞ্জ গঠিত। অতএব ওই সব তারার সমষ্টিগত রঙে যে বর্ণালীর সৃষ্টি হয় তাথেকে সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়। বর্ণালীর দাগের পরিবর্তন লক্ষ্য করে' কাছের তারকাপুঞ্জগুলির হিসেব কিছু কিছু পাওয়া গেলেও দূরের গুলির বিষয় কিছুই ধরা যায় না। অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই নির্ভরযোগ্য কিছু কিছু হিসেব পাওয়া সম্ভব। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের আলো স্পেক্ট্রোস্কোপে ফেলে রং বিশ্লেষণ করা হয়।

বিভিন্ন উপায়ে যখন তারকাপুঞ্জের দূরত্ব এবং গতি নির্ণয় করা হয়, তখন কয়েকটা বিশেষ ব্যাপার দেখা যায়। প্রথমত—এদের গতি সাধারণ তারার গতির চেয়ে ঢের বেশী। সাধারণ তারাগুলির গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৬ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে; কিন্তু তারকাপুঞ্জের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ থেকে ১৫,০০০ মাইল পর্যন্ত দেখা গেছে। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন যে, জেমিনি তারকাপুঞ্জের মধ্যে যে অস্পষ্ট মেঘের মত তারকাপুঞ্জ দেখা যায়, তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মাইল। মহাশূন্যের মধ্যে আল্‌ফা কণিকা অহরহ বিচরণ করছে এবং প্রতি মুহূর্তে অগুণতি তেজ-কণিকা আমাদের পৃথিবীর উপর এসে পড়ছে। এদের গতিও প্রায় ঐ রকমের। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে এই তারকাপুঞ্জের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি আলোক-বছর বলে স্থির করেছেন। দ্বিতীয়ত—দূরের তারকাপুঞ্জের গতি কাছের গুলির চেয়ে অনেক গুণ বেশী। সবচেয়ে কাছের তারকাপুঞ্জের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল, আর সবচেয়ে দূরের তারকাপুঞ্জ, এ-পর্যন্ত যার হিসেব করা সম্ভব হয়েছে, তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মাইল কিংবা আরও বেশী। তৃতীয়ত—সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কেবল মাত্র পাঁচটি বাদে সব তারকাপুঞ্জগুলি ক্রমশঃ আমাদের নিকট থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ পাঁচটিকেই বা সরে যেতে দেখা যায় না কেন? এ বিষয় অনেক মতবাদ আছে। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন—আমাদের সূর্য আমাদের ছায়াপথের মধ্যে কোন একটা তারাকে কেন্দ্র করে নিজ কক্ষে ঘুরছে। সূর্যের এই গতির জন্যে আপাতদৃষ্টিতে কাছের তারকাপুঞ্জগুলি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলেন, ওরা এগিয়েই আসছে। তাঁরা আইনষ্টাইনের মতবাদ লক্ষ্য করেই ওই কথা বলেন। আইনষ্টাইন অনাদি, অনন্ত (Infinitum) অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক জিনিষই সময় এবং পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে যেদিকে খুসী অসীমের দিকে যাক না কেন, আবার তাকে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে হবে। এই হিসেবে তাঁরা বলেন যে, ওই পাঁচটি তারকাপুঞ্জ বোধ হয় অসীমের দিকে পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসছে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের ছায়াপথ-শৃঙ্খলও তো একটা তারকাপুঞ্জ—এটাও নিশ্চয়ই

অন্যগুলির মত একদিকে ছুটে চলেছে। অন্য কোন তারকাপুঞ্জের গতি যদি আমাদের ছায়াপথের গতির চেয়ে কম হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই তারকা-পুঞ্জকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে। যেমন, দু-খানা রেলগাড়ী একই দিকে ছুটে চলেছে এবং সামনের গাড়ীর গতি যদি পিছনের গাড়ী থেকে কম হয়, তবে পিছনের গাড়ীর যাত্রীরা দেখবে, সামনের গাড়ীটা যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এই পাঁচটিকে নিয়েই যত ঝামেলা; অন্যগুলি তো বেশ সরেই যাচ্ছে।

কিন্তু এইখানেই তো এক কঠিন প্রশ্ন—কেন এরা দূরে সরে যাচ্ছে? যত দূরে যায়, তারা ততই যেন আরও জোরে আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে চায়। মাধ্যাকর্ষণ বা মহাজাগতিক আকর্ষণে ওদের তো আরও কাছে আসা উচিত; কিন্তু তা তো আসে না! এই ব্যাপার লক্ষ্য করে আইনষ্টাইন বলেছেন যে, মহা-জাগতিক আকর্ষণের মত প্রত্যেক জিনিষেরই মহাজাগতিক বিকর্ষণও আছে। দুটি জিনিষের মধ্যে আকর্ষণের একটা দূরত্ব আছে, তার বাইরে গেলেই আরম্ভ হয় বিকর্ষণের পালা। আর যত দূরে যেতে থাকে ততই বিকর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই ক্রম-বর্ধমান গতির জন্যে অনেকে ত্বরণের (Acceleration) কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্তু অন্য কোন আকর্ষণ ব্যতীত ত্বরণের আবির্ভাব কি করে হয়, তার ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। অনেকে এই কারণে অনন্তের কোন অজানা আকর্ষণের কথাও চিন্তা করেছেন। গতি একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। দু'খানা রেলগাড়ী যদি পাশাপাশি একই দিকে একই গতিতে চলে, তবে উভয় গাড়ীর যাত্রীই অন্য কোন দিক লক্ষ্য না করলে রেলগাড়ী দু'খানার গতি বুঝতে পারবে না। তারা দেখবে—দু'খানা গাড়ীই এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে। অতএব এই সব তারকাপুঞ্জের গতি সমান নয় বলে তাদের গতি বুঝতে পারা যায়। এখানে একটা প্রশ্ন আসে—ঐ তারকাপুঞ্জগুলি কার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সব তারকাপুঞ্জগুলিকে নিয়ে একটা গোলকের আকার কল্পনা করেছেন। কিন্তু কোথায় এর কেন্দ্র, তার কোন সঠিক হিসেব দিতে পারেন নি। আমাদের এই ছায়াপথ কি এদের কেন্দ্র—তাও সঠিক বলতে পারেন না। তবে তাঁরা বলেন যে, যাদের গতি কম তাদের থেকেই এই গতি আপেক্ষিক। একখানি রেলগাড়ীর গতি যদি ঘণ্টায় ৩০ মাইল হয় এবং আর একখানি গাড়ীর গতি যদি ঘণ্টায় ৫০ মাইল হয়, তবে উভয় গাড়ী একই দিকে রওনা হলে প্রথম খানির যাত্রী দ্বিতীয় গাড়ীখানির গতি ঘণ্টায় ২০ মাইল অনুভব করতে পারে। এই ভাবেই বিভিন্ন গতিসম্পন্ন তারকাপুঞ্জগুলির গতি ঠিক করা হয়। কোন কোন সময় আবার কোন বস্তুর গতি ঠিক করতে অপর একটি বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়। যেমন, দুখানি রেলগাড়ীর যাত্রীরা পাশের গাছগুলির দিকে লক্ষ্য করলে গাড়ী দু'খানির গতি বুঝতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রথমে সব তারকাপুঞ্জই ছিল আকর্ষণের আওতার মধ্যে। কিন্তু কোন একদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে এ ওর কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের এই গোলককে বিজ্ঞানীরা মনে করেন একটা বেলুনের মত। আর এই বেলুনটাকে কে যেন ফুঁ দিয়ে বড় করে দিচ্ছে। অবশ্য বেলুনের মত এর উপরে কোন আবরণ আছে কি না—তা কেউই বলতে পারেন না।

যেখান থেকে তারকাপুঞ্জগুলি সরে যেতে সুরু করে, অর্থাৎ যেখানে তারকাপুঞ্জগুলি দাঁড়িয়ে ছিল আকর্ষণের শেষ ধাপে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার একটা হিসেব ঠিক করেছেন। তাঁরা বলেন যে, তখনকার গোলকের ব্যাসার্ধ ছিল প্রায় একশ ছয় কোটি আলোক-বর্ষ। এই ব্যাপারটা কি

কেবল মাত্র অনুমান? কারণ কোথায় আকর্ষণের শেষ ধাপ, আর কোথায় গোলকের কেন্দ্র তার ঠিক নেই, তবে তার ব্যাসার্ধ ঠিক হবে কেমন করে? কিছুটা অবশ্য অনুমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, কয়েকটি তারকাপুঞ্জ এগিয়ে আসছে, আর তাদের কিছু পিছনে অন্য তারকাপুঞ্জগুলি যাচ্ছে পিছিয়ে—এই দুই অবস্থার মাঝামাঝিকেই তাঁরা আকর্ষণের শেষ ধাপ ঠিক করে নিয়েছেন। এরপর একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত দূরত্ব হিসেব করে তার অর্ধেক দূরত্বকে ঠিক করেছেন প্রথম অবস্থার ব্যাসার্ধ। এখানে আর একটা প্রশ্ন আসে—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি করে ঠিক করলেন যে, সব তারকাপুঞ্জগুলি মিলে একটা গোলকের সৃষ্টি করেছে? এটা অবশ্য খুবই গোলমালের ব্যাপার। কারণ আধুনিক কয়েকটি মতবাদের উপর নির্ভর করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আইনষ্টাইন স্থির করেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই বাঁকা। আমরা যদি কোথাও কোন সরল রেখা টানি, আপাতদৃষ্টিতে তাকে সরল বলে মনে হলেও আসলে তা বাঁকা। এমন কি—আমাদের দৃষ্টি, আলোকরশ্মি সবই চলে বাঁকা পথে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে, দূরতম একটি তারকাপুঞ্জ থেকে অপর একটি দূরতম তারকাপুঞ্জ পর্যন্ত একটা কাল্পনিক রেখা টানলে তা হবে বাঁকা। এই ভাবেই সবগুলি দূরতম তারকা-পুঞ্জের সঙ্গে কাল্পনিক রেখা টানলে নিশ্চয়ই একটা গোলকের সৃষ্টি হবে। এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকাপুঞ্জের গতি লক্ষ্য করে সম্প্রতি হিসেব করেছেন যে, প্রায় একশ' তিরিশ কোটি বছর অন্তর ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যাবে দ্বিগুণ হয়ে। এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ড বড় হতে হতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে? হয়তো সবই একদিন কোন অনাদি অনন্তে যাবে বিলীন হয়ে—আর বিরাজ করবে আদি অন্তহীন মহাশূন্য।

হাইড্রোজেনই মৌলিক পদার্থ

শ্রীসুবিমল কুণ্ডু

মৌলিক পদার্থ বলতে এমন জিনিষ বুঝায়, যাকে বিশ্লেষণ করলে তা থেকে অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বতঃবিকিরণ নামে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে পেরেছি, যার ফলে মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের পুরাতন ধারণা পরিবর্তন করতে হয়েছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পিয়ের কুরী ও ম্যাডাম কুরী পীচব্লেণ্ড নামক পদার্থ থেকে রেডিয়াম নামক একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই পদার্থের বিশেষত্ব এই যে, জিনিষটা স্বতঃই আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। এই বিকিরিত রশ্মির মধ্যে আল্‌ফা, বিটা ও গামা—এই তিন রকমের রশ্মি পাওয়া যায়। বর্তমানে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ থেকে উক্ত তিন শ্রেণীর রশ্মি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যাহোক, আল্‌ফা কণার ভর ৪ এবং এর দুই একক ধনাত্মক তড়িতাবেশ আছে। সংক্ষেপে আল্‌ফা কণা দুটি ইলেকট্রন হারিয়ে-যাওয়া হিলিয়ামের পরমাণু। দেখা যায়, স্বতঃবিকিরণকারী রেডিয়াম একটি আল্‌ফা কণা ছেড়ে দিয়ে র‍্যাডন গ্যাসে পরিণত হয়।

রেডিয়াম (২২৬)→আল্‌ফা (৪)+র‍্যাডন গ্যাস (২২২)…(১)

রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা স্বতঃবিকিরণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন সংক্ষেপে এই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রাদারফোর্ডই সংঘর্ষ ঘটিয়ে সর্বপ্রথম মৌলিক পদার্থকে অপর মৌলিক পদার্থে পরিণত করতে সক্ষম হন এবং নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে হাইড্রোজেন পরমাণু বের করেন। বর্তমানে জানা গেছে, নাইট্রোজেন পরমাণু আল্‌ফা কণার সাহায্যে ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত হয়।

নাইট্রোজেন (১৪)+আল্‌ফা (৪)—অক্সিজেন (১৭)+হাইড্রোজেন (১)………(২)। আবার নাইট্রোজেনকে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন দিয়ে ভাঙলে কার্বন ও হিলিয়াম পাওয়া যেতে পারে।

নাইট্রোজেন (১৪)+হাইড্রোজেন (১)—কার্বন (১১)+হিলিয়াম (৪)…(৩)। নিম্নে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থের সমীকরণ দেওয়া গেল :—

(ক) লিথিয়াম (৭)+হাইড্রোজেন (১)→
হিলিয়াম (৪)+হিলিয়াম (৪) ·· (৪)

(খ) বোরন (১১)+হাইড্রোজেন (১)→
৩ হিলিয়াম (৪) ·· (৫)

(গ) বোরন (১০)+হাইড্রোজেন (১)→
কার্বন (১১)+বিকিরণ··· (৬)

(ঘ) ডয়টেরন (২)+ডয়টেরন (২)→
ট্রাইটিয়াম (৩)+প্রোটন (১)+বিকিরণ···(৭)

(ঙ) ডয়টেরন (২)+ডয়টেরন (২)→
হিলিয়াম (৩)+নিউট্রন (১)+বিকিরণ···(৮)

(চ) ট্রাইটিয়াম (৩)+ডয়টেরন (২)→
হিলিয়াম (৪)+নিউট্রন (১)+বিকিরণ (৯)

(ছ) আয়রন (৫৬)+নিউট্রন (১)→
ম্যাঙ্গানিজ (৫৬)+হাইড্রোজেন (১) ·· (১০)

(জ) কার্বন (১৩)+হাইড্রোজেন (১)→
নাইট্রোজেন (১৪)+বিকিরণ... (১১)

বর্তমানে আল্‌ফা কণার সাহায্যে বহু মৌলিক পদার্থ, যেমন—বোরন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, নিয়ন, সোডিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফস্‌ফরাস প্রভৃতিকে অপর মৌলিক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। এদিকে আবার প্যাটার্সন ও কার্স দাবী করেন যে, তাঁরা প্রায় সব কয়টি মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের কথা কেউ কেউ স্বীকার করেন না। তবে এ-বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই একমত যে, আল্‌ফা কণার সাহায্যে মৌলিক পদার্থকে বিচূর্ণিত করলে তা থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত হয়। যেহেতু বিচূর্ণিত করলে কোন পদার্থ থেকে হাইড্রোজেনের পরমাণু পাওয়া যায়, সেহেতু বুঝা যায় যে, ঐ মৌলিক পদার্থে হাইড্রোজেন ছিল অথবা হাইড্রোজেন সৃষ্টি হওয়ার মত কিছু ছিল। সুতরাং হাইড্রোজেনকেই একমাত্র মৌলিক পদার্থ বলা যেতে পারে।

এখন পূর্বের সমীকরণগুলিতে ফিরে যাওয়া যাক। সমীকরণ (৩), (৪) এবং (৫) থেকে বোঝা যায় যে, বেশী ভরের মৌলিক পদার্থকে কম ভরের মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যায়। তাছাড়া বেশী ভরের ইউরেনিয়াম তাপ বিকিরণের ফলে কম ভরের সীসায় পরিণত হয়। আবার (২), (৬), (৭), (৮), (৯) এবং (১১) নং সমীকরণ থেকে জানা যায় যে, কম ভরের মৌলিক পদার্থকে বেশী ভরের 'মৌলিক পদার্থে' পরিণত করা যায়। কিন্তু আজও হাইড্রোজেনকে ভেঙে কম ভরের মৌলিক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হয় নি এবং কোনদিন হবে বলেও আশা করা যায় না। কাজেই এ-কথা বলা যেতে পারে যে, হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌলিক পদার্থ, যাকে ভেঙে তার চেয়ে কম ভরের মৌলিক পদার্থ পাওয়া সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সূর্যের মধ্যে অবিরত হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে এবং তার ফলেই আমরা আলোক ও তাপ পেয়ে থাকি; অর্থাৎ সৌরশক্তির উৎস হলো হাইড্রোজেন। যেহেতু পৃথিবী সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবীতে হাইড্রোজেন গ্যাসই ছিল বেশী। বেশী বলবার কারণ এই যে, তখন কতকগুলি হাইড্রোজেনের পরমাণু হিলিয়াম প্রভৃতি বেশী ভরের গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এই দিক থেকেও হাইড্রোজেনকেই একমাত্র মৌলিক পদার্থ বলা যেতে পারে।

আবার যদি শক্তি হিসাবে বিচার করতে হয়, তা হলেও হাইড্রোজেনের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয় না; কারণ বাস্তব জগতে সব রকম শক্তির মূল উৎস হলো দুটি—সূর্য এবং মহাকর্ষ। আবার সূর্যের শক্তির উৎস হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং পৃথিবীও সূর্য থেকে উৎপন্ন। সুতরাং পার্থিব জগতে সকল শক্তিরই উৎস হাইড্রোজেন। তাছাড়া সূর্য থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি না হলে মহাকর্ষের জন্যে শক্তির কথা চিন্তা করা যেত না। প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কি শুধু হাইড্রোজেন থেকেই শক্তি পেয়ে থাকি? নিশ্চয়ই না; হাইড্রোজেন ছাড়াও যাবতীয় মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ থেকেই আমরা শক্তি পেয়ে থাকি। কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থ (যাদের আমরা বর্তমানে মৌলিক পদার্থ বলি) হাইড্রোজেনেরই রূপান্তর মাত্র। তাপ, চাপ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে তাদের পরিবর্তন ঘটেছে।

সবশেষে বলতে হয়, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাউট যা বলে গেছেন, অর্থাৎ সব মৌলিক পদার্থের ওজন হাইড্রোজেনেরই গুণিতক মাত্র—তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হয়। কিন্তু বর্তমানে ভর এবং শক্তির অভিন্নতার কথা চিন্তা করে প্রাউটের সিদ্ধান্তকে ভুল বলা যায় না। সুতরাং মনে হয়—হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌলিক পদার্থ এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনেরই রূপান্তর মাত্র। সেগুলি বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তথাকথিত অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা
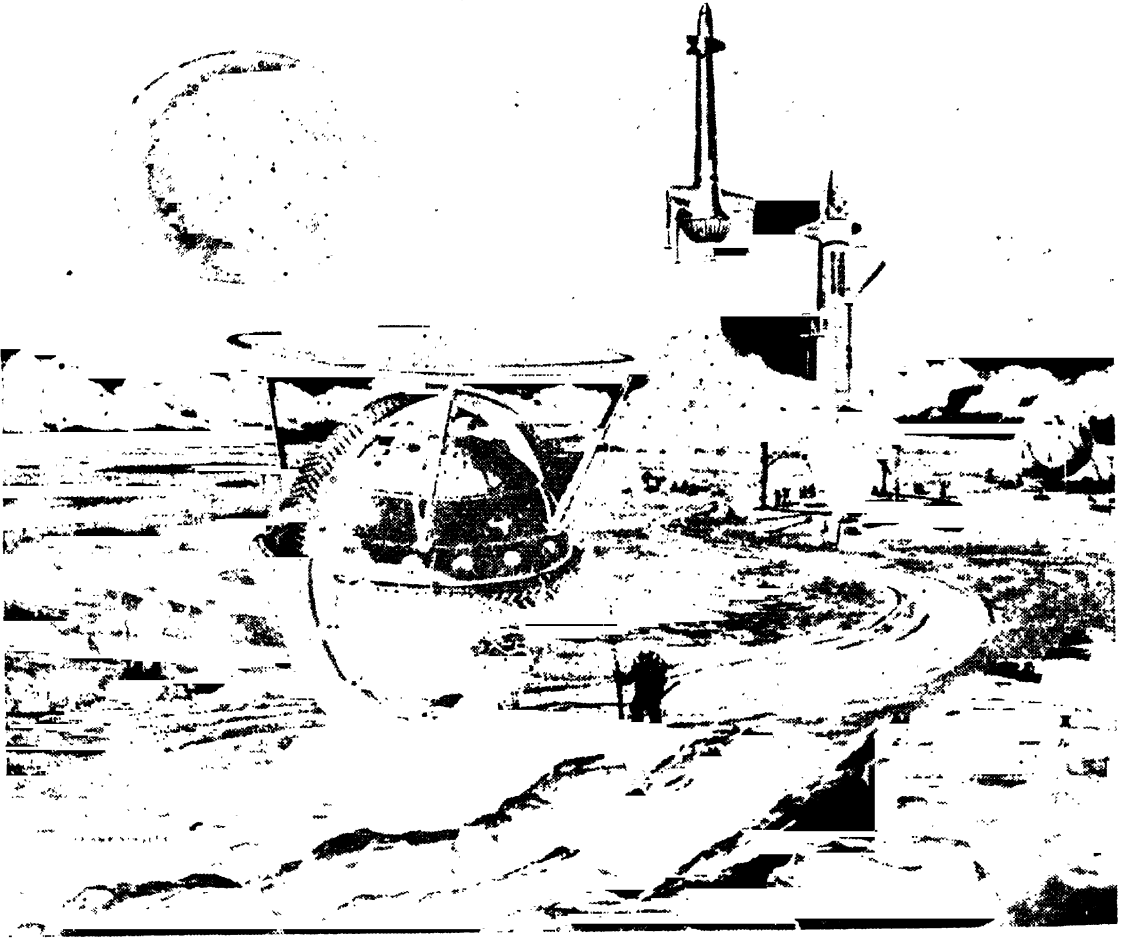
ভবিষ্যতের মহাশূন্য-যান সূর্যরশ্মির দ্বারা পরিচালিত হইবে।

মধ্যস্থলে 'ইউনিসাইকল্' নামক ভবিষ্যৎ মহাশূন্য-যানের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণের কল্পিত দৃশ্য। গোলাকার ইউনিসাইকল্-এর পিছনে দুইটি সরবরাহ রকেট এবং তার পিছনের আকাশে পৃথিবীকে চন্দ্রের মত দেখা যাইতেছে।

গণিতে ধাঁধা

ধাঁধা কি? কোন একটা সিদ্ধান্ত—যাকে আমরা সত্য বলে জানি, তাকে যদি কেউ কোন কৌশলে এমনভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয় যে, আমরা তার যুক্তিটা চট্ করে অস্বীকার করতে পারি না, অথচ বুঝতে পারি—এর মধ্যে কোথাও একটা গলদ আছে, যেটা সহজে ধরা যাচ্ছে না—এমন জিনিষকে ধাঁধা বলে। ধাঁধা অবশ্য ধাঁধাই—সত্য নয়, উপযুক্ত যুক্তি প্রয়োগ করতে পারলে এর কুযুক্তির জাল কেটে দেওয়া যায়। গণিতেও এমন অনেক ধাঁধা আছে, যেগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

আমরা কথায় বলি—যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন। ব্যবহারিক জীবনে এটা অনেক সময় মেনেও নিই। কিন্তু আমরা সবাই জানি, বিশুদ্ধ গণিতের বিচারে বাহান্ন কখনো তিপান্ন হয় না। তা যদি হতো, তবে গণিতের জগতে এক মহা অনাসৃষ্টি ঘটতো এবং গণিতের প্রাসাদটা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তো। এখন লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে বাহান্নকে তিপান্ন-এর সমান বলে প্রমাণ করি—

$ক=ক$, $\therefore ক^{২}=ক^{২}$ $\therefore ক^{২}-ক^{২}=০$, $\therefore (ক+ক)\ (ক-ক)=০$। এখন উভয় পক্ষকে $(ক-ক)$ দ্বারা ভাগ করে পাই, $ক+ক=০$, $\therefore ২ক=০$, $\therefore ক=০$। আমরা জানি ক-এর মান যা কিছু হতে পারে; কাজেই ধরা যাক $ক=৫২$, $\therefore ৫২=০$। আবার ধরা যাক $ক=৫৩$, $\therefore ৫৩=০$, $\therefore ৫২=৫৩=০$। অবাক কাণ্ড! এখানে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, যে কোন সংখ্যা অন্য যে কোন সংখ্যার সমান, আবার সব সংখ্যার মান শূন্য। তাহলে পৃথিবীতে শূন্য ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা নেই! কিন্তু আমরা জানি, গণিতের রাজ্যে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটতেই পারে না। অথচ উপরে যা প্রমাণ করেছি, গণিতের প্রক্রিয়া ধরেই করা হয়েছে। তাহলে গলদটা কোথায়? তোমরাই তা বের কর। পারলে না তো? আচ্ছা দেখ—যেখানে আমি উভয় পক্ষকে $(ক-ক)$ দ্বারা ভাগ করেছি, সেখানে ভাগ করাটা অন্যায় হয়েছে। তোমরা বলবে কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, কোন সংখ্যাকে শূন্য (০) দিয়ে ভাগ করা চলে না। $(ক-ক)=০$; সুতরাং $(ক-ক)$ দিয়ে ভাগ করতে গিয়েই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তোমরা জানলে—কোন সংখ্যাকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে তখনই ভাগ করা যায়, যখন দ্বিতীয় সংখ্যাটা 'শূন্য' না হয়।

এখন আর একটা ধাঁধা দেখ। মনে কর, একটা আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১৫০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ গজ; এর জন্যে ৪০০ গজ বেড়ার দরকার। এখন মনে কর, এর মধ্যে ৩০০টা ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। এবার একটা বর্গক্ষেত্র ধরা যাক, যার প্রত্যেক বাহু ১০০ গজ। এর জন্যেও ৪০০ গজ বেড়ার দরকার। পূর্বের মত একই

রকম ব্যবধানে ফুলের চারা লাগালে এর মধ্যে ক'টা চারা লাগানো যাবে? নিশ্চয়ই ৩০০টা; কারণ এখানেও ৪০০ গজ বেড়া রয়েছে! না, তা হবে না, এখানে ৪০০টা চারা লাগানো যাবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে গাছ পুঁতে দেখ। অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতে হবে? তাহলে দেখ—প্রথম আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১৫০×৫০ বা ৭৫০০ বর্গগজ। দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১০০×১০০ বা ১০০০০ বর্গগজ। ৭৫০০ বর্গগজ স্থানে ৩০০টা চারা লাগানো হলে, একই হারে ১০০০০ বর্গগজ স্থানে ৪০০টা চারা লাগানো যায় না কি? এবার গণ্ডগোলটা তোমরা নিশ্চয় ধরে ফেলেছ। গাছ লাগানো হচ্ছে দৈর্ঘ্য ধরে নয়—ক্ষেত্র ধরে; যার একক গজ নয়, বর্গগজ। সুতরাং কতটা জায়গায় বেড়া দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সীমানাটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, দেখতে হবে ক্ষেত্রফলটা কত। এখন কেউ যদি তার একটা বর্গাকার জায়গা তোমার একটা সমান সীমানাযুক্ত আয়তাকার জায়গার সঙ্গে বদল করতে আসে, তুমি তা লুফে নেবে—কেমন কিনা? কিন্তু তার বোকামির কথাটা প্রকাশ করে দিও না যেন!

এবার একটা ঐতিহাসিক ধাঁধার কথা বলবো। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক জেনো এই ধাঁধাটি সৃষ্টি করে গ্রীক গণিতবিদ্‌দের মহা মুস্কিলে ফেলেছিলেন। তাঁরা বহুরকম যুক্তি প্রয়োগ করেও এর কোন সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পান নি। এখন ধাঁধাটা দেখা যাক।

একিলিস একটা কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ে নেমেছেন। তিনি কচ্ছপের দশগুণ বেগে দৌড়াতে পারেন। কচ্ছপটাকে ১০০ গজ এগিয়ে দেওয়া হলো। এখন একিলিস ১০০ গজ দৌড়ে যেখানে কচ্ছপটা ছিল সেখানে পৌঁছলো। ইতিমধ্যে কচ্ছপ ১০ গজ এগিয়ে গেছে; সুতরাং এখন কচ্ছপ একিলিসের ১০ গজ সামনে আছে। একিলিস যখন এই ১০ গজ দৌড়লো, কচ্ছপ তখন একিলিসের ১ গজ সামনে। একিলিস এই এক গজ দৌড়ালে কচ্ছপ তার $\frac{১}{১০}$ গজ সামনে থাকবে। এমন করে একিলিস যতই দৌড়ান না কেন, কচ্ছপ বরাবরই তার কিছুটা সামনে থাকবে, সে দূরত্বটা যতই সামান্য হোক না কেন। তাহলে প্রমাণ হলো যে, একিলিস কচ্ছপকে কখনও ধরতে পারবে না। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নয় কি? বিখ্যাত গ্রীক বীর একিলিস একটা কচ্ছপের কাছে দৌড়ে পরাজিত হয়ে যাচ্ছে, তাও আবার ঈশপের খরগোসের মত না ঘুমিয়ে! এর মধ্যে গলদটা কোথায় বের কর দেখি।

অঙ্কটা যদি তোমাদের করতে দেওয়া হয় তবে এক মিনিটের মধ্যে করে ফেলবে। তোমরা অঙ্কটা কর কি ভাবে—কচ্ছপ একিলিসের ১০০ গজ সামনে আছে; এখন ধরা যাক, একিলিস এক সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়ায়, তাহলে কচ্ছপ এক সেকেণ্ডে ১০ গজ দৌড়ায়। একিলিস কচ্ছপকে ১ সেকেণ্ডে ৯০ গজ হারিয়ে দিতে পারে; অতএব ১০০ গজ হারিয়ে দিতে সময় লাগবে $\frac{১০}{৯}$ বা ১$\frac{১}{৯}$ সেকেণ্ড। তা হলে দেখতে পাচ্ছ, একিলিস

কচ্ছপকে অল্প সময়েই হারিয়ে দিচ্ছে। অথচ উপরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একিলিস কচ্ছপকে কখনও হারাতে পারবে না। এর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? দ্বিতীয়টা নিশ্চয়, কিন্তু কেন?

গণ্ডগোলটা কোথায় জান? একিলিস ও কচ্ছপের মধ্যে এই যে দূরত্বটা ক্রমশঃ কমে আসছে, এর কি শেষ নেই—এটা কি অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে? এই প্রশ্নটা গ্রীকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এরূপ একটা অনন্ত শ্রেণীর কখনও শেষ হবে না, তাই একিলিস কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তারা ঠিকই জানতো যে, একিলিস হেলায় কচ্ছপকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা এখন জানি, এরূপ শ্রেণীর একটা বাস্তব শেষ আছে। উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ভগ্নাংশটা কমতে কমতে অবশেষে তার মান এত কম হয়ে যাবে যে, তার মান শূন্য ধরা যাবে এবং তখনই কচ্ছপকে একিলিস পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। এখন সময়ের প্রশ্নে এলে দেখা যায় যে, $\frac{১}{৯}$ সেকেণ্ড বলে যে সময়টা তার অর্থ কি? একে দশমিকে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ·১̇ সেকেণ্ড। এরূপ দশমিককে আমরা বলি আবৃত্ত দশমিক, এর নামতঃ শেষ না থাকলেও বাস্তবে শেষ আছে এবং এর মান সীমাবদ্ধ। এটা ·১১ থেকে বড়, কিন্তু ·১২ থেকে ছোট; একে আরও ছোট সীমার মধ্যে আনা যায়। ভগ্নাংশের দিক থেকে একে আরও বাস্তব ভাবে বোঝা যায়; কারণ $\frac{১}{৯}$-এর অর্থ হচ্ছে, একটা জিনিষের নয় ভাগের এক ভাগ।

গ্রীকদের ভগ্নাংশ সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল; দশমিক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না, আবৃত্ত দশমিক তো দূরের কথা! অসীম শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা তাদের কোন কালেই হয় নি। তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে, প্রাচীন হিন্দুদের নিকট এরূপ কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নি। ভগ্নাংশ, দশমিক ও শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান একেবারে পাকা ছিল।

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

তিমি

তোমরা নিশ্চয়ই হাতী দেখেছ। হাতী হচ্ছে স্থলচরদের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রাণী। কি বিরাট, আর কি তার শক্তি! কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রাণী আছে। স্থলচর নয়, সে থাকে জলে। তোমাদের অধিকাংশই তাকে দেখ নি, সে হচ্ছে তিমি। তিমি প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আর ওজন? এই ৬০ ফুটের একটি তিমির ওজন প্রায় ৭০ টন। এত ভারী, কিন্তু বিশাল দেহের তুলনায় হাল্‌কা।

জলের উপরে ভেসে থাকতে পারে বেশ সহজে। ভেসে থাকবার জন্যে এদের কোনও কাজই করতে হয় না। তার কারণ, এদের দেহে প্রচুর চর্বি। শুধু তাই নয়, এদের হাড়গুলিও অজস্র ছিদ্রযুক্ত। সেই সব ছিদ্রের মধ্যে থাকে একরকমের তেল। তিমির সারা দেহ এক ইঞ্চি পুরু চামড়ায় ঢাকা। তার পরেই চর্বি, প্রায় পনেরো ইঞ্চি পুরু। ভেবে দেখ, কি বিরাট ব্যাপার! এক একটি তিমির শরীর থেকে প্রায় ৫০০ গ্যালন তেল পাওয়া যায়। এই তেলের জন্যেই এদের উপর মানুষের এত লোভ।

এই বিশাল দেহ নিয়ে তারা ঘণ্টায় চার মাইলের বেশী যেতে পারে না। কিন্তু যখন বিপদে পড়ে তখন তাদের গতিবেগ আশ্চর্য রকম বাড়িয়ে দেয়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। মাছের মত এদের ডিম হয় না। স্থলের স্তন্যপায়ীদের মত বাচ্চা হয়। মানুষের সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে। যেমন, এদের বক্ষ-সংলগ্ন ডানাগুলির সঙ্গে মানুষের হাতের হুবহু মিল। এরা ফুস্‌ফুস দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। মাথার উপরে এই জন্যে ছুটা গর্ত আছে। জলের উপর ভেসে এরা সেই গর্ত ছুটি দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়।

মাথাটা এদের দেহের তুলনায় বিরাট—দেহের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আর এদের মুখগহ্বরটিও তেমনি ভয়ঙ্কর। মুখ খুললে মনে হবে যেন একটি জাহাজের কেবিন। গণ্ডার, জলহস্তী প্রভৃতির অতি শক্তিশালী দাঁত আছে। সেই দাঁত দিয়ে তারা খাবার গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু জলের এই দৈত্যদের দাঁতের বদলে উপরের বিরাট চোয়ালে প্রায় ৫০০ হাড়ের প্লেট আছে। চোয়ালের ছু-পাশের ছুটি সবচেয়ে বড় প্লেটের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, গোড়াটা প্রায় ১২ থেকে ১৫ ইঞ্চি মোটা। প্লেটের ভিতরের দিকে আছে ঝালরের মত অজস্র লম্বা চুল। কিন্তু বাইরের দিকটা মসৃণ। এই সব প্লেটের নীচেই থাকে স্পঞ্জের মত নরম জিভ। জিভ্‌টা প্রায় ১০ ফুট চওড়া আর প্রায় ১৮ ফুট লম্বা। ভেবে দেখ, কি বিরাট এই মাংস পিণ্ডটি।

খাবার ধরে এরা এক আশ্চর্য উপায়ে। মুখ খুলে এরা জলের ভিতর দিয়ে ছুটে যায়। তখন মুখের মধ্যে অনেক ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণী ঢুকে পড়ে। তারপর মুখটি বন্ধ করে ভিতরের জল সব বের করে দেয় এবং ভিতরের প্রাণী-গুলিকে উদরস্থ করে। মাঝে মাঝে এরা জল থেকে লাফিয়ে উঠে জলের উপর আছড়ে পড়ে; এর ফলে জলের মধ্যে বিরাট ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ ছাড়াও ছোট-বড় অনেক প্রাণী এদের খুবই উত্যক্ত করে, আর অনেক সময় এমন নির্দয়ভাবে মেরে ফেলে যে, শুনলে তোমাদেরও ছুঃখ হবে।

তরোয়াল মাছ আর সামুদ্রিক শৃগালেরা দল বেঁধে এদের আক্রমণ করে। আক্রমণের কায়দাটাও কৌশল-পূর্ণ। যখনই তিমি শ্বাস নেবার জন্যে জলের উপর একটু ভেসে ওঠে তখনই এই শৃগালগুলি জল থেকে বেশ উঁচুতে লাফিয়ে উঠে বেশ জোরে

তিমির পিঠের উপর পড়ে লেজ দিয়ে সজোরে আঘাত করে। দূর থেকে সেই আঘাতের শব্দ ঠিক বন্দুকের শব্দের মত মনে হয়। আর তরোয়াল মাছগুলি আক্রমণ করে নীচের দিক থেকে। এদের লম্বা সুচালো তরোয়ালটি দিয়ে এরা দারুণ জোরে খোঁচা মারে। চারদিক ঘিরে এরা তিমির গায়ে এখানে-সেখানে ছিদ্র করে দেয়, আর সেই সব ছিদ্র দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। দারুণ যন্ত্রণায় তিমি বার বার লেজ দিয়ে ঝাপ্‌টা মারতে থাকে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

গ্রীনল্যাণ্ডের হাঙ্গরগুলি এদের প্রবল্ শত্রু। জীবন্ত অবস্থায় এদের টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেলে। যতক্ষণ উদর পূরণ না হয়, ততক্ষণ এরা বড় বড় মাংস খণ্ড ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

তিমির আর এক প্রবল শত্রু করাত মাছ। তিমি-শিকারীরা বলে, এদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র জীবনপণ যুদ্ধে লেগে যায়। করাত মাছই ক্রমাগত উন্মাদের মত আক্রমণ করতে থাকে।

তিমি তার একমাত্র অস্ত্র লেজটি দিয়ে ক্রমাগত ঝাপ্‌টা মারতে থাকে। অবশ্য ওর এক একটা ঝাপ্‌টায় টাল সামলাতেই করাত মাছের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। তবুও করাত মাছ আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তারা জলের উপর লাফিয়ে উঠে নীচের দিকে সোজাভাবে তিমির পিঠের উপর পড়ে। এর ফলে তিমির পিঠে করাত গেঁথে যায়। এই আঘাতে তিমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে থাকে। এমনি করে লড়াই চলতে থাকে। এক জনের প্রাণান্ত না হলে যুদ্ধ থামে না।

এসব বড় বড় শত্রু ছাড়া তিমিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিষাক্ত পোকা-মাকড়ও দারুণ যন্ত্রণা দেয়। এক অদ্ভুত ধরণের জল-পোকা হাজারে হাজারে এদের পিঠে লেগে থাকে এবং চামড়া কেটে পিঠে ঘা করে দেয়। গ্রীষ্মকালে এই পোকার সংখ্যা দারুণ বেড়ে যায়। তাই প্রায়ই তিমির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ে অনেক পাখীকে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। যখনই তিমি তার পিঠটা জলের উপরে তোলে, তখনই পাখীরা তার পিঠ থেকে পোকা তুলে খেয়ে নেয়। এদিক দিয়ে তিমির বেশ উপকারই করে ওরা; কিন্তু সেই কাঁচা ঘা-এর উপর পাখী যখন ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারে, তখন তিমির খুবই যন্ত্রণা হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধে মসৃণ পিঠওয়ালা একরকম তিমি আছে। তারা আয়তনে প্রায় গ্রীনল্যাণ্ডের তিমিরই মত। বসন্তকালে এরা দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, ভ্যান ডিয়েম্যানস ল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতির উপসাগরে এসে আশ্রয় নেয়

ক্যাচোলট নামে আর একরকমের তিমি, মসৃণ পিঠওয়ালা তিমির চেয়ে অনেক

বেশী মূল্যবান। এরা কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ডের তিমির চেয়েও বড় হয়। লম্বায় ৭৬ ফুট পর্যন্তও হতে দেখা যায়। তবে শুধু পুরুষেরাই এত বড় হয়। স্ত্রী-ক্যাচোলটগুলি ৩০-৩৫ ফুটের বেশী বড় হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকারের এত পার্থক্য অন্য কোনও স্তন্যপায়ীর ভিতর দেখা যায় না।

এদের লেজ ১৮ ফুট পর্যন্ত চওড়া হতে দেখা গেছে। বেশ সহজেই অতি দ্রুত-গতিতে ওরা লেজ চালনা করতে পারে। সময় সময় যখন জলের মধ্যে লেজের আঘাত করে তখন দারুণ শব্দ হয়। বেশ দূর থেকেও এই শব্দ শোনা যায়। যে ধরণের চর্বির জন্যে ক্যাচোলটের এত দাম, তা থাকে এদের মাথায়।

তিমিগুলি একা একা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু এই ক্যাচোলটরা অনেকে এক সঙ্গে দল বেঁধে থাকে। এক একটা দলে ২০ থেকে ৫০টা পর্যন্ত ক্যাচোলট থাকে। এদের মধ্যে অন্ততঃ একটি পুরুষ ক্যাচোলট থাকবেই। বাকীগুলি স্ত্রী ও তাদের কাচ্চা বাচ্চা। দলের কোনও বিপদে এই পুরুষই প্রথমে এগিয়ে যায়। কিন্তু এদের ভয় এত বেশী যে, একটা মাছের ঝাঁক এসে পড়লেও এরা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে।

এত বড় তিমিকে শিকার করা হয় কিন্তু আশ্চর্য উপায়ে। বোটের উপর থেকে শিকারীরা তিমি দেখতে পেলেই তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। বোটের সামনে বল্লম নিয়ে শিকারীরা প্রস্তুত থাকে এবং সুযোগ বুঝে বল্লম ছুঁড়ে মারে। পিঠে গেঁথে গেলেই তিমি বিদ্যুৎ গতিতে নীচের দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে খানিক পরেই আবার তাকে ভেসে উঠতে হয়। শিকারীরা তখন আবার এগিয়ে গিয়ে বল্লম ছোঁড়ে। প্রতিবারই ভেসে উঠলে ওদের পিঠে এমনি করে বল্লম গেঁথে দেওয়া হয়। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিমি জলে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাপ্টা মারতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে যায়। তবে যত সহজে বলা হলো, আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। শিকারের সময় আনুসঙ্গিক অনেক রকম বিপদও এসে পড়ে।

শ্রীমৃণালকান্তি পট্টনায়ক

জানবার কথা

১। ঝড়-বৃষ্টির সময় বজ্রপাতের ফলে অনেক লোক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত বা নিহত হয়। মোটর গাড়ী যদি ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে তবে তার আরোহীদের বজ্রপাতে আহত বা নিহত হবার আশঙ্কা খুব কমই থাকে। অবশ্য যতক্ষণ আরোহীরা গাড়ীতে থাকে, ততক্ষণই ভয় থাকে না। এর কারণ হচ্ছে—গাড়ীর উপর বাজ

১নং চিত্র

পড়লে তার কাঠামোর মধ্যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে এবং চাকা থেকে আর্ক সৃষ্টি করে মাটিতে প্রবাহিত হয়। মাটিতে চলে যাবার ফলে বিদ্যুৎ থেকে আর অনিষ্টের কারণ থাকে না।

২নং চিত্র

২। নিখুঁত ঘরকন্নার জন্যে বহুকাল ধরে নেদারল্যাণ্ডের মেয়েরা প্রসিদ্ধি লাভ

করেছে। তারা ঘরের সামনের পথও মেজে-ঘষে চক্‌চকে করে রাখে। তারা শুধু বাড়ীর ভিতরটাই মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে না, বাড়ীর বাইরের পথও যতটা সম্ভব সমানভাবে পরিষ্কার রাখে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বহু ডাচ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

৩। কাশ্মীর উপত্যকায় জমির পরিমাণ খুবই কম। সেই জন্যে সেখানকার কৃষকেরা ভাসমান বাগিচার সাহায্যে নিজেদের কৃষির কাজ চালায়। খালের শান্ত জলের উপর গাছপালা ও মাটির সাহায্যে বাগান তৈরী করা হয়। তার পর সেটাকে

৩নং চিত্র

হ্রদের মধ্যে টেনে নিয়ে খুঁটায় বেঁধে রাখা হয়। এরপর কাশ্মীরীরা নৌকায় চড়ে সে বাগানে গিয়ে নানাবিধ শস্যাদির চাষ করে।

৪নং চিত্র

৪। যুক্তরাষ্ট্রের আর্মার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী একটি নতুন ওষুধ প্রস্তুত

করেছেন। এর প্রয়োগে চোখের ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্টের অস্ত্রোপচার খুব সুবিধাজনক হয়েছে বলে প্রকাশ। ওষুধটির নাম আল্‌ফা কাইমার (alpha chymar)। এই ওষুধ প্রয়োগে ছানির বাঁধন শিথিল হয়ে যায় এবং অস্ত্রোপচারে সহজেই সেটাকে তুলে ফেলা হয়। এতে বিপদাশঙ্কা খুব কম থাকে। চোখে ছানি পড়লে দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। যে সব বন্ধনীর সাহায্যে চোখের লেন্স ঠিক জায়গায় থাকে—এই ওষুধ প্রয়োগে সে সব বন্ধনী নরম হয়ে যায় এবং এর ফলে লেন্স আল্‌গা হয়ে পড়ে। এই জন্যে ছানি সহজে তুলে ফেলা সম্ভব হয়।

৫। সম্মিলিত জাতি-সংঘের এক হিসাবে প্রকাশ—পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ২,৮০০ মিলিয়ন। গত দশ বছরে সাধারণভাবে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ৫৩০ মিলিয়নেরও
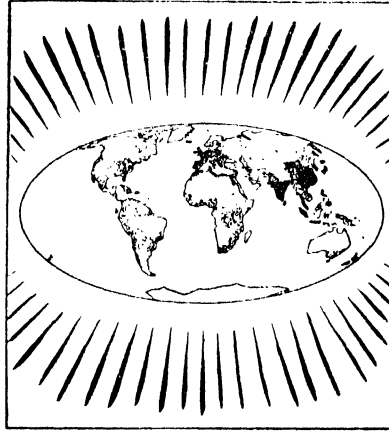
৫নং চিত্র

বেশী বেড়েছে। এর মধ্যে কম্যুনিষ্ট দেশের জনসংখ্যা ৮৪০ মিলিয়ন এবং অবশিষ্ট, অর্থাৎ ১৯৬০ মিলিয়ন অকমুনিষ্ট দেশসমূহের।

৬নং চিত্র

৬। পৃথিবীতে জন্মহার সর্বাপেক্ষা কম হচ্ছে উরুগয়তে—প্রতি হাজারে ১১

জন এবং সর্বাপেক্ষা বেশী হচ্ছে গিনিতে—প্রতি হাজারে ৬০ জন। কিন্তু গড়ে সর্বাপেক্ষা ঘন জনবসতি হচ্ছে ইউরোপে—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৮৪ জন। এশিয়ায় প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে লোকসংখ্যা হচ্ছে ৫৭ জন।

৭। কার্ল সি, ক্রিম নামে ইউ, এস-এর একজন ট্রাকচালক ২৬ বছরে মোট ১'৫ মিলিয়ন মাইল ট্রাক চালিয়েছেন। এতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—এই সময়ে তার গাড়ী চালনাকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আমেরিকান ট্রাকিং অ্যাসোসিয়েসন তার নাম দিয়েছে—"১৯৫৯ সালের ট্রাক-চালক"। ক্রিম, টুলসার
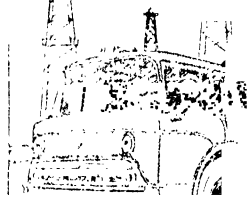
৭নং চিত্র

ওক্‌লাহোমা কোম্পানীর একখানি ট্রাঙ্ক ট্রাক চালান। এই গাড়ী চালিয়ে তিনি যে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন—তা বিষুব-রেখায় পৃথিবীর চতুর্দিকে ৬০ বার প্রদক্ষিণ করবার সমান।

৮নং চিত্র

৮। মৃত্যুহার সম্পর্কিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ—বিবাহিতদের মৃত্যুহার,

অবিবাহিতদের তুলনায় কম। ১৯৩০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, মৃত্যু-হার কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মৃত্যুহার আরও কমের দিকে। সমীক্ষায় সংগৃহীত মৃত্যুহার সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১০ জন করে হ্রাস পেয়েছে। এই হারে মৃত্যু হ্রাস পাওয়া পূর্বে অকল্পনীয় ছিল।

৯। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড মোটর কোম্পানী চাকাবিহীন একরকম মোটর গাড়ী নির্মাণ করেছে। এর নাম হলো লেভাকার। এই গাড়ীর তলায় তিনটা লেভাপ্যাড লাগানো থাকে। এই লেভাপ্যাডের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়ে গাড়ীটি সেই বায়ুপূর্ণ
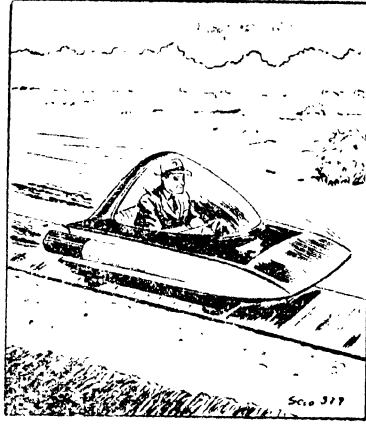
৯নং চিত্র

গদীর উপর দিয়ে চলে। ৬ থেকে ৮ জন যাত্রী নিয়ে রেলের উপর দিয়ে ঘণ্টায় দু-শো মাইল বেগে যেতে পারে, মোটরকার কোম্পানী এরূপ গাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। লেভাকরের ওজন ৪৫০ পাউণ্ড। গাড়ীটি লম্বায় ৯৪ ইঞ্চি, চওড়ায় ৫৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৪৮ ইঞ্চি। এই গাড়ীটিতে একজনের বেশী লোক চড়তে পারে না।

১০। ভাবী স্বামী কিরূপ অর্থশালী হবে—সেই সম্পর্কে ব্রেজিলের কুমারীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তিনটি কলাইয়ের সাহায্যে তারা তাদের ভাবী স্বামীর অর্থ-সঙ্গতি কিরূপ হবে—তা নির্ণয় করে। তিনটি কলাইয়ের মধ্যে একটির খোসা একেবারে ছাড়ানো হয়, আরেকটির খোসা কিছুটা ছাড়ানো হয় এবং বাকীটি খোসা সমেত রেখে দেওয়া হয়। তারপর সেণ্ট জনের জন্মোৎসবের দিন কুমারীরা ঐ তিনটি কলাই তাদের বালিশের নীচে রেখে দেয়। পরের দিন বালিশের তলা থেকে না দেখে তিনটির মধ্যে একটি কলাই বের করে নেয়। যদি বের-করা কলাইটি সম্পূর্ণ খোসা-শূন্য হয়—তবে ভাবী স্বামী হবে গরীব, কিছুটা খোসা-সমেত

কলাই হলে হবে মোটামুটি অর্থশালী এবং সম্পূর্ণ খোসা-সমেত কলাই হলে হবে প্রচুর

১০নং চিত্র

অর্থশালী।

১১। এক শতাব্দী আগেও যুক্তরাষ্ট্রের উইয়োমিঙ্গ, কোডি শহরে অনুন্নত পশ্চিম সীমান্তে কোন গির্জা ছিল না। শহরের লোকেরা সেখানে একটি গির্জা তৈরী করবার জন্যে উৎসুক ছিল। একদিন কয়েকজন স্থানীয় লোক এক সঙ্গে বসে তাস

১১নং চিত্র

খেলছিলেন এবং খেলায় বাজীর অর্থের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করে—এই বাজীর টাকা ব্যক্তিগতভাবে কারুর নেওয়া উচিত নয় এবং তা গির্জা নির্মাণের জন্যে দান করা হোক। এভাবেই কোডি শহরে বিখ্যাত এপিস্‌কোপাল গির্জা তৈরী হয়েছিল।

১২। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট সান অ্যান্টোনিও এবং মাউণ্ট উইলসনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ফিতার মাপে

দূরত্ব হচ্ছে ঠিক ২২ মাইল। এটিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত পরিমাপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আলোর গতিবেগ পরিমাপের সুবিধার জন্যেই এই দূরত্বের
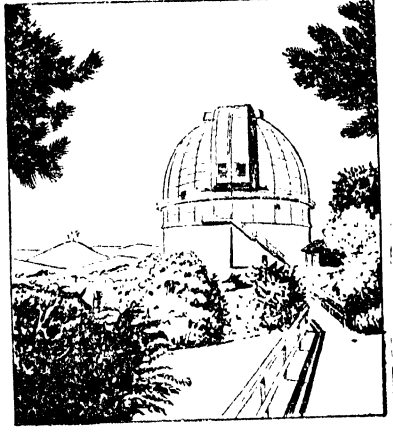
১২নং চিত্র

পরিমাপ করা হয়েছিল। এই পরিমাপ, ৬,৮০০,০০০ ভাগের এক ভাগ অথবা ২২ মাইলের মধ্যে এক ইঞ্চির ২/১০ ভাগ পর্যন্ত নির্ভুল। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে এ-পর্যন্ত যে সব সূক্ষ্ম পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে এই পরিমাপ হচ্ছে সবচেয়ে নিখুঁত এবং সূক্ষ্মতম।

১৩। ১৭৫২ সালে ঘুড়ির সাহায্যে বিদ্যুৎ সম্পর্কে পরীক্ষা করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেন যে, যাকে বজ্রপাত বলা হয়, তা বিদ্যুৎ ছাড়া কিছু নয় এবং

১৩নং চিত্র

ঝড়-বৃষ্টির সময় মেঘ বায়ুচালিত ডায়নামোর মত কাজ করে। যদিও এর কারণ আজ পর্যন্তও সঠিকভাবে জানতে পারা যায় নি, তথাপি বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন—বিদ্যুতের পারস্পরিক আকর্ষণ যখন খুব প্রচণ্ড হয় তখন ইলেকট্রনগুলি এক মেরু থেকে আর

এক মেরুতে ছুটে যেতে থাকে এবং এর ফলে আলো, তাপ ও শব্দের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া বজ্রপাতের ফলে যে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা ৪০০০ মাইল দূরের বেতার গ্রাহক যন্ত্রেও ধরা পড়ে।

বিবিধ

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

সমুদ্র সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির উদ্যোগে ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজকর্ম শীঘ্রই সুরু হইবে এবং ইহাতে পৃথিবীর আটটি রাষ্ট্রের জাহাজ কাজে নিয়োগ করা হইবে।

এই তথ্যানুসন্ধানের কাজ চার বৎসর ধরিয়া চালাইবার কথা। প্রথম আন্তর্জাতিক ওশেনো-কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে ম্যাসাচুসেট্‌সের উড্‌স্‌হোল ওশেনোগ্র্যাফিক ইনষ্টিটিউশনের ডাঃ সি. ও. ডি. আইসলীন একটি ঘোষণায় ইহা জানাইয়াছেন।

ভারত সরকারের মৎস্য-চাষ উন্নয়ন দপ্তরের ডাঃ এন. কে. পানিক্করও এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী রাষ্ট্রসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য যে কোথায় রহিয়াছে, তাহার সন্ধান এই পর্যালোচনা ও পরীক্ষার ফলে পাওয়া যাইতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা, সমুদ্র-সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্স-মেণ্ট অব সায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কংগ্রেসের এই অধিবেশনের আয়োজন করা হইয়াছিল। ৩৮টি রাষ্ট্রের ভূ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী, প্রাণী-বিজ্ঞানী এবং সমুদ্র-বিজ্ঞানীগণ ইহাতে যোগদান করেন। অধিবেশনে ৫০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানে যে সকল দেশের জাহাজ অংশ গ্রহণ করিবে, ডাঃ আইসলীন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লামণ্ট জিয়োলোজিক্যাল অবজার-ভেটরীর' একটি জাহাজ এবং রাশিয়ার মিথাইক লোমোনোসভ নামে একটি জাহাজ আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তথ্যানুসন্ধান কার্য সুরু করিবে। প্রাথমিক পরীক্ষার কাজে দক্ষিণ আফ্রিকার জাহাজ-সমূহও অংশ গ্রহণ করিবে।

ডাঃ আইসলীন জানাইয়াছেন যে, এই পরি-কল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬২ হইতে ১৯৬৩ সালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান এবং ভারতও জাহাজ দিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

এখানে সংগৃহীত তথ্যসমূহ আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান-বর্ষ পালন উপলক্ষে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেরণ করা হইবে।

ডাঃ আইসলীন এই প্রসঙ্গে বলেন, বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা ভারত মহাসাগরের তথ্যানুসন্ধানের এই প্রচেষ্টা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। কোন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে।

সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিবার ব্যাপারে ভারত মহাসাগর কেন বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বিশেষ কমিটির ডাঃ আইসলীন বলেন

যে, নানা দিক হইতেই এই মহাসাগর অনন্য-সাধারণ। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চল হইতে প্রকৃত পক্ষে কোন রকম বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

তৈলবীজ ও তৃণ হইতে পুষ্টিকর প্রোটিন সংগ্রহ

বৃটেনে এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে তৈলবীজ ও তৃণ শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে প্রোটিন সংগ্রহ এবং প্রোটিন চূর্ণ করিবার কাজ হইতে পারে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিকগণ এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা দেখিয়া আসেন। সাংবাদিকগণ সকলেই ইহার কার্যকারিতায় সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা মনে করেন, বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে পুষ্টির অভাব রহিয়াছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে এক্ষণে ব্যাপকভাবে প্রোটিন সরবরাহ করা যাইতে পারে।

প্রোটিন সংগ্রহের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বৃটিশ গ্লুস্ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল্‌স্ লিমিটেডের সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আই. এইচ. চায়েন।

১৯৫৯ সালের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

অধ্যাপক ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ও অধ্যাপক ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ ১৯৫৯ সালের জন্য ভেষজবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন বলিয়া ১৫ই অক্টোবর ষ্টকহোমে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ডাঃ ওচোয়া ও ডাঃ কর্ণবার্গ জীবদেহে রিবোনিউক্লিক ও ডেসক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের রূপ সম্পর্কে আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ক্যারোলিন ইনষ্টিটিউট হইতে এই পুরস্কার দানের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সংস্থার ফ্যাকাল্টিকে প্রতি বৎসর ভেষজবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নির্বাচন করিতে হয়।

এই বৎসর এই পুরস্কারের পরিমাণ ১৫ হাজার ২১৯ ষ্টার্লিং পাউণ্ড। আগামী ১০ই ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে এই পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত হইবে।

ষ্টকহোমের ২৬শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ—একজন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীকে রসায়নবিদ্যার জন্য এবং দুইজন আমেরিকানকে (তাঁহাদের মধ্যে একজন ইতালীয় বংশোদ্ভূত) পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

পদার্থসমূহের পারমাণবিক-বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের যন্ত্র 'পোলারোগ্রাফ' উদ্ভাবনের জন্য অধ্যাপক জারোস্লাভ হেরোভস্কি রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

অ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কারের জন্য ক্যালি-ফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এমিলিও সেগ্রে ও ডাঃ ওয়েনচেম্বারলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ডাঃ সেগ্রে ইতালীয় বংশোদ্ভূত। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হন।

চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্র

সোভিয়েট আন্তগ্রহ ষ্টেশন লুনিক-৩ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে দিকটা দেখা যায় না, সেই দিকের চিত্র গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া টাস' ১৮ই অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর, তারিখে চন্দ্র ও পৃথিবীর চার-পাশে আবর্তনের জন্য লুনিক-৩ কক্ষপথের উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়। ৬ই অক্টোবর তারিখে উহা চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতে সুরু করে। পরে পৃথিবীর দিকে মোড় ফিরিবার পূর্বে মহাশূন্যের দিকে আগাইয়া যায়।

লুনিক-৩-এর যন্ত্রপাতি এখনও তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতেছে। ১৮ই অক্টোবর রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটে উহার পৃথিবীকে প্রথমবার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করিবার এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় ২৯৩৬৮৭ মাইল নিকটে আগমনের

কথা। উহার গতি হ্রাস পাইয়া সেকেণ্ডে ২·৪ মাইলে দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। আবর্তনের পর আন্তগ্র্হ ষ্টেশনটি যখন আবার দূরে সরিয়া যাইতে থাকিবে তখন দুই দিন সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে উহা দেখা যাইবে না।

চন্দ্রের আকার ডিম্বাকৃতি

ডাঃ সেভোল্ড ফেডনিস্কি ১২ই অক্টোবর বলিয়াছেন যে, চন্দ্র সম্ভবতঃ ডিম্বাকৃতি—বিষুব-রেখা বরাবর পৃথিবীর দিকেই উহা দীর্ঘতর। প্রাভদায় লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, লুনিক-৩-এর সাহায্যে এই সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে।

লুনিক-৩ হইতে বেতার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তথ্য আহরণ করিতেছেন। এত দূরেও যন্ত্রপাতি সক্রিয় রহিয়াছে। ইহা হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

মস্কোর বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক ঘোষণায় ইহাও বলা হয় যে, চন্দ্রে প্রাণের চিহ্ন আছে কিনা, সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাইতেছেন। একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, চন্দ্রে যেহেতু আগ্নেয়গিরি আছে, সেহেতু মনে হয় যে, অভ্যন্তরে তাপমাত্রা অব্যাহত থাকে। আগ্নেয়গিরির ফাটল হইতে নিশ্চয়ই কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতেই অক্সিজেন বাহির করিয়া আনা সম্ভব হইতে পারে। তাহা ছাড়া ফাটলগুলিতে আর্দ্রতাও থাকা সম্ভব। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, চন্দ্রে সরলতম সজীব পদার্থ থাকা সম্ভব।

সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফেলেনকভ বলেন, প্রত্যেক দশ লক্ষ তারার মধ্যে একটি তারার নিশ্চয়ই এমন গ্রহমণ্ডল রহিয়াছে যাহাতে সজীব পদার্থ আছে। ইহার অর্থ এই যে—ছায়াপথের মধ্যে অন্ততঃ দেড় লক্ষ গ্রহমণ্ডল আছে। এরূপ কোন কোন গ্রহে হয়তো মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বাস করে। তবে কোথাও সম্ভবতঃ মানুষ অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং উন্নত প্রাণী রহিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষ ও অন্যান্য গ্রহের অধিবাসীদের মধ্যে নিশ্চয়ই একদিন সাক্ষাৎ হইবে।

পৃথিবীর বিকিরণ-বলয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মহাকাশে যে বিকিরণ-বলয় রহিয়াছে, সে সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩ই অক্টোবর একটি এক্সপ্লোরার শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। মার্কিন জাতীয় মহাকাশ সংস্থা হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ৯১ পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার ৭-এ যে সকল যন্ত্রপাতি রহিয়াছে, সেগুলির দ্বারা বিকিরণ-বলয় সম্পর্কে অন্ততঃ ৭টি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষাকার্য চালানো সম্ভব হইবে।

ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলের বায়ু-প্রবাহ

ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলের বায়ু-প্রবাহ এবং বাতাসের গতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কয়েকটি রকেট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাসাধিক পূর্বে এই পর্যায়ের প্রথম রকেটটি নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ন্যাশন্যাল অ্যারোনটিক্স অ্যাণ্ড স্পেস এজেন্সী বা জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই সম্পর্কে জানাইয়াছে যে, এই রকেটটি মহাশূন্যে উৎক্ষেপণের পর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সমুদ্রোপকূলবর্তী আকাশের কয়েক শত মাইল স্থান কমলা ও হরিদ্রা রঙের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সোডিয়াম-যুক্ত যৌগিক পদার্থের এই ধূম্রজাল প্রায় আধঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়।

ভার্জিনিয়ার পূর্ব উপকূলস্থিত জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার কেন্দ্র হইতে কিছু

দিন পূর্বে এই দুই পর্যায়ী 'নাইক-এস্প সাউণ্ডিং রকেটটি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। সংস্থার পাঁচটি কেন্দ্র হইতে ইহার আলোকচিত্র গৃহীত হয়। সংস্থা এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছে যে, ইহার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ উর্ধ্ব আবহমণ্ডলে বায়ুর গতি ও বাতাসের ঘনত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের খুবই কাজে লাগিবে।

রকেট-নিঃসৃত বাষ্প রেখা উর্ধ্বাকাশের ১৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্বে পৃথিবী হইতে মাত্র ৫০ মাইল উর্ধ্বের বায়ু-সংক্রান্ত তথ্যাদি বেলুন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

পাকস্থলীর ক্ষত-প্রতিষেধক নূতন ভেষজ

ডাঃ যোগীন্দ্র ভায়ানা নামে জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক ওয়াশিংটনের জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর দুইজন মার্কিন সহযোগীর সাহায্যে সামুদ্রিক আগাছা হইতে পাকস্থলীর ক্ষত-প্রতিষেধক একটি ভেষজ আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বাদবিহীন এই ভেষজটি পানীয় জলের সহিত সেবন করিতে হয়।

এই চিকিৎসকগণ সম্প্রতি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রী সেক্সন বা চিকিৎসা বিষয়ক রসায়ন-বিজ্ঞান বিভাগকে এই গবেষণালব্ধ ফলাফলের কথা জানাইয়াছেন। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বর্তমানে ১৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে।

তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে ক্যারাজেন নামে একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার রস পাকস্থলী ও আন্ত্রিক-ক্ষত চিকিৎসায় কার্যকরী হইয়া থাকে। কারণ পাকস্থলীর পেপ্‌সিন নামে যে জারক বস্তুর দরুণ খাদ্যবস্তু জীর্ণ ও হজম হইয়া থাকে, পাকস্থলীতে ক্যারাজেন থাকিলে তাহার ক্ষরণ হয় না।

তাঁহাদের মতে, ইহা কোন বিষাক্ত দ্রব্য নহে, ইহার মধ্যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছুই নাই। শরীরের মধ্যে ইহা মিশিয়া যায় না। তবে মুখে দিলে কচ্‌কচ্‌ করে বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে বিরক্তি বোধ হয়।

আমেরিকার একটি প্রধান ভেষজ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইহার গুণাগুণ নির্ধারণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

নয়া দিল্লীর অধিবাসী ইন্দোর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক ডাঃ ভায়ানা একটি শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছেন। তিনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন।

তরল সিরিঞ্জ

প্রত্যেক লোকেরই টিকা বা ইন্‌জেকশনের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। সিরিঞ্জের সূচ যখন পেশীর মধ্যে বা চামড়ার নীচে ফুটাইয়া দেওয়া হয় তখন যত কমই হউক, একটু-আধটু ব্যথা টের পাওয়া যায়। কিন্তু তরল-সিরিঞ্জ ব্যবহার করিলে এতটুকু ব্যথাও লাগিবে না। এই অভিনব সিরিঞ্জের কোন সূচ নাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক প্রদর্শনীটির জনস্বাস্থ্য মণ্ডপে তরল-সিরিঞ্জ দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়া বা ইন্‌জেকশন দেওয়ার কাজে এই নূতন সিরিঞ্জ অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই সূচ-হীন ইনজেক্টরের কল্যাণে বহুসংখ্যক লোককে অল্প সময়ের মধ্যেই টিকা দেওয়া যায়।

এই সিরিঞ্জের সম্মুখভাগে সূচের বদলে একটি রবারের টিপ-বোতামের মত ব্যবস্থা আছে। দেহের যেখানে ইন্‌জেকশন দিতে হইবে, সেখানে এই সিরিঞ্জের মুখটি বসাইয়া চাপ দিলেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে ঔষধ দেহের ভিতরে চলিয়া যাইবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়, সেনাবাহিনী ও দপ্তর, কারখানায় কর্মচারী ও শ্রমিকদের ব্যাপক হারে ইন্‌জেকশন দিবার জন্য এই তরল-সিরিঞ্জ গত দুই বৎসর যাবৎ সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক্স-১৫ বিমান

বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন, আমেরিকায় রকেট-চালিত এক্স-১৫ নামে যে পরীক্ষামূলক বিমান নির্মিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনের সাহায্যে পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ এই বিমানখানি পৃথিবী হইতে ৫০০০০ ফুট উর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছিল। ইহার ইঞ্জিনের ধাক্কা বা 'থ্রাষ্ট' হইল ৮০০০০ পাউণ্ড। ইহার অগ্রভাগ সূচের মত। ১৫ টন ওজনের এই বিমানখানিকে অন্য একটি বিমান পৃথিবীর ৩৮০০০ ফুট উর্ধ্বে লইয়া যায়। তাহার পর এই বিমানের সহিত এক্স-১৫-এর ছাড়াছাড়ি হয় ও ইহা পৃথিবীর ৫০,০০০ ফুট উর্ধ্বে উত্থিত হয়।

পৃথিবীর ১০০ মাইল উর্ধ্বের তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে এই ধরণের আরও একটি বিমান মহাশূন্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

বিমান-বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে এক্স-১৫ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাকে ক্যালিফোর্ণিয়ার মোহাভি মরুভূমির এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটি হইতে ১০ মিনিটের জন্য শূন্যলোকে প্রেরণ করা হয়।

বিমান-বাহিনী হইতে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত শব্দের গতির তুলনায় অধিকতর গতিতে বিমান-যাত্রা সম্পর্কে এবং বাতাসের সহিত ঘর্ষণের ফলে বিমানের দেহে যে তাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এক্স-১৫-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহাকাশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার স্থাপন

চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকল্পে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে একটি "স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্র্হ যন্ত্রাগার" স্থাপন করিয়াছে।

সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাস এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই আন্তগ্র্হ যন্ত্র-ঘাঁটিটি একটি মহাজাগতিক রকেটে স্থাপিত হয়। ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে উক্ত মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

টাসের সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, আন্তগ্র্হ যন্ত্র-ঘাঁটিটি প্রায় ৬,২৫০ মাইল দূর হইতে চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তৎপরে উহা পৃথিবীর এলাকায় চলিয়া আসিয়া পৃথিবীরই একটি উপগ্রহরূপে অবস্থান করিবে। প্রদক্ষিণকারী আন্তগ্র্হ স্টেশনের কক্ষ এরূপভাবে নির্ধারিত হইয়াছে যে, উহা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রত্যক্ষ করা যাইবে। ৪ঠা অক্টোবর ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ-এ ভারত মহাসাগর হইতে ৬৭,৫০০০ মাইল উর্ধ্বে আন্তগ্র্হ স্টেশনটি দেখা যাইবে বলিয়া সংবাদে উল্লিখিত হয়।

আন্তগ্র্হ স্টেশনটির ওজন প্রায় ৬১৩ পাউণ্ড। মহাজাগতিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় তাপ-নিয়ামক যন্ত্র ইহাতে স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক সরঞ্জাম এবং সৌর ব্যাটারী-চালিত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে দুই হইতে চার ঘণ্টা অন্তর সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পৃথিবীর একটি সংযোগ-সাধন কেন্দ্র হইতে এই সকল সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৫৯ | একাদশ সংখ্যা

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না* ?

শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়

মুকুলের মর্মে যে অধীর আগ্রহ রুদ্ধ থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাকে আপন মর্মে অনুভব করেছিলেন। রাত্রির শিশির শিহরণ ও দিনের সূর্যসন্তাপের মধ্য দিয়ে ফলন সুরু না হওয়া পর্যন্ত ফুলকে প্রহর গুণতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর নিজের জীবনে প্রত্যাশা করেছিলেন এমন এক স্পর্শের, যাতে তাঁর সব কিছু কামনা এক নিমেষেই সাধনার কাল-ক্ষেপ অতিক্রম করে সফল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই কয়েকজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী চেয়েছিলেন ফলনের মূল রহস্যটি করায়ত্ত করতে, যাতে ফলন-কালকে নিয়ন্ত্রিত ও সংক্ষিপ্ত করা যায়। এই প্রচেষ্টায় তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের এই সাফল্য কবি-কল্পনার মতই অভাবনীয়।

ফলন নিয়ন্ত্রণের এই গবেষণাগুলি সব এই শতাব্দীতেই করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফলনের মূল কারণটি একেবারে অজ্ঞাত ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব—তত্ত্বীয় ও প্রয়োগমূলক, এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাতারাতি আমূল পরিবর্তন; বিশেষ করে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেকার শতাব্দী-ব্যাপী বহুপোষিত ধারণার অধিকাংশই এই শতাব্দীর অত্যুন্নত বিশ্লেষণ পদ্ধতির কাছে অমূলক প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে, এই শতাব্দী যতই এগিয়ে চলেছে ততই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গ্রন্থকারকে তাঁর পূর্ববর্তী সংস্করণের অনেক পৃষ্ঠা মুছে ফেলে নতুন করে বিবরণী লিখতে হচ্ছে অথবা কোনও সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় যোজনা করতে হচ্ছে। যেমন—বেনসন ও ক্যালভিন কর্তৃক (১৯৫০ সাল) তেজস্ক্রিয় অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ধাপগুলি নির্ণীত হবার ফলে এই সম্পর্কিত যাবতীয় মতামত সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলি অকস্মাৎ একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে; এবং কগল্ ও হাগেন-স্মিট কর্তৃক (১৯৩৪ সাল) উদ্ভিদ-হর্মোন 'অক্সিন' আবিষ্কৃত হবার ফলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, উদ্ভিদের অন্যান্য বহুবিধ বিকাশ ও বৃদ্ধির মতই ফলন-প্রক্রিয়াটিও হর্মোন-নিয়ন্ত্রিত।

ফলন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এ-কথাটা বহুদিন থেকেই জানা ছিল যে, পুষ্পরেণুর গর্ভমুণ্ডে সংলগ্ন হওয়া

দরকার। এই রেণু সংযোগের পর সাধারণতঃ গর্ভ-সঞ্চার হয়ে থাকে এবং গর্ভসঞ্চারের পর গর্ভ-কোষটি ফলের আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিষিক্ত-গর্ভ ফলের লক্ষণ হলো তাতে বীজ থাকবেই; কেন না উৎপাদনক্ষম বীজের সৃষ্টিই গর্ভসঞ্চারের লক্ষ্য। আমরা সচরাচর যে সব ফল দেখি তাদের অধিকাংশই নিষিক্ত-গর্ভ ফল। কিন্তু কয়েকটি গাছের ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার ফলনের জন্যে অপরিহার্য নয়; শুধুমাত্র রেণুসংযোগ হলেই হলো। এ-ক্ষেত্রে ফলটি বীজশূন্য হয়ে থাকে; কারণ নিষিক্ত না হওয়ায় বীজ জন্মাতে পারে না। বীজহীন আঙুর ও কলা এ-রকম ফলের দৃষ্টান্ত। আর অল্পসংখ্যক কয়েকটি উদ্ভিদ আছে, যাদের ফলনের জন্যে পরাগ সংযোগেরও দরকার হয় না। ন্যাভেল কমলালেবু হলো এই জাতীয় একটি ফল। নিষিক্ত না হওয়ায় এই শ্রেণীর ফলও বীজশূন্য। লাইব্যাক ও থাইম্যান দেখলেন, রেণুতে অক্সিন বা বৃদ্ধি-কারক হর্মোন থাকে। তাঁদের এই আবিষ্কারের ফলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদি শুধুমাত্র রেণুর গর্ভকেশরে উপস্থিতির ফলেই ফলন-ক্রিয়া সুরু হতে পারে এবং যদি রেণুতে অক্সিন বা বৃদ্ধিকারক হর্মোন থাকে, তাহলে রেণুর বদলে কোন কৃত্রিম হর্মোন গর্ভকেশরে সরাসরি সঞ্চারিত করা হলেই বা কেন ফলন সম্ভব হবে না?

সুরু হলো পরীক্ষা। ইয়াসুডা (১৯৩৪ সালে) শসার রেণুকে জলে ভিজিয়ে হর্মোন-নির্যাস তৈরী করেন এবং সেই রেণু-ভিজানো জল শসা-ফুলের কচি গর্ভকোষের মধ্যে সরাসরি ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি স্বাভাবিক আকারের কয়েকটা শসা ফলাতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, এই শসাগুলি বীজশূন্য হয়েছিল। কৃত্রিম উপায়ে ফলনের পরীক্ষায় এই হলো প্রথম সাফল্য। তারপর পরীক্ষা করেন গুস্তাফ্‌সন (১৯৩৬ সালে)। তিনি টোম্যাটো-ফুলের না-ফোটা কুঁড়ির পুং-কেশরগুলি ছেঁটে দিলেন, যাতে রেণুসংযোগ না ঘটতে পারে এবং গর্ভদণ্ডটাকে কেটে কিছুটা ছোট করে তার মাথায় কৃত্রিম হর্মোন লাগিয়ে দিলেন। গর্ভদণ্ডটাকে ছোট করবার উদ্দেশ্য হলো এই যে, তার মাথায় লাগানো হর্মোন সহজেই গর্ভকোষে পৌঁছাতে পারবে। গুস্তাফ্‌সন এভাবে বীজশূন্য টোম্যাটো ফলালেন। তিনি যে কৃত্রিম হর্মোনগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির মধ্যে ইণ্ডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইণ্ডোলবিউটিরিক অ্যাসিড ও ফেনিলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড অন্যতম। কৃত্রিম ফলনের গবেষণায় গুস্তাফ্‌সনের অবদানই সবচেয়ে বেশী। তিনি টোম্যাটো ছাড়া আরও অনেক কৃত্রিম ফলন ঘটিয়েছেন।

গুস্তাফ্‌সন যখন কৃত্রিম ফলনের পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আর একজন বিজ্ঞানী ডল্‌ফাস (১৯৩৬ সালে) আবিষ্কার করেন যে, গর্ভকোষের ফলাকারে বৃদ্ধির জন্যে যে হর্মোন প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই ডিম্বকোষে বর্তমান। তিনি গর্ভকোষ থেকে ডিম্বকোষগুলি সরিয়ে ফেলে দেখতে পেলেন যে, রেণু-সংযোগ হলেও গর্ভকোষটি আর ফলাকারে বাড়ছে না। অথচ সেই একই গর্ভকোষের ডিম্বকোষগুলির জায়গায় তাদের বদলে ইণ্ডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড লাগিয়ে তিনি দেখলেন যে, গর্ভকোষটি স্বাভাবিক ফলনের মতই ফলাকারে বেড়ে উঠছে। তাই ডল্‌ফাস তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। ডল্‌ফাস-এর সিদ্ধান্তটির সত্যতা পুনঃপ্রমাণিত করেন গুস্তাফ্‌সন (১৯৩৮ সালে)। গুস্তাফ্‌সন গ্রীষ্মকালীন কুব্জকণ্ঠ স্কোয়াশ-এর উপর এক সুন্দর পরীক্ষা করেন। তিনি কয়েকটি না-ফোটা পুষ্পকোরক নিয়ে তাদের গর্ভকোষটির কিছু কিছু অংশ তলার দিক থেকে কেটে বাদ দেন। কোনও গর্ভকোষে হয়তো ডিম্বকোষের সংখ্যা থাকলো কুড়ি, কোনটায় বা পনেরো, কোনটায় দশ, কোনটায় পাঁচ, কোনটায় আবার একটাও না। ফলে দেখা গেল, যে গর্ভকোষে যত

বেশীসংখ্যক ডিম্বকোষ আছে, ফলাকারে তার বৃদ্ধি সেই পরিমাণে বেশী হচ্ছে। অর্থাৎ যাতে কুড়িটা ডিম্বকোষ আছে, সেটা বাড়ছে পনেরোটা ডিম্বকোষ যাতে আছে, তার চেয়ে কিছুটা বেশী। যাতে একটাও ডিম্বকোষ নেই, তার বৃদ্ধি প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে। গুস্তাফ্‌সনের এই পরীক্ষাটি ডল্‌ফাস আবিষ্কৃত সত্যকে সন্দেহের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছ।

অতঃপর গুস্তাফ্‌সন ফলনের তত্ত্বটি সম্পূর্ণাকারে উপস্থাপিত করেন (১৯৩৯ সালে)। তিনি বললেন, রেণু-নিঃসৃত হর্মোন ফলন-ক্রিয়ার উদ্বোধন ঘটায় এবং এই উদ্বোধনের পর গর্ভকোষের অবশিষ্ট বৃদ্ধি ডিম্বকোষ-নিঃসৃত হর্মোনের ক্রিয়ার ফলেই ঘটে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, যে সব ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না বা রেণুসংযোগও নিষ্প্রয়োজন তাদের গর্ভকোষ গর্ভসঞ্চারপ্রবণ ফলের গর্ভকোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশী হর্মোন উৎপন্ন করে। এর ফলে রেণু-নিঃসৃত হর্মোনের অভাবটা মিটে যায়। এই তথ্যটি যাবতীয় ফলন-রহস্যকে পরিষ্কার করে দিল।

ইয়াসুডা-ডল্‌ফাস-গুস্তাফ্‌সনের এই আবিষ্কারগুলি ফলচাষের ইতিহাসে নতুন যুগ আনয়ন করে। আরম্ভ হলো কৃত্রিম ফলনের অভিযান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরভাগের রাজ্যগুলিতে কৃত্রিম ফলনের প্রথম ব্যাপক প্রয়োগ হয়। সেখানে ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—এই তিন মাস সূর্যের মুখ প্রায় দেখাই যায় না বললেও হয়। শীতের আকাশ সব সময়েই কুয়াশায় ঢেকে থাকে। সূর্যালোকের অভাবে এই তিন মাসে টোম্যাটো-ফুলের রেণু ভাল বাড়তে পারে না (অর্থাৎ পরিণত হতে বা পাকতে পারে না), ফলে টোম্যাটোর ফলন অত্যন্ত হ্রাস পায়। কিন্তু কৃত্রিম হর্মোন প্রায়-ফোটা টোম্যাটো ফুলের কুঁড়ির উপর স্প্রে করবার ফলে এখন আর একটি ফুলও বৃথা যায় না, সবগুলিতেই ফল ধরে। এই ফলগুলি বাজারে খুবই সমাদর লাভ করে। কেন না এরা বীজশূন্য; শুধু তাই নয়, স্বাভাবিক ফলনের টোম্যাটোর চেয়ে মিষ্টিও বেশী, তাছাড়া এগুলিতে ভিটামিন-এর পরিমাণও বেশী হয়। এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, হর্মোন খুবই কম মাত্রায় কার্যকরী; যেমন, সাধারণতঃ দশ লক্ষ ভাগ দ্রাবকের সঙ্গে মাত্র পাঁচ ভাগ হর্মোন মেশালেই চলে। মাত্রা বেশী হয়ে গেলে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। তবে কার্যকরী মাত্রাটি হর্মোনবিশেষের ক্ষেত্রে কম-বেশী হয়ে থাকে। যেমন, দশ লক্ষ ভাগ দ্রাবকের সঙ্গে পঁচিশ থেকে তিরিশ ভাগ প্যারা-ক্লোরফেনক্সি-অ্যাসেটিক অ্যাসিডে হর্মোনটি মেশানো হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে বীজশূন্য টোম্যাটোর ফলনে যে সব কৃত্রিম হর্মোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান হর্মোনের নাম হলো প্যারা-ক্লোরফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বিটা-ন্যাপ্‌থক্সি-অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং ইণ্ডোলবিউটিরিক অ্যাসিড। এ-যাবৎ যে সব ফলের কৃত্রিম হর্মোন-নিয়ন্ত্রিত বীজহীন ফলন সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে টোম্যাটো ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি হলো—স্কোয়াশ, ষ্ট্রবেরি, গ্ল্যাডিওলাস এবং মোটা লাল লঙ্কা। এদের সবগুলিই যুক্তরাষ্ট্রে হর্মোন-নিয়ন্ত্রণে ফলছে।

কিন্তু এগুলি শীতপ্রধান দেশের ফল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেই কৃত্রিম হর্মোনের সাহায্যে ফলনের সবচেয়ে বেশী প্রচলন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরের কর্কট ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্বর্তী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। এখানে আনারস চাষে হর্মোন-প্রক্রিয়া বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধন করেছে। কৃত্রিম হর্মোন আল্‌ফা-ন্যাপ্‌থালিন-অ্যাসেটিক অ্যাসিড স্প্রে করবার ফলে যখন খুশী তখনই আনারস গাছে ফুল ধরানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে জোর করে ফুল ফোটানোর সার্থকতা এই যে, এতে ফলনের ঋতু খুশীমত বাড়ানো যাচ্ছে এবং ফুল ধরবার সমতা ও সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার

ফলে ফলনেরও সমতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। আনারস ফলনের আর একটা দিকও আছে। সেটা এই যে, আল্ফা-ন্যাপ্থালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড স্প্রে করবার ফলে আনারসের ডাঁটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাতে ডাঁটা ভেঙ্গে ফলটা খসে পড়তে পারে। এই অসুবিধা দূর করা হয়ে থাকে বিটা-ন্যাপ্থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড স্প্রে করে। ফলের বৃদ্ধি কিছু এগিয়ে গেলে এই কৃত্রিম হর্মোনটা স্প্রে করা হয়। বিটা-ন্যাপ্থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড স্প্রে করবার ফলে ডাঁটা আর দুর্বল হতে পারে না।

যদিও এখন পর্যন্ত আপেল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, চেরি, পীচ ইত্যাদি প্রধান ফলগুলিকে কৃত্রিম হর্মোন-নিয়ন্ত্রণে ফলানো সম্ভব হয় নি, তবুও এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ফ্লোরিডায় কৃত্রিম হর্মোন-নিয়ন্ত্রিত ফলনের গবেষণা পুরাদমে চলছে।

খুশীমত যে কোন সময়ে আনারস গাছে ফুল ধরিয়ে আর শীতের সূর্যালোকবঞ্চিত দিনে টোম্যাটোর স্থগিতপ্রায় ফলনকে গতিবেগ দান করে কৃত্রিম হর্মোন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর যে স্বপ্নকে পৃথিবীর মাটিতে সফল করেছে, তা একদিন ছিল কেবল কবিকল্পনারই উপজীব্য। যেদিন রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন—

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না?

সোভিয়েট রকেট—লুনিকের সাহায্যে গৃহীত চন্দ্রের বিপরীত দিকের আলোকচিত্র।

ভারতের অতীত আগ্নেয়োচ্ছ্বাস

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

ভূত্বক সাধারণতঃ যেসব শিলায় আচ্ছাদিত তাদের মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—(১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা এবং (৩) রূপান্তরিত শিলা। এদের মধ্যে আবার আগ্নেয় শিলাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্য দু-রকমের শিলার জন্ম দিচ্ছে। কারণ, প্রাথমিক আগ্নেয় শিলাগুলি জমাট বাঁধবার পর রোদ, বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয়িত হতে থাকে। এই সব ক্ষয়ে-যাওয়া অংশগুলি নদীস্রোত অথবা বৃষ্টির জলের সঙ্গে চলে যায় অন্যত্র এবং সুবিধামত জমে উঠে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। স্তরে স্তরে জমতে থাকে বলে এদের স্তরীভূত শিলাও বলা হয়। আগের দু-রকমের শিলা কখনও কখনও ভূগর্ভের চাপ, উত্তাপ প্রভৃতির প্রভাবে একেবারে নতুন ধরণের শিলায় পরিবর্তিত হতে পারে। এদেরই বলা হয় রূপান্তরিত শিলা।

আগ্নেয় শিলা ও আগ্নেয়োচ্ছ্বাস

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগ্নেয় শিলাই এত রকমের শিলার মূলে রয়েছে। তবে এ আগ্নেয় শিলাই বা কোথা থেকে আসে? অগ্ন্যুৎপাত বা আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ফলেই এ সব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের কোন দুর্বল জায়গা ভেদ করে সবেগে উঠে আসে ভিতরকার গলিত দ্রব্য এবং পরে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে ব্যাসাল্ট অথবা গ্র্যানিট শিলার। এই জাতীয় আগ্নেয় শিলার বুকেই লেখা রয়েছে অতীতের যত আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের কাহিনী।

জীবের আবির্ভাবের আগে

জীবের আবির্ভাব হয়েছিল পুরাজীবীয় যুগের (Palaeozoic Era) প্রারম্ভে (?)। এরও বহু আগে আদিম আর্কিয়ান যুগে (Archaean Era) পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মত ভারতের নানা স্থানেও বহুবার আগ্নেয়োচ্ছ্বাস হয়েছিল। রাজপুতনার বিশাল জায়গা জুড়ে যে গ্র্যানিট বিস্তৃত তাকে এ যুগের কীর্তি বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া ছোটনাগপুর, নোয়ামুণ্ডি এবং চাইবাসা ও আশে-পাশের গ্র্যানিট ও ব্যাসাল্টসমূহ এ-যুগের আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সাক্ষী। সিংভূম অঞ্চলের এই গ্র্যানিট বিস্তৃতিকে এক কথায় 'সিংভূম গ্র্যানিট' বলা হয়। এর বেশ কিছুকাল পরে দক্ষিণ ভারতের কুডাপ্পা অঞ্চলে ব্যাসাল্টের ধারা বয়েছিল। তাছাড়া মহীশূর অঞ্চলে এবং মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র, বিজাওয়ার প্রভৃতি স্থানের ব্যাসাল্ট শিলাও এ-যুগের শেষভাগের বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, জীবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে; অর্থাৎ আদিম আর্কিয়ান যুগের সম-সাময়িক বা তারও পরের বহু আগ্নেয় শিলার বিশদ বিশ্লেষণ আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। আর বর্তমানে 'সিংভূম গ্র্যানিটের' কোন কোন অংশের উপর বিশেষ গবেষণার দ্বারা সেগুলিকে পরিবর্তিত শিলা বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই আজকাল ভারতের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক গবেষণাগারে এ-যুগের গ্র্যানিট নিয়ে বিশদ গবেষণা চলছে—এদের সত্যিকারের উৎপত্তির ইতিহাস জানবার জন্যে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন গ্র্যানিট নিয়েও আজকাল অনুরূপ মতভেদ দেখা যাচ্ছে।

জীবের আবির্ভাবের পরে*

পুরাজীবীয় যুগের প্রথম দিকে রাজপুতনার ঘালানি (যোধপুরের নিকট) অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে (Sangla Hills) অম্লাত্মক লাভা বহু শত মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ-যুগের শেষভাগের বিরাট আগ্নেয়োচ্ছ্বাস হয়েছিল কাশ্মীর অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে। এ অঞ্চলের অম্ল ও ক্ষারীয় প্রস্তরগুলি পরে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করেছে পির-পাঞ্জাল পর্বতরাজির।

মধ্যজীবীয় যুগে ক্রমশঃ মধ্য ও উত্তর ভারত যেন ঝিমিয়ে পড়ে—আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ এসে লাগে পূর্বভারতে। গঙ্গার পাশে সাহেবগঞ্জ ও তার চারপাশ জুড়ে যে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তার জন্ম হয়েছিল এ-যুগে। এ-অঞ্চলের কতকগুলি দুর্বল জায়গা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল ব্যাসাল্ট— প্রায় ১০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে জমে উঠে সৃষ্টি করলো রাজমহল পাহাড়। এখানে মোট দশটি ধারার উপস্থিতি আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের প্রচণ্ডতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লার স্তর ভেদ করে যে সব বিশেষ ধরণের আগ্নেয় শিলার (Lamprophyre dykes) দেখতে পাওয়া যায়, তারা সুদূর রাজমহল ব্যাসাল্টের সঙ্গে জড়িত বলে অনেকে অনুমান করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত আগ্নেয় শিলাসমূহ কয়লাস্তরগুলিকে অনেকাংশে পুড়িয়ে ঝামা করে দিয়েছে—নষ্ট হয়ে গেছে বহু ভাল জাতের কয়লা। এছাড়া আসামের সিলেট অঞ্চলের ব্যাসাল্টের পাহাড় ও আসামের উত্তর-পূর্ব-কোণের আবর পর্বতশ্রেণীও এ-যুগের ব্যাসাল্ট দিয়েই তৈরী। এ-যুগের শেষভাগে কাশ্মীরে আবার (দ্বিতীয় বার) ব্যাসাল্টের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এই অগ্ন্যুৎপাত আগের বারের তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক রকমের হয়েছিল।

নবজীবীয় যুগের প্রথমদিকে ভারতের উত্তরাংশে দেখা দিয়েছিল এক বিরাট আলোড়ন এবং এই আলোড়নের ঢেউ কাঁপিয়ে তুলেছিল ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত। ভারতের উত্তরাংশের টেথিস সাগরের বুকে এতকালের জমে-ওঠা পলিসমূহ ঊর্ধ্বচাপ আর পার্শ্বচাপের ফলে ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল উপরের দিকে—কালক্রমে এরাই সৃষ্টি করলো হিমালয় পর্বতশ্রেণী। উত্তরাংশের এই ভাঙ্গাগড়ার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই অঞ্চল ও তার আশেপাশের কয়েকটি স্থানে বিরাট বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এসব ফাটল দিয়ে পর পর কয়েকবার ব্যাসাল্টের আগ্নেয়োচ্ছ্বাস হয়েছিল—ছড়িয়ে পড়েছিল বোম্বাই, গুজরাট, কচ্ছ, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের প্রায় দু-লক্ষ বর্গমাইল জায়গায়। ১০,০০০ ফুট উঁচু এই স্তূপীকৃত লাভাকে ডেকান-ট্র্যাপ বলা হয়। উত্তর ভারতের একমাত্র হিমালয় অঞ্চল ছাড়া ভারতের আর কোথাও এত বড় অগ্ন্যুৎপাত হয় নি। ভূতাত্ত্বিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে দাক্ষিণাত্যের এ সব অঞ্চলে অম্লাত্মক, ক্ষারীয় এবং আরও নানান ধরণের শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া আরও জানা গেছে যে, দাক্ষিণাত্যের এই আগ্নেয়োচ্ছ্বাস বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পথে বেরিয়ে এসেছিল অনেকগুলি ধারায়। ডাঃ এল, এল, ফারমোরের মতে, ভূসাওয়ালে এইরূপ ২৯টি ধারার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও ওয়ধ ওয়ানে ৪৮টি (ডাঃ ওয়েষ্ট) এবং চিন্দোয়ারা জেলার লিংগা অঞ্চলে ৪টি ধারা রয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আর অম্লাত্মক শিলাগুলিকে উত্তর-দক্ষিণে বোম্বাই দ্বীপ সমেত উপকূলের সমান্তরালভাবে ও পূর্ব-পশ্চিমে নর্মদা উপত্যকা পথে পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, এই দুটি দিকে লম্বালম্বিভাবে দুটা বিরাট চ্যুতি (Fault) দেখা

* পুরাজীবীয়, মধ্যজীবীয় ও নবজীবীয় যুগের বয়সের হিসেব 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান,' জুলাই, ১৯৫৮ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

দিয়েছিল আর বেরিয়ে এসেছিল আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের অসংখ্য ঢেউ।

সর্বশেষে বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্বে যে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রয়েছে (Barren Island ও Narcondam Island), তারা এ-যুগের শেষভাগে পুনঃপুনঃ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি করেছে দুটি ছোট ছোট দ্বীপের। এখন এগুলি একেবারে শান্ত; কিন্তু কিছুকাল আগেও এগুলি থেকে লাভা ও ধূম বেরিয়ে আসবার সংবাদ পাওয়া গেছে। Barren Island-এর কেন্দ্রীয় মুখের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১,০১৫ ফুট। এথেকে শেষবারের মত ১৭৮৯, ১৭৯৫ ও ১৮০৩ সালে লাভা, ধূম, ভস্ম প্রভৃতি বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে।

পরিশেষে বেরারের বুলদানা জেলার লোনার হ্রদ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার; কারণ এটা নিয়ে ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে আজও মতভেদ রয়ে গেছে। ৩০০-৪০০ ফুট গভীর এই লবণাক্ত জলের হ্রদটি ডেকান-ট্র্যাপ শিলার মধ্যে একটি বিরাট গর্তের আকারে রয়েছে। এর চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য ব্যাসাল্টের টুকরা। অনেকের মতে, এটা অগ্ন্যুৎপাতের একটা মুখ ছিল এবং অতীতে এ-পথে বহুবার উপচে পড়েছে ব্যাসাল্টের ঢেউ। তবে এটুকু নিশ্চয় করে বলা যায় যে, আজ এটা মৃত—সম্পূর্ণ ই মৃত।

একমাত্র Barren ও Narcondam island এবং ভারত মহাসাগরের দু-এক স্থানে অগ্ন্যুৎপাতের আভাস পাওয়া ছাড়া সুদূর অতীতে যার সূচনা হয়েছিল তা আবার মানুষের জন্মের আগে, বহু আগেই যৌবনের মত্ততা হারিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। অনেকের মতে—ভারতে ভবিষ্যতে আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের আর কোন সম্ভাবনা নেই। তবে প্রকৃতি যদি আবার যৌবনের মাদকতা ফিরে পায়—যদি আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ঢেউ আবার ছেয়ে ফেলে ভারতের কোন অংশ, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক না কেন, এ সবের উপর তার কোন হাত নেই—কোনদিন থাকবেও না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কুলচিহ্ন সমন্বিত বর্ম অঙ্কিত যে ছোট পতাকাটি রকেটের সহিত চন্দ্র-পৃষ্ঠে পৌছিয়াছে—তাহার ছবি।

শিশু পক্ষাঘাত

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পলিওমায়েলাইটিস বা শিশু-পক্ষাঘাত অনেকের নিকট অতি আধুনিক ব্যাধি বলে মনে হতে পারে। কারণ সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে ১৮৮৭ সালের পর থেকে এই রোগের প্রকোপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে। মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই এই রোগের উদ্ভব হয়েছে। কারণ পলিও রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে মানুষের স্নায়ুর মধ্যে। গবেষণাগারে বিশেষ কৌশলে বানর, ইঁদুর প্রভৃতির দেহে এই জীবাণু সংক্রামিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে মানুষই একমাত্র জীব যাদের দেহে এদের আক্রমণ ও বিস্তার চলছে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে।

সেই সুদূর অতীতেও কয়েকদিন জ্বরে ভুগে রোগীর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটেছে। দেহের কোন অংশ ক্ষীণতর হয়েছে, পঙ্গু হয়ে গেছে চির জীবনের মত। আশেপাশের লোকজন হা-হুতাশ করেছে, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছেন চিকিৎসক।

এই অঙ্গ-বিকৃতির কথা প্রাচীন লেখক ও চিত্রকরেরা তাঁদের লেখা ও রেখায় মধ্যে রেখে গেছেন। আজ থেকে প্রায় ৩৫৫০ বছর পূর্বে মিশরের এক দক্ষ শিল্পী এক ধর্মীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য এঁকেছিলেন। এক মন্দিরের দিকে চলেছে অগণিত পুণ্যাকাঙ্খীর দল। মন্দিরের পুরোহিতের পূর্ণাবয়ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুরোহিতের বাঁ-পা-খানি শীর্ণ ও চলৎ-শক্তিহীন। এই চিত্র আজও পুরাকালের পলিও আক্রমণের এক সঠিক সাক্ষ্য বহন করেছে বলেই মনে হয়।

তারপর অনেক শতাব্দী গত হয়েছে। পলিও-জীবাণু মানুষের স্নায়ুতে আশ্রয় পেয়ে বেঁচে রয়েছে, সময় সময় মানুষের মৃত্যুর কারণও হয়েছে; মৃতের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই ছিল বেশী। পলিও রোগ তখনও ভয়ানক মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে নি। এ রোগ কি করে হয়, সে সম্বন্ধে চিকিৎসকদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। লোকে মনে করতো, দুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে হয়তো এ রোগ হয়েছে; কেউ ভাবতো, দূষিত দুধ হয়তো এ রোগের কারণ। নানারকম ওষুধ দেওয়া হতো, অবশ্য সবই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বার মত। কেউ ঠাকুরদেবতার চরণামৃত পান করতো, কেউ ওঝা ডেকে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করাতো।

মানব-সভ্যতায় শিল্পযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পলিও ব্যাধিরও বিস্তার ঘটতে লাগলো। ধীরে ধীরে পলিও আক্রমণের রূপ বিকট আকার ধারণ করলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমগ্র সভ্যজগৎ পলিও রোগের ভয়ে সচকিত হয়ে উঠলো। এক কালে লোকের ধারণা ছিল, পলিও রোগের শিকার হচ্ছে শিশুরা এবং এই ব্যাধিজনিত পক্ষাঘাত কিছুকাল পরে সেরে যায়। এ-ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হলো। দেখা গেল, ছোট-বড় সবাই এ রোগের শিকার হতে পারে।

১৮৮৭ সালে পলিও রোগ সর্বপ্রথম মহামারীর আকারে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে। এক দেহ থেকে অপর দেহে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এ ব্যাধি সংক্রামিত হলো। কেবল শিশুই নয়—কিশোর, যুবক ও বয়স্কেরাও হাজারে হাজারে এ ব্যাধির কবলে পতিত হতে লাগলো।

সময়ের পরিবর্তনে পলিও-জীবাণুতে কোন তারতম্য ঘটে নি—নতুনত্ব এসেছে মানুষের জীবন-যাত্রায়। শিল্পযুগে মানুষের ধনসম্পদের প্রাচুর্য হয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে, জীবনযাত্রার

মান হয় উচ্চতর। স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-ভাবে বসবাসের দিকে মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এতকাল অপরিচ্ছন্নতার সুযোগে পলিও-জীবাণু সহজেই মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারতো। পলিও-জীবাণু মানুষের দেহে তার নিজের শত্রু প্রতি-জীবাণু (Antibodies) সৃষ্টি করে মানুষকে এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার ফলে ও নানারকমের সাবধানতায় পলিও-জীবাণু শৈশব কাল থেকেই শিল্পোন্নত দেশের মানুষের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। জীবাণু প্রবেশ না করবার দরুণ এ রোগের প্রতি-জীবাণু তার দেহে সৃষ্টি হয় না। প্রতি-জীবাণুর অভাবে তার শরীরের পলিও-প্রতিরোধক ক্ষমতা ব্যাহত হয়ে থাকে। সে জন্যে পলিও-জীবাণু যখন তার দেহে প্রবেশ করে তখন তাকে কোন শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় না। এ-জন্যেই সভ্যসমাজে অবস্থাপন্ন পরিবারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। আধুনিক শহরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুও জন্ম থেকে হাসপাতালে অতি যত্নের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। চারদিকে রোগ প্রতিষেধকের সুবন্দোবস্ত, কোথাও রোগ-জীবাণুর সম্ভাবনা নেই। এ রকম সুস্থ পরিবেশ থেকে শিশু যখন বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসে তখন তার চারদিকে পলিও রোগের জীবাণু; অথচ এই ব্যাধি প্রতিরোধ করবার মত প্রতি-জীবাণু তার দেহে নেই। এই কারণে যতই দিন যাচ্ছে, পলিও ব্যাধির আক্রমণের তীব্রতা ও বিস্তার ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পলিও আক্রমণের ভয়ে সভ্য মানুষ আবার সামন্ত যুগে ফিরে যেতে পারে না। কারণ পলিও রোগ বৃদ্ধি পেলেও অনেক ব্যাধি আজ পরাস্ত হয়েছে। সভ্যতার দানে মানুষের পরমায়ু বেড়েছে, শিক্ষাদীক্ষা বিস্তৃততর হয়েছে। সভ্য মানুষ পলিও রোগের ভয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায় নি—পলিও রোগের কারণ জেনে তাকে পরাভূত করতে চেয়েছে।

১৮৪০ সালের পূর্বে শিশু-পক্ষাঘাত এক পৃথক রোগ হিসেবে গণ্য হয় নি। ১৮৪০ সালের পর থেকে চলে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণা—কি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব।

১৯০৮ সালে কার্ল ল্যাণ্ডষ্টাইনার মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের টিস্থ বা তন্তু বানরের দেহে ঢুকিয়ে সর্বপ্রথম বানরের পক্ষাঘাত সৃষ্টি করেন। বানর হচ্ছে একমাত্র পশু যার দেহে নিশ্চিতরূপে পলিও ব্যাধি সঞ্চারিত করা সম্ভব। খরগোসের দেহে পলিও ব্যাধি উৎপাদন করানো যায় বটে, কিন্তু অনেক সময় সে চেষ্টা সফল হয় না। কুকুর, বিড়াল ও গিনিপিগ প্রভৃতি এ রোগে মোটেই আক্রান্ত হয় না। দু-এক প্রকার ইঁদুরের দেহে কৃত্রিম উপায়ে এ রোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

১৯১০ সালে কার্ল ল্যাণ্ডষ্টাইনার প্রমাণ করেন যে, পলিও রোগের কারণ হচ্ছে ভাইরাস-জীবাণু। আকারে ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাস দৃষ্টিগোচর হয় না। ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ভাইরাসের ছবি তোলা যায়। ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপে কোন ক্ষুদ্র জিনিষকে লক্ষ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যায়। লক্ষ গুণ বর্ধিত আকারে পলিও-ভাইরাস অতি ছোট ছোট গুটিকার মত দেখায়। ভাইরাস-জীবাণুর দ্বারা সঞ্চারিত রোগের নাম হচ্ছে—টাইফাস, শিশু-পক্ষাঘাত, হাম, বসন্ত, জলবসন্ত প্রভৃতি। ভাইরাস জীবন্ত জীবকোষে বর্ধিত হয়; ব্যাক্টেরিয়ার মত মৃত পদার্থে ভাইরাস বাঁচতে পারে না। অজৈব পদার্থ, যেমন—সোডা, লবণ, চিনি প্রভৃতি বিশেষ অবস্থায় এক নির্দিষ্ট আকারে (ক্রিষ্টাল রূপে) থাকে, ভাইরাসকেও সময় সময় তেমনি নির্দিষ্ট আকারে সম্মিলিত হতে দেখা যায়। এ-জন্যে মনে করা হয় যে, প্রাণের লক্ষণ থাকলেও ভাইরাস অজৈব পদার্থ থেকে খুব উন্নত নয়। অজৈব পদার্থ

এবং জীবন্ত প্রাণীর মাঝখানে হচ্ছে ভাইরাসের স্থান।

পলিও রোগের উদ্ভব হতে পারে অনেক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে; তবে তিন প্রকারের ভাইরাসের আক্রমণই মারাত্মক হয়ে থাকে। ১৯৩১ সালে এই ভাইরাসগুলি আবিষ্কৃত হয়। এদের পার্থক্য ধরা পড়ে প্রটোপ্লাজমের গঠনে। ব্রুনহাইল্ড নামক একটি বানরের শরীরে একপ্রকার ভয়ানক পলিও ভাইরাস প্রথম বিশ্লেষিত হয়—সে জন্যে ঐ রকম পলিও-ভাইরাসের নাম হয়েছে ব্রুনহাইল্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লানসিঙ শহরে আর একপ্রকার ভাইরাস সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়—ঐ শহরের নামে এই ভাইরাসকে বলা হয় লানসিঙ। আর তৃতীয় প্রকার ভাইরাস ধরা পড়ে লিওন নামক এক ব্যক্তির দেহে। সে জন্যে এই ভাইরাসকে বলা হয় লিওন। পলিও রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে হলে এই তিন প্রকার ভাইরাসের প্রতিষেধক নেওয়া আবশ্যক।

পলিও-ভাইরাস পয়ঃপ্রণালী, মাছি এবং দূষিত খাদ্যদ্রব্য মারফৎ সংক্রামিত হয়ে থাকে। এ ব্যাধির সংক্রমণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি ও কাশি থেকে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেছে, স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, অর্থাৎ ৮০° ফারেনহাইটে পলিও-ভাইরাস দুধের ভিতর ৩০ দিন বেঁচে থাকতে পারে। জলও এ রোগের বাহক হতে পারে। মশা বা কীটের সাহায্যে এ ব্যাধি বিস্তৃত লাভ করে কিনা, তা এখনও জানা যায় নি।

পলিও মহামারীর সময় কয়েকটি নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ট্রাম-বাসের অতিরিক্ত ভীড়, সিনেমা হল প্রভৃতি পরিহার করা উচিত। অতিশয় পরিশ্রম করে স্নায়ুকে দুর্বল করা ঠিক নয়; কারণ দুর্বল স্নায়ুর পথ বেয়ে জীবাণু অতি সহজে দেহের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। আসন্ন-প্রসবাদের এ রোগে আক্রান্ত হবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। পলিও মহামারীর সময় দাঁত ফেলা, টন্‌সিল অপারেশন করা, ডিপথেরিয়া বা হুপিং কাশির টিকা নেওয়া উচিত নয়।

১৮৫০ সালের পর থেকে পলিও-ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি জানবার জোর চেষ্টা চলছে। এই ভাইরাস সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানারকম বিরুদ্ধ মতামত প্রাধান্য লাভ করেছে। পরবর্তী কালে বাস্তব পরীক্ষায় অনেক ধারণা বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ রোগ বংশ-পরম্পরায় বিস্তৃত হয়। কিন্তু এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের এই ভয়াবহ পলিও রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশী। এ-জন্যে পলিও রোগকে শিশুরোগ মনে করা হয়। এ কথা সত্য, শিশুদের ক্ষেত্রেই এ রোগের ফলাফল অত্যধিক মারাত্মক হয়ে থাকে, বটে, তবে কিশোর, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পূর্বে ধারণা ছিল, ৪০ বছরের বেশী হয়ে গেলে পলিও রোগের আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পায়। কথাটা পুরাপুরি সত্য নয়। চল্লিশের অধিক হলেও পলিও রোগে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে; বরং তখন আক্রান্ত হলে রোগীকে বাকী জীবন তার জের টানতে হয়।

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দূষিত পদার্থের মাধ্যমে এ রোগের ভাইরাস আমাদের নাক ও মুখ দিয়ে গলায় প্রবেশ করে। গলা পেরিয়ে খাদ্যবাহী নল দিয়ে এই ভাইরাস আমাদের দেহের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। রক্ত থেকে এই জীবাণু স্নায়ুকে আশ্রয় করে। স্নায়ুর পথ ধরে জীবাণু চলে যায় মস্তিষ্কে। পলিও রোগ স্নায়বিক ব্যাধি। মেরুদণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এই রোগ দেহের স্নায়ুগুলিকে প্রভাবিত করে। মগজের কয়েকটি স্নায়ু মস্তক কেন্দ্র থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংবাদ বহন করে আনে প্রয়োজনীয় কাজ করবার জন্যে। এগুলিকে বলা হয় মোটর নার্ভ। এদের দ্বারাই আমাদের দেহের বিভিন্ন

অঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। পলিও-ভাইরাস এই সব মোটর নার্ভ বিধ্বস্ত করে দেয়—দেহ তার চলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

আমাদের দেহে প্রবেশ করবার পর পাঁচ থেকে বারো দিন যাবৎ এই জীবাণু বংশবিস্তার করে। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সামান্য উত্তাপ লক্ষিত হয়। প্রথমে নাসিকায় ও গলদেশে ঠাণ্ডা লাগে, শরীরটা কেমন অসুস্থ বোধ হয়। সময় সময় পেটের গোলমাল হয়; কারণ পলিও-জীবাণু খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। জীবাণু তখন রক্তস্রোতে প্রবেশ করে' দেহের প্রত্যেকটি অংশে যাতায়াত করে। এই সময় জ্বরের মাত্রা বেড়ে ওঠে এবং বমির উদ্রেক হয়। অনেক সময় এই জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা ঠাণ্ডার দরুণ সাধারণ জ্বর বলে ভুল করা হয়। কারণ রক্ত পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পলিও রোগের লক্ষণ এ অবস্থায়ও ধরা পড়ে না। তা ছাড়া জ্বরের মাত্রা ১০১° ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী বড় ওঠে না। এরপর পলিও রোগের সবচেয়ে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে থাকে, অসহ্য মাথাব্যথা হয়, গলা ও পিঠ শক্ত হয়ে পড়ে। তারপর পক্ষাঘাত দেখা দেয়। পক্ষাঘাত কতদূর কি ভাবে বিস্তৃত হবে তা এখনও আধুনিক-বিজ্ঞানের বলার বাইরে রয়ে গেছে। আকস্মিক ভাবে পক্ষাঘাত হবার দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন কার্যকরী চিকিৎসা সম্ভব হয় না; কারণ রোগ নির্ণয়ের পূর্বেই রোগের ভয়ঙ্কর ফল প্রকটিত হয়ে পড়ে।

কিছুদিন দেহের বিভিন্ন অংশে ঘুরেফিরে পলিও-জীবাণু মেরুদণ্ডে এসে উপস্থিত হয়। মেরুদণ্ডের ভিতরকার কোষ এই জীবাণুর আক্রমণে বিনষ্ট হয়ে যায়। কোষ বিনষ্ট হলে নিকটবর্তী মাংসপেশীর কার্যকারিতা লুপ্ত হয়। সাধারণতঃ পলিও রোগে পা ও উরুর মাংসপেশী চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গের মাংসপেশীতেও গোলযোগ ঘটতে পারে। শ্বাসনালীর পেশী আক্রান্ত হলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়—তখন লৌহ-হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে রোগী কিছুকালের জন্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে বটে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অনেক সময় পলিও-জীবাণু মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ও একান্ত প্রয়োজনীয় কোষগুলি নষ্ট করে তীব্রতম পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়ে থাকে।

পলিও রোগে আক্রান্ত মাংসপেশী কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ঐ মাংসপেশীর কাজ অন্য মাংসপেশীকে করতে হয়—তাই সুস্থ পেশীর উপর অধিক চাপ পড়ে। এই অসম চাপের দরুণ দেহের হাড় বেঁকে যায়। শিশুর নরম হাড় অতি সহজেই বেঁকে অদ্ভুত আকারে পরিণত হয়। বয়স্ক লোকের শক্ত হাড়েও ধীরে ধীরে বিকৃতি ঘটে।

পক্ষাঘাত দুষ্ট অঙ্গ-বিকৃতির কোন সুচিকিৎসা ছিল না। বিশেষভাবে তৈরী যন্ত্রের সাহায্যে লোককে খুঁড়িয়ে চলতে হতো। অঙ্গ-বিকলতার স্বাক্ষর তাকে বহন করতে হতো সারা জীবন।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন নার্স কিন্তু এ দুরবস্থাটা স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না। তাঁর নাম এলিজাবেথ কেনি। পলিও রোগের ভয়াবহ পরিণামকে তিনি বিদূরিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পূর্বে মনে করা হতো, পলিও-জীবাণু মেরুদণ্ডের কোষ ধ্বংস করে দেবার ফলে আশেপাশের মাংসপেশী তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কেনি তাঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই মতবাদের বিরোধিতা করলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এই রোগে দেহের পেশী দুর্বল হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে—সংকোচনের ফলে রোগীর দেহে তীব্র যন্ত্রণা হয়—রোগী তখন দেহটাকে কুঁকড়ে ঐ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সংকোচন

দীর্ঘস্থায়ী হলে পেশীর স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। অতএব কেনির মতে, পেশীর সংকোচন ও বিকৃতির পর পক্ষাঘাত হয়, পক্ষাঘাতের পর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটে না।

এই মতবাদের ভিত্তিতে তিনি কোন পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অঙ্গের উপরকার ত্বকে উষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করতে লাগলেন। গরম জলে ডুবিয়ে জল নিঙরে নিয়ে একটি গরম পশমী কাপড় দূষিত অঙ্গের উপর লাগালেন। এভাবে দিনের পর দিন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে উষ্ণ প্রলেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে পেশী-সংকোচন সেরে গেল। অনেক শিশু আবার ভাল হয়ে উঠলো। দেখা গেল, সুস্থ হয়ে উঠলেও তারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। কেনি অনেক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অনেকদিন একটানা শায়িত অবস্থায় ছিল বলে পেশীর স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। অসীম ধৈর্য আর দরদের সঙ্গে রোগাক্রান্ত শিশুদের একটু একটু করে আবার ঠিকভাবে হাঁটানো হলো। এরপরও দেখা গেল, অনেক শিশুর পা ঠিকমত পড়ে না। কেনি ভাবলেন যে, তাদের মস্তিষ্ক হয়তো অঙ্গ-চালনায় সহায়তা করছে না; অনেকদিন ধরে নড়াচড়া বন্ধ ছিল বলেই এরূপ মানসিক বিরূপতার উদ্ভব হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠতে চাই অসীম উৎসাহের সঙ্গে অতি নিখুঁত উপায়ে শিশুকে অঙ্গ-চালনা করতে আবার শিখিয়ে নেওয়া। কাজটা অত্যন্ত কঠিন বটে, কিন্তু একটি শিশুর জীবনের মূল্য যে আরও অনেক বেশী।

কেনির এই মতবাদ ও তদনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা অষ্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ করে নি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতে দেখেছেন। তাই তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরাও একজন অতি সাধারণ নার্সের মুখের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। এবার আটলাণ্টিক মহাসাগর পেরিয়ে কেনি গেলেন আমেরিকায়। আমেরিকার কিছু লোক তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছিল এবং তাঁর উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া কয়েকটি হাসপাতালে পরীক্ষার পর চালু করা হয়েছিল।

কেনি এখন পরলোকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের জন্যে তাঁর আবেগভরা কণ্ঠ আজ নিস্তব্ধ। কিন্তু তিনি আজও বেঁচে আছেন অসংখ্য শিশুর মধ্যে, অগণিত লোকের নিত্য স্মরণে। এই মহিয়সী নারী কোন সম্মান চান নি, কোন অর্থের লিপ্সা তাঁর ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রত্যেক শিশুকে সুগঠিত মানুষে পরিণত করা। আজ তাঁর আবিষ্কৃত প্রণালী বিভিন্ন হাসপাতালে অনুসৃত হচ্ছে। মানব-সমাজ এই কল্যাণময়ী নারীকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে।

যাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা প্রবল, তারা পলিও রোগে আক্রান্ত হয়েও আবার সুস্থ-সবল হয়ে উঠতে পারেন। তারা পুনরায় এই রোগে সাধারণতঃ আক্রান্ত হন না। এ-রকম কয়েকজন পলিও রোগীর রক্ত-পরীক্ষায় জানা যায় যে, রক্তস্রোতে পলিও রোগ-বিরোধী সৈন্যদল গঠিত হয়—এদের বলা হয় প্রতি-জীবাণু। প্রতি-জীবাণু দীর্ঘকাল ধরে ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। এই ঘটনা আবিষ্কৃত হবার পর বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করতে লাগলেন, কি উপায়ে এমন রক্তমস্তু (Serum) প্রস্তুত করা যায়, যার সাহায্যে পলিও-ভাইরাসের আক্রমণ সহজেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে। চিকিৎসকেরা তাই পলিও রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন, এমন লোকের রক্ত পলিও রোগগ্রস্ত শিশু ও বয়স্ক লোকের দেহে সূচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক-বারই তাঁদের আশা ব্যর্থ হয়েছে।

পলিওর টিকা আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর প্রয়াস বলে গণ্য হয়েছে। পলিও টিকা তিন প্রকার মারাত্মক পলিও-ভাইরাস থেকে

প্রস্তুত করতে হয় নতুবা টিকার কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমিত থাকবে। টিকা ঠিকমত প্রস্তুত হলে রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হওয়া যায়; কিন্তু টিকায় সামান্য ত্রুটি থাকলে পক্ষাঘাত—এমন কি, মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, টিকায় কোন ফলই হলো না। অনেক প্রণালীতে টিকা তৈরী হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পলিও-জীবাণু বিভিন্ন তাপমাত্রায় রেখেছেন, বেগুনীপারের আলো ঐ জীবাণুতে প্রয়োগ করেছেন, কার্বলিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে জীবাণুকে টিকার উপযোগী করবার চেষ্টা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত টিকা প্রথমে প্রয়োগ করেছেন বানরের উপর, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে ডাঃ কোল্‌মার এবং ডাঃ রুল রেড়ির তেল থেকে প্রস্তুত সাবানে পলিও-ভাইরাস রেখেছিলেন। পরে ঐ পলিও-ভাইরাস তাঁরা বানরের দেহে ঢুকিয়ে দেখলেন যে, বানরের কোন ক্ষতি হয় নি এবং টিকা-নেওয়া বানর পলিও-জীবাণু থেকে অনাক্রম্য (immune) হয়েছে। তাঁরা জানতেন যে, পলিও টিকা সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহের শেষ নেই। তাই তাঁরা ঐ টিকা নিজেদের শরীরে প্রয়োগ করে নিশ্চিত হলেন যে, টিকার কোন কুফল নেই। অতঃপর তাঁরা দশ হাজার শিশু ও বয়স্ক লোকের উপর ঐ টিকা প্রয়োগ করেন। ঠিক এমন সময় ডাঃ ব্রডি ও ডাঃ পার্ক ফরম্যালডিহাইড সহযোগে একপ্রকার পলিও টিকা আবিষ্কার করেন এবং তাঁরাও দশ হাজার শিশুকে টিকা দেন। কিছুকাল পরে কয়েকটি শিশু পক্ষাঘাতে মারা যায় এবং কেউ কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজে পলিও টিকা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। কিছুদিন পর সন্দেহ এমন বিস্তার লাভ করে যে, দুটি টিকাই পরিত্যক্ত হয় এবং তাদের সঠিক মূল্য আজও নিরূপিত হয় নি।

গবেষকেরা প্রথম বানরের দেহে পলিও-ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দিতেন। কিছুকাল পরে বানরের দেহে পলিও রোগ দেখা গেলে তাকে মেরে ফেলা হতো। তারপর মৃত বানরের স্নায়ু থেকে পলিও-ভাইরাস বের করা হতো। মোটামুটি এই ছিল পরীক্ষার উপযোগী ভাইরাস সরবরাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অসুবিধা ছিল এই যে, ভাইরাস তৈরীতে অনেক সময় লাগতো এবং ভাইরাসও যথেষ্ট পাওয়া যেত না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ জন এন্ডার্স অনেক পরীক্ষার পর পলিও-ভাইরাস তৈরীর একটি সহজ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি দেখালেন যে, পলিও-ভাইরাস কেবল যে স্নায়ুতেই তৈরী করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি গবেষণাগারে টেষ্ট-টিউবে সাধারণ তন্তুতে পলিও-ভাইরাস প্রস্তুত করেন। দেখা গেল, বানরের কিডনী এ-ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী। এন্ডার্সের গবেষণায় একদিকে যেমন পলিও-ভাইরাস প্রাপ্তি ত্বরান্বিত হলো, অন্য দিকে প্রচুর পরিমাণ ভাইরাসও একবারে পাওয়া সম্ভব হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯৫৪ সালে এন্ডার্স নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

কিছুকাল পূর্ব থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌স্‌-বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস গবেষণাগারের কর্ণধার হিসেবে ডাঃ জোনাস সক পলিও-রক্তমস্ত আবিষ্কারের জন্যে পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করে ছিলেন। ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ সকের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় তাঁর উৎসাহ লক্ষিত হয়। প্রথমে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে ঐ রোগের টিকা প্রস্তুত করেন। পিট্‌স্‌বার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাঃ সক ও তাঁর সহকর্মীরা এন্ডার্সের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া অনুসারে পর্যাপ্ত পলিও-ভাইরাস প্রস্তুত করেন। পক্ষাঘাতের জন্যে দায়ী তিন প্রকার ভীষণ পলিও-ভাইরাস অন্যান্য নিরীহ

প্রকৃতির পলিও-ভাইরাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো।

দীর্ঘ দিনের সাধনায় ডাঃ সক এমন একটি রক্তমস্তু প্রস্তুত করেন, যাতে পূর্বোক্ত তিন প্রকার ভাইরাসই ছিল। ইঁদুর ও বানরের উপর প্রাথমিক পরীক্ষা সফল হলো। এরপর হচ্ছে মানুষের উপর এই রক্তমস্তুর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। সাধারণ লোকেরা তাঁর আবিষ্কার সন্দেহের চোখে দেখছিল। ১৯৫২ সালে মোট ১৬১ জনকে সক-আবিষ্কৃত টিকা দেওয়া হয়। এই দলে ছিলেন ডাঃ সক নিজে, তাঁর পত্নী ও তাঁদের তিন ছেলে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, এই টিকা মানুষের দেহে প্রতি-জীবাণু সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এর কোন বিষক্রিয়া নেই।

১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও পাঁচ লক্ষ লোককে এই টিকা দেওয়া হয়েছিল এবং এই টিকার কার্যকারিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯৫৫ সালে একদল বৈজ্ঞানিক এই টিকার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে এর উপকারিতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, পক্ষাঘাতসূচক পলিও রোগ আক্রমণের শতকরা ৮০-৯০টি ক্ষেত্রে এই টিকা রোগদমনে সফল হয়েছে।

১৯৫৫ সালে পলিও রোগের প্রাদুর্ভাব পর্যুদস্ত করবার জন্য লক্ষ লক্ষ শিশুকে সক্-টিকা দেবার বন্দোবস্ত হয়। ঐ সব শিশু পলিও রোগ থেকে অত্যন্ত নিরাপদ ছিল।

সক্-টিকার কার্যকারিতা প্রায় আড়াই বছর অটুট থাকে। আশা করা যায়, এই টিকা এমন উন্নত হবে যে, তিনবারের বদলে একবার দিলেই চলবে এবং কার্যকারিতা অনেক বেশী দিন স্থায়ী হবে। ডাঃ সক্ তাঁর আবিষ্কৃত টিকা সম্বন্ধে সুগভীর আস্থা পোষণ করেন। তাঁর জীবনে অসামান্য মেধার সঙ্গে মিলিত হয়েছে অসাধারণ কর্মশক্তি। বর্তমানেও তিনি প্রতিদিন ষোল ঘণ্টার অধিক গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন। তাঁর অতি সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় হচ্ছে কর্কট রোগ (ক্যান্সার)।

সক্-টিকা প্রস্তুতের প্রদ্ধতি অতিশয় জটিল। বানরের বৃক্ক (কিড্‌নী) গুঁড়া করে তার সঙ্গে এন্‌জাইম বেশ করে মিশানো হয়। বানরের বৃক্ক-তন্তু এখন কোষে পরিবর্তিত হয়। এই কোষগুলি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত এক দ্রবণে পরিপুষ্ট হতে থাকে। ঐ দ্রবণে বিভিন্ন ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড জাতীয় ৬৮টি পদার্থ থাকে। ঐ পুষ্টিকর দ্রবণে কোষগুলি অতি দ্রুতহারে বর্ধিত হয়।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত হবার পর এক পলিও রোগাক্রান্ত বানরের দেহ থেকে প্রাপ্ত ভাইরাস ঐ কোষগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। ভাইরাস ঐ সব কোষে সংখ্যায় তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে এবং চারদিনের মধ্যে সব কোষগুলি ভাইরাসের দৌরাত্ম্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবার ফরম্যালডিহাইড যোগ করা হয় ৯৮° ফারেনহাইট তাপমাত্রায়। ফরম্যালডিহাইড প্রায় সব ভাইরাসকেই মেরে ফেলে এবং যেগুলি মরে না তাদেরও রোগ-বিস্তারের ক্ষমতা লোপ পায়। তারপর আর কয়েকটি প্রক্রিয়ায় এই টিকা সংরক্ষিত করবার বন্দোবস্ত হয়।

পলিও টিকা তার পর পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিছু টিকা জীবকোষে রাখা হয়। কোষগুলি বেঁচে থাকলে বুঝা যায় যে, ভাইরাসের রোগ-বিস্তারের ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনবার একটি বানরকে টিকা দেয়া হয়। অবশেষে জীবন্ত পলিও-ভাইরাস বানরটির দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় এক মাস ধরে পরীক্ষা চলে, বানরের মেরুদণ্ডে পলিও-ভাইরাস পাওয়া যায় কিনা। বানরের দেহে পলিও-ভাইরাস যদি না পাওয়া যায়, তবেই টিকা মানুষের উপযোগী মনে করা হয়।

সক্-টিকার অপূর্ব সাফল্যের পরেও নানা কারণে

সাধারণ লোক এই টিকার ব্যাপারে আজও খুব আগ্রহ দেখায় না। কেউ মনে করে, পলিও-ভাইরাস তাকে আক্রমণ করবে না—পলিও-ভাইরাসের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস রয়েছে তার মনে। কেউ কেউ ভাবে, টিকার সঙ্গে পলিও-ভাইরাস তাদের দেহে ঢুকে পলিও রোগের সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ পয়সার অভাবেও এই টিকা নেয় না।

পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের সবচেয়ে আগে সক্-টিকা দেবার প্রয়োজন। কারণ তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। অথচ তাদের টিকা দেবার বেলায় আমাদের শৈথিল্যের তুলনা নেই।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু অঙ্গ-চালনা সম্বন্ধে একটি খুব আশাপ্রদ খবর এসেছে এক অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে। মার্কিন দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ ম্যাক্কিবেনের কন্যা ক্যারোন মাত্র আট বছরে পলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কন্যার পঙ্গু অবস্থা স্নেহবৎসল পিতৃহৃদয়কে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি দিনের পর দিন এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন, যার দ্বারা পঙ্গু অঙ্গের কাজ করা যাবে। বিশেষভাবে তৈরী একটি যন্ত্র গ্যাস নির্গমনের উপর নির্ভর করে হাতের আঙ্গুলের কাজ করতে সক্ষম হলো। প্রথমে অন্য হাত বা পা দিয়ে যন্ত্রটির সুইচ টিপে দিতে হতো। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যন্ত্রটিকে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ করা হয়েছে। পক্ষাঘাত-দুষ্ট অঙ্গ দিয়ে কোন কাজ করবার চিন্তা করলে সেই অঙ্গে যে সামান্য কম্পন হয়, তাতেই ঐ যন্ত্রের কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে যথেষ্ট। এ রকম যন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়ায়ও তৈরী হয়েছে। এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে পঙ্গু লোকেরাও স্বাভাবিক লোকের মত প্রায় সব কাজই করতে সক্ষম হবে।

পলিও রোগকে পরাস্ত করতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়াস আজ সফল হতে চলেছে। আমাদের জীবন থেকে পলিও রোগ একেবারে অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এ-সাধনা চলবে অবিচ্ছিন্নভাবে।
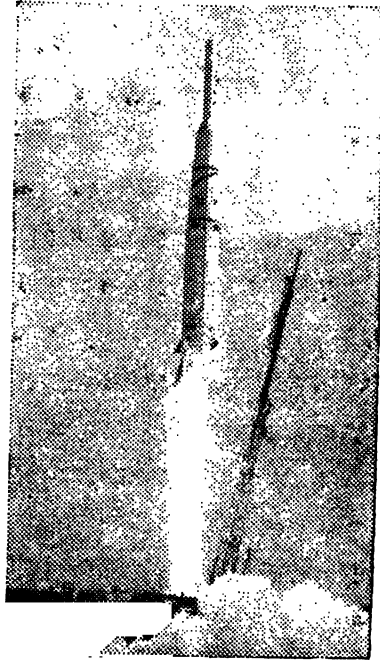
ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে ৯০ ফুট দীর্ঘ থর-এবল্-থ্রি রকেটের সাহায্যে প্যাডেল হুইলযুক্ত এক্সপ্লোরার-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করবার দৃশ্য।

পরমাণু-জগতের অন্তরালে

শ্রীসরোজকুমার দে

এই অনন্ত বিশ্বজগৎ পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এক একটি পরমাণু যে কত ক্ষুদ্র তা কল্পনা করা যায় তার পরিমাপে—প্রায় এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ! এত ক্ষুদ্র, তবু কত না বিস্ময়কর বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে এর মধ্যে! নানা দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় পরমাণু সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই তথ্য একদিনে জানা যায় নি। অনুসন্ধানী মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরমাণু সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছে। খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রাচ্যের দার্শনিকদের চিন্তাধারায় এই পরমাণুর অস্তিত্বের এক অস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিল। তারপর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে পরমাণু সম্পর্কে আরও উন্নত ধারণা গড়ে উঠেছিল। সে সময়ে তাঁদের বিশ্বাস ছিল—কোন বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে এমন এক অবস্থায় এসে পড়ে যখন আর ভাঙা সম্ভব হয় না। বস্তুটির সেই অতি ক্ষুদ্র অংশই হলো পরমাণু। 'অ্যাটম' কথাটি এসেছে গ্রীকদের কাছ থেকে; এর অর্থ হলো অবিভাজ্য, অর্থাৎ যা ভাঙা যায় না। ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ পরমাণুর অবিভাজ্যতা, আকৃতি, ভর ইত্যাদি বিষয়ে একটা অস্পষ্ট এবং কিছুটা ভুল বিবরণ প্রকাশ করে গেছেন। অবশ্য সেই প্রাচীন যুগে বর্তমানের ন্যায় বিজ্ঞানের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ছিল না। তবু সেই প্রাচীন মনীষিবৃন্দ সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির সাহায্যে পরমাণু সম্বন্ধে যে-ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, তাতে এ-যুগের মানুষ বিস্মিত না হয়ে পারে না।

পরমাণু সম্বন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে এরপর বেশ কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টায় ও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরমাণুর গঠন বৈচিত্র্য, প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে আজ মোটামুটি এক স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিচার করলে বলা যায়, পরমাণু-বিজ্ঞান কোন এক বিশেষ বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি। অনন্ত রহস্যময় পরমাণুর সম্বন্ধে একের আবিষ্কার অন্যের আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাই আজ বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, আইনষ্টাইন, টমসন, রঞ্জেন, কুরি-দম্পতি, রাদারফোর্ড, নিল বোর্, ফ্রেডারিক ও আইরিন কুরি, স্যাড্উইক, ফের্মি, লরেন্স, অ্যাণ্ডারসন প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। এঁরা একের পর এক পরমাণু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করে পরমাণু-জগতের বৈচিত্র্য উদ্ঘাটন করেছেন।

তখন ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ডব্লু. সি. রন্‌জেন সেই ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় এক নতুন রশ্মির সন্ধান পেলেন—যে রশ্মি বেরিয়াম প্ল্যাটিনো-সায়ানাইডের পাত্‌লা পর্দায় উপর পড়ে সবুজাভ প্রভা বিকিরণ করতে থাকে। সেই রশ্মি, তরঙ্গের দ্বারা না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা গঠিত, তখন তা জানা ছিল না। উপরন্তু এই রশ্মির বিভিন্ন প্রাকৃতিক ধর্মও ছিল অজ্ঞাত। সে জন্যে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় এক্স-রে বা অজ্ঞাত রশ্মি। গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন কঠিন বস্তুর সংঘর্ষে এক্স-রশ্মি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

১৯১২ সালে বিজ্ঞানী এম. ভি. লাউ-এর সহযোগিতায় ফ্রিড্‌রিচ ও নিপিং অনেক গবেষণার পর আবিষ্কার করেন যে, এক্স-রশ্মি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ আলোর ন্যায় এই রশ্মিরও প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ডিফ্র্যাক্‌শন সম্ভব। পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব অনুসন্ধানে এক্স রশ্মি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলা যায়।

এরপর ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন পরমাণুর অন্যতম অংশ ইলেকট্রন নামক মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন। ইলেকট্রন বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে এই ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ক্ষুদ্র মৌলিক কণিকা এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে আছে।

পরমাণু-বিজ্ঞানে নতুন প্রভাতের সূচনা হয়েছে বলা যায় রেডিও অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর থেকে। ফরাসী বিজ্ঞানী হেন্‌রী ব্যাকেরেল ১৮৯৬ সালে নব-আবিষ্কৃত এক্স-রশ্মির কাচের টিউবের দেয়ালে ফ্লোরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা এবং সূর্যরশ্মির প্রভাবে কয়েকটি বস্তুর ফস্‌ফোরেসেন্স বা অনুপ্রভার মধ্যে কি সম্পর্ক তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সে দিনের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সে জন্যে সূর্যরশ্মির অভাবে ব্যাকেরেল পরীক্ষণীয় ইউরেনিয়াম ও পটাসিয়াম সালফেট কাগজ মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দেন। সেই ড্রয়ারে ছিল কয়েকটি ফটোগ্রাফির প্লেট কালো কাগজে আবৃত। কয়েক দিন পর তিনি দেখলেন যে, সূর্যরশ্মির দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও কালো কাগজে মোড়া প্লেটগুলি অন্য একভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তখন তিনি অনুমান করলেন, অন্ধকারেও উপরিউক্ত সালফেট এমন এক শক্তিশালী রশ্মি বিকিরণ করে থাকে যা কালো কাগজ ভেদ করে প্লেটগুলিকে প্রভাবিত করেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁর এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ নিয়ে আরও গবেষণার পর তিনি দেখলেন যে, ইউরেনিয়াম থেকে স্বতঃই একপ্রকার রশ্মি বিকিরিত হয়ে থাকে, যার সঙ্গে অনুপ্রভার কোন সম্পর্ক নেই। এই রশ্মির নাম দেওয়া হলো ব্যাকেরেল রশ্মি—প:রে যার নাম হয় রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা।

সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী-দম্পতি পিয়ারে ও মাদাম কুরি পদার্থের এই তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৮৯৮ সালে পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম নামে দুটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কুরি দম্পতি আরও দেখেন যে, প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আপনা থেকেই শক্তিশালী রশ্মি বিকিরণ করে থাকে। ১৯০৩ সালে বিজ্ঞানী আর্ণষ্ট রাদারফোর্ড ও সডি আবিষ্কার করেন যে, কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে রশ্মি বিকিরিত হওয়ার সময় আল্‌ফা-রে (হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক), বিটা-রে (প্রায় আলোকের সমান গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন) ও গামা-রে (এক্স-রশ্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র তরঙ্গবিশিষ্ট আলোকের প্রায় সমধর্মী এক শক্তিশালী রশ্মি) নির্গত হয়। আল্‌ফা, বিটা ও গামা-রশ্মি মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল তেজস্ক্রিয় পদার্থটিরও পরিবর্তন হতে থাকে এবং সর্বশেষে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অন্য এক স্থায়ী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়, যখন আর উপরিউক্ত রশ্মিগুলি নির্গত হয় না। উপরন্তু পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা হলো সম্পূর্ণরূপে পরমাণুর কেন্দ্রকের একটি বিশেষ ক্রিয়া।

এর বছর দুই পরে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময় হয়ে বিরাজ করছে। ১৯০৫ সালে তিনি স্পেশাল থিওরি অব্ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিজ্ঞান-জগতের সামনে উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বেই তিনি বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$-এর মাধ্যমে বস্তুর ভর ও শক্তির অভিন্নতা বা পারস্পরিক সম্বন্ধের সূত্র আবিষ্কার করেন।

সমীকরণের E হলো শক্তি, m হলো ভর এবং c হলো সেকেণ্ডে আলোকের গতিবেগ। কোন বস্তুর ভর শক্তিতে বা শক্তির ভরে রূপান্তর ঘটে থাকে অবিচ্ছিন্নভাবে; বস্তুর ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এক গ্র্যাম কোন বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ৬×১০^{২৬} মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পাওয়া যায়। আইনষ্টাইনের এই সমীকরণ পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে কেবল সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, উপরন্তু নানাবিধ সমস্যার নিখুঁত সমাধানেও সক্ষম হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রের সাফল্যের পিছনে ঐ সমীকরণের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রথম পদক্ষেপ রাদারফোর্ডের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। পাত্‌লা ধাতুর পাতের দ্বারা আল্‌ফা কণিকার 'স্ক্যাটারিং' অর্থাৎ বিচ্ছুরণ সম্পর্কে পরীক্ষা করে ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড দেখান যে, পরমাণুর মোটামুটি দুটি অংশ। একটি হলো ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রক, যার পরিমাপ হলো প্রায় ১০$^{-১২}$ সেন্টিমিটার এবং অপর অংশটি হলো ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন, যারা কেন্দ্রকের চারদিকে অবিরাম ঘূর্ণায়মান। এই সময়ে রাদারফোর্ড প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎস থেকে উৎপন্ন শক্তিশালী আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে ইলেকট্রনটি বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং এই থেকে প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক হলো ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত 'প্রোটন' নামক একপ্রকার কণিকা যা ইলেকট্রন অপেক্ষা ওজনে কয়েক শত গুণ ভারী। কিন্তু রাদারফোর্ডের এই পরমাণু গঠন-তত্ত্বে ইলেকট্রনগুলির কেন্দ্রকের বাইরে অবস্থান এবং পরমাণুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা রয়ে গেল।

১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী নিল বোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি দেখান যে, ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের চারপাশে কোয়ান্টাম সর্ত অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে বেড়ায়। এই সময় নিল বোর 'বর্ণালী রেখার উৎপত্তি'র তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তিনি দেখান যে, কোন ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে আসবার সময়েই কেবলমাত্র শক্তির বিকিরণ হয় এবং তখন বর্ণালী রেখার উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার বর্ণালী রেখা দেখা যায়। বিজ্ঞানী বোরের পর আরও অনেক উন্নত গবেষণার সাহায্যে বহু জটিল বর্ণালী সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সমারফেল্ড, উলেনবেক, পাউলি, ষ্টার্ণ, গেলার্ক প্রভৃতি যেসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তার ফলে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথে অবস্থিতি ও সঙ্গে সঙ্গে জটিল বর্ণালী রেখার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

নিউট্রন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পরমাণু কেবল প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৩০ সালে বোথে ও বেকার নামক জার্মান বিজ্ঞানীদ্বয় ৫ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকার দ্বারা বেরিলিয়াম ধাতুকে আঘাত করে দেখেন যে প্রায় ৭ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন ভেদকারী একপ্রকার রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। তাঁরা এই রশ্মিকে অনেকটা গামা রশ্মির ন্যায় ধারণা করে নিলেন। ১৯৩২ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী-দম্পতি জোলিও ও আইরিন কুরি এই বিকিরিত রশ্মির সাহায্যে পদার্থের রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। তাঁরা দেখলেন—ঐ বিকিরিত রশ্মি প্যারাফিন, জল, কাগজ, সেলোফেন প্রভৃতি থেকে অতি দ্রুত শক্তিসম্পন্ন প্রোটন মুক্ত করতে সক্ষম। প্যারাফিন থেকে মুক্ত প্রোটনের শক্তি দেখা গেল ৫ মি. ই. ভো.। কিন্তু গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে জানা গেল, ঐ

বিকিরিত রশ্মি যদি গামা রশ্মি হয় তাহলে তার শক্তি অন্ততঃ ৫০ মি. ই. ভো. হলে তবে সেটি ৫ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন প্রোটন মুক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঐ বিকিরিত রশ্মি প্রায় ৭ মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং এটি যে গামা রশ্মি নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিজ্ঞানী শ্যাড্উইক এই সমস্যার সমাধান করেন ১৯৩২ সালে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, ঐ নতুন রশ্মি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা দ্বারা গঠিত। শ্যাড্উইক এই কণিকার নাম দিলেন নিউট্রন। নিউট্রন, প্রোটনের সমভরসম্পন্ন এক অস্থায়ী কণিকা। এইভাবে পরমাণুর অন্তর্গত আর একটি কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এই নিউট্রন কণিকা প্রোটনের সঙ্গে পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থান করে।

এখন মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, পরমাণু অবিভাজ্য বা বস্তুর শেষ অবস্থা নয়। পরমাণুর গঠনের কথা বলতে গেলে প্রধানতঃ তাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—একটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক, অপরটি ইলেকট্রন। কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটন ও ইলেকট্রন যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। একটা ইলেকট্রনের ওজন হলো প্রায় ৯×১০^{-২৮} গ্র্যাম। একটি প্রোটনের ওজন $১\cdot৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম ও একটি ইলেকট্রনের সমান তড়িৎযুক্ত, অর্থাৎ $৪\cdot৮ \times ১০^{-১০}$ ই. এস. ইউ। একটি নিউট্রন একটি প্রোটন অপেক্ষা ওজনে সামান্য ভারী।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। অবশ্য সর্বদাই ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান সংখ্যায় অবস্থান করে, যার ফলে সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণু-ইলেকট্রনের মোট ঋণাত্মক তড়িৎ ও প্রোটনের মোট ধনাত্মক তড়িৎ-এর সমন্বয়ে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়। একটি পরমাণুকে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগতের মত কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন, সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহগুলি পরিভ্রমণ করে, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রকে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে তত সংখ্যক ইলেকট্রন কেন্দ্রকের চারপাশে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন, অক্সিজেনের ৮টি প্রোটন ও ৮টি ইলেকট্রন, ইউরেনিয়ামের ৯২টি প্রোটন ও ৯২টি ইলেকট্রন··· ইত্যাদি।

পরমাণুর ভর নির্ভর করে তার কেন্দ্রকের ভরের উপর। কেন্দ্রকের ভর প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভরের সমান। সাধারণতঃ একটি পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সমসংখ্যক বা অধিক নিউট্রন থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রকের ভরের পার্থক্য দেখা যায়। সে জন্যে এদের বলা হয় আইসোটোপ। কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার দরুণ ভরের এই পার্থক্য হয়ে থাকে। একই পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশী হয়। আজ পর্যন্ত সবগুলি মৌলিক পদার্থের প্রায় আট শত আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবগুলিই প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায় না; বর্তমানে কৃত্রিম উপায়েও অনেক অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

শ্যাড্উইক কর্তৃক নিউট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণু-বিজ্ঞানের এক যুগান্তর এসেছে বলা যায়। সেই সময় থেকে পর পর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের পশ্চাতে নিউট্রন এক বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে অতি ক্ষুদ্র এই পরমাণুর যে অনন্ত বৈচিত্র্য বিজ্ঞান-জগতের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ না হয়ে পারে নি। ট্র্যান্স্মিউটেশন বা পরমাণু-কেন্দ্রকের রূপান্তর এমনি এক অবিস্মরণীয়

আবিষ্কার। কেন্দ্রকের রূপান্তরের অর্থ হলো একটি মৌলিক পদার্থকে অপর একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত করা। এ যেন সেই পরশ পাথরের স্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতুকে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করা। সত্যই বিজ্ঞানের বলে তাও অসম্ভব নয়, যদিও এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক।

কেন্দ্রকের রূপান্তরের মূলে সর্বপ্রথম অবদান রয়েছে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের। তিনি ১৯১৯ সালে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎস থেকে মুক্ত আল্‌ফা কণিকার আঘাতে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রককে অক্সিজেনের (আইসোটোপ) কেন্দ্রকে পরিণত করতে সক্ষম হন। উপরন্তু এই প্রক্রিয়ায় একটি শক্তিশালী প্রোটনও মুক্ত হতে দেখা যায়। রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি হাল্‌কা মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন দুটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তেমনি কেন্দ্রকের রূপান্তর নামে এক নতুন অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়ার জন্ম হলো। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শক্তিরও জন্ম হয় এবং এই শক্তির পরিমাণ আইনষ্টাইনের 'ভর ও শক্তি সূত্রের' সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। রাদারফোর্ড প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎস থেকে নির্গত আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হন। কিন্তু বর্তমানে আল্‌ফা কণিকা, প্রোটন, ডয়টেরন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতি মৌলিক কণিকাকে কৃত্রিম উপায়ে সাইক্লোট্রন, সিনক্রোসাইক্লোট্রন, বিটাট্রন, প্রোটন-সিনক্রোট্রন বা বিভাট্রন প্রভৃতি অ্যাকসিলারেটর বা ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী করবার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব যন্ত্রের উদ্ভাবনে বিজ্ঞানী ই. লরেন্স্‌, ওয়াল্টন, ডি. কার্ষ্ট, ম্যাকমিলান প্রভৃতির অবদান পরমাণু-বিজ্ঞানকে অনেক অগ্রগামী করে দিয়েছে। উপরিউক্ত পন্থায় প্রাপ্ত শক্তিশালী মৌলিক কণিকার সাহায্যে বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রককে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রকের কৃত্রিম রূপান্তর প্রক্রিয়া সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে মন্থর গতি-সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা। বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষতার দরুণ নিউট্রনকে ভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো হয়। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রকের রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শক্তি, ধর্ম ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়ে থাকে আয়নাইজেসন চেম্বার, ক্লাউড্‌ চেম্বার, গাইগার কাউণ্টার, ফটোগ্রাফিক ইমালসন প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্র ও উন্নত পন্থার সাহায্য গ্রহণ করে।

কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রকের রূপান্তর সম্বন্ধে গবেষণাকালে আরও কয়েকটি বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা, ট্র্যান্স-ইউরেনিক এলিমেণ্ট অর্থাৎ ইউরেনিয়ামপারের মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি ও নিউক্লিয়ার ফিসন বা কেন্দ্রকের বিভাজন তাদের অন্যতম।

১৯৩৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী-দম্পতি ফ্রেডারিক জোলিও কুরি ও আইরিন কুরি 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা' আবিষ্কার করেন। তাঁরা আল্‌ফা কণিকার দ্বারা বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি হাল্‌কা মৌলিক পদার্থকে আঘাত করবার পর উৎপন্ন নিউট্রন কণিকা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তখন লক্ষ্য করেন যে, আল্‌ফা কণিকার উৎস সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও আঘাতপ্রাপ্ত মৌলিক পদার্থগুলি থেকে একপ্রকার রশ্মির বিকিরণ হচ্ছে। পরীক্ষান্তে তাঁরা নির্ণয় করেন—ঐ বিকিরিত রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন—যার নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। যেমন প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিটা কণিকা নির্গত হয়ে থাকে, তেমনি এ-ক্ষেত্রে কয়েক মিনিটব্যাপী পজিট্রন নির্গত হয়ে থাকে। উপরন্তু প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার ন্যায় এই প্রক্রিয়াও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কমে যায়। এই থেকে বিজ্ঞানীদ্বয় স্থির

করেন যে, এই প্রক্রিয়ার ফলে অস্থায়ী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয়েছে, যা থেকে পজিট্রন মুক্ত হয়ে স্থায়ী অন্য এক কেন্দ্রকে পরিণত হচ্ছে। যেমন, বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামকে আল্‌ফা কণিকা দ্বারা আঘাত করলে যথাক্রমে প্রথমে অস্থায়ী রেডিও নাইট্রোজেন ও রেডিও ফস্‌ফরাসের কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয়। তারপর সেগুলি থেকে পজিট্রন মুক্ত হয়ে যথাক্রমে স্থায়ী কার্বন ও সিলিকন কেন্দ্রকে পরিণত হয়। এইভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হলো।

জোলিও এবং আইরিন কুরি কর্তৃক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই সম্বন্ধে গবেষণা স্থরু করেন। গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হলো যে, কেবলমাত্র আল্‌ফা-কণিকার আঘাতেই নয়—প্রোটন, ডয়টেরন এবং নিউট্রন দ্বারা আঘাত করেও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়া পজিট্রনের পরিবর্তে কয়েক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনও মুক্ত হয়ে থাকে। এই সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বলা হয় রেডিও আইসোটোপ। আজ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে পাঁচ শতেরও অধিক বিভিন্ন রেডিও আই-সোটোপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে রেডিও আইসোটোপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং নানাবিধ শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিউট্রন আবিষ্কারের পর প্রখ্যাত ইটালীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি প্রায় সব মৌলিক-পদার্থের উপর নিউট্রন প্রয়োগ করে কি ফলাফল হয়, তা নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। তিনি দেখলেন, পরমাণুর কেন্দ্রক অধিকসংখ্যক নিউট্রন ধারণ করবার ফলে কখনও কখনও অস্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হয় এবং সেটি স্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হবার কালে বিটা-কণিকা মুক্ত করে। এর ফলে মূল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা এক এক করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ফের্মি ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন প্রয়োগ করে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অধিক পারমাণবিক সংখ্যা-যুক্ত নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। এই ভাবে ১৯৩৩ সালে জন্ম হলো ট্র্যান্সইউরেনিক এলিমেণ্ট বা ইউরেনিয়ামপাড়ের মৌলিক পদার্থ। তখনও পর্যন্ত ইউরেনিয়ামই ছিল পিরিয়ডিক টেবলের শেষ মৌলিক পদার্থ, যার পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৯২। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ন্যাপ-চুনিয়াম (৯৩), প্লুটোনিয়াম (৯৪), আমেরিসিয়াম (৯৫), কুরিয়াম (৯৬), বার্কেলিয়াম (৯৭), ক্যালি-ফোর্ণিয়াম (৯৮), আইনষ্টেনিয়াম (৯৯), ফের্মিয়াম (১০০), মেণ্ডেলেভিয়াম (১০১), নোবেলিয়াম (১০২) —এই সব ট্র্যান্সইউরেনিক এলিমেণ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এগুলি খুবই অস্থায়ী এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভিন্ন রকম স্থায়ী মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়।

নিউক্লিয়ার ফিসন বা পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড পরমাণু-শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে। ফের্মি কর্তৃক ট্র্যান্সইউরেনিক এলিমেণ্ট আবিষ্কারের পর ফ্রান্সে জোলিও কুরি ও স্যাভিচ, জার্মেনীতে অটো হান, মাইটনার ও ষ্ট্র্যাসম্যান এই সম্বন্ধে আরও উন্নত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী হান ও ষ্ট্র্যাসম্যান ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে আবিষ্কার করেন—ইউরেনি-য়াম কেন্দ্রকটি ভেঙে গিয়ে দুটি পৃথক ও প্রায় সমান ভরসম্পন্ন বেরিয়াম ও ক্রিপটন নামক আইসো-টোপের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সাধারণ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাতে যে পরমাণু কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয় তাতে মূল পরমাণু অপেক্ষা তার পারমাণবিক সংখ্যা ও পার-মাণবিক ভরের খুব সামান্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাছাড়া সে ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে প্রোটন, নিউট্রন বা আল্‌ফা কণিকা মুক্ত হয়ে যায় এবং মাত্র ১০

থেকে ৩০ মি. ই. ভো. পরমাণু শক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু উপরিউক্ত কেন্দ্রকের বিভাজন প্রক্রিয়ায় মূল কেন্দ্রকটি প্রায় দুটি সমান অংশে ভেঙে যায়, উপরন্তু প্রায় ২০০ মি. ই. ভো. পরমাণু শক্তিরও উদ্ভব হয়।

পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানাগারে এই নিয়ে উন্নত ধরণের গবেষণা চলতে থাকে। বিজ্ঞানী বোর্ ও হুইলার গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখালেন যে, কেবল ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেই বিভাজন সম্ভব। আরও জানা গেল, ইউ-রেনিয়াম (২৩৪, ২৩৫, ২৩৮) আইসোটোপের মধ্যে ইউ-২৩৫কে মন্থর গতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে বিভাজন প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়। তাছাড়া থোরিয়াম এবং প্রোট্যাক-টিনিয়ামও নিউট্রনের আঘাতে বিভাজিত হয় এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯ বিভাজনের ক্ষেত্রে ইউ-২৩৫ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী।

কেন্দ্রকের বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে বিরাট পরমাণু-শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। গবেষণান্তে আবিষ্কৃত হলো যে, ইউরেনিয়ামের প্রতি বিভাজিত অংশ থেকে গড়ে একটির অধিক দ্রুতগামী নিউট্রন মুক্ত হয়ে থাকে। এই মাধ্যমিক নিউট্রন আবার অন্য ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে বিভাজিত করতে সক্ষম, যার ফলে পুনরায় নিউট্রন মুক্ত হয়ে থাকে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে নিউট্রনের সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে বিভাজন ক্রিয়াও বৃদ্ধি পেতে থাকে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ পদার্থটি বিভাজিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড পরমাণু-শক্তিও উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে, এক ঘন মিটার ইউরেনিয়াম অক্সাইড ০·০১ সেকেণ্ডে এক লক্ষ কোটি কিলোওয়াট আওয়ার শক্তি উৎপন্ন করে। এই 'চেন রিয়্যাকসন' বা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে বর্তমানে কেন্দ্রকের বিভাজন-উদ্ভূত পরমাণু-শক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া পারমাণবিক চুল্লী বা রিয়্যাক্টরের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণেও এই পরমাণু-শক্তিকে নিয়োজিত করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানীদের গভীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তর্দেশ অনুসন্ধান কালে সন্ধান পেয়েছিল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকাগুলির। কিন্তু পরমাণু-কেন্দ্রকের মধ্যভাগে যে পরম বিস্ময় ও অনন্ত বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে নিরলস গবেষণার ফলে আরও কয়েকটি মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। পজিট্রন, মেসন, হাইপারন ইত্যাদি কয়েক প্রকার মৌলিক কণিকার আবিষ্কার গত ত্রিশ বছরের মধ্যে সম্ভব হয়েছে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই কণিকাগুলি মূলতঃ পরমাণুর অংশ নয়। পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে বিভিন্ন শক্তিশালী কণিকার সংঘর্ষে কেন্দ্রকের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাথেকে উদ্ভূত শক্তির রূপান্তরের ফলে ঐ সব কণিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পূর্বে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আলোচনার সময় পজিট্রন কণিকার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এরও আগে ১৯৩২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডার-সন মেঘ-কক্ষের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণাকালে পজিট্রন কণিকা আবিষ্কার করেন। অ্যাণ্ডারসন মেঘ-কক্ষটিকে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের মধ্যে স্থাপন করে ছবি তুলে কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, একই বিন্দু থেকে দুটি কণিকার রেখা বেরিয়ে চুম্বক-ক্ষেত্রের দরুণ বিপরীত দিকে বেঁকে গেছে। এই ছবি থেকে ধারণা করে নেওয়া যায় যে, কণিকা দুটির একটি ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত, যা প্রথমে ইলেকট্রন ও প্রোটন বলে ভ্রম হয়েছিল।

কিন্তু চুম্বকক্ষেত্রের দিক, কণিকা কোন্ দিকে বেঁকেছে এবং উপর না নীচে থেকে আসছে ইত্যাদি নির্ণয় করে পরে স্থিরীকৃত হলো যে, কণিকা দুটির একটি ইলেকট্রন হলেও অপরটি প্রোটন নয়—ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত অন্য এক নতুন কণিকা। এই সময়ে অ্যাণ্ডারসন একটি বিশেষ অবস্থায় একটি মাত্র এমনি কণিকার ছবি তুলতে সক্ষম হলেন, যে কণিকাটি ছয় মিলিমিটার পুরু সীসার পাত্ ভেদ করতে সক্ষম। ছবিটি লক্ষ্য করে দেখা গেল, নীচের চেয়ে সীসার পাতের উপরে কণিকাটি চুম্বকক্ষেত্রের দ্বারা বেশী বেঁকেছে। এথেকে ধারণা করা হলো, কণিকাটির গতি নীচ থেকে উপরের দিকে এবং সীসার পাত্ ভেদ করবার কালে তার বেশ শক্তি ক্ষয় হয়েছে। উপরন্তু এই কণিকা কোন্ দিকে কতখানি বেঁকেছে এবং প্রোটন কণিকা-সৃষ্ট রেখার চেয়ে এই কণিকা-রেখার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ইত্যাদি নির্ণয় করে অ্যাণ্ডারসন নিশ্চিত হলেন যে, এটি এক নতুন কণিকা—ইলেকট্রনের প্রায় সমভর ও সমান ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত। এই কণিকার নাম দেওয়া হলো পজিট্রন। ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট ও অচিআলিনি গাইগার কাউণ্টারযুক্ত মেঘ-কক্ষের সাহায্যে পরীক্ষা করে পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হলেন। মহাজাগতিক রশ্মি ছাড়াও পজিট্রনের সাক্ষাৎ আরও কয়েকক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মির সঙ্গে কোন বস্তুর সংঘর্ষে একই বিন্দু থেকে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন নির্গত হয়, যাকে বলা হয়, পেয়ার প্রোডাকসন। পজিট্রনের আয়ুষ্কাল খুবই কম এবং তারপরই একটি পজিট্রন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ফটোন বা বিকিরণ কণিকায় পরিণত হয়, যাকে বলা হয়—অ্যানিহিলেসন।

১৯৩৭ সালে বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডারসন ও নেদারমেয়ার মেঘ-কক্ষের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণাকালীন আর একটি নতুন মৌলিক কণিকার সন্ধান পান। এই কণিকার ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২০০ গুণ এবং কণিকাটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে। মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত কণিকা-সৃষ্ট মেঘ-কক্ষের রেখা বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ রেখার দৈর্ঘ্য, চুম্বকক্ষেত্রের দ্বারা রেখাটি কতখানি বেঁকেছে, কণিকার আয়নিত করবার ক্ষমতা ইত্যাদি সূক্ষ্মরূপে পর্যালোচনা করে এই কণিকার আবিষ্কার সম্ভব হয়। এই নতুন কণিকার নাম মেসন, অর্থাৎ মাঝামাঝি ভরবিশিষ্ট এক কণিকা। সাধারণতঃ প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত শক্তিশালী প্রোটনের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন পরমাণু কেন্দ্রকের সংঘর্ষের ফলে মেসন সৃষ্টি হয়।

মেসন আবিষ্কারের দুই বছর পূর্বে জাপানী পদার্থ-বিজ্ঞানী ইউকাওয়া 'অতি ক্ষুদ্র সীসার আন্তঃকেন্দ্রীন শক্তির' প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণকালে মেসনের ন্যায় এক ভারী কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি দেখান যে, কেন্দ্রকের প্রোটন-প্রোটন, নিউট্রন-নিউট্রন, প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে পরস্পর একপ্রকার কণিকার মাধ্যমে শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে—যার ফলে কেন্দ্রক স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। ইউকাওয়া বর্ণিত কণিকার ভরও প্রায় ইলেকট্রনের ভরের ২০০ গুণ এবং ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত।

আজ পর্যন্ত কয়েক শ্রেণীর মেসন আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী সি. এফ. পাওয়েল ১৮৪৬ সালে সমুদ্র-পৃষ্ঠের অনেক উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে প্রেরিত ফটোগ্রাফিক ইমালসনে মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত কণিকা-সৃষ্ট রেখা পরীক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন ভরবিশিষ্ট তিন প্রকার মেসনের সন্ধান পান। এদের পাই-মেসন, মিউ-মেসন ও নিউট্র্যাল মেসন বলা হয়। পাই-মেসন অতি অল্প আয়ুষ্কালের (২.৬×১০^{-৮}) পরেই মিউ-মেসন ও নিউট্র্যাল মেসনে পরিণত হয়। পাই-মেসনের ন্যায় মিউ-মেসনও ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে

এবং অল্প আয়ুষ্কাল পরেই (২×১০^{-৬} সে.) একটা ইলেকট্রন্ বা পজিট্রন এবং নয়ট্রিনোতে (অতি অল্প ভরবিশিষ্ট ও বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ এক কণিকা) পরিণত হয়। এছাড়া ইলেকট্রনের প্রায় ১০০০ গুণ ভরবিশিষ্ট টাউ-মেসন, থিটা-মেসন, কাপ্পা-মেসন, সাই-মেসন ইত্যাদি আরও কয়েক শ্রেণীর মেসনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

মাত্র কয়েক বছর পূর্বে প্রোটন অপেক্ষা ভারী হাইপারন নামক আর একপ্রকার কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণাকালে রচেষ্টার ও বাট্লার নামক বৃটিশ পদার্থ বিজ্ঞানীদ্বয় ১৯৪৯ সালে ইলেকট্রনের প্রায় ২২০০ গুণ ভরবিশিষ্ট এই হাইপারন কণিকা আবিষ্কার করেন। হাইপারন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত বা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে এবং এর গড় আয়ুষ্কাল প্রায় এক সেকেণ্ডের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এটি সাধারণতঃ একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রন ও একটি ঋণাত্মক বা একটি ধনাত্মক পাই-মেসনে পরিণত হয়।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক যথাক্রমে প্রোটন ও আল্ফা কণিকা। আরও যে মৌলিক পদার্থ আছে তাদের পরমাণুগুলি সব ইলেকট্রন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ কেবল তাদের কেন্দ্রকগুলি সাধারণ পার্থিব অবস্থায় সাধারণতঃ থাকে না। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় তত তার কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যা বা ধনাত্মক তড়িতাবেশও বৃদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু পার্থিব অবস্থায় এত বেশী ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রক পৃথক হয়ে থাকতে পারে না—সর্বদাই আশেপাশের ইলেকট্রন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্র্যাড্ট্, পিটার্স প্রভৃতি কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী প্রায় ২৮ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে ফটোগ্রাফিক ইমালশন প্রেরণ করে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ভারী কেন্দ্রকের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন—যে কেন্দ্রক থেকে সব ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরূপ ভারী কেন্দ্রকের নাম দেওয়া হয়েছে হাইপার ফ্র্যাগমেণ্টস্ বা ভারী কেন্দ্রক। তবে আয়রন অপেক্ষা ভারী কেন্দ্রকের অস্তিত্ব খুব কম। সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক, অর্থাৎ প্রোটন এবং তার পরই হিলিয়াম কেন্দ্রক অর্থাৎ আল্ফা কণিকা। আজকাল ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে মেসন, হাইপারন ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পরমাণু-জগতের আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিপরীত মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব। যেমন, পজিট্রন হচ্ছে ঠিক ইলেকট্রনের বিপরীত এক কণিকা; তাই পজিট্রনের আর এক নাম অ্যান্টি-ইলেকট্রন। ১৯৫৫ সালে অ্যান্টি-প্রোটনের সন্ধানও পাওয়া গেছে—যেটি প্রোটনের সমভর-বিশিষ্ট, কিন্তু ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত। অ্যান্টি-প্রোটন আবিষ্কারের পর নিউট্রনের বিপরীত এক কণিকা, অর্থাৎ অ্যান্টি-নিউট্রনের অস্তিত্বও ১৯৫৭ সালে আবিষ্কৃত হয়—যার ভর নিউট্রনের সমান, কিন্তু তার ম্যাগ্নেটিক মোমেণ্ট ঠিক বিপরীত। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা অ্যান্টি-অ্যাটম বা বিপরীত পরমাণুর অস্তিত্বও কল্পনা করছেন।

পরমাণু-জগতের অন্তরালে যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে তার মোটামুটি আলোচনা এখানে করা হলো। অসীম বিশ্বজগতের ন্যায় একটি পরমাণুও অনন্ত রহস্যময়! আজও পরমাণু সম্বন্ধীয় সব বিষয় উদ্ঘাটিত হয় নি। আশা করা যায়, অনাগত ভবিষ্যতে পরমাণু-জগতের আরও অনেক অজানা রহস্য আবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

তলপেটের ডানদিকের কোণে চিন্‌চিনে ব্যথা সুরু হলেই অনেকে হাঁক-ডাক সুরু করে দেন, আর বলেন—আমার আর রক্ষা নেই, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস এমনই পরিচিত রোগ সবার কাছে। অ্যাপেণ্ডিক্স নামক বস্তুটি বৃহদন্ত্রের সিকাম নামীয় একটি অংশের গা থেকে নীচের দিকে সামান্য ঝুলে থাকে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

ইংরেজী 'আইটিস্' কথাটির মানে হচ্ছে প্রদাহ। প্রথম অ্যাপেণ্ডিক্সকে আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের একটি অংশ বলে জেনেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সর্বপ্রথম এই প্রত্যঙ্গটির ছবি আঁকেন বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। নর-দেহতত্ত্বের বিধান অনুসারে ফ্যালোপিয়াস এবং ভেসালিয়াস নামে দু-জন চিকিৎসক এটির বর্ণনা দেন এবং ভেরহায়েন নামে একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এর এই নামকরণ করেন।
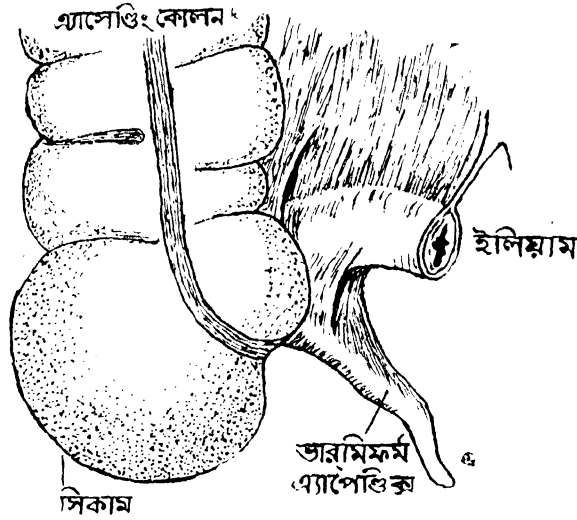
১নং চিত্র
অ্যাপেণ্ডিক্সের সম্মুখ-ভাগের দৃশ্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অ্যাপেণ্ডিক্সে রোগাক্রমণের ফলে প্রদাহের সৃষ্টি হওয়ার নাম অ্যাপেণ্ডিসাইটিস।

পেটের মধ্যে এই অদ্ভুত বস্তুটির অস্তিত্ব প্রথম নজরে পড়ে ফ্যারাও-র দেশে, অর্থাৎ মিশরে। মিশরের পিরামিড এবং মমি ইতিহাস-বিখ্যাত। যে সব লোক নানাবিধ মশলা, ভেষজ ও সুগন্ধি-দ্রব্যাদি মৃতদেহে মাখাবার কাজে নিযুক্ত থাকতো তাদের বলা হতো Embalmer। এরা-ই সর্ব-

চার ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি পুরু একমুখ খোলা টিউবের মত এই বস্তুটি দেখতে অনেকটা পোকার মত। তাই একে ইংরেজীতে বলা হয় Vermiform (Worm Shaped) appendix। দেহে এর প্রায় কোন কাজ নেই বললেই চলে। তাই মধ্যযুগের অ্যানাটমি এবং সার্জারিতে নিষ্প্রয়োজনীয় এই অংশটির নামের উল্লেখ ছিল না।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টার নামে জনৈক চিকিৎসক এই অপ্রয়োজনীয় বস্তুটির অনিষ্টকারিতার এক

ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সময় বেশ কিছু সংখ্যক রোগী অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মেষ্টিভিয়ার নামে অপর একজন চিকিৎসকও এই রোগের নানাবিধ উপসর্গের বিষয় বর্ণনা করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সেণ্ট জন হাসপাতালে ডাঃ ক্লডিয়াস অ্যামিয়াণ্ড সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার করে রোগাক্রান্ত অ্যাপেণ্ডিক্স উৎপাটিত করেন। এই অস্ত্রোপচারের সংবাদ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির Philosophical Transactions-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে নিখুঁতভাবে এই রোগ নির্ণয় এবং তার উপসর্গাদির বর্ণনা পাওয়া যায় উনবিংশ শতকের শেষ কুড়ি বছরের মধ্যে।

প্রতি বছর সমগ্র দেশে বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগের কবলে পড়ে। বয়সের কোন বাছবিচার নেই—অতি শিশু থেকে আরম্ভ করে একশো বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউ এ-রোগের হাত থেকে রেহাই পায় না, অর্থাৎ যে কোন বয়সে এই রোগ হতে পারে। তবে প্রবীণদের চেয়ে নবীনেরাই এই রোগে বেশী ভুগে থাকেন। যারা অতিরিক্ত মাংসাশী তাদের এই রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, নিরামিষভোজীদের চেয়ে অধিক সংখ্যক আমিষভোজীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পূর্বেকার দিনে অস্ত্রোপচারের পরেও বহুলোক মারা যেত। বিগত ১৯৩৯ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল ২,৭২২ এবং অ্যান্টিবায়োটিক গোষ্ঠীর ওষুধ (যেমন—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ইত্যাদি) চালু হবার ফলে ১৯৪৯ সালে মৃত্যুসংখ্যা ১,২৪৬-এ নেমে এসেছে। তবে এর পিছনেও একটি কথা আছে—লোক যত বেশী কুসংস্কারমুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, আয়ুর পরিমাণও তাদের তত বেশী বেড়ে যাবে।

দৈনন্দিন খাদ্যে আমিষজাতীয় পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী এবং সেই অনুপাতে শ্বেতসারের (কার্বোহাইড্রেট) অংশ সামান্য হলে এই রোগের আক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। বিড়ালের পেটে কৃত্রিম অ্যাপেণ্ডিক্স বসিয়ে বিবিধ পরীক্ষার পর উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে আসা গেছে।

আজকালকার দিনে আমরা যে ধরণের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, সেগুলি এত বেশী দুষ্পাচ্য যে, তারা বৃহদন্ত্রের কোলন নামক অংশের সরবরাহকারী স্নায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে না। সেহেতু কোলনের Motor nerve-এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে অ্যাপেণ্ডিক্সের মধ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য হঠাৎ ঢুকে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সেই আবদ্ধ খাদ্যকণা ক্রমে ক্রমে জমে গিয়ে কঠিন হতে থাকে। সেই কঠিন বস্তু তখন অ্যাপেণ্ডিক্সের অভ্যন্তরে থেকে সেই অংশের আয়তন বাড়িয়ে তোলে। জোর করে অ্যাপেণ্ডিক্সের আয়তন বেড়ে যাবার দরুণ আক্রান্ত স্থানে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। সে সময় অ্যাপেণ্ডিক্সে সরবরাহকারী রক্তধমনীগুলির রক্তপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস। সাধারণতঃ তিন বছরের কম বয়সের শিশু-দের এই রোগ হয় না বললেই চলে। তবে অত্যন্ত রুগ্ন শিশুর তিন বছরের কম বয়সেও ঐ রোগ হতে দেখা গেছে। বৃদ্ধেরা যুবকদের চেয়ে অনেক কম সংখ্যায় এই রোগে ভোগে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তিন বছর বয়সের পর থেকেই এই রোগের আক্রমণ হতে পারে; তার কারণ এই—প্রায় এই সময় থেকে শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষের মত সব রকম খাদ্যের আস্বাদ পেয়ে থাকে। এই রোগে নানারকমের আণুবীক্ষণিক জীবাণু অ্যাপেণ্ডিক্সকে আক্রমণ করে প্রদাহের সৃষ্টি করে। এই জীবাণুর মধ্যে কোলন ব্যাসিলাস্ এবং ষ্ট্রেপ্‌টো-কক্কাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

কারুর পেটের মধ্যে কোন জায়গায় ফোঁড়া

হলে সেখানে স্বভাবতঃই দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ তৈরী হয়। সে সময় নানারকম জীবাণু খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে অথবা রক্তস্রোতের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে অ্যাপেণ্ডিক্সের দেয়াল আক্রমণ করে। খাদ্যের মধ্য দিয়ে জীবাণু অ্যাপেণ্ডিক্সে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে অ্যাপেণ্ডিক্সের মধ্যেকার লুমেন বুজিয়ে ফেলে। তার ফলে অ্যাপেণ্ডিক্স থেকে শ্লেষ্মা বাইরে বেরুতে পারে না। অনেক সময় আবার ঐ প্রত্যঙ্গটি এমনভাবে বেঁকে যায় যে, তার নিম্নাংশে দূষিত বস্তু আটকে যায়। উপরে বর্ণিত যে কোন একটি কারণে অ্যাপেণ্ডিক্সে প্রদাহ এবং ক্ষতের স্থচনা হয়।

অবস্থানুযায়ী এই রোগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) অ্যাকিউট, (২) রেকারেণ্ট ও (৩) ক্রনিক। প্রথমে অ্যাকিউট বা মারাত্মক শ্রেণীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই বিশেষ শ্রেণীর রোগে যে কোন দেশের যে কোন লোক আক্রান্ত হতে পারে। তবে বনজঙ্গলের অসভ্য যারা খুব কম মাংস খেয়ে থাকে বা খেলেও আধুনিক প্রথায় খায় না, তাদের মধ্যে এই এই রোগ খুব কমই হয়। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে মাংস-ভক্ষণের রেওয়াজ খুব বেশী ছিল না বলে তৎকালীন ইতিহাসে এই রোগের

২নং চিত্র
অ্যাপেণ্ডিক্সের পশ্চাৎ-ভাগের দৃশ্য।

অ্যাপেণ্ডিক্সের কিছু অংশ পেরিটোনিয়াম দিয়ে ঢাকা থাকে (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অ্যাপেণ্ডিক্স আক্রান্ত হলে পেরিটোনিয়ামও রোগগ্রস্ত হতে পারে এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় পেরিটোনাইটিস্। ক্রমাগত প্রদাহের স্থষ্টি হবার দরুণ অ্যাপেণ্ডিক্সটি বেঁকে গিয়ে তার মাংসপেশী পুরু হয়ে ওঠে এবং অনেক সময় থলির মত আকার নেয়।

অ্যাপেণ্ডিক্সের সব অংশই যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে অ্যাপেণ্ডিক্সের রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে গ্যাংগ্রিনের স্থষ্টি হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা ও প্রদাহ স্থরু হয়।

তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মিশর, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং ভারতের অনেক স্থানে এই রোগের আক্রমণ খুব কম বলে জানা গেছে।

আগে লোকের ধারণা ছিল যে, কোন প্রকারে যদি পিন, কোন ফলের বীজ, টুথ ব্রাশের কুঁচি, ভাঙ্গা এনামেলের থালায় খাবার সময় এনামেলের টুকরা অ্যাপেণ্ডিক্সের মধ্যে ঢুকে যায়—তাহলে এই রোগ হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। তাছাড়া এসব দ্রব্য পেটের মধ্যে সচরাচর যাওয়া সম্ভব নয়।

এই রোগে আক্রান্ত বহু রোগীর ইতিহাস

থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, সহরের লোকেরা এই রোগে বেশী ভোগেন। মাংস খাবার পরিমাণ খুব বেশী হলে এবং খাদ্য সহজপাচ্য না হলে স্বভাবতঃই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। এই তুটি কারণ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সৃষ্টির সহায়তা করে। তাছাড়া বদহজমের জন্যে দাঁতের গোড়ায় পুঁজ জমা ও দাঁতে পাথুরি পড়াও অস্বাভাবিক নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বাস্থ্যবান লোকেরা এই রোগে বেশী ভুগে থাকে। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে কোলনে প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় কোলাইটিস। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এবং বাতরোগের আক্রমণও প্রায়ই হতে থাকে, এই রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায়, হঠাৎ নাভির চারপাশে যন্ত্রণা সুরু হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাপেণ্ডিক্সে রক্ত-সরবরাহ যত বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে যন্ত্রণার পরিমাণও ততই বাড়তে থাকে। প্রায় বারো ঘণ্টা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করবার পর তলপেটের ডানদিকে এক অংশে ঐ যন্ত্রণা কেন্দ্রীভূত হয়। ঐ অংশ দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে, আর গা-বমি ভাব, মাথাঘোরা, বমি ইত্যাদি আরম্ভ হয়। ৯৯° থেকে ১০১° ফাঃ পর্যন্ত জ্বর ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এই রোগে তলপেটের ডানদিকে যে যন্ত্রণা হয় তাকে অনেক সময় শূলব্যথা বলে ভুল করা হয়। এ-সময়ে রোগী সর্বদাই বুকের ডানদিকের উপর চাপ দিয়ে শুতে ভালবাসে। এই রোগে যে সব উপসর্গ দেখা দেয়, সেগুলি সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা যাক।

(১) পেটে যন্ত্রণা—এই উপসর্গের কথা আগেই ভালভাবে বলা হয়েছে।

(২) বমি—এই রোগে বিশেষভাবে শিশুদের বারে বারে বমি হতে থাকে। বমির সঙ্গে সঙ্গে পেটে যন্ত্রণাও ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে। অনেক সময় এই অবস্থাকে বদহজম বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার উপসর্গরূপে ধরা হয়।

(৩) ক্ষুধামান্দ্য—যন্ত্রণা আরম্ভ হবার প্রায় তু-একদিন আগে থেকেই খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা হয়।

(৪) গা-বমি ভাব—এটি বমির পূর্বলক্ষণ মাত্র; বয়স্ক রোগীদের বমি না হলে এই উপসর্গ থাকে।

(৫) কোষ্ঠকাঠিন্য—এটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান উপসর্গ। আবার অনেক সময় পেটের গোলমাল আরম্ভ হতে পারে। এর কারণ হচ্ছে—অ্যাপেণ্ডিক্সে তীব্র প্রদাহ সুরু হলে বৃহদন্ত্রের একটি অংশ কোলনের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে মল-ত্যাগের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

এ-ছাড়া ঐ একই কারণে মূত্রথলিকে সর-বরাহকারী স্নায়ু উত্তেজিত করে মূত্রত্যাগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

এবারে রেকারেণ্ট অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। কেউ যদি একবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়, তাহলে পরবর্তী-কালেও তার বারে বারে ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বার বার আক্রমণ হয় বলেই এর নাম 'রেকারেণ্ট' হয়েছে। বিশেষভাবে যাদের অ্যাপেণ্ডিক্সে কোন দিন ফোঁড়া হয়েছিল, তারা ঘন ঘন এই রোগের আক্রমণে ভুগে থাকে। কয়েক সপ্তাহ যাবার পর যন্ত্রণা আপনাথেকেই কমে যায়।

ক্রনিক অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—রোগ পুরনো হলে তেমন কোন উপসর্গ নজরে পড়ে না। তবে রোগী ক্রমশঃ তুর্বলতা, ক্লান্তি, অজীর্ণতা এবং পেটের নানা স্থানে বেদনা অনুভব করে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, আর তলপেটের ডানদিকে চাপ দিলে শক্ত বলে মনে হয়। দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসায় থাকলে এই রোগের সঙ্গে পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রের ডিওডিনামে ক্ষত উৎপন্ন হতে পারে। তাছাড়া কোলাইটিস, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি নানা ব্যাধিও বাসা বেঁধে রোগীর জীবন আরো তুঃসহ করে তোলে।

এই রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রথমেই কোষ্ঠ-পরিষ্কারের কথা বলতে হবে। যন্ত্রণা উপশমের জন্যে পেথিডিন বা ঐ জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো বা ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। এ রোগের সর্বাবস্থাতেই একমাত্র চিকিৎসা—অস্ত্রোপচার।

সঞ্চয়ন

আধুনিক চিকিৎসায় প্লাষ্টিক

আধুনিক শল্য-চিকিৎসায় প্লাষ্টিক সম্পর্কে লিওনার্ড জি. রুল লিখেছেন—পাঁচ বছর পূর্বে লণ্ডনের একটি কাগজে প্রকাশিত হয় যে, একজন মহিলাকে প্লাষ্টিকের পা দিয়ে হাঁটতে দেখা গেছে। এই সংবাদটিতে আরও বলা হয়—উরুর অস্থি-র উপরাংশ, যেখানটা পেল্‌ভিসের কোটরের সঙ্গে যুক্ত, সেখানটা অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ফিমারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

প্লাষ্টিক দিয়ে উরুর অস্থি-র এই উপরাংশ বা হেড তৈরী করে কোটরের মধ্যে ঠিক মত তা বসিয়ে দেওয়া হয়। এই উপরাংশের মধ্যে তারগুলিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে এক্স-রে'র সাহায্যে এই অংশের নড়াচড়া এবং প্লাষ্টিকের সন্ধিস্থলটি সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে কি না, তা সহজে লক্ষ্য করা যায়।

এই ধরণের অপারেশন এই প্রথম নয়। প্রথমদিকে উরুর অস্থি-র গ্রীবার সঙ্গে প্লাষ্টিক হেড যুক্ত করা হতো। প্লাষ্টিক ব্যবহার করবার পূর্বে শল্য-চিকিৎসকেরা কলঙ্ক-প্রতিরোধক ইস্পাতের অংশ দিয়ে উরু-সন্ধি মেরামতের চেষ্টা করতেন; কিন্তু প্লাষ্টিক হাল্‌কা হওয়ায় তাঁরা মনে করেন, এতে শরীরের তন্তুর প্রদাহের কোন সম্ভাবনা দেখা দেবে না।

এই প্রদাহের প্রশ্ন থেকেই প্লাষ্টিক বা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহারের প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রদাহ মানুষের শরীরে নানারকম অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এমন কি, এর ফলে রক্তে বিষক্রিয়া পর্যন্ত হতে পারে এবং ক্রমশঃ ক্যান্সারের মত কঠিন রোগও দেখা দিতে পারে।

প্লাষ্টিক নিয়ে বৃটেনে ব্যাপকভাবে কাজ সুরু হয় (বৃটেনেই প্রথম উরুর অস্থি-র অপারেশন হয়) এবং শল্য-চিকিৎসক, নার্স এবং দন্ত-চিকিসকদের চাহিদা অনুযায়ী প্লাষ্টিকের নানারকম উপকরণ উদ্ভাবিত হয়। এ-বিষয়ে বৃটেনের একজন বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস. এ. লীডার বলেন, বিশ্বের বাজারে এই ধরণের প্লাষ্টিকের উপকরণ প্রতি বছর ৫০০ টনেরও বেশী বাইরে রপ্তানী হচ্ছে এবং এর অধিকাংশই যাচ্ছে দন্ত-চিকিৎসকদের কাছে।

শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে, প্রতি বছর প্রায় ১৫০,০০০,০০০ দাঁত তৈরী হচ্ছে এবং তার প্রায় অর্ধেক ব্যবহৃত হচ্ছে বৃটেনে। যে প্লেটের উপর দাঁতগুলি বসানো হয়, সেই প্লেটটি আগে হতো বিশেষ ধরণের রবারের, এখন তা আর একরকমের প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী হচ্ছে। প্লাষ্টিকের যে দুটি উপকরণ দিয়ে দু-পাটি দাঁত তৈরী হচ্ছে, সেই উপকরণকে প্রতিবারের চর্বণে প্রায় ২০০ পাউণ্ডের মত চাপ সহ্য করতে হচ্ছে এবং মানুষ মোটামুটিভাবে প্রতিদিন প্রায় ৩,০০০ বার চর্বণ করে থাকে—চুইং-গাম ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও।

প্লাষ্টিকের দাঁত বা অন্যান্য যে সব উপকরণ দেহের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হয়, সেগুলি অস্বচ্ছ হলেই ভাল হয়, যাতে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তাকে শরীরের মধ্যে সন্ধান করা সহজ হয়। অপর পক্ষে প্লাষ্টিকের অন্যান্য উপকরণ, যা স্পাইনাল সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা এমন হবে, যাতে রঞ্জেন রশ্মি ছায়া না ফেলে তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে অস্থি-র চিত্র ভাল ভাবে তোলা সম্ভব হয়।

বৃটেনে প্লাষ্টিকের বিচিত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গে

প্লাষ্টিকের চোখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বে কাচের চোখ মানুষকে যথেষ্ট কষ্ট দিত। এতে চোখের জলের পরিমাণ অহেতুক বেড়েই যায়। এই চোখের জলের মধ্যে আছে ক্লোরিন, যা কাচ ক্ষয় করে ফেলে এবং কখনও কখনও চোখের কোটরের মধ্যে কাচ ফেটে যাওয়ার কারণ ঘটে। এখন কৃত্রিম চোখ তৈরী হচ্ছে, দাঁত যে ধরণের প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী, সেই ধরণের প্লাষ্টিক দিয়ে। এতে চোখের অস্বস্তির ভাবও অনেক কম হয়ে থাকে।

ডাক্তারী চিকিৎসার দিক দিয়ে বোধ হয় প্লাষ্টিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হলো ব্লাডারের জন্যে ব্যবহৃত টিউব। এই ধরণের আর একটি উপকরণ হলো শিশুদের ফীডিং টিউব। অ্যানেস্থেটিস্টরা প্লাষ্টিকের মুখোস ব্যবহার করেন। এর একটা সুবিধা হলো এই যে, এতে রবারের কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। এই গন্ধটাকে অনেক সময় অ্যানেস্থেটিক বলে ভুল করা হয় এবং কেউই তা পছন্দ করে না।

অপারেশন থিয়েটারে রোগীর জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মুখের মধ্যে একটা টিউব প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যাতে জিভটি পেছনে ঝুলে গিয়ে কণ্ঠরোধ না করে। এখন এই টিউবগুলি হয় প্লাষ্টিকের। এই প্লাষ্টিক দিয়ে সিরিঞ্জ পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে। এতে একটা সুবিধা হলো এই যে, সিরিঞ্জগুলি দামে অনেক সস্তা এবং একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া যায়।

প্লাষ্টিকের উপকরণগুলির শোধন সম্পর্কে যে নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, তার গুরুত্ব স্বীকার্য। এখন উত্তাপ বা বাষ্পের সাহায্যে এই কাজ করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ানটেজ-এ পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্লাষ্টিকের সরঞ্জামগুলিকে প্লাষ্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে সীল করে শোধন করা সম্ভব। এই শোধনের কাজ হতে পারে গামা-রশ্মির সাহায্যে।

ক্যান্সারের মত রোগের চিকিৎসাতেও প্লাষ্টিকের ব্যবহার লক্ষণীয়। যে ক্ষুদ্র কলঙ্ক-প্রতিরোধক ইস্পাতের সিলিণ্ডার রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়, সেই সিলিণ্ডারের পরিবর্তে এখন অতি ক্ষুদ্র প্লাষ্টিকের সিলিণ্ডার ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে তন্তুর মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। এই প্লাষ্টিক সিলিণ্ডার বিকিরণ প্রতিরোধে সক্ষম এবং রোগীর পক্ষে দীর্ঘতর সময় শরীরের মধ্যে ধারণ করা অনেক সহজ। ক্যান্সারের মত একটা ভয়াবহ রোগের চিকিৎসায় এই উপকরণটি চিকিৎসক এবং রোগীর অনেকটা দুশ্চিন্তা দূর করতে সক্ষম হয়েছে সন্দেহ নেই।

নতুন ধরণের শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র

এই যন্ত্র সম্পর্কে জেনেট হুইটন লিখেছেন—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেস্থেটিক্সের ন্যুফীল্ড্ বিভাগ সম্প্রতি এক নতুন ধরণের অ্যানেস্থেটিক শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটি চিকিৎসা-জগতে একটা ছোটখাটো বিপ্লব সৃষ্টি করেছে বলা যেতে পারে। যে সব দূরবর্তী গ্রামে হাসপাতাল নেই, সেই সব গ্রামেও এখন এই যন্ত্রের সাহায্যে অ্যানেস্থেটিক্সের মাধ্যমে শল্য-চিকিৎসা করা হচ্ছে। এই সব রোগীদের আর তাড়াতাড়ি দূরের পথে হাসপাতালে প্রেরণ করবার প্রয়োজন হয় না।

চীন আজ বিশেষভাবে এই নতুন যন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অক্সফোর্ডের অ্যানেস্থেটিক্সের ন্যুফীল্ড্ অধ্যাপক সার রবার্ট ম্যাকিনটশ এই নতুন যন্ত্রটির উদ্ভাবক। তিনি চীন কর্তৃক

যন্ত্রটির কার্যকারিতা সম্পর্কে আভাস দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি শীঘ্রই চীন যাত্রা করবেন এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বের হবেন।

এই নতুন অ্যানেস্থেটিক শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র "এমো" (EMO, অর্থাৎ Epstein, Macintosh, Oxford) নির্মাণ করেছে অক্সফোর্ডের একটি ফার্ম, ন্যুফীল্ড্ বিভাগের সহযোগিতায় তারা মূল মডেলটির উন্নতি সাধন করে। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সালের মধ্যে মূল মডেলটি নির্মিত হয়।

এমো যন্ত্রটি প্রমাণ করেছে—যে সব বড় বড় যন্ত্র বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের তুলনায় তার কার্যকারিতা অনেক বেশী। এমো সম্পর্কে একটা প্রধান কথা হলো এই যে, যন্ত্রটি কাজের জন্যে গ্যাস সিলিণ্ডারের উপর নির্ভরশীল নয়—অ্যানেস্থেটিক মিক্‌চার প্রয়োগ করা হয় শুধু বাতাসের সঙ্গে।

যে সব দেশে অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সিলিণ্ডার পাওয়া যায় না বা যে সব দেশে গ্যাসের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় গ্যাস ব্যবহার সম্ভব হয় না, সেই সব দেশে এই যন্ত্র ব্যবহার করে বুঝা যায়, এর সুবিধা কতখানি। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সিলিণ্ডার নিয়ে যাওয়ারও একটা সমস্যা রয়েছে। এখনও বিচ্ছিন্নভাবে দেশের মধ্যে এমন সব হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় না করলে গ্যাস পাওয়া যায় না; কারণ পরিবহনের সুবিধা সব জায়গায় সমান নয়।

সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করলেই বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে একজন মেডিক্যাল অর্ডার্লি সহজেই এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারে, অথচ যে জটিল যন্ত্র এখন ব্যবহৃত হচ্ছে, তার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে একমাত্র অভিজ্ঞ অ্যানেস্থেটিস্ট। এটা একটা মস্ত বড় কথা। যে সব ছোট ছোট হাসপাতালে অভিজ্ঞ লোকজনের অভাব, সেই সব হাসপাতালে এই যন্ত্রটি যে বিশেষ কার্যকরী হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এমো সহজ বহনযোগ্য হওয়ায় সামরিক ব্যবহারের কথাই প্রথম চিন্তা করা হয়। বর্তমানে তা সাধারণ মেডিক্যাল উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। গত যুদ্ধের শেষদিকে অ্যানেস্থেটিক্সের ন্যুফীল্ড্ বিভাগ এমো সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করলেও এই শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় যুদ্ধের শেষে, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর। যাহোক, যন্ত্রটি যে শল্য-চিকিৎসার কাজ সহজসাধ্য এবং নিরাপদ করেছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। যে চিকিৎসা একদিন সহরের বড় বড় হাসপাতালে সম্ভব হচ্ছিল, তা আজ দূরবর্তী গ্রামেও সম্ভব হবে।

রোগী যে ইথার-বাষ্প গ্রহণ করে, সেই বাষ্পের শতকরা হার নিয়ন্ত্রিত করা হয় হস্তচালিত কণ্ট্রোল ট্যাপের সাহায্যে। ইথার-বাষ্পের সরবরাহ বজায় রাখা একটা কঠিন কাজ; কারণ অবশিষ্ট তরল পদার্থ অতি শীঘ্র শীতল হয়ে যায় এবং তার ফলে বাষ্পের পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। পূর্বের উপকরণটিতে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টায় গরম জল ব্যবহৃত হতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগীর দেহে যে বাষ্প প্রয়োগ করা হয় তার শতকরা হার সব সময় ঠিক রাখা সম্ভব হতো না।

এমোতে স্বয়ংক্রিয় থার্মো-কম্পেন্সেটর থাকায় রোগী নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে বাষ্প গ্রহণ করে তার শক্তির কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি ভাল্‌ভের সাহায্যে তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ হয়। বেশী রকম গরম হলে এবং বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পেলে ভাল্‌ভ্ বন্ধ হয়ে যায়। আবার ইথার অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে শীতল হলে, বেশী করে বাতাস গ্রহণের জন্যে ভাল্‌ভ্ খুলে যায়। এভাবে রোগী যে ইথার বাষ্প গ্রহণ করে তার পরিমাণ সব সময় সমান রাখা সম্ভব হয়।

১৮৪৭ সালে জন স্নো প্রথম ইথার ইনহেলার বা শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। তিনিই লণ্ডনের প্রথম পেশাদার অ্যানেস্থেটিস্ট এবং প্রিন্স লিওপোল্ডের জন্মের সময় রাণী ভিক্টোরিয়ার দেহে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে তিনি খ্যাতির অধিকারী হন। সম্ভবতঃ বেদনাহীন সন্তান প্রসবের দিক থেকে তাঁর এই কাজ প্রথম; কিন্তু তাঁর কাজ একেবারে ত্রুটিশূন্য হয় নি।

১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে লেভি দুটি ক্লোরোফর্ম ইনহেলার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেছিলেন, মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯০৫ সালে উদ্ভাবিত যন্ত্রটিতে তিনি তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। হাতের সাহায্যে এই কাজ করতে হতো। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে থার্মোমিটারে জলের তাপ হ্রাসের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প-প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে আরও বেশী করে বাতাস প্রবেশ করানো হতো।

এসব শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রকে সহজ বহনযোগ্য করে তোলা এবং তাদের বৈদ্যুতিক সরবরাহের উপর নির্ভরশীল না করবার জন্যে ১৯৪১ সালে ম্যাকিনটশ ও মেণ্ডেলসোন অক্সফোর্ড ভেপারাইজার উদ্ভাবন করেন এ-ক্ষেত্রেও উত্তাপের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় উষ্ণ জল; কিন্তু তাতে একটি রাসায়নিক থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করে প্রকোষ্ঠের তাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয় এবং ১৯৫২ সালে অক্সফোর্ডে এপষ্টিন ও ম্যাকিনটস কর্তৃক এমো যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এই যন্ত্রটিতেই প্রথম স্বয়ংক্রিয় থার্মো-কম্পেন্‌সেটর ব্যবহৃত হচ্ছে।

এমোতে কেবল ইথারই নয়, ফ্লুওথেন, ট্রিলিন ও ক্লোরোফর্মও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের প্রয়োজনীয়তা

এই সম্পর্কে স্টিফেন স্যাটম্যান লিখেছেন—বৃটেনে নির্মিত প্রথম কম্পিউটর যন্ত্র স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের শেষে মাঞ্চেষ্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। আট বছর পরে যুক্তরাজ্যে এই কম্পিউটর যন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০-এরও বেশী এবং যন্ত্রগুলি সরবরাহ হয় বৃটেনের নয়টি প্রতিষ্ঠান থেকে। বৃটেনের এই সব প্রতিষ্ঠান এখন আরও ১২৫টি যন্ত্র নির্মাণে ব্যাপৃত রয়েছে। এই সব যন্ত্রের কিছু কিছু বিদেশেও রপ্তানী হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৭টি দেশে এই কম্পিউটর যন্ত্র এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব ইলেকট্রনিক কম্পিউটর যন্ত্রকে অনেক সময় বলা হয় 'ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক। এই নাম স্বভাবতঃই সাধারণ লোকের মনে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। লোকে মস্তিষ্ক বলতে যা বোঝে এই যন্ত্রটি তা নয়, এটিকে বলা যেতে পারে, ইলেকট্রনিক রোবোট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। কারণ এই যন্ত্রগুলি আসল মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এই ধরণের যন্ত্রের আজ যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

একটি গণনকারী কম্পিউটর কতকগুলি সংখ্যা নিয়ে যোগ বা বিয়োগ ফল নির্ণয় করতে পারে এবং দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বৃহত্তর, তাও স্থির করতে পারে। অ্যাবেকাস-এ (Abacus) যার আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে, তাতে এই কাজ হয় তারের উপর গুটি ব্যবহার করে। আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক অভিঘাত। যন্ত্রটি যে কোন ধরণের গণনার কাজ করতে পারে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে যন্ত্রটি বুদ্ধিহীনের মত সব দিক দিয়ে চেষ্টা করে থাকে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটর হলো একপ্রকার

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যন্ত্র চিন্তা করতে পারে না; কাজেই যে কোন গণনা কার্যের জন্যে তাকে প্রোগ্রাম মাফিক জানিয়ে দিতে হয়, কিভাবে কোন্ দিকে অগ্রসর হবে। গণনার সব আংশিক উপকরণ এবং নির্দেশ, বৈদ্যুতিক অভিঘাতের সাহায্যে যন্ত্রের স্মৃতির মধ্যে জমা রাখা হয়।

কম্পিউটরের জন্যে এই প্রোগ্রাম প্রস্তুতের কাজ সহজ নয়, এর জন্যে যথেষ্ট দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

মোটামুটি ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সরকারী গবেষণা কেন্দ্রগুলিতেই কম্পিউটর যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছিল। এর পরে শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখন এই যন্ত্র বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের তুলনায় রাসায়নিক কাজকর্মেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

একটি বৃটিশ কোম্পানী বিমান-ইঞ্জিন সংক্রান্ত কাজকর্ম, রকেট এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত যন্ত্রের ডিজাইন সম্পর্কে কম্পিউটর যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করেছে। কোন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রেট ডিম্যাণ্ড নোট প্রস্তুত এবং অন্যান্য হিসাব প্রস্তুতের জন্যে কম্পিউটর যন্ত্র স্থাপন করেছেন। একটি বিশিষ্ট বৃটিশ ব্যাঙ্ক লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে অবস্থিত তার শাখা দপ্তরগুলির হিসাব রক্ষার জন্যে কম্পিউটর যন্ত্রের অর্ডার দিয়েছেন। পেরোল ও স্টক কণ্ট্রোল সম্পর্কে এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও ট্র্যান্সমিশনের ক্ষেত্রেও কম্পিউটর গ্রিডসমূহের বিন্যাস এবং পারমাণবিক রিয়্যাক্টরগুলির সঙ্গে টার্বাইন এবং শক্তি উৎপাদক যন্ত্রগুলির ব্যবহার কি পর্যন্ত ফলপ্রদ হতে পারে তা সন্ধান করবার কাজে কম্পিউটর ব্যবহৃত হচ্ছে।

মেশিন টুল নির্মাণ সম্পর্কেও কম্পিউটরের ব্যবহার লক্ষণীয়—দুটি বৃটিশ মেশিন টুল নির্মাণকারী ফার্ম এই দিকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এই যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের সময় চার-পঞ্চমাংশ বা তারও বেশী হ্রাস পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে উৎপাদন-মূল্য।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা যেতে পারে, কম্পিউটর যন্ত্রের কার্যক্ষমতার শেষও এইখানেই, একথা মনে করা ভুল হবে। এই যন্ত্র ভবিষ্যতে যা'তে আরও অনেক বেশী কাজ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তার চেষ্টা চলছে।

একটি কম্পিউটর যন্ত্র স্থাপনে যথেষ্ট অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে, কম্পিউটর যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অকারণ অর্থব্যয়ও বন্ধ হয়ে যায়। একটি ফার্ম কয়েক বছরের পরীক্ষার পর জানিয়েছেন যে, পাঁচ বছরে এই ক্ষতি পূরণ সম্ভব। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে সেটা সম্ভব হবে, তা মনে হয় না।

এর আর একটি দিক হলো এই যে, যন্ত্রটি পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং গবেষণা-কর্মীদের অবিলম্বে গাণিতিক তথ্য সরবরাহ করে তাদের কাজকর্মে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করছে। বহু জটিল সমস্যা এর ফলে দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

কাগজের গুণ ও ব্যবহার

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে কাগজ ব্যবহারের সীমা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী কাগজ বিশেষভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে যে কোন কাজের জন্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন কাগজ পাওয়া যায়। বিবিধ উপাদান থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার কাগজ তৈরী করা হচ্ছে। যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত আঁশে তৈরী খুব সস্তা কাগজ থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণরূপে ন্যাকড়ার আঁশের সাহায্যে হাতে-তৈরী মূল্যবান অসংখ্য রকমের কাগজ মানুষের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। মোটা, পাত্‌লা, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, অমসৃণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে। তাছাড়া কোন কাগজ আবার কালী, তেল, জল প্রভৃতি সহজেই শোষণ করে এবং কোন কোন কাগজ এ সব তরল পদার্থ প্রতিরোধ করে।

প্রত্যেক শ্রেণীর কাগজ একই মূল উপাদান—সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন হলেও সব ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের উপযোগী গুণ-সম্পন্ন করে প্রস্তুত করা হয়। এক শ্রেণীর কাগজের যে গুণ বাঞ্ছনীয়, অন্য শ্রেণীর কাগজের পক্ষে তা ক্ষতিকর। শক্ত কাগজ ঠোঙা তৈরীর পক্ষে ভাল, কিন্তু লিথোগ্রাফির জন্যে নমনীয় কাগজই উৎকৃষ্ট। অস্বচ্ছতাই বাইবেল কাগজের প্রধান গুণ, অপর পক্ষে গ্ল্যাসিন কাগজের স্বচ্ছতা অত্যাবশ্যক। এক শ্রেণীর কাগজ অন্য শ্রেণীর কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। লেখবার কাগজ চোষক কাগজের পরিবর্তে, কিংবা ছাপার কাগজ সিগারেট কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই সব রকম কাগজের গুণ বিচার করবার জন্যে কোন সাধারণ নিয়ম করা সম্ভব নয়। কোন কাগজ কাজবিশেষের পক্ষে উপযুক্ত হলেই তার গুণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক হবে।

কাগজ ব্যবহারের রীতি, বিশেষতঃ ছাপানোর বিষয় জানতে হলে কাগজের পাত্‌ সম্বন্ধে একটি বিষয় বোঝা দরকার। কাগজের পাতের গঠন ও আয়তনের কিঞ্চিদধিক পরিবর্তন হয়। সদ্য-প্রস্তুত সবরকম কাগজের আয়তনই অস্থায়ী। পাত্‌ প্রস্তুত করবার কিছুক্ষণ পূর্বেই আঁশগুলিকে তীব্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসতে হয়। আঁশগুলিকে ধোলাই ও বিরঞ্জনের পর পেষণ-যন্ত্রে কাটা, থেঁৎলানো ও জল খাওয়ানো হয়। সেগুলির ভিতরে কলপ অনুপ্রবেশ করানো দরকার। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাপ ও তাপ প্রয়োগে সেগুলিকে একেবারে আর্দ্র অবস্থা থেকে শুষ্ক অবস্থায় আনা প্রয়োজন।

কাগজ-কলের এক প্রান্তে পাত্‌লা মণ্ডের ভিতর শতকরা এক ভাগেরও কম আঁশ এবং নিরানব্বই ভাগেরও বেশী জল থাকে। কয়েক মিনিট পরেই কলের অপর প্রান্তে একটি কাগজের পাত্‌ উৎপন্ন হয়, যার শতাংশের প্রায় ছিয়ানব্বই ভাগই আঁশ এবং চার ভাগ মাত্র জল। কলের ভিতর চালাবার সময় কাগজের পাত্‌টিকে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রেস রোলের ভিতর চেপে আঁশগুলিকে সুসংবদ্ধ করে উত্তপ্ত সিলিণ্ডারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ভারী ক্যালেণ্ডার রোলের ভিতর পেষণ করা হয়। এভাবে কলে দলিত ও মথিত হয়ে আঁশগুলি যেন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তারপরেই যেন নিজেদের সত্তা আবার ফিরে পেয়ে আঁশগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকে।

এই প্রক্রিয়া প্রথমে খুব দ্রুতই চলতে থাকে ; তারপর ক্রমশঃ মন্থর হয়ে অবশেষে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখনই কাগজ যথোপযুক্ত অবস্থায় পরিণত হয়।

এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, সাধারণ অবস্থায় সেলুলোজ আঁশের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬।৭ ভাগ জল থাকে। কিন্তু সদ্য-প্রস্তুত কাগজে এর চেয়ে কম জল থাকে। এরূপে খুব ভাল করে শুকিয়ে না গেলে কাগজের পাত্‌ কুঁচকে যায় এবং সমতল হয়ে বসে না। এজন্যে অত্যধিক শুষ্ক সদ্য-প্রস্তুত কাগজ গুদামে রেখে দেওয়া হয়, যাতে আঁশগুলি বাতাস থেকে জল আহরণ করে পাত্‌ পরিণত করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সময়-সাপেক্ষ। কাজেই কাগজ তাড়াতাড়ি পরিণত করবার জন্যে রীলে জড়ানোর পূর্বে গরম পাতের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা ছড়ানো হয়। পরিণত করবার আর একটি উপায় হলো, কোন ঘরের ভিতর বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে পাত্‌গুলিকে ঝুলিয়ে রাখা। এভাবে পাত্‌গুলি তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। অনেক কলেই এই প্রক্রিয়ায় পাত্‌ পরিণত করবার ব্যবস্থা আছে।

অপরিণত কাগজ মুদ্রাকরের নিকট সরবরাহ করা হলে পাত্‌ অসমতল হয়ে বসবার দরুণ মুদ্রণের সময় অনেক বিঘ্ন ঘটে এবং পাত্‌ সম্বন্ধে অভিযোগ হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, সদ্য-প্রস্তুত কতকগুলি কাগজ মুদ্রাকরের নিকট সরবরাহ করবার পর ছাপার অনুপোযোগী বলে মুদ্রাকর সেগুলি ফেরৎ দেয়। তখন অন্য ভাল কাগজ সরবরাহ করা হয় এবং ফেরৎ দেওয়া কাগজগুলি পরিণত করে পুনরায় পাঠানো হয়। মুদ্রাকর তখন কিন্তু এই কাগজগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করে।

কাগজ সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিযোগের প্রধান কারণ হলো, কাগজ ঠিকমত পরিণত না করে সরবরাহ করা কিংবা পরিণত কাগজ পাওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণের সময় ছাপাখানার অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় পাতের আয়তনের পরিবর্তন ঘটা। যে কাগজে অনেক প্রকার রং নিখুঁতভাবে মুদ্রণ করতে হবে, সে কাগজ বিশেষভাবে পরিণত করা দরকার। সম্পূর্ণ ন্যাকড়ার আঁশে তৈরী উৎকৃষ্ট কাগজই হোক কিংবা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঁশে তৈরী অতি সাধারণ কাগজই হোক, সবারই এরূপ গুণ থাকা দরকার। অপরিণত কাগজে সূক্ষ্ম কাজ করা মোটেই সম্ভব নয়। সস্তা কাগজের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর অধিক মূল্যের কাগজ খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিণত করা দরকার। কারণ এসব কাগজ ছাপানোর পরে দেখতে সুন্দর হয় এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। অপর পক্ষে কম দামের কাগজ অল্পদিন ব্যবহারের পরেই ফেলে দেওয়া হয়।

অত্যধিক শুষ্ক কাগজ তৈরী করবার সময় এবং ছাপা, বাঁধাই ও অন্যান্য কাজে লাগাবার সময় যন্ত্রের ঘর্ষণের ফলে পাতের উপর স্থিরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার দরুণ কাজের খুব বিঘ্ন ঘটে। হয়তো পাত্‌গুলি পরস্পর এরূপভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে, যেন আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে এবং কিছুতেই টেনে পৃথক করা যায় না। কিংবা পরস্পরের কাছ থেকে অথবা লোহার যন্ত্র থেকে এরূপভাবে বিকর্ষিত হয় যে, উভয়কে নিকটে আনা মুস্কিল হয়ে পড়ে। যাদের এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই, এরূপ ব্যাপার দেখে তারা প্রথমে খুবই বিস্মিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাত্‌কে নিস্তড়িৎ করবার জন্যে কাগজের ভিতর বিদ্যুৎ চালানো হয়।

দীর্ঘকাল স্থায়ী দলিলপত্রের জন্যে তুলা এবং লিনেনের বিশুদ্ধ সেলুলোজ-আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরী করা হয়। এসব কাগজে কাঠ, ঘাস কিংবা খড়ের আঁশ ব্যবহার করা হয় না। আঁশে ক্ষার, বিরঞ্জক, রজনের কলপ, ফটকিরি প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের অবশেষ থাকবে না। এ সব দ্রব্য থাকলে ভবিষ্যতে কাগজের রং খারাপ হয়ে যাবে এবং স্থায়িত্ব কমে যাবে। এই প্রকার কাগজ হাতে তৈরী

করা হয়; কারণ হাতে-তৈরী পাতের সব দিক সমান দৃঢ় হয়। অপর পক্ষে কলে তৈরী কাগজের পাতে সব দিকের দৃঢ়তা সমান হয় না। এই শ্রেণীর হাতে-তৈরী কাগজ সাবধানতার সঙ্গে রাখলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভাল ছাপার কাগজ প্রস্তুত হয় বহুব্যবহৃত তূলার ন্যাকড়ার কোমল আঁশ দিয়ে। এরূপ উপাদানে উৎপন্ন কাগজ নমনীয়, মসৃণ ও অস্বচ্ছ হয়। এরূপ কাগজে মুদ্রণের হরফ খুব ভালভাবে বসে।

আর্ট পেপার ব্যবহৃত হয় কেবল ছবি ছাপানোর জন্যে। এই শ্রেণীর কাগজ সাধারণ কাগজের মত নয়। এতে সাধারণ কাগজকে কাঠামোরূপে ব্যবহার করে উপরিভাগে পূরক, শিরীষ প্রভৃতির মিশ্রণের প্রলেপ মাখানো হয়। এই কাগজ খুব ভঙ্গুর এবং ভাঁজ করলে ফেটে যায়। আর্ট পেপারের গা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এজন্যে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। অতি উজ্জ্বল পালিশ কাগজে বই ছাপানো উচিত নয়। যদি দরকার হয়, আর্ট পেপারে হাফটোন ছেপে পৃথকভাবে বই-এর ভিতরে জুড়ে দেওয়া যায়।

সাধারণ বই ছাপবার জন্যে কলের ক্যালেণ্ডার রোলে পালিশ-করা কাগজ ব্যবহার করাই ভাল। এরূপ কাগজ খানিকটা মসৃণ হওয়াতে অল্প কালি প্রয়োগ করেও পরিষ্কার মুদ্রণ হয় এবং যে কোন শ্রেণীর মুদ্রণের জন্যেই ব্যবহৃত হতে পারে। খবরের কাগজ, সস্তা বই প্রভৃতি মুদ্রণের জন্যে কাঠ থেকে উৎপন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঁশ দিয়ে তৈরী কাগজ ব্যবহার করাই ভাল। যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত আঁশই নিউজ-প্রিন্ট বা খবরের কাগজের প্রধান উপাদান। এই শ্রেণীর কাগজে শতকরা প্রায় আশী ভাগ যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত আঁশ এবং অবশিষ্ট রাসায়নিক আঁশ থাকে।

মোটা অ্যান্টিক ও ফেদারওয়েট কাগজ ব্যবহার করা খুবই বিরক্তিকর। এই শ্রেণীর কাগজ তৈরী করা, ব্যবহার করা এবং ছাপানো অসুবিধাজনক। ছাপানোর সময় অধিক কালি ব্যবহার করতে হয় এবং কাগজ থেকে আঁশ বেরিয়ে এসে কল নোংরা ও কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এরূপ কাগজে ছাপা বই আলমারির অনেকটা জায়গা দখল করে। রীতিমত ব্যবহার করলে কিছুদিন পরেই বই থেকে পাতা বেরিয়ে আসে। এরূপ বই বাঁধানোও সম্ভব নয়।

মোটা কাগজের পরিবর্তে পাত্‌লা কাগজ ব্যবহার করা সব দিকেই সুবিধাজনক। কাগজের কল যে কোন রকম পাত্‌লা কাগজ সরবরাহ করতে পারে। পাত্‌লা কাগজ মোটা কাগজের চেয়ে অধিকতর দৃঢ় এবং কোমল হতে পারে; কাজেই এর ব্যবহার আরামদায়ক। তাছাড়া ছাপা এবং বাঁধাইও সহজ। পাত্‌লা কাগজ যথেষ্ট অস্বচ্ছ হতে পারে; কাজেই মুদ্রণের হরফ বিপরীত দিকে দেখা যাবে না। বাইবেল বা ইণ্ডিয়া পেপার যথেষ্ট পাত্‌লা হলেও এত অস্বচ্ছ যে, কাগজের দুই দিকেই ছাপার হরফ পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। পাত্‌লা কাগজ বই ছাপার জন্যে ব্যবহার করলে বই-এর দোকান এবং সাধারণ পাঠাগারে নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক বেশী বই রাখা যায়।

ডেকল্‌ এজ্‌ বা পালকের ন্যায় ঢেউ খেলানো অসমান প্রান্তবিশিষ্ট হাতে-তৈরী কাগজের পাত্‌ চিঠিপত্রের জন্যে ব্যবহার করা সুরুচি ও মর্যাদার পরিচায়ক। বাইরে কলপ মাখানো কাগজই লেখবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রকৃত পক্ষে এরূপ কাগজে লিখতে গেলে শিরীষের একটি মসৃণ স্তরের উপরেই লেখা হয়; কাজেই লেখা খুব সহজ ও আরামদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু পেষণ-যন্ত্রে কলপ যোগ করে যে কাগজ তৈরী হয়, তাতে লিখতে গেলে আঁশের উপরেই লিখতে হয়। এরূপ কাগজে লেখবার সময় কলমের নিবের খোঁচা লেগে কাগজ থেকে আঁশ উঠতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত কাগজে আঁশগুলি শিরীষের আঠা দিয়ে জোড়া থাকে বলে এরূপ হবার সম্ভাবনা নেই।

সবচেয়ে ভাল ড্রয়িং পেপার প্রস্তুত করা যায়, লিনেন কিংবা তুলার নতুন ন্যাকড়া দিয়ে। এদের খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়। কাগজে আঁশের স্বাভাবিক রংই বজায় থাকে, আর কোন বিশেষ রং দেওয়া হয় না। পেন্সিলে ছবি আঁকবার কাগজ মসৃণ করা হয় এবং চিত্রকরের রুচি অনুযায়ী পালিশ দেওয়া হয়। কিন্তু রঙীন ছবি আঁকবার কাগজ অমসৃণ রাখা হয়।

কাগজ সম্বন্ধে বিচার করতে হলে, বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রণ-প্রণালী ও কাগজের অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষ কাজে প্রয়োগ করতে হলে কাগজের কিরূপ বিশেষ গুণ আবশ্যক, তৈরী করবার সময় কাগজের ভিতর ঐ সব গুণ কিভাবে উৎপন্ন করা যায় এবং কাগজের আভা, ঔজ্জ্বল্য, গঠন-সৌষ্ঠব, আয়তন প্রভৃতির সামান্য পার্থক্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি থাকা দরকার। বহুদিন চর্চার ফলেই এসব বিষয় আয়ত্ত করা যায়।
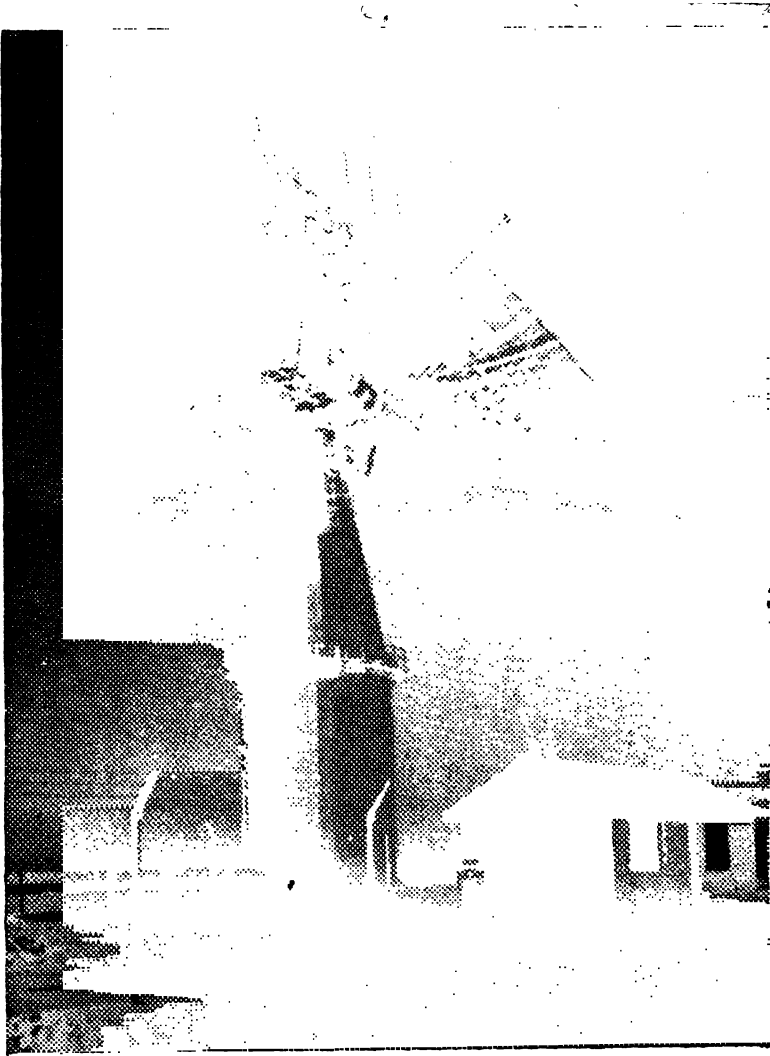
ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর ওয়েষ্টফোর্ডে (ইউ. এস.) স্থাপিত রেডার যন্ত্র। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী যন্ত্র। এর সাহায্যে শুক্রগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন সম্ভব হয়েছে। ৩০০ কিলোমিটারের রেডার-সঙ্কেত প্রেরণ করে শুক্রগ্রহ থেকে তার অতি ক্ষীণ প্রতিফলন পাওয়া গেছে।

বেল

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

শ্রীফলে তুষ্ট হন মহাদেব। এটা খুব সাধারণ প্রবাদ বাক্য। ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে কিংবা ধর্মগ্রন্থে বিল্বপত্রের নানারকম ব্যবহারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকেও বেলের নানারকম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ লেখক বেলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বেলপাতা শিবপূজার অপরিহার্য অর্ঘ্য-সামগ্রী। ইউরোপীয় লেখকগণ বেলের নানারকম নামের উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ Cydonia Bengalensis বা Bengal quince নামে অভিহিত করেছেন। অনেকে এই গাছকে Crataeva religiosa নামে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর গার্সিয়া-দ্যা-ওরাতা একে Marmelos de Bengala বলে উল্লেখ করেছেন। গার্সিয়া-দ্যা-ওরাতা বেলের আমাশয়ে ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আরবীয় গ্রন্থকার সেরপ্যার গ্রন্থে বেল, ফেল এবং সেল নামক তিনটি ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিকিৎসক অ্যাভেসিল ফেল এবং বেল সমার্থক পদ বলে বিবেচনা করেছেন। মাখজান-এল-আদিয়াতে বেলের হৃদ্‌যন্ত্রের উপর ভাল ফলের কথা উল্লেখিত আছে।

বেল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এগেল মারমেলোস কর্‌ (Aegle marmelos corr.) নামে পরিচিত। গাছগুলি ২০-২৫ ফুট উঁচু এবং ৩-৪ ফুট মোটা হয়। গাছগুলি প্রায়ই সোজা হয় এবং এর ডালে বেশ কাঁটা থাকে। জঙ্গলা এবং কর্ষিত দু-রকম ভাবেই এগুলি দেখা যায়। সমগ্র উপহিমালয় অঞ্চল এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বেলগাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে বেলগাছের চাষ হয়। দেশভেদে ফলের আকার নানারকমের হয়।

পাতাগুলি এক সঙ্গে তিনটি করে থাকে। মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে ফুল ফোটে এবং ফল ফলতেও আরম্ভ করে। ফলগুলি ডিসেম্বর থেকে পাকতে আরম্ভ করে। অনেক সময় জুন মাস পর্যন্ত গাছে ফল পাওয়া যায়। পাঁচ থেকে আট বছর বয়স থেকেই গাছগুলি ফল দিতে থাকে। তবে ২৫ থেকে ৩০ বছরের গাছগুলিই পূর্ণ ফলবতী পর্যায়ের আখ্যা লাভ করে।

বেলগাছের বাকল থেকে কষ বের হয় এবং এই কষ আঠা হয়ে যায়। পরিমাণে এই আঠা বেশ কম। বীজ থেকেই সবচেয়ে বেশী আঠা পাওয়া যায়। গেল শতকে এই আঠা ব্যবহৃত হতো সিমেণ্ট ও রঞ্জক দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্যে। ওয়াট উল্লেখ করেছেন যে, যোগীগণ ফলের মণ্ড তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করে। এজন্যে একটা ফল উনুনে উত্তপ্ত করে ফাটিয়ে নিয়ে জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। সেই মণ্ড সারা গায়ে মেখে সন্ন্যাসীগণ স্নান করেন। এতে নাকি শরীর খুব স্নিগ্ধ হয়।

ভেষজ হিসাবে বেলগাছের বিভিন্ন অংশের নানারকমের গুণের কথা উল্লেখিত আছে। বেলের শিকড়ের ছাল দশমূলারিষ্টের একটি বিশেষ উপাদান। পাতার রস চোখের অসুখ ও নানাপ্রকারের ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। এই রস বেশ তেঁতো ও ঝাঁঝালো। জর, সর্দি ও পিত্তাধিক্যে রস জ্বাল দিয়ে খাওয়ানো হয়। সাধুগণ বেলপাতা চিবিয়ে খান, সংযত জীবনের সহায়ক বলে। এতে খাবার ইচ্ছা কমে আসে।

বেলের রাসায়নিক গবেষণা, বলতে গেলে আরম্ভ হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে। দিল্লীর শিখিভূষণ দত্তই এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু রাসায়নিক গবেষণার বেশীর ভাগই সম্পাদিত হয়েছে বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ-রাসায়নিক ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা। এথেকে অনেকগুলি কুমারিন জাতীয় যৌগিক পৃথক করা হয়েছে। আম্বেলিফেরন, মারমেলোসিন, অ্যালোইম্পেরোটিন, মারমেসিন, মারমিন—এই যৌগিকগুলির অন্যতম। এর মধ্যে মারমেলোসিন কাঁচা ফলে পাওয়া যায়। পাকবার সময় এই যৌগিক অ্যালোইম্পেরোটিনে পরিণত হয়। মারমেলোসিন কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ও মূত্র-বৃদ্ধিকারক। এছাড়া মারমেসিন, আম্বেলিফেরন, মারমিনের অল্পবিস্তর ছত্রাক বৃদ্ধি প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। উপক্ষারের মধ্যে স্কিমিয়াসিন, ফ্যাগারিন এবং এগলিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফলের খোলা থেকে এক রকমের হলুদে রং পাওয়া যায়।

জীবনের জন্মকথা

শ্রীপতাকারাম চন্দ্র

আজ পৃথিবীর যে দিকেই তাকাই না কেন, সেখানেই জীবনের সাড়া মিলবে। ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নীচে বেশ কয়েক কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আজ জীবন আধিপত্য বিস্তার করেছে—আকাশে কিছু স্তন্যপায়ী জীব ও বিহঙ্গ থেকে সুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ও ভাইরাস, পৃথিবীর বুকে অসংখ্য রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ, সমুদ্রতলে কতক শৈবাল, মাছ ও নীচুস্তরের প্রাণী এবং মাটির মধ্যেও আবার কত ধরণের জীব বাস করছে। বহু শতাব্দীর গবেষণায় জানা গেছে যে, পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যময় অধিবাসীরা কোন না কোন সরল ও ক্ষুদ্র জীব থেকে এসেছে। এভাবে দেখা যাবে যে, সব জীবই এসেছে অতি ক্ষুদ্র কোন এককোষী জীব থেকে, যাদের অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না। এরা এখনও কোটি কোটি সংখ্যায় পৃথিবীতে বাস করছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, এরা এলো কোথা থেকে? এদের চেয়ে সরল জীব তো হতে পারে না! তাহলে এরা কি পৃথিবী সৃষ্টির গোড়া থেকেই ছিল? তাই বা কি করে হবে? কারণ সুরুতে পৃথিবী তো ছিল একটা জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড মাত্র, যার প্রচণ্ড উত্তাপে এককোষী বা বহুকোষী যে কোন জীবের জ্বলেপুড়ে যাবার কথা! তবে?

এর উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, জীবনের লক্ষণ কি এবং জড় ও জীবে তফাৎ কোথায়। জীবনের প্রধান লক্ষণ হলো তিনটি—

(১) জীব তার পারিপার্শ্বিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করে,

(২) নিজের দেহে নানারকমের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীব ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টি লাভ করে এবং আয়তনে বাড়ে; এবং

(৩) আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে জীব নিজ-দেহ দু-ভাগ করে অথবা কোন জটিলতর এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বংশধারা বজায় রাখে। এর মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে, জীবের জন্ম ও মৃত্যু নেই বলাও চলে।

খাদ্য আত্মসাৎ করা, দেহ-বৃদ্ধি আর প্রজননের ব্যাপারগুলি জড়-পদার্থেও যে কিছু পরিমাণে থাকতে পারে না, এমন নয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে, চিনির সম্পৃক্ত দ্রবে চিনির কেলাসের আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এখানে কেলাসটি

পারিপার্শ্বিক থেকে নিজের অনুরূপ পদার্থ গ্রহণ করে আয়তনে বাড়ে; কিন্তু এই বৃদ্ধি জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের বদলে শুধু ভৌত পরিবর্তনের দ্বারা হচ্ছে। তেমনি যদি কেলাসটি আয়তনে খুব বড় হয়ে যায় তবে মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি বহিঃস্থ শক্তির জন্যেই সেটা কয়েক টুক্‌রাতে ভেঙ্গে যেতে পারে; কিন্তু এই বিভাজন কোন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হবে না—কাজেই কেলাসটির জীবন আছে, একথা বলা চলে না। অবশ্য ভাইরাস নামে কয়েক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আছে যাদের মধ্যে জড় ও জীব, উভয়ের লক্ষণই বর্তমান। জড় ও জীবের যোগসূত্ররূপ এই বিস্ময়কর পদার্থগুলির সাম্প্রতিক আবিষ্কারে জড় ও জীবের মধ্যের তফাৎটা প্রায় মিলিয়ে গেছে। এ-বিষয় পরে আলোচনা করা যাবে।

ভাইরাস আবিষ্কারের আগে সরলতম এককোষী জীবের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিকেরা (প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীদের ঐ নামেই অভিহিত করা হতো) নানা মতবাদের অবতারণা করেন। সেই যুগের এই সব উদ্ভট মতবাদের অনেকগুলিই অতিপ্রাকৃতিক ও ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে তাদের আলোচনা না করলেও চলবে।

রিক্‌টারের 'কস্‌মোজোয়ান' বা মহাজাগতিক বীজরেণু মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বের মহাশূন্যে অতিক্ষুদ্র এবং শক্ত এক ধরণের বীজরেণু, অর্থাৎ স্পোর জাতীয় পদার্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছরেও এগুলি নষ্ট হয় না। এই রেণু যদি কখনও পৃথিবীর মত কোন জীবন-পোষণক্ষম গ্রহে হাজির হয়, তাহলে তখনই সেখানে জীবনের বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি সুরু হবে। এই মতবাদ অনুসারে মঙ্গলগ্রহ ও বিশ্বের আরো যে সব জায়গায় জীবনের চিহ্ন থাকতে পারে, তাদের সব জীবই এই আদি প্রাণবস্তু থেকে উদ্ভূত। আরহেনিয়াস দেখিয়েছেন যে, এই বীজরেণু মহাশূন্যের বিকিরণ চাপের জন্যে সেকেণ্ডে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বেগ পেতে পারে এবং সম্পূর্ণ আর্দ্রতাহীনতার জন্যে মহাশূন্যের নিরতিশয় শৈত্যেও বহু লক্ষ বছর ধরে প্রায় অক্ষত থাকতে পারে। এমন রেণু পৃথিবী থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই শুক্র ও অন্যান্য গ্রহে এবং মাত্র দশ হাজার বছরেই নিকটতম তারাগুলিতে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু এই রেণুর পক্ষে মহাশূন্যের অতিশক্তিশালী বেগুনী-পারের রশ্মি বিকিরণে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয় বলে এই মতবাদ বহুদিন পূর্বেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

জীবনের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করতে গেলে আগে কলয়েড সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কোন কঠিন পদার্থের সাধারণ দ্রব তৈরী করলে ঐ পদার্থটা ভেঙ্গে গিয়ে তার অণুগুলি আলাদা হয়ে দ্রাবকে ভাসতে থাকে। কিন্তু কলয়েড দ্রবে দ্রবণীয় পদার্থগুলি অণুতে ভেঙ্গে না গিয়ে ছোট ছোট টুক্‌রায় ভেঙ্গে যায়। এদের আকার (অণুর তুলনায় খুব বড় হলেও) এত ছোট যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখাই যায় না। এই দ্রবণীয় ও দ্রাবক কঠিন, তরল, অথবা বায়বীয়ও হতে পারে, অর্থাৎ কলয়েড দ্রব ছয় ধরণের হতে পারে। তরল দ্রবকে কঠিন ও তরল দ্রবণীয়ের যে কলয়েড দ্রব হয়, এখানে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

দ্রবণীয় যদি অজৈব পদার্থ হয় তাহলে কলয়েড টুক্‌রাগুলি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িতাবিষ্ট হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তারা ব্রাউনীয় সঞ্চরণ দেখায়। নানা ধরণের ধাতু, লবণ ইত্যাদির এরূপ দ্রব তৈরী করা যায়। এই দ্রব যদি কোন বিপরীত তড়িতাবিষ্ট কলয়েড দ্রব বা যে কোন ক্ষার, অম্ল বা লবণের সাধারণ দ্রব অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংস্পর্শে আসে, তাহলে কলয়েড টুক্‌রাগুলি তঞ্চিত হয়ে নীচে তলানি হিসাবে পড়ে যায়।

কিন্তু দ্রবণীয় যদি জৈব পদার্থ, অর্থাৎ সমযোজ্য কার্বন বা অঙ্গারবাহী কোন জটিল রাসায়নিক পদার্থ হয় তবে সে দ্রব সহজে তঞ্চিত হয় না। কারণ এই কলয়েডের প্রত্যেকটি টুক্‌রা তার চারদিকে বহুসংখ্যক জলের অণু আকৃষ্ট করে। ফলে জলের লম্বা অণুগুলি কলয়েড টুক্‌রার গায়ে লম্বভাবে আট্‌কে গিয়ে একটা স্থায়ী ও অপরিবাহী আবরণের সৃষ্টি করে, যা বৈদ্যুতিক আধানকে প্রশমিত হতে দেয় না। এর গায়ে গায়ে আবার জলের অণু আট্‌কে গিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা আরও বেশীসংখ্যক এককেন্দ্রীক আবরণের সৃষ্টি করে; কিন্তু ভিতরের আবরণের তুলনায় বাইরেরগুলি তত শক্ত ও স্থায়ী হয় না। উদাহরণস্বরূপ দুধ, গঁদের আঠা ইত্যাদির নাম করা যায়। বিপরীত তড়িতাবিষ্ট এ-ধরণের দুটি কলয়েড দ্রব একসঙ্গে মেশালে বিপরীত-ধর্মী টুক্‌রাগুলি একে অপরকে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু ঐ জলীয় আবরণের জন্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশতে এবং নিজেদের বৈদ্যুতিক আধানকে প্রশমিত করতে পারবে না। ফলে, তারা একটা জেলির মত ঘন পদার্থরূপে তলানি পড়ে যাবে। একে বলে কোয়াজারভেট।

এককোষী জীবের দেহের প্রায় সবটাই প্রোটোপ্লাজম নামে এক ধরণের আকারহীন পদার্থে তৈরী। ওপারিন প্রমুখ বহু গবেষক কোয়াজারভেটের ভিতর প্রোটোপ্লাজমের প্রায় সব কিছু গুণাবলীই লক্ষ্য করেছেন। কোয়াজারভেট পারিপার্শ্বিক থেকে অপেক্ষাকৃত সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থকে নিজের গা দিয়ে আত্মসাৎ করে বা খেয়ে ফেলে। বিভিন্ন এককোষী জীবের মত এক এক রকমের কোয়াজারভেট এক এক রকমের খাবার খেয়ে থাকে, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক থেকে তারা এক এক ধরণের জৈব পদার্থ টেনে নেয়। এর ফলে যে কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কোয়াজারভেট বাড়বার জন্যে বিভিন্ন মাত্রায় সুযোগ পায়। তছাড়া একই ধরণের ছোট ও বড় কোয়াজারভেটের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতা সুরু হয় এবং ছোট কোয়াজারভেটদের শরীরের বহু অংশ বড় কোয়াজারভেটরা-আত্মসাৎ করে নিজেদের দেহের আয়তন দ্রুত বাড়াতে থাকে। কিন্তু দেহের আয়তন ব্যাসের ঘনফলের অনুপাতে বাড়ালে উপরিতল বা গাত্রদেশের কালি বর্গফলের অনুপাতে বাড়বে। সুতরাং আকার (বা ব্যাস) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আয়তনের এবং প্রয়োজনের তুলনায় গাত্রদেশের পরিমাণ কমে যাবে এবং ফলে খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেবে। এর প্রতিকার করবার জন্যে কোয়াজারভেটা মাঝখানে ভেঙ্গে দু-টুক্‌রা হয়ে গিয়ে গাত্রতলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কোয়াজারভেটের এই দুভাগে ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারটা জীবন্ত কোষের দেহ দু-ভাগে ভাগ হয়ে প্রজনন ক্রিয়ারই অনুরূপ। প্রোটোপ্লাজম ও প্রোটিন এবং অন্যান্য কয়েক ধরণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ কোয়াজারভেটের মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট জলীয় কলয়েড দ্রব মাত্র। এই কোয়াজারভেটরূপী আদিম এককোষী জীব থেকে জৈব বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ক্রমে বহুকোষী ও উন্নত ধরণের জীবের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করবার বহু যুক্তি রয়েছে।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোয়াজারভেট বা আদিম এককোষী জীব খাদ্য হিসেবে যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে, সেগুলি পৃথিবীতে প্রথম এলো কোথা থেকে? আজ কাল পরীক্ষাগারে প্রায় সব রকমের জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করা সম্ভব। এই সব সংশ্লেষণের কাজ আরম্ভ হয় সাধারণতঃ অঙ্গারাম্ল গ্যাস অথবা কোন সরল গঠনের হাইড্রোকার্বন থেকে। আজ থেকে প্রায় একশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন কমে গিয়ে ভূত্বক জমে কঠিন হতে সুরু করে, তখন এই প্রাথমিক আগ্নেয় শিলার মধ্যে যে বহু ধাতব

কার্বাইড ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কমে গেলে (ভূত্বকের তাপমাত্রা ঐ সময়ে অবশ্য ১০০° সে-র বেশীই ছিল) প্রথম বৃষ্টিপাত স্বরু হয়—যে বৃষ্টি হয়তো বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকে। এই জলের সঙ্গে ধাতব কার্বাইডের রাসায়নিক সংযোগ ঘটবার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে (প্রথমে সমুদ্রে) বেশ কিছু পরিমাণ হাইড্রোকার্বনের উৎপত্তি হয়। তখনকার আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ফলে এই সব হাইড্রোকার্বন থেকে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তির খুবই সম্ভবনা ছিল। এই ধরণের সংশ্লেষণের কাজে পরীক্ষাগারে নানাজাতীয় অনুঘটকের সাহায্য নেওয়া হয়। পৃথিবীর পরীক্ষাগারে অবশ্য এই সব অনুঘটক ছিল না। অনুঘটক না থাকলে এই সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া খুবই ধীরে গতিতে অগ্রসর হয়। তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু আসে-যায় না; কারণ এই প্রক্রিয়ায় কয়েক কোটি বছর কেটে গেলেও পৃথিবীর কাছে সে সময়টা খুবই সামান্য। এই ধরণের সংশ্লেষণের কাজ আজও চলছে—যেমন—বিদ্যুৎ চমকালে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অম্লজান মিলে নানারকম অক্সাইডের উৎপত্তি হয়, যেগুলি পরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

এভাবেই যদি জীবনের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে প্রাণহীন জটিল জৈব পদার্থ থেকে আজও নতুন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব ঘটা অসম্ভব নয়। হয়তো বর্তমান সমুদ্রের তলদেশে "উজ্" জাতীয় পললে এখনো তা ঘটছে। জীবনের এভাবে উৎপত্তি সম্ভব কিনা, দেখবার জন্যে বহু বিজ্ঞানী জীবাণুশূন্য দুধ ইত্যাদি বহু বছর রেখে দিয়ে পরীক্ষা-কার্য চালিয়েছেন; কিন্তু নতুন জীবনের কোন সন্ধান তাঁরা আজও পান নি। তাতে অবশ্য উপরিউক্ত তথ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নি; কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, যথোচিত অনুঘটকের অভাবে এ কাজ ধীরে ধীরে কয়েক লক্ষ বা কোটি বছরে সম্পূর্ণ হবে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক ধরণের রোগ-জীবাণু মানুষের ইতিহাসে শেষের দিকে প্রথম দেখা দিয়েছে বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন।

ভাইরাস নামে এক অপজীবাণুর কথা আলোচনা না করলে জীবনের জন্মের আর একটা দিক বাদ পড়ে যাবে। উদ্ভিদের বহু রোগ এবং সর্দি, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি প্রাণী-জগতের বহু দুরারোগ্য ব্যাধির মূলে আছে ভাইরাস। আসলে এরা লম্বা অণুবিশিষ্ট জীবনহীন জৈব পদার্থ, যেগুলি কলয়েড অবস্থার পরিবর্তে কেলাসিত অবস্থায় থাকে। পরীক্ষাগারে এদের নানারকম কেলাস তৈরী করা যায়; কিন্তু উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়লে এদের মধ্যে জীবনের পূর্বোক্ত তিন রকম লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। এরা তখন অন্যান্য জৈব পদার্থ দিয়ে নিজের রাসায়নিক গঠনবিশিষ্ট জৈব যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষিত করে। এভাবে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করে এবং কিছু সময় অন্তর নিজের দেহকে অর্থাৎ কেলাসকে ভেঙ্গে দু-ভাগ করে প্রজননের কাজও চালায়। ভাইরাসের কেলাস জীবনের কোন লক্ষণ না দেখিয়ে সুপ্ত অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বছর পড়ে থাকতে পারে—আবার অনুকূল অবস্থা পেলেই বেঁচে ওঠে। ভাইরাস ও তার প্রকৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা হতাশ হয়ে বুঝলেন যে, ভাইরাস-ঘটিত রোগ থেকে মানুষ কখনো সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে না; কারণ পৃথিবী থেকে সব ভাইরাস নষ্ট করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁরা একথাও বুঝলেন যে, যে কোন ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন একবার জানতে পারলে জীবনের রহস্য উদ্ধার করা এবং পরীক্ষাগারে মানুষের পক্ষে নতুন জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, এ কাজ মানুষের সামান্য আয়ুষ্কালের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা যাবে। ভাইরাস মানুষের জীবনে যে দুঃখ ও দুর্দশা এনে দিচ্ছে, তার মধ্যে আশার আলো ঐটুকু।

মানবজীবনে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সাহা

আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে মানুষে মানুষে এত বৈষম্য কেন? সৃষ্টির আদিকাল থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ অন্ততঃ এটুকু বুঝতে শিখেছে যে, বাঁচবার তাগিদে তাকে সংগ্রাম করতে হয়। দেখা গেছে, এই জীবন-সংগ্রামে কেউ এগিয়ে আছে, কেউ পিছিয়ে আছে—আবার এই দুয়ের মাঝে কেউ বা নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে এত ব্যবধান কেন? বহুদিন পর্যন্ত এই পার্থক্যের কারণ মানুষের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সবাই স্বীকার করেছেন যে, বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও পার্থক্যের একমাত্র কারণ।

বংশগতি এবং পরিবেশ—এই দুয়ের সমন্বয়ে ভ্রূণের প্রকৃতি পর্যালোচনা ও তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি বিশিষ্ট কোষে ভ্রূণের জন্ম। প্রাণী-বিজ্ঞানে একে জীবকোষ (Zygote) বলা হয়ে থাকে। এই জীবকোষের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ মানুষের সব কিছু সম্ভাবনা। তার দৈহিকগঠন ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার মূল নিহিত থাকে এই জীবকোষেই। নরনারীর জননকোষের সম্মিলনের ফলেই ভ্রূণের জন্ম। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণ পিতা-মাতার কাছ থেকে শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতির যে সব মৌলিক উপাদান নিয়ে আসে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে সব অবস্থা বা প্রকৃতির বিকাশ সাধন ঘটে। শিশুর দৈহিক গঠন কেমন হবে, ভবিষ্যতে সে দায়িত্বশীল নাগরিক হবে, না হীনচরিত্র হয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, তাও বহুলাংশে এই পারিপার্শ্বিকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, পিতা-মাতা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হলে সন্তানেরা সাধারণতঃ সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। পিতা-মাতার দৈহিক গঠন ও প্রকৃতি যেমন হয় শিশুও তার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। কেন এমন হয়?

পিতা-মাতা উভয়ের দেহকোষে ২৪ জোড়াকরে বংশসত্তাবাহী কণিকা অর্থাৎ ক্রোমোজোম থাকে এবং জননকোষে থাকে তার অর্ধেক। প্রত্যেক জোড়ার দুটি সমজাতীয় ও সমগুণসম্পন্ন; অবশ্য সমজাতীয় অসমধর্মীও হতে পারে। যেমন পিতা-মাতা উভয়েই যদি দীর্ঘকায় হন, তবে সাধারণতঃ শিশু উভয়ের কাছ থেকেই এই লম্বা হওয়ার গুণটি পাবে এবং পরিণামে সে লম্বাই হবে। কিন্তু যদি পিতা অপেক্ষাকৃত খাটো এবং মাতা লম্বা হন, তাহলে পিতা-মাতার এই সমজাতীয় অসমধর্মী গুণ সংযোগে জাত শিশু পিতার মত খাটো বা মায়ের মত লম্বা হবে। যদি খাটো হয় তবে তার মধ্যে মায়ের লম্বা ভাবটিও রয়ে যাবে সুপ্তভাবে। ভবিষ্যতে যদি সেই শিশুর সঙ্গে বিশুদ্ধ লম্বা মেয়ের মিলন ঘটে, তাহলে সন্তানেরা লম্বাই হবে। তেমনি গায়ের রঙের বেলায় যদি পিতা সম্পূর্ণ কালো আর মা সম্পূর্ণ ফর্সা হন, তাহলে শিশুর গায়ের রং সাধারণতঃ ফর্সাই হবে—অবশ্য তার মধ্যে পিতার গায়ের কালো রঙের ভাবটা সুপ্ত থেকে যাবে। চোখের রঙের বেলায়ও দেখা যায়, শিশু সাধারণতঃ বাপের

চোখের রঙেরই অধিকারী হয়ে থাকে। পিতার চোখের রং যদি কটা আর মায়ের চোখের রং যদি কালো হয়, তাহলে শিশুর চোখের রং কটাই হবে—যদিও তার ভিতরে মায়ের চোখের কালো রঙের ভাবটাও সুপ্ত থেকে যাবে। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, পিতা-মাতার গুণ যদি অসমধর্মী হয় তাহলে তার মধ্যে একটি প্রকাশ্য এবং অন্যটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যেটি প্রকাশ্য, অর্থাৎ প্রবল, সেটিই শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়, আর যেটি সুপ্ত, সেটি অপ্রকাশিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার গুণটিই হয় প্রবল, আবার কখনও কখনও মায়ের গুণটিই প্রাধান্য লাভ করে।

পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ কেবল বর্ণের দিক দিয়েই শিশুতে আবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য মানসিক ক্ষেত্রেও তা শিশুতে বর্তায়। যেমন ধরা যাক, গান গাইবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা। পিতা-মাতার জননকোষের সংমিশ্রণে যদি এমন ঘটে যে, পুং-কোষের সঙ্গীত ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্রোমোসোম, স্ত্রী-কোষের সঙ্গীত-ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্রোমোসোমের সঙ্গে একত্রিত হয়, তাহলে সাধারণতঃ শিশুর মধ্যে সঙ্গীত-ক্ষমতা জন্মায়। এই সঙ্গীত-ক্ষমতা শিশু জন্মসূত্রে পায় বলে একে জন্মগত বলা হয়। আবার এই ক্ষমতা শিশু বংশপরম্পরায়ও পেতে পারে। যেমন—পিতামহ, মাতামহী উভয়ের গান গাইবার শক্তির সংমিশ্রণ ঘটলে, সে শক্তি পিতার মধ্যে বর্তাতে পারে। এভাবে শিশু পিতা-মাতার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বতন পিতৃ-মাতৃকুলের গুণাগুণ কিছু না কিছু পেয়ে থাকে। এজন্যেই আমরা পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কোন কোন শিশুর সময় সময় মিল দেখতে পাই। বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির গুণাগুণ বর্তানোকেই বংশগতি বলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বংশগতির অর্ধেক ধারাই শিশু পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকে। বাকী পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে আশা করতে পারে।

পিতা-মাতার দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য যেমন শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তাদের বিচারবুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দও শিশুর মধ্যে দেখা যায়। বংশগতির সমর্থকেরা বলে থাকেন যে, ভাবীজীবনে শিশু কতখানি উৎকর্ষ লাভ করবে, তা শিশুর অন্তর্নিহিত এই সব গুণাবলীই ঠিক করে দেয়। তাঁদের মতে, এই সব শক্তি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। জগতে যে কয়জন বড় হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বংশগতি-সমর্থকদের মতে, তাঁদের মধ্যে বড় হওয়ার গুণ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। একই পরিবেশে কত ছেলেই তো মানুষ হচ্ছে, কিন্তু কই সবাই তো আর বিদ্যাসাগর হয় না?

পক্ষান্তরে শিশুর জীবন গঠনে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকেও উপেক্ষা করা যায় না। সুশিক্ষা ও সুপরিবেশের ফলে কত বিপথগামী শিশুকে সুপথে চালনা করা সম্ভব হয়েছে, তার দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

কাজেই দেখা যায়, মানুষের জীবনে বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনীয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পিতা-মাতার কাছ থেকে আমরা যা পাই, পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সেই গুণাগুণ বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়। প্রকৃতির এই বিভিন্ন অবস্থাকেই আমরা পরিবেশ বলে থাকি। সুপ্ত শক্তির বিকাশ হয় উপযুক্ত অবস্থায়, আবার অবস্থা পরিবর্তনে সেই শক্তি চিরকালের জন্যে সুপ্তই থেকে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উদ্ভিদের জন্মকথা। আমরা সবাই দেখেছি যে, একটি উদ্ভিদের জন্ম, তার বৃদ্ধি, ফলোৎপাদন সবই নির্ভর করে তার বীজ, জমি ও আবহাওয়ার প্রকৃতির উপর। বীজের মধ্যেই ভাবী বৃক্ষ-শিশু সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কি ভাবে, কেমন করে সেটি সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পাবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে—যে জমিতে বীজটিকে রোপণ করা হয়, সে জমির উর্বরতা এবং পরিবেশের উপর। একই বৃক্ষের দুটি সতেজ বীজ দুটি বিভিন্ন স্থানে রোপণ করা হলো। একটি রোদ, জল, বায়ু—সবই পেলো, অন্যটি জল ও বায়ু পেলো কিন্তু রোদ পেলো না। কয়েকদিন পরে দেখা গেল—রোদ, জল ও বায়ু—এই তিন উপাদানে পরিপুষ্ট উদ্ভিদ-শিশু একটি সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হলো, কিন্তু অপর বীজটির তখন অঙ্কুরোদ্গম হলো বটে, কিন্তু আলোর অভাবে শুকিয়ে মরে গেল। আবার ঐ বৃক্ষেরই একটি নিস্তেজ বীজকে রোপণ করা হলো উপযুক্ত পরিবেশে। দেখা গেল, তাতে অঙ্কুরোদ্গমই হলো না। এতে বোঝা গেল, শেষোক্ত বীজটি তার উৎস-বৃক্ষ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত ছিল। কাজেই উদ্ভিদের পক্ষে যেমন বীজ, জমি ও উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন, মানুষের পক্ষেও তেমন

বংশগতি এবং উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন।

দুটি জননকোষের সম্মিলনে ফলে শিশুর জন্ম হয়। এর ফলে শিশু যে দৈহিক ও মানসিক গুণাগুণ পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তার বিকাশ সাধন হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে শিশু পিতা মাতার বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হয় কিনা, তা নিয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে। অনেকে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, পিতা-মাতা সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন হলে সন্তানাদিও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। পিতা-মাতা উভয়েই হীনবুদ্ধি হলে সাধারণতঃ তাদের সব শিশুই হীনবুদ্ধি হয়।

পিতা-মাতার অর্জিত গুণ সন্তানে বর্তায় কিনা, সে প্রশ্নও মাঝে মাঝে শোনা যায়। অনেকের ধারণা—পিতা-মাতার অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক হতে পারে; কিন্তু এ-ধারণা ভুল। কারণ ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারই হয় না, উকিলের ছেলে উকিলই হয় না; কোন শিশুই বিশেষ দক্ষতাপূর্ণ কাজ করবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। যদি কোন শিশুকে আমরা জন্মকবি বা জন্মশিল্পী হতে দেখি, তাতে এই বুঝি যে, শিশুটির মধ্যে কবি বা শিল্পী হবার সহজাত সম্ভাবনা রয়েছে এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তা সহজে বিকশিত হবে।

বংশগতি শিশুর জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তা যমজ সন্তানের দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। যমজ সন্তান দু-রকমের হতে পারে—অভিন্ন ও ভ্রাতৃস্থানীয়। যে সব যমজ সন্তান একই জীবকোষ থেকে উৎপন্ন, তাদের অভিন্ন যমজ বলা হয়; আর যারা পৃথক জীবকোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের ভ্রাতৃস্থানীয় বলা যেতে পারে। এই ধরণের যমজ সন্তানদের বিভিন্ন পরিবেশে রেখে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, একই জীবকোষ থেকে উৎপন্ন যমজদের পরস্পরের মিল, পৃথক জীবকোষ থেকে উৎপন্ন যমজদের চেয়ে ঢের বেশী। একই জীবকোষজাত সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের দৈহিক গঠন, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষায় হুবহু মিল রয়েছে। এদের একজনের কোন রোগের ছোঁয়াচ লাগলে অন্য জনেরও তা হতে দেখা যায়। শারীরিক বৃদ্ধি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াও তাদের একরকম। একজনের মানসিক দুর্বলতা দেখা গেলে অন্য জনেরও তা দেখা যায়। একবার এ-জাতীয় যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করা হলো। তারা ছিল শ্যাম দেশীয় যমজের মত দু-বোন। তাদের বিভিন্ন পরিবেশে রেখে মানুষ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, তাদের একই সময়ে দাঁত ওঠে, তারা একই সময়ে হাঁটতে এবং কথা বলতে শেখে। তারা দুজনেই ছিল সঙ্গীত-প্রিয়, বাচাল এবং লঘুপ্রকৃতির। একই দিনে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। শেষে দেখা যায়, একই দিনে তারা সংসার পরিত্যাগ করে আশ্রমবাসিনী হয়েছে। তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে এই যে মিল এটাই প্রমাণ করিয়ে দেয় যে, তারা একই উপাদানে তৈরী এবং তাদের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিকাশ একইভাবে হয়েছে।

আর একবার দুটি ছোট যমজ শিশুকে সিঁড়িতে চড়া শেখানো হয়েছিল। এদের কেউ জানতো না, কেমন করে সিঁড়িতে উঠতে হয়। একজনকে নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করে সিঁড়িতে চড়া শেখানো হলো। অন্যজনকে কিছুই শেখানো হলো না। উভয়কে পরীক্ষা করা হলো। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-প্রাপ্ত শিশুটিই এ-পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছিল; দ্বিতীয় শিশুটি সিঁড়ির একধাপও উঠতে পারল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পরে দেখা গেল, দ্বিতীয় শিশুটি নিজেই সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠে বসে আছে। সুতরাং কোন কাজ পারা না পারা সব সময় শিক্ষার উপর নির্ভর করে না, দৈহিক বৃদ্ধিও তার যথেষ্ট কারণ। শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি যেদিন পূর্ণতা লাভ করলো, সেদিন সে আপনা থেকেই সবগুলি ধাপ পেরিয়ে গেল।

এখন অনেকের হয়তো মনে হবে, এখানে পারিপার্শ্বিকের বুঝি কোন মূল্য রইলো না; কিন্তু তাহলে আমরা ভুল করবো। একই জীবকোষজাত সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, বংশগতির প্রভাব তাতে যতখানি, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবও ঠিক ততখানি রয়েছে। দুটি মেয়ে—পাঁচ মাস যখন তাদের বয়স, তখন তাদের আলাদা করে দুজন আত্মীয়ের কাছে রাখা হয়। একজন থাকে শহরে, আর একজন গ্রামে। তাদের বয়স যখন ২৮ বছর তখন তাদের আবার পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, শহরে মেয়েটি কিছু লেখাপড়া শিখে কোন অফিসে কেরাণীর কাজ করছে, আর অন্য মেয়েটি পড়াশুনা করতে পারে নি; সে কোন একটা খামারে কাজ নিয়েছে। গ্রামের মেয়েটিকে

আরও পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, সে শহরের মেয়েটির চেয়ে লম্বায় এক ইঞ্চি বড়, ওজনে ২৮ পাউণ্ড বেশী, কথাবার্তায় বেশ চট্‌পটে আর মেয়েলীপনায় পটু। বুদ্ধির পরীক্ষায় শহুরে মেয়েটি অবশ্য বেশী নম্বর পায়।

এরূপ আরও কয়েকটি যমজ শিশুকে পরীক্ষা করেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। এসব পরীক্ষা থেকে পারিপার্শ্বিকবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত তারতম্য নির্ভর করে পরিবেশের উপরেই। তাহলে আমরা দেখতে পাই, পরিবেশের কাজই হলো নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত হবার পথ করে দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশের ফলে গ্রামের মেয়েটির এমন কতকগুলি গুণ প্রকাশ পেয়েছে, যা উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে শহরের মেয়েটির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে নি। আবার শহরে মানুষ হওয়ার জন্যে একটি মেয়ের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বেড়েছে; কিন্তু গ্রামের মেয়েটির বেলায় তা ঘটতে পারে নি। কাজেই বুঝা যায়, পারিপার্শ্বিকও মনুষ্য জীবনকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ঐ দুটি মেয়েকে যদি পারিপার্শ্বিক বদলে দিয়ে, অর্থাৎ শহরের জনকে গ্রামে এনে এবং গ্রামের জনকে শহরে রেখে কিছুদিন পরে পরীক্ষা করা যেতো, তাহলে হয়তো তাদের মূলগত মিলটা আরও বেশী করে চোখে পড়তো। অবশ্য তারা যদি একই জীবকোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে তবেই একথা বিশেষভাবে খাটবে। বিভিন্ন জীবকোষ-জাত যমজের ক্ষেত্রে কিন্তু একই পরিবেশে বিভিন্ন রকম ফল হতে পারে।

এ-তো গেল যমজ সন্তান নিয়ে বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিকের আলোচনা। এবার দেখা যাক একই পরিবারে দুটি শিশু বিভিন্ন রকমের হয় কেন?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই পরিবারে এবং একই রকম অবস্থার মধ্যে বাস করেও একই পিতামাতার সন্তানসন্ততি একরকম না হয়ে বিভিন্ন রকমের হয় কেন? আমরা লক্ষ্য করেছি, একমাত্র যমজ সন্তান ছাড়া দুটি শিশুর সামাজিক পরিবেশ কখনও এক হয় না। পরিবারের শিশুর স্থান অনুযায়ী পরিবেশেরও বদল হয়। এ জন্যে একই পরিবারে বড়, মেজো, সেজো ও ছোটকে একরকম দেখতে পাই না। তাছাড়া বালক-বালিকা-ভেদে এই পরিবেশের পার্থক্য আরও বেশী হয়ে থাকে।

পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন শিশু যেমন বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি বংশগতির দিক দিয়েও তারা বংশের বিভিন্ন ধারার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে কে কোন্ ধারার উত্তরাধিকারী হবে তা বলা শক্ত। কারণ, বংশসত্তাবাহী জননকোষের মিলনের আগে তাদের অভ্যন্তরে কোন কারণে কিছু জটিল পরিবর্তন ঘটে। প্রত্যেক জননকোষই সত্তাবাহী কণিকা বা ক্রোমোজোমের অর্ধেক অংশ থাকে। উভয় জননকোষ মিলনের ফলে কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা আবার পূরণ হয়। অর্থাৎ পুং-জননকোষের ১২ জোড়া এবং স্ত্রী-জননকোষের ১২ জোড়া মিলে নিষিক্ত কোষে (ভ্রূণ-কোষে) আবার সেই ২৪ জোড়া ক্রোমোজোমই একত্রিত হয়। কাজেই মিলনের সময় যেসব গুণ-বহনকারী কণিকা বর্তমান থাকবে সেই কণিকাগুলিই শিশুর শারীরিক ও মানসিক গুণ স্থির করবে। যেমন ধরা যাক, গায়ের রং—কালো বা সাদা রং। এই দুটি সমজাতীয় অসমধর্মী গুণের মধ্যে হয়তো দুটি জননকোষের মিলনের পূর্ব মুহূর্তে কালো রঙের গুণযুক্ত কণিকাটি বাদ পড়ে গেল দুটি জননকোষ থেকেই। বাকী রইলো সাদা রঙের গুণযুক্ত কণিকাটি। এবার এই সাদা রঙের গুণযুক্ত কণিকা দুটির মিলন ঘটলেই একাধারে যেমন ভ্রূণের মধ্যে সাদা রং প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা যাবে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন জননকোষ দুটি মিলিত হয়ে পুনরায় ২৪ জোড়া ক্রোমোজোমে পূর্ণ হয়ে উঠবে। যে মিলিত জীবকোষ থেকে ভ্রূণ জন্মগ্রহণ করে, তাতে মোট ৪৮টি, অর্থাৎ ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। কাজেই যে সত্তাগুলি মিলিত জীবকোষটির মধ্যে থাকে, শিশুই বংশের সেই সত্তাগুলির অধিকারী হয়। একই পিতা-মাতার বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন প্রকারের হয় কেন—এটিই তার একটি প্রধান কারণ।

বংশগতি এবং পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক শিশুই বিভিন্নমুখী সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে সেই সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে। সম্ভাবনা যার মধ্যে যত বেশী, ভাবী জীবনে সে-ই তত বেশী প্রতিভামুখী হয়; আর সম্ভাবনা যার যত কম, উপযুক্ত পরিবেশেও তাথেকে ফল লাভ করা যায় না। এজন্যেই আজ অমরা মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত পার্থক্য দেখি। এরই জন্যে সবাই আইনষ্টাইন অথবা বিদ্যাসাগর হতে পারে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর যাবৎ জীবদেহের উপর মহাকাশ পরিক্রমার ফলাফল নিয়ে গবেষণা করছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে গত ২রা জুলাই '৫৯ এক উচ্চস্তরের বায়ো-মেডিক্যাল পরীক্ষার্থে ডন্টলেস নামে একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কুকুর ও একটি খরগোসকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রভাগে স্থাপন করে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরে পাঠিয়ে আবার সাফল্যের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে এনেছেন। চিত্রে প্রদর্শিত কুকুরটি গত ১০ই জুলাই '৫৯ অপর একটি কুকুরের সঙ্গে চতুর্থবারের জন্যে রকেট-যাত্রী হবার গৌরব অর্জন করেছে।

কার্বন

বিশুদ্ধ কয়লাই হলো কার্বন। প্রায় দু-শ' বছর হলো কয়লার প্রচলন হয়েছে। বাড়ীঘরে উত্তাপ দান, কলকারখানার কাজ, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতিতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। তারপর প্রায় ১৯০০ সাল থেকে অনেক কাজে পেট্রো-লিয়ামের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে গেছে। হয়তো ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির কদর বেশী হবে। তাহলেও, এখন কয়লার অভাব হলে ইস্পাত উৎপাদন ও অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

যে সব পরমাণু দিয়ে কয়লা গঠিত, তারা পূর্বে ছিল উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীরে। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীরে কার্বন থাকে। যে সব বিভিন্ন পরমাণুর সমন্বয়ে মানুষের দেহ গঠিত, তাদের শতাংশের দশ ভাগই কার্বন।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীর প্রধানতঃ চারটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। জলা-জায়গার গাছপালা মরে গেলে সেগুলি জলের নীচে আস্তে আস্তে পচতে থাকে। কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন সমন্বিত বৃহদাকার জটিল অণুগুলি বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্রাকার অণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রাকার অণুগুলি নাইট্রোজেন কিংবা অ্যামোনিয়ার মত গ্যাস অথবা জলের মত তরল পদার্থ হতে পারে। এগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ থেকে মুক্ত হয়। এভাবে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু পালিয়ে যায়। খানিকটা কার্বন পরমাণু ক্ষুদ্র অণুর আকারে নির্গত হয়ে গেলেও, অধিকাংশ কার্বন পরমাণুই থেকে যায়। এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে অধিকতর কার্বন-প্রধান হতে থাকে। শুকনো কাঠের অর্ধেকই কার্বন। তারপর পীট, লিগ্‌নাইট ও বিটুমিনাস কয়লাতে কার্বন থাকে শতাংশের প্রায় ৬০,৬৭ ও ৮৮ ভাগ। অবশেষে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লাতে কার্বনের পরিমাণ হয় শতাংশের ৯৫ ভাগ। কার্বন ছাড়া অন্যান্য পরমাণু এত বেশী থাকে বলেই বিটুমিনাস কয়লা জ্বালালে এত ধোঁয়া হয়। অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা জ্বালালে বিশেষ ধোঁয়া হয় না। অ্যানথ্রাসাইটের চেয়ে বিটুমিনাস কয়লাই অনেক বেশী পাওয়া যায়। কলকারখানায় বিটুমিনাস কয়লাই বেশী ব্যবহার করা হয়। এই জন্যে কলকারখানায় কয়লা জ্বালালে এত ধোঁয়া দেখা যায়।

কয়লা উৎপাদনের জন্যে অনেক উদ্ভিদের দরকার। হিসাব করে দেখা গেছে, ভূগর্ভে এক ফুট পুরু স্তরের কয়লা উৎপন্ন করতে চব্বিশ ফুট উদ্ভিদ-স্তরের দরকার হয়। ভূগর্ভে কোটি কোটি টন কয়লা আছে। কাজেই অসংখ্য বনজঙ্গল বর্ধিত হবার পর

মরে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে—তার ফলেই এই পরিমাণ কয়লা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার জন্যে লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর।

নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাঠ পুড়িয়েও কয়লা করা যায়। কাঠকয়লার গুঁড়ার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, অনেক প্রকার বস্তুর অণুকে এই গুঁড়া আটক করতে পারে, অর্থাৎ এসব বস্তুর অণু কয়লার গুঁড়ার গায়ে লেগে থাকে। বস্তুর অণু যত বড় হবে ততই দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। এই জন্যে কাঠকয়লার চূর্ণ রঙীন পদার্থকে বর্ণহীন করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। লাল চিনির সরবতে খানিকটা কয়লা-চূর্ণ যোগ করলে, রঙীন ভেজালের অণু কয়লার কণার গায়ে লেগে থাকবে। কিন্তু চিনির অণু কয়লার কণাকে স্পর্শও করবে না। কয়লা ছেঁকে নিয়ে তরল পদার্থটি বাষ্পীভূত করলে, নীচে সাদা চিনি পড়ে থাকবে। কাঠকয়লার গুঁড়া গ্যাস-মাস্কে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস-মাস্কের ভিতর দিয়ে শরীরে বিষাক্ত বায়ু টেনে নেবার সময় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণু কয়লার ভিতর দিয়ে সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বড় অণু কয়লার কণার সঙ্গে লেগে থাকে; কাজেই শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

গ্র্যাফাইটও একপ্রকার কার্বন, মাটির নীচে পাওয়া যায়। কয়লাতে পরমাণুগুলি থাকে বিশৃঙ্খলভাবে; অপর পক্ষে গ্র্যাফাইটের পরমাণুগুলি থাকে সুসম্বদ্ধ হয়ে; অর্থাৎ গ্র্যাফাইট হলো কার্বনের কেলাসিত বা স্ফটিকতুল্য আকার। কয়লা থেকেও গ্র্যাফাইট তৈরী করা যায়। বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ চালিয়ে কয়লা উত্তপ্ত করলে, কয়লার পরমাণুগুলি আস্তে আস্তে সুসম্বদ্ধ হয়ে গ্র্যাফাইটে পরিণত হবে। ৭০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে গ্র্যাফাইট প্রজ্জ্বলিত হয়। গ্র্যাফাইটের পরমাণুগুলি থাকে স্তরে স্তরে। এই সব বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ার ঝোঁক থাকে বলেই গ্র্যাফাইট থেকে সহজেই আঁশ বেরিয়ে আসে। গ্র্যাফাইটের গুঁড়া হাতে নিলে পিছল লাগে। প্রকৃতপক্ষে গ্র্যাফাইট-চূর্ণ মসৃণ করবার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেখানে দুটি কঠিন পদার্থের ঘর্ষণ হচ্ছে, সেখানে খানিকটা গ্র্যাফাইট-চূর্ণ দিলে জায়গাটি মসৃণ হয়ে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় অনেক কমে যাবে। লেখবার পেন্সিলে গ্র্যাফাইট থাকে। লেখবার সময় যাতে সহজে ভেঙ্গে না যায়, তার জন্যে গ্র্যাফাইটের সঙ্গে খানিকটা মাটি মেশানো হয়।

গ্র্যাফাইটের পরমাণুগুলি সুসম্বদ্ধ হয়ে থাকলেও যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের খুব নীচে এরূপ কার্বনের ডেলা দেখা যায়, যাদের যথেষ্ট তাপ ও চাপ সহ্য করতে হয়। এ-অবস্থায় পরমাণুগুলি খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে নিরেট হয়ে থাকে। এভাবে গ্র্যাফাইটের ন্যায় আর একটি ভিন্ন রকমের স্ফটিকতুল্য কার্বন পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় প্রকারের স্ফটিকতুল্য পদার্থটিও গ্র্যাফাইটের ন্যায়ই বিশুদ্ধ কার্বন।

কিন্তু দুটির রূপ একেবারে ভিন্ন। গ্র্যাফাইট হলো কালো ও নরম; কিন্তু নতুন পদার্থটি বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও সবচেয়ে কঠিন। গ্র্যাফাইট বিদ্যুৎ পরিবহন করে। ফ্লাশ-লাইটে গ্র্যাফাইটের দণ্ড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নতুন পদার্থটি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। গ্র্যাফাইট সুলভ, কিন্তু অপরটি দুর্লভ এবং অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। এই নতুন স্বচ্ছ পদার্থটি হলো হীরক। কয়লা ও গ্র্যাফাইটের মত হীরকও বিশুদ্ধ কার্বন। যথেষ্ট উত্তপ্ত করলে হীরকও কয়লার মতই প্রজ্জ্বলিত হবে।

পৃথিবীর মোট সরবরাহের শতাংশের ৯৬ ভাগ হীরকই আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। গবেষণাগারেও নিয়ন্ত্রিত তাপ ও চাপ প্রয়োগে কৃত্রিম হীরক তৈরী করা যায়। কৃত্রিম হীরক প্রাকৃতিক হীরকের ন্যায় একই রকম গুণসম্পন্ন।

অত্যধিক কাঠিন্যের জন্যে শিল্পের পক্ষে হীরক দরকারী। ছিদ্র করবার যন্ত্রে এবং কঠিন ইস্পাত কাটবার ও পালিশ করবার যন্ত্রে হীরক ব্যবহার করা যায়। হীরক দিয়েই অন্যান্য হীরককে ইচ্ছানুরূপ আকার দেওয়া ও পালিশ করা হয়। দুর্মূল্যতার জন্যে খুব স্বচ্ছ ও উৎকৃষ্ট হীরক শিল্পে ব্যবহৃত হয় না। যে গ্র্যাফাইটের সবটাই সম্পূর্ণ-রূপে হীরকে পরিণত হয়নি এবং রং কালো রয়েছে, সেরূপ অসম্পূর্ণ হীরকই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এ দ্রব্যকে বলে কার্বনাডো বা বর্ট। অলঙ্কারের পক্ষে অযোগ্য হলেও হীরকের ন্যায় কাঠিন্য থাকার দরুণ এ-দ্রব্যটি শিল্পের পক্ষে খুবই উপযোগী।

ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদে কার্বনের সঙ্গে কখন কখন হাইড্রোজেনও থেকে যায়। এই অবস্থায় কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহযোগে ছোট-বড় অণুসমন্বিত অনেক প্রকার যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এই পদার্থগুলিকে বলে হাইড্রোকার্বন। পেট্রোলিয়াম হলো প্রধানতঃ নানারকম আকারের অণুসমন্বিত হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। পাতন প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন অণুসমন্বিত হাইড্রোকার্বনগুলিকে পৃথক করে সংগ্রহ করা যায়। কম তাপমাত্রায় ছোট অণু এবং অধিক তাপমাত্রায় বড় অণুর পদার্থ বাষ্পীভূত হবে। এভাবে পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায়—গ্যাসোলিন, পেট্রোলিয়াম ইথার বা বেঞ্জিন, কেরোসিন, জ্বালানী তেল, লুব্রিকেটিং তেল, পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসিলিন প্রভৃতি।

ক্ষ. চ. স.

ফনোগ্রাফের কথা

(কথায় ও চিত্রে)

১। আধুনিক ফনোগ্রাফ—গ্রামোফোন বা ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং কেমন করে এই যন্ত্র কাজ করে তাও অনেকেরই জানা আছে। সে জন্যে ব্যাপারটা আমাদের খুব অদ্ভুত বলে মনে

১নং চিত্র

হয় না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল—যখন কেউ চিন্তাই করতে পারতো না যে, যন্ত্র আবার মানুষের মত কথা বলবে। আধুনিক ফনোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর ও অন্যান্য শব্দ প্রায় নিখুঁতভাবেই শোনা যায়। প্রায় আশী বছরের অক্লান্ত গবেষণার ফলে ফনোগ্রাফের এই উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে।
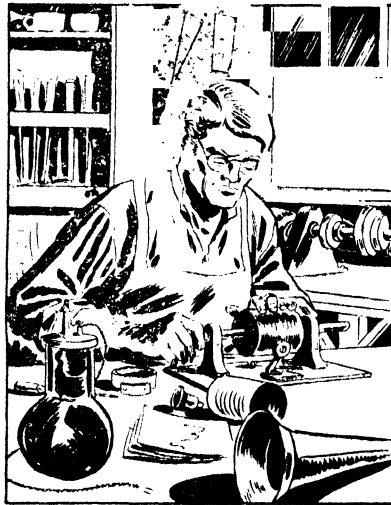
২নং চিত্র

২। ফনোগ্রাফ তৈরীর কল্পনা—বহুদিন থেকেই মানুষের কল্পনা ছিল—শব্দকে কোন উপায়ে ধরে রেখে পরে আবার ইচ্ছামত তাকে বাজিয়ে শোনবার। এ নিয়ে

কেউ কেউ বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষাও আরম্ভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েকজন ইউরোপীয়ান এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং কয়েকজন জার্মান গবেষক টিনের পাতে কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। সেই রেকর্ড বাজালে শব্দ শোনা যেত বটে, কিন্তু তা বোঝবার উপায় ছিল না—ফলে গবেষকদের উৎসাহ কমে যায়।

৩। এডিসন—১৮৭৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিসন টেলিগ্রাফের বার্তা রেকর্ড করা নিয়ে গবেষণা করবার সময় ঘটনাক্রমে কার্যোপযোগী একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র তৈরী করেন। এর আগেই তিনি আরও কতকগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করে খ্যাতি

৩নং চিত্র

অর্জন করেছিলেন। যদিও তাঁর উদ্ভাবিত ফনোগ্রাফটি একেবারে নিখুঁত ছিল না, কিন্তু তাতে শব্দ বোঝা যেত। তাঁর ফনোগ্রাফেও টিনের পাতের রেকর্ড বাজানো হতো।
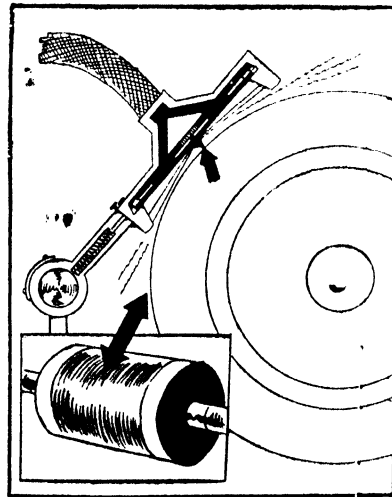
৪নং চিত্র

৪। ফনোগ্রাফ বাজবার সূত্র—একটি পিন সংযুক্ত ডায়াফ্রামকে (পাত্‌লা ধাতব

পর্দা) শব্দ-তরঙ্গ নড়ায় বা কাঁপায় এবং তার ফলেই ফনোগ্রাফগুলি থেকে শব্দ শোনা যায়। তখনকার টিনের পাতের রেকর্ডগুলি ছিল চোঙের মত গোলাকৃতির এবং সেগুলি একটিসিলিণ্ডারের মত ঘুরতো। টিনের পাতের রেকর্ড ঘোরবার সময় ঐ পিনটি আঁচড়-কাটা দাগের উপর দিয়ে চলবার ফলে ডায়াফ্রামটি কেঁপে শব্দ উৎপাদন করতো।

৫। প্রথমদিকে রেকর্ড প্রস্তুত—আগেকার ফনোগ্রাফের জন্যে রেকর্ড প্রস্তুত করবার সময় শিল্পীরা একটি মেগাফোনের চারদিকে ঠাসাঠাসি করে বসতো। মেগাফোনের সঙ্গে লাগানো থাকতো একটি পিন-সংযুক্ত ডায়াফ্রাম। রেকর্ড করবার সময়

৫নং চিত্র

সোজাসুজি মেগাফোনের চোঙের মধ্যে খুব চেঁচিয়ে বলতে হতো। এসব রেকর্ডে যন্ত্রের শব্দ থেকে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার বোঝা যেতো। এজন্যে তখনকার বিখ্যাত গায়কদের (যেমন, এনরিকো ক্যারুসো) কণ্ঠস্বর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।
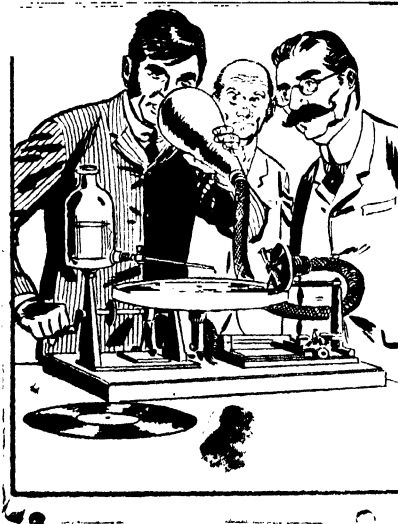
৬নং চিত্র

৬। ফনোগ্রাফের উন্নতি—১৮৮৫ সালে দু-জন আমেরিকান এক নতুন

পদ্ধতিতে রেকর্ডের উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা সিলিণ্ডার রেকর্ডে একটি মোমের আবরণ লাগান। এর ফলে টিনের পাতের রেকর্ডের তুলনায় শব্দ খুব পরিষ্কার শোনা গেল। ১৮৮৭ সালে এমিল বারলিনার নামক একজন আমেরিকান নতুন ধরণের গ্রামোফোন উদ্ভাবন করেন। তিনি সিলিণ্ডার রেকর্ডের পরিবর্তে চ্যাপ্টা চাকৃতির রেকর্ড ব্যবহার করেন। দেখা গেল, চ্যাপ্টা চাক্‌তিতে বেশী শব্দ সহজে রেকর্ড করা সম্ভব।

৭। জনসাধারণের আগ্রহ—প্রথম অবস্থায় ফনোগ্রাফের রেকর্ডে শব্দ পরিষ্কার না শোনা গেলেও জনসাধারণের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিপুল আগ্রহ দেখা গেল। প্রিয়-শিল্পীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত অবসর সময়ে বাড়ীতে শোনবার জন্যে বহু লোক ফনোগ্রাফ

৭নং চিত্র

কিনতে লাগলেন। ফলে এর চাহিদাও খুব বেড়ে গেল। শীঘ্রই ফনোগ্রাফের মালিকেরা বাড়ীতে রেকর্ডের লাইব্রেরী করলেন। বিভিন্ন শিল্পীর রেকর্ড সেখানে থাকতো এবং অবসর সময়ে বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঐ রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পরিবেশন করা হতো।

৮। অফিস সংক্রান্ত কাজে ফনোগ্রাফের ব্যবহার—গান-বাজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ফনোগ্রাফের ব্যবহার থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার চালু হতে থাকে এবং সে সব ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাও প্রমাণিত হয়। এডিসন ফনোগ্রাফকে ডিক্টেটিং মেসিনে পরিণত করেন এবং এই ডিক্টেটিং মেসিন ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে উপযোগী বলে

প্রমাণিত হয়। আজকাল অনেক অফিসেই ডিক্টেটিং মেসিন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়েও

আজকাল ফনোগ্রাফের ব্যবহার হচ্ছে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের জন্যে।

৯। ইলেকট্রনিক্স্—ফনোগ্রাফের উন্নতিসাধনের জন্যে গবেষণা চলতে থাকে। ১৯২৫ সালে বৈদ্যুতিক উপায়ে রেকর্ড তৈরী করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে এই যন্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। এর ফলে কণ্ঠস্বর

৯নং চিত্র

ও যান্ত্রিক শব্দকে প্রায় সহজেই অবিকৃতভাবে রেকর্ড করা সম্ভব হয়। এসব রেকর্ড বাজিয়ে বক্তা ও গায়কের অবিকল কণ্ঠ শোনা যায়।

১০। সবাক চিত্র—এডিসন ১৮৮৯ সালে গতিশীল ছবি তোলবার ক্যামেরা এবং প্রোজেক্টর যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এবার তিনি সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করবার জন্যে চেষ্টা

করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে তিনি সিনেমার প্রোজেক্টর যন্ত্রের সঙ্গে ফনোগ্রাফ যুক্ত করে সবাক চিত্র তৈরীর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ

১০নং চিত্র

হয়। কিন্তু তিনি যে সূত্র অবলম্বন করে এই সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন—পরবর্তী কালে সেই সূত্র অবলম্বনে গবেষণা করে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সবাক চিত্র নির্মাণে কৃতকার্য হন।

১১। বেতার ফনোগ্রাফের ব্যবহার—বেতার কেন্দ্রেও ফনোগ্রাফের ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। বেতার কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্যে বিশেষ ধরণের রেকর্ড (Transcription
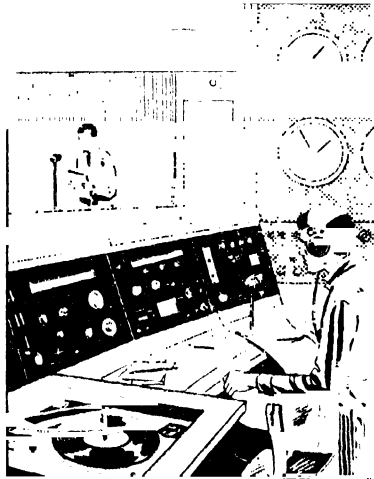
১১নং চিত্র

Record) তৈরী করা হয়। ফনোগ্রাফে যে রেকর্ড ব্যবহার করা হয়—তা থেকে এই রেকর্ডগুলি বড় হয়ে থাকে। এতে গান, বাজনা, নাটক প্রভৃতি রেকর্ড করা হয়। পরে সুবিধামত বেতার কেন্দ্র থেকে রেকর্ডগুলি বাজানো হয়।

১২। শিক্ষাদানে ফনোগ্রাফের ব্যবহার—বহু বছর যাবৎ ফনোগ্রাফের সাহায্যে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। রেকর্ডের সাহায্যে গান, কথা ও বৈদেশিক ভাষা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করা সহজসাধ্য হয়েছে। অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্যে 'সবাক পুস্তক'
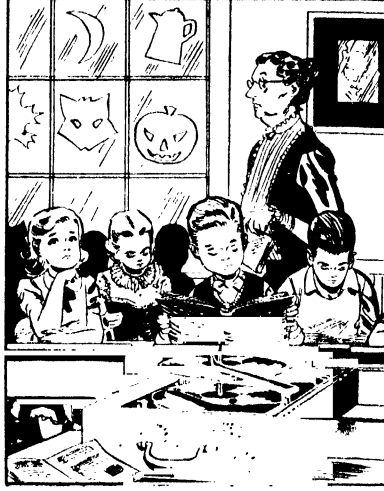
১২নং চিত্র

(Talking Book) প্রচলিত হয়েছে; অর্থাৎ অন্ধদের পাঠোপযোগী বইয়ের সব অংশই কথার সাহায্যে রেকর্ড করা হয়। কোন কোন দেশে এই রেকর্ড অন্ধদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

১৩। টেপ-রেকর্ডার—বিজ্ঞানীরা শব্দকে আরও সহজে ধরে রাখবার জন্যে

১৩নং চিত্র

টেপ-রেকর্ডার নামে একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। একটি চৌম্বক তার বা ফিতার সাহায্যে এই যন্ত্রের দ্বারা শব্দের রেকর্ড করা হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা একনাগাড়ে কয়েক

ঘণ্টা পর্যন্ত রেকর্ড করা যায়। এই টেপ-রেকর্ডের শব্দ একেবারে নিখুঁতভাবে শোনা যায়। সাধারণতঃ দীর্ঘ ভাষণ, সভা প্রভৃতি দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠান এই টেপ-রেকর্ডারের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়।

১৪। ষ্টিরিওফোনিক রেকর্ড—ফনোগ্রাফে আজকাল ষ্টিরিওফোনিক রেকর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রেকর্ডের সাহায্যে গান-বাজনা প্রভৃতি শুনলে মনে হয় যেন সেগুলি তখনও শিল্পী নিজেই গাইছেন—রেকর্ড বাজছে বলে মনে হয় না। এতে
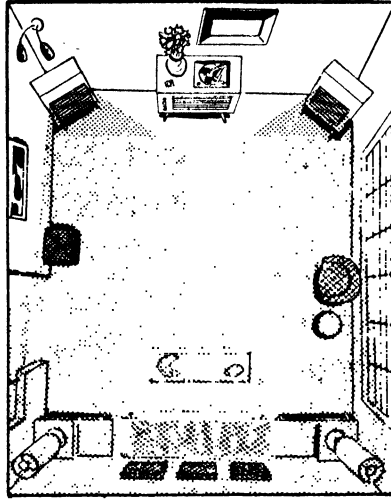
১৪নং চিত্র

দুটি 'স্পীকার' ব্যবহৃত হয়—একটিতে নিম্নস্বরের গান উৎপন্ন হয় এবং অপরটির দ্বারা সেই শব্দই জোরে শোনা যায়। ষ্টিরিওফোনিক রেকর্ড চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বেতার ও টেলিভিসনে ব্যবহারের জন্যে পরীক্ষা চলছে।
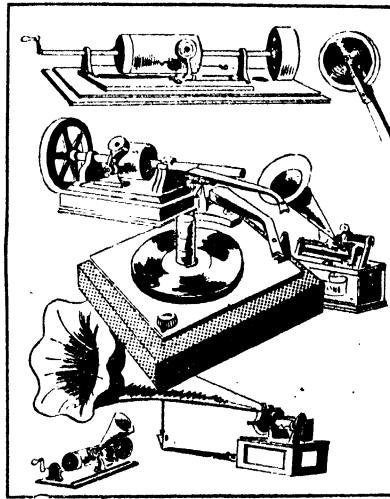
১৫নং চিত্র

১৫। ফনোগ্রাফের দান—ফনোগ্রাফের সাহায্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আনন্দদানের

পদ্ধতির যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ডিক্‌টেটিং মেসিন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছে। 'সবাক পুস্তক' অন্ধদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক ফনোগ্রাফের যুগে—আশা করা যায়, এর সাহায্যে মানব-সভ্যতার গতি আরও এগিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা ফনোগ্রাফের আরও উন্নতি বিধানের জন্যে গবেষণা করছেন।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৯ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। এই উপলক্ষে ঐ দিন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা গৃহে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিঃ-এর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর সার জাহাঙ্গীর গান্ধী একবিংশতিতম আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

চন্দ্রের অদৃশ্য বিপরীত অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা

চন্দ্রের অদৃশ্য দিকটি সমতল মরু-প্রান্তর—সে দীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে মরু-সমুদ্ররূপী একটি গভীর গর্ত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ কয়েকটি ছোট পাহাড় ও সমুদ্র বা হ্রদের মত কয়েকটি অগভীর গর্ত থাকিবার ফলে পরিদৃশ্যমান অংশের তুলনায় তাহা নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। পরিদৃশ্যমান অংশে যেরূপ অসংখ্য পাহাড় ও অসংখ্য খাদের ক্ষত চিহ্ন রহিয়াছে, তেমন কিছুই সেখানে নাই।

রাশিয়া মহাকাশচারী রকেটের সাহায্যে গৃহীত চন্দ্রলোকের অপর অংশের ছবি এখন প্রকাশ করিয়াছে। এই ছবিতে এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমির উপর বড় ও ছোট কয়েকটি ফোঁটা ও ফুটকি চিহ্ন রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন, কোন দুষ্ট ছেলে খেয়ালের বশে একটি কুমড়ার গায়ে এখানে-সেখানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ছবিতে কৃষ্ণ বর্ণের একটি ফোঁটাকে মস্কো সাগর বলিয়া নামাঙ্কিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, উহার ব্যাস প্রায় ১৮৭ মাইল।

রাশিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছে যে, চন্দ্রের যে দিকটা পৃথিবী হইতে দেখা যায়, তাহার তুলনায় অদৃশ্য দিকটা অধিকতর বৈচিত্র্যহীন। রাশিয়ার মহাকাশচারী রকেট লুনিক-৩ টেলিভিশনযোগে যে ফটো পাঠাইয়াছে, তাহা হইতে এই সংবাদ জানা গিয়াছে। পৃথিবী হইতে চিরকাল চন্দ্রের শুধু একটি অংশই দেখা যায়—লুনিক-৩ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চন্দ্রের অদৃশ্য দিকে চলিয়া গিয়া সেখানকার ফটো তুলিয়াছে।

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর জ্যোতি-বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মিখায়েলোভের বিবৃতি উল্লেখ করিয়া 'টাস' বলিয়াছে, যে, চন্দ্রের বিপরীতদিকে সমুদ্রের সংখ্যা কম। সেদিকটা অত্যন্ত একঘেয়ে। এই বৈচিত্র্যহীনতা নিশ্চয়ই চন্দ্রের জন্ম ইতিহাসের সহিত জড়িত রহিয়াছে। এই বৈচিত্র্যহীনতার মূল রহস্য যে কি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূতাত্ত্বিকগণের নিকট তাহা এক অদ্ভুত সমস্যারূপেই আজ দেখা দিয়াছে।

যে সকল সমুদ্র ও পর্বতের ছবি তুলিয়া আনা হইয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের নাম

অনুযায়ী সেগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর নামেও একটি পর্বতের নামকরণ করা হইয়াছে। প্রায় ১৮৭ মাইল ব্যাসের সমুদ্ররূপী যে গর্তটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মস্কো সাগর; এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সাগরটি চন্দ্রের বিষুবরেখার উত্তরে বিশ ও ত্রিশ অক্ষ রেখার মধ্যবর্তী স্থানে ১৪০তম ও ১৬০তম দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।

এই সাগরের দক্ষিণাংশে একটি উপসাগর রহিয়াছে এবং উহার নামকরণ করা হইয়াছে, মহাকাশ উপসাগর।

৭ই অক্টোবর এই দুইটি জিনিষের ফটো স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ যন্ত্রঘাঁটি হইতে পাওয়া যায়। টাস বলিয়াছে, যে সকল জিনিষের সুস্পষ্ট ফটো তোলা সম্ভব হইয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলিরই নামকরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য পর্বতশাখা ও গর্তের নামকরণ করিবার জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী একটি স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বলেন, দক্ষিণ গোলার্ধে ৬০ মাইল ব্যাসের এমন একটি গর্ত রহিয়াছে যাহা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে।

বিষুবরেখার উত্তরে দৃশ্য ও অদৃশ্য অংশের প্রায় সীমা রেখার দুইটি গর্ত রহিয়াছে—তন্মধ্যে একটির নাম দেওয়া হইয়াছে লীমানোসভ এবং অপরটির নাম রাখা হইয়াছে জোলিও কুরী।

সোভিয়েটস্কী পর্বতমালা ইহার দক্ষিণে বিষুবরেখা অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। চন্দ্রের অদৃশ্য অংশের একেবারে প্রান্ত-সীমায় দক্ষিণ গোলার্ধে মেচাতা নামক সাগরটি রহিয়াছে। মহাকাশে ফটো তুলিয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণের কালে চন্দ্রের দৃশ্য অংশেরও কিছু কিছু ফটো তোলা হইয়া গিয়াছে। এ সকল অংশ এতদিন আংশিকভাবেই দেখা যাইত—মানুষ এই প্রথম এগুলিকে পুরাপুরি দেখিবার সুযোগ পাইল।

দক্ষিণ সাগরের প্রকৃত চেহারাও এই প্রথম জানা গেল—এই সাগরটির বৃহৎ অংশই চন্দ্রের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

আন্তর্গ্রহ যন্ত্রঘাঁটিতে স্থাপিত টেলিভিশন যন্ত্রের সহায়তায় প্রায় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার দূর হইতে পাঠানো হইয়াছে।

মহাকাশে জীবনের সন্ধানে

কাজাখ বিজ্ঞান অ্যাকাডামীর অ্যাস্ট্রো-বোটানিক্যাল বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক টিখভ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন মহাকাশে যে যন্ত্রাগার প্রেরণ করিয়াছে, তাহা চন্দ্রলোকে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে।

চন্দ্রলোকে প্লেটো নামক আগ্নেয়গিরির মুখের সন্নিকটে নিম্নতর জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কিছুটা কারণ রহিয়াছে। চন্দ্রের পরিদৃশ্যমান দিকটিকে এমন কয়েকটি স্থান থাকা সম্ভব, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে প্রেরণোপযোগী এমন যন্ত্রাগার নির্মাণ করিবেন যাহা মঙ্গলগ্রহের অতিশয় নিকটে এবং যেখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল প্রশ্নের অবসান ঘটাইবে। সোভিয়েট মহাকাশ গবেষণা কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ফিদোরোভ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহাকাশচারী যন্ত্রাগার হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্যই বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জানাইয়া দেওয়া হইবে।

সোভিয়েট ভৌগোলিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট পাভলস্কী বলেন, শীঘ্রই চন্দ্রলোক হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আনা হইবে। ককেসাসের পুলকোভা গবেষণাগারের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এক বৎসরের মধ্যে তিনটি মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপণ করিতে পারিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সোভিয়েট রকেট অতি শীঘ্রই শুক্র ও

মঙ্গল গ্রহের দিকে রওনা হইবার সম্ভাবনা। এই দুইটি গ্রহে সোভিয়েট রকেট অবতরণের আর বেশী বিলম্ব নাই।

অন্ধ্র প্রদেশে মৃৎশিল্পের উপযোগী নরম মাটির সন্ধান

ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা অন্ধ্র প্রদেশের কুদ্দাপা ও কুর্ণুল জেলার কয়েক স্থানে মৃৎশিল্পের উপযোগী নরম মাটির স্তরের সন্ধান পাইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই মাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহারের যোগ্য এবং 'ফিলার' হিসাবেও উহা ব্যবহার করা যায়।

মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মৃৎশিল্পের জন্য কাঁচামালের সন্ধান করিবার ফলে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ১৯৪৪-৪৮ সালে প্রথম এই মাটির স্তরের পরীক্ষা করে। সাধারণতঃ নদীগর্ভে এবং পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বৃষ্টির জলের নালায় এই মাটি দেখা যায়।

যে সব অঞ্চলে উক্ত মাটির স্তর পাওয়া গিয়াছে শ্রী আর ত্যাগরাজন ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কর্তৃক প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মিনারেল্‌স্' পত্রিকার গত এপ্রিল-জুন (১৯৫৯) সংখ্যায় সেগুলির সাধারণ ও রাসায়নিক গুণাগুণের বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন।

পোড়া মাটির জিনিষ, মাটির ঘড়া, পাইপ, ইট, টালি, ফাঁপা ইট, নর্দমার পাইপ এবং অন্যান্য কাচবৎ দ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্য এই মাটি ব্যবহার করা যাইবে। তাহা ছাড়া, উহা বস্ত্র ও রবারে ফিলার হিসাবে এবং রং, রঙ্গীন খড়ি, ক্রেয়ন প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ব্যবহার করা যাইবে।

নূতন সেবনযোগ্য পেনিসিলিন

লণ্ডনের বীচাম গ্রুপ লিমিটেড এবং বীচাম রিসার্চ লেবরেটরিজ-এর চেয়ারম্যান মিঃ এইচ. জে. ল্যাঞ্জেল গত ২৬শে অক্টোবর নূতন এক ধরণের সেবনযোগ্য পেনিসিলিন উদ্ভাবনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সাধারণতঃ যে ধরণের পেনিসিলিন বর্তমানে সেবন করা হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা এই পেনিসিলিন অনেক বেশী ফলপ্রদ হইবে।

ল্যারিনজাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া, টন্‌সিলাইটিস, স্ফোটক, কার্বাঙ্কল, কর্ণরোগ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় তাহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বীচাম রিসার্চ লেবরেটরিজ এবং বৃষ্টল লেবরেটরিজ-এর (যুক্তরাষ্ট্র) যুক্ত গবেষণার ফলে এই নূতন পেনিসিলিন উদ্ভাবিত হয় এবং তাহা বীচাম বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক গত বৎসর স্বতন্ত্রীকৃত মৌলিক পেনিসিলিন কণা হইতে প্রস্তুত। মিঃ ল্যাঞ্জেল বলেন, যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন পেনিসিলিনের নাম হইল ব্রক্সিল (Broxil)।

অন্ধত্ব প্রতিরোধ সম্পর্কে নূতন তথ্য

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড গত চার বৎসর ধরিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে যে অনুসন্ধান-কার্য চালাইয়া আসেন তাহার ফলে ঘানা, কামেরুনস এবং নাইজেরিয়ার উত্তর অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টসমূহ নিঃসন্দেহে অন্ধত্ব সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য জানিবার সুযোগ পাইবেন। সোসাইটির এই অনুসন্ধান কার্যের ফলাফল সম্প্রতি ডাঃ এফ. সি. রজার্স-এর 'ব্লাইণ্ডনেস্ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা' পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে অন্ধত্বের কারণ ও তাহার প্রতিরোধ সম্পর্কে নূতন আলোকপাত হইয়াছে।

উপরিউক্ত তিনটি অঞ্চলে অন্ধত্বের একটি কারণ হইল অনকোসারকিয়াসিস রোগ। এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। ইহা সাধারণত "নদী-অন্ধত্ব" নামে পরিচিত। কারণ যে মক্ষিকার দংশনের ফলে এই রোগ জন্মায়, তাহারা নদীতে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানীদের প্রথম যে দলটি এই সম্পর্কে অনু-

সন্ধান-কার্য চালান তাহার নেতা স্বর্গত ডাঃ জে. ক্রিস্‌প এই 'নদী-অন্ধত্ব' সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকটি সোসাইটি কর্তৃক পরে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অন্ধত্ব এবং তাহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে মৌলিক তথ্য পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দলটি পরিচালনা করেন ডাঃ রজার্স; তিনি এই অঞ্চলটিতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে বিশদভাবে অনুসন্ধান করেন।

রাজা হর্ষের আমলের স্বর্ণমুদ্রা

বড়বাঁকীতে (উত্তর প্রদেশ) সারদা খালের জৌনপুর শাখার বাঁধ নির্মাণকালে শ্রমিকগণ লোনিকাটরা পুলিস সার্কেলের অন্তর্গত শাহাওয়ার গ্রামে একটি মৃৎপাত্রে ১৩টি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছে। প্রকাশ, এইগুলি রাজা হর্ষের আমলের মুদ্রা।

মুদ্রাগুলির একদিকে পৃষ্ঠদেশে তূণীর ঝুলান একজন যোদ্ধার মূর্তি খোদিত এবং অপর পৃষ্ঠে হাতে তীরধনুক সহ এক শিকারীর মূর্ত ও কতকগুলি অস্পষ্ট লিপি রহিয়াছে।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতের জন্য চুনা পাথর ব্যবহার

মাদ্রাজের করাইকুদিস্থিত কেন্দ্রীয় ইলেকট্রো-কেমিক্যাল গবেষণাগার ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্পে চুনা পাথর কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহারের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। ভারতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের চাহিদা খুবই বেশী। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে বৎসরে ৪০ হাজার টন কার্বাইড উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে বৎসরে ৫ হাজার টন ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপন্ন হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা 'বিজ্ঞান প্রগতি'র কার্তিক মাসের সংখ্যায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতের জন্য চুনা পাথরের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

ভারতের জন্য শক্তিশালী চুম্বক

ব্রেডফোর্ডের (ইংল্যাণ্ড) ব্রুকহার্ষ্ট ইগ্রানিক কোম্পানী জামশেদপুরের টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জন্য জাহাজযোগে কতকগুলি অতিশয় শক্তিশালী চুম্বক পাঠাইতেছেন। এই চুম্বকগুলির সাহায্যে রেল লাইন ও ইস্পাতের বার তোলা হইবে।

চুম্বক-নির্মাতারা বলেন যে, রেল লাইনগুলি ৪৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইলে চুম্বকগুলি গজ প্রতি ১৬০ পাউণ্ড এবং ৬০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইলে গজ প্রতি ১২০ পাউণ্ড পর্যন্ত তুলিতে পারিবে। সাধারণ চতুষ্কোণ চুম্বক অপেক্ষা এই চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশী।

ব্রুকহার্ষ্ট ইগ্রানিক কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত একটি চুম্বক ৬৫ টন পর্যন্ত ওজন তুলিতে পারে। কোম্পানী দাবী করেন, ইহাই বিশ্বের বৃহত্তম চুম্বক।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, একজন সোভিয়েট ঐতিহাসিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস কর্তৃক স্পেনের তদানীন্তন রাণী ইসাবেলের নিকট লিখিত একটি গোপনীয় চিঠি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা দ্বারা এই মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে যে, কলম্বাস দৈবক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত ঐতিহাসিক উজবেক অ্যাকাডেমীর একজন সদস্য। তিনি বলিয়াছেন যে, কলম্বাস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবিষ্কার করিতে যাত্রার পূর্বে উহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন; এমন কি তাঁহার নিকট তাঁহার পূর্ববর্তী স্পেনীয় নাবিকগণ কর্তৃক প্রস্তুত ঐ দ্বীপপুঞ্জের একটি মানচিত্রও ছিল।

প্রকাশ যে, উক্ত ঐতিহাসিক আমেরিকা আবিষ্কার বিষয়ে বহু বৎসর গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলম্বাস কর্তৃক স্পেনের তদানীন্তন

রাণী ইসাবেলের নিকট লিখিত এক গোপনীয় চিঠি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা হইতে দেখা যায় যে, কলম্বাস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবস্থিতি এবং তথায় কি পাওয়া যায় ও স্পেন কর্তৃক কিরূপে ঐ দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা জানিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কলম্বাসের অভিযান ও উহার ব্যয় সমর্থন করাইবার উদ্দেশ্যে স্পেন সরকার ইচ্ছা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, কলম্বাস ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; কারণ তখন বিশ্বাস করা হইত যে, প্রাচ্য ধনসম্পদপূর্ণ।

অদ্ভুতকর্মা নূতন গাণিতিক যন্ত্র

একটি নূতন গাণিতিক যন্ত্র (ইলেকট্রনিক ব্রেন) লণ্ডনে প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার নির্মাণকারীরা দাবী করিয়াছেন যে, ইহার গণনা-পদ্ধতি এত ব্যাপক যে, পৃথিবীতে এই যন্ত্রের সমকক্ষ যন্ত্র নাই।

কে. ডি. পি. নামে অভিহিত এই যন্ত্রটির খরচ পড়িবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ষ্টার্লিং হইতে ৫ লক্ষ ষ্টার্লিং। হিসাব, পণ্য বিক্রয়, গবেষণা ও সংখ্যা-তাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইবে।

লোকরঞ্জক সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

নব সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী লোকরঞ্জক সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দানের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগরের তরুণ সাহিত্যিক শ্রীঅমরনাথ রায় এই বৎসর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় ১৯৫৭ সালে "ফেলবার নয়", ১৯৫৮ সালে "হঠাৎ বিপদে" এবং এই বৎসর "শুধু সখ নয়" গ্রন্থ রচনার জন্য পর পর তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এ পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। শ্রীরায়ই প্রথম বাঙ্গালী সাহিত্যিক, যিনি পর পর তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করিলেন।

শ্রীঅমরনাথ রায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখক।

প্রাচীন নুবীয় সভ্যতার সম্পদ

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ খৃষ্টপূর্ব চারি হাজার বৎসর হইতে পরবর্তী নুবীয় সভ্যতার সম্পদ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন।

আসুয়ান হইতে সুদান সীমান্ত পর্যন্ত দুইশত মাইলব্যাপী অঞ্চল নুবীয় সভ্যতার স্মারক স্তম্ভ ও অন্যান্য কীর্তিসমূহের ধ্বসাবশেষ দ্বারা পূর্ণ। ১৯৬৮ সালে যখন আসুয়ান বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে, তখন ঐ অঞ্চল জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা।

এই আট বৎসরের মধ্যে বিশেষজ্ঞদিগকে পুরা কীর্তিসমূহ উদ্ধারের জন্য নূতন অঞ্চলসমূহে খনন করিতে, জ্ঞাত ধ্বংসাবশেষসমূহ যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে স্থানান্তরিত করিতে এবং স্থাবর কীর্তি-সমূহ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হইতে রক্ষার চেষ্টায় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা পুরাকীর্তি সংরক্ষণ কার্যে যোগদানকারী-দিগকে পাঁচটি মন্দির এবং এই অঞ্চলে নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির অর্ধেক দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি পুরাকীর্তিসমূহের উদ্ধার সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জন ও ব্রিউ ঐ কমিটির সভাপতি। উহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া ও মিশরের বিশেষজ্ঞগণ আছেন।

উদ্ধার কার্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হইবে। তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঐ সংস্থা বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পাইবার পর বিশ্বব্যাপী আবেদন প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আসুয়ান হইতে কয়েক মাইল দূরে আবু সিম্বেল নামক স্থানে ফেরাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের স্মৃতি-রক্ষার্থে পাহাড় খোদাই করিয়া নির্মিত ১৫০ ফুট উচ্চ মন্দির রক্ষার্থে উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করিতেই প্রায় এক কোটি ডলার ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। অন্যান্য মন্দির অপসারণ করিয়া উচ্চতর স্থানে পুনরায় স্থাপন করিতে এবং নীল নদের আরও উজানে বন্যজন্তুপূর্ণ অঞ্চলে নুবীয় সভ্যতার প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে নূতন দ্রব্যসমূহের অনুসন্ধানের জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ আবশ্যক।

উক্ত অঞ্চলসমূহে খনন কার্যের ফলে নুবীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত উহার পরবর্তী মিশরীয়, গ্রীকো-রোমীয় ও আরব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ প্রকাশিত হইবে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সরকার এই উদ্ধার কার্যে যোগদানকারী দলসমূহকে সর্বপ্রকার সুবিধা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

নূতন ধূমকেতু

রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টাস-এর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জনৈক সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'হারকিউলিস' নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই তৃতীয় ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইল। জর্জ অ্যালক নামক জনৈক বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গত অগাষ্ট মাসের শেষভাগে দুইটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন।

টাসের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রুশ বিজ্ঞানী এ. ব্র্যানড ক্রিমিয়ায় মহাশূন্যে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় উত্তর গোলার্ধের উপর এই নূতন ধূমকেতুটি দেখিতে পান।

সমুদ্রের রহস্য সন্ধানে

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দলের নেতা ডাঃ বেরিস আলেকজান্দ্রোভিচ বলোগভ বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তাঁহারা বঙ্গোপসাগরের গভীর তলদেশের রহস্য সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত হইবেন। প্রস্তাবিত এই গবেষণার ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতিনিধিদল পৃথিবীর একমাত্র অ-চৌম্বক জাহাজ জারজার-এ—যাহা একটি ভাসমান গবেষণাগার বলিয়া আখ্যাত হয়—আরোহণ করিয়া বোম্বাইয়ে উপনীত হন। উক্ত জাহাজে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ বলোগভ আরও বলেন, আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের অনুষ্ঠান সূচীর অংশ হিসাবে অভিযাত্রী দল পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি, আয়নমণ্ডল এবং মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করিয়াছেন।

অভিযাত্রী দল সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে আসিবার পথে আটলান্টিক, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে গবেষণা চালাইয়াছেন।

হাসপাতালে ৬৫ বৎসর

ভিয়েনার ৮৩ বৎসর বয়স্কা মহিলা মেরী স্টুবার্ট ভিয়েনার একই হাসপাতালের একই ওয়ার্ডের একই শয্যায় ৬৫ বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপের উপর দিয়া দুইটি মহাযুদ্ধের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে রোগশয্যা ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই।

কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া বলেন—আমার জীবনে সৌন্দর্যেরও অভাব নাই,

ঐশ্বর্যেরও অভাব নাই, অতএব সহানুভূতি বা সমবেদনা কিছুরই আমার প্রয়োজন নাই।

১২ বৎসর বয়সে স্টুয়ার্টের দক্ষিণ পায়ের হাড়ের ভিতরে অষ্টিওমায়েলাইটিস রোগ দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়ান রাজকুমারী মেটারনিক নিজ ব্যয়ে স্টুয়ার্টের দেহে অস্ত্রোপচার করান এবং এমন কি, স্বাস্থ্য-নিবাসেও তাহাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অতঃপর ১৮ বৎসর বয়সে স্টুয়ার্ট হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর।

পরলোকে অধ্যাপক সি. টি. আর. উইলসন

স্কট্‌ল্যাণ্ডের পদার্থ-বিজ্ঞানী, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অধ্যাপক চার্লস টমসন রীজ উইলসন গত ১৫ই নভেম্বর, '৫৯, পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯০ বৎসর। ১৮৬৯ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি এডিনবরার গ্লেনকোর্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ম্যাঞ্চেষ্টার ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে কম্পটনের সঙ্গে যুক্তভাবে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়। আয়নিকরণ সম্পর্কিত কাজে তিনি বিশেষ খ্যাতি-লাভ করেন। তিনি দেখান যে, ধূলিকণার পরিবর্তে আয়নিত কণিকাও বৃষ্টির ফোঁটা গঠনে কেন্দ্রকের কাজ করিতে পারে। ইহার ফলেই তিনি আয়নিকরণ সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে মেঘ-প্রকোষ্ঠ নামক এক অপূর্ব যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণায় আজও এই মেঘ-প্রকোষ্ঠ একান্ত অপরিহার্য।

পরলোকে ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

প্রেসিডেন্সি কলেজের (কলিকাতা) অবসর প্রাপ্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার গত ২১শে নভেম্বর তাঁহার ১৯, একডালিয়া প্লেসের (কলিকাতা) বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত পাবনা জেলার গোপাল-নগরের প্রখ্যাত এক জমিদার-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ মজুমদার বিজ্ঞানী-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং দেশ ও বিদেশের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং কয়েকটি পৌত্র রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য এবং কিছুকাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাদশ বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৫৯ | দ্বাদশ সংখ্যা

বলবিদ্যার ক্রমবিকাশ *

শ্রীননীগোপাল কর্মকার

মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা ও তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত সৃষ্টি, সব কিছুরই উৎস মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব প্রয়োজন। মানব-চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, সুসংবদ্ধ সাধারণ জ্ঞানই সমস্ত চিন্তার ভিত্তি; Inner urge, Introspection ও Inspiration সত্যদ্রষ্টা মানুষের মনের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র এবং বাস্তব জীবনের ঘটনা-পঞ্জীই মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় অনুরণিত হয়।

মানব-চিন্তার ক্রমবিকাশের এই মৌলিক সত্যটি বলবিদ্যার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। বলবিদ্যার জনক গ্রীসদেশীয় বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস। তিনি বলবিদ্যাকে ভারী বস্তু উত্তোলন করিবার কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত 'Principle of Lever' বলবিদ্যার এক অভিনব আবিষ্কার বলিয়া পরিগণিত হইল। আর্কিমিডিসের বিখ্যাত তত্ত্ব তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বলবিদ্যা প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করিল। এই তত্ত্বটি আবিষ্কারের কাহিনী সর্বজনবিদিত। রাজা হীরোর সোনার মুকুটের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে গিয়াই এই সত্যটি চিন্তা-প্রবণ গ্রীক বৈজ্ঞানিকের মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর্কিমিডিসের পর ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর হাতে পড়িয়া বলবিদ্যার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনিই প্রথম গতিসূত্র আবিষ্কার করেন এবং তাহাই পরে নিউটনের হাতে পড়িয়া সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের টানে পতনশীল বস্তুর গতি সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, ইহাও গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন।

বলবিদ্যার সুসংবদ্ধ রূপ দেখা যায় নিউটনের সময় হইতে। নিউটনের পূর্বে বলবিদ্যা বলিতে যন্ত্র-নির্মাণের বিদ্যাই বুঝাইত। কিন্তু নিউটনের সময় হইতে বলবিদ্যা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন বলবিদ্যার অর্থ দাঁড়াইল, গতি ও বলপ্রয়োগের বিদ্যা। ইহার দুই শাখা—গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যা। গতিবিদ্যায় বলপ্রয়োগে

বস্তুর গতিশীল অবস্থা এবং স্থিতিবিদ্যায় বল প্রয়োগে বস্তুর স্থিরাবস্থার আলোচনা করা হয়। গতিবিদ্যার আবার দুই শাখা—স্থতিবিদ্যা বা Kinematics ও Kinetics। স্থতিবিদ্যায় কারণ নিরপেক্ষভাবে বস্তুর গতির আলোচনা করা হয়, আর কাইনেটিক্সে কারণ সহ গতির আলোচনা করা হয়।

নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি—তাঁহার গতি-সূত্র ও মহাকর্ষ-সূত্র। নিউটনের গতি-সূত্র অনেকটা ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে ইহাদের সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ইহাদের কোন গাণিতিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। নিউটনের প্রথম গতি-সূত্রটি কার্য-কারণ সম্বন্ধেরই নামান্তর মাত্র। কোন বস্তুর স্থিরাবস্থা ও সমগতির পরিবর্তনের কারণই হইল বাহ্যিক শক্তি এবং শক্তিকেই নিউটনের গতি-বিদ্যায় 'বল' বলা হয়। দ্বিতীয় গতি-সূত্রে বলের পরিমাণ বাহির করিবার পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছে।

নিউটনের গতি-সূত্র গতি-বিজ্ঞানের এক মৌলিক আবিষ্কার। ইহার সত্যতার তাত্ত্বিক প্রমাণ দেওয়া না গেলেও ইহার উপর ভিত্তি করিয়া যে গতি-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের গণনার সত্যতা হইতেই নিউটনীয় গতি-সূত্রের অবিসংবাদী সত্যতা প্রমাণিত হয়।

নিউটনের আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার মহাকর্ষ-সূত্র ও মাধ্যাকর্ষণ। ইহারও মূলে রহিয়াছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্য-কারণ সম্পর্ক। আপেলকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবার কারণই হইল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াই মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষের অবতারণা করা হইল। নতুবা এক বস্তু আর এক বস্তু হইতে দূরে থাকিয়া কি করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। এই আকর্ষণী শক্তি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা যুগযুগ ধরিয়া মানুষের চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাকর্ষের উপর ভিত্তি করিয়া যে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সত্যতাই এই যুক্তিমূলক আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করে।

নিউটন তাঁহার গতি-বিজ্ঞানে বস্তু বলিতে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বস্তুকেই বুঝাইয়াছেন; দেশ বলিতে ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় দেশ বা দেকার্তের ত্রিমাত্রিক সন্ততি (Three Dimensional Continuum) বুঝাইয়াছেন। নিউটনের সময় আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতারই সময়, ইহা Linear Continuum। নিউটনের দেশ ও কাল উভয়েই পরম, অর্থাৎ absolute এবং ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ। নিউটনের দেশ অচল, অনড় ও ঘটনা-পঞ্জীর নিষ্ক্রিয় আধার মাত্র। নিউটনের কালের ভিতর Intrinsic time-order আছে, অর্থাৎ যে কোন দুইটি ঘটনাকেই পূর্বাপরভাবে সাজানো যাইতে পারে। নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানে বস্তুর গতির সহিত তাহার ভর ও সময়ের কোন সম্পর্ক নাই—ভর ও সময় মৌলিক একক।

নিউটনীয় বলবিদ্যার আর এক বিশেষত্ব হইল ইহার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। নিউটন বলবিদ্যায় অপেক্ষক (Function), চল (Variable), অন্তরকলন (Differential Calculus) ও সমাকলন (Integral Calculus) প্রয়োগ করিয়া বলবিদ্যাকে এক সুসংবদ্ধ গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহা হইতেই Analytical Mechanics-এর চর্চা সুরু হয়। গতি, ত্বরণ ও মন্থরতার সংজ্ঞা দিতে হইলে Differential co-efficient-এর ধারণার একান্ত প্রয়োজন।

নিউটনের পর লাগ্রেঞ্জ ও হ্যামিল্টনের হাতে পড়িয়া বলবিদ্যার গবেষণা Analysis (Differential ও Integral Calculus)-এর গবেষণায় পরিণত হইল। লাগ্রেঞ্জের 'Principle of Virtual work' বলবিদ্যার বহু সমস্যাকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে সক্ষম হইল। Generalised

Co-ordinates বা স্থানাঙ্ক ($q_1, q_2, \ldots, q_n$) এবং ভরবেগ ($p_1, p_2, \ldots, p_n$)-এর ব্যবহার করিয়া Lagrangean Functions ও Lagrangean Equations গঠিত হয়। গতিয় সমস্যা সমাধানের সময় অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়ার কোন হিসাব রাখিতে হয় না—ইহাই লাগ্রেঞ্জের সমীকরণের বৈশিষ্ট্য। Variational Method প্রয়োগ করিয়া হ্যামিলটন দুইটি সূত্র প্রস্তুত করেন—(i) Hamilton's Principle, (ii) Hamilton's Principle of Least Action.

স্থানাঙ্ক যদি সময়ের অপেক্ষক না হয়, তাহা হইলে হ্যামিলটনের সূত্র এই দাঁড়ায় :—

"If the time of passing from one configuration to another configuration is given, the Principal Function has a stationary value in the actual path when compared with the neighbouring path",—এই সূত্রের ভিতরে সমস্ত নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে।

স্থানাঙ্ক যদি সময়ের অপেক্ষক না হয় তবে "Principle of Least Action" এই দাঁড়ায় :—

"If the total energy of a system is prescribed, as it passes from one configuration to another, the action in the actual path is a minimum when compared with the neighbouring paths".

বলবিত্তায় Analysis-এর প্রয়োগের আর এক দৃষ্টান্ত Stability or unstability of Equilibrium of a system। যদি Δq সময়ের Periodic function হয়, তাহা হইলে সাম্য (Equilibrium) stable হইবে, আর Periodic function না হইলে সাম্য unstable হইবে। Δq সময়ের Periodic function হওয়ার অর্থ—সময় যতই বাড়ুক না কেন, Δq-এর মান দুইটি নির্দিষ্ট মানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং Periodic function না হওয়ার অর্থ—সময় বাড়িলে Δq-এর মানও বাড়িবে।

Analytical Mchanics-এরই একটি প্রধান শাখা Celestial Mechanics। নিউটন ও লাপ্লাস এই শাখায় যে যুগান্তকারী গবেষণা করিয়া গিয়াছেন তাহাকে সমগ্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। Celestial Mechanics প্রকৃতপক্ষে Analysis ছাড়া আর কিছুই নয় এবং Analysis-এর অগ্রগতির সহিত Celestial Mechanics-এর অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। Potential বস্তুতপক্ষে অবস্থানের অপেক্ষক (Function of position) এবং Potential-এর derivative হইল Attraction। লাপ্লাসের সমীকরণ: $\frac{d^2v}{dx^2}+\frac{d^2v}{dy^2}+\frac{d^2v}{dz^2}=0$ এবং পয়সনের সমীকরণ: $\frac{d^2v}{dx^2}+\frac{d^2v}{dy^2}+\frac{d^2v}{dz^2}=-4\Lambda P$; Theory of Attraction and Potential-এ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রের ভিতরে কোন গতিশীল জ্যোতিষ্কের কক্ষ কি রকম হইবে, তাহার সমাধান দুরূহ। Analysis-এর সমস্যা সমাধান ছাড়া আর কিছুই নয়। Boundary value দেওয়া থাকিলে Differential Equation-এর সমাধান করাই Celestial Mechanics-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

Celestial Mechanics সাধারণতঃ 2-body problem লইয়াই আলোচনা করে। তিন বা ততোধিক বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণে কোন বস্তুর গতি ও পথ কি রকম হইবে তাহার গাণিতিক সমাধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। Mathematical Analysis-এর যতদূর অগ্রগতি হইয়াছে

তাহাতে N-body problem-এর সমাধান তো হয়ই না—এমন কি, 3-body problem-এরও সাধারণ সমাধান পাওয়া যায় না; তবে লাপ্লাস 3-body problem-এর বিশেষ সমাধান দিয়াছেন। Mathematical Analysis-এর সহিত Mchanics-এর কি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রহিয়াছে তাহা এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

Mechanics-এ Analysis প্রয়োগের আর এক সুফল হইল Rocket Dynamics-এর আবিষ্কার। বিখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কে. ই. জিওলকোভ্স্কি এই নব্যবিজ্ঞানের পুরোহিত। নিউটনের গতি-সূত্র (তৃতীয়) অনুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া হয়। তাই কোন গতিশীল বস্তুর ভর যদি গতিশীল অবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তবে বেগেরও পরিবর্তন হইবে। কারণ ভরবেগ সর্বদাই ঠিক থাকিবে। জিওলকোভ্স্কির প্রতিক্রিয়া-সূত্রের মূল ভিত্তিই হইল ভরবেগের নিত্যতা এবং এই প্রতিক্রিয়া-সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই রিয়্যাকসন ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইতেছে এবং এই যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ আজ মহাকাশে রকেট প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় ক্ষীয়মান বস্তুর বেগ কি রকম হইবে, তাহা নিউটনীয় গতি-শাস্ত্রের সাহায্যে সমাধান করিতে না পারিয়া গতি-বিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিলেন (Mechanics of bodies with variable mass)।

এ যাবৎ আমরা গতি-বিজ্ঞানের যে অগ্রগতির কথা আলোচনা করিলাম, তাহা মূলতঃ নিউটনের চিন্তাধারার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গতি-বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। পদার্থ-বিজ্ঞানের কতকগুলি পরীক্ষামূলক গবেষণা করিতে গিয়া এমন কতকগুলি সমস্যা দাঁড়াইল যাহা নিউটনের চিন্তাধারার সহিত খাপ খায় না এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের এই সঙ্কট নিরসন করিতে গিয়াই গতি-বিজ্ঞানের ভিতর কতকগুলি নূতন চিন্তাধারার আমদানী করিতে হয়। এই সকল নূতন চিন্তাধারার পুরোহিত হইলেন—আলবার্ট আইনষ্টাইন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, হাইসেনবার্গ, লুই ডি ব্রগলি, ডিরাক ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষায় যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহা নিরসন করিবার জন্য আইনষ্টাইন আমাদের দেশ-কালের চিন্তাধারার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেন। আলোর গতি সম্পর্কে গবেষণা ও Electro-Dynamics-এর গবেষণা করিতে গিয়াই আইনষ্টাইন 'দেশ-কাল সন্ততি'র বিষয় চিন্তা করেন এবং ইহাই তাঁহার সম্বন্ধবাদ বা থিয়োরী অব রিলেটিভিটি-এর জ্যামিতিক ভিত্তি। আইনষ্টাইনের 'দেশ-কাল সন্ততি' হইল চতুর্মাত্রিক রিমানিয়ান দেশ—এই নূতন সন্ততিতে দেশ ও কাল তাহাদের পৃথক সত্তা হারাইয়া একই সূত্রে গ্রথিত হইল এবং ইহারা আর 'পরম' রহিল না। নূতন সন্ততিতে Intrinsic time-order-এর ধারণা বাতিল হইয়া গেল। দুইটি ঘটনা একই 'World line'-এ না থাকিলে তাহাদের পূর্বাপর ভাবে সাজানো যাইবে না। শুধু তাই নয়, 'Axiom of the comparability of lengths at a distance'-এর ধারণাও এই সন্ততিতে অচল হইয়া গেল। একই 'World line'-এ অবস্থিত হইলেই শুধু দুইটি দৈর্ঘ্যের তুলনা করা সম্ভব।

সম্বন্ধবাদে বস্তু ও বলের ধারণাও পরিবর্তিত হইল। বস্তুর সংজ্ঞা হইল—দেশ-কাল সন্ততিতে ঘটনা-পঞ্জীর সমষ্টি। 'বল' বলিতে 'Differential causal laws' বুঝাইবে। সম্বন্ধবাদে বস্তু ও তাহার পারিপার্শ্বিক দেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হইল—দেশ আর Passive container of events রহিল না।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ

তত্ত্বের মূল ভিত্তি হইল আলোর গতিবেগের ধ্রুবকত্ব। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান বক্তব্য—

"Only those equations are admissible as an expression of natural laws which do not change their form when the co-ordinates are changed by means of Lorentz-Transformation (Covariance of equations in relation to Lorentz-transformation)".

আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্বকে 'Theory of Rapid motion' নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে; কারণ বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের সহিত তুলনীয় হইলেই ইহার ব্যবহার প্রয়োজন। এই তত্ত্ব হইতেই আমরা প্রথমে জানিতে পারিলাম :—

(i) বস্তুর গতির সহিত ভরের সম্পর্ক আছে :—

$$m_v = \frac{m_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$, c = আলোর গতিবেগ।

(ii) বস্তুর গতি বাড়িলে সময় সংকীর্ণ হইয়া যায়।

(iii) ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে :—

$E = mc^2$, c = আলোর গতিবেগ।

(iv) কোন পার্থিব কণা আলোর চেয়ে বেশী দ্রুত গতিতে চলিতে পারে না।

মহাকাশ পরিক্রমায় (i) ও (ii) নম্বরের সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট যেদিন আলোর গতির সহিত পাল্লা দিবে, তখন রকেটের ওজন বাড়িয়া যাইবে এবং সময় সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। সময় সংকীর্ণ হওয়ার ফলে যে সকল নক্ষত্র বা নীহারিকা লক্ষ লক্ষ কোটি আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত, সেখানেও মানুষ তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই রকেটে চড়িয়া যাইতে পারিবে। (iii) ও (iv) নম্বরের সিদ্ধান্ত আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষ করিয়া পারমাণবিক বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণের সুসংবদ্ধ গাণিতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। আইনষ্টাইন দেশ বলিতে চতুর্মাত্রিক রিমানিয়ান দেশ বুঝাইয়াছেন এবং এই দেশের আকৃতি বস্তুসাপেক্ষ। প্রত্যেক বস্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশে বক্রতার সৃষ্টি করে এবং এই দেশ-কাল সন্ততির বক্রতাই মাধ্যাকর্ষণ; ফলে মাধ্যাকর্ষণ দেশ-কাল সন্ততির জ্যামিতিক ধর্মে পরিণত হইল। আপেল পৃথিবীর আকর্ষণে মাটির দিকে আসে না—দেশ-কাল সন্ততিতে আপেল তাহার Geodesic বা Least path-এ চলে। এই জন্য আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্বকে হ্রস্বতম পথের সূত্র বলা যাইতে পারে।

আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের সহিত নিউটনের মহাকর্ষের নিয়মের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ আছে, কিন্তু বিকর্ষণ নাই। আইনষ্টাইনের নিয়মে কিন্তু দুই-ই আছে। গাণিতিক প্রতীকের সাহায্যে লিখিলে আইনষ্টাইনের আকর্ষণ-তত্ত্বের নিয়মে দাঁড়ায়: $G_{\mu\nu} = \lambda g_{\mu\nu}$; λ-কে (ল্যামডাকে) বলা হয় Cosmical Constant এবং $\lambda g_{\mu\nu}$-কে বলা হয় Cosmical term। ল্যামডা = ০ হইলে $G_{\mu\nu} = 0$ হয় এবং এ-স্থলে নিউটনের সূত্র ও আইনষ্টাইনের সূত্র এক হইয়া যায়; বিকর্ষণ থাকে না, শুধু আকর্ষণ থাকে এবং তাহা ব্যস্ত আনুপাতিক নিয়ম মানিয়া চলে।

কিন্তু ল্যামডা ০ না হইলে, আকর্ষণ ব্যতীত বিকর্ষণও থাকে এবং তাহা Cosmical term-এর সমানুপাতিক হইবে এবং বিকর্ষণ পারস্পরিক দূরত্বের সমানুপাতিক হইবে। সৌরমণ্ডলের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিউটন ও আইনষ্টাইনের গণনা এক হইয়া যায়; কারণ সৌরমণ্ডলে ল্যামডা = ০ ধরা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া বহির্দেশীয় গ্রহগুলি নিউটনের নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু অন্তর্দেশীয়

গ্রহগুলি (যেমন বুধ গ্রহ) আইনষ্টাইনের নিয়ম মানিয়া চলে। নীহারিকাপুঞ্জের অপসরণ ব্যাখ্যা করিতে হইলেও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের নিয়মের সাহায্য লইতে হয় এবং ইহা হইতেই সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তার সৃষ্টি হয়। নিউটনের নিয়ম, আইনষ্টাইনের নিয়মের একটি বিশেষ অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

বলবিদ্যার আর এক ধাপ হইল Quantum Mechanics ও Wave Mechanics। ইলেকট্রনের গতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়াই এই নূতন বলবিদ্যার উদ্ভব হয়। এই নূতন বলবিদ্যার চিন্তাধারা এমন অমূর্ত ও গণিতনিষ্ঠ যে, গাণিতিক প্রতীক ও সমীকরণ বাদ দিয়া ইহার শুদ্ধ প্রকাশ অসম্ভব। ইলেকট্রন এত দ্রুতগতিতে চলে যে, ইহার স্থানাঙ্ক (Co-odinate) ও গতিবেগ, দুইটি একসঙ্গে জানা যায় না। একটিকে পাইতে হইলে আর একটিকে হারাইতে হয়। ইলেকট্রনের স্থানাঙ্ক (q), ভরবেগ (p) এবং প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (h)-এর উপর ভিত্তি করিয়াই কোয়াণ্টাম মিকানিক্‌স্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদের মূল সূত্র ও ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা। বল-তরঙ্গবাদে এই বস্তু তাহার বস্তুত্ব হারাইয়া তরঙ্গে পরিণত হইল এবং এই তরঙ্গ হইল অনিশ্চয়তার তরঙ্গ; অর্থাৎ কোন বিন্দুতে ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাবনা কতটুকু, তাহার লৈখিক চিত্রই হইল এই তরঙ্গ।

এখন আমরা বলিতে পারি যে, বলবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মূলতঃ তিনটি ধারা প্রধানতঃ কাজ করিয়া আসিয়াছে—নিউটনীয় মিকানিক্‌স্, রিলেটিভিষ্টিক মিকানিক্‌স্ ও কোয়াণ্টাম মিকানিক্‌স্। স্থূল-বিশ্বের (Macrocosm) সমস্যা, অর্থাৎ বস্তু, শক্তি, বিকিরণ, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণ-শক্তি সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনাই রিলেটিভিষ্টিক মিকানিক্সের উপজীব্য বিষয়; আর ক্ষুদ্র-বিশ্বের (Microcosm) সমস্যা, অর্থাৎ ইলেকট্রন-প্রোটনের গতিবিধির আলোচনা কোয়াণ্টাম মিকানিক্সের উপজীব্য বিষয়। অবশ্য অনেক জায়গায় কোয়াণ্টাম ও রিলেটিভিষ্টিক মিকানিক্‌স্ মিশিয়া এক হইয়া যায়। আর নিউটনীয় বলবিদ্যাকে রিলেটিভিষ্টিক মিকানিক্সের একটি বিশেষ রূপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় নগণ্য হইলে সেই বস্তুর গতি নিউটনের সূত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে; আর Cosmical Constant ল্যামডা, শূন্য হইলে Cosmical Repulsion থাকিবে না; ফলে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সহিত এক হইয়া যাইবে।

রিলেটিভিষ্টিক মিকানিক্স ও কোয়াণ্টাম মিকানিক্সকে স্বতঃবিরোধী বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। সমস্ত জড়-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি—'Matter in motion' এবং একই বিশ্বের এক এক জায়গায় এক এক নিয়ম চলিবে, ইহা অসম্ভব। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আইনষ্টাইন প্রথমে 'Unitary Field Theory'-এর কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। সমগ্র বস্তুবিশ্বে একই নিয়ম কাজ করিতেছে—ইহাই এই নূতন তত্ত্বের সারকথা। আইনষ্টাইন তাঁহার আরব্ধ কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ এই দুরূহ তত্ত্বের আবিষ্কারে আজও আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। বলবিদ্যার চর্চা করিতে গিয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকম তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছিল; কিন্তু Unitary Field Theory প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সব বিভিন্ন তত্ত্ব একের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইবে। সেদিন মানব-চিন্তার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের আবির্ভাব হইবে। গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, অণু-পরমাণু, নীহারিকা প্রভৃতি সকলেই এক গতিসূত্রে গ্রথিত হইবে।

খাদ্য ও কৃষিকার্যে পারমাণবিক শক্তি

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি। প্রতি বছর এই সংখ্যা শতকরা ১.৫ ভাগ বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১০০০০০ ক্ষুধার্ত মুখ বাড়ছে। এভাবে চললে আগামী ২৫ বছর পর পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে সাড়ে তিন-শ' থেকে চার-শ' কোটি। এই ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে যে সব সমস্যা দেখা দেবে, তাদের মধ্যে এই বিপুল জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সংস্থানের সমস্যা অন্যতম।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্বেও খাদ্য উৎপাদন সে তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান, যন্ত্র-শিল্প, যানবাহন ইত্যাদির প্রয়োজনে চাষের জমির পরিমাণ অনেক কমে যাবে; সুতরাং বর্তমানের খাদ্য-সমস্যা ভবিষ্যতে আরও জটিল হয়ে দেখা দেবে। এতদিন পর্যন্ত মানুষ রাসায়নিক সার, জল-সেচ ইত্যাদির দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছে। বর্তমানে তারা বিজ্ঞানের নবতম অবদান পারমাণবিক শক্তি নিয়োগ করে খাদ্য ও কৃষির উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হচ্ছে।

যান্ত্রিক দিক থেকে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা তিন প্রকারে মেটানো যেতে পারে। সবচেয়ে সোজা উপায় হলো, বর্তমান উৎপাদন, সঞ্চয় ও বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থায় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান চাষের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো। শেষ উপায়ে নতুন কর্ষণোপযোগী ভূমির পরিমাণ বাড়ানো। অবশ্য এই শেষোক্ত কাজ একটু কঠিন; কারণ অনায়াস-লভ্য ভূমি বর্তমানে আর পতিত নেই। এই তিন পর্যায়ে পারমাণবিক শক্তি কি ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে, দেখা যাক।

পারমাণবিক শক্তি সহজলভ্য হলে তাথেকে কৃষিকার্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। এর দ্বারা উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যয় অনেক কমে যাবে। শহরাঞ্চল ব্যতীত গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক সুখ-সুবিধা সহজলভ্য হবে। এ-ব্যাপার অবশ্য সময়সাপেক্ষ। তবু বর্তমানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং বিকিরণের প্রভাবে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হওয়া সম্ভব।

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন, বণ্টন ও সঞ্চয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া ও নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সব ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হলে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ অনেক বাড়ানো যাবে। এ ভাবে পৃথিবীতে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি হয়, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে এই পরিমাণ অতি বৃহৎ। কেবল মাত্র সঞ্চয়নে কীট-পতঙ্গের আক্রমণে খাদ্যশস্যের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা প্রায় দশ ভাগ। পৃথিবীর উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে এই সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ। তা-ছাড়া পচনশীল খাদ্য, যেমন—ফল, সব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি সঞ্চয়ন ও বণ্টনে প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও বিকিরণ ব্যবহারের ফলে এই ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করে সরবরাহের পরিমাণ প্রকৃষ্টরূপে বাড়ানো যেতে পারে। বিকিরণের প্রভাবে আজকাল বিভিন্ন শ্রেণীর পোকা

মাকড়, ব্যাকৃটিরিয়া ও ছত্রাকের বন্ধ্যাত্ব বা মৃত্যু প্রায়ই ঘটানো হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ও শস্য-নষ্টকারী পোকা-মাকড় প্রভৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে, আলুর চারা বেরোবার চোখ নষ্ট করে আলুসংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে এবং কাঁচা সব্জী, পাকা ফল ইত্যাদি প্রয়োজনমত অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়েছে। মাছ, মাংস ডিম ও নানা-প্রকার শাক-সব্জী এভাবে জীবাণু-শূন্য করে ঠাণ্ডা কামরার বাইরেও অনেক সময় পর্যন্ত অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়েছে। এ-রকম বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে বুঝা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-সংরক্ষণ খুবই সহজসাধ্য হবে।

প্রতি বছর উদ্ভিদ-রোগ ও নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণে অনেক শস্য নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকার মত উন্নত দেশেও প্রতি বছর এভাবে প্রায় ১৩০০ কোটি ডলার লোকসান হয়। উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনে এই ক্ষতি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায় এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এই কাজে অনেক সহায়তা করে। কীট-পতঙ্গের আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে তাদের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শস্য-নষ্টকারী কীট-পতঙ্গের গায়ে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সামান্য অংশ প্রবেশ করিয়ে দেবার পর সেগুলিকে মাটির ভিতর পুঁতে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তাদের গতিবিধি ও কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করা হয়েছে। রোগ-বিস্তারকারী কীট-পতঙ্গের গায়ে তেজস্ক্রিয় জিনিষের লেবেল এঁটে ছেড়ে দিয়ে বহু দূরে তাদের আট্‌কে রেখে জানা গেছে, তারা কতদূর যেতে পারে। এভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দ্বারা কীট-পতঙ্গের ওড়বার দূরত্ব, দেশান্তর গমন পথ ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে এদের দ্বারা শস্য-আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

আজকাল বাজারে অনেক কীটনাশক ওষুধ পাওয়া যায়। ক্রমাগত এসব কীটঘ্ন ব্যবহারে কীট-পতঙ্গ ক্রমশঃ এই সব ওষুধ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করে। এসব কীটনাশক ওষুধে তেজস্ক্রিয় জিনিষের লেবেল এঁটে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জনকারী কীট-পতঙ্গের কীটনাশক ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হবে।

এভাবে তেজস্ক্রিয় লেবেল আঁটা ছত্রাক ও আগাছা-নাশক পদার্থ ব্যবহার করে একই রকম ফল পাওয়া যাবে। আর তেজস্ক্রিয় লেবেল আঁটা আগাছা ও ছত্রাক-নাশক পদার্থ ব্যবহার করে যে সব ফসল পাওয়া যায়, সেগুলি মানুষ বা জীব-জন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর কিনা তাও দেখা যেতে পারে।

উদ্ভিদ-কোষের উপর পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাক প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করা গেলেও সেগুলি অধিক ব্যয়সাপেক্ষ; সে জন্যে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ-ক্ষম উন্নত ধরণের গাছপালার চাষ করে অধিকতর ফসল পাওয়া যেতে পারে। কাজেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে নির্বাচন, সঙ্করোৎপাদন প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা উন্নত ধরণের গাছপালা সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা করছেন এবং এ-কাজে অনেকাংশে সাফল্যও লাভ করেছেন। কিন্তু দিন দিন নতুন ধরণের রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ফলে এ-কাজের শেষ নেই; কাজেই নতুন ধরণের রোগাক্রমণ প্রতি-রোধক্ষম উদ্ভিদের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এইরূপ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির কাজে বিকিরণ অনেক সহায়তা করছে। বীকরণের ফলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি ঘটিয়ে উৎকৃষ্টতর গাছপালা পাওয়া যায়।

রঞ্জেন-রশ্মি, গামা-রশ্মি, তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-রশ্মি প্রভৃতির দ্বারা মিউটেশন বা পরিব্যক্তির ফলে যে সব উন্নত ধরণের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে যান্ত্রিক উপায়ে শস্য-সংগ্রহের উপযোগী শক্ত খড়যুক্ত

কয়েক জাতের বার্লি এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত ও অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ভূমির উপযোগী শস্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যানাডায় এভাবে সৃষ্ট কয়েক প্রকার বার্লির মধ্যে কিছু সংখ্যক দ্রুত ফলনশীল বার্লির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বার্লি চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

উদ্ভিজ্জ উপায়ে বংশবৃদ্ধিকারী উদ্ভিদেরও বিকিরণের ফলে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে পাওয়া গেছে নানা রঙের পিচ, আঙ্গুর ও অন্যান্য বীজহীন ফল।

শ্যাওলার ক্ষেত্রেও বিকিরণের ফলে অধিক তাপ-সহনশীল নতুন জাতের শ্যাওলার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কালে এই সব শ্যাওলা খাদ্য ও নানাপ্রকার শিল্পের কাঁচা মালের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। বন বিভাগেও বিকিরণের ফলে দ্রুত বর্ধনশীল ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

রাষ্ট্‌ ও স্মাটের আক্রমণে গম ও ওটের প্রভূত ক্ষতি হয়। হয়তো বিভিন্ন উপায়ে বিশেষ প্রজাতির রাষ্ট্‌ ও স্মাট প্রতিরোধক এক জাতের গমের সৃষ্টি হলো। কিন্তু এই সব রাষ্ট্‌ ও স্মাটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিউটেশন হওয়ায় বিশেষ জাতের রাষ্ট ও স্মাট প্রতিরোধক গম মিউটেশনের প্রভাবে নতুন জাতের রাষ্ট্‌ ও স্মাটের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না। বিকিরণের দ্বারা নানা জাতের রাষ্ট্‌ ও স্মাট সৃষ্টি করে এদের আক্রমণ প্রতিরোধক গমের সৃষ্টি করা যায়। বিকিরণের ফলে রোগ উৎপাদনের অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ছত্রাক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ফলে আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলা সম্ভব হবে।

রোগ-প্রতিরোধক উদ্ভিদের সৃষ্টি ছাড়াও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্ভিদের শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং উদ্ভিদের সঙ্গে মাটি, জল ও সূর্যালোকের জটিল সম্বন্ধের বিষয়ে অনেক তথ্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে।

জমির উর্বরতার উপর তার ফলন অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারতে একর প্রতি ধানের ফলনের পরিমাণ জাপানের এক-চতুর্থাংশ। জাপানে অজৈব সার প্রয়োগ দ্বারা এই অধিক ফলনের ব্যবস্থা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, ভারতের জমিতে অন্যান্য সারের সঙ্গে প্রতি হেক্টরে ৩৫ কিলোগ্র্যাম নাইট্রোজেন ব্যবহারে ধানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১০ মিলিয়ন টন বাড়ানো যায়। সার ব্যবহারের সঙ্গে দেখতে হবে, যাতে এর পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ভূমির উর্বরতা নির্ধারণে নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস মিশ্রিত ফস্‌ফেট সার প্রয়োগ করে জমিতে ফসল ফলাবার পর সেই ফসলের ভিতর তেজস্ক্রিয় ও সাধারণ ফস্‌ফরাসের অনুপাত বের করে জমির ফস্‌ফেটের পরিমাণ জানা গেছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, এতদিন পর্যন্ত জমিতে যতটা ফস্‌ফেট দেওয়া হতো, তার সিকি ভাগই সে জন্যে যথেষ্ট। এভাবে অন্যান্য সারেরও পরিমাণ বের করা সম্ভব হয়েছে। উষ্ণমণ্ডল ও জলাভূমির ফস্‌ফরাসের পরিমাণ নির্ণয়ে ভারতেও কাজ চলছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলে কোন্‌ জমিতে কতটা সার দেওয়া দরকার এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোন্‌ অবস্থায় সার প্রয়োগ বেশী উপযোগী, কোন্‌ স্তরে কতটা সার প্রয়োগ করলে গাছ তা সহজে পেতে পারে—ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভূমিসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে ভূমির কোন্‌ স্তরে কতটা জলীয় বাষ্প আছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। কৃষি-বিজ্ঞানী ও ভূমি-সংরক্ষণকারীদের পক্ষে এই প্রশ্ন একান্ত প্রয়োজনীয়। ফস্‌ফরাস-৩২ ও রুবিডিয়াম-৮৬ প্রয়োগে ভূমির জল নিষ্কাশনের পরিমাণ ও গতি নির্ণয় করা যায় এবং সেচের জলে এদের প্রয়োগে ভূমিতে জল বণ্টনের দক্ষতা সম্বন্ধে জানা

যায়। জাপানে জলসেচের বাঁধের ছিদ্রপথে জলের নির্গমন নির্ধারণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার হচ্ছে।

গাছ শেকড়ের সাহায্যে পুষ্টিকর দ্রবণ শোষণ করে এবং পরে তা শেকড় থেকে অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়। বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে এ-সম্বন্ধে নতুন তথ্যাদি জানবার চেষ্টা চলছে।

উদ্ভিদে পুষ্টিকর দ্রবণ পরিবহন সম্বন্ধে জ্ঞান, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শস্যের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও আগাছা বিনাশে উদ্ভিদ-হর্মোন ব্যবহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সাহায্য করবে। অধিকাংশ হর্মোন ও আগাছা বিনাশক-পদার্থ গাছের পাতার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জমির বদলে পাতায় সার ছিটিয়ে গাছ ও ফসলের উন্নতি করা যায়। এভাবে, বিশেষ করে বড় বড় গাছের বেলায় লোহা, দস্তা ইত্যাদির সাময়িক ঘাট্‌তি পূরণ করবার জন্যে দ্রবণীয় সার জলে গুলে গাছপালার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তেজস্ক্রিয় পরমাণুঘটিত সার ব্যবহারের ফলে দেখা গেছে যে, পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া সার গাছ সহজে শোষণ করে অন্যান্য অংশে পৌঁছে দিতে পারে। ইতিমধ্যে এই প্রথার বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে চাষীরা ফল ও শাকসব্জীর পাতায় এভাবে ইউরিয়া ব্যবহার করছে। আলু, তামাক, টোম্যাটো, ভুট্টা ও শশাজাতীয় গাছ তাড়াতাড়ি পাতার ভিতর দিয়ে সার শোষণ করতে পারে। ষ্ট্র-বেরীর বেলায় দেখা গেছে, পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া ক্যালসিয়াম গাছের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয় না; যে জন্যে এ-ক্ষেত্রে জমিতেও ক্যালসিয়াম প্রয়োগের দরকার হয়।

লোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু তৈরী করে। সাধারণতঃ সবুজ পাতা যে পরিমাণ সূর্যালোক পায় তার শতকরা এক ভাগ মাত্র আলোক-সংশ্লেষণে ব্যবহার করে। উদ্ভিদের দ্বারা এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে এই অল্প পরিমাণ সূর্যালোক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া সীমিতকারী পদার্থগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে। এই আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াই আমাদের ও অন্যান্য জীবজন্তুর খাদ্যদ্রব্যাদির উৎস। সুতরাং এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হলে বেশী পরিমাণে সৌরশক্তি ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত সম্ভব হবে। এতে খাদ্য-সমস্যা সমাধানে কতদূর সাহায্য হবে, তা বর্তমানে অনুমানসাপেক্ষ হলেও ভবিষ্যতে এর ফলভোগের আর বোধ হয় বেশী দেরী নেই।

পারমাণবিক শক্তি গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষ সাধনেও নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পশু-খাদ্যে অজৈব তেজস্ক্রিয় সালফেট ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, অরোমন্থনকারী পশুরাও তাদের প্রয়োজনীয় Cystane আংশিকভাবে তৈরী করতে পারে। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে, আল্‌ফাল্‌ফার ফস্‌ফরাসের এক পঞ্চমাংশ মাত্র পশু-খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে; কিন্তু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে দেখা গেছে, আল্‌ফাল্‌ফার ফস্‌ফরাসের শতকরা ৯০ ভাগ পশু-খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। এ ভাবে বিভিন্ন খাদ্যের কতটা জীবদেহের পুষ্টিসাধনে ব্যবহৃত হয়, তাও জানা যায়।

স্ক্রু-ওয়ার্ম ফ্লাই নামক এক শ্রেণীর পতঙ্গ অনেক দিন পর্যন্ত আমেরিকার গৃহপালিত পশুর পক্ষে ভীষণ অভিশাপের মত ছিল। এদের আক্রমণে বহু পশু বিনষ্ট হতো। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-রশ্মির দ্বারা এদের ডিম নষ্ট করে এবং তেজস্ক্রিয় গামা-রশ্মির দ্বারা পুরুষ পতঙ্গের বন্ধ্যাত্ব ঘটিয়ে এই পতঙ্গ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

উষ্ণমণ্ডলের অধিকাংশ দেশে মাছ, আমিষ-জাতীয় প্রোটিনের একমাত্র উৎস। এখন পর্যন্ত দেশের জলাশয়ে এবং সমুদ্রের জলভাগের সামান্যতম

অংশে মাছের চাষ হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের মৎস্য-সম্পদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যাবে এবং জনকল্যাণে এদের ব্যবহার সম্ভব হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পারমাণবিক শক্তি কৃষিকার্য ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিতে উত্তরোত্তর অধিকতর প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করছে। গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে স্বল্প-পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব ও গতিপথ ধরা পড়বার ফলে নানাপ্রকার গবেষণায় এর ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এসব তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গতিপথ অনুসরণ করে নানাপ্রকার জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে।

অবশ্য এসব গবেষণার জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত লোকের দরকার এবং গবেষণার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্যেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; তথাপি প্রায় সকল দেশেই সরকার এই বিষয়ে বেশ দৃষ্টি দিচ্ছেন।

অল্প ব্যয়ে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া গেলে তাথেকে কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভর-শীল শিল্পের অনেক উন্নতি হবে। নানাপ্রকার রোগের আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা করে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়ানো যাবে, তেমনি নতুন নতুন চাষ-পদ্ধতির দ্বারাও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। বিশেষ করে মরুঅঞ্চলে জলসেচ প্রথার সাহায্যে অনেক নতুন চাষের জমি পাওয়া যাবে। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যএশিয়া ও উত্তর চীন প্রভৃতি দেশের অনেক ভূখণ্ড এভাবে শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে। তাছাড়া জলাভূমির পুনরুজ্জীবনের দ্বারাও চাষের জমির পরিমাণ বাড়বে। সহজলভ্য পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সেচ প্রথার উন্নতির ফলে কৃষিতে অনুন্নত দেশগুলি বেশ উপকৃত হবে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পারমাণবিক শক্তি নানা উপায়ে কৃষির উন্নয়নে সাহায্য করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ-সমস্যা রসমাধান করতে পারবে।

দাঁত

শ্রীজয়া রায়

ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের দেহ ও মনের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু দাঁতের ব্যাপারে তার বর্তমান অবস্থা পূর্বপুরুষদের তুলনায় হীনই হয়েছে, বলা যেতে পারে। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী, বন-মানুষ এবং অন্যান্য কয়েক জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁত মানুষের দাঁতের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

অন্যান্য স্তন্যপায়ীর দাঁতের মত মানুষের দাঁতের সংখ্যা নির্দিষ্ট। ৬ মাস পর থেকে মানব-শিশুর দাঁত উঠতে সুরু করে। এই সময় এক এক পাটিতে ১০টি করে দাঁত বেরোয়। এগুলিকে অস্থায়ী বা 'দুধে দাঁত' বলা হয়। সাত বছর বয়সের পর সেগুলি ক্রমে ক্রমে পড়ে গিয়ে নতুন স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। প্রায় ১১ বছর বয়সের মধ্যে 'আক্কেল দাঁত' ছাড়া প্রায় সব দাঁতই উঠে যায়। ১৫ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে আক্কেল দাঁত ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়সে সর্বসমেত ৩২টি দাঁত হয়।

মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে একমাত্র বাদুড় ও গিনিপিগের জন্মের পূর্বেই অস্থায়ী দাঁত পড়ে যায়। হাঙ্গর ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অনির্দিষ্ট সংখ্যক দাঁত থাকে।

এদের কোন্ দাঁতের কি কাজ, তাও সঠিক জানা যায় না। বিবর্তনের ধারায় অগ্রগতির ফলে স্থলবাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট দাঁতের সংখ্যাও কমে এসেছে। কারণ খাদ্যের পরিমাণ আগের তুলনায় কমে গেছে এবং সেই অল্প পরিমাণ খাদ্য ভাল করে চিবিয়ে খাবার জন্যে শক্ত মাংসপেশীর প্রয়োজন হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের মাপও ছোট হয়ে এসেছে।

মানুষের দাঁত এই পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়েছে। আদিম মানুষ এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আক্কেল দাঁত অন্যান্য দাঁতের সঙ্গেই সঙ্গেই উঠে থাকে; কিন্তু সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। বহুবিবর্তিত কোন কোন আধুনিক মানুষের নীচেকার আক্কেল দাঁত থাকে না। এমন কি, রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যেও তাদের সেখানে দন্তোদ্গমের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

খাওয়ার ব্যাপারে দাঁত দু-ভাবে সাহায্য করে। প্রথমতঃ খাদ্যকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাকে চূর্ণ বা পেষণ করা। সামনের চারটি ছেদন দন্ত পাঁউরুটি ইত্যাদিকে কাঁচির মত কেটে দেয়। খাবার জিনিষ এই দাঁতগুলির সাহায্যে মুখের দিকে যায় এবং পিছন দিকের পেষণ দন্তগুলি দ্বারা সেই খাবার পেষিত হবার ফলে গিলে ফেলবার সুবিধা হয়।

মানুষের চারটি লম্বা ধরণের শ্বদন্ত আছে। মাংসাশী জন্তুদের যুদ্ধ করবার ও মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্যে এই ধরণের দাঁতের প্রয়োজন হয়। সেই দাঁতেরই চিহ্ন আমাদের চোয়ালে রয়ে গেছে। এগুলির কাজ যদিও খাদ্যকে কেটে দেওয়া, তবুও গঠনের দোষে সেগুলি মানুষের বিশেষ কোন উপকারে আসে না।

আদিম মানুষের চোয়াল এমন ছিল যে, তার মুখমণ্ডলের উর্ধ্বাংশ বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকতো। এই সময় এদের ছেদন দন্তগুলি খাদ্যবস্তু কাটবার কাজ করতো না। কারণ তারা পাঁউরুটি বা স্যাণ্ডউইচের মত খাবার খেতো না, বরং এগুলির সাহায্যে খাদ্যবস্তু ভেঙে বা ছিঁড়ে খেতো। সেগুলিকে দেখতে ছিল চ্যাপ্টা ধরণের এবং পরস্পরের মুখোমুখিভাবে বসানো থাকতো, যেমন সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুদের থাকে।

মানুষের সারা জীবনের সম্বল এই দু-পাটি দাঁত কথা বলতে ও খেতে সাহায্য করে। তাছাড়া একটি দাঁত পড়ে গেলেও সৌন্দর্যের যথেষ্ট হানি হয়; অথচ পড়ে গেলে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মত সে জায়গায় নতুন দাঁত গজায় না।

জন্তুদের থাবার মত মানুষের হাত-পায়ের নখ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং কোন কারণে ভেঙে বা নষ্ট হয়ে গেলেও নতুন নখ গজায়। অথচ নখ দিয়ে আর কতটুকুই বা কাজ হয়! বড় জোর চুলকানো যায়, ছুরি কি কৌটা খোলা বা ক্ষুদ্র জিনিষ তোলবার সময় দরকার পড়ে। যে দুর্বল অথচ মূল্যবান দাঁত দিয়ে আমরা খাই, কথা বলি বা যা আমাদের সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত, তাকে রক্ষা করবার জন্যে খুব অল্প অর্থ এবং সময়ই আমরা ব্যয় করি। সে হিসাবে নখ কাটতে সময় দিই বেশী এবং সেই সঙ্গে নখ কাটবার যন্ত্র এবং পালিশ করবার রং কিনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করি।

দেখা যায়, কতক মানুষের দাঁত বেশ শক্ত এবং মোটা ধরণের; আবার কারও দাঁত সে তুলনায় পাত্‌লা। অনেক কারণেই দন্তক্ষয় হয়, তবুও বিভিন্ন মানুষের দাঁতের রাসায়নিক উপাদান, গঠন এবং স্থায়িত্ব বিভিন্ন রকমের। দাঁতের স্বাস্থ্য বংশানুক্রমের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে—অবশ্য সব সময় উত্তরাধিকারের ফলাফল সঠিক ধরা পড়ে না।

নানাবিধ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও শরীরের মধ্যে দাঁতই সবচেয়ে শক্ত এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তু। এদের আকৃতি ও গঠন জটিল এবং নানা ধরণের। দাঁতের বাইরে যে চক্‌চকে অংশকে এনামেল বলা

হয়, তার বেশীর ভাগই ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, কিছুটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগ্নেসিয়াম ফস্‌ফেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক লবণ; বাকীটা জৈববস্তুর দ্বারা গঠিত। এনামেলে কিছুটা জলও আছে। এনামেলের নীচে দাঁতের যে অংশ থাকে তা ডেন্টিন দ্বারা তৈরী। এই ডেন্টিন খুব শক্ত, হাতীর দাঁতের মত বস্তু। হাড়ের সঙ্গে ডেন্টিনের রাসায়নিক গঠনের মিল আছে। তবে ডেন্টিনে শতকরা ১০ ভাগ জল থাকে। ডেন্টিনের নীচে একটি গর্তের মধ্যে দন্তমণ্ড (tooth pulp) থাকে। এই মণ্ডে রক্তনালী, শিথিল সংযোজক তন্তু, স্নায়ু এবং নানা আকৃতির কোষ থাকে। ডেন্টিনের কোষের সঙ্গে দন্তমণ্ডের স্নায়ুর সংযোগ আছে।

দন্তগঠন ও দন্তরক্ষার জন্যে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফোরাস, ফ্লোরিন ও ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি খাদ্য বা পানীয়ের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। ফস্‌ফরাস এবং ম্যাগ্নেসিয়াম যে খাদ্যে আছে, তাই খাওয়া উচিত। খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাট্‌তি হলে দুধ থেকে তা পূরণ করা যেতে পারে। ফ্লোরিন দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তবে বেশী পরিমাণে ফ্লোরিনের যৌগিক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এক কোটি ভাগ জলে এক ভাগ ফ্লোরিন থাকলেই দাঁতের উপকার হয় ও দাঁতের রোগ কম হয়। কোটি ভাগের মধ্যে ১৫ ভাগ বা তার বেশী ফ্লোরিন থাকলে দাঁতে ছোপ ধরে। ৮ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ফ্লোরিন মিশ্রিত জল খাওয়ালে শতকরা ৫০টি ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়।

খাদ্যই শৈশব অবস্থায় দাঁতের মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ। যে সব খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস বা খাদ্যপ্রাণ A, C ও D-এর অভাব সেগুলি খেলে দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

যে দাঁত তোলবার দরকার তা না তুলে ভুলক্রমে অন্য দাঁত তোলা হলে পাশের বাকী দাঁতের উপর জোর পড়ে। অনেকে ঘুমের সময় দাঁত-কাটে বা সময়ে সময়ে দাঁতে দাঁত ঘষে। এই কুঅভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো দন্তক্ষয়। চুরুট, পেন্সিল ইত্যাদি চিবুলেও দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। দাঁতের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহারের উপর দন্তক্ষয় নির্ভর করে। তবে প্রধান কারণ হচ্ছে, দাঁতের উপর জীবাণুর ক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। এর প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভব। মুখের ভিতরটা জীবাণুমুক্ত রাখা অসম্ভব বললেই হয়। কোনও জীবাণুনাশক ওষুধ দ্বারা মুখ পরিষ্কার করলে জীবাণু বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের তন্তুগুলিও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য ও বায়ু থেকে রোগ-জীবাণু সর্বদাই মুখের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করে। দাঁতের ফাঁকে আট্‌কে-থাকা খাদ্যকণার মাধ্যমে জীবাণুর দ্রুতবৃদ্ধি ঘটে। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবার ঠিক পরেই দাঁত মাজলে কিছুটা উপকার হয়। কিন্তু দাঁতের দুর্গম খাঁজগুলিতে ব্রাশ ঢোকে না; কাজেই সে জায়গা পরিষ্কারও হয় না।

আজকাল যেন ডেন্টিষ্ট বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের রোগও বেড়ে গেছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে, দন্তরোগই অনেক সময় অন্য কতকগুলি কঠিন রোগের পরোক্ষ কারণ। সাধারণ মানুষ দাঁতের রোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানলেও প্রতিকার করতে পারে না। তাছাড়া দন্ত-চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের মত অগ্রসর হয় নি। পাশ্চাত্য দেশ তো বটেই—এমন কি, জাপানীরাও আজকাল দাঁত সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-স্বাস্থ্য-পরীক্ষক সমিতির রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই দাঁত খারাপ। তার কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে মা, বাবা দাঁত সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্নশীল হতে শিক্ষা দেন না।

কোনও রক্তহীনতার রোগীকে দেখে ডাক্তার যদি দাঁতের যত্ন নিতে উপদেশ দেন—তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু রক্তহীনতা নয়, দৃষ্টিশক্তি

হ্রাস, স্নায়বিক রোগ ও পেটের নানারকম রোগের কারণও দূষিত দাঁত।

দাঁতের নানারকম ব্যাধির মধ্যে দাঁতের গোড়া থেকে পুঁজ বা রক্ত পড়া (পাইয়োরিয়া) একটি ভয়ঙ্কর রোগ। এই রোগ সাধারণতঃ বয়স্ক লোকদেরই হয়। তবে উপযুক্ত যত্নের অভাবে অল্প-বয়স্কদেরও হতে পারে। বেশী দিন এই রোগ অবহেলা করলে দাঁতের গোড়া আল্‌গা হয়ে দাঁত পড়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে, রোগ-জীবাণু মুখের মধ্য দিয়েই শরীরে ঢোকে। দাঁতের ফাঁকে ও মাড়ির সীমানায় জমে-থাকা খাদ্যকণায় অম্লতার সৃষ্টি হয়। সেই অম্লতায় নানাপ্রকার জীবাণু জন্মায়। সেই জীবাণুগুলি দাঁতের এনামেল আক্রমণ করে এবং তার মধ্যে ছোট ছোট গর্ত করে। সেই গর্তে আরও জীবাণু এসে বাসা বাঁধে। যেমন রূপকথার রাক্ষসের রক্তের একটি ফোঁটা থেকে লক্ষ লক্ষ রাক্ষস জন্মাবার কথা শোনা যায়, তেমনি ঐ কয়েকটি জীবাণু থেকে অনেক সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটে। তারপর সেগুলি খাদ্যের সন্ধানে গর্ত বাড়াতে বাড়াতে ভিতরে গিয়ে রক্তনালী ও স্নায়ুকে আক্রমণ করে। তখন অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং মাড়ি দিয়ে পুঁজ ও রক্ত পড়তে থাকে। সেই দূষিত রক্ত খাবারের সঙ্গে পেটে গিয়ে সেখানেও রোগ জন্মায়। তারপর রক্তে মিশে গিয়ে তারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন হৃদ্‌রোগ, বাত, গেঁটেবাত, স্নায়বিক রোগ, যক্ষ্মা, দৃষ্টিহীনতা ও প্রস্রাবের রোগ হয়।

আধুনিক দন্ত-চিকিৎসকেরা নানারকম বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে রোগীর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করছেন। চিকিৎসার জন্যে দাঁতে ছিদ্র করবার প্রয়োজন হলে পূর্বে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, তার চেয়ে অনেক উন্নত ও দ্রুত ঘূর্ণনশীল যন্ত্রের সাহায্যে সেই কাজ করা হচ্ছে। এই যন্ত্র চালাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে হাওয়া ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

দাঁতে অস্ত্রোপচারের সময় স্থানটিকে অসাড় করবার জন্যে ওষুধ বা কোনও গ্যাস ব্যবহার করা হয়। রূপা ও পারদ নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে দাঁতের গর্ত ভরাট করা এবং সোনা দিয়ে Precision Casting করবার ব্যবস্থাও উন্নততর হয়েছে। নকল দাঁত লাগাবার জন্যে প্লাষ্টিকের তৈরী হাল্‌কা ব্রিজ হওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে। অল্প-বয়স্কদের দাঁত উঁচু-নীচু হলে তাও আজকাল ঠিক করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। একজন বিখ্যাত লেখক বলেছেন যে, মানুষের এক-একটি দাঁত হীরকের চেয়েও মূল্যবান। কথাটা যে কতখানি সত্য তা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। শিশুর দাঁত পড়ে যায় বলে অনেকে সেই দাঁতের যত্ন নেন না—ক্রমাগত অযত্নে দাঁত ও মাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং দাঁতে পোকা ধরে। সেই দাঁত পড়ে গেলেও সেই মাড়িতে কখনই ভাল দাঁত হয় না। গর্ভাবস্থায় মায়ের দাঁতের যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ মায়ের স্বাস্থ্যের উপরেই শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শিশু গরুর দুধ খেতে সুরু করলেই দুধে চুনের জল মিশিয়ে তাকে খাওয়ানো উচিত। কারণ তাতে দাঁত শক্ত হয়। একটু বড় হলে শক্ত জিনিষ চিবিয়ে খেতে দেওয়া উচিত। তাছাড়া বেশী পরিমাণ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য ও ফ্লোরিন মিশ্রিত জল খেলে এবং দাঁতের উপযুক্ত যত্ন নিলে দাঁত নিশ্চয়ই ভাল থাকবে। মধ্যে মধ্যে দন্ত-চিকিৎসককে দেখিয়ে নিলে দাঁতের দোষ বা রোগ ধরা পড়ে এবং সময় থাকতে সুচিকিৎসাও হতে পারে।

রি-ইনফোর্সড্ সিমেণ্ট কংক্রীট

শ্রীনির্মলেন্দুবিকাশ কর

আদিম যুগ থেকে মানুষের মনে চিন্তাধারার বিরাম নেই। মানুষ যখন পৃথিবীর আলোক দেখবার প্রথম সুযোগ পেয়েছিল, তখন না ছিল তাদের ঘরবাড়ী—না ছিল তাদের কোন স্থায়ী আস্তানা। তাই তাদের বনে-জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াতে হতো এবং কোন পাহাড়ের গুহায় বিশ্রাম-স্থল খুঁজে নিত। এই ভাবে বহুদিন পরে স্থায়ী গৃহ-নির্মাণের কথা প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের চিন্তাধারায় আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথম প্রথম তারা কতকগুলি কাঠ ও পাথর জড়ো করে প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতো। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও অধিক উন্নত হয়ে ওঠে এবং সর্বশেষে তারা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গৃহ-নির্মাণের কাজে লেগে যায়।

তারপর মানবজাতির ইতিহাসে এলো লৌহযুগ। মানুষের জীবন-প্রবাহকে আরও দ্রুত গতিশীল করে তুললো—লোহার যন্ত্রপাতির সাহায্যে গৃহ-নির্মাণের কাজ দ্রুততর হতে লাগলো। কিন্তু তখনও লৌহকে গৃহ-নির্মাণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে লাগানো হয় নি। লোহার খুঁটি, লৌহ-শলাকা, ছাদ তৈরীর কাঠামো প্রভৃতি তখনও তৈরী হয় নি। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাও সম্ভব হলো।

আজ বিংশ শতাব্দীতেও সভ্য জনগণের চিন্তাধারার বিরাম নেই। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল উন্নততর গৃহ-নির্মাণ ও সভ্যজগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানাবিধ পরিকল্পনাসমূহ। বিংশ শতাব্দীর কর্মমুখর বৈজ্ঞানিক যুগে ইস্পাত-নির্মিত কাঠামোর সাহায্যে প্রায় ১৪০০ ফুট উঁচু, অর্থাৎ ১০০ তলারও বেশী উঁচু বাসভবন তৈরী হয়েছে। শুধু বাসভবনই নয়, আরও অনেক কিছু তৈরীর কাজে আজকাল লোহা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষ দেখলো, এভাবে যদি লোহার ব্যবহার চলতে থাকে তবে এমন দিন আসবে, যেদিন পৃথিবীর যাবতীয় লোহা ফুরিয়ে যাবে। কাজেই মানুষ নতুন উপায় উদ্ভাবনের কাজে লেগে গেল। তারা দেখলো যে, উপযুক্ত পরিমাণ সিমেণ্ট, বালি, পাথরকুচি ও জলের সংমিশ্রণে যে কংক্রীট তৈরী হয়, সেগুলিকে এ-ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। সিমেণ্ট কংক্রীটের গুরুত্ব এই যে, এই কংক্রীট প্রতি বর্গইঞ্চিতে হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে; কিন্তু প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৬০ পাউণ্ডের বেশী টান (Tension) সহ্য করতে পারে না। কাজেই এখানেও খানিকটা বাধার সৃষ্টি হলো। যেখানে কেবল চাপ প্রযুক্ত হয়, সেখানেই সিমেণ্ট কংক্রীটের ব্যবহার চললো; কিন্তু যেখানে টান প্রযুক্ত হয়, সেখানেই সমস্যা রয়ে গেল। অচিরেই কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান হলো। দেখা গেল—যেসব জায়গায় টান প্রযুক্ত হয়, সে সব জায়গায় হিসাবমত ইস্পাতের শলাকা সিমেণ্ট কংক্রীটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে কংক্রীট টানও সহ্য করতে পারে। কিন্তু এই ইস্পাতের শলাকা সমেত সিমেণ্ট কংক্রীটকে শুধু সিমেণ্ট কংক্রীট বললে ভুল হবে—কেন না, এই ধরণের ইস্পাত-শলাকা সমেত সিমেণ্ট কংক্রীটের নামই রি-ইনফোর্সড্ সিমেণ্ট কংক্রীট বা আর. সি. সি.। সাধারণভাবে বলা হয়—রি-ইনফোর্সড্ কংক্রীট বা আর. সি.।

আজকাল আর. সি-এর ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং বহু প্রয়োজনীয় কাজে আর. সি.

অত্যধিক ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোটখাটো থেকে সুবৃহৎ গৃহসমূহ, পুল, রাস্তা, নদীর বাঁধ, মাটির নীচের নর্দমার নল প্রভৃতি নির্মাণে লোহার পরিবর্তে আর. সি-এর ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। গৃহ-নির্মাণে আর সি. দিন দিন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বাড়ীর প্রতিটি কোণ ও তার মধ্যবর্তী কয়েক জায়গায় আর. সি-এর খুঁটি বা স্তম্ভ ও দুটি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থান আর. সি. বা শুধু কংক্রীট ব্লক দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। যে সব বড় বড় বাড়ী (সাধারণতঃ ৯।১০ তলা উঁচু) সাধারণতঃ ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে নির্মাণ করা হয়, সেগুলিতে ইস্পাতের কাঠামোর বদলে আর. সি.-ও ব্যবহার করা যায়। অনেকে বলতে পারেন—আর. সি. দিয়ে করতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই ভুল; কারণ যে সব দেশে আর. সি-এর খুব উন্নতি হয়েছে, সে সব দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সব কাজ সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে। দরজা, জানালা বা কোন ফাঁকার উপর দেয়াল তুলতে হলে ইটের খিলান বা ইস্পাতের কড়ির উপর তুলতে হয়। আজকাল সে সব কড়ি বা খিলানের ব্যবহার কমে গেছে, তার পরিবর্তে এখন আর. সি. লিণ্টেল কাজে লাগানো হয়। এসব লিণ্টেল গৃহ-নির্মাণের সময়ে তৈরী করে নেওয়া হয়; অথবা আগে থেকে তৈরী-করা লিণ্টেলও পাওয়া যায়। কারখানায় তৈরী-করা লিণ্টেলগুলির কোন্ দিকটায় ইস্পাতের শলাকা দেওয়া আছে, সেটা চিহ্নিত করে নিতে হয়। কারণ শলাকাগুলি ঠিক কোন্ দিকটায় আছে, বাইরে থেকে সেটা মোটেই দেখা যায় না। কাজেই যেদিকে চাপ প্রযুক্ত হবে, সেই দিকটায় লিণ্টেলটি ঠিক মত 'সেট' করায় ভুল হলে তার চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা ব্যাহত হবে। সুতরাং যে দিকটায় ইস্পাত-শলাকা দেওয়া থাকবে, তার অপর দিকে চিহ্নিত করাই কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। এতে লিণ্টেলটি সঠিকভাবে রাখা যাবে এবং চিহ্নটি বাইরে থেকে দেখা যাবে না বা দৃষ্টিকটু হবে না। বাড়ীর উপর তলার মেঝে বা ছাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেখানেও ইস্পাতের কড়ির পরিবর্তে আর. সি-এর কড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে; সেগুলিকে আর. সি. বীম বলা হয়। উপর তলায় যত মেঝে ও শেষে যে সমতল ছাদ তৈরী করা হয় তাতে আর. সি. স্ল্যাব দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ধরণের বাড়ীতে লিণ্টেল সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি, আর স্ল্যাব ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু করা হয়। আজকাল আর. সি-এর কাজে স্তম্ভ, বিম ও স্ল্যাব একই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে তৈরী করা হচ্ছে। এতে বাড়ীর স্থায়িত্ব এবং ভারবহন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এই ধরণের কাজকে মনোলিথিক কাষ্টিং বলা হয়। আর. সি-এর আর একটা গুণ এই যে, এর রুক্ষ তলে প্লাষ্টার করা খুব সুবিধা; কেন না, প্লাষ্টার এ-ধরণের রুক্ষ তলে খুব ভাল ভাবে লেগে থাকে।

আর. সি. দিয়ে আজকাল বড় বড় রাস্তাও তৈরী করা হচ্ছে এবং সে সব রাস্তা আশাতীত রকমের ভাল ফলও দিচ্ছে। এ-ধরণের রাস্তা যেমন উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে তেমনই আবার অনেক দিন স্থায়ীও হয়। ব্রীজ ও ক্যালভার্টগুলি আজকাল আর. সি. দিয়ে তৈরী হচ্ছে এবং এসব ক্ষেত্রে আর. সি-এর উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, পাইপ ক্যালভার্টেও আজকাল আর. সি. হিউম পাইপ ব্যবহৃত হচ্ছে। বড় বড় ব্রীজ ও সিউয়ার পাইপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আর. সি-এর কাজ চলছে পুরাদমে। বিভিন্ন প্রোজেক্টগুলির মাধ্যমে নদী-শাসনের কাজে আর. সি. অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কোন নরম জায়গায় বাড়ী বা অন্য কিছু তৈরী করতে হলে সাধারণতঃ পাইল ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলি কাঠ, লোহা বা ইস্পাত দিয়ে নির্মিত হতো; কিন্তু আজকাল আর. সি. পাইলিং সেগুলির স্থান সম্পূর্ণ-ভাবে দখল করেছে। আর. সি এর বাড়ী ও তার

নীচে আর. সি. পাইল একসঙ্গে মনোলিথিক কাষ্টিং করলে তাতে বাড়ীর স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা অনেক বাড়ে এবং সেগুলির কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী। অতি নরম জায়গায় আর. সি-এর র‍্যাফ্‌ট ফাউণ্ডেসনও দেওয়া হচ্ছে।

আর. সি. উদ্ভাবনের ফলে স্থাপত্যের কাজে লোহার খরচ শতকরা ৮০ ভাগের বেশী কমে গেছে। আর. সি-এর দ্বারা নির্মিত সুদৃশ্য বাড়ী খুব কম খরচেই হয়ে যায়। একটা একতলা বাড়ীর প্লিন্থ আয়তনের প্রতি বর্গফুটে মাত্র পাঁচ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে। জিনিষপত্রের দাম কম হলে চার টাকায় প্রতি বর্গফুটও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আজকাল কারখানাতেই বাড়ীর প্রায় সব অংশই তৈরী হয়ে থাকে। সবগুলি অংশ ঠিক ঠিক মাপ অনুযায়ী সেখানে তৈরী করা হয় ও কয়েকটি ভাগে ভাগ করে 'সেট' করবার উপযোগী করে রাখা হয় এবং পরে ঠিক জায়গায় এনে সঠিক-ভাবে 'সেট' করে দেওয়া হয়। এতে রাতারাতি যেমন বাড়ী তৈরী করা যায়, তেমনি আবার রাতারাতি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়েও যাওয়া চলে।

আজকাল অনেক দেশে সিমেণ্ট কংক্রীটে ইস্পাতের পরিবর্তে বাঁশের শলাকা দিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাতে অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভও হয়েছে। এই প্রকারের কংক্রীটকে ব্যাম্বু কংক্রীট বলে। এর প্রচলন এখনও তেমন বেশী হয় নি, তবে ভবিষ্যতে ছোট ছোট গৃহ-নির্মাণ কার্যে ব্যাম্বু কংক্রীট যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। যে সব জায়গায় অত্যধিক টান বা চাপ প্রযুক্ত হয়, সে সব জায়গাতেই লৌহ শলাকার প্রয়োজন হবে। কিন্তু যে সব স্থানে কোনও টান বা চাপ প্রযুক্ত রাখবার প্রয়োজন নেই, যেমন ছোটখাটো একতলা বাড়ীর ছাদ, ফ্যাক্টরী ও ফ্যাক্টরীর কর্মীদের শেডের ছাদ, (আলাদা আলাদাভাবে সব অংশ ভাগ করে যাতে টান না পড়ে), মন্দিরের সামনের আঙিনার ছাদ, শ্রমিকদের উন্নততর গৃহসমূহ ও গোলাবাড়ীর ছাদ ইত্যাদি রি-ইনফোর্সড্‌ ব্যাম্বু কংক্রীটের দ্বারা অতি সহজে ও সস্তায় করা যাবে। কিন্তু এগুলি করতে হলে খুব শক্ত ও মজবুত এক-মাপের মাঝারী ধরণের ভাল জাতের বাঁশের প্রয়োজন এবং যাতে ভিতরে ঘুণ ধরে ভবিষ্যতে জোর কমে না যায়, সে জন্যে আগে থেকে বেশ কিছু দিন জলের মধ্যে রাখবার পর রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিতে হয়। অদূর ভবিষ্যতে এ-জাতীয় কাজ যে প্রসার লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

রি-ইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীট নামটা শুনতে একটু শক্ত হলেও এর কার্যকারিতা খুবই সুন্দর। সে তার নিজের আভরণ, অর্থাৎ যেটা তার শক্তির উৎস, সেটিকে নিজের দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, অপরকে দেখতে দেয় না। এর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তবুও কিছু কিছু জায়গায় আর, সি-এর অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার জন্যে কিছু সংখ্যক লোকের মনে এ-সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে যে, আর. সি-এর সম্বন্ধে যতটা বলা হয় প্রকৃতপক্ষে এটা তত কার্যকরী নয়—উদাহরণস্বরূপ গণ্ডকী নদীর উপর ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কংক্রীট পুলের ফাটলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু রি-ইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল—কারণ এর মূল সূত্র খুবই ভাল এবং আশাতীতরূপে ফলপ্রদ। তবে যারা কাজটা করে তারা যদি অনভিজ্ঞ হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থটাকেই বেশী করে দেখে তাহলে আর. সি-এর ডিজাইন যত ভালই হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ-জাতীয় মনোভাব পরিবর্তিত হবে; এটা সত্য এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আর. সি-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। আর সেদিন হবে—লোহার বদলে এরই একাধিপত্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর লোহার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় জাহাজ তৈরীর কাজেও আর. সি-এর সাহায্য নিয়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়েছিল। ফলে এখন জাহাজ তৈরীর কাজে আর. সি-এর প্রচলন খুবই বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো ঘরের দরজা-জানালাগুলিও আর. সি. দিয়ে তৈরী করা হবে।

হর্মোন

শ্রীসুব্রতকুমার পাল

আমাদের শরীরে প্রধানতঃ বহিঃক্ষরণকারী এবং অন্তঃক্ষরণকারী, এই দুই রকমের গ্রন্থি আছে। বহিঃক্ষরণকারী গ্রন্থির নিজস্ব নালী আছে। এই নালীপথে গ্রন্থির ক্ষরিত রস শরীরের নানাস্থানে পরিচালিত হয়। অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি নালী-বিহীন। এই নালীবিহীন গ্রন্থি-নিঃসৃত রস সরাসরি রক্তের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন কোষ এবং দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। যে সব রস দেহকোষকে কার্যে উদ্দীপিত করে, তাদের বলা হয় হর্মোন। আর যেগুলি শারীরযন্ত্রের কার্যকে অবদমিত করে তাদের বলা হয় ক্যালোন (Chalone)। তবে সাধারণভাবে এই দুই শ্রেণীর রসকেই হর্মোন বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা হর্মোনকে রাসায়নিক বার্তাবহ বলে অভিহিত করেন। রাসায়নিক বিচারে হর্মোনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) প্রোটিন জাতীয়—পিটুইটারী হর্মোন, ইনসুলিন, প্যারাথর্মোন।

(২) স্টেরল জাতীয় (Steroid) যৌন-হর্মোন—অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স-এর হর্মোনসমূহ।

(৩) ফেনল জাতীয় (Phenolic)—অ্যাড্রিন্যালিন, থাইরক্সিন।

হর্মোন কথাটি প্রথম প্রচলন করেন ষ্টার্লিং ও বেলিস নামে দু-জন প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ, ১৯০৫ সালে তাঁদের নবাবিষ্কৃত Secretin-এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে। অবশ্য এর আগে ক্লড বার্ণার্ড এবং আরও দু-জন বৈজ্ঞানিক এই জাতীয় বস্তুর অবস্থিতির সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। এর পরে অনেক হর্মোন, তাদের প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার ফলে হর্মোনতত্ত্বের (Endocrinology) পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে হর্মোন সম্বন্ধে সব কথা বলা একান্তই অসম্ভব বলে শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলির অন্তঃক্ষরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

শরীরের অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিসমূহের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থির স্থান সবার উপরে। এই গ্রন্থি শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; অধিকন্তু এই গ্রন্থিটি অন্যান্য অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থির নিয়ামক। আকারে ক্ষুদ্র হলেও শরীরের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় এর গুরুত্ব অসাধারণ। এই কারণে এই গ্রন্থিকে এণ্ডোক্রাইন অর্কেষ্ট্রার প্রধান যন্ত্রী বলা হয়। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের Tubercinerum নামক অংশে অবস্থিত। এর দুটি ভাগ। সম্মুখ ভাগ থেকে থেকে প্রায় ১১টি বিভিন্ন ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হর্মোন হচ্ছে—

(১) শরীর-বর্ধক হর্মোন (Growth Hormone)

(২) থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন (Thyrotrophic Hormone)

(৩) অ্যাড্রিন্যাল-উদ্দীপক (Adrenotrophic)

(৪) যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক (Gonadotrophic)

(৫) স্তন্যবিবর্ধক (Prolaction)

(৬) প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক (Parathyrotrophic)

(৭) অগ্ন্যাশয় উদ্দীপক (Pancreotrophic)

উল্লিখিত হর্মোনগুলির নাম থেকেই তাদের ক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জন্মে। শরীরবর্ধক হর্মোন শরীরের সমানুপাতিক বৃদ্ধির জন্যে অত্যাবশ্যক। এর অভাবে বা স্বল্পক্ষরণের ফলে বামনত্ব দেখা দেয়। আবার অতিক্ষরণে শরীর অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে ওঠে। অতিকায়তা (Gigantism) এবং বিষমকায়তা (Acromegaly) দেখা দেয়।

থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। পিটুইটারী গ্রন্থি কেটে ফেলে দেখা গেছে যে, থাইরয়েড গ্রন্থি ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই হর্মোনের সহায়তায় থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন উপযুক্ত পরিমাণে রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হতে পারে।

অ্যাড্রিন্যাল-উদ্দীপক হর্মোনের অভাবে অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে নানা বিকৃতি দেখা দেয়। স্ত্রী ও পুরুষের যৌনগ্রন্থি ও যৌনাঙ্গসমূহের বৃদ্ধির জন্যে যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক হর্মোন এবং স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরণের জন্যে প্রোল্যাকটিন অপরিহার্য। প্যারাথাইরয়েড-উদ্দীপক এবং অগ্ন্যাশয়-উদ্দীপক হর্মোন যথাক্রমে প্যারাথাইরয়েড ও অগ্ন্যাশয়ের উপর ক্রিয়া করে।

পিটুইটারীর পশ্চাদ্ভাগ থেকে নিঃসৃত হয় পিটুইট্রিন। পিটুইট্রিনের দুটি উপাদান—পিটোসিন এবং পিট্রেসিন। পিট্রেসিন রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়—আর পিটোসিন গর্ভাশয়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটায়। ইনসুলিনের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি হর্মোনও নির্গত হয় এখান থেকে।

থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোনকে বলা হয় থাইরক্সিন। এটি প্রোটিনজাতীয়। গ্রন্থির মধ্যে এই থাইরক্সিন থাইরোগ্লোবিউলিনের আকারে থাকে। রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হওয়ার সময় একটি আমিষ-ভ্রংশী, অর্থাৎ প্রোটিওলিটিক এনজাইমের সাহায্যে থাইরোগ্লোবিউলিন থাইরক্সিনে পরিণত হয়। থাইরক্সিনে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকে। থাইরয়েডে সাধারণতঃ ২০ মিলিগ্র্যাম থাইরক্সিন থাকে। পিটুইটারির সম্মুখ ভাগের থাইরয়েড-উদ্দীপক থাইরোট্রোফিক হর্মোন থাইরক্সিন নিঃসরণে সহায়তা করে। থাইরয়েড হর্মোন দেহকোষের দহনক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং দেহের Basal metabolic rate বাড়িয়ে দেয়। অস্থি, মাংসপেশী এবং স্নায়ুতন্ত্রের সুসমঞ্জস পুষ্টিসাধনের জন্যে থাইরয়েড হর্মোন অত্যাবশ্যক। এর অভাবে বর্ধনশীল শিশুর হাড়ের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং তথাকথিত বামনের সৃষ্টি করে। শিশুরা জড়ধীতে পরিণত হয়। তাদের যৌনাঙ্গ ও যৌন-যন্ত্রসমূহের বিকাশ ঘটে না। এই ধরণের জড়ধী বামনদের বলা হয় ক্রেটিন।

থাইরয়েড হর্মোনে আয়োডিনের অভাব ঘটলে গলগণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই রোগে থাইরয়েড গ্রন্থি অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত হয়। থাইরক্সিনের অভাবে বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরে মাইক্সেডিমা রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে চামড়া পুরু, শুষ্ক এবং থস্‌থসে হয়ে যায় এবং দেহে মেদ বৃদ্ধি ঘটে।

প্যারাথাইরয়েড হর্মোনকে প্যারাথর্মোন বলা হয়। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির এই হর্মোন রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে টিটানী নামে একপ্রকার রোগ হয়। এই রোগে ক্যালসিয়াম অত্যন্ত কমে যায়। পক্ষান্তরে অজৈব ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। শ্বাসকার্য বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কর্কশ শব্দ হয়। মুখ থেকে অনর্গল লালা নিঃসৃত হয়ে থাকে এবং ফেনা দেখা দেয়। মাংসপেশীতে খিল ধরে।

আবার এই হর্মোন বেশী ক্ষরিত হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম রক্তে আসতে থাকে; ফলে হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

টেস্টোস্টেরন নামক যৌন-হর্মোনটি টেষ্টিস নামক পুং-যৌন গ্রন্থির এণ্ডোক্রাইন অংশ থেকে নিঃসৃত হয়। পুরুষের যৌন-যন্ত্রসমূহের সম্যক বৃদ্ধি এবং পুং-লক্ষণসমূহের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে এই হর্মোন অতিশয় প্রয়োজনীয়।

স্ত্রী-দেহের জনন এবং যৌন-যন্ত্রসমূহের সুস্থ বিকাশ ও বর্ধনের জন্যে ঈষ্ট্রাডিয়োল নামক স্ত্রী-হর্মোনটি অপরিহার্য। প্রোজেস্টেরোন নামক আরও একটি স্ত্রী-হর্মোন নিঃসৃত হয়। স্ত্রীদেহে মাসিক ঋতুচক্রের সুসঙ্গতি ও সুসমতা রক্ষার জন্যে এই হর্মোনটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই হর্মোনটির অভাবে নারীদের যৌন-জীবনে নানারকম অবাঞ্ছিত অসঙ্গতি দেখা দেয়। মাসিক ঋতুচক্র-ঘটিত ব্যাধিগুলির মূল কারণ এই হর্মোনের অভাব বা অনিয়মিত ক্ষরণ।

গর্ভবতী নারীদের দেহে শিশু-জন্মের আগে একপ্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়। এর নাম রিলাক্সিন। এই হর্মোন তলপেটের গ্রন্থিগুলির বন্ধন রজ্জুকে শিথিল করে এবং এর দ্বারা সন্তান প্রসব সহজতর হয়।

ইনসুলিন নামে পরিচিত হর্মোনটি অগ্ন্যাশয়ের ল্যাঙ্গারহান্স্ আইল্যাণ্ডস্ নামক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। এই হর্মোনটির কাজ হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজ নামক শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ জন্মে।

অ্যাড্রিন্যাল মেডালার হর্মোনকে বলা হয় অ্যাড্রিন্যালিন। এই হর্মোনটিকে শারীরতত্ত্ববিদেরা Emergency mechanism বলে বর্ণনা করেন। কারণ, শরীরের আকস্মিক আপৎকালে এর প্রয়োজন হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সাংঘাতিক কোন বিপর্যয় ঘটলে অ্যাড্রিন্যালিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে চামড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও উদরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রের কৈশিক নালী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালীগুলিকে সঙ্কুচিত করে এবং মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস এবং মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলিকে প্রসারিত করে। ফলে চামড়া প্রভৃতি অল্প প্রয়োজনীয় অংশ থেকে মাংসপেশী, ফুস্‌ফুস হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। অর্থাৎ অধিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলির কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে আমাদের শরীর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে। এই জন্যে এই হর্মোনকে আপৎকালীন প্রতিরক্ষক বলা হয়ে থাকে। অ্যাড্রিন্যালিন ক্ষরণের ফলে আরও নানা পরিবর্তন দেখা দেয়; যথা—রক্তের চাপ বেড়ে যায়, করোনারীর রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাসকার্য বেড়ে যায়। যকৃৎ থেকে অধিক পরিমাণে গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে আসতে থাকে। রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা বৃদ্ধি পায়।

অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স থেকে প্রায় কুড়িটি হর্মোন নিষ্কাশিত করা সম্ভব হয়েছে। এরা স্টেরল-জাতীয় হর্মোন। এদের সাধারণ নাম কর্টিকয়েড বা কর্টিকোস্টেরয়েড। অধ্যাপক ম্যাকডুয়ালের মতে, কর্টেক্সে প্রায় ৫০টি এই জাতীয় হর্মোন আছে। অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স-এর রাসায়নিক নিষ্কাশনকে অনেকে কর্টিন বলে থাকেন। কর্টিকোস্টেরন এদের অন্যতম। এই হর্মোনটি প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে গ্লুকোজ নামক শর্করায় পরিণত হতে সহায়তা করে; অর্থাৎ এই হর্মোনটি ইনসুলিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। রক্তে গ্লুকোজের যথাযথ পরিমাণ রক্ষায় এর গুরুত্ব অসাধারণ।

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনগুলির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো তাথেকে হর্মোন সম্বন্ধে যে কয়টি সাধারণ সূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই—

'(ক) কোন গ্রন্থির নিজস্ব হর্মোন সেই বিশেষ গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, থাইরক্সিন কদাচ থাইরয়েড গ্রন্থির উপর ক্রিয়া করে না।

(খ) কোন একটি বিশেষ হর্মোন একটি বিশেষ যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। যেমন—থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থিকেই উত্তেজিত করে, প্যারাথাইরয়েডকে নয়। একে হর্মোনের বিশেষত্ব বলা হয়।

(গ) এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব আছে।

(ঘ) দেহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্যে পরিমিত হর্মোন নিঃসরণ প্রয়োজন। প্রয়োজনের খুব কম বা বেশী হর্মোন নির্গত হলে দেহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

হর্মোনের আবিষ্কার এ-যুগের মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম জীবনযাত্রার ফলে মানুষের জীবনের জটিলতা বহুগুণ বেড়ে গেছে এবং এই জন্যে শরীরের অতি-প্রয়োজনীয় হর্মোনগুলি স্বাভাবিক এবং পরিমিত রূপে নিঃসৃত হয় না। ফলে আমাদের দেহের অন্দর মহলে আজ হর্মোন বিভ্রাটের ফলে অসংখ্য বিশৃঙ্খলা এবং নানাবিধ জটিল ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ ওষুধে এই সব ব্যাধির সুচিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু যথোপযুক্ত হর্মোন ব্যবহার করে এসব ক্ষেত্রে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। আরও আশার কথা, আজকাল সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কৃত্রিম হর্মোন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে হর্মোন নিষ্কাশিত ও বিশোধিত করে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে হর্মোন নিয়ে যে বিরাট গবেষণা চলেছে, তাতে এটা আশা করা যায়, আগামী দিনে হর্মোনতত্ত্বের আরও অসামান্য উন্নতি হবে এবং নব আবিষ্কৃত নানারকম হর্মোনের সুষ্ঠু প্রয়োগে মানুষের জীবনের অনেক জটিলতা দূর হবে। ফলে মানব-জীবন সুস্থ, সুন্দর, নিরাময় এবং কল্যাণময় হয়ে উঠবে।

যে শব্দ শোনা যায় না

শ্রীমুকুল বিশ্বাস

আলট্রাভায়োলেট আলোর নাম আমরা অনেক শুনেছি। সেই আলো-কে যেমন দেখতে পাওয়া যায় না, সেরূপ যে শব্দকে শোনা যায় না তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন আল্ট্রাসনিক্স। শব্দ বাতাসের তরঙ্গমাত্র। কোন বস্তুর কম্পনের ফলে বাতাসে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই আলোড়নই শব্দরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন একটা গ্রামোফোন বাজলে বাতাসে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং সেই কম্পন বাতাসের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করে। তখন কানের পর্দার কম্পন আরম্ভ হয় এবং এই কম্পন কতকগুলি স্নায়ুকে আঘাত করায় শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু সব রকমের কম্পনজাত শব্দ মানুষের কান শুনতে পায় না। এর কারণ হলো আমাদের কানের শোনবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাতাসে প্রতি সেকেণ্ডে কতবার কম্পন হয় তাই দিয়ে বিভিন্ন শব্দকে আমরা বিচার করি। একে বলা হয়

ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা। মানুষের কান যে শব্দ শুনতে পারে, তার ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পন-সংখ্যা হচ্ছে, প্রতি সেকেণ্ডে দশ-বারো থেকে প্রায় বিশ হাজার। আবার যে শব্দের কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে বারোর নীচে, সে শব্দকে একেবারে শোনা যায় না। একে বলা হয় ইনফ্রাসনিক্স। এত অল্প কম্পনের শব্দকে শুনতে না পাওয়া মানুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা; কারণ তাহলে হৃৎপিণ্ডের কম্পন-জাত শব্দকে সর্বদাই শুনতে হতো এবং তাতে ভয়ানক অস্বস্তির কারণ ঘটতো। তৃতীয় রকমের কম্পনজাত শব্দই হচ্ছে আল্ট্রাসনিক্স। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬০০০ থেকে ২০ হাজার কম্পনজাত শব্দ শোনাও সম্ভব নয়।

কি ভাবে এই আলট্রাসনিক্স উৎপন্ন করা যায়, বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা না করে শুধু মাত্র এটুকু জানলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, কোয়ার্টস্ জাতীয় কেলাসের কম্পনের সাহায্যে এই প্রকারের উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টি করা যায়। বিজ্ঞানীরা বহু সাধনার ফলে আল্ট্রাসনিক্সকে মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করেছেন। উচ্চ কম্পনজাত বলে এই রকমের শব্দের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা সাধারণ শব্দের নেই।

একটা ঐতিহাসিক নজীর থেকে আরম্ভ করা যাক। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের নৌ-সেনাবাহিনী জার্মান সাবমেরিনের দ্বারা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন, কি উপায়ে সাবমেরিনে অস্তিত্ব টের পাওয়া যেতে পারে। ১৯১৬ সালে বৈজ্ঞানিক পল লেঞ্জেভিন বললেন, আল্ট্রাসনিক্সের সাহায্যে একমাত্র এই সমস্যার সমাধান করা যায়। তিনি সমুদ্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিকে আল্ট্রাসনিক্সের তরঙ্গ পাঠালেন। যদি সে দিকে কোন বাধা না থাকে তবে সে শব্দ সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু থাকে, যা সেই শব্দকে ফিরিয়ে দিতে পারে, তবে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরে আসবে। সুতরাং সাবমেরিনজাতীয় কোন বস্তু থাকলে তা বোঝা যাবে এবং কতক্ষণ পরে সেই প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, তা জানলে বস্তুর দূরত্ব সম্বন্ধেও তথ্য পাওয়া যাবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ শব্দকে কেন ব্যবহার করা হয় নি? তার কারণ, সাধারণ শব্দের কোন নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। সেগুলি সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উচ্চ কম্পন-সংখ্যার শব্দ আলোর মত বিশেষ দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট দিকে আমরা এই তরঙ্গ পাঠাতে পারি। অন্যদিকে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে তবে তা বিশেষ ক্ষতি করবে না।

শিল্প, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলট্রাসনিক্সের অবদান বহুমুখী। বিভিন্ন রকমের জীবাণুর উপর এর প্রতিক্রিয়া খুবই বিস্ময়কর। উদাহরণস্বরূপ, জলের মধ্যে ইনফিউ-সোরিয়া জাতীয় কীটাণু খুব সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রতি সেকেণ্ডে ১২০০ ফটোগ্রাফ নিতে পারে, এমন শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে দেখা গেছে যে, একটা জীবাণুর ধ্বংসকাল $\frac{১}{১২০০}$ সেকেণ্ড মাত্র। সুতরাং আলট্রাসনিক্সের ক্ষমতার কথা সহজেই অনুমেয়। টিউবারকিউলোসিস, ডিপথিরিয়া প্রভৃতির জীবাণু অতি সহজে বিনষ্ট হয়। সুতরাং জল বিশুদ্ধিকরণ বা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থেকে জীবাণু দূরীকরণে আলট্রাসনিক্সের উপযোগিতা অসামান্য।

কিন্তু কিসের জন্যে এই শব্দের এত ক্ষমতা? যখন আলট্রাসনিক্স-এর তরঙ্গ জলের মধ্যে পাঠানো হয় তখন জলের মধ্যে প্রবল আলোড়ন হয়। শব্দ-তরঙ্গের ধর্ম হলো, চাপ একবার প্রবল হবে এবং পরবর্তী বায়ুমণ্ডলের চাপ হাল্কা হবে, অর্থাৎ পরিবর্তী সঙ্কোচন ও প্রসারণ হবে। এই অবস্থায় জল ঠিক যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে এবং জলের মধ্যস্থিত গ্যাসের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদের উৎপত্তি হয় এদের বলা হয় Cavitation।

এই Cavitation বুদ্‌বুদগুলি খুবই ক্ষণস্থায়ী, একটু পরেই ভেঙ্গে যায়। এরা যখন ভাঙতে আরম্ভ করে তখন প্রভূত চাপের সৃষ্টি হয় এবং এই চাপের ফলেই জীবাণুগুলি এত তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়।

টক্সিন, এন্‌জাইম, সিরাম প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আল্‌ট্রাসনিক্স ব্যবহার করে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। হুপিং কাশির জীবাণু থেকে আল্‌ট্রাসনিক্সের সাহায্য নিয়ে এণ্ডোটক্সিন নামে বিষটি পাওয়া গেছে। কিছু সময়ের জন্যে এই এণ্ডোটক্সিন ঠাণ্ডায় রেখে দিলে এর বিষাক্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন অপর প্রাণীদেহে এই রোগ মুক্ত করবার জন্যে তাকে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। বেঞ্জোপাইরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যার জন্যে প্রাণীদেহে অনিষ্টকারী বহু টিউমার সৃষ্টি হয়। আলট্রাসনিক্স ব্যবহার করে বেঞ্জোপাইরিনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা যায়। জীবাণু ধ্বংস করাই আল্‌ট্রাসনিক্সের একমাত্র কাজ নয়। জীবনকে সঞ্জীবিত করবার ব্যাপারেও এর অবদান অনেক। মানবদেহে মৃদু-শক্তির আল্‌ট্রাসনিক্স ব্যবহার করে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মটর কলাই-এর দানায় আল্‌ট্রাসনিক্স প্রয়োগ করে অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে।

কতকগুলি ওষুধ আছে যারা জলে দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং এই ওষুধগুলিকে যদি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট করাতে হয় তবে সাধারণভাবে দেওয়া যায় না; যেমন, ক্যাম্ফর। ক্যাম্ফর তেল যদি সাধারণ-ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট করানো হয়, তবে রক্ত-চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে' মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ওষুধ জলের সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম-ভাবে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হয়। এই মিশ্রণকে বলা হয় ইমালসন। শক্তিশালী আল্‌ট্রা-সনিক্স ব্যবহার করে জলের সঙ্গে ক্যাম্ফর তেলের সূক্ষ্ম ইমালসন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আর একটি প্রয়োজনীয় ওষুধ হচ্ছে সালফোনামাইড ইমাল্‌সন, যা শক্তিশালী আল্‌ট্রাসনিক্সের সাহায্যে পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, আল্‌ট্রাসনিক্সের সাহায্যে প্রস্তুত ইমালসনের কার্যক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

দুধ বা দুধ থেকে প্রস্তুত পদার্থ, যেমন—আইস-ক্রিম-শিল্পেও আল্‌ট্রাসনিক্সের ব্যবহার করা হয়েছে। দুগ্ধ-শিল্পের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে, দুধের সমজাতীয়করণ। মাখন ইত্যাদি পদার্থ-গুলিকে দুধের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে দেওয়াকে বলা হয় সমজাতীয়করণ। আল্‌ট্রাসনিক্সের সাহায্যে দুধকে সুচারুরূপে সমজাতীয়করণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

তন্তুজাত বস্ত্র এবং পশমের দ্রব্যাদি ধৌত করা বস্ত্র-শিল্পের একটা বৃহৎ সমস্যা। এখানেও আল্‌ট্রা-সনিক্স ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে তন্তুজাত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কাঁচা পশম ধৌত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাঁচা পশমে গ্রীজ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জৈব পদার্থ থাকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করতে হলে সাবানের জল এবং ক্ষারের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষার ব্যবহারে কিছু অসুবিধাও আছে। পশমের উৎকর্ষ নষ্ট হয়ে যায় এবং খরচও অধিক পড়ে। এসব ক্ষেত্রে আল্‌ট্রাসনিক্সের ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁচা পশমের মধ্য দিয়ে উচ্চ কম্পনের শব্দ পাঠালে জীবাণুগুলি তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকে না বলে পশমের উৎকর্ষ কমে যায় না। অধিকন্তু জলের মধ্যে আল্‌ট্রাসনিক্স পাঠালে জল ভেঙে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নামক একটি পদার্থ তৈরী হয়, যা পশমের বর্ণ সাদা করতে পারে। পশম-শিল্পে এই ব্লিচিং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সুতরাং আল্‌ট্রা-

সনিক্স ব্যবহারের ফলে কত যে সুবিধা পাওয়া যায়, তা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনিক্স এত ব্যবহৃত হচ্ছে যে, তার সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। আল্ট্রাসনিক্সের একটি অভিনব অবদানের কথা বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করবো। কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাধি আছে, যাদের প্রকৃতি নির্ণয় করা খুবই শক্ত। আল্ট্রাসনিক্স ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, শরীরের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী শব্দ প্রেরণ করা হলো। শরীরের বিভিন্ন তন্তুগুলি সে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিধ্বনি পাঠাবে যা উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে ধরতে পারা যায়। যে সব তন্তু সুস্থ, সবল তারা এক ধরণের প্রতিধ্বনি পাঠায়, আবার যে সব তন্তু রোগাক্রান্ত বা দুর্বল তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রতিধ্বনি পাঠাবে। এভাবে প্রতিধ্বনির ধরণ থেকে সম্ভাব্য রোগের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান থেকে যে প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে তার গভীরতা সুস্থ তন্তু থেকে প্রাপ্ত প্রতিধ্বনির চেয়ে অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে ½ ইঞ্চি মাপের ক্যান্সার তন্তুর অস্তিত্ব এভাবে সুপারসনিক্সের সাহায্যে পাওয়া যায়। এত ছোট টিউমার কিন্তু সাধারণভাবে নির্ণয় করা যায় না। বুকে ক্যান্সারের পরিচয় পাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা একটা বিশেষ ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

সঞ্চয়ন

মহাশূন্যগামী রকেট নিয়ন্ত্রণের উপায়

এই সম্পর্কে ইউ. মুশকফ লিখিয়াছেন—মহাশূন্যগামী সোভিয়েট রকেট, চন্দ্রকে তাহার কেন্দ্র হইতে ব্যাসার্ধের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পথ দূরে আঘাত করিয়াছে। অপূর্ব সাফল্যের সহিত সম্পাদিত এই কাজের জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, রকেটটিকে প্রচণ্ড গতিদান করা ছাড়াও উহাকে নির্ভুলভাবে গন্তব্য পথে প্রেরণ করিতে হইয়াছে।

আমাদের এই পৃথিবী নিজের অক্ষরেখায় আবর্তিত হইতে হইতে সূর্যের চারদিকে ঘুরিয়া আসে সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গতিবেগে। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে সেকেণ্ডে প্রায় ১ কিলোমিটার বেগে। রকেটের গন্তব্য পথ আগেই হিসাব করিয়া ঠিক করা হয় এবং রকেটের গমন প্রভাবিত করে, এমন সব বিষয় পূর্বেই বিবেচনা করিতে হয়; যেমন, পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিভ্রমণ, উভয়ের মহাকর্ষের টান, উড্ডয়নের প্রথম দিকের ধাক্কার সময় বায়ুর চাপ ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে উৎক্ষেপণের সঠিক সময়, গমন-পথ, গমন-পথের যে কোন বিন্দুতে গতিবেগ, রকেটের বিভিন্ন পর্যায়গুলি কখন বিচ্ছিন্ন হইবে সেই সঠিক মুহূর্ত, শেষ অধ্যায়ের গতিবেগ ইত্যাদি পূর্বাহ্নেই স্থির করা হয়।

দ্বিতীয় সোভিয়েট রকেটটি চন্দ্রকে তাক করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতে হয়, তজ্জন্য উড্ডয়নের শেষ বা চূড়ান্ত অধ্যায়ে এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন রাখা হয়। রকেট হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেরিত সঙ্কেত-বার্তা ও ভূপৃষ্ঠের সন্ধানী স্টেশনগুলির পর্যবেক্ষণের ফলে কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পিত উড্ডয়ন-পথ হইতে সামান্যতম

বিচ্যুতি সম্পর্কেও সতর্ক থাকা সম্ভব হইয়াছে। ভুল ধরা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইভাবে প্রকৃত উড্ডয়ন-পথকে পরিকল্পিত উড্ডয়ন-পথের খুব কাছাকাছি রাখা সম্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় কি, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকিবার সময় মামুলী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মহাশূন্যে কার্যকরী হয় না। মহাশূন্যগামী যানের উড্ডয়ন তখন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে একমাত্র উহার ইঞ্জিন।

রুশ বিজ্ঞানী কে, ই, জিওলকভ্স্কি উড়ন্ত রকেট নিয়ন্ত্রণের একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলিয়াছিলেন। এই রুশ বিজ্ঞানীই মহাশূন্য অভিযানের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন। জিওলকভ্স্কির উক্ত পদ্ধতিটি এইরূপ—বায়ু-নিয়ন্ত্রণের জন্য ডানার ব্যবস্থা মহাশূন্যে কাজ করিবে না; কেন না মহাশূন্যে বাতাস নাই। অধিকন্তু, রকেট ইঞ্জিনের নলের মুখ হইতে গ্যাস নির্গত হইবে। অতএব নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিতে হইবে নিঃসৃত গ্যাসের পথে। এই ডানাগুলি তৈরী করিতে হইবে ভাল উত্তাপ-নিরোধক মাল-মশলার দ্বারা। কারণ তরল-জ্বালানী চালিত রকেট ইঞ্জিনের দহন-প্রকোষ্ঠের তাপ ৩০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠিতে পারে।

গ্যাস-ডানাই মহাশূন্যগামী রকেট নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় নয়। রকেটকে উহার ভারকেন্দ্রের দিকে ঘুরাইলে উহার গতিপথের পরিবর্তন হইবে। তখন ইঞ্জিনের ধাক্কায় রকেটও এক পাশে সরিয়া যাইবে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে রকেটকে উহার ভারকেন্দ্রের দিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে। গ্যাস-ডানাগুলির কথা বাদ দিলেও অপর কয়েকটি ব্যবস্থার সাহায্যে এই মোড় ঘুরাইবার কাজ হইতে পারে।

রকেটের অভ্যন্তরে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে যদি যন্ত্রনিয়ন্ত্রণকারী একটি ভারী চক্র ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে রকেটটি বিপরীত দিকে চলিতে থাকিবে। ঐ চক্রটির অক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাইয়া রকেটটিকে যে কোন দিকে পরিচালিত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ আধুনিক রকেট নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়, যদিও রকেটের উচ্চতা সংরক্ষণ করিবার কাজে ব্যাপকভাবেই জাইরোস্কোপের ব্যবহার হইয়া থাকে।

রকেটকে তাহার ভারকেন্দ্র বা গুরুত্বকেন্দ্রের দিকে ঘুরাইতে সামান্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় প্রধান রকেট-ইঞ্জিনের নলের মুখের চারদিকে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র-রকেট মোটর দ্বারা।

রকেটের উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণের আরও একটি উপায় হইল, উহার ইঞ্জিনের নলের মুখকে বিপরীত দিকে সরাইয়া দেওয়া। ধাক্কা তখন আর ভারকেন্দ্র বা গুরুত্বকেন্দ্রের মধ্য দিয়া যাইবে না, কিন্তু একটি 'টর্ক' বা মোচড়ের উদ্ভব হইবে যাহা রকেটটিকে অভীপ্সিত দিকে ঘুরাইতে থাকিবে। রকেট-ইঞ্জিনের প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোড় ঘুরিবার কোণও আপেক্ষিকভাবে কম হইবে। মোড় ঘোরা সাঙ্গ হইলে ইঞ্জিনের নলের মুখ উহার স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবার ধাক্কা রকেটের ভারকেন্দ্রের মধ্য দিয়া যাইবে এবং উহা পরিবর্তিত গমন-পথে সোজা চলিতে থাকিবে।

বর্তমানের চাঁদ ও অতীতের পৃথিবী

বোরিস লেভিন এই সম্পর্কে লিখেছেন—শত শত বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চাঁদের যে দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায়, সেই দিকটার বিষয়ই অনুশীলন করে এসেছেন। চাঁদের দৃশ্যমান দিকটির গায়ে শুষ্ক সমুদ্র, গহ্বর ইত্যাদি খুব বিস্তৃতভাবে চিহ্নিত করে তাঁরা এর নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক উপ-গ্রহটির অদৃশ্য পিঠের কোন খবর জানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণটা সকলেই জানেন। চাঁদ সব সময়েই তার একটি গোলার্ধ পৃথিবীর মুখোমুখী রেখে ঘোরে—অর্থাৎ পৃথিবীকে এক পাক ঘুরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে, তার নিজের অক্ষের চারদিকে এক পাক ঘুরতেও ঠিক সেই সময়ই লাগে। ফলে সর্বদাই চাঁদের একটি মাত্র গোলার্ধ পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু সোভিয়েট তৃতীয় লুনিক চাঁদের অদৃশ্য পিঠের ফটোগ্রাফ তুলে আনবার পর চাঁদের পূর্ণ গোলকটির খবর মানুষ জানতে পারলো মাত্র এই সেদিন। চাঁদের অপর পিঠের মানচিত্রও এখন জানা হয়ে গেল। তাই চাঁদ সম্পর্কে আরও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন, আরও খুঁটিয়ে সে সম্পর্কে অনুশীলন করতে পারেন।

আমাদের এই সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহগুলির বিবর্তন ঘটেছে অনেকাংশে একই রকম ভাবে। চাঁদ আর পৃথিবী গঠিত হয়েছে প্রায় একই সময়ে এবং একই উপাদানে—৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে। এই কোটি কোটি বছরে পৃথিবীর জলবায়ু এবং আকৃতি অনেকখানি বদলে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প কালের মধ্যেই চাঁদ জলবায়ু বিবর্জিত হয়ে পড়বার ফলে তার মূল গঠনের রূপটি মোটের উপর ভাল ভাবেই রক্ষিত হয়েছে। চাঁদের দেহ সম্বন্ধে অনুশীলনের ফলে আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারি—আজ থেকে ২০০-৩০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর দেহটি দেখতে কেমন ছিল।

পৃথিবী চাঁদের মতই শীতল ও নিরেট উপকরণ থেকে গঠিত হয়েছে। এসব উপকরণের মধ্যে আছে বিবিধ তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। এই তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের বিকিরণের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে চাঁদ আর পৃথিবী যখন গঠিত হতে থাকে, তখন এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ ছিল ঢের বেশী; যার ফলে এখনকার চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশী তাপ সৃষ্টি হতো। পৃথিবী আর চাঁদ গঠিত হবার ১০০ থেকে ২০০ কোটি বছর পরে উভয়ের অভ্যন্তর ভাগই এত বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, তার ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ উপাদান গলিত অবস্থায় পরিণত হতে থাকে। পৃথিবীর আয়তন অনেক বড় বলে ভিতরের এই তাপ ভূপৃষ্ঠের উপরিতলে সঞ্চারিত হতে বেশী সময় লাগে এবং বোধ হয় সে জন্যেই পৃথিবী এখনও পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে চলেছে।

চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ। আর চাঁদের ভর হলো পৃথিবীর ভরের আশী ভাগের এক ভাগ মাত্র। চাঁদের ক্ষুদ্র আয়তনের ফলে এর ভিতরে সৃষ্ট তাপ উপরিতলে সঞ্চারিত হয়েছে ঢের বেশী দ্রুত গতিতে এবং মহাশূন্যে সেই তাপের বিকিরণও হয়ে গেছে খুব অল্পকালের মধ্যে; অর্থাৎ চাঁদের দেহ অনেক আগেই শীতল হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ১০ থেকে ৩০ মাইল গভীরে তাপাঙ্ক হলো ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু চাঁদের ভিতরে এই তাপাঙ্কে পৌছাতে হলে ১২৫ থেকে ২৫০ মাইল পর্যন্ত যেতে হবে।

তৃতীয় লুনিক চাঁদের অপর পৃষ্ঠের যে ফটোগ্রাফ তুলে পাঠিয়েছে, তাথেকে দেখা যাচ্ছে—সে দিকটায় শুষ্ক সমুদ্র আর গহ্বরের সংখ্যা দৃশ্যমান অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। এই তফাৎটুকুর কারণটা কি শুধুই একটা আকস্মিক ব্যাপার? চাঁদের দেহের উপরিতলে দৃশ্য-অদৃশ্য দুই গোলার্ধের মধ্যে এই বৈষম্যটুকুর জন্যে তার দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোন ভূমিকা আছে কি না, সেটা জানা খুবই দরকার।

পৃথিবীর বেলায় দুই গোলার্ধের উপরে মহাদেশের অবস্থানের মধ্যে অসামঞ্জস্যটুকু সহজেই চোখে পড়ে। উত্তর-গোলার্ধে, যেখানে রয়েছে উত্তর-আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা-সেখানে স্থলভাগ বেশী, জলভাগ কম। দক্ষিণ-গোলার্ধে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা আর দক্ষিণ-মেরুদেশ নিয়ে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ ঢের বেশী। এ-সম্পর্কে অনুশীলনের ফলে মনে হয়েছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন কিছু বিষম ঘটনা বা প্রতিক্রিয়ার ফলে এই রকম হয়েছে। এই ধরণের বৈষম্য খুব সম্ভব চাঁদের ভিতরেও রয়েছে, যার ফলে চাঁদের গঠন এই রকম অসমান হয়েছে।

এ-সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো হচ্ছে। চন্দ্র-পরিক্রমাকারী আরও কয়েকটি রকেট এ-সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এইভাবে চাঁদের অতীত অবস্থার বিষয় অনুশীলনের ফলে পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানবার সুবিধা হবে।

ভিলাই ইস্পাত কারখানা

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

পুরাতন গোলার্ধ মানব-সভ্যতার লালন-ক্ষেত্র। সেই গোলার্ধের দুটি মহাদেশ জুড়ে অঞ্চল বিস্তার করে রয়েছে যে বিশাল দেশ, সেখানেই প্রথম সূর্যোদয়ের মত জগতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটে। আমাদের উত্তর দিকের প্রতিবেশী এই দেশটির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আজকের নয়। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র কিৰ্ঘিজিয়ার এক কোণে ফর্গনা নামে যে উপত্যকা আছে, সেখানে পাহাড়ের গায়ে সম্প্রতি কিছু শিলাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—জন্তু-জানোয়ারের ছবি। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, সেগুলি যারা খোদাই করেছিল তারা ভারতীয়। চিত্রগুলির জন্মকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ।

তারপর ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত নানা যুগের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে পথ করে এগিয়ে চলেছে এই দুই দেশের সম্পর্ক। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিদেশী শাসন ব্যবস্থায় সেই দেশের সঙ্গে আমাদের সব কিছু যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের পর সেই যোগাযোগ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ বছর আগে সোভিয়েট যেমন দুঃশাসনের পুঞ্জীভূত আবর্জনার বোঝা নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করেছিল, ১৯৪৭ সাল থেকে আমরাও সেভাবে নতুন জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে আমাদের সাহায্যের জন্যে সোভিয়েট আজ এগিয়ে এসেছে। এরই বাস্তব রূপায়ণ ভিলাই ইস্পাত কারখানা। ভিলাই কারখানার প্রথম বাত্যাতাড়িত চুল্লীটির উদ্বোধনের সময় সোভিয়েট নেতা মিঃ আব্রিয়েক সেখানে এক বক্তৃতায় ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে বলেন—দীর্ঘকাল উপনিবেশ-

বাদীদের শাসনের ফলে আপনাদের দেশে শিল্পের প্রসার হয়-নি। এখন আপনাদের অল্প সময়ে দীর্ঘ রাস্তা পার হতে হবে। কিন্তু আমরা জানি, সেই অসাধ্য আপনারা সাধন করতে পারবেন।

দুশো বছরে ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলাম, দুনিয়ার শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশী (অন্ততঃ ৩০০ কোটি টন) সেরা আকরিক লোহা এবং ৬৬০,০০০,০০০,০০ কোটি টন কয়লা সম্পদ নিয়ে। ২২৫ কোটি টন আকরিক লোহা নিয়ে বৃটেন যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেড়-কোটি টনের বেশী লোহা উৎপাদন করতো, সে ক্ষেত্রে ভারত করতো মাত্র ১৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের চেয়েও কম। সেই ১৫ লক্ষের মধ্যে ৮ লক্ষ টন ইস্পাত। বৃটিশ শাসনের ২০ বছরে (১৯১৭-৩৭) ভারতের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৌলতে ঐ কুড়ি বছরে অনুন্নত কৃষিপ্রধান রাশিয়া শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে পৌনে দুই কোটি টন ইস্পাত এবং পৌনে তেরো কোটি টন কয়লা উৎপাদন করে। এই ২টি দেশের সমস্যার রূপ ছিল একই ধরণের, যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে—"বহু বিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ বহু বিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।" কিন্তু ঐ ২০ বছরে দুটি দেশের ছবি দু'রকম হলো কেন? হলো এই জন্যে যে, একটি সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং অপরটি সমাজতান্ত্রিক নীতির পরিপোষক।

ভিলাই ইস্পাত কারখানার ওপেন হার্থ ফার্ণেসের দৃশ্য।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ যখন শিল্প-প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে হাত পেতে কোন ফল পেল না তখন সোভিয়েট

দেশ প্রস্তাব করে যে, সে ভারতের শিল্প-প্রসারে সাহায্য করতে রাজী আছে। সেই প্রস্তাবের প্রথম বাস্তব রূপায়ণ হলো ভিলাই কারখানা। পশ্চিমী মহল তখন ধুয়া তুলেছিলেন যে, সোভিয়েটের কলকজা আধুনিক নয় এবং যন্ত্রকৌশলে সে পেছিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের শিল্প-প্রসারে সাহায্য করবার যোগ্যতা তার নেই। এই প্রচারের জবাব পাওয়া যাবে একবার ভিলাই ঘুরে এলেই। আমি সেপ্টেম্বরে (১৯৫৯) ভিলাই দেখে এসেছি। যা দেখেছি তা চোখে না দেখলে ধারণা করা খানার চুল্লীটি সমান মাপের হওয়া সত্ত্বেও সেই মাসে, অর্থাৎ মার্চ মাসে তার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২৬০০ টন। আর দুর্গাপুর কারখানা তো আজও কোক ছাড়া আর কিছু উৎপাদন করতে পারে নি। এর কারণ হচ্ছে—ভিলাই কারখানায় সোভিয়েটের সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে কাজ হয়, কিন্তু রাউরকেল্লায় হয় জামশেদপুরের মত সেকেলে পদ্ধতিতে। বাত্যাতাড়িত চুল্লীর মাথার দিকে হাওয়ার, অর্থাৎ অক্সিজেনের অত্যধিক চাপ দিয়ে (হাই টপ প্রেসার) লোহা উৎপাদন
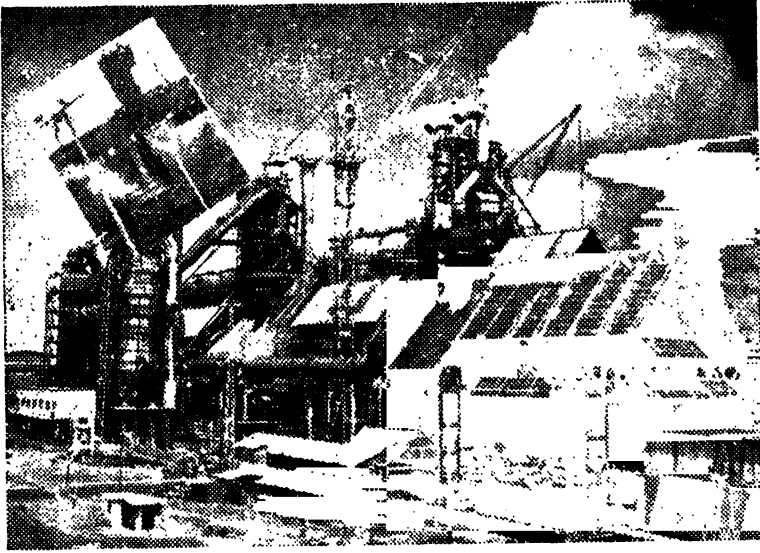
ভিলাই ইস্পাত কারখানার ব্লাষ্ট ফার্ণেসের দৃশ্য।

যায় না। এক বর্গমাইল জুড়ে এই নির্মীয়মান কারখানা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কারখানার প্রথম বাত্যাতাড়িত চুল্লী গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে লোহার চৌপল উৎপাদন করছে। আপাততঃ এই রকম তিনটি চুল্লী নির্মাণ করবার কথা ১৯৬০ সালের মধ্যে, যেগুলি মিলিয়ে বছরে ১২ লক্ষ টনের মত ইস্পাত উৎপাদিত হবে, যদিও পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ১০ লক্ষ টন। প্রথম চুল্লীটিতে কাজ সুরু হবার পর প্রথম মাসে সেটি ২৪ হাজার টন চৌপল উৎপাদন করে। কিন্তু রাউরকেল্লা কারকরবার কৌশল পৃথিবীতে এক সোভিয়েট ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এতে শতকরা ১০ ভাগ কোক কয়লার খরচ কম হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর পরে সিণ্টারিং প্ল্যাণ্ট বসানো হলে কয়লার মিতব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং এখন যে প্রচুর চুনাপাথর দরকার হয় ঝাপ্টা দেবার গ্যাস তৈরি করবার জন্যে, তার আর প্রয়োজন হবে না। তখন চুল্লী ও কোক ব্যাটারীর গ্যাসকেই ঝাপ্টা দেবার কাজে লাগানো যাবে। এখনকার হিসাব মত ভিলাই কারখানায়

বছরে ২৫ লক্ষ টন আকরিক লোহা, ২০ লক্ষ টন কয়লা এবং প্রায় ৮ লক্ষ টন চুনাপাথর দরকার। হাই টপ প্রেসার ও সিণ্টারিং প্ল্যাণ্টের দরুণ এই সব কাঁচামালের খরচ অনেক কমে যাবে অথচ উৎপাদন বাড়বে। আকরিক লোহার গুণগত উন্নতি করবার জন্যে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা ভিলাই থেকে ৫৬ মাইল দূরে রাজহারা খনিটিকে যন্ত্রচালিত করবার ব্যবস্থা করছেন। সেখানে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন লোহা আছে। কয়লা ও কাঁচা ধাতু বোঝাই করা থেকে চৌপল লোহা উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। একজন মাত্র রাশিয়ায় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কণ্ট্রোল ঘরে বসে একটি যন্ত্রের হরেকরকম আলোক সঙ্কেতের সাহায্যে গোটা কাজটার তদারক করে। এমন কি, সে সেখানে বসে গল্পের বইও পড়তে পারে।

চৌপল লোহা উৎপাদনের সময় অত্যধিক উত্তাপে কয়লার অঙ্গারীকরণের ফলে তা-থেকে অ্যামোনিয়া, আলকাতরা, বেঞ্জল, ন্যাপথ্যালিন, ফেনল ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলির মোট ওজন বছরে ৫৯২২৫ টন, যার মধ্যে অ্যাসিডের পরিমাণ ১২ হাজার টন।

প্রতিটি বাত্যাতাড়িত চুল্লীর জন্যে একটি করে ২৫২ ফুট লম্বা, ৪৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উঁচু কোক ব্যাটারী আছে। সেটিও স্বয়ংচালিত। প্রতিটি কোক ব্যাটারী ২০।২৫ বছর গরম থাকবে এবং বছরে ১২৬৮০০০ টন কোক উৎপাদন করবে।

গত ১২ই অক্টোবর ভিলাই-এর প্রথম উন্মুক্ত চুল্লীতে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, দিনে ২৫০ টন করে। সেটিও পুরাপুরি স্বয়ংচালিত।

সম্প্রাত ভারত সরকার ভিলাই কারখানা সম্প্রসারণ করে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এর জন্যে মোট ৫টি বাত্যাতাড়িত চুল্লী নির্মাণ করা হবে, যেগুলির মধ্যে ৩টি চালু হয়ে যাবে ১৯৬০ সালে।

বাত্যাতাড়িত ও উন্মুক্ত চুল্লী ছাড়াও যেসব ব্লুমিং মিল, রোলিং মিল, বিলেটিং মিল ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, সেগুলি নিম্নোক্ত জিনিষগুলি উৎপাদন করবে—

বছরে—১১০০০০ টন রেলের লাইন।
,, —২৮৪০০০ টন অন্যান্য ভারী জিনিষ।
,, —৯০০০০ টন স্লীপার।
,, —১৫০০০০ টন বিলেট এবং অন্যান্য জিনিষ।

সোভিয়েট যন্ত্র-কৌশলের বিরুদ্ধে অনুন্নত অবস্থার দুর্নাম যে ভিত্তিহীন, তা এ-থেকেই বুঝা যায়।

আর একটি কুৎসার কথা শুনা যায়। অনেকে বলেন, সোভিয়েটের পুঁজিবাদী ভারতকে সাহায্য করবার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কি রকম? আমাদের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের কি মৎলব সিদ্ধ হবে? এ-পর্যন্ত আমাদের ৫০০ জনেরও বেশী ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্র-কর্মীকে সোভিয়েটে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পের আশা।

ভিলাই কারখানার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগে কাজ হচ্ছে। কিন্তু সেটুকু থেকে আমরা কি পেয়েছি, পাচ্ছি বা পাব? ১৯৬০ সালে মোট ১১১০০০০ টন চৌপল, লোহার ৩ লক্ষ টন বেচে আমরা ৬০ কোটি টাকা পাব (এক টনের দাম ২০০ টাকার মত)। লোহার বাজারের ইতিমধ্যেই উন্নতি দেখা যাচ্ছে। গত ১৫ই অগাষ্ট পর্যন্ত ১৩১৪২৫ টন ভিলাই-এর লোহা দেশের প্রায় ৫০০টি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় করে ভারতের রাজকোষের ২৮২৫৬৩৭৫ টাকা লাভ হয়েছে এবং বর্তমানে দৈনিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের চৌপল লোহা উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতের মত এতদিনের অনুন্নত দেশ আজ জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের কাছ

থেকে পর্যন্ত লোহার অর্ডার পেয়েছে। একথা কি কেউ কোন দিন ভাবতে পেরেছিল? আজ বিদেশী পণ্যের হাটে ভারতীয় শিল্প-পণ্য দিয়ে মূল্য দেবার শক্তি ফিরে পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—ভারতে সোভিয়েট সাহায্যের ফলে।

আমাদের কবি পরাধীন ভারতের প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের শৈশবের ব্যবস্থা বর্ণনা করে লিখছেন—

"কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার; ইউরোপীয় বড় বাজারে এদের হুণ্ডী চলে না।·· তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিনছে।"

আমাদের দেশেরও এই দশাই ছিল। সোভিয়েটের সাহায্যে আমরা আজ এই দশা কাটিয়ে ওঠবার ভরসা পাচ্ছি।

রেডার

শ্রীদীপক বসু

পৃথিবীতে যদি দুটি মহাযুদ্ধ না হতো, তবে বিজ্ঞান আজ যে অবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার এতটা অগ্রগতি সম্ভব হতো না—এ কথাটা সবাই স্বীকার করবেন। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খুব অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়। অবশ্য এ সব আবিষ্কার প্রথম দিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র বা যুদ্ধজয়ের সহায়করূপেই দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধ চিরকাল থাকে না, তখন শান্তিকামী মানুষ সচেষ্ট হয়ে ওঠে, যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত মারণাস্ত্র বা যান্ত্রিক কৌশল কি করে জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে নিয়োগ করা যায়। পারমাণবিক শক্তি এর চরম নিদর্শন। রেডার এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রেডারের আবির্ভাব হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান যুদ্ধগুলিতে রেডার যে ভাবে সাহায্য করেছিল, তাতে সারা পৃথিবী এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে রেডার আবিষ্কারের জন্যে কোন বিশেষ একজন বিজ্ঞানীর নাম করা যায় না। ১৮৮৬ সালে হার্টজ্ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, অদৃশ্য বেতার-তরঙ্গের গুণাবলীর সঙ্গে দৃশ্য আলোক-তরঙ্গের ধর্মের সাদৃশ্য আছে। আলোকের মত বেতার-তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়। ১৯২৫ সালে ব্রাইট ও তুভে আয়নমণ্ডলের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্যে বেতারের সাহায্যে যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাতে বেতার-তরঙ্গ ঝলকে ঝলকে উপরের দিকে প্রেরিত হতো এবং সেগুলি আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়তো। এই পরীক্ষা থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে ধারণা জন্মে যে, বেতার-তরঙ্গের এই ধর্মকে রাত্রির অন্ধকার বা কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে কোন অদৃশ্য দূরাগত বস্তুকে দেখবার কাজে লাগানো যেতে পারে। এভাবে রেডারের উৎপত্তি।

রেডার কথাটি আসলে কয়েকটি ইংরেজী শব্দের আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত। মূল কথাটি হলো Radio Detection and Ranging; অর্থাৎ বেতারের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয়। যন্ত্রের মূল কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী অবশ্য রেডারের আর একটি নামও দেওয়া যেতে

পারে—ইকোমিটার, অর্থাৎ প্রতিধ্বনি পরিমাপক যন্ত্র।

প্রতিধ্বনি কথাটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। যে কোন প্রকার শব্দ করলে বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ শব্দের গতিতে বাতাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। গতিপথে কোন বাধার সম্মুখীন হলে সেখান থেকে ধাক্কা লেগে ফিরে আসে এবং প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গ আবার একই গতিতে এসে শ্রোতার কানে পৌঁছায়। এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সাহায্যে কোন বস্তুর দূরত্ব সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। মনে করা যাক, আমরা একটা ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি এবং কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট পাহাড় বা বড় বাড়ী রয়েছে। এখন মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা যদি কোন শব্দ করি, তবে একটু পরই তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাব। পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনবার অন্তর্বর্তী সময় নির্ভর করবে—আমরা যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নির্দিষ্ট পাহাড় বা বাড়ীর দূরত্বের উপর। কারণ ঐ সময়ের মধ্যেই শব্দ-তরঙ্গ পাহাড় পর্যন্ত যাবে এবং আবার ফিরে আসবে। শব্দ-তরঙ্গের গতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট। কাজেই উপরিউক্ত দূরত্ব যদি ৫৫০ ফুট হয় তবে এক সেকেণ্ড পরে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাব। অতএব প্রতিধ্বনি দুই সেকেণ্ড পরে শুনলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে, ঐ দূরত্ব ১১০০ ফুট। এইভাবে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সাহায্যে আমরা দূরত্ব মাপতে পারি।

রেডার যন্ত্রের কর্মপদ্ধতিও এরূপ; তবে সেখানে শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। একই ধারণার উপর ভিত্তি করে উপর থেকে সমুদ্রের অতল গভীরে ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় শ্রুতিপারের শব্দ বা সুপারসনিক্স্ তরঙ্গ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাদুরেরা রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করবার সময় তাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে নাকি রেডার যন্ত্রের মতই ব্যবহার করে। তারা মুখ দিয়ে একপ্রকার শ্রুতি-পারের শব্দ উৎপন্ন করে। এই শব্দ গাছ-পালা ইত্যাদি থেকে প্রতিফলিত হয়ে ওদের কানে এসে পৌঁছায়। তাথেকেই ওরা দিক-নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

রেডার যন্ত্রের সাহায্যে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (বেতার-তরঙ্গ) সন্ধানী আলো বা সার্চলাইটের মত আকাশে প্রেরণ করা হয়। সার্চলাইটের আলো যেমন কোন কিছুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে এবং অপেক্ষমান দর্শকের চোখে পড়ে, রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গও তেমনি কোন বাধার সম্মুখীন. হলে প্রতি-ফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ এবং তাকে গ্রহণ করাই রেডারের কাজ। এ-থেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিফলক বস্তুর (যেমন—বিমান, জাহাজ ইত্যাদির দূরত্ব, গতিবেগ, কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে—ইত্যাদি সব কিছু নির্ণয় করা যায়।

সাধারণতঃ রেডার যন্ত্রে একই পথে বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ও প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়। এই জন্যে প্রেরক-যন্ত্র থেকে তরঙ্গ ক্রমাগত না পাঠিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠানো হয়, অর্থাৎ কিছুক্ষণ পাঠাবার পর অল্প সময়ের বিরতি দেওয়া হয়। এই বিরতির মধ্যে প্রতিফলিত তরঙ্গ যন্ত্রে ধরা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার নাম Pulse Technique.

একটা প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক—রেডারে সহজলভ্য শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় কেন? বেতার-তরঙ্গের সুবিধা অনেক। এর গতিবেগ অনেক বেশী (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল)। বেতার-তরঙ্গের দ্বারা পরিচালিত রেডার অনেক দূর থেকে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে। বেতার-তরঙ্গ যে কোন প্রকার আব-

হাওয়াতে কাজ করতে সক্ষম—কুয়াশা, ধোঁয়া, মেঘ, ঝড়-বৃষ্টি, বরফ, এমন কি, চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো ইত্যাদি সব কিছু বাধাই সে অতিক্রম করতে পারে; তাছাড়া বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে অনেক বেশী সঠিকভাবে ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়।

এখন দেখা যাক, রেডারের ভিতর কি কি যন্ত্রপাতি থাকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বেতার-তরঙ্গের অস্বাভাবিক গতির জন্যে রেডারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যেই সব কাজ হয়। যন্ত্রের যাবতীয় অংশই যাবতীয় রেডার যন্ত্রের প্রাণবস্ত হলো এর প্রেরক-যন্ত্র বা ট্র্যান্সমিটার। এই যন্ত্র থেকেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা আকাশে প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই তরঙ্গরাজি অধিকতর স্পন্দন-সংখ্যা বিশিষ্ট এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ম্যাগনেট্রন অসিলেটর নামক যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ গুণসম্পন্ন তরঙ্গমালা আজকাল সহজেই উৎপন্ন করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ ম্যাগ্নেট্রনের আবিষ্কার রেডারের ইতিহাসে নতুন যুগ এনে দিয়েছে। ম্যাগ্নেট্রনে উৎপন্ন সুনিয়ন্ত্রিত বেতার-তরঙ্গ নিয়ে যাওয়া হয়
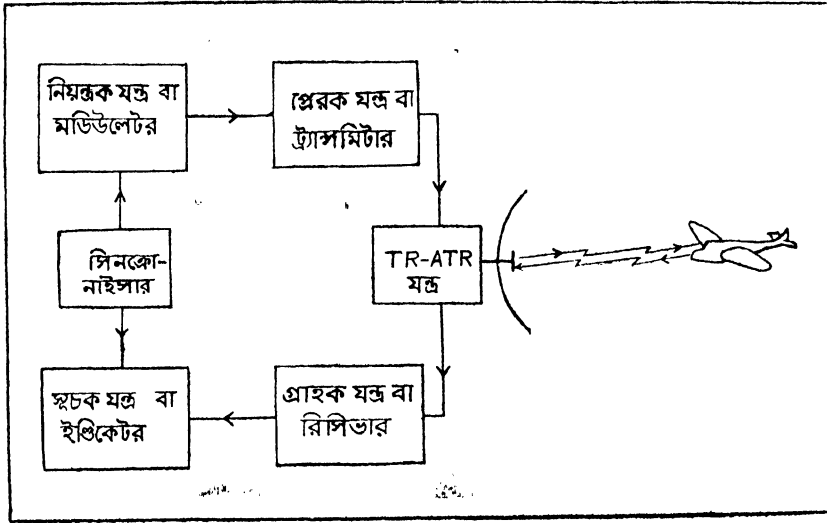
রেডার-যন্ত্রের ক্রিয়া-কৌশল।

বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে; কাজেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। সেনাবিভাগে ব্যবহৃত রেডারে সাধারণতঃ বিদ্যুৎ-উৎপাদক গতিশীল যন্ত্র বা Mobile Generator থাকে। অন্যান্য স্থানে লাইন থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি নেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, রেডার যন্ত্রে তরঙ্গমালা ক্রমাগতঃ না পাঠিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠানো হয়। প্রেরক-যন্ত্রকে ঠিক সময় মত চালু করা বা বন্ধ করবার জন্যে আছে একটি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা মডিউলেটর। এই যন্ত্র এক সেকেণ্ডের কোটি ভাগের একভাগ সময় নিরূপণে সক্ষম।

প্রতিফলক সমন্বিত এরিয়েল বা আকাশ-তারে। কিন্তু কি ভাবে? জল যেমন নলের ভিতর দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়, বেতার-তরঙ্গকেও সেরূপ বিশেষভাবে নির্মিত ওয়েভ-গাইড নামক একপ্রকার নলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আকাশ-তার থেকে নির্গত হয়ে তরঙ্গ-মালা ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। প্রয়োজন অনুসারে রেডারের আকাশ-তার বিভিন্ন আকারের হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকাশ-তারকে চারদিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে।

অভীষ্ট বস্তুর গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিহত বেতার-

তরঙ্গ পুনরায় এসে আছড়ে পড়ে আকাশ-তারের উপর। আকাশ-তার এই তরঙ্গমালাকে আবার নলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায়? ম্যাগ্‌নেট্রন যেদিকে আছে সেদিকে নিশ্চয়ই নয়! এখানে একটি ইলেকট্রনিক সুইচের সাহায্য নেওয়া হয়—TR ও ATR সুইচ। এদের সাহায্যে তরঙ্গমালাকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। সাধারণতঃ রেডারের একই আকাশ-তারের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। প্রেরিত ও প্রতিফলিত—উভয় প্রকার তরঙ্গ যাতে প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট পথে আসে তার জন্যে এই ইলেকট্রনিক সুইচের ব্যবস্থা। আকাশ-তার থেকে নলের ভিতর দিয়ে তরঙ্গমালা এসে পড়ে অন্য একটি যন্ত্রের ভিতর। এর নাম ক্যাথোড-রে-অসিলোগ্রাফ। এটি একটি অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র। স্পন্দন প্রেরণ ও স্পন্দন গ্রহণ—এই দুই সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান, সেটা মাপাই এই যন্ত্রের কাজ। যন্ত্রটিতে একটি ছক-কাটা পর্দা আছে। সিন্‌ক্রোনাইজার নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত ও প্রতিফলিত তরঙ্গের ছায়া এই পর্দার উপর পাশাপাশি ভেসে ওঠে এবং এথেকেই ঈপ্সিত বস্তুর অবস্থান ও অন্যান্য তথ্যাদি নির্ণয় করা যায়।

রেডারে সাধারণতঃ ১০০ থেকে ৫০০ কিলোওয়াটের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। প্রেরক যন্ত্রটি এক সঙ্গে ০.০০১ সেকেণ্ড কাল চালু থাকে। রেডার যন্ত্রে যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তার স্পন্দন-সংখ্যা ১০০ থেকে ২৫,০০০ মেগাসাইকল্‌স্ পর্যন্ত হতে পারে। এখন দেখা যাক, রেডারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই রেডার যন্ত্রের উদ্ভব ও উন্নতি। রেডার আবিষ্কারের ফলে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান একটিই থাকুক, আর এক ঝাঁকই থাকুক—অনেক দূর থেকেই তাকে রেডারের কাছে ধরা দিতেই হবে। শত্রুপক্ষের বিমান রেডারের দৃষ্টিপথে আসবার সঙ্গেই সঙ্গে তার অবস্থান, গতি ইত্যাদি সব খবরই সৈন্যদের জ্ঞাত হয়ে যায়। ইলেকট্রনিক্‌সের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি স্বয়ংক্রিয়-ভাবে রেডারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। অর্থাৎ রেডারে বিমানের অস্তিত্ব ধরা পড়বার পর বিমান উপযুক্ত স্থানে আসবামাত্র কামান নিজে নিজেই গর্জে ওঠে এবং নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করে—এর জন্যে আলাদা কোন কামান-চালকের দরকার হয় না।

আজকাল বিমানগুলিতেও রেডার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এখানে অবশ্য স্বভাবতঃই যন্ত্রটিকে খুব হাল্‌কা করতে হয়েছে। বিমানগুলি রেডার যন্ত্রে সজ্জিত হওয়ার ফলে মাটিতে রেডার-চালকের কাজ কিছুটা লাঘব হয়েছে। নীচের চালক রেডারের সাহায্যে শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষের বিমানকেই দেখতে পাচ্ছে। শত্রুপক্ষের বিমান কোথায় আছে, কোন্ দিক দিয়ে তাকে আক্রমণ করা সুবিধাজনক—এসব খবর মিত্রপক্ষের বিমান-চালককে বেতারযোগে সরবরাহ করে রেডার-চালক। যখন সে বোঝে যে, তাদের বিমান শত্রুপক্ষের বিমানের বেশ নিকটে এসেছে তখন সে মিত্রপক্ষের বিমান-চালককে নির্দেশ দেয় তার নিজের বিমানের সংলগ্ন রেডার ব্যবহার করতে। শত্রুপক্ষের বিমান ধরা পড়ে মিত্রপক্ষের বিমান-বাহিত রেডারের পর্দায়—সুরু হয় গোলা-গুলি বর্ষণ। তাছাড়া বিমান-বাহিত রেডারের সাহায্যে টহলদার বিমানগুলি সহজেই শত্রুপক্ষের জাহাজ, ডুবো-জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস করতে পারে।

বোমা ফেলবার সুবিধার জন্যে রেডারের এত উন্নতি হয়েছে যে, যে সহরের উপর বোমা ফেলা হবে, প্রায় মানচিত্রের মত তার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে রেডারের পর্দার উপর। সহরের কোথায় নদী, কোথায় কারখানা, কোথায় সেতু বা বড় রাস্তা ইত্যাদি আছে, তা বুঝতে চালকের কোনই

অসুবিধা হয় না। নির্দিষ্ট সহর মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াসাচ্ছন্ন—যাই হোক না কেন, বোমারু বিমানের কোনই অসুবিধা ঘটে না। বিমান ধ্বংসের জন্যে ব্যবহৃত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কাজেও রেডারকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

শুধু বিমান যুদ্ধই নয়, জলযুদ্ধেও রেডারের অবদান কম নয়। বর্তমানে সকল যুদ্ধ-জাহাজই রেডার-যন্ত্রে সজ্জিত থাকে। রেডার ও কামানের সাহায্যে শত্রুপক্ষের বিমান ও জাহাজ ধ্বংস করাই এদের প্রধান কাজ। এমন কি, শত্রুপক্ষের জাহাজ দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগেই রেডারের সাহায্যে তাকে ধ্বংস করা যায়।

একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রেডারের সাহায্যে সব সময় যে শত্রুপক্ষের বিমানই ধরা পড়বে, তার নিশ্চয়তা কি? নিজেদের বিমানও তো হতে পারে! এ-ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সাধারণতঃ কোন সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা সব সময়ে কার্যকরী হয় না।

যদিও সামরিক প্রয়োজনেই রেডারের সৃষ্টি, তথাপি শান্তিকামী মানুষ শীঘ্রই দেখলো যে, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কল্যাণকর কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা যেতে পারে। শীতের দিনে অধিকাংশ সময়েই (বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে) বিমান-ঘাঁটি কুয়াসাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এর ফলে নিরাপদে বিমান অবতরণ খুবই অসুবিধাজনক। আজকাল এই অবস্থায় নিরাপদে নেমে আসবার জন্যে বিমান-চালকের প্রধান সহায় হলো রেডার। সাধারণতঃ দুটি রেডার দিয়ে কাজ করা হয়। প্রথমটি বিমানটিকে ৩০।৪০ মাইল দূরে থাকতেই নিজের পর্দার উপর ধরে ফেলে। ফলে বিমান ঘাঁটি থেকে এর দূরত্ব, মাটি থেকে উচ্চতা ইত্যাদি রেডার-চালক জানতে পারে। সে তখন বেতারের সাহায্যে বিমান-চালককে নির্দেশ দেয়, কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে অগ্রসর হলে বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করানো যাবে। এভাবে বিমানটি ঘাঁটি থেকে প্রায় ১০ মাইলের মধ্যে এসে গেলে প্রথম রেডার বন্ধ করে দ্বিতীয়টিকে চালু করা হয়। এটি প্রথমটি থেকেও সূক্ষ্মতর যন্ত্র। রেডারের পর্দার দিকে তাকিয়েই চালক বলে দিতে পারে, বিমানের গতি-বিধি ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দেয় বেতার মারফৎ বিমান-চালকের কাছে। এভাবে রেডার ও বিমান-চালকের পরস্পরের সহায়তায় বিমান নির্বিঘ্নে নীচে নেমে আসে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রেডার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র আজ এত উন্নত হয়েছে যে, প্রয়োজন হলে বিমান-চালক যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। সে শুধু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের বিমান-বাহিত অংশটুকু চালিয়ে দেয়; তাতেই বিমান নিজে নিজে নিরাপদে নীচে নেমে আসে। এই ব্যবস্থার নাম Automatic Ground Control Approach বা AGCA.

উড়োজাহাজের বেলায় যেমন, সামুদ্রিক জাহাজের বেলায়ও তেমনি রেডারের অবদান কম নয়। কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে ও অন্ধকার রাত্রিতে রেডারই নাবিকদের একমাত্র সহায়। ডুবো-পাহাড় বা ভাসমান হিমশৈলের অস্তিত্ব, তীরভূমির দূরত্ব ইত্যাদি জানবার জন্যেও রেডার নাবিকদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

মানুষের উপকারে রেডারের আর একটি কাজ হলো আবহাওয়া বিভাগে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বিশেষ বিশেষ কম্পন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ বৃষ্টিকণা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফলে, আবহাওয়াবিদ্‌গণ জলকণাবাহী মেঘের উচ্চতা ইত্যাদি অনেক তথ্য জানতে পারেন। এ-থেকেই তাঁদের পক্ষে জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়।

মহাশূন্যে ভ্রমণ করা আজকে আর অলীক স্বপ্ন বলে মনে হয় না। মহাশূন্যে ভ্রমণকারী ব্যোমযান, স্পুট্‌নিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ

করবার কাজে রেডার বিশেষ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। ভবিষ্যতে যখন মানুষও মহাশূন্যের পথে যাত্রা করবে তখন তার প্রধান বিপদের সম্ভাবনা থাকবে উল্কা থেকে। উল্কার হাত থেকে কৃত্রিম উপগ্রহকে বাঁচানো খুবই শক্ত। মহাশূন্যে উল্কার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবে রেডার। উপগ্রহের সঙ্গে সংলগ্ন শক্তিশালী রেডার ১০০০ মাইল দূর থেকে উল্কার ঝাঁক দেখতে পাবে। সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ২৫ মাইলের বেশী বেগ উল্কার হয় না। এই বেগে ১০০০ মাইল আসতে তার ৪০ সেকেণ্ড সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ উল্কার গতিপথের বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া ধাতু, তৈল ইত্যাদি খনিজ পদার্থের সন্ধানেও রেডারের সাহায্য নেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত নানা-রকম গবেষণার কাজে রেডারের প্রয়োজনীয়তার অন্ত নেই।

বস্তুতঃ রেডার আধুনিক বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য অবদান—বিজ্ঞানের চরম উন্নতির নিদর্শন। যতই দিন যাচ্ছে, রেডার ততই উন্নত হচ্ছে এবং এর কর্মক্ষেত্রও ততই প্রসারিত হচ্ছে। একদিকে সামরিক ক্ষেত্রে শত শত বিমান ও সহস্র সহস্র লোকের ধ্বংসের কারণ, অপর দিকে নিরাপদে বিমান-অবতরণ ও জাহাজ-চলাচলে সাহায্য করে ভীষণ ঝড়-তুফানের হাত থেকে শত সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করছে।

সাবানের কথা

আনসার রহমান

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে সাবান সভ্য-সমাজের পক্ষে একটি অপরিহার্য বস্তু। এস্থলে এই সাবানের কথাই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো। সোপ কথাটা এসেছে ল্যাটিন স্যাপো কথা থেকে। এর প্রকৃত অর্থে বুঝায় ট্যালো নামক পদার্থকে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই ট্যালো আর স্নেহ-জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু আজকের দিনে সাবান বলতে বিভিন্ন চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বস্তুকে বুঝায়। এ ছাড়া রসায়ন শাস্ত্রে সাবান হচ্ছে—চর্বি, অম্ল ও ক্ষয়কারী ক্ষারজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত বস্তু। এই বস্তু জলের সংস্পর্শে ক্ষার উদগীরণ করে এবং সেই ক্ষার কাপড়ের সঙ্গে ধূলা-ময়লা বিজড়িত তৈল ও চর্বি [illegible]ত করে দেয়। এর ফলে এবং সাবানের ফেনার তল-টানের গুণে কাপড়-জামা পরিষ্কার হয়ে যায়।

সাধারণতঃ শক্ত ও নরম—দু-রকমের সাবান ব্যবহৃত হয়। শক্ত সাবান জলে খুবই কম গলে, আর কাপড়ের উপর ঘষলেও সহজে ক্ষয় হয় না। আবার নরম সাবান সহজেই জলে গলে যায় এবং খুব ফেনা হয়, কিন্তু ব্যবহারে অপচয় ঘটে।

সাবানের শক্ত বা নরম হওয়া সাধারণতঃ নির্ভর করে ক্ষারজাতীয় পদার্থের উপর। কষ্টিক সোডা থেকে তৈরী সাবান নরম হয়। প্রকৃত পক্ষে Semi-drying বা Non-drying তেল থেকে উৎপন্ন চর্বির সঙ্গে কষ্টিক সোডা সংমিশ্রণে যে সাবান তৈরী হয় তা শক্ত সাবান; আর Drying তেল থেকে উৎপন্ন চর্বির সঙ্গে কষ্টিক পটাশ সংমিশ্রণে তৈরী সাবান হলো নরম সাবান।

Semi-drying, Non-drying—Drying তেলের এসব প্রকার ভেদ সৃষ্টি হয়েছে তেলের আয়োডিন ভ্যালিউর পার্থক্য থেকে। জৈব-রসায়নের মতে—১০০ সি-সি তেল যত গ্র্যাম আয়োডিন শোষণ করে, তত গ্র্যাম আয়োডিন ঐ তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ নির্দেশ করে। যে সব তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ ৯০-এর নীচে, সেগুলি Non-drying তেল। যেমন—নারকেল তেল। Semi-drying তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ ৯০ থেকে ১০০-এর মধ্যে; যেমন—তুলার বীজের তেল। আর Drying তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ ১২০-এর উর্ধ্বে; যেমন—তিসির তেল।

এখানে একটা কথা জানবার আছে। সাবান যেমন শক্ত বা নরম হতে পারে, তেমনি এ দুটির মাঝামাঝিও হতে পারে। মহুয়ার তেল ও চীনা-বাদামের তেল থেকে উৎপন্ন সাবান শক্তও নয়, নরমও নয়। এই মাঝামাঝি সাবানের চাহিদাই বেশী।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে বহু প্রকার সাবান তৈরী হয়। ঘরোয়া কাজে, ধোবীখানায়, প্রসাধনে, সেলুনে, কলকারখানায়, জাহাজে, ডাক্তারখানায় বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সাবান ব্যবহৃত হয়। হলদে রঙের বার সোপ বা বল সোপ, বাগমারী সোপ, অলিভ-অয়েল আর কষ্টিক পটাস থেকে Castile soap, Tallow আর অল্প নারকেল তেল থেকে তৈরী সুগন্ধী Curd soap, বিভিন্ন anilin dye মিশ্রিত কাপড় রং করা Dye soap, কাপড়-ছাপা Marseilles soap, Monopole soap, গ্লিসারিন মেশানো গ্লিসারিন সোপ প্রভৃতি নাম-জানা ও নাম-নাজানা প্রসাধনী সাবান আজকাল সাবানের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তুলেছে।

এতক্ষণ আমরা সাবান প্রস্তুতে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ক্ষারজাতীয় পদার্থের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই দুটি ছাড়া আরো কয়েকটা জিনিষের প্রয়োজন। যেমন—রেজিন, কিছু পাউডার, লবণ, রং, সুবাস এবং জল তো আছেই।

রেজিন—শক্ত ও স্বচ্ছ পদার্থ। এক এক প্রকার রেজিন এক এক রঙের হয়। রেজিন সাবানের পরিষ্কারক ক্ষমতা বাড়ায়, অধিক ফেনা উৎপাদনে সাহায্য করে, তেলের দুর্গন্ধ দূর করে এবং সুগন্ধ বাড়ায়।

পাউডার জাতীয় দ্রব্য সাধারণতঃ সাবানের আয়তন বাড়ায়; কিন্তু দ্রব্যমুল্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করে না।

সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম সালফেট, চিনি, সোপ-ষ্টোন ইত্যাদি দ্রব্যগুলি ফিলিং এজেন্টরূপে ব্যবহৃত হয়।

লবণ-জলে সাবান সহজে দ্রবণীয় নয়। তেল আর ক্ষারের মিশ্রণ থেকে সাবানকে দানা-বাঁধা অবস্থায় পৃথক করতে লবণের প্রয়োজন হয়।

সাবান রঙীন কি করে হয়, এবার তাই বলছি। সাদা রঙের জন্যে জিঙ্ক অক্সাইড, টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড; হলদে রঙের জন্যে—ফ্লোরেসিন ইয়েলো, সোপ ইয়েলো, ক্যাডমিয়াম ইয়েলো, ন্যাপ্থল ইয়েলো; লাল রঙের জন্যে—কার্ডিন্যাল রেড, রোডামিন, স্যাফ্রানিন, ক্রোসিন স্কারলেট; গোলাপী রঙের জন্যে—প্যানসিয়া, স্কারলেট, ভার-মিলিয়ন; সবুজ রঙের জন্যে—ফাষ্ট-লাইট গ্রীন, আলট্রামেরিন গ্রীন, ক্রোম-গ্রীন; নীল রঙের জন্যে—মেথিলীন ব্লু, আলট্রামেরিন; বেগুনী রঙের জন্যে—ফরমিল ভায়োলেট, মিথাইল ভায়োলেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এ-ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, এমন রং ব্যবহার করতে হবে, যার উপর সাবানের মুক্ত-ক্ষারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এই কারণে প্রুসিয়ান ব্লু, ক্রোম-ইয়েলো, অ্যালকেলি ব্লু, ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় না। এখানে আরো একটা কথা আছে—যে রংই ব্যবহার করা হোক না কেন—তা যেন সহজে জলে গুলে যায়, সাবান দেহের সর্বত্র এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখে,

আলো বা উত্তাপে অপরিবর্তিত থাকে, আর রঙীন সাবানের ফেনা যেন সাদা হয়।

এ তো গেল সাবানের রঙের কথা। এবার গন্ধের কথা বলছি। জীব-জন্তুর চর্বি, প্রাকৃতিক তেল থেকে উৎপন্ন অনেক সাবানই বহুক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সেই কারণে সাবান প্রস্তুতকারীরা সাবানের সঙ্গে বহু প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে সাবানের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে। প্রসাধনী সাবানের জন্যে বেশ উঁচুদরের গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক সুগন্ধি তেলের মধ্যে অ্যানিজ অয়েল বা বার্গ্যামেট অয়েল, কেসিরা অয়েল, সিনামন অয়েল, ইউক্যালিপ্টাস অয়েল, রোজমেরী অয়েল, স্যাণ্ডাল-উড অয়েল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক সংমিশ্রণে উদ্ভূত গন্ধদ্রব্যের মধ্যে লিলাক, ভায়োলেট, জেস্‌মিন রোজ, অয়েজ, গোল্ড-ল্যাক, আমণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সাবানের গন্ধ নির্বাচনে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, ঐ গন্ধ যেন রঙের ক্ষতি না করে বা সাবানের আসল গুণ নষ্ট না করে। আরো একটা কথা—ঐ সুগন্ধি অন্য সুগন্ধ দ্রব্যের পাশাপাশি যেন একেবারে গন্ধহীন হয়ে না যায়।

সুরাটগড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি প্রতিষ্ঠানের অধীনে সোভিয়েট যন্ত্রবাহিনী জমিতে লাঙ্গল দিতেছে

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৫৯

১২শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
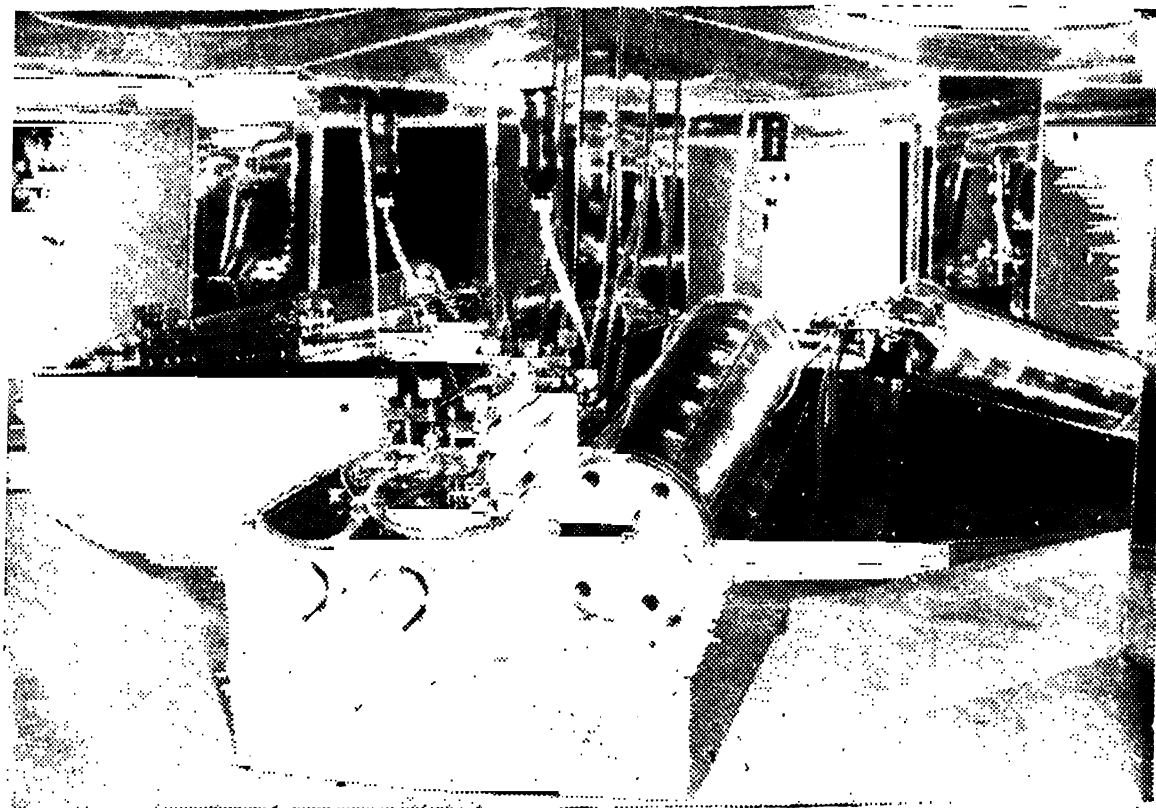
মেলরোজ হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস যন্ত্র

লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালের একদল বৃটিশ পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্র মস্কোতে একটি রোগীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় এই মেলরোজ হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস যন্ত্রটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন।

পেট্রোলিয়ামের সন্ধান

পেট্রোলিয়াম বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় যুগান্তর এনে দিয়েছে। শিল্পে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মানুষের জীবনধারা আজ হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যময়। যে দেশ কৌশলে পৃথিবীর বুক চিরে এই তরল সোনা বের করে নিতে সক্ষম হচ্ছে, সে দেশই আজ বিত্তশালী হয়ে উঠছে।

পেট্রোলিয়াম আমাদের জীবনধারা যতই সহজ করে দিক না কেন, এর আবিষ্কার কিন্তু সহজ কাজ নয়। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু এক ফোঁটাও পেট্রেলিয়াম পাওয়া যায় নি। এরূপ ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেউ পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের মোহমুক্ত হতে পারে নি। 'মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন'—এই আশাতেই মানুষ দমে যায় নি এবং পেট্রোলিয়ামও পেয়েছে। হয়তো দশটা কূপে* কিছু পাওয়া যায় নি, কিন্তু একাদশ কূপে যা পাওয়া গেছে, সেটা আরও কুড়িটা নিষ্ফল প্রচেষ্টার ব্যয় যোগাতে পারবে।

তবে যেখানে-সেখানে কূপ খনন করলে তো আর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে না! যে সব অনুসন্ধান পদ্ধতির দ্বারা পেট্রোলিয়াম স্তরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করা যেতে পারে, তারই একটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো। ভূমিকম্প সম্পর্কিত পদ্ধতি এদের মধ্যে অন্যতম। তবে এই অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করবার পূর্বে অন্য দু-একটি পদ্ধতির সাহায্যেও অনুসন্ধান চালানো হয়। তা-থেকে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেলে আলোচ্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

সাধারণতঃ ভূমিকম্প সম্পর্কিত পদ্ধতিতে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অনুসন্ধানযোগ্য এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প সৃষ্টি করা হয়। এই কম্পনে কতকগুলি তরঙ্গ-প্রবাহ প্রকাশ পায়। বিশেষ বিশেষ পদার্থের এক-একটি বিশেষ তরঙ্গের নির্দিষ্ট একটা গতিবেগ আছে। বেলেপাথরের মধ্য দিয়ে একটি তরঙ্গ যে গতিতে যাবে, সেটা একটা চুনাপাথরের স্তরের মধ্যের গতিবেগ থেকে ভিন্ন রকমের হবে। আবার একটি তরঙ্গের গতিবেগ সচ্ছিদ্র বেলেপাথর এবং অত্যল্প ছিদ্রযুক্ত বেলেপাথরের বেলায় একরকম হবে না। বিভিন্ন শিলাস্তরে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের গতিবেগ গবেষণা করে বের করা হয়েছে। বিস্ফোরণে সৃষ্ট তরঙ্গ এক শিলাস্তর থেকে অন্য শিলাস্তরে প্রবেশকালে

---

* পেট্রোলিয়াম ভূপৃষ্ঠে তোলবার জন্যে কূপ খননের প্রয়োজন। এগুলি ড্রিলিং মেসিনের সাহায্যে করা হয়। তারপর এই কূপের মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম বের করে আনা হয় অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্য।

আলোক-রশ্মির মত প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়। এই প্রতিসরিত তরঙ্গ তৃতীয় কোন শিলাস্তরে প্রবেশের সময় পুনরায় প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়। আলোচ্য পদ্ধতিতে প্রতিফলিত তরঙ্গের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠে এই প্রতিফলিত তরঙ্গ ধরবার জন্যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এরূপ যন্ত্রকে বলা হয় সাইজমোগ্রাফ। ভূপৃষ্ঠের বেশ কয়েক হাজার ফুট নীচের স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ এতে ধরা পড়ে। এই যন্ত্র তরঙ্গের রেখাচিত্র লিপিবদ্ধ করে একটি কাগজে। এভাবে সৃষ্টি হয় একটি ভূকম্প-লিপির। এই লিপি থেকেই জানা
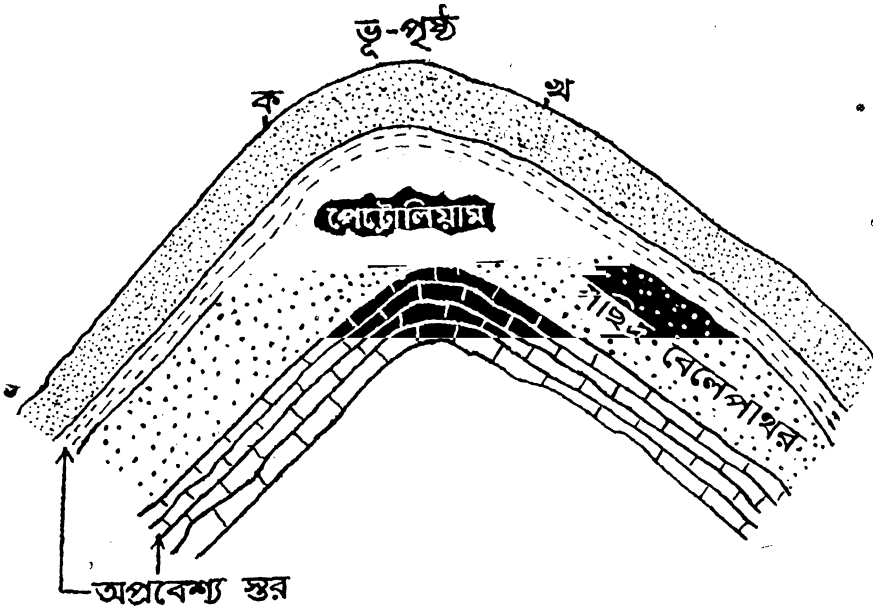
ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের আদর্শ অবস্থান।
ক-খ-এর মধ্যবর্তী অংশ তৈল-কূপ খননের উপযোগী।

যায়, একটি বিশেষ তরঙ্গ কোন্ সময়ে প্রথম-দ্বিতীয়, দ্বিতীয়-তৃতীয় ও তৃতীয়-চতুর্থ প্রভৃতি শিলাস্তরগুলির মধ্যবর্তী তল থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। তলগুলির গভীরতা এভাবে নির্ণয় করা যায়। ফলে স্তরবিন্যাসও জানা যায় এবং স্তরগুলিতে যদি কোনও ভাঁজ থাকে তবে ভাঁজের প্রকৃতিও জানা যায়। আবার প্রয়োজন-মত আবিষ্কৃত শিলাস্তরগুলির প্রকারভেদও করা যেতে পারে। এভাবে অনুসন্ধানের এলাকায় ভূপৃষ্ঠের নীচের শিলাস্তরগুলির অবস্থান একটা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থা পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্বের অনুকূল হলে তবেই পেট্রোলিয়াম কূপ খনন করা হয়। অনুকূল অবস্থা বলতে বুঝতে হবে যে, একটি তৈলবাহী শিলাস্তরের উপস্থিতি; যেমন—একটি সচ্ছিদ্র বেলেপাথরের স্তর। এই সঙ্গে একটি সন্নিহিত শিলাস্তরের অবস্থান প্রয়োজন; যেটা একদিন পেট্রোলিয়ামের উৎস-স্থল ছিল বলে ধরা যেতে পারে; যেমন—অঙ্গারযুক্ত শেল পাথর (Carbonaceous shales)।

এরূপ স্তরে সৃষ্ট পেট্রোলিয়ামই পরে পূর্বোল্লিখিত তৈলবাহী স্তরে সঞ্চিত হয়। আবার এই তৈলবাহী স্তরে একটি ভাঁজেরও প্রয়োজন, যার ফলে পেট্রোলিয়াম পাশের দিকে বেশী বিস্তৃত না হয়ে অল্প স্থানের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে একটা পেট্রোলিয়াম খনি সৃষ্টি করতে পারে। আবার পেট্রোলিয়াম স্তরের উপরে ও নীচে এমন শিলাস্তর থাকবে, যার মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম নির্গত হতে পারে; যেমন—অপ্রবেশ্য শেল-পাথরের স্তর। এগুলিকেই সাধারণভাবে পেট্রোলিয়াম অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ বলে ধরে নেওয়া হয়। আলোচ্য পদ্ধতিতে এরূপ অনুকূল অবস্থার সন্ধান দেওয়া যায় এবং এলাকাটি পেট্রোলিয়াম কূপ খননের উপযোগী কিনা, সেটা ঘোষণা করা হয়। তবে যতক্ষণ কূপ খনন করে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব এবং পরিমাণ লাভজনক বলে প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে স্বীকার করা হয় না। উত্তরোত্তর উন্নততর উপায়ে এই অসঙ্গতি কমিয়ে আনা হচ্ছে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুহুরী

রকেট

কোন কোন উৎসব উপলক্ষে আমরা হাউই ছাড়ি। হাউই জিনিষটা কি—দেখা যাক; তাহলেই রকেট কি—বোঝা যাবে। একটা লম্বা প্যাকাটির একদিকে মোটা কাগজের একটা লম্বাটে চোঙ বাঁধা থাকে। চোঙের মধ্যে বারুদ ও তার নীচের দিকে ছিদ্র করে একটা পল্‌তে বাইরে বের করা থাকে। হাউই ছাড়বার সময় প্যাকাটির অন্য দিকটা আল্‌তোভাবে ধরে থেকে পল্‌তেয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুন পল্‌তেটাকে পোড়াতে পোড়াতে যেই বারুদের মধ্যে ঢোকে অমনি শাঁ করে হাত থেকে প্যাকাটিটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাউই আকাশে উঠে যায়। যতক্ষণ বারুদ থাকে ততক্ষণ উপরে উঠতে থাকে। বারুদ ফুরিয়ে গেলে শূন্য খোলটা নীচে নেমে আসে।

বারুদে আগুন পৌঁছানো মাত্র বারুদ পোড়বার ফলে উৎপন্ন গ্যাস আয়তনে অনেক বেড়ে যায় এবং ছোট্ট খোলটির চারপাশে চাপ দিতে থাকে। কেবল নীচের ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বেরোবার রাস্তা পায়। ছিদ্রের বিপরীত দিকে ধাক্কা দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যায়; ফলে হাউই আকাশে উঠতে থাকে। একটা রবারের বেলুনে হাওয়া ভর্তি করে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, বেলুনের ছোট্ট মুখটি দিয়ে হাওয়া যখন বেরুতে থাকে তখন বেলুনটা মুখের বিপরীত দিকে ছুটে যায়। এমনি করে বিপরীত-চাপ সৃষ্টির ফলে উড়ন-তুবড়ীও ছুটে যায়। মহাকাশযাত্রী রকেটও এই

রকম শক্তির জোরেই ছুটে যায়। অতি দ্রুতগামী যে কমেট বিমান আজকাল দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, তাও এই শক্তির জোরেই ছুটে থাকে। অবশ্য একটা কথা বুঝতে হবে—হাউই বা রকেটের এই গতি উৎপাদনের সঙ্গে বাইরের বাতাসের কোন সম্পর্ক নেই। বাইরের বাতাস এই শক্তি সৃষ্টিতে কোন কাজে আসে না।

আধুনিক যুগেই যে রকেট আবিষ্কৃত হয়েছে, তা নয়। বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছে চীন দেশে; আবার কার্যক্ষেত্রে রকেটের ব্যবহার তারাই করে প্রথম। তের শতকে মঙ্গোলিয়ানরা চীন আক্রমণ করলে চীনারা তাদের উপর এমন রকেটের (হাউই-এর রকমফের) ফোয়ারা ছোঁড়ে যে, মঙ্গোলিয়ানদের ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দেশেও আঠারো শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের এক যুদ্ধে রকেট ব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। এই রকেটগুলি ছিল লোহার নলে তৈরী এবং সেগুলির পাল্লা ছিল আধমাইলের মত। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বোলোনের যুদ্ধে ইংরেজরাও রকেট ব্যবহার করেছিল। শেষ মহাযুদ্ধে রকেট-অস্ত্রের নানাভাবে উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যাক সে-সব কথা। আমরা যুদ্ধের রকেটের কথা ছেড়ে দিয়ে শান্তির রকেটের কথায় আসি।

পৃথিবী ছেড়ে চাঁদ বা অন্য গ্রহে যাবার স্বপ্ন মানুষের বহু দিনের। কিন্তু যাবার জন্যে উপযুক্ত বাহনের প্রয়োজন। বেলুন বা বিমানে যাওয়া অসম্ভব। কারণ হাওয়া না হলে এরা উড়তে পারে না। পৃথিবীর উপরে ব্যবহারযোগ্য হাওয়া আছে সামান্য কিছু দূর পর্যন্ত। উপযুক্ত রকেট নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিলেন আমেরিকায় বিজ্ঞানী রবার্ট গডার্ড। তিনিই প্রথম তিন-পর্যায়ের রকেটের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন ১৯১৯ সালে।

পৃথিবীর টানে সব জিনিষ মাটিতে পড়ে। পৃথিবী ছেড়ে চাঁদ বা অন্য গ্রহে যেতে হলে এই আকর্ষণ শক্তিকে কাটাতেই হবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, যদি কোন বাহনের ঘণ্টায় পঁচিশ-হাজার মাইল গতিবেগ সৃষ্টি করা যায়, তবেই সেই বাহন পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে অন্য গ্রহে যেতে পারবে। কিন্তু অত বেশী গতিবেগ কেমন করে করা যাবে? এত জ্বালানীর ব্যবস্থাই বা কি করে হবে? এসব সমস্যা সমাধানের উপায় দেখালেন গডার্ড তিন-পর্যায়ী রকেট তৈরী করে।

তিন-পর্যায়ী রকেট কি? একটা আকারে ছোট রকেটের (১নং রকেট) পিছনে আর একটা অপেক্ষাকৃত বড় রকেট (২নং রকেট), তার পিছনে আরও বড় রকেট (৩নং রকেট) পরস্পর সংলগ্ন। প্রথমে ৩নং রকেট জ্বালানো হলো। ৩নং রকেট ঠেলে নিয়ে চলল ২নং ও ১নং রকেট। ৩নং রকেটের জ্বালানী ফুরিয়ে যেতেই ২নং রকেটের জ্বালানীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েই ৩নং রকেট খসে পড়ে যায়। এতে লাভ হয় দু-রকম। এক—৩নং রকেটের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে সর্বশেষে যে গতিবেগে পৌঁছায়, সেই গতিবেগ

থেকে ২নং রকেটের গতিবেগ বাড়তে সুরু করে। এতে গতিবেগ অনেক বেশী বাড়তে পারে। দ্বিতীয় লাভ এই হয় যে, ৩নং রকেটটি খসে পড়ে' ২নং রকেটের বোঝা অনেক হাল্‌কা করে দেয়। এই ভাবে ২নং রকেটের জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে ১নং রকেটকে যে গতিবেগ দিয়ে যাবে—তার ফলে তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বা তারও বেশী এবং পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে চাঁদের দেশ বা অন্য গ্রহে যাত্রা করতে পারবে। এখন এই ব্যবস্থাতেই রকেট চন্দ্রের পৃষ্ঠে উপস্থিত হতে পেরেছে। এরূপ বহু পর্যায়ী সোভিয়েট রকেট 'মেচতা' চাঁদ পেরিয়ে সূর্যের দিকে যাত্রা সুরু করেছিল এই বছরের ৩রা জানুয়ারী তারিখে।

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ

পৃথিবীর বয়স

পৃথিবীর বয়স কত—এ-নিয়ে মানুষ অনেক কাল থেকেই চিন্তা করে আসছিল।

অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্চবিশপ আশার এবং তার পরবর্তী হিব্রু ধর্ম-যাজকেরা বললেন—পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩শে অক্টোবর, সকাল ন'টার সময়। কিন্তু আজকের কচিখোকাটিও জানে যে, এই হিসাবটা সম্পূর্ণ ভুল।

পৃথিবীর বয়স ঠিক করবার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে জেম্‌স্‌ হাটনের নাম করা যায়। তিনি অবসর সময়ে বাড়ীর কাছেই সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি দেখতেন, কখনও সমুদ্রের শান্ত ঢেউ বালির উপর বিচিত্র দাগ কেটে যাচ্ছে। আবার কখনও প্রচণ্ড ঢেউ পাশের চুনাপাহাড়ের চাঙ্গড় খসিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

ঢেউয়ে ভেঙে-পড়া একটা পাথরের চাঙ্গড়ে তিনি জলের দাগ-কাটা বিচিত্র নক্সা দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন যে, এই পাথরের চাঙ্গড় বোধ হয় বহুদিন আগে সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল। সেই বেলাভূমি আস্তে আস্তে সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবার পর সমুদ্রের ঢেউয়ে দাগ সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপর স্তরের পর স্তর বালি পড়ে এমন একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল, যাতে ঐ বেলাভূমি পাললিক শিলায় পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে পর্বতের সৃষ্টি করেছে। এই থেকে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে, কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল।

আর একটা বিষয় থেকেও মানুষ পৃথিবীর প্রাচীনত্বের কথা বুঝতে পেরেছিল। সেটা হচ্ছে ফসিল বা জীবাশ্ম।

বিজ্ঞানী কুভিয়ের ধারণা ছিল যে, এক একটি বিশেষ যুগে এক এক রকম

জীবের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই বিশেষ যুগ শেষ হতেই সেই প্রাণীরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, এক-একটি বিশেষ যুগে এক-এক ধরণের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন কোন জীব পরের যুগেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়সকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটা হলো নব্য-জীবীয় যুগ, যেটা সাত কোটি বছর আগে থেকে সুরু হয়ে এখনও চলছে। এটা হলো স্তন্যপায়ীদের যুগ। দ্বিতীয় হলো মধ্যজীবীয় যুগ। সেটা ১৯ কোটি বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল। সেটা ছিল সরীসৃপদের যুগ। তৃতীয়টা হচ্ছে পুরাজীবীয় যুগ। এই যুগে মৎস্যজাতীয় জীবের আবির্ভাব ঘটে।

কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন যে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন তাতে তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, সত্যিই পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের বেশী নয়। প্রথম যে বিষয়টি তিনি আলোচনা করেছিলেন, সেটা হলো পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্বন্ধে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে। ১০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কত ছিল, সেটা বের করা হলো। দেখা গেল—তখন যদি পৃথিবী তরল অবস্থায় থাকতো তবে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত আরও চাপা হতো। তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, পৃথিবীর মেরুদ্বয় যে রকম চাপা, সেটা কেবল সম্ভব, যদি পৃথিবীর উৎপত্তি দশ কোটি বছর আগে হয়ে থাকে।

এ তো গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, সূর্যের সমোষ্ণতার বিষয়ে। সূর্যের তাপ বিকিরিত হওয়া সত্ত্বেও তার তাপ হ্রাস পায় না কেন? কেলভিন প্রমাণ করলেন যে, সূর্যের পরিধির সঙ্কোচনের জন্যেই এই তাপের উদ্ভব হয়। এই সঙ্কোচনের ফলে কতটা তাপ সৃষ্টি হয়, তারও একটা হিসেব করা হয়েছে। তাথেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যের বয়স বড় জোর পনেরো কোটি বছর এবং পৃথিবী যে অপেক্ষাকৃত নবীন, তাতে কোন ভুল নেই। সুতরাং পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের বেশী হয় না।

তৃতীয় যুক্তিতে আসা যাক। কেলভিন বললেন যে, ভূগর্ভের যত নীচে নামা যায়, তত উত্তাপ বাড়ে কেন? তার কারণ, পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হলেও ভিতরটা এখনো ঠাণ্ডা হয় নি। ভূগর্ভের নীচে নামলে কত উত্তাপ বাড়ে, সেটাও হিসেব করে বের করা হয়েছে। প্রতি ৮০ ফুটে ১° সেন্টিগ্রেড বাড়ে। পৃথিবীর যদি গলিত অবস্থায় উত্তাপ ৪৫০০° সেন্টিগ্রেড হয় তবে বর্তমান অবস্থায় আসতে কত বছর লাগবে, সেটা হিসেব করা হলো। দেখা গেল যে, দশ কোটি বছরের বেশী লাগে না।

কিন্তু এই তিনটি যুক্তিতেই ভুল রয়েছে। প্রথম থেকেই ধরা যাক।

কেলভিন বলেছেন যে, পৃথিবীর বয়স ১০০ কোটি বছরের বেশী হলে উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত আরও চাপা হতো। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পৃথিবীতে বহু ভাঙা-

গঁড়ার জন্যে ১০০ কোটি বছরের আগে জন্ম হলেও বর্তমান অবস্থায় থাকা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যুক্তিতে কেলভিন বলেছেন যে, সূর্যের পরিধির সঙ্কোচনের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জানা গেছে যে, সূর্যের তাপ সৃষ্টি হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে।

তৃতীয় যুক্তিতে আসা যাক। পৃথিবী যেমন একদিকে ঠাণ্ডা হয়েছে, তেমনি তেজস্ক্রিয়তা, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতির জন্যে উত্তপ্তও হয়েছে খুব। এই ভাবে হিসেব করলে পৃথিবীর বয়স অনায়াসে এক-শ' কোটি বছরের বেশী হতে পারে।

এখন ভূ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটা যুক্তি জানা দরকার।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, সমুদ্র জলের পরিমাণ দেড়-শ' কোটি ঘন-কিলোমিটার এবং নুণের মোট পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ। প্রতি বছর পৃথিবীর সবগুলি নদীপথে প্রায় চল্লিশ কোটি টন নুণ এসে সমুদ্রে পড়ে। যদি ধরা যায় যে, অতীতে বরাবর এই পরিমাণ নুণ সমুদ্রে পড়েছিল, তবে সমুদ্রের বয়স হয় দশ কোটি বছর। কিন্তু অতীতে ভূপৃষ্ঠ সমতল থাকায় নদী-বাহিত নুণের পরিমাণ ছিল অনেক কম। এই হিসেবে দেখা যায় যে, সমুদ্রের বয়স এক-শ' থেকে দেড়-শ' কোটি বছর।

সমুদ্রের বয়স যদি দেড়-শ' কোটি বছর হয় তবে পৃথিবীর বয়স যে আরো অনেক বেশী হবে, তাতে কোন ভুল নেই।

এবার দ্বিতীয় আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি বছর নদীর জল, হিমবাহ ইত্যাদির সাহায্যে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে কতটা পলি পড়ে। এই মাটি ক্রমে পাললিক শিলায় পরিণত হয়। ৭০ মাইল গভীর পাললিক শিলা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এই হিসেবে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

কিন্তু এসব যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারিত হয় নি। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এক নতুন ব্যাপার আবিষ্কৃত হলো। তার নাম তেজস্ক্রিয়তা। এর সাহায্যে পৃথিবীর বয়সের নির্দিষ্ট মাপ পাওয়া যায়।

এটা অবশ্য পদার্থ-বিজ্ঞানেরই দান।

এই তেজস্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়াম অনবরত রশ্মি বিকিরণ করে ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে থাকে। সীসাই হলো ইউরেনিয়ামের শেষ রূপান্তর। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কত বছরে কতটা ইউরেনিয়াম থেকে কতটা সীসা হয়, সেটা হিসেব করা হলো। তখন পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের উপায় সহজ হয়ে গেল। একটা শিলা নেওয়া হলো, যার মধ্যে ইউরেনিয়াম আছে। এখন কতটা ইউরেনিয়াম থেকে কতটা সীসা কত বছরে রূপান্তরিত হয়েছে, সেটা হিসেব করা হলো এবং তত

বছরই হলো শিলাটার বয়স। এই রকম ভাবে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলাটা পাওয়া গেছে, সেটার বয়স এক-শ' পঁচাশী কোটি বছর। এর চেয়েও পুরনো শিলা পাওয়া অসম্ভব নয়।

শিলাটার বয়স যখন এক-শ' পঁচাশী কোটি বছর তখন পৃথিবীর বয়স তিন-শ' থেকে চার-শ' কোটি বছর হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই বিজ্ঞানীদের মতে—পৃথিবীর বয়স তিন-শ' থেকে চার-শ' কোটি বছর।

মানুষের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি অদম্য। এই অনুসন্ধিৎসার জন্যে মানুষ বিপন্ন হয়; এর জন্যে মানুষকে জীবন্ত পুড়ে মরতে হয়েছে। যে অনুসন্ধিৎসার জন্যে মানুষ বারবার দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করে, সেই অনুসন্ধিৎসার ফলেই সে বারবার প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়।

শ্রীসুদামচন্দ্র রায়

বিবিধ

ভারতের উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি এজেন্সীর সর্বশেষ বুলেটিনে 'ভারতে পারমাণবিক শক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ বলা হইয়াছে যে, আগামী বিশ বৎসর ধরিয়া ভারতে অধিক পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইবে। ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সাধারণ জ্বালানীর পরিপূরক হিসাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য ১৯৬৪ সালের শেষে ভারতে একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ঐ কেন্দ্রে ২৫০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির সমান পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৭৫০ মিলিমিটার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য আর একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ডাঃ হোমি ভাবার কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে ভারতের ডাঃ ভাবা বলিয়াছিলেন, ভারতে ২৫০ কিলোওয়াট হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির সমান পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতে শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিশুদের পুষ্টিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ

ভারতের শিশুদের পুষ্টির দিক হইতে সাধারণতঃ দুই ধরণের ঘাট্‌তি ঘটিয়া থাকে—স্নেহজাতীয় পদার্থের ঘাট্‌তি ও ক-খাদ্যপ্রাণের ঘাট্‌তি। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ক-খাদ্যপ্রাণ প্রয়োজন হয়। স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া শিশুর

স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন বেশ ভাল ভাবেই মিটিয়া থাকে। কিন্তু ছয় মাস পরে যখন মায়ের দুধ ফুরাইয়া আসে তখন শিশুকে পুষ্টির জন্য গরুর দুধ বা স্নেহজাতীয় পদার্থ-সমৃদ্ধ অনুরূপ কোন খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। গরীব ঘরের শিশুদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না।

শাকসব্জি হইতেও স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্নেহজাতীয় পদার্থ দুধ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 'উপযুক্ত সংমিশ্রণের দ্বারা শাকসব্জি হইতে পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে।

দুই দল শিশু লইয়া পরীক্ষা করা হয়। একটি দলকে মাখন-তোলা দুধ এবং অপর দলকে বাংলা ছোলা দেওয়া হয়। বাংলা ছোলা হইতে রক্তে স্নেহজাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হইতে সামান্য দেরী হয়। তাহা ছাড়া, উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল মোটামুটি একই প্রকার।

চার ভাগ ভাজা বাংলা ছোলার সঙ্গে এক ভাগ মাখন-তোলা দুধ মিশাইলে উহাতে শিশুদের প্রয়োজনীয় স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় কি না, তাহা লইয়া প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতীয় শিশুদের পুষ্টি-সমস্যার অবিলম্বে সমাধান সম্ভব হইবে। এই পর্যন্ত ফল খুবই আশাপ্রদ।

উদ্ভিজ্জ মোম

ভারত বর্তমানে কারনোবা ও অন্যান্য কঠিন মোম আমদানীর জন্য বৎসরে ৮ হইতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে। এই মোম পালিশ এবং কার্বন পেপার তৈরী করিতে প্রয়োজন। পালিশ আমদানীর জন্য আরও ৮ হইতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

কারনোবা মোমের পরিবর্তে একটি দেশীয় বিকল্প পদার্থ আবিষ্কারের জন্য পুণায় জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারে চেষ্টা চলিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিসলের পাতা হইতে তন্তু ছাড়াইয়া লইবার পর সেই গাছের পাতা হইতে যে মোম পাওয়া যায়, তাহা বহু ক্ষেত্রে কারনোবা মোমের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। যে সকল গুণের জন্য কারনোবা মোম ব্যবহার করা হয়, তাহার অধিকাংশই সিসলের মোমে আছে; যেমন—দ্রবণ ও তাপ-প্রতিরোধক ক্ষমতা।

সিসল পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ ও বোম্বাইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সিসলের তন্তু উৎপাদন শিল্প বেশ ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সিসলের তন্তু যন্ত্রের সাহায্যে বা আছড়াইয়া পৃথক করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত ছাঁটের মধ্যে শতকরা ৫ হইতে ১৮ ভাগ কঠিন মোম থাকে।

শুধু মাত্র দুইটি কারখানা হইতে বৎসরে প্রায় ৪০০ টন ছাঁট পাওয়া যায়। দেশের সমস্ত সিসল ছাঁট যদি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ৫০ টন করিয়া কঠিন মোম পাওয়া যাইবে এবং উহাতে দেশের বর্তমান চাহিদা মিটিবে।

ইথিলিন ডাইক্লোরাইড তৈরার পদ্ধতি

পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার ইথিলিন ডাইক্লোরাইড তৈরীর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে। নানা ধরণের মিথাইল প্লাষ্টিক তৈরীর জন্য ইথিলিন ডাইক্লোরাইড প্রয়োজন হয়। কয়েক ধরণের জিনিষ দ্রবণের জন্যও উহা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া, শস্যাগারে কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্যও উহা ব্যবহার করা যায়।

ভারতে কি পরিমাণে ইথিলিন ডাইক্লোরাইড প্রয়োজন হয়, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। কারণ উহা সাধারণতঃ একটি মিশ্র দ্রাবকের উপকরণ রূপে বিক্রীত হয়। তবে মোটামুটি হিসাবে

জানা যায় যে, ১৯৫৮ সালে ৬০০ টন ইথিলিন ক্লোরাইড ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৬৬ সালে উহার চাহিদা দাঁড়াইবে ৪,৬০০ টন।

যাঁহারা গবেষণাগারের পদ্ধতি অনুসারে বাণিজ্যিক হারে ইথিলিন ডাইক্লোরাইড তৈরী করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেক্রেটারির (মণ্ডি হাউস, লিটন রোড, নয়াদিল্লী-১) সঙ্গে পত্রালাপ করেন।

ট্র্যাকোমা রোগের টিকা

মার্কিন-বাহিনীর মেডিক্যাল ইউনিট তাইপের চীনা চিকিৎসকদের সহিত কাজ করিয়া ট্র্যাকোমা রোগ প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—এই টিকা সংক্রামক চক্ষুরোগ ট্র্যাকোমার বিস্তাররোধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

তিনজন মার্কিন ও দুইজন চীনা চিকিৎসক ট্র্যাকোমা-ভাইরাস লইয়া গবেষণা করিয়া মানুষের দেহে ঐ রোগ জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ ভাইরাস হইতে এমন একটি টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা মানুষের ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের সহকারী ডাঃ জে, টমাস গ্রেসন তাইপের ফরমোজা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় এই সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। ডাঃ গ্রেসন বর্তমানে তাইপের একটি নৌ-বিভাগীয় মেডিক্যাল ইউনিটে কর্মরত আছেন।

ডাঃ গ্রেসন বলেন যে, এই পর্যন্ত যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল বিশেষ আশাজনক। তিনি বলেন যে, ট্র্যাকোমা রোগ প্রতিরোধকরূপে এই টিকার যথেষ্ট সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহা সম্ভবতঃ এরূপ চক্ষু-রোগও নিরাময় করিয়া দিতে পারিবে, যাহা হয়তো মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া দিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, টিকার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য আরও এক বৎসর সময় লাগিবে।

রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় নূতন ভেষজ

বৃটেনের বিখ্যাত মেডিক্যাল গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশন এমন একটি ভেষজ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা করিবে। এই ভেষজটি এক্ষণে বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা-মূলকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই ভেষজটির—নাম ডারেনথিন (Darenthin)। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে যে সকল রিপোর্ট বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসিতেছে, তাহা হইতে জানা যায়—রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় তাহা বিশেষভাবে ফলপ্রদ হইয়াছে।

বাজারে ইতিমধ্যে বহু রকমের যৌগিক ভেষজ দেখা দিয়াছে; কিন্তু ডারেনথিন-এর গুণ হইল এই যে, তাহা স্নায়ুচক্রে কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

মিলন, না মৃত্যু ?

যৌন-আকর্ষণের সাহায্যে নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার চেষ্টা করছেন।

চেষ্টাটি চলছে মিউনিকের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক জীব-বিজ্ঞান রসায়নাগারে।

কয়েক শতাব্দী যাবৎ একথা জানা আছে যে, স্ত্রী-প্রজাপতির দেহ থেকে এমন একরকম সুগন্ধ নির্গত হয়, যার আকর্ষণে পুরুষ-প্রজাপতি ছুটে আসে। দু-এক শত গজ দূর থেকে নয়, তার অনেক বেশী দূর থেকেও পুরুষ-প্রজাপতি সে গন্ধের টানে চলে আসে। প্রজাপতির যৌন-জীবনের এটি এক রোমাঞ্চকর রহস্য।

বিজ্ঞানীরা এ-সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁদের

ধারণা, প্রায় সব কীট-পতঙ্গের যৌন-ইতিহাস একই রকম। কিন্তু নিঃসৃত সুগন্ধি দ্রব্যের পরিমাণ এতই কম যে, দু-একটি স্ত্রী-প্রজাপতি নিয়ে এই পরীক্ষা চালানো যায় না। অতএব বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নামে উৎসর্গীকৃত মিউনিক গবেষণাগারে ৫ লক্ষ স্ত্রী-প্রজাপতি আমদানী করে তাদের দেহ-নিঃসৃত সুগন্ধি-রস সংগ্রহ করা হয়। এখন কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারেই এই রস তৈরীর চেষ্টা চলছে। এর পর এই কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্যের টানে পুরুষ-প্রজাপতিরা ছুটে আসবে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, প্রজাপতি-সংহার তাঁদের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হলো সে সব কীট-পতঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করা, যারা কেবলই মানুষের অনিষ্ট করে চলেছে।

মার্কিন উপগ্রহ—ডিস্‌কভারার-৭

মার্কিন বিমান বাহিনী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি সাফল্যের সহিত কৃত্রিম উপগ্রহ 'ডিস্‌কভারার-৭' ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া উহাকে কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। উহাতে একটি আধার রহিয়াছে এবং সেটি একটি রহস্যাবৃত আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহা উপগ্রহ হইতে নির্গত হইবে। আধারে কোন প্রাণী নাই।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ডিস্‌কভারার-৭ প্রথমবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করিবার সময় আলাস্কা গ্রহ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে উহা হইতে প্রেরিত সঙ্কেত শ্রুত হয়।

উপগ্রহটির সপ্তদশবার পৃথিবী পরিক্রমার সময় আধারটি (ক্যাপসুল) নির্গত হইয়া আকাশ হইতে প্যারাসুটযোগে হাওয়াই-এর নিকট নিকট পতিত হইবে বলিয়া অনুমান। বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ উহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে। আধারটির ওজন ৩০০ পাউণ্ড। উহার ভিতর কি জিনিষ আছে তাহা অবশ্য গোপনীয় রহিয়াছে।

অফিসারগণ বলেন যে, ৫ ও ৬নং ডিসকভারারবাহিত আধার বা ক্যাপসুল পুনরুদ্ধার করা যায় নাই। যে ত্রুটির জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই, এখন তাহা সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থার সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ ড্রাইডেন এক বক্তৃতায় বলেন, দশ বৎসরের মধ্যে মহাকাশচারী রকেটসমূহ পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত হইবে।

পারমাণবিক শিল্পসংস্থায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, মহাশূন্যে অভিমুখে ধাবমান রকেটের নিম্নতর পর্যায়ে বর্তমানের রাসায়নিক জ্বালানীই ব্যবহার করিতে হইবে—কিন্তু ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে।

সৌরলোকের নিকটতম গ্রহসমূহের আলোকচিত্র

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী এরূপ আভাস দেন যে, রাশিয়ার রকেটসমূহ সম্ভবতঃ শীঘ্রই মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর নিকটতম সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহের আলোক চিত্র গ্রহণ করিয়া সেই আলোক চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে।

রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এস. কাতায়েভ সোভিয়েট সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ায় তাঁহার এক প্রবন্ধে আরও বলেন—আমাদের নিকটতম সৌরলোকের গ্রহসমূহের (যেমন—মঙ্গল গ্রহের) আলোক চিত্র মহাশূন্যলোক হইতে প্রেরিত হইয়া শীঘ্রই যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের টেবিলে আসিয়া হাজির হইবে, তাহার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মঙ্গলগ্রহ যে পৃথিবী অপেক্ষা বহু লক্ষ বৎসরের প্রাচীন এবং বহুকাল পূর্বে মঙ্গলগ্রহের অবস্থা যে

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার মতই ছিল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই অভিমত উল্লেখ করিয়া উক্ত অধ্যাপক বলেন—রকেট-বাহিত টেলিভিশন যন্ত্রের-সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগ পর্যবেক্ষণ করিয়া উভয় গ্রহের কতকগুলি সাদৃশ্যের কারণে মানুষ নির্ভুলভাবে বহু লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীর অনুরূপ অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম হইবে।

চন্দ্রের কলঙ্ক কাহিনী

টাসের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক বোরিস লেভিন মস্কোর পলিটেকনিক মিউজিয়ামে এক বক্তৃতায় বলেন, দীর্ঘকাল পূর্বে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের ন্যায় এক বিরাট মহাজাগতিক বস্তু-স্তূপের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে চন্দ্র বর্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

লেভিন বলেন, সোভিয়েটের মহাজাগতিক যন্ত্রাগার চন্দ্রের যে ছবি তুলিয়াছে, তাহার দ্বারা এই মতবাদের নির্ভুলতা প্রমাণিত হইয়াছে। চন্দ্র-দেহের 'বর্ষণ-সাগর' এলাকায় এই সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। সঙ্ঘর্ষের পর লাভাস্রোত চন্দ্রের প্রায় সমগ্র দেহেই ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাই পৃথিবী হইতে দেখা যায়।

লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের নক্ষত্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক অগ্রোদনিকোভ টাসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন—ইহা অনস্বীকার্য যে, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

তিনি বলেন, চন্দ্রের বিপরীত দিকের ছবি তোলাকে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রুশ বিজ্ঞানীরা সে একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের ছবি তুলিবেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই দুটি গ্রহের ফটো তুলিবার কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে এবং তজ্জন্যই চন্দ্র বা উহার নিকটবর্তী কোন যন্ত্র-ঘাঁটি হইতে উহাদের ফটো তুলিতে হইবে।

উত্তর মেরু অঞ্চলকে শস্য-সমৃদ্ধ করিবার পরিকল্পনা

সোভিয়েট মিলিটারী গেজেটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রকাশ—পিটার বোরিসোভ নামক জনৈক সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার বেরিং প্রণালীতে ৪৬ মাইল দীর্ঘ একটি রুশ-মার্কিন বাঁধ নির্মাণ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন, ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার সমূহ পরিবর্তন ঘটাইয়া এগুলিকে শস্য-সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিবার এক অতিবৃহৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

টাস এই সংবাদটি প্রচার করিয়া বলে—পরিকল্পিত বাঁধটি লৌহ ও কংক্রীটের দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে। বেরিং প্রণালী সংকীর্ণতম স্থানেও ৩৮ মাইল চওড়া। উহা যেমন এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশকে বিভক্ত করিতেছে, তেমনই উত্তর মহাসাগর ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। বৎসরের প্রায় সাত মাস তাহার জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই বাঁধে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-যন্ত্র স্থাপন করিয়া উত্তর মহাসাগরের জল পাম্প করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার ফল হইবে এই যে, ল্যাব্রাডার, পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ড ও অন্যান্য শীতল স্রোত যেভাবে অপর দিক হইতে প্রবাহিত শক্তিশালী ও গরম উপসাগরীয় স্রোতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহা আর সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, পাম্পের সহায়তায় গরম উপসাগরীয় স্রোতকে উত্তর মহাসাগরে বহাইয়া আনা হইবে এবং উহারই ফলস্বরূপ মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিবে। এই অতিবৃহৎ এশিয়া-আমেরিকা বাঁধটি নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে ৬২৫ কোটি ষ্টার্লিং—বহু দিনের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া

পরিকল্পনাটি সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাঁধটি নির্মাণের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিলে সর্বাধিক লাভবান হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, জাপান ও চীন। কিন্তু উহা নির্মাণের দায়িত্ব মুখ্যতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বহন করিতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরের সর্বাধিক গভীরতা

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানাইতেছে, সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর কৃষ্ণ সাগরীয় গবেষণা পরিষদ ভূমধ্যসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ১৫৭৫০ ফুট বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভূমধ্যসাগরের সর্বাধিক গভীরতা হইতেছে ১৪,৪৩৫ ফুট।

মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ-জীবন

বিশিষ্ট মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম সিণ্টন একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ-জীবনের ব্যাপক অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। মঙ্গলগ্রহের বৃক্ষলতা পৃথিবীর বৃক্ষলতা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র এবং সম্ভবতঃ উন্নত ধরণের।

মার্কিন বিজ্ঞান প্রসারণী সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ডাঃ সিণ্টন বলিয়াছেন যে, তাঁহার মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহে জৈব-অণুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই জৈব-অণুর অস্তিত্ব হইতেই সেখানে বৃক্ষলতার অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহের অধিকাংশ স্থল বৃক্ষ ও লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। গত বৎসর অক্টোবর মাসে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছিল, তিনি সেই সময় তাঁহার পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইয়াছিলেন।

ডানাওয়ালা মানুষ

ইমেল হর্টিম্যান নামক জনৈক আফ্রিকান যুবক তাঁহার অর্থিনোপিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়িতে সক্ষম হইয়াছেন। মনুষ্য-চালিত এই যন্ত্রের ডানা দুইটি গুটানো থাকে। এই উড্ডয়ন-ক্রিয়া লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়।

একখানা মোটর গাড়ী উহাকে খানিকটা টানিয়া নিলেই উহা আকাশে উঠিয়া যায় এবং বাজপাখীর মত পাখা দুইটি মেলিয়া হর্টিম্যান আকাশে উড়িতে থাকেন। হর্টিম্যান তিনবার আকাশে উঠিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অর্থিনোপিটার যন্ত্রের সহায়তায় হর্টিম্যান আকাশে উঠিতেছেন, এই ছবিটি কয়েকখানা বৃটিশ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে—'খেচর মানবের আকাশ যাত্রা।'

মানব-দেহে ষ্ট্রন্‌সিয়াম

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র 'নেচারে' প্রকাশ, উত্তর গোলার্ধের অধিবাসীদের হাড়ের মধ্যে যে পরিমাণ ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ রহিয়াছে, তাহার অর্ধেকেরও কম রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ানদের দেহে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ বায়ুমণ্ডলে ষ্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ ছড়াইয়া পড়ে এবং খাদ্যদ্রব্যের মারফৎ মানব-দেহে গিয়া প্রবেশ করে।

৭৬,৪০০ ফুট উঁচু হইতে লম্ফপ্রদান

মার্কিন বিমান বাহিনী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিমান বাহিনীর একজন অফিসার, ওহায়োর অন্তর্গত ডেটনে অবস্থিত এয়ার ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টারের এয়ারো স্পেস মেডিক্যাল লেবরেটরীর ক্যাপ্টেন জোসেফ ডব্লিউ. কিটিঙ্গার, জুনিয়ার ৭৬,৪০০ ফুট উর্ধ্বে একটি বেলুন হইতে প্যারাস্যুটযোগে লম্ফপ্রদান করিয়াছেন। বিমান

বাহিনীর ইতিহাসে এত উচ্চ হইতে প্যারাসুটযোগে লম্ফপ্রদানের দৃষ্টান্ত আর নাই।

মিঃ কিটিঙ্গার ১,০৫০ পাউণ্ড ওজনের একটি বেলুনযোগে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন। ৭৬,৪০০ ফুট উচ্চে উঠিতে তাঁহার ৯০ মিনিট সময় লাগে। লম্ফপ্রদান করিয়া ৬৮,০০০ ফুট নীচে নামিয়া আসিবার পর মিঃ কিটিঙ্গারের প্যারাসুটটি আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। তিনি তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০,০০০ ফুট উর্ধ্বে রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে নামিয়া আসেন। ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে তাঁহার ৩ মিনিট সময় লাগে। এই সময় আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা কখনও ছিল ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট, কখনও বা শূন্য ডিগ্রীর কম।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্থি আবিষ্কৃত

কয়েক মাস পূর্বে একদল সোভিয়েট ও চীনা প্রত্নজীব-বিজ্ঞানী গোবি ও আলাশান মরুভূমিতে এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানে অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর শিলীভূত কঙ্কাল ও দেহাবশেষ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান। সাড়ে চার মাসব্যাপী এই অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞানী-দলটি এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দুই শতাধিক জীবাশ্ম সংগ্রহ করিয়া গত ২১শে নভেম্বর তারিখে মস্কো প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই সংগ্রহগুলির কিছু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ও কিছু চীনের প্রত্নভবনগুলিতে সংরক্ষণ করা হইবে।

এই সব জীবাশ্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল—প্রায় সাড়ে তিন কোটি বৎসর পূর্বেকার এক জাতের গণ্ডারের কঙ্কাল (এই প্রাণীটির অস্তিত্ব এই পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল); দশ কোটি বৎসর পূর্বেকার এক শ্রেণীর দ্বিপদ ডাইনোসরের গলার ও ঘাড়ের কতকগুলি অস্থি; এবং পক্ষী ও স্থলচর জীবের মধ্যবর্তী অবস্থার কতকগুলি বিরাটকায় প্রাণীর দেহাবশেষ। প্রাগৈতিহাসিক গণ্ডারটির কঙ্কাল হইতে দেখা যাইতেছে, উহার দেহের উচ্চতা ছিল প্রায় এগারো ফুট এবং দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পনেরো ফুট। দ্বিপদ ডাইনোসরটি উচ্চতায় ছিল প্রায় ২৫ ফুট এবং নাসিকাগ্র হইতে পশ্চাদভাগ পর্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪৫ ফুট। এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত বৃহত্তম ডাইনোসরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

কৃত্রিম উপায়ে মাংসপেশী উৎপাদন

নিউকাসেল-এ (ইংল্যাণ্ড) মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত একদল চিকিৎসক ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা তরল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মাংসপেশী উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই ব্যাপারে গবেষণা এতটা অগ্রসর হয় নাই। পৃথিবীতে এই প্রথম মাংসপেসী উৎপাদন করা হইল। প্রায় এক বৎসর পূর্বে মাংসপেশীর রোগে আক্রান্ত তিনটি ইঁদুর আমেরিকা হইতে এই হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। মাংসপেশীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সময় লাগিতে পারে—কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া আমরা উৎসাহ বোধ করিতেছি।

নূতন শক্তির সন্ধান

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ কেন্দ্রীভূত শক্তি সম্পর্কে একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। টাস এই সম্পর্কে বলিয়াছে—শক্তি-চক্রের ধাঁধার সমাধানটা যদি হইয়া যায় তবে মানবজাতি পারমাণবিক শক্তির চেয়েও বহু গুণ শক্তিশালী অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদ এক অপরিসীম শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবে।

বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অণু-আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম একটি উপ-পরিবাহী যন্ত্রের সাহায্যে শক্তি সম্পর্কে এই নূতন সত্যটি জানিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানো চলে।

বৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তিজাল হইতে যখন উত্তাপ সৃষ্টির জন্য যন্ত্রটিকে চালু করা হয় তখন উহা যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি গ্রহণ করে তাহার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ শক্তি উৎপাদন করিতে পারে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বর্তমানে অতিরিক্ত উত্তাপের উৎসের রহস্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা—ইলেক্ট্রনের মধ্যেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

তাহা পাওয়া গেলে মানুষ অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হইবে। ইহার ফলে বিজ্ঞানে 'বৈদ্যুতিক, শক্তি ইঞ্জিনীয়ারিং' নামে নূতন একটি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ জ্ঞানের দ্বার মানুষের নিকট খুলিয়া যাইবে।

বিজ্ঞানীদের মতে—শক্তি সর্বদাই কেন্দ্রীভূত হইতেছে—তারকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে, উপগ্রহগুলি সৌরশক্তির সমাবেশ করিয়া চলিয়াছে এবং পৃথিবীর ওজন দিনে এক হাজার টন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

এই নূতন আবিষ্কার শক্তি-সংরক্ষণের বর্তমান থিয়োরীকে অস্বীকার করিতেছে না। কারণ শক্তি-সংরক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় যে, শক্তি যদি কখনও একটি বিশেষ আকারে থাকাকালে বিনষ্টও হয় তবে তাহা অন্য রূপ গ্রহণ করে এবং তাহার পরিমাণ ঠিকই থাকে।

লণ্ডন হইতে অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ—জনৈক ৬৬ বৎসর বয়স্ক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এক বিপ্লবাত্মক নূতন শক্তির উৎস আবিষ্কারের ব্যাপারে রাশিয়ানদের পরাজিত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের 'ডেলি মেল' সংবাদ দিতেছে যে, মিঃ ওয়াল্টার ওয়াটসন নামে একজন উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শক্তি কেন্দ্রীভূতকরণের ক্ষেত্রে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে টাসের বিবৃতি পাঠ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন।

রাশিয়ানরা ঘরে তাপ নিয়ন্ত্রণের এক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন।

'ডেলি মেল' মিঃ ওয়াটসনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ ওয়াটসন বলিয়াছেন যে, তাঁহার গৃহে রাশিয়ার বিপ্লবাত্মক 'নতুন শক্তির উৎস' তিন বৎসর যাবৎ রহিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, রাশিয়ানরা আজ যাহা কিছু বলিতেছেন, আমি ছয় বৎসর পূর্বেই সেই সমুদয় কিছু করিয়াছি। আমি উক্ত গুণাবলীর পেটেণ্ট করাইয়াছি এবং গৃহাদিতে ও প্লাইমাউথ হোটেলে উক্ত যন্ত্র স্থাপন করিয়াছি। আমার ঘরে তাপের জন্য ব্যয় অর্ধেকেরও কম পড়ে।

মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির গবেষণা

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ২০০৯ সালের মধ্যে মানুষের পরমায়ু দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে। ঐ সময়ের মধ্যে সোভিয়েট হাসপাতালগুলিতে প্রধানতঃ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদেরই দেখা যাইবে। হাসপাতালে জীর্ণ হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, বৃক্ক প্রভৃতি দেহযন্ত্রগুলিকে যন্ত্রণাহীনভাবে সরাইয়া সেগুলির স্থলে অপেক্ষাকৃত তরুণ সতেজ যন্ত্র বসান হইবে।

এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ও বার্ধক্য বিলম্বিত করিবার ব্যাপারেই কেন্দ্রীভূত হইবে। এক দেহ-যন্ত্রের স্থলে অন্য দেহযন্ত্র স্থাপন—একটি জনপ্রিয় ও নিরাপদ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে পরিণত হইবে।

ডাঃ ডেমিখব উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ডাঃ ডেমিখব জীবজন্তুর দেহযন্ত্র স্থানান্তর সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। '২০০৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে মানুষের আয়ুষ্কাল' সম্পর্কে এক আলোচনা উপলক্ষে এক প্রবন্ধ লিখিত হয়। ডাঃ ডেমিখব লিখিয়াছেন যে, এখন চিকিৎসার এই পদ্ধতি লইয়া জীবজন্তুর উপর

পরীক্ষাকার্য চালান হইতেছে, ভবিষ্যতে ঐ পদ্ধতি মানুষের উপর প্রয়োগ করা যাইবে।

ডাঃ ডেমিখব বলেন যে, গত অক্টোবর মাসে মস্কোতে এক বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি একটি কুকুর দেখাইয়াছিলেন। উহা দুইটি হৃৎপিণ্ড লইয়া পক্ষকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। আর একটি কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস বাহির করিয়া লইয়া উহাকে আর একটি কুকুরের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসহীন ঐ কুকুরটি বেশ কয়েকদিন বাঁচিয়া ছিল। রক্তবাহী ধমনী সেলাই করিবার জন্য এক বিশেষ যন্ত্র নির্মিত হওয়ায় দেহযন্ত্র স্থানান্তরের এই গবেষণা চালান সম্ভব হইতেছে।

মানব-দেহে এই সকল পরীক্ষাকার্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এক দেহযন্ত্রের স্থলে অন্য দেহযন্ত্র সাময়িকভাবে বসাইয়াও কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা জখম যন্ত্রকে নিরাময় করা যাইতে পারে। তাঁহার ধারণা, অপেক্ষাকৃত তরুণ যন্ত্র বাহির হইতে বসাইয়া সমগ্র দেহযন্ত্রের নবজীবন সঞ্চারিত করিবার সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিয়াছে—জড্‌রেল ব্যাঙ্কে বৃটেনের-যে রেডিও-টেলিস্কোপ রহিয়াছে, রাশিয়ার টেলি-স্কোপটি তদপেক্ষা অনেক বড় হইবে।

প্রায় ১৩০ ফুট উচ্চ টেলিস্কোপটির সহায়তায় শুক্রগ্রহ সম্পর্কে গবেষণাও সম্ভব হইবে।

জমি তৈরীর নূতন যন্ত্র

ধানের জমি রোপণের উপযোগী করিবার একটি সস্তা যন্ত্র কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাগার আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে কতকগুলি ঘূর্ণায়-মান ব্লেড বা ফলক আছে। এই যন্ত্র মাটি কাটিয়া উহা ভাল করিয়া আলোড়িত করে। ইহা সহজেই দুইটি বলদের সাহায্যে টানা চলে।

জমিতে জল দাঁড়াইবার পর মাত্র একবার বা দুইবার এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

ধানের চারা রোপণের পূর্বে জমি কর্দমাক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে ইহা করা হয়। দেশী লাঙ্গলে শুধু মাটি কাটা যায়। সেই জন্য জমি ভালভাবে কর্দমাক্ত করিতে হইলে বারবার লাঙ্গল চালাইতে হয়।

যন্ত্রটি নরম মাটি ছাড়া সকল প্রকার মাটিতেই ব্যবহার করা যায়। আট ঘণ্টায় প্রায় তিন একর জমি কর্দমাক্ত করা যায়। এমন কি উহার সাহায্যে সবুজ সার ভালভাবে মিশান যায়। উহা তৈরী করিতে ৭০ টাকা খরচ পড়ে।

রাগির মল্ট

মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার রাগি (ইলিউসিন কোরানা) হইতে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট তৈরীর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। গুণের দিক হইতে বাজারের অন্যান্য মল্টের সঙ্গে এই মল্টের তুলনা করা যায়।

সাধারণতঃ ওষুধ এবং শিশু ও পীড়িতদের খাদ্য, যেমন, মল্টযুক্ত দুধের গুঁড়া, পানীয় প্রভৃতি তৈরীর জন্য মল্ট এক্সট্র্যাক্ট প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ মল্ট এক্সট্র্যাক্ট তৈরী হয় তাহা মোট চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে প্রচুর পরিমাণে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়—যদিও রাগি, যোয়ার, বজরা প্রভৃতির মত তণ্ডুল জাতীয় শস্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

মহীশূরে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট তৈরীর জন্য এই চারিটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে—(১) রাগি হইতে মল্ট তৈরী (২) জিলাটিনযুক্ত মল্ট ময়দার সঙ্গে উহা ভালভাবে মিশান, (৩) পরিস্রাবণ ও (৪) ঘনীভূত-করণ। এভাবে যে এক্সট্র্যাক্ট পাওয়া যায় তাহা হাল্কা তামাটে রঙের ও চট্‌চটে হয়। উহার স্বাদ ও গন্ধ সুন্দর।

বিশেষজ্ঞের অভাবেই আমাদের দেশে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট শিল্প ব্যাহত হইয়াছে। বর্তমানে মাত্র ব্যাঙ্গালোর ও লক্ষ্ণৌতে দুইটি কারখানায় মল্ট এক্সট্র্যাক্ট তৈরী হইতেছে।